নব্যভারত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

উনবিংশ খণ্ড— ১৩০৮।

কলিকাতা.

৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত, ও ২১০৪ নং

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৲ তিন টাকা মাত্র।

ঊনবিংশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

(১৩০৮)

নব্যভারত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

উনবিংশ খণ্ড—১৩০৮।

দয়া।

পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী কে? খ্রীষ্ট বলিতেন, দীনাত্মারা সুখী, কেন না, স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই। শ্রীচৈতন্ত বলিতেন, ধর্ম্মের সার কথা, নামে রুচি, জীবে দয়া। দুঃখী দরিদ্র ভিন্ন বিধাতার দয়া উপভোগ কে করিতে পারে? দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষ যখন যায় যায় হয়, তখন দয়ারূপিনী দেব দূতীর আবির্ভাব হয়। সে আবির্ভাবে যাঁহার হৃদয় সিক্ত, সে-ই প্রকৃত সুখী।

ইতিমধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে দয়া করিতে লিখিয়াছিলাম। বন্ধু লিখিয়াছেন, "দয়া, তাহা আজ কালকার দিনে বড় দুর্লভ।" এইরূপ তিক্ত ব্যবহার পাইয়া ভাবিতেছিলাম, বাস্তবিকই কি দয়া এ জগতে দুর্লভ হইতেছে? যদি তাহা হয়, তবে তৎসহ সুখ শান্তিও কি এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে? যদি তাহা হয়, দুঃখী দরিদ্র ব্যক্তিগণ কি করিয়া, কি লইয়া জীবন ধারণ করিবে?

জুগার, দ্বারে দ্বারে দয়া ভিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কোথায় দয়া? স্বার্থপরতা মানুষের অন্তরকে পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, দয়ার মধুর মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। হতভাগ্য চীন সম্রাজ্ঞীর চরণপ্রান্তে আজ দয়াপ্রার্থী, কিন্তু খ্রীষ্টের ভক্তগণ আজ রক্তপানের মহানৃত্যে মাতোয়ারা! হায়, দয়া কোথায়? পিতা মাতাকে বধ করিয়া, যুবতী কন্তার সতীত্ব অপহরণ করিয়া সৈন্যগণ চীনে আত্মতৃপ্তি সাধন করিতেছে!! তাহাদের খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত প্রতিশোধ তোলা হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত! বিসপগণ, পাদ্রীগণও আনন্দিত!! হায়, দয়া কোথায়? দয়া কি এ জগৎ হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে? সেবুণীরর এবং ষ্টেড্ সাহেবের ক্ষীণ লেখনী পরাস্ত—আসুর রাজ্যে কত কত ভীষণ ক্রিয়ার নিত্য অভিনয় হইতেছে! হতভাগ্য আসামের কুলীদিগের দুর্দ্দশার কথা না জানে, এমন লোক নাই। কিঞ্চিৎ বেতন-বৃদ্ধির চেষ্টা হইল, স্বার্থপরতা ঘোর প্রতিবাদী হইল! মহাত্মা কটনের চেষ্টা পরাস্ত হইল!! এদেশে কত অবলার প্রতি কত পাপের অত্যাচার হইতেছে, কত দুঃখী, দরিদ্র, ধনীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত, কিন্তু হায়, দয়া নামক দেবদূত কোথায়?

নববর্ষের প্রারম্ভে এই সকল বিষাদের কথা ভাবিতেছিলাম এবং অশ্রুপাত করিতেছিলাম। আমাদের মনে ১২৮৪ সালের

কথা জাগিতেছিল। জীবন ইতিহাসের সে এক অমূল্য বৎসর। সামাজিক অত্যাচারে আমরা মুহ্যমান। চতুর্দ্দিকে বিরোধী দলের আস্ফালন, সহানুভূতি সঙ্কুচিত, লজ্জা শরম লুক্কায়িত, আত্মীয়গণ মহা শত্রুর বেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান। মা যদি সন্তানকে মারে, কে রাখিতে পারে? আমরা মাতৃহীন অসহায়, মাতা পিতার স্থানীয় আত্মীয়গণ যখন তীব্র, কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, নিরুপায় হইয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিলাম। দ্রব্যাদি প্রতিগৃহীত, সাহায্য বন্ধ, ক্রমে ক্রমে উপবাসকে সম্বল করিয়া চলিতে হইল। তাহাতেও নিবৃত্তি নাই, উপহাস, বিদ্রূপ, তিক্ত ব্যবহার, অবহেলা, ঘৃণা, পরিত্যাগ, পরিবর্জ্জন, এ সকলও যখন পরাস্ত হইল, তখন একমাত্র সম্বল চরিত্রের উপরও অভিযোগ আরম্ভ হইল। মানুষ যখন আর কোন রূপে কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, তখন এই উপায়টীকেই মহা অস্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। কত লোক প্রতিদিন কত মহাজনের চরিত্রের নিন্দা ঘোষণা করিয়া ইষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে। কষ্টের উপর কষ্ট, দুঃখের উপর দুঃখ। আকাশের দিকে চাহিয়া চলিতাম এবং বিধাতাকে বলিতাম "দুরের মৃত্যু নিকটে আনয়ন কর, দুঃখ নাই, বিধাতা, দীনের এই প্রার্থনা, কর্ত্তব্য পালন করিয়া যেন মরিতে পারি।" সে কষ্ট দুঃখময় ইতিহাস লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাই না। ব্যক্তিগত শোক দুঃখের কথা শুনিতে, আজ কাল, এই দয়াহীনতার দিনে, শুনিতেছি, অনেকেই বিরক্ত। যে কখনও রসগোল্লা খাইয়াছে, তাহার নিকট সন্দেশের মিষ্টত্বের বর্ণনা শুনিতেই নাকি অনেকে উৎসুক! এই কষ্ট দুঃখ, উপহাস অনাহারের দিনে, একটী ঘটনা উপলক্ষে, দেখিলাম, একটী অপরিচিত সাধু ব্যক্তি দশ আনা পয়সা প্রসন্নচিত্তে আমাকে দান করিলেন। দশ আনা পয়সা নয়,মনে হইল যেন দশ কোটী টাকা। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, মনুষ্য মূর্ত্তি যেন সেখানে নাই, যেন দেবরূপী দয়া সেখানে আবির্ভূত। অথবা সে যে কি অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলাম, ভাষায় তাহা বর্ণনা করার সাধ্য নাই। বন্ধু, তুমি কি দয়াকে কখন কোন বাহ্য রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবেই, কেবল তবেই, সে রূপের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে। জননীর স্তনের শোণিত দুগ্ধরূপে কণ্ঠকে শীতল করে, নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, কিন্তু বুঝিয়াছ কি, কি শক্তি মন্ত্রে ঐ শোণিত দুগ্ধে পরিণত? অসহায় অবস্থায় কোন ভীষণ ব্যাধিরহস্তে পড়িয়া কোন লোককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়াছ কি? দেখিয়াছ কি, কোন অপরিচিত লোক তাহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে এবং মৃতের জন্য অশ্রুপাত করিতেছে? দেখিয়াছ কি যে, শেষে সেই দারুণ শোকে,সেই মৃত ব্যক্তির সংক্রামক ব্যাধিতেই সেবাকারীর মৃত্যু হইয়াছে? এরূপ চিত্র অনেক দেখা যায়। বন্ধু, তুমি এইরূপ দুই একটী চিত্র দেখিয়াছ বই কি? দেখিয়াছ এবং উপেক্ষা করিয়াছ। কি শক্তি মন্ত্রে এইরূপ লোকেরা দীক্ষিত, বলত? কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া এই সেবাকারী জীবনমমতা ছাড়িলেন? মন্ত্র আর কিছুই নয়—উহা দয়া;—অদৃষ্ট দেবতার দৃষ্ট ছবি, অলক্ষিত সত্যের ধ্রুব প্রকাশ,—উহা স্বর্গের প্রভা-

কিংবা [illegible]ছুতের আমিরাখারা ; উহা পতিত-পাবনী মৃতসঞ্জীবনী নিত্য প্রত্যক্ষ শক্তি। উহাতেই বিধাতার বিধাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত,—সংসার-মরুভূমিতে উহাই একমাত্র ওয়েসিস্। উহা এ সংসারের জিনিস নয়।

মানুষ সদা আত্মভাবে বিভোর হইয়া গৌরবের সহিত ঘোষণা করে,—"আমি করি, আমি বলি,—আমি কত দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছি, কত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছি, শত জনকে বিপদে রক্ষা করিয়াছি।" এ সংসারের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার-বিবরণ আর কিছুই নয়, উহা কেবল অহঙ্কারের লিখিত ইতিহাস মাত্র। দান দাতব্যের কাহিনী, অহংতত্ত্বপূর্ণ অসংযত আসুরিক লীলাকথা। নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া সে কাহিনী লেখার আবশ্যকতা বুঝেন নাই। ঈশা মেরি ম্যাগডেলিনকে উপদেশ দিয়া উদ্ধার করিলেন, কিন্তু সে কাহিনী লিখিয়া রাখিলেন না। এ দেশের প্রাচীন সময়ের কত কথা, কত শাস্ত্র, কত সত্য প্রচারিত রহিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রচারকের নাম নাই। আমি-তত্ত্বে যত দিন মানুষ নিমগ্ন, পর তত্ত্ব ততদিন মানুষ বুঝেনা। আমি-তত্ত্ব বিস্মৃতিতে ডুবাইলে তবে পরের আদর শেখা যায়। পরের আদর শিখিলে, তবে একতা সম্ভব, তবে দয়ার অঙ্কভীরে উপনীত হওয়া যায়। নররূপী অসুর, তখন দয়ারূপিনী দেবী হন। তখন মানুষ পরের দুঃখ দুঃখ দেখিলে, নিজের স্বার্থ, সংসারের প্রপঞ্চ, এমন কি, জীবন-মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পরের উপকারে তৎপর হয়। মহাত্মা এমারসন বলিতেন, "যিনি আমার নিকট উপস্থিত হন, তিনিই কোন না কোন বিষয়ে আমার "গুরু।" কথাটা ভাবান্তরে লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ হয়, যিনি আমার নিকট উপস্থিত হন, তিনিই আমাকে কিছু দিতে আসেন। কাহার প্রেরণায় কে জানে, প্রতিনিয়ত মানুষ কত সত্য, কত বেদ বেদান্ত, কত সাহায্য, অযাচিত ভাবে আমার ঘরে রাশিকৃত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শিশু শুধু হাসিয়া হাসিয়া অব্যক্ত ভাষায় কত তত্ত্ব বলিয়া যায়, কত যুবক কত সহানুভূতি, কত বৃদ্ধ কত উপদেশ কতরূপে দিয়া দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া যাইতেছে। আমি চাই যখন তখন মোটেই পাইনা ; চাই না যখন, তখন দেখি, কতজনে দিবার জন্য ব্যস্ত। যে যাচ্‌ঞা করেনা, তাহাকে দিবার জন্য যেন সকলে ব্যতিব্যস্ত। সে দুঃখী, তাহার প্রতিই যেন সকলের দৃষ্টি। পৃথিবীতে দুঃখ দারিদ্র্য অনেক আছে, তাহার দ্বারে নিত্য অপরাজিতা দয়াও মূর্ত্তিমতী। তাহা যদি না হইত, এই ধরা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইত। তৃণের ন্যায় দীন যে, তাহাকে রক্ষা ও উদ্ধার করিবার জন্য প্রত্যক্ষ দেবী দয়া সদা ব্যস্ত। ঐ যে ১২৮৪ সালে যেরূপী "দয়ার" প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তারপর প্রতিদিনই, প্রতিঘটনায়, শয়নে স্বপনে ঐ এক মূর্ত্তিই দেখিতেছি। বিজ্ঞ বন্ধুরা আমাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু আমি যে "দয়ার" সাগরে ডুবিয়াছি, সে অকথিত কথা কেহ বুঝিলেন না। এইরূপে সংসারের দীন দুঃখী সকলেই অপরাজিত দয়ার বাঁচিতেছে।

সাহিত্যের বাজারে বড় হুলস্থুল লাগিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের অনেক বক্তাই পাণ্ডিত্য, আলোচিত। কাগজের উপর কাগজ

প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কত রকম বিজ্ঞাপন, কত ছবি, কত ছাপার মনোহারিত্ব, কত গল্পের ছড়াছড়ি!! দশজন সুলেখকের দেশে বিশ খানি কাগজ! সাহিত্যের সেবার অপেক্ষা পবিত্র কাজ আর নাই। বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এত লোক চেষ্টা করিতেছেন, এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। সহস্র সহস্র লোক খাটিলে, তবে বাঙ্গালা ভাষা জাগিবে। কিন্তু এই পবিত্র কর্ত্তব্য সাধনে বৃথা হই-চই, আড়ম্বর আস্ফালন, হিংসাবিদ্বেষ কেন? যাত্রী সংগ্রহের জন্য তীর্থের পাণ্ডারা যেমন করে, পবিত্র সাহিত্যসেবীরা সেইরূপ কাজে কেন প্রবৃত্ত? ভদ্রতার অযোগ্য নানা প্রলোভন প্রদর্শন কেন? ফুল ফোটে, কাহাকেও সৌন্দর্য্য দেখাইতে ডাকে না; পাখী গায়, কাহাকেও শুনাইতে ব্যস্ত হয় না। কত জন বিজ্ঞাপনে কত প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছেন,—"এমন করিব, তেমন করিব।" কোন কোন হিতৈষী বন্ধু এই সব দেখিয়া বলেন,—"এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকের দিনে নব্যভারত লইয়া আর হাবুডুবু খাওয়া কেন? পার ত প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেও, অবিভেদে যে-সে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া আয় বাড়াও, ছবি দেও, গল্প দেও, চাকচিক্য বাড়াও, নচেৎ পাততাড়ি তোল। কি সম্বলে এই কঠোর পরীক্ষার দিনে টিকিবে?" প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সম্বল কি? সম্বল ত কিছুই নাই। সম্বল যদি কিছু থাকিত, তবে বুঝিবা কাহারও নিকট কিছুই সাহায্য পাইতাম না। মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছিলাম, সহায় সম্বলহীন উলঙ্গ অবস্থাতেই চলিয়াছি,—উলঙ্গ অবস্থাতেই মরণকে আলিঙ্গন করিব। জ্ঞান নাই, পাণ্ডিত্য নাই; বুদ্ধি নাই, প্রতিভা নাই; বেশ [illegible] ভূষা নাই; ধন নাই, বল নাই—কি দিয়া কি করিব? যাহার কোন সম্বল থাকে, সে সেই সম্বলের জোরে এই সংসারে যুঝে। আমরা সকল সহায় এবং সম্বলহীন। আমরা আত্মহারা,—সর্ব্বস্বহারা। আমরা আছি কেবল কাহারও যেন অযাচিত, স্পষ্ট, দৃষ্ট, ধ্রুব দয়ায়। শৈশবে মাতৃকোলে সেই দয়া মাতৃস্নেহ, যৌবনে বন্ধুস্নেহ, বার্দ্ধক্যে জগতের স্নেহ। দয়া, কেবল দয়াই আমাদের সম্বল। যাহাকে পাই, তাহারই পা ধরিয়া কেবল দয়া ভিক্ষা চাই। কখনও চাই, কখনও কেবল নির্ভর করিয়া থাকি। শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া ভিক্ষা করি, দয়া পাই; ভিক্ষা না করিয়া নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি, তখনও দয়া পাই। দুঃখী, অসহায়, দরিদ্রের মস্তকে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় দয়া ঝর ঝর করিয়া দিবা রাত্রি বর্ষিত হইতেছে; শত্রু-মিত্র, স্বদেশী বিদেশী, আত্মীয়, অনাত্মীয়—যাহার নিকট তাকাই, তিনিই অযাচিত ভাবে "দয়া" করেন। বন্ধু বলেন, দয়া এজগতে দুর্লভ; ইতিহাস বলে, চীন ও ট্রানস্ভাল দয়াতে বঞ্চিত; কিন্তু হায়, আমি যে "দয়া" ভিন্ন এসংসারে আর কিছুই দেখি না। চীন, ট্রানস্ভালের দুঃখ-কাহিনী ছিল, তাই ষ্টেড্ ও লাবুশিয়র দয়া রূপে আজ আবির্ভূত; ভারতের কুলিদিগের দুঃখ দারিদ্র্য ছিল, তাই আজ অযাচিত ভাবে কটন দয়ার অবতার। ভারতে পুলিসের অত্যাচার অদম্য, তাই মধুর পেনেল-মূর্ত্তি বিকশিত। বঙ্গে বিধবাদের অশেষ দুঃখ দুর্গতি ছিল, তাই বিদ্যাসাগর এদেশে দয়ারসাগর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আর্য্যদেশের-দুঃখ দুর্গতি অশেষ, তাই মহামতি

গ্রাজোট্রামন্দের জীবনে দয়ার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি ভাল করিব, আমি নিজে চেষ্টা করিয়া ভাল হইব, এ অভিমান আমার নাই। ভাল যদি হই, কাহারও দয়ায় হইব ; যদি কাহারও ভাল হয়, কাহারও দয়ায় হইবে। এই নব্য-ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য অগণিত, অশেষ, অসমাপ্ত বটে—কিন্তু ঐ আকাশে দয়াও অশেষ, অগণিত, অপরাজিত, অসমাপ্ত। দিন রাত্রি দয়া-শ্রাবণের ধারাপাত হইতেছে, ঝর ঝর করিয়া দয়ার ঝরণা বহিতেছে। বন্ধু, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না ? বৃথা অভিযোগ কর। দয়া সম্বল, দয়া ভরসা, দয়া মন্ত্র, দয়া সাধন যাহার, সে আর কি করিবে ? ঐ দয়াকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আজও উহার দিকে চাহিয়াই বসিয়া থাকিব। বাঁচিত ঐ দয়াতেই বাঁচিব ; মরিত ঐ দয়াতেই মরিব। বৃথা ভয়ে আমি ভীত নই—আমার সম্বল কেবল দয়া, কেবল দয়া।

দয়া, তুই স্বর্গের রাণী, তুই অমৃতের দেবদূতী, তুই এই ভারতে একবার নূতন ভাবে নববর্ষে নেমে আয় ; আসিয়া এ মৃত দেশকে একেবারে সজীব করিয়া তোল্। তোর অসাধ্য কিছুই নাই—তুই একবার তুলিয়া ধর ত একবার দেখি,—দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাই।

অবৈধ।

(ইসলাম শাস্ত্রে)।

(১) উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে গুলি মাদকতা বা আলস্য উৎপাদন করে, বা যে গুলি বিষাক্ত, তৎ সমুদয় ভক্ষণ করা অবৈধ।

(২) চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে যাহারা দন্ত দ্বারা ভোজন করে, সেই সকল হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করা অবৈধ। দন্তভোজী জীব যথা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, কুকুর হস্তী ইত্যাদি।

(৩) পক্ষি জাতির মধ্যে শ্যেন, পেচক, শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণ, যাহারা অন্য পক্ষী বা ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৪) গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় জীব মাত্রই ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৫) গর্দ্দভ, অশ্বতর, ঘোড়া প্রভৃতি ভোজন করা অবৈধ।

(৬) কীট ও পতঙ্গ-জাতীয় জীবগণের মধ্যে পঙ্গপাল ব্যতীত অপর সমস্তই ভক্ষণ করা অবৈধ।

(৭) জলজন্তুর মধ্যে মৎস্য ব্যতীত অপর সমস্তই ভোজন করা অবৈধ।

(৮) যে সকল জীব ভোজন করিতে শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে মৎস্য ব্যতীত অবশিষ্ট মৃত হইলে ভোজন করা অবৈধ।

(৯) জীবহত্যা কালে যে রক্ত ক্ষত স্থান হইতে বহির্গত হয়, তাহা ভোজন করা অবৈধ।

(১০) মাদক দ্রব্য মাত্রই সেবন করা অবৈধ।

(১১) ভগবানের নাম উচ্চারণ না করিয়া বা অন্যের নাম উচ্চারণ করিয়া কোন জীব বধ করিলে তাহা ভোজন করা অবৈধ।

(১২) স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা

অবৈধ। অঙ্গুরীর পরিমাণ রৌপ্য ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত কোনরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে অবৈধ। রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে অবৈধ। রেশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পুত্র সন্তানদিগকে পরিধান করানও অবৈধ।

(১৩) সকাম দৃষ্টিতে পরস্ত্রী দর্শন বা স্পর্শন অবৈধ। পরস্ত্রী স্পর্শন সকাম না হইলেও অবৈধ।

(১৪) পুরুষগণের নাভিস্থল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত দর্শন ও স্পর্শন অবৈধ।

(১৫) যাহাদের সহিত বিবাহ হওয়া শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, তাহাদের উদর, পৃষ্ঠদেশ বা জানু দর্শন অবৈধ।

(১৬) অন্য কাহাকেও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান করা বা তাঁহার ন্যায় ভক্তি করা অবৈধ। কোন বাসনা পূরণের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা বা কোন সঙ্কটের সময় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে আহ্বান করা অর্থাৎ ভক্তি, পূজা প্রভৃতি প্রদর্শনকালে অন্য কাহাকেও ঈশ্বরের তুল্য সম্মান করা অবৈধ।

১৭। বিনা দোষে কাহাকেও বধ করা, উপপত্নী গ্রহণ করা, এবং সতীর সতীত্বে অন্যায় পূর্ব্বক দোষারোপ করা অবৈধ।

(১৮) ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মী সৈন্য দ্বিগুণের কম থাকিলে পলায়ন অবৈধ।

(১৯) ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র প্রয়োগ করা বা করান অবৈধ। পিতৃহীন বালক বালিকার সম্পত্তি অন্যায় পূর্ব্বক ভোগ করা এবং পিতা মাতাকে দুঃখ দেওয়া অবৈধ।

(২০) মক্কার অধিকার মধ্যে যে সকল কার্য্য করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তথায় সেই সকলের অনুষ্ঠান অবৈধ।

(২১) কুসীদগ্রহণ, পরদ্রব্যাপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও সাক্ষ্যদানকালে সত্য বিষয় গোপন অবৈধ।

(২২) শাস্ত্রাদেশ ব্যতীত ব্রতোপবাস ভঙ্গ করা ঈশ্বরের উপাসনা না করা, বা অসময়ে করা অবৈধ।

২৩। সঞ্চিত ধন অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি সঞ্চিত সম্পত্তি থাকিলে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্র ও ফকিরদিগকে না দেওয়া, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মক্কা তীর্থে গমন না করা, আত্মীয় কুটুম্বদিগের সহিত আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ভঙ্গ করা, ক্রয় বিক্রয়কালে দ্রব্যের ওজন কমবেশী করা, অনর্থক কাহারও সহিত কলহ করা, ভগবান ও ভগবৎ প্রেরিত মহাত্মা মহম্মদ, তাঁহার স্ত্রী, বংশধরগণ ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভৎর্সনা করা, হেয়জ্ঞান করা, মন্দ ভাবা বা অভিশাপ দেওয়া একান্ত অবৈধ।

২৪। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সদুপদেশ না দেওয়া, অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে না বলা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতিজ্ঞাপালন না করা, কোরাণ মুখস্থ করিয়া ভুলিয়া যাওয়া, জীবিত জন্তুকে অগ্নিতে দগ্ধ করা, স্ত্রী হইয়া স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, স্বামী হইয়া পত্নীর প্রতি অত্যাচার করা, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া দেওয়া, ধর্ম্মোপদেশ অবজ্ঞা করা, ঈশ্বরের দয়া লাভে নিরাশ হওয়া, তাঁহার দণ্ড হইতে ভীত না হওয়া, পণ রাখিয়া খেলা করা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে কোনও জন্তু বলিদান করা, ভগবান ভিন্ন অপরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কোনও

অন্ত তাহার পুত্রার্থ উৎসর্গ করা, গর্ব্বিত হওয়া, মনে মনে আত্ম গৌরব করা, ছলনা প্রতারণা বা বঞ্চনা করা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, অসূয়া, দ্বেষ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, রোজা নামাজ প্রভৃতি দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য ও শাস্ত্রীয় বিধিকে অবজ্ঞা করা বা বিধিসঙ্গত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হওয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করা, খাদ্য বস্তুকে অখাদ্য ও অখাদ্য বস্তুকে খাদ্য জ্ঞান করা, ধর্ম্মকার্য্যে দোষারোপ বা বিঘ্ন উৎপাদন করা, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য অন্যের নিকট গোপন করা, ন্যস্ত ধন অস্বীকার করা, যাহাদিগকে বিবাহ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করা, ধর্ম্মমন্দির ভঙ্গ করা বা অপবিত্র করা, অশুচি হইয়া নামাজ পড়া, গোপনে কাহাকেও অন্যের দোষ জ্ঞাপন করা, বিধর্ম্মী, পাপী বা অসদাচারীদিগকে ভয়ের বিশেষ কারণ ব্যতীত মান্যকরা, শাস্ত্র জ্ঞান ব্যতীত ব্যবস্থা দেওয়া, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতীত চিকিৎসা করা, সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ না করিয়াই নিজের জ্ঞান হইতে কোরাণের অর্থ করা, সৈয়দ বংশীয়দিগকে ঘৃণা করা, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে নিন্দা করা, মুসলমান হইয়া মুসলমান জাতিকে মনে মনে মন্দ ভাবা, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা, যে স্থানে কোরাণ পাঠ হইতেছে, তথায় অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা, বিনা কারণে কাহারও নিন্দা করা বা নিন্দা শ্রবণ করা, জ্যোতির্ব্বিৎগণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করা, অপ্রত্যক্ষ বিষয় ভগবান ব্যতীত অন্যে জানে বলিয়া বিশ্বাস করা, ভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষগণ, স্বর্গীয় দূতগণ, ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক সকল, স্বর্গ ও নরক পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড, পোল সিরাত অর্থাৎ স্বর্গসেতু, সমাধিতে দণ্ড লাভ এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ পরকাল সম্বন্ধে অন্যান্য যত সংবাদ দিয়াছেন, ঐ সকলের মধ্যে কোনও একটী অস্বীকার করা, পেগম্বরের আদেশ ও মুসলমান ধর্ম্মের শাস্ত্রকারগণ একমত হইয়া যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহার অন্যথাচরণ করা, শ্মশ্রু মুণ্ডন, গোঁফগুলিকে দীর্ঘকরণ, কোন রূপ বাদ্যবাদন, ইচ্ছাপূর্ব্বক গীত বাদ্য শ্রবণ, নৃত্য দর্শন, গায়ক বাদককে কোন বস্তু দান বা তাহার প্রশংসাকরণ, সতরঞ্চি খেলা, তাসখেলা, ভোজবাজি বা আতসবাজি দেখান, অখাদ্যদ্রব্যের ভোজনকালে ভগবানের নাম গ্রহণ, মিথ্যাকথায় ঈশ্বরকে সাক্ষীকরা, বিধর্ম্মিগণের শাস্ত্রের সমর্থন করা, তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করা, তাহাদের দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করা, পীর, পেগম্বর প্রভৃতির নামে শিখণ্ড অর্থাৎ টিকা রাখা বা কোন জন্ত উৎসর্গ করিবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা করা, বিধর্ম্মীদিগের শীতলা বা অন্য দেবদেবীর পূজা করা, দাসদাসীদিগকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞার সহিত কাহাকেও আহ্বান করা, সতত কাহারও মন্দ চিন্তায় বা নিজের শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকা, ক্ষমতা থাকা সত্বেও পিতামাতার সেবা না করা, ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তিতে কৃপণতা করা অবৈধ।

হিন্দু শাস্ত্রে।

১। জীবিকার্থ পরপীড়ন করিবে না।

২। গীত বাদিত্রাদি ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে না।

৩। রূপ রসাদি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হইবে না।

৪। বেদাধ্যয়নের বিরোধী কোন কার্য্যই করিবে না।

৫। বিভব সত্ত্বে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না।

৬। উদয় কালে, মধ্যদিনে, অস্ত সময়ে ও গ্রহণের সময়, এবং বারিস্থ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

৭। বৎসরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না।

৮। বৃষ্টি কালে দৌড়িবে না।

৯। জলে নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দেখিবে না।

১০। রজোদর্শন কালে নারীতে উপগত হইবে না। তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

১১। পত্নীর সহিত একত্র ভোজন করিবে না।

হাঁচি, জৃম্ভণ, ভোজন ও সুখোপবেশন কালে তাহাকে দেখিবে না।

১২। নেত্রে অঞ্জন দান, তৈল মর্দ্দন, ও প্রসব কালে এবং অনাবরণ অবস্থায় পত্নীকে দর্শন করিবে না।

১৩। এক বস্ত্রে ভোজন করিবে না।

১৪। উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না।

১৫। পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, কর্ষিত ক্ষেত্রে, জল, চিতা, পর্ব্বত, জীর্ণ দেবমন্দির, বল্মীক, সত্ত্বাশ্রিত গর্ত্ত ও নদীতরে অথবা গমন করিতে করিতে মূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৬। বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল ও গরু সম্মুখে থকিলে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

১৭। অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিবে না, পা তাতাইবে না এবং ফুঁ দিয়া উহা জালিবে না।

১৮। নগ্ন অবস্থায় স্ত্রী দর্শন করিবে না।

১৯। খট্টা প্রভৃতির নীচে অগ্নি রাখিবে না, উহা উল্লঙ্ঘন করিবে না ও পাদ দেশে অগ্নি স্থাপন করিবে না।

২০। প্রাণ পীড়াদায়ক কার্য্য করিবে না।

২১। সন্ধ্যাকালে ভোজন, গ্রামান্তর গমন করিবে না ও নিদ্রা যাইবে না।

২২। ভূমিতে রেখাদি অঙ্কিত করিবে না।

২৩। পুষ্পমালা নিজে উন্মোচন করিবে না।

২৪। জলে বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রক্ত, বিষ অমেধ্যলিপ্ত বস্ত্র বা ভুক্তোচ্ছিষ্ট প্রভৃতি প্রক্ষেপ করিবে না।

২৫। শূন্য ঘরে একাকী শয়ন করিবে না। নিদ্রিতকে জাগরিত করিবে না। রজস্বলার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

২৬। গরু জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিলে নিবারণ করিবে না বা কাহাকেও বলিয়া দিবে না। আকাশে রামধনু দেখিয়া দেখাইবে না।

২৭। অধার্ম্মিকবহুল ও ব্যাধিবহুল গ্রামে বাস করিবে না, একাকী পথে যাইবে না, পর্ব্বতে বহুকাল বাস করিবে না।

২৮। শূদ্র রাজ্যে, চণ্ডালাদি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও পাষণ্ডগণাক্রান্ত স্থানে বাস করিবে না।

২৯। মাখম তোলা দুগ্ধ ইত্যাদি খাইবে না। অতি তৃপ্তি করিবে না, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত কালে ভোজন করিবে না।

৩০। বৃথা চেষ্টা করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা বারিপান করিবে না, ভক্ষ্য দ্রব্য উৎসঙ্গে করিয়া খাইবে না।

৩১। বাহু স্ফোট করিবে না, দন্তশব্দ করিবে না। রাসভাদি শব্দ করিবে না।

৩২। কাংসপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে না। ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিবে না, ভাবদুষ্ট কোন বস্তুই খাইবে না।

৩৩। দুর্দ্দান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, রুগ্ন ও ভগ্ন শৃঙ্গাদি অশ্ব হস্তী ইত্যাদি বাহনে আরোহণ করিবে না।

৩৪। বালাতপ ও প্রেতধূম লাগাইবে না, ভগ্ন আসনে বসিবে না, নখ ও লোম ছেদন করিবে না, দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিবে না।

৩৫। অকারণ মৃত্তিকা ও লোষ্ট্র মর্দ্দিত করিবে না, নখ দ্বারা তৃণ ছেদন করিবে না নিষ্ফল ও পরিণাম বিরস কার্য্য করিবে না।

৩৬। গো পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে না। অদ্বার দিয়া গ্রাম বা প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করিবে না।

৩৭। রাত্রি কালে বৃক্ষমূলে বাস করিবে না।

৩৮। কদাচ অক্ষক্রীড়া করিবে না, পাদুকা হস্তাদি দ্বারা লইয়া যাইবে না, আসনে ভোজন-পাত্র রাখিয়া, শয্যায় শুইয়া বা হস্তে প্রভৃত অন্ন লইয়া ভোজন করিবে না।

৩৯। সূর্য্য অস্তগত হইলে তিলের কোন বস্তু খাইবে না, নগ্ন অবস্থায় শয়ন করিবে না, উচ্ছিষ্ট লইয়া কোন স্থানে গমন করিবে না।

৪০। শুষ্ক পাদে ভোজন করিবে না, আর্দ্র পাদে শয়ন করিবে না, কখন দুর্গম স্থানে গমন করিবে না, মল মূত্র দেখিবে না, সন্তরণ দিয়া নদী পার হইবে না, কেশ, ভস্ম অস্থি, খাপরা ইত্যাদি পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না।

৪১। পতিত, চণ্ডাল, মূর্খ, গর্ব্বিত প্রভৃতি লোকের সহিত বাস করিবে না।

ক্ষত্রিয় ভিন্ন রাজার কাছে প্রতিগ্রহ করিবে না।

৪২। অস্পষ্ট অধ্যয়ন করিবে না, শূদ্র নিকটে অধ্যয়ন করিবে না, রাত্রি শেষে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় পরিশ্রান্ত হইয়া শয়ন করিবে না।

৪৩। রাত্রিকালে অতি শব্দের সহিত বায়ু বহিলে, দিবসে ধূলি উত্থাপক বায়ু উঠিলে, বিদ্যুৎ গর্জ্জন ও বৃষ্টি একত্র উপস্থিত হইলে এবং উল্কাপাতে অধ্যয়ন করিবে না।

৪৪। শত্রুমিত্র, অধার্ম্মিক, চৌর ও পরদার সেবা করিবে না।

৪৫। ক্ষত্রিয়, সর্প ও ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করিবে না।

৪৬। আত্মাবজ্ঞা করিবে না।

৪৭। প্রত্যূষে বা প্রদোষে ও দিবা দ্বিতীয় প্রহরে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির সহিত ও শূদ্রের সহিত গমন করিবে না।

৪৮। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ, বৃদ্ধ, কুরূপ, অর্থহীন, ও হীন জাতি ব্যক্তিকে নিন্দা করিবেনা।

৪৯। উচ্ছিষ্ট ও অশুচি অবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিবে না। সুস্থ অবস্থায় অশুচি হইয়া সূর্য্যাদি গ্রহ দেখিবে না।

৫০। অকারণে নিজ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র ও গোপনীয় রোম স্পর্শ করিবেনা।

৫১। যে যে কর্ম্ম পরবশ, তাহা ত্যাগ করিবে এবং যাহাতে অন্তরাত্মার সন্তোষ হয় না, তাহা করিবে না।

৫২। আচার্য্য, বেদ ব্যাখ্যাতা, পিতা, মাতা, অপর গুরুজন, গো, ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী, ইহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিবে না।

৫৩। নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, মান, ক্রোধ ও তীক্ষ্ণতা ত্যাগ করিবে।

৫৪। পরগাত্রে হননের জন্য দণ্ড উৎক্ষেপ করিবে না বা নিপাত করিবে না। ব্রাহ্মণ গাত্রে দণ্ড নিপাতাদি কদাচ করিবে না।

৫৫। দৈন্য দশায় ও অধর্ম্মে মতি করিবে না, ধর্ম্ম বর্জ্জিত অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে।

৫৬। বাক্‌পাণিপাদ নেত্রের চপলতা ত্যাগ করিবে, পরের অনিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

৫৭। পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, কন্যা ও দাস বর্গের সহিত বিবাদ করিবে না।

৫৮। প্রতিগ্রহ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবে, সুবর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গো, বস্ত্র, অন্ন, তিল ও ঘৃত গ্রহণ করিবে না।

৫৯। বিড়াল তপস্বী ও বক ধার্ম্মিককে জল ও প্রদান করিবে না।

৬০। ধর্ম্মের অপদেশে পাপ করিয়া ব্রত আচরণ করিবে না, পরকীয় জলাশয়ে কদাপি স্নান করিবে না, পরকীয় যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান ও গৃহ না দিলে ব্যবহার করিবে না।

৬১। অশ্রোত্রিয়ের যজ্ঞে, গ্রামযাজক, স্ত্রী বা ক্লীব যে যজ্ঞে আহুতি দেয়, তথায় ব্রাহ্মণ কদাচ ভোজন করিবে না।

৬২। মত্ত, ক্রুদ্ধ, আতুরের অন্ন, কেশ কীটে দুষ্ট ও পাদস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না; রজস্বলা স্পৃষ্ট, ভ্রূণঘাতিদৃষ্ট, পক্ষি-স্বাদিত, গোঘ্রাত অন্ন ও গণিকার ভোজন করিবে না। শুক্ত, পর্য্যষিত ও শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন ত্যাগ করিবে।

৬৩। পলাণ্ডু, লশুন, গৃঞ্জন (গাঁজর), ছত্রাক (বেঙের ছাতি), ও অমেধ্য প্রভব বস্তু ভক্ষণ করিবে না।

৬৪। লোহিত বৃক্ষ নির্য্যাস (খদিরাদি), খেজুর রস, চালিতা, নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধের ডেলা ক্ষীর, তিল সিদ্ধ অন্ন, সংযাব ঘৃত (ক্ষীর,গুড় ও গোধূম চূর্ণসিদ্ধ) অনর্চ্চিত মাংস, অনিবেদিত হবিঃ ও নৈবেদ্য, অনির্দ্দশা গাভীর দুগ্ধ, ভেড়ার দুধ, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ঋতুমতী ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ মহিষী ভিন্ন সমস্ত বন্য পশুর দুগ্ধ ভক্ষণ করিবে না।

৬৫। মাংসাশী পক্ষী, গ্রাম্যপক্ষী পারাবতাদি ও টিট্টিভ শাবক ভক্ষণ করিবে না।

৬৬। চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, দাত্যূহ, শুক, সারিকা, রজ্জুবাল, দার্ব্বাঘাট প্রভৃতি প্রতুর্দ জাতি, শফরি প্রভৃতি জালপাদ জাতি, কোযষ্টিক, নখ বিষ্কির জাতি, মগু প্রভৃতি মৎস্যাশী, শুষ্ক মাংস, বক, বলাকা, দ্রোণ কাক, খঞ্জন, নক্র প্রভৃতি জলজন্তু, বিড্‌বরাহ ও মৎস্য ত্যাগ করিবে।

৬৭। যাহারা একাকী চরে, তাহাদিগকে, অজ্ঞাত মৃগ পক্ষীদিগকে ও শশকাদি ব্যতীত পঞ্চ নখ ভক্ষণ করিবে না।

৬৮। ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবে না।

৬৯। মদ্যপান, কুসংসর্গ, ভর্ত্তৃবিচ্ছেদ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল নিদ্রা, ও অন্যগৃহে বাস, এই ছয়টী চরিত্র দূষক স্ত্রীলোক ত্যাগ করিবে।

৭০। স্ত্রী দেহ, মন, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা পতির ব্যভিচার করিবে না।

৭১। পতি প্রবাসে গেলে, হাস্য, পরগৃহে গমন, উৎসব দর্শন, কেশ সংস্কার ইত্যাদি করিবে না।

ইসাই শাস্ত্রে।

১। চর্ব্বি বা রক্ত খাইবে না।

২। সাক্ষ্য দিবার সময় কিছু গোপন করিবে না।

৩। শপথ করিবে না।

৪। যে সকল পশুর ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত নহে বা যাহারা রোমন্থন করে না এমন, পশুর মাংস খাইবে না। যথা শশক, শূকর।

৫। সে সকল জলজন্তুর আঁইস বা ডানা নাই, তাহা খাইবে না।

৬। পক্ষিসকলের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি খাইবে না,—চিল, দাঁড় কাক, পেঁচক, শকুনি, কোকিল, রাজহংস, বক, বাদুড়।

৭। পূর্ব্বোক্ত জন্তুগুলির মৃত দেহ স্পর্শ করিবে না।

৮। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে নকুল, ইন্দুর, কচ্ছপ, বহুরূপী টিকটিকি, শামুক, ছুঁচা হেয়।

৯। যে সকল জন্তু গুঁড়ি মারিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পেটে হাটে বা চারি পায়ে বা আরও বেশী পায়ে চলে, সে সকল জন্তু খাইবে না।

১০। যে কেহ তোমার নিকট সম্পর্কীয়, তাহাতে অভিগমন করিবে না। যথা পিতা, মাতা, পিতার স্ত্রী, ভগিনী, পিতার কন্যা, ভ্রাতার কন্যা, পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, পিতার স্ত্রীর কন্যা, মাতার ভগিনী, পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য পত্নী, পুত্রবধূ; ভ্রাতৃ জায়া।

১১। কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া তাহার কন্যা বা পৌত্রী বা দৌহিত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১২। পত্নীকে কষ্ট দিবার জন্য তাহার ভগিনীর কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে উলঙ্গ করিবে না।

১৩। অপবিত্রাবস্থায় কোন স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না।

১৪। প্রতিবেশীর স্ত্রীতে অভিগমন করিবে না। ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করিবে না।

১৫। কোন পশুতে অভিগমন করিবে না।

১৬। পুতুল পূজা করিবেনা। বা ধাতু দ্রব্য দ্বারা দেবতা নির্ম্মিত করিবে না।

১৭। চুরি করিবে না। মিথ্যা কথা কহিবে না। ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিবে না। প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিবে না। বল পূর্ব্বক প্রতিবেশীর কোন দ্রব্য লইবে না বা অপহরণ করিবে না।

মজুরের পারিশ্রমিক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি আটকাইয়া রাখিবে না।

কালাকে অভিশাপ দিবে না। অন্ধের পথে প্রতিবন্ধক রাখিবে না। অন্যায় বিচার করিবে না।

১৮। ভ্রাতাকে ঘৃণা করিবে না। প্রতিবেশীকে ভর্ৎসনা করিবে না। তাহাকে পাপ করিতে দিবে না। প্রতিশোধ লইবে না। তোমার স্বজাতির সন্তানগণের বিরুদ্ধে মনে মনে আক্রোশ রাখিবে না।

নানা প্রকার বীজ মিশ্রিত করিয়া বপন করিবে না, পশম ও সূতা মিশ্রিত বস্ত্রে পোষাক প্রস্তুত করিবে না।

১৯। যে স্ত্রীলোক ক্রীতদাসী এবং

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই বা যে বাগ্দত্তা হইয়াছে, তাহাতে অভিগমন করিবে না।

২০। কোন বৃক্ষ পুতিয়া চারি বৎসর তাহার ফল খাইবে না।

২১। রক্ত মিশ্রিত করিয়া কিছু খাইবে না।

২২। যাদু করিবে না।

২৩। মস্তকের কেশগুলি গোল করিবে না। দাড়ির ধার গুলি কাটিবে না। নিজের গাত্রের উপর কিছু দাগ করিবে না।

২৪। নিজের কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইবে না। যাদুকর বা ডাইনদিগের নিকট যাইবে না।

২৫। তোমার দেশে কোন বিদেশী লোক আসিলে তাহাকে বিরক্ত করিবে না।

২৬। মাথা একেবারে কেশহীন করিবেনা। দাড়ির কোণ একেবারে কামাইয়া ফেলিবে না।

২৭। বেশ্যা, ধর্ম্মহীনা বা পতিপরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে না।

২৮। যাহা কিছু আঁচড়ান, ভগ্ন, কর্ত্তিত, তাহা ঈশ্বরকে দিবে না।

২৯। গাভী হউক বা মেষ হউক, মাতা ও শিশুকে একদিনে হনন করিবে না।

৩০। ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ না করিয়া রুটী বা শুষ্ক শস্য বা কাঁচা শীষ কিছুই খাইবে না।

৩১। ৭ম মাসের ১ম দিনে কোন কার্য্য করিবে না। আর ঐ মাসের ১০দিন পর্য্যন্ত কোন হীন কর্ম্ম করিবে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

গণেশ বন্দনা।

(প্লেগ উপলক্ষে)।

তুমি কিছু মন্দ নহ গণেশ ঠাকুর,
সিন্দুরে রঞ্জিত পেট, মুখে শোভে শুঁড়।
তোমার বাহন বেটা দুষ্ট সে ইঁদুর বেটা;
খায় দায় মাটি করে বড়ই প্রচুর;
কাটে পুঁথি, কাটে বস্ত্র,—দন্ত যেন ক্ষুর।

কাটে কোটে, খায় দায়, তাহে ক্ষতি নাই;
কিন্তু দেব লম্বোদর! এ কিবা বালাই—
দাঁতে দাঁতে প্লেগ পুরে' চারি দিকে ঘুরে ঘুরে
বিনাশিল কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই
ওহে বিঘ্নবিনাশন! তোমারি সেপাই।

ওহে দেব গণপতি এ বড় শরম;
তুমি হ'লে সিদ্ধিদাতা, খাইল সিদ্ধির মাথা
এ বেটা বিশ্বাসহন্তা রোডাণ্ট-অধম।

তোমার বাপের ঝুলি ভরা সিদ্ধি আছে;
তুমিও শিখেছ বিদ্যা ঢের তাঁর কাছে।
কিছু যদি শুঁড় ঝেড়ে শুঁড় গুলো দেও ওরে,
অম্লশোধ খাবে সিদ্ধি; রাজ্য তাহে বাঁচে:
ছেলে বুড়া মেয়ে যত আনন্দেতে নাচে।

পুরাণেতে শুনি কথা গজেন্দ্রবদন।
দন্তাঘাতে করেছিলে অসুর নিধন।
একবার কৃপা কর, শ্রীদন্তে ইঁদুর মার;
ঘোড়া দিব, হাতী দিব, যাহে ওঠে মন;
পাইবে ডীসেণ্ট অতি নূতন বাহন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইহসর্ব্বস্ববাদ।

বিলাতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগকে (Secularist) অর্থাৎ ইহসর্ব্বস্ববাদী বলে। তাঁহাদের মত এই যে, যাহাতে ইহসংসারের উন্নতি হয়, এইরূপ কার্য্যেই মনুষ্যের ব্যস্ত থাকা উচিত। অলৌকিক, অপার্থিব বিষয়ে মন দেওয়াতে কেবল সময় নষ্ট। পরমেশ্বরের ভজন সাধন, পারলৌকিক চিন্তা প্রভৃতির কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, যাহাতে ইহজীবন, ইহসংসারের উন্নতি হয়, এমন চেষ্টা কর। অনিশ্চিত, অপার্থিব বিষয় ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে নিশ্চিত ঐহিক বিষয়ের উন্নতি হয়, পৃথিবীর কল্যাণ হয়, এমন বিষয়ে যত্নশীল হও।

এই দলের মধ্যে দুইজন প্রধান ব্যক্তির নাম জানি; ব্রডল ও হোলিওক। এদেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে ইঁহাদের মতের লোক অনেক দেখিয়াছি। তাঁহারা মনে করেন, উপাসনা, ধ্যান ধারণা, পারলৌকিক বিষয়ের আলোচনা করার কোন ফল নাই। যাহাতে পার্থিব উন্নতি হয়, এমন বিষয়ে মনোযোগী হওয়াই ভাল।

ইহসর্ব্বস্ববাদীদিগের মত নিতান্ত অযুক্ত ও অসার। অনেকে মনে করেন যে, লোকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মন দেওয়াতে তাহারা অনর্থক সাংসারিক সুখভোগে বঞ্চিত হইতেছে। এ কথা কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসার কথা। আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগী হইলে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হওয়া দূরে থাকুক, সংসারী অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত, সাংসারিক সুখ উৎকৃষ্টতররূপে ও অধিকতর পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি ঘোর সংসারী, সে অবশ্য ইন্দ্রিয়জনিত সুখ ভোগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু কি ইন্দ্রিয়জনিত সুখভোগ করিতে পারেন না? চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় হইতে সংসারী যে প্রকার সুখ ভোগ করে, ভগবদ্ভক্ত তদপেক্ষা শতগুণে অধিক সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ হইতে সকলেই সুখ ভোগ করে, কিন্তু যিনি সাধু, যিনি ঈশ্বরপ্রেমানুরক্ত, তিনি রূপের মধ্যে সেই অরূপ ব্রহ্মের নিরুপম রূপ দর্শন করেন, রসের মধ্যে তাঁহারই প্রেমরস আস্বাদ করেন, গন্ধের মধ্যে তাঁহারই পবিত্রতার সৌরভ লাভ করেন, স্পর্শের মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ সুখ প্রাপ্ত হন, শব্দের মধ্যে তাঁহারই স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন।

পারিবারিক সম্বন্ধ জনিত সুখ কে না ভোগ করিয়া থাকে? কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ঐ প্রকার সুখ শতগুণ অধিক পরিমাণে ভোগ করেন। তিনি সকল সম্বন্ধের মধ্যে সেই মূলাধার পুরুষকে দর্শন করেন। পিতার মধ্যে সেই পরম পিতা, মাতার মধ্যে সেই পরম মাতা, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম প্রেমময়, বন্ধুর মধ্যে সেই পরম বন্ধু, সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়দিগের মধ্যে সেই পরমাত্মীয়কে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না।

ইহসর্ব্বস্ববাদীগণ বলেন যে, অলৌ-

কিক, অপার্থিব বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করিয়া কি ফল? বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর। বিজ্ঞান চর্চ্চায় প্রত্যক্ষ সত্য লাভ হয়। বিজ্ঞান দ্বারা সংসারের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে, ও হইবে।

ধর্ম্মবিশ্বাসীর নিকট কি বিজ্ঞান আদরনীয় নহে? সংসারীর অপেক্ষা ধর্ম্মবিশ্বাসীর নিকট, ভগবদ্ভক্তের নিকট, বিজ্ঞান অধিকতর আদরনীয় ও পবিত্র। তাঁহার নিকট সকল বিজ্ঞান, তাঁহার উপাস্য দেবতার মহিমা, গৌরব ও পবিত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। সেই জন্য সকল বিজ্ঞান তাঁহার নিকট পরম আদরের বিষয়। বিজ্ঞান আলোচনায় ভগবদ্ভক্ত যে আনন্দ লাভ করেন, ইহসর্ব্বস্ববাদীর পক্ষে তাহা স্বপ্নের অতীত।

"গগনমণ্ডল পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে!" এই মহা বাক্যের তাৎপর্য্য, ইহসর্ব্বস্ববাদী বুঝেন না। এক জন ইহসর্ব্বস্ববাদী বলিয়াছেন, আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ সকল, নিউটন, ল্যাপ্লাস প্রভৃতির গৌরবই কীর্ত্তন করিতেছে। কালিদাসের গ্রন্থে, কালিদাসের গৌরব না দেখিয়া, যে ব্যক্তি টীকাকার মল্লিনাথের গৌরবের কথাই বলে, তাহার কথা যেমন, ইহসর্ব্বস্ববাদীর কথাও সেইরূপ।

আর বিশ্বরূপ মহাগ্রন্থের উপযুক্ত টীকাকারই বা কোথায়? ছি! ছি! যে জগৎ দেখিয়া, জগৎকর্ত্তার মহিমার কথা বলিল না, কীটস্য কীটের মহিমা ঘোষণা করিল, তাহার কি দুর্ভাগ্য! তাহাকে ধিক্!

বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কতদূর কল্যাণ ও উন্নতি হইতেছে, ইহসর্ব্বস্ববাদী তাহা প্রদর্শন করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বৃথা আলোচনা করিয়া কি হইবে? বিজ্ঞান চর্চ্চা কর। বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিজের ও জগতের প্রকৃত কল্যাণ।

বিজ্ঞান চর্চ্চায় যে নিজের ও জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহসর্ব্বস্ববাদী ইহা যেমন স্বীকার করেন, ঈশ্বরবাদীও সেইরূপ।

বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হইতেছে বলিয়াই যে, ভগবদ্ভক্ত সাধু বিজ্ঞানকে ভালবাসেন, এমন নহে। উহাই একমাত্র কারণ নহে। পরমেশ্বরের শক্তি, জ্ঞান ও মহিমা, বিজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে বলিয়া তিনি বিজ্ঞানকে আরও ভালবাসেন। কেবল সাংসারিক উন্নতির জন্য নহে।

বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিশেষ সহায়। যাঁহারা বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝেন না, তাঁহারাই মনে করেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। তাঁহারা বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন না। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"So far from science being irreligious, as many think, it is the neglect of science that is irreligious—it is the refusal to study the surrounding creation that is irreligious. Take a humble simile. Suppose a writer was daily saluted with praises couched in superlative language. Suppose the wisdom, the grandeur, the beauty of his works, were the constant topics of the eulogies addressed to him. Suppose those who unceasingly uttered these eulogies on his works were content with looking at the outsides of them; and had never opened them, much less tried to understand them. What value should we put upon their praises? What should we think of their

sincerity? Yet comparing small things to great, such is the conduct of mankind in general, in reference to the Universe and its Cause. Nay, it is worse.' Not only do they pass by without study, these things which they daily proclaim to be so wonderful; but very frequently they condemn as mere triflers those who give time to the observation of nature - they actually scorn those who shew any active interest in these marvels. We repeat, then, that, not science, but the neglect of science, is irreligious, devotion to science, is a tacit worship—a tacit recognition of worth in the things studied; and by implication in their Cause. It is not a mere lip-homage, but a homage expressed in actions,—not a mere professed respect, but a respect proved by the sacrifice of time, thought and labour."

Education. Intellecual, moral and physical. By Herbert Spencer, P. 50—53.

ইহসর্ব্বস্ববাদী বলেন যে, জনসমাজের মঙ্গলের জন্য নীতি একান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি? নীতি হইলেই হইল। কেবল মাত্র নীতিকে রক্ষা কর, ধর্ম্মে কাজ নাই। উপাসনা, ধ্যান ইত্যাদিতে কেবল সময় নষ্ট। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মকে ছাড়িলে পবিত্র জীবন যাপন করিবার পক্ষে, সৎ কার্য্য সাধন করিবার পক্ষে এমন প্রবল অভিসন্ধি (Motiue power) কোথায় পাইবে? পরমেশ্বরে বিশ্বাস, নীতিকে শতগুণ বলীয়ান্ করিয়া দেয়। যিনি জগদীশ্বর, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, তাঁহার আদেশ বলিয়া বিশ্বাস হইলে মনুষ্য যেমন দৃঢ়তা ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করে, সেরূপ কি অন্য কোন কারণে সম্ভব হইতে পারে?

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেও সাধারণ মতের দ্বারা মনুষ্যের নৈতিক জীবন সুরক্ষিত হইতে পারে। সাধারণ মত (Public opinion) এ বিষয়ে যথেষ্ট। নৈতিক জীবন রক্ষার পক্ষে ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই।

ইহার ন্যায় অযুক্ত কথা আর কিছুই নাই। মানুষ, মানুষকে ভয় করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য। লজ্জা ও ভয়ে মানুষ অনেক দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মানুষ যখন মানুষের ভয়ে অনেক দুষ্কার্য্য করিতে সাহস করে না, একটি ক্ষুদ্র শিশু সম্মুখে থাকিলে লোকে অনেক পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেনা, তখন যাঁহার নিকট মনুষ্য "কীটস্য কীট"ও নয়, তিনি নিকটে আছেন জানিলে, তিনি দেখিতেছেন, বিশ্বাস থাকিলে, কি কেহ কখন দুষ্কার্য্য করিতে পারে? পরমেশ্বরের সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে পাপ নিশ্চয়ই অসম্ভব হইয়া যায়। নরচক্ষুর অগোচরে, গোপনে, লোকে অনেক দুষ্কার্য্য করিতে পারে ও করে। কিন্তু, যদি বিশ্বাস থাকে যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের চক্ষু যেমন আলোকে, সেই রূপ অন্ধকারে সমভাবে জ্বলিতেছে, তাহা হইলে কি কখন পাপ সম্ভব হইতে পারে?

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে ঈশ্বরবিশ্বাসী পাপ করেন কেন? এ কথার উত্তর এই যে, যে পরিমাণে বিশ্বাস, সেই পরিমাণে নিশ্চয়ই পাপ অসম্ভব হইবে। যদি মানুষ পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইতে পারে। পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, অথচ পাপ করিতেছি, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? দিবা দ্বিপ্রহরে কি অমানিশার অন্ধকার সম্ভব?

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর থাকেন, থাকুন। কিন্তু তাঁহার ভজন সাধন, ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি? এক শ্রেণীর লোক আছেন, ঈশ্বরের থাকাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, কেবল তাঁহার উপাসনা,

তাঁহার তখন সাধনেই যত আপত্তি। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলেও নীতিই যথেষ্ট।

ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। যদি পিতা মাতাকে ভক্তি করা নীতি হয়, তাহা হইলে যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, জগতের পিতা, জগতের মাতা, পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, তাঁহাকে ভক্তি করা কি নীতি নহে? পিতা মাতার সঙ্গে যখন নৈতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন যিনি আসল পিতা, আসল মাতা, তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা কি সম্ভব?

বাস্তবিক কথা এই যে, এই স্থানেই নীতি ও ধর্ম্ম এক হইয়াছে। সন্তান হইয়া মাতা পিতাকে যে ভক্তি করে না, তাহাকে কি নীতিপরায়ণ বলিতে পারি? সেইরূপ আসল মাতা পিতা পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি ভক্তি করে না। তাহার জীবন কি নীতি-সঙ্গত? এস্থলে নীতি-শব্দ ব্যবহার হয় না, ধর্ম্ম শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্পষ্টই এখানে নীতি ও ধর্ম্ম একীভূত হইয়াছে। যাহা নীতি, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম, তাহাই নীতি, অথবা ইহা বলিলেই হয় যে, মনুষ্যের সম্বন্ধে যাহা নীতি, তাহাই ঈশ্বর সম্বন্ধে ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, লোকে ভগবানের নিয়ম পালন করুক, তাহা হইলেই হইল। কিন্তু কেবল নিয়ম পালন যথেষ্ট নহে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি পিতা মাতাকে ভক্তি করে না, তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেবল লৌকিক ভাবে তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করে; এরূপ ব্যক্তির জীবন কি নীতিশাস্ত্র সঙ্গত? নীতি-শাস্ত্রানুসারে এইরূপ বাহ্যনীতি কি প্রকৃত নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে? বাহ্য নীতি প্রকৃত নীতি নহে। লৌকিক নীতি প্রকৃত নীতি নহে। মাতা পিতাকে আন্তরিক ভক্তি না করিলে, তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত ভাবে কর্ত্তব্য সাধন করা হয় না। সেইরূপ, পরমেশ্বর আমাদের আসল মাতা পিতা, তাহাকে যদি ভক্তি না করি, তাঁহাকে যদি ভাল না বাসি, তাহা হইলে কি আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করা হয়? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন যে নীতি, উহা প্রকৃত নীতি নহে।

ইহাসর্ব্বস্ববাদী বলেন, সংসারের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই কর। ঈশ্বর চিন্তা ও পরকাল চিন্তা করিয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর থাকেন, থাকুন, সে বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সংসারের যাহাতে কল্যাণ হয়, এমন কার্য্যে ব্যস্ত হও।

জগতের ইতিবৃত্ত এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য দান করিতেছে? ইতিহাস কোটি কণ্ঠে বলিতেছে যে, ধর্ম্মের দ্বারা ইহসংসারের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। মার্টিন লুথর রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া ইয়োরোপে যে প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে যে কেবল ধর্ম্ম-সংস্কার হইল, এমন নহে, তাহার ফলস্বরূপ কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইল। অদ্য পর্য্যন্ত উহা প্রবাহিত হইতেছে ও চিরদিন হইবে। মার্কিন দেশে যে নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, যে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে, এবং দিন দিন যাহার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে, তাহার মূল কি? তাহার মূল ধর্ম্মপ্রাণ ইংলণ্ডীয় পিউরিট্যানগণ।

যাঁহারা প্রথম চার্লসের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পিউরিট্যানগণ আট্‌লাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া মার্কিন দেশে গিয়া বাস করিলেন। সেই জন্য তাঁহারা Pilgrim-fathers এই সুন্দর নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই ধর্ম্মোৎসাহ, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা আমেরিকার নূতন জাতি ও নূতন সভ্যতার মূল। আর একটি দৃষ্টান্ত। মহাত্মা জর্জ্জ ফক্‌স্ যে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে Friends বলেন। অন্য লোকে তাঁহাদিগকে কোয়েকার বলিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মোৎসাহ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আমেরিকার ভীষণ দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য এই সম্প্রদায়ের লোক যেরূপ চেষ্টা ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদের প্রতি কাহার না ভক্তির উদয় হয়? প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ব্রাইট সাহেব এই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ভারত বাসীগণ তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ।

Sisters of Charity নামক মহিলা দলের মহৎ কার্য্যের বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কোন্ মুখে বলিতে পারেন যে, ধর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন, তাহা দ্বারা কোন ফল হয় না। এই সকল মহিলাদিগের কার্য্য দেখিলে তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন গরিব, কাঙ্গাল, অনাথ, পীড়িতদিগের কল্যাণের জন্য স্বর্গ হইতে দেবী সকল পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন! তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন বৃক্ষে যে অমৃতফল প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখিলে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কে আর একটী কথা বলিতে পারে?

মহম্মদ ও আরব দেশের বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম দ্বারা জাতীয় উন্নতি কি প্রকার আশ্চর্য্যরূপে সংসাধিত হইতে পারে। মহম্মদ পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া আরব দেশে একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। দেশের লোক উচ্চতর ধর্ম্ম লাভ করিয়া ক্রমে সর্ব্ববিধ বিষয়ে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আরবগণ সভ্যতার বর্ত্মে অনেক অগ্রসর হইলেন। আরবগণের দ্বারা এক সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের আশ্চর্য্য উন্নতি সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল উন্নতির মূল, মহম্মদ-প্রচারিত উচ্চতর ধর্ম্ম।

বিদেশের কথায় অধিক প্রয়োজন কি? এদেশে, পঞ্জাবে, কি হইয়াছে দেখিলে আমাদের কথা নিঃসংশয় সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। বাবা নানক পঞ্চনদ প্রদেশে যে উচ্চতর ধর্ম্ম, যে একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন, তাহার ফলে ক্রমে একটী বীর জাতির সৃষ্টি হইল। শিখদিগের পরাক্রমে এক সময়ে দিল্লির সিংহাসন পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের মূল, ধর্ম্ম। ধর্ম্মই প্রথমে মানব হৃদয়ে নূতন উৎসাহ, নূতন উত্তেজনা, নূতন প্রভাব সঞ্চার করে, ক্রমে তাহা সমাজ, নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে বিস্তারিত হয়। জগতের ইতিবৃত্ত এ কথার যাথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিখ ও অন্য পঞ্জাবীর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই প্রভেদের মূল কারণ, গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম্ম।

অনেকে মনে করেন যে, রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই! রাজ-

নীতিজ্ঞ, রাজনৈতিক কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত কোন সংশ্রব রাখেন না। জগতে এমন অনেক রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্যে যথার্থই, ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। কিন্তু তাহাই বলিয়া কি রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই? যাঁহারা সেইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের নিতান্তই ভুল। ধর্ম্মের অসীম অধিকার। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, যাহা কিছু আছে, সকলেরই উপর ধর্ম্মের আধিপত্য। ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিহীন হইয়া কোন কার্য্যই সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। মানবসমাজের যে কোন ব্যাপার ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সমাজের অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিলাতের ইহসর্ব্বস্ববাদীগণ, সাধারণতঃ সকল বিষয়ে নীতির একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন। কিন্তু সংসারের পক্ষে, কেবল নীতি যথেষ্ট নহে। পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি একান্ত আবশ্যক।

আবার বলি, যাঁহারা মনে করেন যে, রাজনীতিজ্ঞগণ ধর্ম্মের ধার ধারেন না; তাঁহাদের বড় ভুল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইটালি দেশের ম্যাট্‌সিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বলিয়া গণ্য। তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি একজন একান্ত ভগবদ্ভক্ত লোক ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া জীবনের কোন কার্য্য করিতেন না। ইয়োরোপের প্রধানতম রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে গ্ল্যাডষ্টোন একজন। ইনি একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কথা বলি। তাহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা কেমন ছিল। গ্ল্যাডষ্টোন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইতেন। সেই জন্য তিনি যখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাকে মহারাণীর এত বড় সাম্রাজ্যের বিষয় চিন্তা করিতে হয়, অথচ আপনি শয্যায় শয়ন করিবামাত্র কেমন করিয়া নিদ্রা যান? গ্ল্যাডষ্টোন উত্তর করিলেন, "আমি শয়ন করিবার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক জলে আমার মনকে ধৌত করিয়া ফেলি, সেই জন্য সহজে নিদ্রা আসে। এ কথার সহজ অর্থ এই যে, তিনি রাত্রিকালে শয্যায় গমন করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা আপনার মনকে সাংসারিক চিন্তাবিরহিত, নির্ম্মল ও শান্ত করিতেন। সুতরাং সহজেই সুনিদ্রার সঞ্চার হইত। ম্যাট্‌সিনি ও গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি মহাত্মাগণ জগতের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলশক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে।

অনেকে মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ জনসমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণায় রত থাকিতেন। এ কথা অমূলক। মহর্ষিগণ জনসমাজের কল্যাণকর কার্য্যে কখনই উদাসীন থাকিতেন না। অন্ততঃ যে সকল মহর্ষির নাম শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের অধিকাংশের পক্ষে একথা খাটে না। পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজারা যখন বিপদে পড়ি-

ছেন, তখন কোন মহর্ষি আসিয়া সৎপরামর্শ দিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। মহর্ষিরা যে জনসমাজের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাহার আর একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যই আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবের প্রধান প্রমাণ। সেই প্রাচীন সাহিত্য ঋষি-প্রণীত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক সকল বিষয়েই ঋষিগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্র পর্য্যন্ত ঋষি প্রণীত। স্মৃতি শাস্ত্র সকল কি? ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, জনসমাজের উপযোগী ব্যবস্থা শাস্ত্র সকল অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, উহাই স্মৃতি শাস্ত্র। ঋষিগণ জনসমাজের কল্যাণ সাধনে উদাসীন হইয়া কেবল নির্জ্জনে ধ্যান ধারণায় সময়াতিপাত করিতেন, এ কথার অমূলকত্ব বিষয়ে এই সকল শাস্ত্র শতকণ্ঠে সাক্ষ্যদান করিতেছে। পরমেশ্বরের সাধন ভজনের সহিত জনহিত সাধনের যে বিশেষ সম্বন্ধ, ইহা পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্ততঃ এ কথা যে তাঁহাদের অধিকাংশের পক্ষে সত্য, তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় নাই।

মানব প্রকৃতির মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস যেমন গভীর ও স্থায়ী, এমন আর কিছুই নহে। মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মরূপ সমুদ্রে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্য সকল জলবিম্ববৎ * প্রকাশ হইতেছে ও অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল সমুদ্রের ন্যায় স্থায়ী ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্ম এ কথার প্রমাণ দিন। সমুদ্রের মধ্যে পর্ব্বত সকল যেরূপ সুদৃঢ় ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেইরূপ শত সহস্র প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে ঐ সকল ধর্ম্ম অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সাধারণ ভাবে সামাজিক জীবনে এ সকল কথা যেমন সত্য, ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য। ইহসর্ব্বস্ববাদী বলেন, ঐহিক বিষয় নিশ্চিত, পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় ও পারলৌকিক বিষয় অনিশ্চিত। যাহা নিশ্চিত বিষয়, তাহাতেই মনোযোগী হও। যাহা অনিশ্চিত, তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ফল কি? ঈশ্বর আছেন কি না, পরকাল আছে কি না, ইহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এরূপ অনিশ্চিত বিষয় লইয়া কেন সময় নষ্ট কর? ঐহিক সুখ নিশ্চিত, তাহারই জন্য কেন যত্নশীল হও না? যাহাতে ইহ জগতের কল্যাণ হয়, সেই বিষয়ের জন্য চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত কার্য্য। ঈশ্বর আছেন কি না? পরকাল আছে কি না, ইহসর্ব্বস্ববাদীদিগের নিকট অনিশ্চিত বটে, কিন্তু উহা জগতের অধিকাংশ লোকের নিকট নিশ্চিত সত্য, সুতরাং তাহারা তাঁহাদের মতানুসারে চলিবে কেন?

এ স্থলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আছেন কি না, যেন অনিশ্চিত সত্য হইল, কিন্তু কল্য বাঁচিব কি না, রজনী প্রভাতের সূর্য্য দেখিতে পাইব না, ইহা কি নিশ্চিত? তবে সংসার নিশ্চিত, এ কথা কেমন করিয়া বলিব?

সংসার কি আমাকে শান্তি দিতে পারে?

* "Empires and Emperors are but bubbles in the sea of Budhism, Christianity and Mahamedanism."

বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ভোগে কি আত্মার শান্তি আছে? এই সকল পরিমিত ও ক্ষণস্থায়ী পদার্থে কি অনন্তমুখী আত্মার তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে? কখনই না। সেই ভূমা, সেই মহান্ ব্যতীত মানবাত্মার তৃপ্তি আর কিছুতেই নাই। সেই জন্যই পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি বলিয়াছেন ;—

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

সেই ভূমাতেই সুখ, ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

জ্ঞানচর্চ্চায় কি আত্মার প্রকৃত শান্তি আছে? এ বিষয়ে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি। এক দিবস দেবর্ষি নারদ ত্রিতন্ত্রী বীণা সহযোগে হরিগুণ গান করিতে করিতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ব্যাসদেব বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্যাসদেব! আপনি এত বড় জ্ঞানী হইয়া এরূপ বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছেন কেন? ব্যাসদেব বলিলেন, "আমি অনেক জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি কিছুতেই শান্তি পাইলাম না। আমার শান্তিলাভ হইল না।" তখন নারদ বলিলেন, কেবল জ্ঞানের আলোচনায় প্রকৃত শান্তি লাভ হয় না। আপনি ভক্তির চর্চ্চা করুন, তাহাতে শান্তি পাইবেন। ব্যাসদেব ভক্তি চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থ।

দয়াধর্ম্ম, পরোপকার ব্রতে কি শান্তি আছে? একদিন কোন স্থানে একজন পরম দয়ালু, পরোপকারী ব্যক্তির * সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "দেখুন, জগতে অনেক লোকের দুঃখ আছে, কিন্তু দয়ালু ব্যক্তির ন্যায় এত দুঃখ কাহারও নয়। যাহার যত দুঃখ, সকল দুঃখ দয়ালুর স্কন্ধে। দয়ালু ব্যক্তিকে সকলের জন্যই কাঁদিতে হয়। আমি বলিলাম, "লোকের উপকার" করিলে কি আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না? উপকার করিলাম বলিয়া কি মনে আনন্দ হয় না? তিনি উত্তর করিলেন, "মানুষের দুঃখের যে শেষ নাই! আমি কয়জন লোকের উপকার করিতে পারি! চারিদিকে হাহাকার!"

এ কথার উত্তর কি? আমার কোন ভগবদ্ভক্ত আত্মীয় ব্যক্তিকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, দেশের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। কিসে ভাল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনি কিছু ভাবেন কি না? তিনি উত্তর করিলেন, "ভাবি বই কি! তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবি যে, যে কীটাণুর কোটি কোটিটা একত্র হইলে একটি বালুকা কণাও হয় না, তাহাকে যিনি দেখেন, তাহার কল্যাণের উপায় করেন, তিনি কি এত বড় দেশটাকে দেখিতেছেন না? দেশের কিসে কল্যাণ হইবে, তিনি কি তাহার বিধান করিবেন না?"

সেই এক স্থানে নির্ভর ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি নাই। আর সকল বিষয়ের সহিত সেই একের যোগ করিয়া দেও। কি জ্ঞানালোচনা, কি জনহিতৈষণা, সকল বিষয়ের সহিত সেই একের যোগ করিয়া দেও। যখন দর্শন, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে, জানিও যে, সকল জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞান। তাঁহারই ভৃত্যরূপে তাঁহার সংসারে তাঁহার কার্য্য কর। ফলাফল চিন্তা করিয়া অস্থির হইও না। তোমার বক্তৃতার মুখে

* স্বর্গীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়।

শ্রী, ফলাফল তাঁহার হস্তে। সকল
ভার তাঁহার উপর নির্ভর কর।
যদি তোমার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পার,

তাহা বিকি না পার, তাহাতেও দুঃখিত
হইও না। ফলাফল তাঁহারি হস্তে।"
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের প্রবেশ)

[ভজনানন্দে]

এমন সময় নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার Resident রাজপ্রতিনিধি। পরমহংসদেব তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। বিবেকানন্দের বয়স বছর বাইশ; B. A. পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিমধারে তানপুরাটী ঝুলান ছিল। নরেন্দ্র সেই তানপুরাটী লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বাঁয়া ও তবলায় সুর বাঁধা হইতে লাগিল; কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) দেখ, ও আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন। পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। পূর্ণ কুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাপ্তেনের প্রতি) কিন্তু নারদাদি ?

কাপ্তেন। তাঁরা লোক শিক্ষার জন্য কথা কয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, নারদ, শুকদেব ওঁরা সমাধির পর নেবে এসেছিলেন—দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন,—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।
(সে দিন কবে বা হবে)
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-ভোগ জীবনে
(সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়া দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হবে)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে]

'আনন্দ অমৃতরূপ' এই কথা বলিতে না বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাব সমাধিতে

নিমগ্ন হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব-আস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহ্য একেবারে নাই। শ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে। স্পন্দহীন। নিমেষশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন!

[সমাধি ভঙ্গের পর।]

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিদৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতে লাগিলেন। ওদিকে ঘরে এক ঘর লোক হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি ভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগুন জেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল।

(সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তদিগের প্রতি) সচ্চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কম্‌বে, ঈশ্বরে মতিভক্তি তত বাড়্‌বে।

কাপ্তেন। কলিকাতার বাড়ীর দিকে যত আস্‌বে, কাশী থেকে তত তফাৎ হবে। আবার কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ী থেকে তত তফাৎ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাঁতে ভাব ভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[বেদান্ত বিচারে]

জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তাহার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। তিনি স্ব স্বরূপে সর্ব্বদা থাকেন। ভক্তের ভিতর একটানা নয়। জোয়ার ভাঁটা হয়। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস ক'রতে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে—যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর' 'টাপুর টুপুর' করে।

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।]

জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞান চান্। ভক্তের ভগবান। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্।

"কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন জ্যোতিঃ ও মণি, জ্যোতিঃ বল্লেই মণি বুঝায়, মণি বল্লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। তুমি মণি না ভাবলে জ্যোতিঃ ভাবতে পার না—জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পার না।

"এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানারূপ—'সেতো তুমিই গো তারা!' যেখানে কার্য্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেই খানেই শক্তি। কিন্তু

থাকলেও জল—তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দ সেই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না, তখনও-যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন, তখনও তিনি, আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি—কেবল উপাধি বিশেষ।

কাপ্তেন। হাঁ মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলুম।

কাপ্তেন। মহাশয়। কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, তিনি বাবু, তিনি সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশবসেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন। তা আপনি যাবেন, তা আর কি করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বর চিন্তা করে—হরিনাম করে। তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বরমায়া জীব-জগৎ' যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীব জগৎ হয়েছেন।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবল মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে বাহিরে ঐ বারাণ্ডায় আসিলেন।

উত্তর-পূর্ব্বের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞান-বিচার করে—বলে, 'জগৎ স্বপ্নবৎ—পূজা, নৈবেদ্য এ সব মনের ভুল—কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য। আর আমিই সেই।'

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কিগো! তোমাদের কি সব কথা হচ্চে?

নরেন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) আমাদের কত কি কথা হচ্চে—'লম্বা লম্বা' কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, শুদ্ধ ভক্তিও সেই খানে নিয়ে যায়। ভক্তি পথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে।' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন Hamilton এ পড়লুম—লিখছেন, 'A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion.'

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কিগা?

নরেন্দ্র। ফিলজফি (দর্শন শাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) Thank you! Thank you! (সকলের হাস্য।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[সন্ধ্যা সমাগমে]

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় হইলেন।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ীর ফরাস চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতে লাগিল।

কালী ঘরের ও বিষ্ণু ঘরের দুইজন পূজারি গঙ্গায় অর্দ্ধ নিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন, কেন না, শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ—কাহারও হাতে Stick, কেহ বন্ধু সঙ্গে, বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুম-গন্ধবাহী নির্ম্মল সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খর স্রোত ঈষৎ বীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছিল। তন্মধ্যে হয় ত কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, তাই পঞ্চবটীর বিজন ভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল ফরাস আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিল ও ধুনা দিল। ওদিকে দ্বাদশ মন্দিরে শিবের আরতি আরম্ভ হইল। তৎপরেই বিষ্ণু ঘরের ও কালী ঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘাড় ও ঘণ্টা মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল,—মধুর ও গম্ভীর—কেননা, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যান স্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতে লাগিল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথী সলিল যেন কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া, হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের ছবি, যশোদা ও গোপালের ছবি, দেবী যড়্ভুজ-মূর্ত্তির ছবি—ধ্রুব প্রহলাদের ছবি, রামনামাঙ্ক ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন, 'ব্রহ্মাত্মা ভগবান, ভাগবত-ভক্ত ভগবান, ব্রহ্ম শক্তি শক্তিব্রহ্ম; বেদ পুরাণ তন্ত্র গীতা গায়ত্রী, শরণাগত—শরণাগত; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী ইত্যাদি। নামের পর করজোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুই চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাগমে উদ্যান মধ্যে ও গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাষ্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নীচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

(নরেন্দ্রের কত গুণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল, ভবনাথ, এরা সব নিত্যসিদ্ধ। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখনা, নরেন্দ্র কাহাকেও (care) (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল, কাপ্তেন ভাল জায়গায় বস্‌তে বল্লে, তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই—যেন কোন বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে পড়তে এদিকে

জিতেন্দ্রিয়—বলেছে, বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

লেখাবলী। *

(সমালোচনা)

গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের আবেগে যাহা বলিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্য-প্রেমিকেরা চির দিন তাহাই বলিবেনঃ -"হায় কেনা ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে।" প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের বংশীধ্বনি নীরব হইবার পরে এবং মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সময়ে, বঙ্গসাহিত্যের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। পরাধীনতা এবং অত্যাচার সঙ্কুচিতায় দেশের লোক জড়প্রকৃতি হইয়া উঠিল। ভাল কথায় মন নাই, সৎকার্য্যে উৎসাহ নাই; কোন রূপে খাইয়া পরিয়া জীবন কাটাইতে পারিলেই হইল। শুনিয়াছি, যে একটী বিদেশীয় সহরে, যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাবে নগর ধ্বংশ হইতে লাগিল, এবং সকলেই জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িল, তখন অধিকাংশ লোক যেন, "হেসে নেও দুদিন বই ত নয়" বলিয়া নৃত্যগীতে, অথবা আত্মমোহকর অপবিত্র আমোদে রত হইতে লাগিল। সকলেরই মনের মধ্যে গভীর ছায়া; সকলেই ভাবিতেছিল, "কে জানে কার কখন সন্ধ্যা হয়;" বঙ্গবাসী যখন পরাধীনতার ফলে ধন হারাইল, মান হারাইল, তখন জীবন ধারণটা, কোনরূপে বাঁচিয়া থাকায় দাঁড়াইল। ব্যাধি, মন্বন্তর এবং অত্যাচার, দেশের লোককে বলবীর্য্যহীন করিয়া তুলিল। যদি এই কালরাত্রির অন্ধকারে, পুণ্যশীলা ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ধ্বনিত না হইত, এতদিনে বোধ হয় বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হইত।

কেবল দুটী দিন হাসিয়া লইবার জন্য, একটুখানি ঠাট্টা তামাসা করিয়া সময় কাটাইবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে পাশা, নাটমন্দিরে কবি ও পাঁচালি, বৈঠকখানায় অশ্লীল ভাঁড়ামি, এবং কক্ষান্তরে আরও কত কিছু চলিতে লাগিল। এ যুগের সাহিত্য কেবল কবির তরজা এবং পাঁচালির ছড়া। এ সময়ের পরস্পরের গালিগালাজ ও বিদ্রূপ তামাসা তত তীব্র হইলেও কেহ রাগ করিত না। উত্তর প্রত্যুত্তর কেবল কথার বাহারে পর্য্যবসিত হইত। ইহাতে তৎসাময়িক লোকের হৃদয়ের উদারতা অপেক্ষা জীবনের উদাসীনতাই আমি বেশী দেখি। জীবনেও যেমন, সাহিত্যেও তেমন, হাসি তামাসা বড়ই উপাদেয়, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন তরল হাসি বাচালতা মাত্র। হাসি ও বিদ্রূপ, সাহিত্য ব্যঞ্জনে লবণ স্বরূপ, না হইলে চলে না। কিন্তু এই যুগের সাহিত্য অধিকাংশ স্থলেই নুনে পোড়া ব্যঞ্জন; কুকুরেরও অগ্রাহ্য।

স্বেচ্ছাচ্ছন্দে, এবং হাসি টিটকারীতে যে বাঙ্গালা ভাষা বর্দ্ধিত হইল, তাহাতে বীরত্ব বা প্রণয়ের অভিব্যক্তি অসম্ভব হইয়া উঠিল। বীরত্ব দেখাইতে গিয়া যাত্রাওয়া-

---

* শ্রীরাধানাথ রায় প্রণীত, হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত।

লার ছোক্‌রারা কেবল একটা হাস্যকর টানা সুরে "এই যে দক্ষিণ বাহু" বলিয়া আস্ফালন করিত; এবং প্রণয়ের গভীরতা "কেবল"হা সখি" ও"গেলাম্ গেলাম্ "শব্দেই শেষ হইত।

এই সময়ে প্রভাত সূর্য্য কিরণের মত অন্ধকাররাশি উদ্ভিন্ন করিয়া মধুসূদনের প্রতিভা দীপ্তি উদিত হইল। "ডুমুরুর ধ্বনি শুনি নাচে কাল ফণী"। "যেও না রজনী তুমি লয়ে তারাদলে," অথবা "তোর ওকি পরাণ কাঁদে না হেরিয়া শ্যাম চাঁদে," বঙ্গদেশে নবযুগের সৃষ্টি করিল। ভাষার অখণ্ডতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং কল্পনার কমনীয়তা আবার দেখা দিল। এই জন্যই ব্রজবাঙ্গিকার মস্মোক্তি বঙ্গদেশের মর্ম্মোক্তি বলিয়া মনে হয়। তাই সকলেই বলি, "ভূতলে অতুলমণি শ্রীমধুসূদন"। আহ্লাদে ভাষা চিরদিনের মত পরিত্যক্ত হইল। শরতের পাদপের মত সতেজ ও প্রফুল্ল, বর্ষার তটিনীর মত অবিশ্রান্তবাহী এবং কুল প্লাবী বসন্তের কুসুমের মত সুগন্ধি ও কমনীয়, দিগন্তব্যাপী আকাশের মত স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ভাষায় যে প্রেমের ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে, বহুদিন পরে মধুসূদন তাহা প্রমীলার প্রেমে এবং বীরাঙ্গনাদিগের লিপিতে দেখাইলেন। হয়ত ঐপ্রকার ভাষা সকল প্রকার প্রেমে অনুপযোগী বলিয়া, এখনো প্রেম সঙ্গীতে শুনিতে পাই, "ন্যাকা সুরে গান গায় হৃদয় আমার"। পটের বিবির বিদেশীর সুধাসিক্ত অধরপুটে এসব কথাই হয়ত মিষ্ট। কিন্তু জাতি সাধারণের সহিত এই সুন্দরীরা পরিচিতা নহেন বলিয়া, আমরা ইহাদের সুখদুঃখের ধার ধারি না।

যে মধুর ভাষায় এবং ভাব-সৌন্দর্য্যে বীরাঙ্গনা রচিত, সেই ভাষা এবং ভাব-মাহাত্ম্যের আদর্শে লেখাবলী বিরচিত। হবহু মাইকেলি অমিত্রাক্ষর রচনায় রাধানাথ বাবু ভিন্ন অন্য কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, দেখি নাই। বিদ্রূপে ছুচুন্দরী বধ রচিত হইয়াছিল; তাহাতেও মাইকেলি সৌন্দর্য্য ছিল, স্বীকার করি; কিন্তু সে গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাহার পর একজন বিশেষ কৃতীপুরুষ এই ছন্দে বড় মিষ্ট ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছেন। এই লিপিতে, ভাষার গাম্ভীর্য্যের ছলে বিদ্রূপের রস দ্বিগুণ উছলিয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অতুল্য "ভারত উদ্ধার" কাব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া রাধানাথ বাবু ভিন্ন অন্য কেহ এপর্য্যন্ত মাইকেলি অমিত্রাক্ষরে মনোমোহন করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বপ্রথমে রাধানাথ বাবুর ভাষার কথাই বলিব। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকার ফলে, রাধানাথ বাবুর ভাষা সর্ব্বত্র পরিমার্জ্জিত এবং নির্দ্দোষ। বাঙ্গালা, বাঙ্গালাই; সংস্কৃত নহে। যাঁহারা ভাষাকে একেবারে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিতে চাহেন, তাঁহাদিগের যত্ন কখনও সফল হইবে না। বর্দ্ধিত তরুকে পুনর্ব্বার বীজ হইতে বাহির করা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া যেখানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, সেখানে তাহার যথেচ্ছা প্রয়োগ ধৃষ্টতা মাত্র। ইংরাজী obliged শব্দের ভাষান্তরে পীড়িত অর্থজ্ঞাপক বাধিত শব্দ দেখিতে পাই; Inspiration অর্থে প্রত্যাদেশ দেখিতে পাই। ভাষা হইতে এই সকল শব্দের প্রত্যাদেশ দেখিতে পাইলেই সুখী হওয়া

ধার। দেশীয় ভাষার ছাঁচ ও কাঠাম সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অথচ সংস্কৃতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সকল সুলেখক ভাষার গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রয়াসী, রাধানাথ বাবু তাঁহাদিগের মধ্যে একজন।

এযুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে অল্প বিস্তর সকলের লেখাতেই আজ হ্যাট্ মাথায় ইংরাজী শব্দ ধুতি চাদর পরিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তিতে দেখা দেন। কেহ লেখেন, "সময় উচ্চ হইয়া আসিয়াছে" কেহ লেখেন, 'সময় ভারি হইয়া কাঁধের উপর ঝুলিতেছে.' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতটা মারাত্মক না হইলেও, কিঞ্চিৎ পরিমাণে সকলকেই এই দোষে দোষী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষ মধ্যে বজ্র পতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতেন না" এই ছত্রটী বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা। বঙ্কিম বাবুর একালের রচনায় এসকল ত্রুটি ছিল না। রাধানাথ বাবুরও তেইশ বৎসর পূর্ব্বের লেখায় একটী স্থানে দেখিলাম, "সে কেশ সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তি"। ইংরাজী ওয়ালা ছাড়া কেহ ইহার অর্থ বুঝিবে না। রাধানাথ বাবুর লেখায় এ ক্ষুদ্র কলঙ্কটী না থাকিলে সুখী হইতাম।

রাধানাথ বাবু বঙ্গ ভাষায় অধিক কবিতা লেখেন নাই। কাজেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির সহিত পাঠকেরা তত অধিক পরিচিত নহেন। আমি ইঁহার উৎকল ভাষায় রচিত কবিতা গ্রন্থগুলি পড়িয়াছি। কি বঙ্গ ভাষায়, কি উৎকল ভাষায়, ইঁহার কবিত্ব শক্তি সর্ব্বত্র সমান ভাবে পরিস্ফুট। উৎকল কবিতার কথা উল্লেখ করিবার একটী উদ্দেশ্য আছে। বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নাই, তাহা নহে; কিন্তু পর্ব্বত এবং বনভূমি-পরিপ্লুত, হ্রদাদি-সুশোভিত, সমুদ্র তরঙ্গ চুম্বিত উপকূলশালী উৎকল দেশে প্রকৃতি সুন্দরী সর্ব্বত্র মনোমোহিনী। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও, প্রাচীন উড়িয়া কবিদিগের রচনায় সে সৌন্দর্য্যের ছায়া পর্য্যন্ত নাই। তাঁহারা হরিদ্রা, তৈলাক্তাঙ্গী সুন্দরীদিগের পায়ের ঝুণ্টিয়া হইতে নাসিকার গুণা পর্য্যন্ত অলঙ্কার রাশির বর্ণনা করিয়াই মরিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কবিসূর্য্যের মত কোন কোন কবির অনেক সুকবিতা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু প্রকৃতি দেবীর সৌন্দর্য্যে কোন কবিই আকৃষ্ট হন নাই। রাধানাথ বাবু উৎকল ভাষায় কবিতা লিখিয়া তদ্দেশীয়দিগকে দেশসুলভ সৌন্দর্য্য সাগরে অবগাহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। লেখাবলীর শেষ কবিতাটীর উপাদান উৎকল ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত। ইহাতে যে সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গক্ষেত্রে দুর্লভ।

দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় নহে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতেও কবির তুলিকা সিদ্ধহস্তপূত। এই দেখুন:—

ভ্রমিতাম সুখ-মনে এ তটিনী তটে
নিশায়, নিয়ত অশ্ব রহিত নীরবে,
ওই যে স্রোতের মাঝে রাজে গজাকৃতি
কৃষ্ণশিলা, তদুপরি বসিয়ে বিরলে,
স্মরিতাম তোমা, সখে, নিরাশ হৃদয়ে।
রাজিত চন্দ্রিকা, নাথ, রজত সৈকতে,
চন্দ্রমার ছবি কোলে সুখে কল্লোলিনী
শিলাপুঞ্জে জর্জ্জরিত; রজতাম্বুময়ী
ধাইত সাগর পানে কলকল রবে
উপল বন্ধুর পথে; শূন্যে তারাবলী
তারাধামে দেড়ি সবে নাচিত কৌতুকে;
ওপারের আম্রবনে পাপিয়ার গীতি

ভাসিত সুদূরে ভাসি পাখীর হিল্লোলে;
সৈকতে স্রোতের পাশে প্রেমোল্লাসে রত,
ভুলিত গুঞ্জিত তান মরাল দম্পতি;
টিটিভের মধুস্বর ভাসিত আকাশে।
শিরীষ-পারাবতী মন্দ গন্ধবহ
রহিয়া রহিয়া বনে ধ্বনিত মর্ম্মরে;
চন্দ্রালোকে চারিদিকে হাসিত প্রকৃতি।
শ্বেতদ্বীপ-লক্ষ্মী যেন শ্বেতাম্বর ধরা,
কাঁদিত অভাগী শুধু, ওই কাশবনে
কাঁদিত অভাগী সহ শোকে কোকবধূ।

আবার দেখুন :—

নাহি চাই অলঙ্কার হীরা মুক্তা মণি
সাজাতে অঙ্গের শোভা, লভিব সহজে
বনফুল, শতদল শৈল সরোবরে;
সীমন্তে গৈরিক বিন্দু সিন্দুরের স্থলে
সখীরূপে বনদেবী দিবেন সুন্দরী,
দিবেন ময়ূর পুচ্ছ বাঁধিতে কবরী,
পট্টবস্ত্ররূপে সখে পরিব আদরে
অস্তগামী রবি-বিভা পাটল বকলে,
কেশপাশে মুক্তামালা দিবেন রজনী
নাই কাজ অন্য ধনে প্রেমধনে ধনী
তুমি, প্রেমভিখারিণী দাসী তব পদে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

টমাস কার্লাইল। (২)

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত কার্লাইল লণ্ডন নগরে Cheyne Row তে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ জীবন সম্বন্ধে এই ৪৭ বৎসর চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) ১৮৩৪—১৮৪২ এই সময়ের মধ্যে তাঁহার 'French Revolution,' 'Hero worship' এবং 'Chartism' প্রকাশিত হয়। তাঁহার বন্ধু Irving এবং জেন ওয়েলসের মাতার মৃত্যুও এই সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল। (২) ১৮৪২—১৮৫৩ এই সময় তাঁহার 'Life and letters of Cromwell' 'Past and present,' 'Latter day Pamphlets' এবং 'Life of Sterling,' এই পুস্তক চতুষ্টয় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩খ্রীঃ তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। এই সময় প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর উপর তাঁহার আস্থা একেবারেই লোপ পাইয়াছিল; এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহার উপর যে তাঁহার বিশ্বাস নাই, একথা তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। (৩) ১৮৫৩—১৮৬৬, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী জেনের মৃত্যু হয় এবং 'History of Frederic II' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর (Lord Rector) মনোনীত হন। Frederic II পাঠে বোধ হয় যে, তখন তিনি স্বাধীন তন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। (৪) ১৮৬৬—১৮৮১ এই সময় তাঁহার জীবন নৈরাশ্য ও দুঃখ পরিপূর্ণ। যাহার প্রতিভা-বিম্বিত সুচারু বদনকমল তাঁহার জীবন-সরোবরকে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহা শুষ্ক এবং চির দিনের মত মলিন হইয়াছে। সরোবরের শোভা কোথায়! দেহে প্রাণ ছিল, কিন্তু দেহ-তন্ত্রী সকল ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। যে স্বর্গীয় সংগীত এত দিন তাঁহার প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা একেবারে নীরব! এই সময় বৎসর তিনি আর বিশেষ কোন কার্য্য করেন নাই; তবে মৃত্যু

আসিয়া তাঁহাকে শান্তি দিবে, কেবল তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী, তিনি তাহারই অঙ্কে স্থান পাইয়াছিলেন।

কার্লাইলের বিস্তৃত জীবনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য-জগতে তাঁহার কীর্ত্তি, তাঁহার নীতি, তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার চরিত্রবল; ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি,সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতির উপর তাঁহার আধিপত্য, তাঁহার গ্রন্থাবলীর শিক্ষা, তাঁহার এবং জেন ওয়েলসের দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি বিষয়ের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কার্লাইলের সাহিত্য-সেবা—কার্লাইল আশৈশব জানিতেন যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান তাঁহাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধন করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম এবং সাহিত্যই সেই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল ক্ষেত্র। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তিনি অধ্যবসায়, সততা, যত্ন ও পরিশ্রমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায়ই নিযুক্ত ছিলেন; এডিনবরা অপেক্ষা কোন বৃহত্তর সহর তদবধি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া যাহাতে নিরুপদ্রবে অধ্যয়ন এবং চিন্তা করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জেনকে লইয়া জনমানবহীন প্রান্তরস্থিত একটী নির্জ্জন গৃহে আশ্রয় নিলেন। এই স্থানের নাম Craigen puttock. সাহিত্য-সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কখন একটী কথাও বলেন নাই। গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়ের জন্য তিনি সময় সময় বিপুল চিন্তার মধ্যে পড়িয়াছেন, তথাপি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, কাহারও অনুরোধে কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই; বরং বলিয়াছেন, 'No talent for the market.' যিনি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্ব প্রধান চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অভিহিত, তাঁহাকেও 'Sartor Resartus' লইয়া মহা বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল। পুস্তক প্রকাশকগণের মধ্যে কেহই সহজে তাহা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। 'Emerson' এবং Goethe ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। Goldsmith এর 'Bee' এবং 'Wordsworth' এর 'Excursion' এর প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহাদিগের সমসাময়িক কেহই বুঝিতে পারেন নাই। মিল্‌টনের 'Paradise Lost" বিক্রয় করিয়া মাত্র ১০ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল! কার্লাইল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে, লোকে উহার প্রকৃত গুণ বুঝিতে পারিতেছে না। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অবিচলিত ছিলেন। সংসারে যেমন নূতন জিনিসের আদর অধিক, তেমন অনেক সময় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কোন পদার্থ উপস্থিত হইলে, লোকে তাহার নিকট ঘেসিতে চায় না। মনুষ্য মাত্রেই সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী; এই জন্যই সংস্কারকদিগের উপর অত্যাচার। কার্লাইলের পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়ে যে সকল পুস্তকাদি লিখিত হইত, তাহার সকলের মধ্যেই কাব্য-

গত এবং কিয়ৎ পরিমাণে ভাবগত সামঞ্জস্য ছিল। কার্লাইলের লিখিবার প্রণালী এবং ভাব এই প্রচলিত স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষা রাজ্যে তিনি বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভাষা চিন্তার বহিঃপরিচ্ছদরূপে উহার অনুগামী হইবে ইহাই কার্লাইলের মত ছিল। যে ভাষা দ্বারা মনোভাব সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রযুজ্য, তাহা প্রচলিত প্রথার প্রতিকূল হইলেও, তাহাই অবলম্বনীয়। এই নীতির উপাসক হইয়া তিনি অনেক সময় প্রচলিত ব্যাকরণ বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিপ্লব হইতে যে নূতন রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্যে জগৎ সংসার বিমোহিত। তিনি ইংরাজী ভাষাকে একটু জর্ম্মন ভাবানুপ্রাণিত করিয়াছেন। এ বিষয় তাঁহার শিক্ষা-গুরু পণ্ডিতপ্রবর গেটে (Goethe).

১৮৪১ খৃঃ অব্দে কার্লাইলের 'Heroes and Hero worship('বীর এবং বীরপূজা') নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেনঃ—

"The history of what man has accomplished in this world, is at bottom the history of the great men that have worked there"

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে 'বীর' এবং 'বীরত্ব' সম্বন্ধে লোকের ভ্রমপূর্ণ ধারণা ছিল। যাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ, বলবান, তাঁহারাই বীর নামে অভিহিত হইতেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর হইতে সে ভাব নিরাকৃত হইয়াছে। যাঁহারা সরলতা, সততা, বিশ্বাস, মহত্ব প্রভৃতি গুণে ধর্ম্ম-জগতে, নৈতিক জগতে, সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বীর-পদবাচ্য। যে দেশে বীর পূজা নাই, সে দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে; যে সময়ে বীরপূজা হয় না, সে সময় পাপ স্রোতে নিমজ্জিত— ইহাও নিশ্চয়। সকল লোক সমান, ইহা ভ্রম, সকলের সমান বুদ্ধি, সকলের সমান বিদ্যা, সমান সততা, ইহা ভ্রম। যাঁহারা সততা, বুদ্ধি, মহত্বগুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা যে সংসারের পরিচালক হইবে, ইহাই ভগবানের বিধান। ভড়ং কখনও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না; ঈশ্বরের রাজ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবিশ্বাসী এবং অসৎ লোকের মুখ হইতে কখনও সত্য কথা বিনিঃসৃত হয় না।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে 'Sartor Resartus' ("পরিচ্ছদ দর্শন') প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রত্যেক পংক্তিতে মণিমুক্তা জড়িত রহিয়াছে। ইহা সাধারণের পাঠোপযোগী নহে। "Sartor excites universal disapprovation" বলিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিতে অনেক প্রকাশক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কার্লাইল স্বয়ংই বলিয়াছেন:-

"Let the British reader study and enjoy .. what is here presented him, and with whatever metaphysical acumen and talent for meditation he is possessed of"

এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় এইরূপ:- জগতে যে সকল পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহা কেবল নিদর্শন বা কোন সত্ত্বার প্রতিরূপ মাত্র। মনুষ্য এবং তাহার কার্য্যকলাপ সকলই এক মাত্র সত্ত্বা ভগবানের বহিঃস্থ পরিচ্ছদ। যাহা কিছু নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়াছে, তাহাকেই বহিঃস্থ পরিচ্ছদ বলা যায়। সুতরাং জড়জগৎ এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত সকল জীব এবং পদার্থকে ভগবানের বহিঃস্থ পরিচ্ছদ বলা যাইতে পারে। দৃষ্ট পদার্থ

মাত্রই যখন ভগবানের বহিঃস্থ পরিচ্ছদ, নিদর্শন বা প্রতিরূপ; তখন পরিচ্ছদ-দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের সার বলা যাইতে পারে।

"All visible things are emblems, what thou seest is not there on its own account; strictly taken is not there at all. Matter exists only spiritually and to represent some idea, and body it forth. On the other hand, all emblematic things are properly clothes thought woven or handwoven, Whatsoever sensibly exists whatsoever represents spirit to spirit, is properly a clothing, a suit of raiment put on for a season, and to be laid off. Thus in this one pregnant subject of clothes, rightly understood, is included all that men have thought, dreamed, done and been, the whole external universe and what it holds is but clothing and the essence of all science lies in the philosophy of clothes." Teufelsdrockh অনেক বিষয়ে কার্লাইলের প্রতিকৃতি। এই গ্রন্থে অনেক তত্ত্ব কথা আছে—

'Laughter is the cipher key with which to decipher the whole man. The Philosopher is he to whom the highest has descended and the lowest has mounted high.

এইরূপ গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদরনীয় হইবে না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে কার্লাইলের 'French Revolution' (ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব) প্রকাশিত হয়। ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত। ইহাকে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস বলা যায় না; ইহা এ বিপ্লবের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা। ইহাকে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ ঘটনার বাহ্যিক বেগের উপর তিনি তত লক্ষ্য রাখেন নাই; উহার অন্তর্নিবিষ্ট যে ভাব-সমষ্টি (soul), তাহাই পাঠকের নয়ন সমক্ষে ধরিয়াছেন, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্তর্নিহিত যে জাতীয় ভাব, তিনি তাহারই এক জীবন্ত ছবি আঁকিয়াছেন। কোন জাতি, কি কোন রাজা কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শুষ্ক বিবৃতি—ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কি কি কারণে ঘটনা বিশেষের সূত্রপাত হয়; তখন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং জাতীয় ভাব কিরূপ ছিল, ধর্ম্মসমাজ এবং রাজনীতির উপর ঐ ঘটনার কিরূপ শক্তি; উহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ফল—এই সকলই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। মেকলে এবং বাকল (Buckle) প্রভৃতিরও এই মত ছিল। কার্লাইল 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

"The essence of history does not lie in laws, senate houses, or battle fields, but in the tide of thought and action.

যাঁহারা সকল বৃহৎ ঘটনার নেতা, তাঁহাদিগকেই তিনি 'বীর' বলিয়াছেন। সকল ইতিহাসের মূলে তাঁহাদেরই কীর্ত্তি বর্ত্তমান। এই জন্য তিনি French Revolution এর অধিনায়কদিগের চরিত্র বিশ্লেষণে সচেষ্ট। বোধ হয়, যেন তিনি তাঁহাদিগেরই জীবনী লিখিতেছেন। তিনি যে সকল চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। তাহার অদ্ভুত বর্ণনা শক্তির প্রশংসা করিয়া Lowell বলিয়াছেন:—

"The figures of most historians seem like dolls stuffed with bran . . ; but Carlyle's are so real that if you prick them they bleed.

এই গ্রন্থে তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। Mirabeauর সকল দোষ ভুলিয়া তিনি তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন; এবং Danton এর দোষও মার্জ্জনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু যিনি ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের একজন প্রধান অধিনায়ক, তাঁহাকেও তিনি অযথা নিন্দা করিয়াছেন। কার্লাইলের কতকগুলি অস্থিমজ্জাগত ভাব ছিল। যাহারা তাহার

অনুগামী, তিনি তাহাদিগকে আকাশে তুলিয়াছেন। যাহারা তদ্বিপরীত, তাহাদিগের সকল গুণ ভুলিয়া তাহাদিগকে নরকে ফেলিয়াছেন।

১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে "Cromwell's letters and speeches' প্রকাশিত হয়। কার্লাইলের মাতা কার্লাইলকে বলিয়াছিলেন—"ক্রমওয়েলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে সকল ইতিহাস এবং সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বিদ্বেষ পরিপূর্ণ; তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইয়াছে; যাহাতে তাঁহার প্রতি সুবিচার হয়, তুমি তাহা করিবে।" এই বাক্য কার্লাইলের শিরোধার্য্য হইল। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতা সহকারে ইহার উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এরূপ অনেক দলিল তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, যাহা অনেকের নিকট একেবারে নূতন বলিয়া বোধ হইল। এই সকল দলিল হইতে কার্লাইল প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ক্রমওয়েল মহৎ, নিঃস্বার্থ এবং সৎলোক ছিলেন, "not a man of falsehood, but a man of truth." কার্লাইল এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরে, কার্য্যের প্রত্যেক স্তরে এবং বক্তৃতা এবং পত্রের প্রত্যেক পংক্তিতে তাঁহার অমিত তেজ, সত্যের প্রতি আস্থা, কপটতার প্রতি ঘৃণা এবং মহত্ত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বীরবর। স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে তিনি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত নৃশংস এবং নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু কার্লাইলের মতে তাহাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। ক্রমওয়েল জানিতেন, যে ব্যক্তি সত্য এবং ধর্ম্মের উপর পদাঘাত করিয়া অন্যায়রূপে আপন স্বার্থ বজায় রাখিতে চায়, সে দেশ এবং লোক-শত্রু। যাহারা ইহার প্রশ্রয় দেয় বা সহায়তা করে, তাহারাও দেশ এবং লোকশত্রু; তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে দেশের কল্যাণ, মনুষ্যের মঙ্গল হইবে না—এই বিশ্বাস তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবান তাঁহাকে এই কার্য্য উদ্ধার করিতে এ জগতে পাঠাইয়াছেন। তিনি এই সময় বলিয়াছিলেন যে, এ বিপদে তিনিই ইংলণ্ডকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারে না। এ বিষয়ে শিবজীর সহিত তাঁহার সৌসাদৃশ্য আছে। গোহত্যা নিবারণ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা শিবজী দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ কথা লিপিবদ্ধ করাও উপহাসের বিষয় হইতে পারে। কথিত আছে যে, যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে এবং বিপদের সময় তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তাহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানস্থ হইতেন। যখন ভগবতী তাঁহাতে আবির্ভূতা হইতেন, তখন তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে যে যে বাক্য নির্গত হইত, তাহা লিপিবদ্ধ হইত। তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। ঐ সকল বাক্য ভগবতীর বাক্য বলিয়াই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং মুসলমানদিগের প্রতি তিনি যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাকে অত্যাচার বলা যায় না। ক্রমওয়েলও আশৈশব ইংলণ্ড উদ্ধার সম্বন্ধে দৈববাণী শুনিতেন। এইরূপ সরল এবং দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনও স্বার্থপর এবং কপট হইতে পারেন না।

ইহা ভিন্ন তিনি 'Past and Present', 'Life of Frederic the Great' 'Chartism' Life of Sterling' এবং অনেকানেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "Past and Present" ('সেকাল ও একাল') এই গ্রন্থে কার্লাইল সকল বিষয়েই অতীতের প্রশংসা এবং বর্ত্তমানের নিন্দা করিয়াছেন। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তিনি অনেক সময় ভ্রুকুটী করিয়াছেন। তিনি যখন Sartor লেখেন, তখন সেই সময়কে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"an epoch when puffery and quackery have reached a height unexampled in the annals of mankind

"Chartism" এই গ্রন্থে তিনি 'যার লাঠী, তার মাটী' এই নীতি প্রচার করিয়াছেন। ইহা সাম্য এবং গণতন্ত্র প্রণালীর প্রতিবাদ বিশেষ। "Might is right' ইহা দ্বারা কেবল পাশব বলকে লক্ষ্য করা হয় নাই, নৈতিক বল এবং ধর্ম্ম বলও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের জীবনী প্রকাশিত হয়। তিনি ত্রয়োদশ বৎসর অবিরাম পরিশ্রম করিয়া এই বিরাট জীবনী লিখিয়াছিলেন। ইহা কেবল ফ্রেডরিকের জীবনী নহে; ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর এক জীবন্ত ইতিহাস। কার্লাইল ফ্রেডরিককে আদর্শ রাজা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। ফ্রেডরিকের অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশল, বীরত্ব, সাহস, অধ্যবসায়, মনবল, স্বদেশ-প্রেম, প্রজার প্রতি ভালবাসা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং অসাধারণ প্রতিভা — সকলেই স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসাও করেন; কিন্তু তিনি যে আদর্শ রাজা ছিলেন, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য এরূপ জঘন্যতা ছিল না, যাহা অবলম্বন করিতে সেওঁরিক কিছুমাত্রও দ্বিধা করিতেন। মেরিয়া থেরেছার (Maria theresa) সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার উপর ঘৃণা জন্মে। তাঁহার ব্যবহার শঠতা এবং কপটতা-পরিপূর্ণ ছিল। ইঁহাকে আদর্শ রাজা প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অসাধারণ শক্তি কাহারও মধ্যে দেখিলে, কার্লাইল তাহার সকল দোষ ভুলিয়া যাইতেন।

সাহিত্য-সেবাকে কার্লাইল ধর্ম্ম সেবা মনে করিতেন। যে বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন না, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অধর্ম্ম মনে করিতেন। এই জন্য তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণাবয়বতা (thoroughness) দেখাইয়াছেন। কোন বিষয় অসম্পূর্ণ রূপে জানিয়া তৎসম্বন্ধে লেখনী ধারণ করা পাপ, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করা ততোধিক।

"No mortal has a right to wag his tongue, much less to wag his pen without saying something, he knows not what mischief he does, past computation, scattering words without meaning to afflict the whole world yet before they cease Literature, as followed at present is but a species of brewing or cooking where the cooks use poison and vend it by telling innumerable lies'

সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধে তাঁহার কি উচ্চ আদর্শ!

'If the poor and humble toil that we have food, must not the high and glorious toil for him in return, that he may have guidance, freedom, immortality? These two in all degrees I honor all else is chaff and dust, which let the wind blow whither it listeth'

তাঁহার শব্দ বিন্যাসের অপূর্ব্ব ভঙ্গী এবং বর্ণনা শক্তির বিকাশ সময় সময় এরূপ অদ্ভুত মনে হয়, যেন ঘটনাবলী চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। কোন ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন সে মূর্ত্ত, সজীব। তাঁহার লেখন প্রণালী সম্বন্ধে একজন বলিয়াছেন,—

"Carlyle's mastery over the language is unrivalled; it is with him a keen irresistless weapon; his power of word is endless. All nature, human and external, is compelled to serve and run his errands. The bright cutlery, after all the dross of Birmingham, has been thrown aside, is his style. It is not in man to determine what his style shall be, if it is to be his own."

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ। তিনি কোন বস্তু বা বিষয়ের বাহ্যাবরণ উন্মোচন করিয়া একেবারেই তাহার অন্তরে প্রবেশ করেন। Emerson বলেন,—

"Nothing seems hid from those wonderful eyes of yours; those devouring eyes; those thirsty eyes; those portrait-eating, portrait-painting eyes of thine."

বর্ণনা শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে বায়রণের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। ইহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।

"Silence as of death; nothing but the granite cliffs ruddy-tinged, the peaceable gurgling of that slow-heaving polar ocean, over which in the utmost north the great sun hangs low and lazy, as if he too were slumbering. Yet is his cloud-couch wrought of crimson and cloth of gold; yet does his light stream over the mirror of waters, like a tremendous fire-pillar, shooting downwards to the abyss, and hide itself under my feet. In such moments solitude is also invaluable, for who would speak or be looked on when behind him lies all Europe and Africa, fast asleep, except the watchmen; and before him the silent immensity, and Palace of the eternal, whereof our sun is but a porch-lamp."

অনেকের নিকট তাঁহার ভাষা একটু অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার পক্ষে উহাই স্বাভাবিক, কেন না, উহা তাঁহার প্রাণের ভাষা। তাঁহার শ্লেষোক্তি পাঠ করিলে Swift এর কথা মনে পড়ে; কিন্তু Swift অপেক্ষাও তাঁহার তীব্রতা অধিক এবং সহানুভূতি কম বলিয়া মনে হয়। কোন কোন বিষয়ে কার্লাইলের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট (বাঁধা) ভাব এবং মত ছিল, ইহা যেন তাঁহার রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল, কিছুতেই তিনি তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেন না; এবং অন্যে বলিলে, তাহাও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার যে ভ্রম হইতে পারে, ইহা তিনি মনে স্থান দিতে পারিতেন না; এবং যাঁহাদের সহিত তাঁহার ভাবের বা মতের ঐক্য নাই, তাঁহারাও সত্যবিশ্বাসী হইতে পারেন, ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। এই জন্য তিনি অনেক বিষয়ে নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই। বিজ্ঞান দ্বারা নীতি শিক্ষা হয় না বলিয়া তিনি বিজ্ঞানকে উচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন।

Socrates সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"The writings of Socrates are made up of thin wire-drawn notions about virtue; there is no conclusion, no word of life in him."

তাঁহার লেখার অনেক স্থানে পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। সকল সময়ে তাঁহার নিজ মতের সামঞ্জস্যও তিনি রাখিতে পারেন নাই। এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"The judgments of the heart are of more value than those of the head."

অন্য স্থানে লিখিয়াছেন,—

"Morals in a man are the counterpart of the intellect that is in him."

এক সময়ে বলিয়াছেন,—

"Actions will be preserved when all writers are forgotten."

আর এক সময়ে বলিয়াছেন,—

"When the vatican shall have crum-

bled to dust.........catholicism will survive in the sublime reli of antiquity—the Devina Comedia."

মানুষ সাক্ষী গোপাল; তাহার কিছু কর্তৃত্ব নাই; ভগবান তাহাকে যে দিকে চালান, সে সেই দিকেই চলে—ইহা নিয়তিবাদ প্রতিপাদক; আবার অন্য স্থানে তাহার পুরুষকারের প্রশংসা করিয়াছেন—ইহাতে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এবং কর্তৃত্ব আছে এইরূপ বুঝা যায়। এই দুই মতের সামঞ্জস্য কোথায়? তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন গুরু, পাঠক শিষ্য, এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা শুনিবে, মানিবে; প্রতিবাদ করা তোমার পক্ষে প্রগল্ভতা; বিশ্বাসীর কথা এইরূপই বটে। কিন্তু সংসারের লোক তাহাতে অহংজ্ঞান আরোপ করে। বর্ত্তমান সময়ের সমালোচনার হাত বাঁচাইয়া লিখিতে হইলে, বিশ্বাস, সরলতা এবং মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলী দিতে হয়। কিন্তু কার্লাইলের নিষ্কলঙ্ক জীবনবেদ পাঠ করিলে তাঁহার সকল দোষ ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

তিনি অতীত কালের সকল বিষয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন; এই জন্য বর্ত্তমান কালের উপর অনেক সময় অযথা কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কোন বৃত্তান্ত (Fact) পাইলে, কল্পনার জোরে সেইটাকে নানাভাবে তিনি পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেন; কিন্তু কেবল মাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কোন গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন না; কেননা, সত্যই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনী এবং কার্য্যকলাপের আলোচনাকেই তিনি ইতিহাসের সার বলিয়াছেন; এই হেতু তাঁহার লিখিত ইতিহাসে, নেতাদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা রহিয়াছে। কার্লাইল যাহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন, তাহার দোষ দেখিয়াও দেখেন নাই। যাহাকে ভালবাসিতে পারেন নাই, তাহাকে নরকে ফেলিয়াছেন। তাঁহার আদর্শনশক্তির মধ্যে যাহারা আসিতে পারে নাই; তাহার পোষিত ভাবের বিপরীত যাহাদের কার্য্যকলাপ, তাহারা তাঁহার ভালবাসার অনুপযুক্ত। এইজন্য তাঁহার সমালোচনা অনেক সময় একদেশদর্শী হইয়াছে। যথায় তাঁহার সহানুভূতি এবং ভালবাসা বর্ত্তমান, তথায় তাঁহার সমালোচনা অন্তরস্পর্শী এবং পূর্ণাবয়ব।

কার্লাইল কি শিক্ষা দিয়াছেন?

কার্লাইল যে তাঁহার লিখিত গ্রন্থে অনেক নূতন কথা লিখিয়াছেন, বা কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না; কিন্তু দুচারিটী কথা এরূপ ভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা নূতন না হইলেও, নূতন এবং মনোহর পরিচ্ছদে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাজনীতির উপর তাহার শক্তি অপরিমেয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মনুষ্য সমাজে কপটতা বিলাসিতা অপ্রতিহত চলিতেছিল; ধর্ম্মজগতে ধর্ম্মের প্রাণ সত্যতা এবং বিশ্বাস ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল; রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথাত্মক সাম্যভাব এবং প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর পক্ষপাতিত্ব ক্রমে ঘনীভূত হইতেছিল, এমন সময় সম্মুখে হঠাৎ এক নব দুন্দুভি-নাদ শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত; আর সে পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার প্রথম শিক্ষা—সত্যের প্রতি আস্থাবান

হওয়া; দ্বিতীয়—কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা, তৃতীয়—কর্ম্মযোগের পবিত্রতা। সত্য কথা বলা, সত্য ব্যবহার এবং সত্য প্রচার করাই মানবজীবনের প্রধান ধর্ম্ম। ইহা নূতন কথা না হইলেও, তিনি ইহাতে এক নূতন শক্তি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য প্রতিপালন করার জন্য সকল প্রকার বাধা বিপত্তিকেই তুচ্ছ করা উচিত; প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক হইলে, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। ভগবান কাহাকেও অলসভাবে জীবন যাপন করিতে প্রেরণ করেন নাই। সকলেরই কোন না কোনরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে। যে কৃষক নিজ পরিশ্রমের দ্বারা সংসারের কতিপয় লোকেরও গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেয়, তাহার জীবনও পবিত্র। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে সত্যের মহিমা কিরূপ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত পংক্তি কতিপয় পাঠে অনুভূত হইবে।

"I have had but one thing to say from beginning to end of them, and that was, that there was no other reliance for this world or any other but just the truth and that if men did not want to be doomed to all eternity they had best give up lying and all kinds of falsehood."

কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"All true work is sacred, in all true work, even if it be but true hard-labour, there is something of devineness."

পৃথিবীতে যাঁহারা সত্যতা, বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবলে মানবসমাজের নেতা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্মান (পূজা) করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য বিশেষ, ইহাও কার্লাইলের অন্যতম শিক্ষা। ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা প্রবন্ধান্তরে লিখিবার অভিপ্রায় রহিল।

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সহধর্ম্মিণী।

১

তুমি প্রভো! দেবতার মত,
দূরে, ঊর্দ্ধে থাক গো বসিয়া,
যাহা কিছু সত্যধর্ম্ম, পবিত্রতা, পুণ্যকর্ম্ম,
অবিরত থাক্ সবি
তোমাতে মিশিয়া।

২

প্রভাতের কনক তপন
উজলিবে তব জ্যোতিঃ নিয়া,
তোমারি পবিত্র গন্ধে, বায়ু ব'বে সদানন্দে,
গাহিবে তোমারি গাথা
কোকিল পাপিয়া।

৩

ভাসিবে তোমার মধুরতা,
চাঁদের মধুর জোছনায়,
গোলাপ,যূথিকা, বেলা, খুলিতে রূপের মেলা
তোমারি লাবণ্য, হাসি,
ছড়াবে ধরায়।

৪

তোমারি স্নেহের ধারা বহি
কুলু কুলু তটিনী চলিবে,
প্রসন্ন হৃদয় তব, সদা হয়ে অভিনব,
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, প্রেম
মোরে শিখাইবে!

৫

তোমাময় আনন্দ-ভবনে
আনন্দে করিব আমি বাস,
পূজি ও অমর কান্তি, পাব সত্য, সুখ, শান্তি,
র'ব না এমন তুচ্ছ
কামনার দাস!

৬

দূরে যাবে ক্ষুদ্রতার ধ্যান,
মহাভাবে পূরিবে হৃদয়,
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর, ভুলিব আপন পর,
স্বার্থের বন্ধন ছিঁড়ি
হব বিশ্বময়!

৭

যাবে চলি শত্রু মিত্র বোধ,
ভাই বোন হইবে সকলে,
হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, যাইব চরণে দলি,
অনাথে বাঁচাতে, সুখে
পশিব অনলে।

৮

চাহিব না মোর তরে আর,
হীরক, মুকুতা, যশঃ, মান,
মানিব না নিন্দা স্তুতি, অকৃপা, সহানুভূতি,
সবি লব শিরে, ভেবে
বিধাতার দান!

৯

যাহা কিছু দেবতার কাজ,
তাতেই হইবে মোর প্রীতি,
"এ জনম বৃথা নয়, সদানন্দ ব্রহ্মময়"
বাজিবে হৃদয়-বীণে
এ মহতী গীতি!

১০

নিরখিব—সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া
দেবত্ব মাখানো ও আনন,
তখনি পড়িবে মনে, জন্মিয়াছি শুভক্ষণে,
ধন্য বিধাতার দান
ধন্য এ জীবন।

১১

এই রূপে বহু দিন গেলে
এক দিন আসিবে সময়,
নীরব নির্জ্জন গেহ, নাহি সেথা আর কেহ,
তুমি আমি আছি শুধু
নির্ম্মুক্ত নির্ভয়!

১২

শ্রান্ত শির রাখি তব কোলে,
ধীরে ধীরে করিব শয়ন,
সহসা সুহৃদ্ বেশে, আমারে ডাকিবে এসে,
স্নেহময়, সুখময়
মধুর মরণ।

১৩

তোমার আদর টুকু লয়ে
অবসাদে নয়ন মুদিব,
তার পরে?—প্রাণাধিক! বলিতে পারিনা ঠিক,
হয় তো দুজনে মিশি,
একই হইব।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

দর্শনশাস্ত্রে মতভেদের কারণ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দর্শন শাস্ত্রে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সেই বিভিন্ন মত শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহার বিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

(ক) পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে জগৎ (ক) জীব (খ) ও ঈশ্বর (গ) এই তিন কোণ বিশিষ্ট ক,খ,গ ত্রিভুজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে। দর্শনের প্রথম আলোচনায় বিষয় জগৎ তত্ত্ব। জগৎ সম্বন্ধে জগৎনাস্তিবাদ ও জগৎ অস্তিবাদ প্রচলিত আছে। জগৎ নাস্তিবাদ মধ্যে

মায়াবাদ, শূন্যবাদ, ও বিজ্ঞানবাদ প্রধান। জগৎ অস্তিবাদ সম্বন্ধে দর্শনের আলোচ্য বিষয় জগতের উপাদান তত্ত্ব। জগতের সৃষ্টি-লয় তত্ত্ব ও দেশ কাল তত্ত্ব ও জগতের নিমিত্ত-কারণ তত্ত্ব। জগতের উপাদান সম্বন্ধে পরমাণুবাদ, শক্তিবাদ, ব্রহ্ম-উপাদান বাদ, শূন্যবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদ অথবা সৎকারণবাদ (বিবর্ত্তনবাদ), সৎকার্য্য-বাদ ও অসৎকার্য্যবাদ, এই কয়টী বাদ প্রধানতঃ প্রচলিত আছে। জগতের সৃষ্টি লয় সম্বন্ধে (১) জগতের নিত্যত্ববাদ (২) উপাদান কারণ হইতে সৃষ্টি ও উপাদানে লয় বাদ, এবং (৩) শূন্য হইতে সৃষ্টি ও শূন্যে লয় বাদ অথবা জ্ঞানে জগতের সৃষ্টি লয় বাদ প্রচলিত আছে। দেশ কাল সম্বন্ধে (১) ইহাদের নিত্যত্ব ও জ্ঞানের বাহিরে অস্তিত্ববাদ এবং (২) ইহাদের জ্ঞানের বাহিরে অনস্তিত্ববাদ, এই উভয়বাদ প্রচলিত আছে। নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে জগতের স্বতঃ নিয়ন্তৃত্ব ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়ন্তৃত্ব, এই দুই মত প্রচলিত আছে।

(খ) আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দর্শনের আলোচ্য বিষয় (১) আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব (২) জ্ঞানতত্ত্ব ও (৩) পরকাল তত্ত্ব। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে (১) দেহাত্মবাদ, (২) চৈতন্যাত্মবাদ, (৩) বিজ্ঞানাত্মবাদ, (৪) ব্রহ্মাত্মবাদ ও (৫) শূন্যাত্মবাদ এবং (৬) অজ্ঞেয়াত্মবাদ প্রচলিত আছে। জ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ জ্ঞানকে বুদ্ধির স্বরূপ ও প্রমাণজ বলিয়া থাকেন, কেহ তাহাকে স্বতঃসিদ্ধ, বুদ্ধি ও প্রমাণের অতীত অমানুষী ও ব্রহ্মের চৈতন্যের স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরকাল তত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ পরকাল স্বীকার করেন না, কেহ স্বীকার করেন। যাঁহারা পরকাল স্বীকার করেন, তাঁহারা হয় জীবের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, কিম্বা সৃষ্টির পর জীবের অনন্তকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করেন। পরকাল সম্বন্ধে স্বর্গ নরকবাদ ও কর্ম্মফলানুসারে জীবের গতি বা জন্মান্তর বাদ এবং মুক্তিবাদ প্রচলিত আছে।

(ক, খ) জগৎ ও দেহের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ বা জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ইন্দ্রিয় পথ দিয়া জগতের ব্যাপার জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়, আর ষষ্ঠ বা আন্তর ইন্দ্রিয় মনঃপথ দিয়া দেহের ব্যাপার জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। এই বহিঃপ্রাপ্ত জ্ঞানের কারণ। কেহ বলেন, জ্ঞান আপনার ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া বিষয়াকারা হইয়া বিষয়জ্ঞান লাভ করেন। ইহা অন্তঃপ্রাপ্ত। অর্থাৎ কাহারও মতে এই বহিঃপ্রাপ্ত হইতে বিষয় জ্ঞান হয়, কাহারও মতে অন্তঃপ্রাপ্ত হইতে এই বিষয় লাভ হয়। কেহ বলেন, বাহ্য হইতে এক প্রবাহ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া অন্তরে আসে, আর যুগপৎ সেই সময়ে আন্তর প্রবাহ বাহিরে আসে। এই দুই প্রবাহের সম্মিলনে বা যুগপৎ আঘাত হইতে জ্ঞান বিষয়াকার হয়। এইরূপে এই বিষয় ও বিষয়ীর এই 'অহং' ও 'ইদং' এর সহজ কথায় এই জগৎ ও জ্ঞাতার সম্বন্ধ বিষয়ে উক্ত তিন রূপ মত প্রচলিত আছে। (১)

---

(১) There are three hypotheses concerning the intercourse of the soul and the body, or concerning the operation of the one in the other, and with the other The first is called physical influx, the second spiritual influx, and the third pre-established harmony No fourth hypothesis can be framed For either the soul must operate on the body, or body on the soul or both reciprocally

Swedenburg "On Intercourse between the Soul and the body" গ্রন্থ হইতে

পারিলে, তাঁহাদের আলোচিত বিষয় আমরা সম্পূর্ণরূপে সহজেই বুঝিতে পারিব। তাহা হইতে সকল রূপ দর্শন মত বুঝিবার একটা মূল সঙ্কেত ধরিতে পারিব।

বলিয়াছি যে, এই সমস্ত প্রভেদের প্রথম কারণ আলোচনা কেন্দ্রের পার্থক্য। কোন দার্শনিক জগৎ কেন্দ্র হইতে তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে সকল সত্য উপলব্ধি হয়, সেই সত্যকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা অন্যান্য তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্ধারণে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ জগৎ হইতে ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করেন, এবং জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ও জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থির করিতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ (ক) কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা (খ), (গ) এবং (ক খ) ও (ক গ) তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেননা, জগৎ জ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞানে বা ঈশ্বর জ্ঞানে যাইবার জন্য তাঁহারা কোন দৃঢ় সেতু সন্ধান করিয়া পান নাই। তাঁহারা ঈশ্বর তত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য, উপাদান ও নিমিত্ত কারণের শেষ সীমায় গিয়া এক আদি কারণ অনুমান করিয়া লইয়া তাহা হইতে ঈশ্বর সিদ্ধি করেন; অথবা এই নিয়মিত জগতের নিয়ন্তৃত্ব কল্পনা করিয়া, তাহা হইতে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞানময় ঈশ্বরের সন্ধান করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইহাকেই cosmological and teleological proof বলে

যাঁহারা আত্মকেন্দ্র করিয়া জগৎ আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন যে, জগতের এই নিয়ম শৃঙ্খলা ও সত্তা সকলই ত আমাদের নিজ চৈতন্যের বিষয়—তাহা হইতেই উহা বাহিরে প্রতিবিম্বিত। আমাদের অন্তঃকরণের স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার হইতেই এই নিয়ম শৃঙ্খলা ও সত্তা অনুমান করিয়া লই। সুতরাং জগতের নিয়ম জ্ঞান বা সত্তা জ্ঞান প্রকৃত আমার আন্তরিক সংস্কারের অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং বাহ্য জগৎ হইতে স্বতঃ এই নিয়ম বা সত্তা পাওয়া যায় না; কাজেই ঈশ্বর তত্ত্বেও উপনীত হওয়া যায় না। আমরা জ্ঞানে যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ধারণা করিতে বাধ্য হই—সসীম হইতে অসীমের সিদ্ধান্ত করিতে যেমন বাধ্য হই—সেইরূপ জ্ঞানেই আমরা জগৎ কল্পনা করিয়া তাহার নিয়ন্তা ও উপাদান ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হই, এই মাত্র। অতএব সকল প্রকারেই জ্ঞানে ব্রহ্ম ধারণা করিতে বাধ্য হই। আমাদের ও জগতের আধার কল্পনা না করিয়া জগতের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার স্থানই হয় না। এইরূপ যুক্তি ontological proof। ইহা ছাড়িয়া কেবল cosmological or teleological proof প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু কোন প্রমাণ বলে তাঁহারা জগত হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত যাইতে পারেন না, এই প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না, তাহা মহর্ষি কপিল সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। সে সিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত অখণ্ডিত আছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জগৎ তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা কেবল বিষয় জ্ঞান হইতে আমরা "কারণ সূত্র" ধরিতে পারি না। কেন ধরিতে পারি না, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম, ক্যাণ্ট, প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। এইজন্য দর্শনে অজ্ঞেয়তা বাদ ও নাস্তিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। জগত আলোচনা দ্বারা কোন দার্শনিক অখণ্ডিত যুক্তি বলে পরমাণু বা শক্তিতত্ত্বের

বাহিরে যাইতে পারেন নাই। বিজ্ঞান বাহ্য বিষয় আলোচনা করিয়া অবশেষে এই পরমাণু ও শক্তিবাদে আসিয়াছে, ইহার বাহিরে যাইতে পারে নাই। আর এই আলোচনা হইতে যাঁহারা দর্শন তত্ত্ব মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা এই শক্তি ও পরমাণুকে মূল ধরিয়া, অনুলোম যুক্তি বলে, ইহা হইতে এই বাহ্য জগত তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইঁহারাও শক্তি ও পরমাণুর বাহিরে আর কিছু ধরিতে পারেন নাই। তবে কেহ কেহ বিজ্ঞান সীমা ছাড়াইয়া গিয়া কেবল শক্তিতত্ত্বে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। তাহার পরে আর যাইতে পারেন নাই।

এই জগৎ তত্ত্ব হইতে আত্ম তত্ত্ব আলোচনায়ও সেইরূপ অসুবিধা হইয়াছে। কেননা, জগৎ তত্ত্ব হইতে আত্ম তত্ত্বে উপনীত হইবার কোন দৃঢ় সেতু পাওয়া যায় না। বাহ্য জগৎ কেন্দ্র ধরিলে এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়। স্থানব্যাপী বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে পতিত হয় ও এই মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষে জ্ঞান জন্মে। সুতরাং এই জ্ঞাতার অস্তিত্ব মস্তিষ্কের বাহিরে নাই, ইহারা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হন। এইজন্য এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ জড়বাদী। ইঁহারা জড়াতিরিক্ত আত্মবাদী হইতে পারেন না। সম্প্রতি জড় শক্তির ন্যায় পরমাণুর ক্রিয়া বিশেষ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, ইঁহারা এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। এই জন্য ইঁহারা আত্মা সম্বন্ধে দেহাত্মবাদী বা জড়বাদী। যাঁহারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন, তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহার বাহিরে কোন সিদ্ধান্তে ইঁহারা উপনীত হইতে পারেন না।

জ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধেও ইঁহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান নাই। বুদ্ধির অতিরিক্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। ইঁহারা বহিঃস্রোত হইতে বাহ্য জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি ও অন্তঃস্রোত ইঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল দার্শনিক জগৎ কেন্দ্র হইতে তত্ত্বালোচনা করেন, তাঁহারা, হয় জড়বাদী, না হয় নাস্তিবাদী, না হয় অজ্ঞেয়বাদী। এ সকল দার্শনিক যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্বে উপনীত হন, বলিয়াছি—সে সকল প্রমাণ সমালোচনায় টিকে না—কাজেই জগত হইতে ব্রহ্ম বা আত্মা কোন তত্ত্বেই পৌঁছান যায় না। সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের শেষ সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহা আমরা এইরূপে অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

এইরূপে যখন জগৎ কেন্দ্র হইতে জ্ঞানালোচনা করিয়া জড়বাদে বা অজ্ঞেয়তাবাদে, কি নাস্তিবাদে উপনীত হইতে হয়, যখন আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা এইরূপে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া একরূপ হতাশ হইয়া পড়িতে হয়,(১) তখন দার্শনিক পণ্ডিত অন্যান্য আলো-

(১) এই কথা পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি বেশ বুঝা যাইবে। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী অথবা শক্তিবাদী। তিনি বলিয়াছেন—

"There is no pleasure in the consciousness of being an infinitesimal bubble on a globe that is itself infinitesimal compared with the totality of things. Those on whom the unpitying rush of changes inflicts suffering which are often without remedy, find no consolation in the thought, that they are at the mercy of blind forces, which cause indifferently now the destruction of a sun, and now the death of animalcule. Contemplation of a universe which is without conceivable beginning or end and without intelligent

চনা কেন্দ্র অনুসন্ধান করেন। সেই সময় আত্মতত্ত্ব অথবা জ্ঞানতত্ত্ব আমাদের আলোচনা কেন্দ্র হয়। তখন আত্ম তত্ত্বানুসন্ধানে ও তাহা হইতে জ্ঞানানুসন্ধানে চেষ্টা হয়। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বলে জ্ঞাতা বা বিষয়ী স্বরূপে তাহাতে যে সত্তা প্রতিভাত হয়, সেই সত্তা অবলম্বন করিয়াই তত্ত্ব আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্ব হইতে জগৎতত্ত্ব (ক) ব্রহ্মতত্ত্ব (গ) আত্মার ও জগতের সম্বন্ধ তত্ত্ব (খ ক) ও আত্মা ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ তত্ত্ব (খ গ) আলোচনা করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন জগৎতত্ত্ব হইতে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আসিতে পারা যায় না, সেইরূপ, আত্মতত্ত্ব হইতেও জগত তত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া সহজ হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সকল দার্শনিকের সমান মত নহে। সুতরাং এই আত্মাকেন্দ্র সকলের সমান হয় না। কেহ মনে, কেহ বুদ্ধিতে এবং কেহ জ্ঞানে এই আত্মাকেন্দ্র অনুসন্ধান করেন। মনে কেবল দৈহিক ও প্রাণ ক্রিয়ার অনুভূতি হয়। যাঁহারা সেই অনুভূতি স্বরূপকে আত্মা মনে করেন, তাঁহারা আত্মকেন্দ্র অবলম্বনে কি বাহ্য জগৎ, কি আত্মা, কি ঈশ্বর কোন বিষয়েই তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইঁহারা অবিশ্বাসী, নাস্তিক, ক্ষণিক বাদী, বা শূন্যবাদী হইয়া পড়েন। যাঁহারা বুদ্ধিকে বা বুদ্ধিতে অনুভূত বিজ্ঞানকে আত্মকেন্দ্র বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী হইয়া পড়েন—অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতে যে অনুভূতি প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহার মধ্যে কোন সূত্র খুঁজিয়া পান না, সুতরাং প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে তাঁহারা সমর্থ হন না। এইরূপ আত্মকেন্দ্রের পৃথক্ ধারণা হইতে সেই কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া যে সকল দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহা পৃথক্ হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, এই বিষয়াকারা বা অনুভূতি-প্রধান আত্মকেন্দ্র অবলম্বন করিয়া কোন দার্শনিকই দৃঢ় প্রমাণ বলে জগত তত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। বিষয়াকারা জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যে বাহ্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব আমাদের জ্ঞানে পতিত হয়, অথবা জ্ঞান বাহ্য বিষয় ধারণা করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্মুখী হইয়া যে বিষয়রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিষয়াকারা জ্ঞান। এইরূপ মনে যে সকল সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্মাদি অনুভূত হয়, তাহারও প্রতিবিম্ব বা ছাপ জ্ঞানে গিয়া পতিত হয়—অথবা জ্ঞান সেইরূপ অনুভূতির আকার ধারণ করে। জ্ঞানে এইরূপে সর্ব্বদা এই বিষয় বা অনুভূতি ধারণা থাকে। জ্ঞানের ইহাই জ্ঞেয়। জ্ঞান যদি কোনরূপে এই জ্ঞেয় বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞাতাকে এই জ্ঞেয় বিষয় করিতে পারে, অর্থাৎ কেবল বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে, তবেই প্রকৃত আত্মকেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের এই বিষয়াকারা ও অনুভূতি আকার অবস্থা দূর করাকেই অজ্ঞান দূর করা বলে।

---

purpose yeilds no satisfaction The desire to know what it all means, is no less strong in the agnostic than in others, and raises sympathy with them Failing utterly to find any interpretation himself, he feels a regretful inability to accept the interpretation they offer.

Fortnightly Review, June, 1895

যাহা হউক, একত্র এ স্থলে আলোচ্য নহে।

এখন সাধারণতঃ যাহাকে অহংতত্ত্ব বা আত্মা বলে, সেই 'অহং' কেন্দ্র স্বরূপ ধরিয়া, তাহা হইতে 'ইদং' বা বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা এই সময় দর্শনের বিষয় হয়। জগৎ হইতে আত্মা অনুসন্ধানকে 'ইদং' হইতে 'অহং' তত্ত্বের অনুসন্ধান অথবা বিষয় হইতে বিষয়ীর অনুসন্ধান বলা যায়। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব হইতে জগৎ বা ঈশ্বর অনুসন্ধান—অহং হইতে ইদংএর বা বিষয়ী হইতে বিষয়ের, অথবা জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় বস্তুর অনুসন্ধান বলা যায়। পূর্ব্বে যেমন দেখা গিয়াছে, যে 'ইদং' ও 'অহং' এরূপ সেতু পাওয়া যায় না—যাহা দ্বারা জগৎ হইতে আত্মতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করা যায়, সেইরূপ 'অহং' ও ইদং এর মধ্যে এমন কোন সেতু পাওয়া যায় না, যাহা হইতে আত্মতত্ত্ব হইতে জগৎতত্ত্বে [illegible]ত হওয়া যায়। এই জন্য এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ মায়াবাদী, কেহ (বৌদ্ধ) বিজ্ঞানবাদী হইয়া পড়েন। আধুনিক অধিকাংশ জর্ম্মাণ দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অতএব আমরা এই যে দ্বিতীয় আলোচনা কেন্দ্র বা জ্ঞান কেন্দ্রের কথা বলিলাম, এই কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া দার্শনিকগণ মায়াবাদী, কেহবা স্বপ্নবাদী, কেহবা বিজ্ঞানবাদী, কেহবা অজ্ঞেয়তা বাদী হইয়া পড়েন। আর এই আত্মকেন্দ্র হইতে যেমন জগৎতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না, সেইরূপ ইহা হইতে একরূপে ব্রহ্মতত্ত্বেও উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। কেন না, বিষয়াকার জ্ঞানের সহিত অথবা অনুভূতি আকার জ্ঞানের সহিত, বিজ্ঞান বা প্রমাণাকার জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বা দৃঢ় সেতু মিলে না। অতএব এইরূপ আত্মকেন্দ্র অবলম্বন করিয়াও দর্শন জ্ঞানের শেষ সীমায় যাইতে পারে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। পূর্ব্বে যেমন জগতকে ধরিতে গিয়া আত্মা তাহার সিদ্ধান্তের বাহিরে লুক্কায়িত হইয়াছিল, তেমনি আত্মাকে ধরিতে গিয়া জগৎ তাহার জ্ঞানের বাহিরে গিয়া পড়িল।

এইরূপ বিষম সমস্যায় পড়িয়া দার্শনিক পণ্ডিত অন্য কেন্দ্র অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। কেহ দর্শন ছাড়িয়া দিয়া আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ বিশ্বাসবান হইতে চেষ্টা করেন, অনুসন্ধানেচ্ছা ত্যাগ করেন।(১) কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক অন্য পথ দেখিতে চেষ্টা করেন। পূর্ব্বে যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, এইরূপে সেগুলি

(১) জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্টে তাঁহার "Vacation of man" নামক গ্রন্থে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Thou didst desire *to know*, and thou hast taken a wrong road ..what has its origin in and through knowledge is merely knowledge. All knowledge, however, is but pictures representations, and there is always something wanting in it that which corresponds to the representation. This want cannot be supplied by knowledge .. But in vain wouldst thou labour to create this reality lying beyond mere appearance) by means of thy knowledge, or out of thy knowledge or to embrace it by thy understanding. If thou hast no other organ by which to apprehend it, thou will never find it..

* * *

It is *Faith*. . . which first lends a sanction to knowledge and raises to certainty and conviction that which without it might be delusion. It is not knowledge but a resolution of the will to admit the validity of knowledge."

সম্প্রতি বালফোর সাহেব তাঁহার Foundations of Belief নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"Out of the depths of unfathomable mystery there emerges the certitude of religion."

স্থির হইয়া গেলে, অন্য শাখার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। (২)

... এইরূপে বর্ণনে ব্রহ্ম কেন্দ্র অবলম্বিত হয়। এই ব্রহ্মকেন্দ্র কি, তাহা এস্থলে বুঝিতে হইবে। এক ভাবে ধরিলে এই ব্রহ্ম কেন্দ্রকে, আত্ম কেন্দ্রের অন্তর্গত বলা যায়। কেন না, জ্ঞানরূপ আত্মার অজ্ঞানাবরণ মোচন করিতে করিতে জ্ঞানের বন্ধনগ্রন্থি উন্মোচন করিতে করিতে কখন কখন আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায়ামুক্ত হয়। তখন আত্মাতে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকে না (১)। অহং ও ইদং ভাবই জ্ঞানের প্রথম বন্ধন, ইহাই আত্মার বিজ্ঞান বন্ধন (বা বিজ্ঞানময় কোষ), তাহার পর দিক্ কাল কারণ সূত্রের বন্ধন, আত্মার দ্বিতীয় বন্ধন (বা মনোময় কোষ, তাহার পর কর্ম্ম বন্ধন ও বাসনা বন্ধন (প্রাণময় কোষ), ইহাই আত্মার শেষ বন্ধন। যখন সাধনাবিশেষ বলে এই সকল বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়, তখন বন্ধন গ্রন্থিগুলি একে

---

(২) এই জ্ঞেয় জড় অথবা জ্ঞাতা অহং কেন্দ্র করিয়া যে কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না, তাহা জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুকরণে বড় সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব বা ব্রহ্মতত্ব ধারণা করিতে না পারিলে, কোন সিদ্ধান্তই হইতে পারে না। সপেনহরের সেই কথা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

জ্ঞাতা—আমি আছি ; আর কিছু নাই, এ জগৎ আমারই সংজ্ঞা মাত্র।

জড়—কি আর দাম্ভিকতা। কেবল আমিই আছি, আর কিছু নাই। এজগৎ আমারই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপ বা মূর্ত্তি মাত্র। তুমিও আমার এক বিশেষ অকস্মাৎ উদ্ভূত রূপ মাত্র।

জ্ঞাতা—কি বাতুলের গর্ব্ব। আমি না থাকিলে তুমি ও তোমার ও মূর্ত্তি কোথায় থাকিত। আমার দ্বারা তুমি সীমাবদ্ধ। আমার সংজ্ঞার বাহিরে তোমার অস্তিত্ব অসম্ভব। আমার জ্ঞানের মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব।

জড়—তোমার এ দাম্ভিকতা এখনি নিবৃত্ত হইবে। আর কয় মুহূর্ত্ত। তাহার পর তুমি কোথা থাকিবে। কিন্তু আমি অনন্তকাল থাকিব। দেখ, আমার এ নিত্য রূপ পরিবর্ত্তন লীলা অটুট থাকিবে।

জ্ঞাতা—অনন্ত কাল, অনন্ত স্থান আমারই ত সংজ্ঞামাত্র। ইহারা আমার জ্ঞানের আকার বিশেষ—ইহাতেই তোমার অস্তিত্ব। আর যে বিনাশের কথা বলিয়া আমার ভয় দেখাইতেছ, সে বিনাশ আমাকে স্পর্শ করে না। তাহা যদি হইত, তবে তোমারও বিনাশ হইত। ব্যক্তি বিশেষের বিনাশ আছে—তাহারা আমার রথ বা (ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়) মাত্র। ইহাও আমার সংজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জড়—কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্বেই তোমার অস্তিত্ব। সে অস্তিত্ব আমারই অধীন। কেন না, জ্ঞেয় আছে বলিয়াই তুমি জ্ঞাতা। সেই জ্ঞেয়ই আমি। আমি এই জ্ঞেয়েরই সার, আমার বা নিত্য উপাদান। আমি না থাকিলে ইহা অসৎ ও ব্যক্তি বিশেষের স্বপ্ন মাত্র হইত। ইহার এই মায়িক আবরণও আমা হইতে গৃহীত।

জ্ঞাতা—আমার সহিত যেমন ব্যক্তির সম্বন্ধ, তোমার সহিতও তেমনি রূপের সম্বন্ধ। রূপ ব্যতীত তুমি প্রকাশিত হইতে পার না। কেহ কখন আমার বা তোমার স্বরূপ দেখে নাই। কেন না, আমরা উভয়েই নামরূপ মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, একই সত্তা আছে। তিনি আপনিই দ্রষ্টা—আপনিই দৃষ্ট হন (ব্রহ্ম), কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ দ্রষ্টা বা দৃষ্ট রূপে নিবদ্ধ নহে। কেন না, সেই একই সত্তা—আমাদের এই উভয় রূপে বিভক্ত।

উভয়ে—তবে আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। একেরই দুই অংশ মাত্র। কেবল ভ্রান্তি হইতেই আমাদের পার্থক্য ও বিরুদ্ধ কল্পনা। একে অপরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া নিজেরই অস্তিত্ব হারায়, তাহা বুঝে না।

World as will and I...ea Vol. II, Ch. I.

একে উদ্ঘাটিত হয়, তখনই আত্মা পূর্ণমুক্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে। এই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান ও ব্রহ্মে অবস্থান একই কথা। এই সময় অহং ইদং ভেদ থাকেনা(১) অহং ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না—জীবে জীবে ভেদ থাকে না। সকল পরিচ্ছেদ দূর হয়। সেই জন্য জ্ঞানের এই অবস্থাকে পূর্ণমুক্ত ব্রহ্মাবস্থা বলে। যদি কখন দর্শন এই কেন্দ্র পাইয়া তাহা অবলম্বন করে, তবেই তাহাতে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিভাত হয়।

এই ব্রহ্ম কেন্দ্র হইতে বা 'অহং ও 'ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উপরিস্থ কেন্দ্র হইতে জ্ঞানালোচনার ফল অদ্বৈতবাদ। মায়া আবরণ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে তবে যে এই ব্রহ্মকেন্দ্র বা প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হয়, তাহা প্রথম বেদান্তদর্শনেই মীমাংসিত হইয়াছিল। আর তাঁহার পর যাঁহারাই এই কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্ত দর্শন হইতেই ইহার মূল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (১)

এইরূপ ব্রহ্ম কেন্দ্র অবলম্বন করিতে পারিলে, তাহা হইতে সহজেই জগত তত্ত্বে ও আত্ম তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। (২) অদ্বৈত জ্ঞানে কোন তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে না। এই জন্য উপনিষদে আছে—

"এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি।"

সত্য বটে পারমার্থিক ভাবে—অর্থাৎ অহং ও ইদং জ্ঞানের অতীত অবস্থায় জগৎও জীব মিথ্যা হইয়া যায়—অর্থাৎ তাহার স্বতন্ত্র জ্ঞান থাকে না—কেননা, তখন জ্ঞানের জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে অর্থাৎ যতদিন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব থাকে, ততদিন জগৎ সত্য, ইহা মিথ্যা বা স্বপ্ন নহে, ইহা আত্মার কল্পনা বা বিজ্ঞান বিশেষ নহে ইহা সিদ্ধান্ত হয়। (৩)

এক্ষণে দর্শনে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ আমরা আলোচনা করিব। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশ্য ও গতির পার্থক্যই এই মত ভেদের দ্বিতীয় কারণ। কিন্তু উদ্দেশ্যে দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ আলোচিত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। এক্ষণে দর্শন শাস্ত্রের গতি কোন্ দিকে, তাহাই দেখা যাউক। এই গতি অবশ্য উদ্দেশ্য অনুসারেই নিয়মিত হয়। দর্শন

(১) জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন,

"It is *Maya* which blinds the eye of mortals and makes them behold a world which they cannot say either that it is, or that it is not *i e*, the world as idea subject to the principles of sufficient reason" (Viz (1) the principle of sufficient reason of being—time and space, (2) the principle of sufficient reason of becoming causation, (3) the principle of sufficient reason of willing, and (4) the principle of sufficient reason of knowledge)."

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—,

"If that veil of *Maya*—the *principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all beings his own inmost true self."

(২) "God' says prof Caird, is the unity of subject and of object"

"The world is inevitably conditioned through the subject and exists only for the subject Berkley first ennunciated it This is the fundamental tenet of vedanta of Vysa (World as Will and Idea Vol I. 31)."

সপেনহর অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"The truth which Kant propounded and is here quite differently presented, is also a leading doctrine of the Vedas and Purans—the doctrine of Maya by which really nothing else is understood than what Kant calls phenomenon in opposition to the thing-in-itself."

(৩) সপেনহর বলিয়াছেন,—

"True *idealism* is not empirical but transcendental. It does not deny the empirical reality of the external world."

শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান, ধ্যান। শেষ উদ্দেশ্য, জ্ঞানকে অজ্ঞানাবরণ হইতে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য ধরিয়া দর্শন একত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই একত্বের দিকে দর্শনের গতি হয় বটে, কিন্তু সকল দার্শনিক এই একত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন না। জ্ঞানের প্রথম সোপানেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। জ্ঞাতা এক, কিন্তু জ্ঞেয় বহুরূপ। জ্ঞাতার স্বরূপ বা প্রবৃত্তি একত্ব দর্শন—জ্ঞেয়ের স্বরূপ নানাভাবে ও বহুরূপে জ্ঞাতার নিকট প্রকটিত হওয়া। দর্শনের চেষ্টা এই জ্ঞাতার একত্ব হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের একত্ব সিদ্ধান্ত করা। এইরূপ জ্ঞান চেষ্টা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা এই জন্য একটী বিশেষ ঘটনা বা কার্য্য দেখিয়া তাহার সাধারণ নিয়ম অনুমান করিয়া লই। একটী বস্তু দেখিয়া বা কোন গুণ বিশেষ ধারণা করিয়া তাহা হইতে তাহার জাতি ধারণা করি। একটী ব্যাপারে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, সেই সম্বন্ধ নিত্য ও তাহার নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা ধারণা করিয়া লই। আমাদের ব্যাপ্তি জ্ঞান জ্ঞানের এই স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বা প্রবৃত্তি হইতে জাত। ইহা হইতেই আমরা প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা ধারণা করি। ইহা হইতেই আমাদের জাতি জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। চলিত কথা আছে—গৃহদাহ-পীড়িত গরু লাল মেঘ দেখিলা ভীত হয়। কেন না, রক্তাভার সহিত তাহার দাহ ক্লেশের নিত্য সম্বন্ধ তাহার ধারণা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে জ্ঞানে আমরা বহুর তত্ত্ব একের অন্তর্গত করিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টার ক্রমবিকাশ দ্বারা আমরা অবশেষে বহুত্ব হইতে একত্বে উপনীত হই।

সুতরাং জ্ঞানের পরিসর যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই বহুত্ব জ্ঞান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসে। বিভিন্ন দ্রব্য হইতে তাহাদের জাতিতে একত্ব ধারণা হয়—তাহার পর সেই জাতির জাতি ধারণা হয়। এইরূপে জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতেও আমরা ক্রমশঃ একত্বের দিকে অগ্রসর হই। বাহ্য বিজ্ঞান এইরূপে বস্তুবিচার করিয়া একত্বের দিকে প্রতিলোম যুক্তি বলে অগ্রসর হইতে থাকে। বিজ্ঞান কখন পূর্ণ একত্বে যাইতে পারে না। যে সকল দার্শনিক এই বিজ্ঞান আবিষ্কৃত পথের পথিক, অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানতঃ বাহ্য জগতকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানালোচনা করেন, তাঁহাদের গতি এই বিজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তথাপি ইঁহারাও একরূপ একত্ব ধরিয়া লন, আর দর্শনের গতি যে একত্ব স্থাপনের দিকে, তাহা বুঝিতে পারেন। (১)

যাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে জ্ঞানালোচনা করেন, বলিয়াছি তাঁহারা জগত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন না, তাঁহারা জগৎকে মিথ্যা, ছায়া, স্বপ্ন, ছায়াবাজী বা ইন্দ্রজাল অথবা বিজ্ঞানপ্রবাহ কিম্বা জ্ঞাতার অজ্ঞান এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং ইঁহাদের একত্ব সিদ্ধান্তও ঠিক হয় না। কেবল যাঁহারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক করিয়া ব্রহ্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন, তখনই প্রকৃত একত্ব সিদ্ধ

---

(১) এই জন্য পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন—

"Science is partially unified knowledge, philosophy is completely unified knowledge."

স্পেন্সর বৈজ্ঞানিকদের পথ অনুসরণ করিয়া শক্তিবাদে (Eternal & inexhaustible energy বাদে) উপনীত হইয়া এই একত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

হয়। জ্ঞানের পরিণত পূর্ণ বৃদ্ধি হইলে দ্বৈত আর থাকে না। তখন মায়া আবরণ দূর হইয়া যায়—বহুত্ব প্রতিপাদক অজ্ঞান তখন অন্তর্হিত হয়। তখন সকলই জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তখনই এই একত্ব ধারণা সম্পূর্ণ হয়। তখন—

এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং ভবতি।

এই এক বিজ্ঞানই দর্শনের শেষ পরিণতি (২) এই স্থানেই দর্শনের জ্ঞানান্বেষণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেবল বেদান্ত শাস্ত্রেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে—ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত এক বিজ্ঞান কিছুতে সম্ভব হয় না। এই জন্যও বেদান্ত শাস্ত্র সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বলিয়াছি ত, যাঁহারা কেবল জগৎ তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারাও এই একত্ব অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা জগতে এক শক্তি বা এক জড় বা একরূপ পরমাণু বা ভূতই জগতের এক মাত্র সত্তা—তাহাই জগতের এক মাত্র কারণ বা উপাদান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। (৩) কিন্তু জীবকে এই এক তত্ত্ব মধ্যে আনিতে পারেন না। সেইরূপ জীব তত্ত্ব হইতে জীব ও জগতের একত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ ব্রহ্ম তত্ত্ব হইতে সেই একত্ব সিদ্ধ হয়। বেদান্ত দর্শনে এই একত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতবাদেই এই একত্ব জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই জন্য এই অদ্বৈতবাদই দর্শন শাস্ত্রের শেষ পরিণতি। ইহার পর দার্শনিককে আর অগ্রসর হইতে হয় না। ব্রহ্ম তত্ত্বে আসিলে, প্রকৃত ব্রহ্ম বিজ্ঞানের রাজ্য আরম্ভ হয়—তখন দর্শনের কার্য্য শেষ হয়।

অতএব দেখা গেল যে, বিভিন্নরূপে এই একত্ব সিদ্ধান্তের চেষ্টা হইতেও দর্শনে বিভিন্ন মত প্রবেশ করিয়াছে। বাহ্য বিজ্ঞান হইতে, একত্ব দর্শন চেষ্টা হইতে শক্তিবাদ ও জড়বাদ বা পরমাণুবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। আন্তর বিজ্ঞান হইতে মায়াবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল ব্রহ্ম

---

(২) পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন, —

"The capacity for philosophy consists just in that in which Plato placed it—the knowledge of the One in the many, and the many in the One"

জর্ম্মান পণ্ডিত হেগেল বলিয়াছেন,—

"Philosoply is the science of the absolute in the form of dialectical development, or t[illegible] [illegible]ence of the self comprehending reason" এই উপায়ে পণ্ডিতবর হেগেল একরূপ পূর্ণ একত্ব ধারণা করিতে পারিয়াছেন।

(৩) এই জড় বা শক্তিবাদে আসিতে হইলে বিজ্ঞানকে একটী প্রধান দার্শনিক তত্ত্ব অধিকার করিয়া লইতে হয়। সেই তত্ত্বকে conservation or indistructibility of matter এবং conservation and correlation of force' অর্থাৎ জড় ও শক্তির নিত্যত্ব সিদ্ধ করিতে হয়। এই দুই তত্ত্ব প্রথমে আমাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া

দিয়াছিলেন। সাংখ্য দর্শনের 'না বস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' নাশঃ কারণলয়ঃ' প্রভৃতি সূত্র তাহার প্রতিপাদক। পণ্ডিত ফুলো[illegible] স্বীকার করিয়াছেন,

"It was in India that men first recognised the fact that force a isdistructible and eternal,"

সাংখ্য মতে 'অণু' স্বষ্ট, এই জন্য সাংখ্য দর্শন কেবল শক্তি বা প্রকৃতিবাদে উপনীত হইয়াছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানও এই শক্তি ও জড় বাদে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এস্থলে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া কঠিন। প্রথমতঃ রসায়নশাস্ত্রে জড় পদার্থ পরীক্ষা দ্বারা প্রায় সত্তরটী মূল পদার্থে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু রাসায়নিক পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এ সকল গুলিই কোন একটী মাত্র মূল পদার্থ হইতে উদ্ভূত। প্রথম ডাক্তার প্রাউট, এই মত উদ্ভব করেন। তাহার পর মহাম্ লাক্ষর পরীক্ষার দ্বারা এবং লকিয়ার সাহেব প্রাকৃতিক জগতের মূল পদার্থগুলি আলোক বিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'The elements intensely heated shall be broken up' যেহেতু, ঝাইড., স্লাক, চুনা প্রভৃতি রাসায়নিক

বিজ্ঞান হইতেই প্রকৃত একত্ব বা অদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়া যায়। কেহ কেহ জগতের ও জীবের সসীমত্ব ও জড়ত্ব বিকারযুক্ত বা পরিণামী দেখিয়া তাহা হইতে অপরিণামী নিত্য অসীমত্বের ধারণা করেন এবং এই অসীম ও সসীমের একত্ব হইতে পূর্ণ একত্ব সিদ্ধান্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে এই একত্বও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে সিদ্ধ হয়।

দর্শন শাস্ত্রে মত প্রভেদের তৃতীয় কারণ, বিভিন্ন জ্ঞাতার জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য। যাহার জ্ঞানের যেরূপ প্রবৃত্তি, যাহার বুদ্ধির যতদূর শক্তি, সে ততদূর মাত্র যাইতে পারে—তাহার অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান বিভিন্ন অজ্ঞানাবরণে আবৃত। যাহার জ্ঞানের অজ্ঞান বন্ধন যতদূর উন্মোচিত হয়, সে জ্ঞানালোচনায় তত দূর যাইতে পারে মাত্র। সকলে জ্ঞানে একত্ব ধারণা করিতে পারে না। যাহার জ্ঞানের পরিসর অধিক, সেই একত্ব ধারণা করিয়া তাহারই অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়। যে এরূপ একত্ব ধারণা করিতে না পারে, সে কোন বিশেষ তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার দর্শন নিতান্ত একদেশী ও অসম্পূর্ণ। এইরূপ আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়। সে বুদ্ধিতে কেহ একের সিদ্ধান্ত করে ও তাহাই পাইতে অগ্রসর হয়; কাহারও বুদ্ধি নানাদিকে প্রধাবিত হয়, নানা পথগামী হয়—তাহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে যাইতে পারে না। এই জন্য দর্শন শাস্ত্রে অধিকতর প্রভেদ হইয়াছে। তাহা পরে আলোচিত হইবে।

যাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত, যাঁহারা দর্শনের মূল সত্য আলোচনায় সমর্থ, তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক বলা যায়। নিম্নাধিকারীর জ্ঞান ও বুদ্ধি রাজসিক। সুতরাং আমাদের প্রকৃতি

পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে "There is but one kind of primordial atom দার্শনিক পণ্ডিত স্পেন্সর এই তত্ত্ব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

তাহার পর এই মূল পরমাণু যে নিত্য নহে, সৃষ্ট এবং ইহা যে শক্তির আধার এবং শক্তি হইতে অভিন্ন, তাহাও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্যাকসওয়েল, ফ্যারাডে, হ্যাকেল প্রভৃতি পণ্ডিতের এই মত। তাঁহারা পরমাণুগুলিকে manufactured articles, বলেন। ম্যাকসওয়েল বলিয়াছেন,—

"Science is incompetent to reason upon the creation of matter out of nothing We have reached the utmost limit of your thinking faculties, when we have admitted that because matter cannot be eternal, it must have been created"

শক্তিবাদী পণ্ডিতগণ পরমাণু গুলিকে কেন্দ্রীভূত শক্তি, বলেন। এই তত্ত্বের নাম atmo mechani

...l theory কেহ বলেন, ইহা কেন্দ্রীভূত বৈদ্যুতিক শক্তি মাত্র। ইহারা বোধ।

"We might reasonably suppose not merely that an atom *carries* an electric current, but that it is nothing else"

'Concepts of modern physics, p 22

একপকার দার্শনিক পণ্ডিত স্পেন্সর, বেন প্রভৃতিও স্বীকার করেন। Matters are *centres of forces* attracting and repelling each other in all directions"

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আকাশ বা Ether কেই জগতের মূল পদার্থ বলেন। ইহার উপরেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন্ সাহেবের Vortex theory of atoms স্থাপিত। টেট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন Material molecule is some kind of knot or coaglutination of Ether," ফ্যারাডে, হেলমহল্‌টস্, ম্যাকসওয়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, আকাশ হইতে আলোক, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। ডেকার্ট, ক্যান্ট, স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আকাশ হইতে সৃষ্টি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এইরূপে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একত্বে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ জড়বাদ (Corpuscular theory) কেহ শক্তিবাদ (Dynamical theory) বিশ্বাস করেন।

মলিন—তাহাতে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয় না। সুতরাং বিভিন্ন দার্শনিকের এই জ্ঞান ও বুদ্ধির মলিনতা হেতু তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দার্শনিক মতেরও তারতম্য হয়। এ সকল বিষয় অধিকার ভেদে আলোচিত হইবে।

গীতায় এই ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা উল্লিখিত আছে।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং।
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্।

শ্রীভগবদ্গীতা ১৮।২০।২২ শ্লোক।

সাত্ত্বিক বুদ্ধির জ্ঞেয় কি, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।

ঐ ১৩। ১২ শ্লোক।

যেরূপে অবস্থান করিলে প্রকৃত জ্ঞানে অবস্থান করা যায় ও যে অবস্থায় প্রকৃত সত্য উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় তাহাও গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।

শ্রীভগবদ্গীতা ১৩।৭।১১ শ্লোক।

গীতাতে বুদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ প্রভেদ বুঝান আছে যথা—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।

শ্রীভগবদ্গীতা ১৮।৩০।৩২ শ্লোক।

গীতায় অন্যত্র আছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।

ঐ ২।৪১ শ্লোক।

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, সাধারণত আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা অনুসারে আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির হয়। আমরা প্রায়ই এই প্রবৃত্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি অবলম্বন ও প্রতিকূল যুক্তি খণ্ডন করিয়া, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করি। একটা ইংরাজী চলিত কথা আছে, 'wish is father to the thought" অর্থাৎ বাসনাই চিন্তার জননী। তাহার পর যদি আমরা অনুকূল যুক্তি না পাই, তবে দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে আমাদের এই সকল অনুকূল সিদ্ধান্তকে বাঁধিয়া রাখি—তাহাকে সহজেই ত্যাগ করিতে পারি না। এই কথা আধুনিক পাণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। যদি অনুকূল যুক্তি না পাইয়া বাধ্য হইয়া অবিশ্বাসের মধ্যে গিয়া আমাদের পড়িতে হয়, তবে প্রায়ই আমরা অস্থির হইয়া পড়ি, চিত্ত অনুকূল হইয়া উঠে, শেষে বাধ্য হইয়া আবার বিশ্বাসের আশ্রয় লই। কচিৎ কোন ধীরচেতা লোক অবিশ্বাসের মধ্যে, অজ্ঞেয়ের মধ্যে, অস্থিরতার মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের নিজের বাসনা প্রবৃত্তি বা সংস্কার অনুসারে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তি নিয়মিত হয়। এই প্রবৃত্তি পার্থক্য জন্যও দর্শন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত প্রবর্ত্তিত হয়। কেন না, কদাচিৎ দুই এক জন মহাপুরুষই কেবল এই প্রবৃত্তির বাহিরে গিয়া, যে অন্তঃশীলা শক্তি আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তিকে নিয়মিত করে, তাহার নিগড় ভেদ করিয়া গিয়া প্রকৃত জ্ঞাতা হইয়া সত্য আলোচনা করিতে সমর্থ হন।

দর্শন শাস্ত্রে মত ভেদের চতুর্থ কারণ, প্রমাণের পার্থক্য হইতে জাত। প্রমাণ নানাবিধ। সকল দার্শনিক সকল প্রমাণ গ্রহণ করেন না। যে যেরূপ প্রমাণ অবলম্বন করে, তাহার সিদ্ধান্ত সেই রূপ হয়। এই জন্য দার্শনিক মতের পার্থক্য জন্মে। এই প্রমাণ তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সাহিত্য সংবাদ।

গঞ্জাম হইতে বস্তার ও বিন্ধ্যন গ্রাম এবং বঙ্গোপসাগর হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলে খন্দ জাতির বাস। খন্দেরা নরবলি দেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সকল খন্দ এ দোষে দোষী নহে। খন্দদের দেবতার মধ্যে বুরাপেন্নু ও তাঁহার স্ত্রী তারীপেন্নু প্রধান। স্বামী স্ত্রীতে বড় দ্বন্দ্ব। উপাসকদের মধ্যে এক দল স্বামীকে অপর দল স্ত্রীকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। তারিপেন্নুর উপাসকেরা নরবলি দেয়। বুরাপেন্নুর দল নরবলি প্রথা ঘৃণা করে এবং তাহাতে যথেষ্ট বাধা দেয়। খন্দ গ্রামে "পান" বলিয়া এক নিকৃষ্ট জাতি বাস করে। বেহারের ডোমদের উত্তর পশ্চিমের আহির দের, পঞ্জাবের জাটদের মত উড়িষ্যার "পান" দের চৌর্য্যাদি নানাবিধ দুর্নামের কথা শুনা যায়।

খন্দদের মতে এ কয়েকটী পাপকার্য্য। (১) অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা (২) উপকার স্বীকার না করা ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা (৩) মিথ্যা বলা। অতিথিকে রক্ষা করিতে মিথ্যা বলা যাইতে পারে (৪) মিত্রদ্রোহ করা (৫) প্রাচীন রীতি নীতি প্রতিপালন না করা (৬) অগম্য গমন করা (৭) এমন ঋণ করা, যাহা পরিশোধ করিতে স্বজাতি উৎসন্ন যাইতে পারে। সভ্যসমাজে স্ত্রীর ঋণের জন্য স্বামী দায়ী। মধ্য সমাজে পরিবারের যে কাহারও ঋণের জন্য সমস্ত পরিবার দায়ী, অসভ্য সমাজে জাতির যে কাহারও ঋণের জন্য সমস্ত জাতি দায়ী। (৮) যুদ্ধে কাপুরুষতা প্রদর্শন (৯) রহস্য প্রচার করা। এই কয়েকটী পুণ্য কর্ম্ম। (১) যুদ্ধে শত্রু নিপাত (২) যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন (৩) পুরোহিত হওয়া এবং তারিপেন্নুর দলে (৪) দেবতার বলি হওয়া।

কোন গ্রামের প্রতি তারিপেন্নু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে গ্রামের সকলে মিলিয়া নরবলি দেয়। রোগ বিশেষে, ব্যাঘ্র বা হিংস্র পশুর আক্রমণে বা প্রসব কষ্টে মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইলে, শস্যপক্কার মধ্যে অজন্মা হইলে, বা অনাবৃষ্টি হইলে তারিপেন্নুর [illegible]। উৎসর্গার্থে নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যকে উড়িয়া ভাষায় মেড়িয়া ও খন্দ ভাষায় টৌক্কী বা কেড়ী বলে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকল জাতির লোক বলি হইতে পারে, বর্ণ বয়স পুরুষ কি স্ত্রী বিচার করা হয় না। [illegible] হইয়া অবধি দেবতার কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, একবারের অধিক তাহাকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে না।

মেড়িয়ার সন্তান, পিতামাতা বা অভিভাবক কর্ত্তৃক দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত বা অপর জাতি হইতে ক্রীত না হইলে কেহ বলি হইতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত পানেরা অন্য জাতি হইতে বলি দিবার জন্য লোক ক্রয় বা চুরি করিয়া আনে। এক একটী পানের গৃহে এমন তিন চারিটী লোকও এক সময়ে পাওয়া যায়। উপযুক্ত মূল্য লইয়া পানেরা আপন আপন পুত্র কন্যাকেও বলি দিবার জন্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

পিতা জ্যেষ্ঠং নবিক্রেতুং মাতা চাহ কনীয়সম্
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্॥

* * *

ন মহস্তি মাতা ন পিতা ভ্রাতরো বান্ধবাঃ কুতঃ
ত্রাতুং ইচ্ছসি মাং সৌম্য ধর্ম্মেণ মুনি পুঙ্গব॥

মায়ের পদানে লাগলে তাহার স্বর্গ লাভ হইবে ও দেশের মঙ্গল হইবে মনে করিয়া খন্দেরাও দুরবস্থায় পড়িলে আপন সন্তান বিক্রয় করিয়া থাকে।

পানেরা মনুষ্যবলি গ্রামে আনিবার সময় তাহার চোখ বাঁধিয়া আনে। বয়স্ক হইলে তাহার পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে, শিশু হইলে সে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে। মেড়িয়া দেবতার ভোগে দেহ নিয়োজিত হইবে ভাবিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে। গ্রামের সকল গৃহে তাহার আদরের ও সম্মানের সীমা থাকেনা। সে কাহারও স্ত্রী বা কন্যা গ্রহণ করিতে চাহিলে স্বামী বা পিতা আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে। বস্তুতঃ তাহার দেবতার ন্যায় পরিচর্য্যা হয়। এ জন্য শতজনে একটীও পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না। কাহাকেও বা দশ পনর বৎসর পরে বলি-

দান করা হয়, কেহ বা প্রতিনিধি দিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি পায়। পলায়ন করিয়া ধরা পড়িলে চিরদিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ধরা না পড়িলেও জাতিদেবের কোপে কুষ্ঠ রোগে প্রাণ হারাইতে হয়। মেড়িয়ার চুল কাটিতে নাই। বলিদানের দশ পনর দিন পূর্ব্বে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। বলিদানের উৎসবে বালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলে যোগ দেয়। তিন দিন সুরাপান ব্যভিচার আমোদ ও উৎসবের সীমা থাকে না। প্রথম দিন মেড়িয়াকে সংযম করিতে হয়। দ্বিতীয় দিন তাহাকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া বাজনা বাজাইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে মিলিয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়। গ্রামের বাহিরে নদীকূলে বলিদিবার জন্য একটী বন নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই নদীকে মেড়িয়া নদী ও এই বনকে মেড়িয়া বন বলে। এই বনে আম, বট, যজ্ঞডুম্বুর ও অশ্বথ বৃক্ষ আছে। সে বনে কেহ গাছ কাটে না, পাতা কুড়ায় না, দেবতার স্থান বলিয়া [illegible] অন্য সময়ে তাহার সীমায় যায় না। দ্বিতীয় দিন এই বনে একটী খুঁটী পোতা হয়। মেড়িয়াকে সেই খুঁটী ঠেস দিয়া বসাইয়া জানী (পুরোহিত) সেই খুঁটীর সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া [illegible] তেল, ঘি, সিন্দুর মাখাইয়া দেয় ও ফুল দিয়া ভাল করিয়া সাজায়। সারাদিন লোকে মেড়িয়াকে দেবতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করে। তাহার নখ কেশ কাপড়ের টুকরা সিন্দুরের বিন্দু ও এক ফোঁটা থু থু পর্য্যন্ত পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মেয়ে মহলে ইহার আদর বেশী। উহা সর্ব্ব রোগ হর। তৃতীয় দিন প্রভাতে মেড়িয়াকে একটু দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই সময় হইতে নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ড ও সুরাপানের মাত্রা অধিক হয়। দ্বিপ্রহরে নৃত্যগীত ও সুরাপান নিবৃত্ত করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা শিঙ্গা ও দামামা বাজাইয়া চিৎকার করিতে করিতে বলিদান করিতে অগ্রসর হয়।

বদ্ধাবস্থায় বলিদান হয় না। বলি-মনুষ্য কোন প্রকারে বাধা দিলে বলিকর্ম্ম শুভরূপে নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য পূর্ব্ব হইতে মেড়িয়ার হাত পা ভাঙ্গিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ আফিম খাওয়াইয়া তাহাকে অচৈতন্য করা হয়। একটা গাছের ডাল কি বাঁশ অর্দ্ধেক ফাড়িয়া তাহার মধ্যে মেড়িয়ার বক্ষদেশ বা কণ্ঠ চাপিয়া সেই দুই ফাড়া খুব শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেয়। তখন "জানি" এক কুঠার দিয়া মেড়িয়াকে আঘাত করে—তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লয়। কেবল মাথা ও নাড়ীভুঁড়ী লয় না।

খন্দদিগের মধ্যে কন্যাবধ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম সন্তান কন্যা হইলে বধ করা হইত না। তদ্ভিন্ন গ্রামের মধ্যে একটী মাত্র কন্যা দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। খন্দদিগের স্বগোত্রে বিবাহ নাই। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার নিন্দা হয় না। স্বামী ব্যভিচার করিলে তাহার নিন্দার সীমা থাকে না। কখন কখন সেই অপরাধে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। বিবাহের পর বৎসর অতীত হইলে সন্তানের বয়স এক বৎসর হইলে বা সন্তুষ্ট না থাকিলে স্ত্রী যখন ইচ্ছা স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। অবিবাহিত পুরুষের গৃহে যে নারী প্রবেশ করিবে, তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে [illegible] বড় নিন্দা হয়। বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে অর্থ ও পশুতে অনেক টাকা দিতে হয়। স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া গেলে শ্বশুরের নিকট জামাতা সে সব ফিরাইয়া লইতে পারে। প্রায়ই নূতন জামাই শ্বশুরের এই টাকাটা পূরণ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খন্দসংঘে একজনের দেনা সকলকে দিতে হয়। সুতরাং কন্যার বিবাহে পিতার অনেকের সহিত মনান্তর ও শত্রুতা হয়। এই শত্রুতা নিবারণের জন্য কন্যাসন্তান খন্দেরা বধ করে। কেবল নির্ব্বংশ না হয়, এই ভয়ে প্রথম সন্তানটী রক্ষা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের নীতিহীনতার কথা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাদশাহ শাহ আলম মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া শাহ আলমকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য মিরজাফর [illegible] ছিলেন,

কালাচাঁদ মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই কালাচাঁদকে অপ[illegible]স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মাতৃহীনতাবশতঃ পিতার সমধিক স্নেহ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর স্বাভাবিক আদর উভয়েই তাঁহার বাল্য শিক্ষার বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীতানুরাগও তাঁহার বিদ্যালাভের অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদের সঙ্গীত চর্চার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল, এবং বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গেই যৎসামান্য পাঠলিপ্সাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কালাচাঁদ শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমোদ প্রমোদই ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র সুখ ও শান্তির নিকেতন বলিয়া স্থির করিলেন। গানবাদ্য, সঙ্গীত রচনা [illegible] করিতে লাগিলেন।

কালাচাঁদ বিদ্যাভ্যাস না করিলেও, তাঁহার নৈসর্গিক সরলতা ও বয়োচিত প্রাজ্ঞতা দর্শনে পল্লীস্থ সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। তিনি লেখা পড়ায় বঞ্চিত হইলেও পুরুষোচিত তেজস্বিতা ও সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধ কখন কোন কার্য্য করিতেন না। বৃথা চাটুবাক্যে তাঁহার রসনা কখন কলুষিত হয় নাই। স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরতন্ত্র সমাজের [illegible]বর্গকে তিনি পশুর ন্যায় ঘৃণা করিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কবির দল করিয়া প্রতিপক্ষের সহিত পাল্লা দিতে কখন লজ্জা বোধ করেন নাই। সমাজের কুৎসা ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যসকল তিনি স্বরচিত সঙ্গীত দ্বারা সাধারণকে অবগত করাইয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিতেন।

২২।২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কালাচাঁদ এইরূপ অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন। একদিন তাঁহার রচনা নৈপুণ্য দর্শনে কোটালিপাড়ার পণ্ডিতকুলচূড়ামণি স্বর্গীয় পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ডাকিয়া স্নেহের সম্ভাষণে বলিলেন, "কালাচাঁদ, তোমার যেরূপ রচনা-নৈপুণ্য, ও অলৌকিক অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাহাতে লেখা পড়া শিখিলে তুমি পণ্ডিত মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, অপরিবর্ত্তন-শীল মন, অলীক ও আকস্মিক আমোদ প্রমোদে বাহিত করিতেছ, আমার বিবেচনায়, কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করা তোমার [illegible]মান লোকের কর্ত্তব্য নয়, এইরূপ আমোদ প্রমোদ, আপাতমধুর [illegible] ও পরিণামে ইহাতে ভীষণ গরল উদ্গীরণ করে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য, মনে রাখিও, অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদের অনুরোধে যাহারা মানব জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহারা মূর্খ।" এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় প্রস্থান করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের কথা শুনিয়া কালাচাঁদের প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল। শরদের সুধাকরের সুধাময় অংশুজালে যে হৃদয় সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল ছিল, আজ তাহা বিষাদের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর বেদনানুভব করিতে লাগিল। ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখময়ী প্রতিমূর্ত্তি যেন করালাস্য ব্যাদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উদাসীনভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। নিদ্রা দেবী অনুতপ্তহৃদয় কালাচাঁদকে নিজের শান্তিময় ক্রোড়ে সে রাত্রে আশ্রয় দান করিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে কালাচাঁদ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, পুনরায় শিরোমণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া পূর্ব্বকৃত অপরিণামদর্শিতা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহার বিষম লজ্জা ও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করিল, ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত বিপন্নের ন্যায় সজল নয়নে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কর্ত্তব্য নির্ণয়ণ পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশে শান্ত করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে উপদেশ প্রদান

প্রদান করিলেন। কালাচাঁদ তাঁহার উপদেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় কালাচাঁদ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স্ক বালকের পাঠোপযোগী ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন তাদৃশ যুবকের পক্ষে নিরতিশয় লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় মনে করিয়া সাধারণের অজ্ঞাতসারে রাত্রিযোগে গ্রামস্থ কোন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিকের নিকট অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ও অনন্যচিত্তে ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কালাচাঁদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন সময় হইতেই নিজের লোকাতিশায়িনী প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন। উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত শস্যাবলী অতি সত্বরই ফলফুলে শোভিত হইবে বুঝিয়া, শিক্ষক মহাশয়ের অন্তরে অবিরল আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অধিকতর উৎসাহ সহকারে অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আশালতা ফলবতী হইল। কালাচাঁদ এক বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণ ও কয়েকখানি কাব্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য জ্ঞানলাভ করিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অন্যের পাঁচ বৎসরের কার্য্য এক বৎসরেই সমাধা করিলেন। স্থানীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণ কালাচাঁদের অলৌকিক ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যে সময় হইতে সংস্কৃত জ্ঞান, মৃদুমন্দ পদ সঞ্চারে, তাঁহার হৃদয়কুঞ্জে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতেই কালাচাঁদ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন ও শ্লোক রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীবাসী সকলেই কালাচাঁদের অল্পকাল-লব্ধ অনন্যসুলভ সংস্কৃত জ্ঞান দেখিয়া [illegible] তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কালাচাঁদের এইরূপ অল্পকাল লব্ধ সংস্কৃত জ্ঞান যে প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তিনি এই অসামান্য প্রতিভাবলে একদিন পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর "ন্যায় দর্শন" অধ্যয়নার্থ বিক্রমপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। জটিল ও দুর্ব্বোধ্য ন্যায়দর্শনেও তিনি ব্যাকরণের ন্যায় অনায়াসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি তর্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার যুক্তিযুক্ত ও সারগর্ভ যুক্তি শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। ছাত্র জীবনেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তদানীন্তন বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ, পরাজয় ভয়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রসর হইতেন না। ছাত্র অবস্থায়ই তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।

প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইল না, পরিশেষে তিনি কাশীপুর নিবাসী ৺জানকীজীবন ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, এবং তর্কভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১২৭১ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে, ন্যায় প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-নৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দে শিক্ষামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক সুবাসিত হইয়া উঠিল; ন্যায় দর্শনের কূটতর্কের মীমাংসায় তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে কালাচাঁদের শিক্ষা সৌকার্য্য একটী আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহার ঈদৃশ উন্নতি দর্শনে কোন কোন পণ্ডিত তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন। এইরূপে মাটীর কালাচাঁদ ক্রমশঃ স্বর্গের দেবতা হইয়া উঠিলেন।

অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণে যাঁহারা মানবজাতির শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, পণ্ডিত কালাচাঁদ তর্কভূষণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী একটী পুণ্য-কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা আলোচনা করিলেও প্রভূত উপকার সাধিত

হইয়া থাকে। যাঁহারা বিংশতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতেই শিক্ষা কাল অতীত হইয়াছে, বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত হন, মহাত্মা কালাচাঁদের ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইলে সংসারে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

পণ্ডিত কালাচাঁদ তর্কভূষণ যে কেবল শাস্ত্রালাপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি নিজের বিষয়-সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মও বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। অন্যান্য জমিদারের সুলভ শঠতা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না। তিনি অপরাপর নির্ব্বিশেষে প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। শিক্ষা জনিত গর্ব্ব মানবের নৈসর্গিক দোষ, কিন্তু এ দোষে তাঁহার পবিত্র হৃদয় কলুষিত হয় নাই। "বিদ্যা বিনয় দদাতি" এই মহাজন বাক্যটী পণ্ডিত কালাচাঁদের চরিত্রে সার্থক হইয়াছিল। তিনি অভিমানী হইয়াও নিরহঙ্কার ছিলেন, তেজস্বী হইয়াও বিনয়াবনত ছিলেন, মধুরভাষী হইয়াও কপটতাময় চাটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত, অর্থলোলুপ হইয়া, পণ্ডিত নাম কখনও কলুষিত করেন নাই। তিনি সাধারণের ন্যায় হুজুকে মত্ত হইয়া কখনও বিবেকহীনতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। আত্মোৎসর্গ ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণে তিনি আপামর সাধারণের হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিলেন, সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিত।

যে কালাচাঁদ একদিন কবির দলের সর্দ্দার ছিলেন, হাস্য, পরিহাস ও গীত বাদ্য যাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আজ সেই কালাচাঁদ বিবিধ জ্ঞানরাগে রঞ্জিত হইয়া সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। সদুপদেশের ও অধ্যবসায়ের অদ্ভুত প্রভাবে নিরক্ষর ও আমোদপ্রিয় কালাচাঁদ আজ দেশহিতৈষী উদার চেতা পণ্ডিতরূপে পরিণত হইলেন। অমানিশার ঘোর তিমিরজাল পূর্ণ সুধাকরের কিরণ সম্পাতে সমুদ্ভাসিত হইল! স্বর্গে পরিণত হইল!

এই ভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই স্বর্গীয় পণ্ডিত কালাচাঁদের জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন হইল। কুসুম সফল হইতে না হইতেই কালকীটে তাহার বৃন্ত ছেদন করিল। অকালে ত্রয়োদশীর চন্দ্র করাল রাহুগ্রাসে নিপতিত হইল। কালাচাঁদ ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পত্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দুশ্ছেদ্য শোকান্ধকারে নিক্ষেপ করতঃ একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক ও একটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা রাখিয়া চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইলেন। মদন পাড়ের গৌরব রবি রাহুগ্রস্ত হইল।

বাল্যকাল হইতেই সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক আশুতোষের মেধাবিতা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে স্বর্গীয় পণ্ডিত কালাচাঁদ তর্কভূষণের আত্মীয় স্বজনের শুষ্ক হৃদয়ে আশালতার অঙ্কুর উদ্গম হইল। আশুতোষও পিতার ন্যায় যথাসময়ে অধ্যবসায় সহকারে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া শোকাশ্রুপাত সমাচ্ছন্ন, মাতা ও পিতৃব্যদিগের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিলেন, বালকের পিতার প্রতিভা ও শাস্ত্র-পারদর্শিতা দর্শন করিয়া, সকলেই কালাচাঁদের শোক বিস্মৃতপ্রায় হইলেন। তিনি তর্করত্ন উপাধি পাইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ নানাদেশাগত ছাত্রদিগকে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করাইতেছেন। আশুতোষও পিতার ন্যায় যুক্তিযুক্ত ও সারগর্ভ তর্কদ্বারা প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিয়া পণ্ডিত সমাজে যশঃস্তম্ভ স্থাপন করিতেছেন। বিক্রমপুর-নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও কোটালিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ নৈয়ায়িকগণ পণ্ডিত আশুতোষের সঙ্গে বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর জেলার পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত আশুতোষ তর্করত্নের আসন অতি উচ্চ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনিও পরোপচিকীর্ষা, আত্মোৎসর্গ এবং তেজস্বিতা প্রভৃতি পৈতৃক গুণে পণ্ডিত নামের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। শ্রীঅনঙ্গমোহন কাব্যতীর্থ।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। *

আমরা সমাজ ও তাহার আদর্শ আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, নানা কারণে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী মূল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া আদর্শ সমাজের আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে আলোচনার প্রয়োজন কি, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা উল্লেখ করা প্রথমে আবশ্যক। আমাদের সমাজ মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আজ আট শত বৎসর যাবত বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু সমাজে নানা দিকে নানা রূপ পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যে সংসাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আপাত মনোহর আহ্বানে হিন্দুসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। সমাজ ধীরে ধীরে অলক্ষ্য ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সংগঠিত হইতেছে। একদিকে প্রাচীন পবিত্র আর্য্যসমাজের কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ, অন্য দিকে আধুনিক, ইহকালে সুখ সমৃদ্ধি প্রদ, পাশ্চাত্য সমাজের জড় কেন্দ্রাতীগ আকর্ষণ এবং সেই পরস্পর বিরোধী আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হেতু আমাদের সমাজ একরূপ বক্রগতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু ভয়ের সহিত সেই উৎকট পরিবর্ত্তন,-সমাজের সেই তীর্য্যক গতি লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন, দারুণ ধর্ম্মহীন কলিযুগ মাহাত্ম্যে সমাজ ক্রমে অধঃপাতে যাইতেছে মনে করিয়া তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত নেতা ছিলেন, তাঁহারা একরূপ হতাশ হইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। অন্য দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সামাজিক পরিবর্ত্তনকে উন্নতি ও জীবনীশক্তির লক্ষণ মনে করিয়া আহ্লাদে ও ব্যগ্রভাবে ভবিষ্যতের পূর্ণ উন্নতির আশায় অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। তাই এই বিষম পরিবর্ত্তনের দিনে, এই বিপ্লবের প্রাক্কালে, আমাদের ভাবিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে—আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, না উন্নতির দিকে যাইতেছি? সমাজের লক্ষ্য কি—সমাজের আদর্শ কি—সমাজের কর্ত্তব্য কি, তাহা না জানিতে পারিলে আমরা এই কথা সম্যক বুঝিতে পারিব না। এই জন্য আমাদের আদর্শ সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

প্রথমে সমাজ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ কাহাকে বলে, তাহার

---

* ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮, সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল। লেখকের শরীর ভাল ছিল না বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বসু মহাশয় সভায় ইহা পাঠ করিয়াছিলেন।

অপরিস্ফুট ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু তাহার পরিষ্কার পরিস্ফুট সম্যক ধারণা করা,—সাম্য বৈষম্য বিচার করিয়া তাহার সংজ্ঞা বা লক্ষণা স্থির করা আমাদের প্রথমেই কর্ত্তব্য। সমাজের ইংরাজী কথা সোসাইটী (Society)। এই সমাজ ও সোসাইটী চলিত কথায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে Royal society, Asiatic society, Humane society, Society for the prevention of cruelty to animals, প্রভৃতিতে সোসাইটী কথার নানা রূপ ভিন্নার্থক ব্যবহার দেখিতে পাই। আমরাও সেই রূপ সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, সঙ্গীত সমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, হিন্দুসমাজ, আর্য্য সমাজ, মনুষ্য সমাজ এই রূপে সমাজ কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একাধিক ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণে বা কার্য্যোপলক্ষে একত্রী সম্মিলিত হইলে যে সমাজ সংগঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক। সে সমাজ আমাদের আলোচ্য নহে। ব্যবসায় বা কৃষিকর্ম্মের জন্ম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, সত্ত্ব সমুত্থান, যৌথ কারবার বা কোম্পানী সংস্থাপিত হয়। এরূপ সম্মিলনকে, এরূপ কোন বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম মানব সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর নৈমিত্তিক সম্মিলনকেও সমাজ বলা যায় না। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার জন্ম, জ্ঞানার্জ্জন বা আত্মোন্নতি জন্ত, পরস্পরের রক্ষা, পোষণ ও উন্নতি জন্ম, পরস্পরের সাহায্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ জন্ম যে মানব মধ্যে আংশিক সম্মিলন, তাহাকে বরং সমাজ নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। সকলই এক মহাসমাজের বিভিন্ন অংশ মাত্র। সতার্থক "অজ" ধাতু হইতে সমাজ। 'এক সঙ্গে গমন' হইতে সমাজ। যে সকল লোক একত্র হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া সকলের গন্তব্য পথে গমন করে, তাহারাই একসমাজ বদ্ধ। এই একত্র হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হইতেই সমাজ। শুধু মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয়, তাহা নহে, অনেক শ্রেণীর ইতর জীব মধ্যেও সমাজের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষে আছে, "পশুনাং সমাজঃ, অন্যেষাং সমাজঃ।" অতএব পশুদের সমাজের আভাষকে 'সমাজ' বলে। কেবল মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সম্মিলনকেই, 'সমাজ' বলে না। পশু মধ্যে পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি অনেক জীব এরূপ 'সমাজ' সম্বদ্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাক প্রভৃতি পক্ষিদের মধ্যে সহানুভূতি বা সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক পশু দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, অনেক পক্ষী মধ্যে দাম্পত্য সম্মিলন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। সে যাহা হউক, ইতর জীব সমাজ ও মানব সমাজ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইতর জীব সহজ জ্ঞান পরিচালিত। তাহাদের সমাজের উন্নতি অবনতি বা কোন পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল, জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত মানবের উন্নতি হয়। মানবের উন্নতির সহিত মানব সমাজের উন্নতি হয়। সেই জন্ম মানব সমাজ ক্রমে বিকাশশীল, পরিবর্ত্তনশীল। আমরা বলিয়াছি যে, মানব সংহতি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম, বিশেষতঃ একত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্ম

সমাজবদ্ধ হয়। মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ ঘটে। নানা ভাবে, নানা কারণে মানুষ পরস্পর আকৃষ্ট ও সম্মিলিত হয়। মানুষে মানুষে যে নানা রূপ সম্বন্ধ, তন্মধ্যে কতক সম্বন্ধ স্বার্থ প্রণোদিত, কতক নিঃস্বার্থ বা পরার্থপ্রবৃত্তি জনিত। এই বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে যে নিত্য সম্বন্ধ লোক সংগ্রহ, তাহাই সমাজ। তবে আমরা সমাজ মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিজনিত সম্বন্ধ, পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ভাব প্রধানতঃ দেখিতে পাই। মানুষ প্রথমে অসভ্য অবস্থায় হয়তঃ পরস্পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়। অথবা বাধ্য হইয়া একজন শক্তিশালী নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া সমাজবদ্ধ হয়। এইরূপে প্রথমে সম্বন্ধ হইলে পরে মানুষের স্নেহ, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হয়। ক্রমে এই নিঃস্বার্থ বা পরার্থ প্রবৃত্তি জনিত আকর্ষণ বলে, সমাজ দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়। তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। তখনই সমাজ প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই পরার্থবৃত্তিকে, এই নিঃস্বার্থ আকর্ষণকে আমরা সমাজের মূল ভিত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। আমরা যখন কোন লোককে অসামাজিক বা Unsocial বলি, যখন বুঝি যে, সে লোক তত "মিশুক" নহে, যেন পরের জন্য তাহার সহানুভূতি নাই, যেন সে পরের সুখে সুখী, পরের দুঃখে দুঃখী হইতে জানে না। পরের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। অতএব এই নিঃস্বার্থ আকর্ষণই সমাজের মূল। জড়জগতের ন্যায় জীবজগতেও আমরা দুই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। এক আকর্ষণ, আর এক বিক্ষেপ বা অপসারণ। আমাদের ভালবাসা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি আছে। তাহার দ্বারা আমরা পরকে আকর্ষণ করি, পরকে আপনার করিতে পারি, পরের সঙ্গে মিশিয়া সাধানাবলে এক হইয়া যাইতে পারি। সেইরূপ আমাদের দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, স্বার্থ পরতা বৃত্তি আছে, যাহাতে আমরা পরকে প্রত্যাখ্যান করি। এই আকর্ষণ জনিত সম্বন্ধ হইতেই সমাজ। এই আকর্ষণ জন্য সমাজে বিভিন্ন মানব সম্প্রদায় মধ্যে একত্বের ভাব থাকে। বহুত্বে একত্ব ও একত্বে বহুত্ব হইতেই সমাজ। এই সমাজ সংগঠন কৃত্রিম নহে। ইহার সংগঠন বা বিনাশ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক নিয়ম বলে মানুষের স্বাভাবিক পরার্থ প্রবৃত্তি বলে, ও স্বাভাবিক স্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা জন্য সমাজ সম্বদ্ধ হয়। যে আকর্ষণ শক্তি বলে মানুষ সমাজ সম্বদ্ধ হয়, তাহাকে 'সমাজ শক্তি' বা সমাজের জীবনী শক্তি বলা যায়। জড় আকর্ষণ শক্তি বলে এক জড়াণু অন্য জড়াণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জড়জগতের উৎপত্তি হয়। জৈবশক্তি বলে, এক জীবাণু অন্য জীবাণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জীবজগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। জৈবশক্তি বলে, কতকগুলি বিরোধী বা বিক্ষেপ শক্তি সম্পন্ন পরমাণু, তাহাদের জড়শক্তিকে সংযত ও অভিভূত করিয়া জীবনের উৎপত্তি করে। সেইরূপ বহু জীবাণু ও উক্ত জৈবশক্তি বলে নিজ শক্তিকে অভিভূত করিয়া, উন্নত জীবদেহ সংগঠিত করে। মানুষও সেইরূপ সমাজ শক্তি বলে নিজ স্বার্থকে অভিভূত করিয়া সমাজ রূপে সম্বদ্ধ হয়। যেমন পরমাণুর বা

জীবাণুর পরস্পর আকর্ষণ আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থ প্রণোদিত মনে হইলেও, বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিলে, সেই আকর্ষণ তাহাদের আয়ত্ত নহে বুঝা যায়, তেমনি মানুষও আপাততঃ স্বার্থ সিদ্ধি জন্য যে পরস্পর আকৃষ্ট হয় মনে করে, সেই আকর্ষণ প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের আয়ত্ত মধ্যে নহে। প্রকৃত নিয়মে তাহা সংসাধিত হয়। যে মহাশক্তিময়ী প্রকৃতি বাধ্য করায় জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব জীবান্তরকে আকর্ষণ করে, মানুষ অন্য মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষকে অনেক সময় স্বার্থ ভুলাইয়া, আপনাহারা করিয়া দিয়া, পরের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করায়, সমাজশক্তি সেই শক্তিরই উচ্চতর অভিব্যক্তি। যেমন জৈবশক্তি বিভিন্ন জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চতর জীবদেহ সংগঠিত করে, তেমনি সমাজশক্তিও বিভিন্ন মানবকে আকর্ষণ করিয়া, একীভূত করিয়া সমাজদেহ সংগঠিত করে। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমাজশক্তি ও সমাজ শরীর স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসর সমাজকে Super organic structure বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, যে সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে সমাজ প্রবদ্ধ হয় ও সমাজের ক্রমপরিণতি হয়, তাহা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা বলিয়াছি, মানুষ পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এই আকর্ষণ জন্য মানুষে মানুষে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও এই সম্বন্ধ জন্যই মানুষ পরস্পর সম্বদ্ধ হয়। যেখানে আকর্ষণ নিত্য, সেখানে সম্বন্ধ নিত্য, সেইখানেই সমাজের বীজ। এই আকর্ষণ স্বাভাবিক। মানুষের ইচ্ছার উপর তাহা নির্ভর করে না। তাহাতে মানুষের স্বাধীনতা নাই। একণে আমরা এই আকর্ষণ ও আকর্ষণজনিত সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিব। এবং এই সম্বন্ধের ক্রমবিকাশে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি কিরূপে সঙ্কুচিত ও পরার্থবুদ্ধির প্রসার বৃদ্ধি হইয়া সমাজ শক্তির কিরূপ বিকাশ হয়, তাহা দেখিব।

সমাজের প্রথম সম্বন্ধ স্ত্রী পুরুষ। স্ত্রী পুরুষ সমগ্র মানব জাতির, মানব সমাজের দুই মূল বিভাগ। ভগবানের সমষ্টি শরীরের দুই প্রধান অংশ। এক শক্তির দুই বিভিন্ন বিকাশ। হরগৌরী রূপী সমাজ শরীরের একার্দ্ধ নারী, আর একার্দ্ধ পুরুষ। আমরা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পাইয়াছি যে, ভগবান হিরণ্যগর্ভ লোক বৃদ্ধির জন্য যেরূপ আপন সূক্ষ্ম শরীরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন, তেমনি সেই শরীরকে দ্বিধা করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও একার্দ্ধে নারী করিয়াছিলেন। এবং তাহা হইতেই বিরাট শরীরের উৎপত্তি হইয়াছিল ও তাহা হইতেই মনু বা সমষ্টি মানব সমাজ শরীরের সৃষ্টি হইয়াছিল।* স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণে ও সম্মিলনেই জীবসৃষ্টি ও রক্ষা হয়। জগতে যেমন আকর্ষণ বিক্ষেপ, ত্যাগ গ্রহণ, অগ্নি সোম, রজঃ—তমঃ positive-negative, active passive এইরূপ এক শক্তির দুই বিপরীত বিকাশের সমবায়ে, বিয়োগে ও যোগে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়, তেমনি এক শক্তি স্ত্রীপুরুষরূপী দুই গুণময় বিকা-

---

* লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
মনুসংহিতা ১।৩১—৩২

শের সমবায়ে জীবশক্তির সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া এক পূর্ণ মানুষ। তাই নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গ। * জাতি রক্ষা বা বংশ রক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষ মধ্যে আকর্ষণ নিত্য। স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ নিত্য। প্রকৃতি জাতি রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যস্ত, ব্যক্তির জন্য বুঝি সেরূপ ব্যস্ত নহে। মানব প্রভৃতি সকল জাতি মধ্যেই প্রকৃতির এই ব্যস্ততা দেখা যায়। ভগবানের এই প্রকৃতির, এই মহা বৈষ্ণবীশক্তির তত্ত্ব আমরা বুঝি না। তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া, অদ্ভুত কৌশল উপলব্ধি করিতে পারি না। যাহা প্রকৃতির কার্য্য, মানুষ তাহা প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশলে নিজ কার্য্য বলিয়া আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করে।

প্রকৃতি তাহার কার্য্য করিবার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক স্বরূপ আমাদের কিঞ্চিৎ সুখ, কিঞ্চিৎ আনন্দ দান করেন। আর আমরা সেই সুখ, সেই আনন্দ টুকু পাইবার জন্য নিজ প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া যাই, দাসের ন্যায় প্রকৃতির অনুসরণ করি। সকল প্রকার সুখ সম্বন্ধেই প্রায় এই নিয়ম। জীবপ্রবাহ রক্ষা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতির প্রয়োজন, সন্তান উৎপাদন দ্বারাই জীব প্রবাহ রক্ষা হয়। স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে না। এই জন্য সন্তান উৎপাদন কল্পে স্ত্রী পুরুষ মধ্যে যে উৎকট প্রাকৃত আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা এত বলবতী।

আবার সন্তান উৎপাদন করিলেই প্রকৃতির কার্য্য শেষ হয় না। সন্তান রক্ষার প্রয়োজন। নতুবা জাতিপ্রবাহ রক্ষা হয় না। এজন্য মাতার হৃদয়ের সন্তান পালন বৃত্তি এত বলবতী যে, মহা মমতাময়ী প্রকৃতি সন্তান রক্ষার জন্য মাতৃ স্তন্যে দুগ্ধ দিয়াছেন, তিনিই মাতৃ হৃদয়ে সন্তানের জন্য দারুণ মমতার অদ্ভুত স্নেহের বিকাশ করিয়াছেন। মা সন্তান পালন করিয়া আপনার স্নেহের বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করেন। এখানেও প্রকৃতি-জননী পরার্থ বৃত্তির সহিত আমাদের স্বার্থ বৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে আমরা নানা জাতীয় জীব মধ্যে প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলের স্বার্থ বৃত্তি ও পরার্থ বৃত্তির সম্মিলন দেখিতে পাই। অতি নিম্ন জাতীয় জীবে অবশ্য এই সন্তান পালন রূপ মূল পরার্থ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ থাকে না। অনেক নিম্ন জাতীয় জীব সন্তান প্রসব করিয়াই পরিত্যাগ করে। স্তন্যপায়ী জীব মধ্যে (Mammals) এই সন্তান পালন বৃত্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। তবে পক্ষী প্রভৃতি জীবগণেরও সন্তান পালন বৃত্তি প্রবল। আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে পড়িয়াছি,—

"জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥"

"পক্ষীদের জ্ঞান থাকিলেও তাহারা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ও মোহ বশত সাদরে তণ্ডুলকণাদি শাবকগণের চঞ্চুতে নিক্ষেপ করে।" এই জ্ঞান কি? আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি। মানুষের ও অধিকাংশ জীবের দুই রূপ প্রবৃত্তি। এক আত্ম রক্ষা প্রবৃত্তি, আর এক বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি। যাহা আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি, তাহাও আমাদের স্বাভাবিক, তথাপি বুদ্ধি আমাদের সেই প্রবৃ-

---

* "বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা।" অর্থাৎ যে ভর্ত্তা, সেও অঙ্গনা ভিন্ন নহে, ইহা বিপ্রগণ বলেন। মনুসংহিতা, ৯।৪৫।

ত্তিকে নিয়মিত করে। সাধারণ জ্ঞান নিজ চেষ্টায় কেবল সাধারণ যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া নীতির মূল সূত্র ধরিতে গিয়া Utilitarianism অর্থাৎ হিতবাদ বা আত্মসুবিধা বাদের ভিত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে জ্ঞান পরার্থবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে না। কেবল ধর্ম্মই আমাদের সেই পরার্থবৃত্তি শিক্ষা দেন। কিন্তু সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে। যাহা হউক, মানুষ, ও ইতর জাতীয় জীব মধ্যে পরার্থবৃত্তি বীজ স্বয়ং মমতাময়ী প্রকৃতি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সন্তান-পালন বৃত্তিতে সেই পরার্থবৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখা যায়। বলিয়াছি ত, এখানে প্রকৃতি অদ্ভুত কৌশলে পরার্থবৃত্তির সহিত স্বার্থ বৃত্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন। যেখানে জীব সহজ জ্ঞানে কাজ করে, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্যই নিজের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ পরিহার জন্য কাজ করিতে যায়, সুতরাং জীব যদি পরার্থবৃত্তির পরিচালনাকে নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ বৃদ্ধির উপায় বলিয়া না বুঝিত, তাহা হইলে জীব সহজে পরার্থবৃত্তি বশে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না।

ইতর জীবেও সন্তান পালন ও রক্ষা কল্পে এই পরার্থবৃত্তি বড় প্রবল। অনেক জীব সন্তান রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। আমরা সচরাচর গার্হস্থ্য গো প্রভৃতি পশুগণের সন্তান হইলে, তাহাকে রক্ষার জন্য বড় চঞ্চল, বড় ব্যস্ত ও বড় উগ্র হইতে দেখিয়া থাকি; অথচ সন্তান বড় হইলে তাহার পালন বা রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে ইতর জীবের মধ্যে মাতার সহিত সন্তানের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। স্ত্রী আর সন্তানকে চিনিতেও পারে না। সন্তান সম্বন্ধে মানুষে ও পশুতে বিশেষ প্রভেদ আছে। ইতর জাতীয় জীবশিশুগণ শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও পোষণে সমর্থ হয়, শীঘ্রই স্বাবলম্বন করে। কিন্তু মানবশিশুকে অনেক দিন লালন পালন করিতে হয়। সকল জাতির জীব অপেক্ষা মানবশিশু বড় অক্ষম, বড় পরমুখাপেক্ষী। বহু দিন পর্য্যন্ত তাহার লালনপালন প্রয়োজন। এ জন্য মানবে সন্তান-স্নেহ স্থায়ী। এই স্নেহবন্ধন সমাজ বন্ধনের মূল।

আমরা দেখাইয়াছি যে, সমাজ সংগঠন কল্পে, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ প্রথম, সন্তান সম্বন্ধ দ্বিতীয় উপকরণ। কিন্তু এক ভাবে দেখিলে এই সন্তান সম্বন্ধই মূল বলিয়া বোধ হয়। কেবল সন্তান উৎপাদন জন্য স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে নৈমিত্তিক ক্ষণস্থায়ী,তাহাতে সমাজ বন্ধনের মূল সূত্র ঠিক পাওয়া যায় না। সন্তান পালন ও রক্ষার জন্যই স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থায়ী হয়। মানুষের মধ্যে স্ত্রী জাতি স্বাভাবিক হীনবল। এ জন্য তাহারা বিনা সাহায্যে আত্মরক্ষা বা সন্তান পালন করিতে সক্ষম হয় না। তাই সন্তান রক্ষার জন্য পিতার সাহায্য প্রয়োজন। তাই সন্তান রক্ষা কল্পে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থায়ী হয়। আমরা অনেক ইতর জীবের মধ্যেও সন্তান রক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন স্থায়ী হইতে দেখিতে পাই। অনেক পক্ষী পিতা মাতা উভয়ে মিলিয়া সন্তান পালন করে। মানুষের সহজ জ্ঞান ইতর জীবের ন্যায় প্রবল নহে। মানুষ সাধারণ জ্ঞানবলে প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। বলিয়াছি ত, কেবল সাধারণ জ্ঞানবশে মানুষ স্বার্থ-চালিত হয়। এই জন্য সন্তান রক্ষার জন্যও

মানুষ প্রথমে স্বার্থচালিত হইত। অসভ্য মানুষ সন্তানকে গরু, ছাগল প্রভৃতির ন্যায় নিজের সম্পত্তি মনে করিত। নিজ স্বার্থের জন্য পুরুষ সন্তান পালন করিত। স্ত্রী সহায় হইত। এখানেও স্বার্থবৃত্তির সহিত পরার্থ বৃত্তির অদ্ভুত সম্মিলন দেখা যায়। আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে পাইয়াছি,—

"মানুষা মনুজব্যাঘ্রঃ সাভিলাষাঃ সুতান প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং নপশ্যসি।"

মানুষও প্রত্যুপকার লোভে বৃদ্ধ কালে (নিজের সেবার জন্য) পুত্রের প্রতি স্নেহ যুক্ত হয়। কিন্তু এই সন্তান পালন করে মানুষ আপাততঃ প্রত্যুপকার লোভে স্বার্থচালিত বোধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থবৃত্তিই তাহাকে পরিচালিত করে। এ জন্য চণ্ডীতে আছে,—

'তথাপি মমতাগর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভা বন সংসার স্থিতিকারিণঃ।"

সংসার স্থিতিকারী বিষ্ণুমায়া প্রভাবেই মানুষ মমতা যুক্ত ও মোহ যুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জ্ঞানে যে মনুষ্যত্বের ধারণা, তাঁহার কাল শক্তি বলে পৃথিবীতে বিবর্ত্তিত হয়। তাঁহারই মায়াশক্তিতে তাহার ক্রম বিকাশ, মানুষের মধ্যে পরার্থবৃত্তির বিকাশ দ্বারা তাহার ক্রমোন্নতি হয়, সমাজের বিকাশ হয়। যিনি জাতিরূপে, মায়ারূপে, মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া সমাজ শরীরের দ্বারা জাতি রক্ষা করেন, মনুষ্যত্বের বিকাশ করেন।

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।"

তিনিই মানবজ্ঞানে, স্বার্থের মোহময় আবরণে আবরিত করিয়া সন্তান পালনাদি পরার্থ বৃত্তির বিকাশ করেন। Herbert Spencer বলিয়াছেন, কোন দার্শনিক যে, মানুষ পূর্ণ উন্নত হইলে, তাহার তাহার স্বার্থ বৃত্তি ও পরার্থ বৃত্তি একীভূত হইয়া যাইবে। তখন মানুষ কেবল পরার্থ কর্ম্ম করিয়াই আপনার সুখবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কিন্তু সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে। আমরা যে কথা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, সন্তান উৎপত্তি ও পালন দ্বারা জাতি রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতির নিয়মে মমতাবশে পরার্থ বৃত্তি পরিচালিত হইয়া পিতামাতা প্রথমে স্বামী রূপে সম্বদ্ধ হয়। পিতা, মাতা, সন্তান সকলে মিলিয়া পরিবার সংগঠিত করে। এইরূপে মানুষ এক পরিবার ভুক্ত হয়। এই পরিবারই সমাজের প্রথম বিকাশ। ইহাই সমাজের মূল কেন্দ্র। এই পরিবারই বিরাট সমাজ শরীরের অনুশরীর। সমাজ পরিবারেরই পূর্ণ বিকাশ। মানুষ একাকী সমাজ শরীর গঠনে অক্ষম। প্রথম মানুষ মিলিত হইয়া পরিবার সংগঠন করে। এই সকল পরিবাররূপ অনুসমাজ সম্বদ্ধ হইয়া এক পরিবারের সহিত অন্য পরিবার বিবাহ কর্ম্ম প্রভৃতি বন্ধনে সম্মিলিত হইয়া তবে সমাজ শরীর গঠন করিতে সমর্থ হয়।

অতএব প্রকৃতিজ পরার্থবৃত্তির প্রধান ও প্রথম বিকাশ বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ হয়, তাহাই সমাজের বীজ। এই পরার্থবৃত্তির মাতৃরূপ প্রথম বিকাশ হইতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা ও সমাজ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি স্বয়ং মাতৃশক্তি রূপে জীব হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন, মানুষকে পরস্পর সম্বদ্ধ করেন,সমাজ শরীরের বিকাশ করেন। মাতা পিতার হৃদয়ে সন্তান পালন ও রক্ষা প্রবৃত্তিই এই মাতৃশক্তি। কোন বিলাতি পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, জীবজগতে মাতৃত্ব

বিকাশ করাই যেন প্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" তাঁহার কথা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কতকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। *

স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ সমাজের মূলসূত্র হইলেও অসভ্য মানব সমাজে সে সম্বন্ধের তাদৃশ বিকাশ লক্ষিত হয় না। অসভ্য সমাজ সাধারণতঃ আত্মরক্ষা ও পোষণ কার্য্যে বিশেষ ব্যাপৃত থাকে। প্রকৃতির সহিত কঠিন সংগ্রাম করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। অন্য অসভ্য সমাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে তাহাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। একারণ সে অবস্থায় অসভ্য সমাজে স্ত্রীপুরুষ ও সন্তান সম্বন্ধ বড় শিথিল থাকে। এই স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে ক্রমে উন্নত হয়। সেই উন্নতির সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে এবং তদনুসারে সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। গৃহাশ্রমই প্রথম ও প্রধান আশ্রম। গৃহাশ্রম দ্বারা অন্য আশ্রম ও সাধারণতঃ সমাজ রক্ষিত হয়। এ কথা আর্য্য ঋষিগণ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। আদিম অসভ্য সমাজে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ সন্তানের সহিত সম্বন্ধ ও অন্যান্য পরিবারের সহিত সম্বন্ধ শিথিল থাকায়, গৃহাশ্রম কিরূপ অসম্বদ্ধ ছিল, তাহা যাঁহারা সেই সকল সমাজের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন। এস্থলে তাহার বিবরণের আবশ্যক নাই।

আমরা এস্থলে কেবল অসভ্য সমাজের বিবাহ প্রথার কথা ও সমাজের উন্নতির সহিত এই বিবাহ প্রথার ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। যাহাকে আমরা বিবাহ বলিয়া বুঝি, অসভ্য সমাজে, অথবা সমাজের প্রথম অবস্থায় তাহা আদৌ প্রচলিত হয় নাই। তখন স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। অনেক সময় সন্তানের পিতা কে তাহার নির্দ্দেশ হইত না। মাতাকেই সন্তান পালন করিতে হইত। অনেক সমাজে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী সূত্রে মাতুলের বিষয় প্রাপ্ত হইত। ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশে এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, প্রাচীন আর্য্যসমাজেই পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। ঋষি শ্বেতকেতু প্রথমে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করেন। অসভ্য সমাজের প্রথম বিবাহ প্রথা নৈমিত্তিক। মানুষের জীবের মধ্যে যৌন নির্ব্বাচনের প্রথার কথা বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু অসভ্য মানব সমাজে এই যৌন নির্ব্বাচন প্রথার কোন আভাস পাওয়া যায় না। আদিম অসভ্য সমাজে জোর করিয়া কন্যা হরণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস, বোধ হয়, বিবাহের প্রথম সূত্রপাত। নিদ্রাভিভূতা, বিহ্বলা বা উন্মত্তা স্ত্রীলোকের প্রতি এরূপ অত্যাচার অধুনা কদাচিত কোন পিশাচ প্রকৃতির লোক করিতে পারে; কিন্তু তখন ইহা

---

* পণ্ডিত ড্রুমাণ্ড (Dramand) তাঁহার "Ascent of Man" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"Is it too much to say that the one motive of Organic nature is to make mothers? It is at least certain that this was the chief thing she did.........the machinery of nature is designed in the last resort to turn out Mothers.........It is a fact which no human mother can regard without awe, which no man can realise without a new reverence for woman, and a new belief in the higher meaning of nature, that the goal of the whole plant and animal kingdom, seems to have been the creation of a family which the very naturalist has had to call Mammalia, the mothers."

অসভ্য সমাজে সাধারণ প্রথা ছিল। পৈশাচ বিবাহ সে বিবাহের নাম। আবার যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসভ্য সমাজ মধ্যে সংঘর্ষ হইত, তখন এক সমাজ অন্য সমাজকে জয় করিয়া, সেই সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের নিজ সমাজভুক্ত করিয়া জেতা নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইত। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, কন্যা পক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদের গৃহভেদ করিয়া "হা হতোঽস্মি" বলিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। ভগবান মনু, তখনকার এ বিবাহকেও ধর্ম্মজনক বলিয়াছেন। কেননা, এইরূপ বিবাহে স্ত্রীর সহিত নৈমিত্তিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে সে সম্বন্ধ বহুকালব্যাপী হইয়া গৃহাশ্রম সংগঠন করিবার উপযোগী হইত। আসুর বিবাহও এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর বিবাহ ছিল। পণ দিয়া কন্যা বা দাসী ক্রয় করিয়া যে বিবাহ, তাহাই আসুর বিবাহ। বোধ হয়, পণ দিয়া কন্যার অন্য বর সংগ্রহও কতক এই শ্রেণীর বিবাহ। পৈশাচিক, রাক্ষস বা আসুর প্রকৃতি সম্পন্ন তামসিক লোক দ্বারা যে সমাজ সংগঠিত, তাহাতেই এরূপ হেয় বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সমাজ ইহা অপেক্ষা উন্নত হইলে, সমাজ রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন ক্ষত্রিয় প্রধান হইলে, বিবাহ প্রথার আরও উন্নতি হয়। সে অবস্থায় সমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহ, স্বয়ম্বর প্রথা বা কোর্টসিপ করিয়া নির্ব্বাচন মূলক বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে। ভগবান মনু ইহাকে ও রাক্ষস বিবাহকে ক্ষত্রিয় বর্ণসম্মত বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সমাজ আরও উন্নত হইলে সমাজ সাত্বিক বা ব্রাহ্মণ প্রধান হইলে, তবে সে সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণোচিত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য, এই চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। তবে সমাজ যদি বিস্তৃত হয়, যদি তাহাতে নানা বর্ণের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন লোক থাকে, তবে সেখানে উক্ত আটরূপ বিবাহ প্রথার মধ্যে সকল গুলিরই অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলন থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজে যে প্রকৃতির লোক অধিক, সমাজের মধ্যে যাহাদের প্রাধান্য থাকে, তাহাদের অনুবর্ত্তিক বিবাহ প্রথাই প্রায়শঃ সে সমাজে প্রচলিত হয়। *

বিবাহ সম্বন্ধে আর এক কথা আমাদের উল্লেখ করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে, বিবাহ দ্বারা গৃহাশ্রম সংগঠিত হইয়া পরার্থবৃত্তি বিকাশের ও সমাজ সংগঠনের বিশেষ সুবিধা হয়। বিবাহ প্রথার ক্রমবিকাশের দ্বারা যে দাম্পত্য প্রেম, যে পরস্পরের জন্য পরস্পরের স্বার্থত্যাগ, যে পরার্থিতার উৎস প্রবাহিত হয়, তাহাই ক্রমে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে সমস্ত সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই সমাজ বন্ধনের মূল সূত্র হয়। কিন্তু অসভ্য সমাজে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়াছি, সে বিবাহে দাম্পত্য প্রেম বা পরার্থবৃত্তির বড় বিকাশ লক্ষিত হইত না, তখন পরিবারবন্ধন বিশেষ শিথিল ছিল। অনেক অসভ্য সমাজে এক স্ত্রীর বহু স্বামী বিবাহের প্রথাও ছিল। এক স্বামীর বহু স্ত্রী বিবাহ ত অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য সমাজে বহুকাল প্রচলিত থাকে। তখন পরিবার বন্ধন শিথিল থাকে। পরিবারের মধ্যে দাসীর অধিক স্ত্রীর অধিকার থাকে না। তখন "হিরণ্য পশবঃ স্ত্রীয়ঃ" এই সকলই গৃহস্বামীর সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত থাকে।

ক্রমবিকাশ নিয়মে সমাজ বিশেষরূপে উন্নত হইলে, তবে এক পতিত্ব বা এক পত্নিত্ব প্রথা প্রচলিত হয়। তখন দাম্পত্য সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। তখন স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ইহ কালে সীমাবদ্ধ নহে, পরকালেও সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না, সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। ধর্ম্মের বিকাশে আমরা এই ধারণা লাভ করি, কাজেই তখন স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা দূরে থাক স্ত্রীর মৃত্যুতেও স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তখন দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকে। সন্তান লালন পালন সৌকার্য্যার্থে, বোধ হয়, এই এক বিবাহই প্রশস্ত। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, দম্পতি মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ যত অধিক হয়, সেই পরিমাণে পিতৃ-মাতৃ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া সন্তানের উৎকর্ষ সাধন করে, বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিলে তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের লালন পালনে বিশেষ বাধা হয়। বিপত্নীক স্বামীও পুনর্ব্বিবাহ করিলে, তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পালনে সম্যক্ সুবিধা হয় না। সুতরাং তাহাতে সন্তানের অবনতির সহিত জাতীয় অবনতি হইতে পারে। এজন্য বোধ হয় প্রকৃতির ক্রমবিকাশ নিয়মে বিবাহ ও পরিবার প্রথার চরম পরিণতিতে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নিত্য পরকালব্যাপী কল্পিত হইয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপে আমরা ক্রম বিকাশ নিয়ম হইতে বুঝিতে পারি যে, যেখানে সমাজের আদিম অসভ্য অবস্থায় প্রথমে স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ নৈমিত্তিক ক্ষণস্থায়ী পাশব বৃত্তি চরিতার্থ জন্য শিথিল ছিল, যেখানে স্ত্রী স্বামীর দাসী বা সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত, সেখানে দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হইয়া স্ত্রী জাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছে, স্ত্রী স্বামীর সহিত একাত্মা, অর্দ্ধাঙ্গিণী ও সহধর্ম্মিনী হইয়াছেন। তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া পরিবার মধ্যে কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ইহ-পরকালব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ সম্বন্ধের, আত্মসুখ সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে পরার্থ সম্বন্ধ, ধর্ম্ম সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। উভয়ে অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে ও ধর্ম্মবন্ধনে নিত্যবদ্ধ হইয়া, একীভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কর্ত্তব্যপালনে সাহায্য করিতেছেন।

এইরূপে বিবর্ত্তন নিয়ম অনুসরণ করিয়া সমাজের মূল সূত্র স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের কতদূর বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে, অথবা হইতে পারে, তাহা আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি। এবং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আদর্শ সমাজে এই সম্বন্ধের কিরূপ পরিণতি হয়, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি এবং এই স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের ন্যায়, অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের কিরূপ ক্রমবিকাশ হয়, এবং শ্রেষ্ঠ উন্নত আদর্শ সমাজে তাহার কিরূপ পরিণতি হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি। আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের ন্যায় গৃহস্বামীর সহিত তাহার সন্তানের সম্বন্ধও ক্রম বিকাশ নিয়মে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অসভ্য সমাজে পরিবার মধ্যে সন্তানের যত্ন ছিল না। অনেক শিশুর অকালমৃত্যু হইত, তাই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইত না। অনেক স্থলে শিশু, বিশেষতঃ কন্যা হত্যারও ব্যবস্থা ছিল।

তখন সন্তান সাধারণতঃ গৃহস্বামীর সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইত। তাহারা দাসের ন্যায় গৃহস্বামীর অনুসরণ করিত। ক্রমে ক্রমে সে সম্বন্ধের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উন্নত সভ্য সমাজে সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষা—পিতামাতা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন ও তাহাদের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। পুত্র কন্যা উভয়কেই সমান যত্নের সহিত লালন পালন করেন ও উপযুক্ত শিক্ষা দেন। যাহাতে তাহাদের উন্নতি হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এমন কি, অনেক সময় সন্তানের রক্ষার জন্য পিতামাতা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। সন্তান আত্মজ, জায়াগর্ভে আপনিই সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই ধারণার ক্রমবিকাশ হইয়া সন্তানের প্রতি স্নেহের ও মমতার বিশেষ বিকাশ হইয়া, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। উন্নত সমাজে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানের যে বিশেষ বিকাশ হয়, সমাজ অনুশাসন যে অলক্ষ্যে আমাদের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে, এস্থলে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের সমাজ মধ্যে যে অতি বড় স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব, নীচাশয়, সেও যথাকালে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে গিয়া অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হইতে কুণ্ঠিত হয় না। যে পরের উপকারের জন্য একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ, সে যে কন্যার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়, ইহা সমাজের অলক্ষ্য শক্তি ও প্রভাবের ফল। উন্নত সমাজ মানুষকে অলক্ষ্যে এইরূপ উন্নত আদর্শের দিকে লইয়া যায়, যাহা হউক, সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্রমবিবর্ত্তন নিয়মে সমাজ উন্নত হইয়া পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধের ও উভয়ের মধ্যে স্নেহবন্ধনের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সেইরূপ গৃহস্বামীর সহিত পিতামাতার সম্বন্ধেরও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। অসভ্য সমাজে বৃদ্ধ পিতা মাতার আদর ছিল না। পিতা মাতা বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, অক্ষম বা রুগ্ন হইলে অনেক অসভ্য সমাজের কৃতী সন্তান তাহাদিগকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিত। অসভ্য সমাজে পরার্থবৃত্তির বিশেষ বিকাশ ছিল না। সে সমাজের তামস প্রকৃতির লোক নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য ভাবিয়া, বা পরার্থবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিতে জানিত না। অপেক্ষাকৃত অনেক সভ্যসমাজেও সন্তান বড় হইলে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া স্ত্রী লইয়া নূতন পরিবার সংগঠন করিয়া থাকে, পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া থাকে, এ প্রথাও এখনও পাশ্চাত্য সমাজ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃ মাতৃ ভক্তির উৎকর্ষ ও চরম পরিণতি বিশেষ রূপে উন্নত সমাজেই সম্ভব হয়। *

এইরূপে পরিবার মধ্যে গৃহস্বামীর সহিত স্ত্রীর, সন্তানের ও পিতামাতার সম্বন্ধের ক্রমবিকাশ হইলে, তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকে। পরিবারবন্ধন দৃঢ় হইলে ভ্রাতার ভ্রাতায় ও দূরস্থ আত্মীয়গণে মিলিয়া পরিবার সংগঠিত করে।

* পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সরও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"At present the latter days of the old whose married children live away from them are made dreary by the lack of those pleasures yielded by the constant society of the descendants: but a time may be expected when this evil will be met by unattachment of adults to their aged parents which of not as strong as that of parents to children approaches it as strength."

তাহার পরে এমন সময় আসে, যখন সে পরিবারকে বিভক্ত হইতে হয়। যেমন সকল জীব শরীরেই বৃদ্ধির সীমা আছে, তেমনই পরিবার শরীরেও বৃদ্ধির সীমা আছে। এক পিতা মাতা হইতে বহু পুত্র জন্মিতে পারে। এই রূপ দুই চারি পুরুষ পরে পরিবার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতে পারে যে, সে পরিবার মধ্যে আর একান্নবর্ত্তিতা সুচারুরূপে চলিতে পারে না। তখন কাজেই ক্রমেই এক পরিবার বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ অথচ পৃথক বহু পরিবারে সংগঠিত হয়।

এই রূপে কোন বিশেষ সম্ভ্রান্তশালী এক পূর্ব্ব পুরুষ হইতে বহু পরিবার সৃষ্টি হয়, আর সেই বহু পরিবার মিলিত থাকিয়া, এক সমাজ ভুক্ত থাকিয়া এক জাতি সৃষ্টি করে। কোন বংশ বিশেষের পূর্ব্বপুরুষ বিশেষ বলবান, ক্ষমতাশালী ও সমাজ মধ্যে প্রধান পারিয়া বহু বিবাহ দ্বারা অতি সহজে ও অল্প দিন মধ্যে আপন বংশ বিস্তার করিয়া লইতে পারে।

এইরূপে পরিবার সম্বন্ধ একবংশ বা জাতি মধ্যে রক্ত ও পুত্রসম্বন্ধ, পরম্পরা সম্বন্ধ, গুণকর্ম্ম সম্বন্ধ, বিভিন্ন বংশ বা জাতি মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ, এইরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে সমাজ সম্বদ্ধ হয়। এই সকল সম্বন্ধের ক্রমোন্নতিতে সমাজের ক্রমোন্নতি হয়। এই সকল সম্বন্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক নহে। নিত্য না হইলে সে সম্বন্ধ হইতে স্থায়ী সমাজ সংগঠিত হইতে পারে না। এই সকল সম্বন্ধ হইতে আরও কতকগুলি সম্বন্ধের বিকাশ হয়, যাহাতে সমাজ বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হয়, সমাজের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়। এস্থলে অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব মাত্র।

এই সকল একতা সূত্র মধ্যে ভাষার একতাই সর্ব্বপ্রধান। এক ভাষা না হইলে পরস্পর মধ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। পরস্পরের মনোভাব না বুঝিলে, পরস্পরের মধ্যে ভাব ও চিন্তের বিনিময় হইতে না পারিলে পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এক সূত্রে বদ্ধ হইবার কোন উপায় থাকে না।

এই ভাষার একতা, ধর্ম্মের একতা, শিক্ষার একতা, বিশ্বাসের একতা, অতীত স্মৃতির (tradition) একতা, ব্যবহার ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের একতা, এক রাজ্য তন্ত্রের বা এক রাজার অধীনতা জন্য একতা, সমাজকে বাহ্য ও শত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য একতা, একরূপ কর্ম্ম ব্যবসা বা বাণিজ্য প্রভৃতি জন্য (বর্ণগত) একতা, আচার ব্যবহারের একতা, রীতি নীতির একতা, আদাব কায়দার একতা, আমোদ উৎসব ও ক্রিয়া কাণ্ডের একতা (ceremonial institution) পাল পার্ব্বণের একতা, আহার বিহারের একতা, ক্রীড়া কৌতুকের একতা প্রভৃতি নানারূপ একতা সংস্থাপক সম্বন্ধ হইতে সমাজ বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হয়, সমাজ শক্তির বিকাশ হয়, সমাজ দেহের পুষ্টি হয়। তোমার সহিত আমার একতা যত বৃদ্ধি হইবে, তোমার সহিত আমার সাদৃশ্য ও সাধর্ম্ম্য যত বৃদ্ধি হইবে, যত পার্থক্য ভাব হ্রাস হইবে, ততই তোমার সহিত আমার একতা, আমার সহানুভূতি বৃদ্ধি হইবে। ততই আমি তোমার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইতে শিখিব, ততই আমি তোমার সুখবৃদ্ধি ও দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিব—ততই আমি স্বার্থ ভুলিয়া তোমার জন্য কর্ম্ম করিতে পারিব; ততই তোমাতে আমাতে পরস্পর

আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের স্বার্থ আ[illegible] বিশেষত্ব, বিভিন্নত্ব সঙ্কুচিত করিয়া একীভূত হইতে পারিব। তুমি বিধর্মী হও, তোমার আচার ব্যবহার রুচি প্রভৃতি আমা হইতে ভিন্ন হয়, তবে [illegible] সহিত স্বভাবতঃ আমার সহানুভূতি বা আত্মীয়তা হ্রাস হইয়া যাইবে। * * * *

অতএব বিভিন্ন সম্বন্ধের ক্রমোন্নতি নিয়মে সমাজ মধ্যে পরস্পরের একতা বৃদ্ধি হইয়া সকলের প্রায় একরূপ শিক্ষা দীক্ষা, প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি হেতু সমাজের উন্নতি ও পরিণত হইয়া সেই সমাজের অধিকাংশ লোকের অনেকটা একরূপ চরিত্রের বিকাশ হয়। ইহাকেই সাধারণতঃ জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হয়। সেই জাতির লোকের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি চিত্তবৃত্তি, উদ্দেশ্য, আশা, গতি সকলই প্রায় একরূপে বিকাশ হয়, এক পথে নীত হয়। সেই সমাজের যাহা আদর্শ, প্রায় সেই সমাজস্থ সকলেই সেই আদর্শ অভিমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে সমাজ যে পরিমাণে উন্নত, সেই সমাজের আদর্শ সেই রূপ উন্নত, সেই সমাজের লোক সাধারণতঃ সেইরূপ উন্নত হইতে যত্ন করে।

এই সকল সম্বন্ধ বা একতা সূত্র কোন একটী বা একাধিক সূত্র কোন বিশেষ কারণে বা উদ্দীপনা প্রভাবে বিশেষ রূপে দৃঢ় হইয়া সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারে, অথবা সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, হত্যা করিয়া, সংগঠিত করিয়া দিয়া জাতীয় চরিত্র নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে— তাহা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কয়েক শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বে এই ভারতে দুইটী জাতি বা সমাজের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এক জাতি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, ধর্ম্মের উদ্দীপনা বলে নূতন করিয়া সমাজ সম্বদ্ধ হয়। আর অন্য জাতিই অন্যের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিশেষ রূপে সংহত হইয়া নূতন সমাজ সংগঠিত করে। সেই দুই জাতির মধ্যে এক শিখ (Sikh) জাতি আর এক মহারাষ্ট্র জাতি। বাবা নানক পঞ্জাবে জাট্ প্রভৃতি অর্দ্ধশিক্ষিত, অসভ্য কয়েকটী ক্ষুদ্র জাতি মধ্যে কি অদ্ভুত ধর্ম্মশক্তি সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিলেন, কি তাড়িতশক্তি, কি নূতন জাতীয় উদ্দীপনার বিকাশ করাইয়াছিলেন! গুরুগোবিন্দ মুসলমান সম্রাট্দের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, সেই সমাজ মধ্যে কি আশ্চর্য্য বীরত্বের বীজ, কি শক্তি নিষেক করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাতে নূতন শিখ্ সমাজের অভ্যুত্থান হইয়া, সেদিন পর্য্যন্ত, মোগল ইংরাজরাজের সময় পর্য্যন্ত, নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এখনও শিখের তেজ, সত্যনিষ্ঠা, অতুল সাহস, অদম্য উৎসাহ প্রভৃতি গুণের আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। এইরূপে মুসলমানদের উৎপীড়নে শিবজী যে মহারাষ্ট্র জাতি বা মহারাষ্ট্র সমাজ সংগঠিত করিয়াছিলেন, সেই সমাজের কথা, তাহার বীরত্বের তেজ, সাহস, শক্তির কথা ভাবিয়া কে না আনন্দিত হইবে?

ধর্ম্মবলই প্রধান বল, ধর্ম্ম সম্বন্ধ বড় মহান সম্বন্ধ, ধর্ম্মের একীকরণ শক্তি, সমাজ বন্ধন শক্তি বড় অদ্ভুত। শিখ সমাজের ন্যায় অধিকাংশ সমাজই ধর্ম্মের মহাশক্তি আশ্রয় করিয়া বিশেষ রূপে উন্নত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া বর্ত্তমান ইউরোপের

বিভিন্ন সমাজ উন্নত হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, ধর্ম্মের মহা একতাসূত্র অবলম্বন করিয়া মুসলমান জাতি একদিন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের অনেক স্থানে আপন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া মুষ্টিমেয় পিউরিটান পরিবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, এক সমাজভুক্ত হইয়া আপনাদের সমাজকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে। অন্য দিকে নুতন জাতীয় উদ্দীপনা, জাতীয় একতাসূত্র অবলম্বন করিয়া, ত্যাগ স্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, কর্ম্মশক্তির অদ্ভুত বিকাশে সে দিনকার অসভ্য জাপান এসিয়া খণ্ডে প্রধান স্বাধীন সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে উল্লিখিত বিভিন্ন একতাসূত্রের কোন না কোন বিশেষ সূত্রের বিশেষ বিকাশে সমাজ বিশেষকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, একীভূত করিয়া দিয়া, উন্নতির পথে অনেক দূর লইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। আমাদের আর অধিক উদাহরণ দিবার স্থান নাই।

যাহা হউক, আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, পরিবার সম্বন্ধ, বংশ সম্বন্ধ, জাতি সম্বন্ধ, ধর্ম্ম সম্বন্ধ, দেশ সম্বন্ধ, ভাষা সম্বন্ধ, রাজশাসন সম্বন্ধ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমোদ উৎসব, ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধ হইতে সমাজ সংগঠিত হয়, এবং এই সকল সম্বন্ধের ক্রমবিকাশে সমাজের উন্নতি ও পরিণতি হয়। এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধের বিকাশ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের বা বিভিন্ন কর্ত্তব্যের বিকাশ হইয়াছে। সমাজকে, মনুষ্যত্বকে ধারণ করে বলিয়া, ইহাদের ধর্ম্মবলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই সকল ধর্ম্মের বিবরণ আছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা সেই জন্য সমাজের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও পরস্পরের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নিয়মিত হয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ সম্বন্ধে যে সকল মূলতত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা অগত্যা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। সমাজ তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে সমাজ শরীর তত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের সমুদায়ই বিবর্ত্তন নিয়মের অধীন,—জীবদেহ ও সমাজদেহ এই বিবর্ত্তন নিয়মের অধীন। মানবদেহের সহিত সমাজদেহের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেহের চারি প্রধান অঙ্গ—মস্তক, বাহুদ্বয়, মধ্যভাগ (ধড়) ও পদদ্বয়। সমাজ শরীরের চারি প্রধান অঙ্গ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্ম্মবিভাগ আছে, সমাজশরীরেরও বিভিন্ন অঙ্গের কর্ম্মবিভাগ আছে। কিরূপে বিবর্ত্তন নিয়মে সমাজ শরীরের ক্রমবিকাশ হয়, কিরূপে সমাজের এই অঙ্গ ও কর্ম্মবিভাগ হয়, কিরূপে সমাজ উন্নত হইয়া তাহাতে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হয় ও গুণ-কর্ম্মানুসারে সেই বর্ণবিভাগের ক্রম-পরিণতি হয়, তাহা এস্থলে আলোচনা করিবার অবসর নাই। যেমন দেহের জন্ম বৃদ্ধি,

* ফরাসি দার্শনিক পণ্ডিত Cousin (কুঁজে) বলিয়াছেন—"Religion is the foundation of every civilization" দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন- "The idea of God constitutes the general foundation of a people, whatever is the form of religion the same is the form of its constitution."

ক্ষয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সমাজের যতই উন্নতি হউক, সমাজ যতই আদর্শের নিকটবর্তী হউক, ইহারও জন্মবৃদ্ধি ক্ষয়ের সহিত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সমাজের উন্নতি অবনতির নানা কারণ আছে। অনেক সামাজিক ব্যাধি আছে, যাহাতে সমাজের ক্রমে অবনতি হয়, সমাজের মৃত্যুর অনেক কারণ আছে, কিন্তু আমাদের এক্ষণে এ সকল বিষয় আলোচনার আর অবসর নাই। ব্যক্তি মানবের সহিত সমাজের সম্বন্ধ কি, সমাজ কিরূপে মানুষকে মানুষ করে, সমাজ লালিত না হইয়া মানব, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভালুক প্রভৃতি জন্তুর দ্বারা লালিত হইলে কিরূপে উচ্চ সংস্কার-সম্পন্ন মানুষও পশুত্বে পরিণত হয়, কিরূপে সমাজ মানব শিশুকে শিক্ষা দিয়া তাহার সংস্কার বীজকে অঙ্কুরিত ও পরিণত করিয়া দেয়, সমাজ সহায়ে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, কিরূপে সমাজ মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি ও চতুর্ব্বর্গ সাধনের সহায় হয়, তাহাও এ স্থলে আলোচনা করিবার অবসর নাই। আদর্শ সমাজ কি, কিরূপ সমাজ আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজ সেই আদর্শের কতদূর নিকটবর্ত্তী ছিল, আমরা এক্ষণে সেই আদর্শ হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এসকল আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইলেও এস্থলে সে আলোচনার আর স্থান নাই, অগত্যা বাধ্য হইয়া এক্ষণে আমাদিগকে এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিব। আমরা সমাজ শরীরের কথা বলিয়াছি। সমাজ শরীরের যিনি আত্মা, তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্যষ্টি ক্ষুদ্র বিভক্ত সমাজ যে এক সমাজের অন্তর্গত, সমষ্টি সমাজ যে ভগবানের বিরাটরূপ, তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই সমষ্টি সমাজ হইতে আমরা মনুষ্যত্বের ধারণা করিতে পারিব, মনুষ্যত্ব বিকাশের সীমা কোথায়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শরীর কাহাকে বলে? পরার্থ সংহতি জন্য শরীর (পরার্থ-সংহতিত্বাৎ সাংখ্যদর্শন ১।১৪০) চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় শরীর (চেষ্টেন্দ্রিয়াশ্রয় শরীর, ন্যায়দর্শন ১।১১) অতএব শরীর যন্ত্র, চৈতন্য তাহার অধিষ্ঠাতা। চৈতন্য জন্যই শরীর। জীব শরীর তদধিষ্ঠিত চৈতন্য জন্য সেই চৈতন্য আশ্রয়ে সংগঠিত। ব্যষ্টি চৈতন্য জীবনী শক্তি বা প্রাণ শক্তি বলে, নিজ প্রয়োজন উপযোগী স্থূল শরীর পঞ্চ ভূতাত্মক জড় জগৎ হইতে সংগঠিত করিয়া লয়। আমরা সমাজ শরীরের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে সেই সমাজ শরীরস্থ চৈতন্যের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজ-শরীর কাহার জন্য সংহত, তাহা বুঝিয়া দেখিব। হর্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক মানবের জন্যই সে সমাজ। সমাজ মানুষের জন্যই সংহত। মানবাতিরিক্ত অন্য কাহারও জন্য সমাজ সংহত হয় নাই। একথা আংশিক সত্য। কিন্তু আমরা জানি যে মানব শুধু স্বার্থের জন্য সমাজবদ্ধ হয় না। মানুষ সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক মানবের জন্য সমাজ, একথা যেমন সত্য, আবার সমাজের জন্য মানুষ, ইহা ততোধিক সত্য কথা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্মিলিত

যা সমাজবদ্ধ হয় না; পরার্থেই প্রধানতঃ সম্মিলিত হয়। যে সকল পণ্ডিত কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্মিলনকে সমাজের মূল সূত্র বলিয়াছেন,তাঁহারা অদূরদর্শী, অন্যদিকে জীব শরীর সম্বন্ধে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু বা জীবকোষ দ্বারা জীব শরীর সংগঠিত হয়, জীব শরীর সেই সকল জীবকোষের জন্য সৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক জীবাণু, তাহার অণু চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া শরীরাধিষ্ঠিত এক চৈতন্য জন্য সংহত হয়। এই দেহস্থ চৈতন্য প্রত্যেক বাষ্টি জীবাণুর চৈতন্যের ঠিক সমষ্টি নহে। অতএব সমাজ যদি তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই কেবল সংহত হয়, তবে সমাজে ও জীব দেহের প্রভেদ বিস্তর। তাহা হইলে সমাজের শরীর কল্পনা করা ঠিক সঙ্গত হইবে না। কেননা, তাহা হইলে সমাজের সংহতি জীব দেহের স্বধর্ম্ম অপেক্ষা বৈধর্ম্ম অধিক হইবে। আমরা দেখাইব যে, এ সম্বন্ধে জীব শরীরের সহিত সমাজের বিশেষ পার্থক্য নাই। জীব শরীরের সহিত জীবাণুর যে সম্বন্ধ, সমাজ শরীরের সহিত সেই সমাজ অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের সেই সম্বন্ধ। কতকগুলি জীবাণুর সমষ্টিতে জীব শরীর, আর কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের সমষ্টিতে সমাজ শরীর, সমস্ত ব্যক্তির সমষ্টিতে মানব জাতি। সমাজ সেই সমষ্টি মানব জাতির অংশ, তাহার ব্যষ্টিরূপ, ক্ষুদ্র বৃহৎ সভ্য অসভ্য সমাজ অনেক। অসভ্য মানব সমাজ হইতে সভ্য উন্নত বিস্তৃত মানব সমাজের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ, সমাজের বিভিন্ন স্তর আছে; বিভিন্ন মানব সমাজকে এই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিতে মানব জাতি। সমাজের পূর্ণ বিকাশ হইলে সমস্ত মানব এক সমাজ অন্তর্গত হইতে পারে, তখন সমাজে ও মানব জাতিতে প্রভেদ থাকে না। বহুত্বে একত্ব জ্ঞান, ও একত্বে বহুত্ব জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। বিজ্ঞানে আংশিক একত্ব জ্ঞান লাভ হয়। তত্ত্ব জ্ঞানে পূর্ণ একত্বের ধারণা হয়। ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির ধারণা ও সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির ধারণা; আমাদের জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। অতএব যতক্ষণ আমরা বিভিন্ন সমাজকে ভিন্নভাবে দেখিব, ততক্ষণ আমরা আংশিক সমাজ বিজ্ঞান লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত সমাজ তত্ত্ব জানিতে পারিব না। অতএব ক্ষুদ্র বৃহৎ পরস্পর আপাত বিভক্ত সমাজ হইতে আমরা এক সমষ্টি বিরাট্‌ সমাজের ধারণা করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বলিয়াছি, ব্যষ্টি মানুষের সমষ্টি করিয়া বিভিন্ন মানব সমাজ একত্র করিয়া, মানব জাতি মনুষ্যত্ব(humanity),ইনি মানুষ, একথা বলিলে আমরা যেমন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দ্দেশ করি,সেইরূপ সেই ব্যক্তিকে মনুষ্য জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্থির করি। জাতি নিত্য, দেশ কাল বিভক্ত সমগ্র ব্যষ্টির একীভূত। সমষ্টিকৃতরূপ। সেই জাতির ব্যক্তির সমষ্টি একীকৃত ধারণা। ব্যক্তি বিশেষ সেই জাতির ব্যষ্টিরূপ, দেশ কালে তাহার অসম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ। বিবর্ত্তন নিয়মে সেই ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হয়,প্রতি মানুষে সেই মনুষ্যত্বের ধারণায় ক্রমাভিব্যক্তি হইতে থাকে। দেশ কাল সীমাবদ্ধ অবস্থা বিশেষের অধীন। এই পৃথিবীতে ক্রম বিকাশ নিয়মে সেই মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ সম্ভব হয়, ব্যক্তি মনুষ্যে তাহার ততদূর বিকাশ হইতে পারে। মনুষ্যত্ব জীবত্বের অংশ। সমষ্টি মানুষ সমষ্টি জীবের অংশ। আমাদের পৃথিবীর

অবস্থানুসারে, ইহাতে মানব অপেক্ষা উচ্চতর জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। আমরা অন্য পৃথিবীর কথা জানি না। সৌর জগতের অন্য কোথাও, অথবা অনন্ত নক্ষত্র জগতের মধ্যে কোন স্থানে, অথবা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কোন কালে মানব অপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের অভিব্যক্তি ছিল, কি হইতে পারে, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আমরা তাহার ধারণা বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। দেবাদি সূক্ষ্ম শরীরী কোন জীবের কথা সাধনাহীন আমরা এস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব না। আমরা এই পৃথিবীর কথা বলিতেছি। এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বই জীবত্বের উচ্চতম বিকাশ। মানুষই ভগবানের অনুগ্রহ স্বর্গ। মানুষেই ক্রমে জ্ঞানের সম্যক বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞানরূপী ভগবান মানুষের হৃদয়মন্দিরে বাস করিবার জন্য তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবান তাঁহার উচ্চতর জীবকল্পনাকে শরীরী করিয়া তাঁহার বিরাট জগতের এই পৃথিবীরূপ একাঙ্গে অভিব্যক্ত করেন। 'নারায়ণ' জ্ঞানে মনুষ্যত্বের বা সমষ্টি মানবের যে সমষ্টি কল্পনা নিত্য অভিব্যক্ত, তাহাই নর-আত্মা। নরোত্তম সেই কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি। ব্যষ্টি মানবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। মনুষ্যত্বে আমরা যে সমস্ত গুণসমষ্টির ধারণা করি, মানুষ বিশেষে তাহার পূর্ণ আমরা দেখিতে পাই না। অসভ্য নগ্ন দেহ আমমাংসভোজী আণ্ডামানবাসী মানবের ন্যায় জীবে মনুষ্যত্বের বড় সংকীর্ণ, বড় সীমাবদ্ধ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের মানুষ বলিতেই হয়ত সহজে প্রবৃত্তি হয় না। অন্য দিকে আধুনিক সমাজের মানুষবিশেষেও পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখা যায় না। একাধারে পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণ কর্ম্মী, পূর্ণ বীর, পূর্ণ ধার্ম্মিক, আদর্শ মানুষ আমরা পাই না, আমরা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কাহারও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ, কাহারও কর্ম্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ, কাহারও বা ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ, কাহারও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ, কাহার বা দেহের পূর্ণ বিকাশ কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই সকলের সমষ্টি করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের ধারণা করি। ব্যক্তিত্বের সমষ্টিতে জাতিত্বের ধারণা। মানুষ, গো, অশ্ব, বৃক্ষ প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের সমষ্টি ধারণা হইতে—জাতিত্বের ধারণা হয়। ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বাদ দিয়া কেবল সাধারণ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া তন্মূলে আমাদের জাতিত্বের ধারণা হয় না। জাতি বিশেষের আদর্শ (type) ধারণা করিয়া, তাহা হইতে সেই জাতির জ্ঞান আমরা লাভ করি না। কেন না, এই সমষ্টি ব্যতীত আদর্শের ধারণা ঠিক সম্ভব নহে।

কেবল ব্যক্তিগণিত সমষ্টিতে জাতির ধারণা হয় না। গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাহাকে Summation of infinite series বলেন; ঠিক তাহা হইতে জাতিত্বের ভাব পাওয়া যায় না। বৃক্ষের সমষ্টিতে বন ও জলের সমষ্টিতে জলাশয় জাতিবাচক নহে। জাতি বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের গুণ সমুদায়ের সমষ্টি হইতে, আমরা সেই সকল গুণের পূর্ণত্ব ধারণা করি। আমরা সে জাতির আদর্শ ব্যক্তি ধারণা করিতে পারি। বৃক্ষ নানা শ্রেণীর আছে। বৃক্ষ জাতি বা বৃক্ষত্ব বলিলে আমরা বৃক্ষের সাধারণ গুণ বুঝি না। সমগ্র বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের

বিশেষ গুণেরও সমষ্টি বুঝিয়া থাকি। যে শক্তি দ্বারা এই সমষ্টি গুণের বা বৃক্ষত্বের বিশেষ বিকাশ কোন বিশেষ বৃক্ষে হইয়া থাকে, সেই শক্তিকেই জাতি বলি। অবস্থা অনুসারে, বৃক্ষ বিশেষে বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে, বৃক্ষত্বে বিশেষ বিকাশ হয় মাত্র। মানুষ সম্বন্ধে এই কথা আরও বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। কেন না, মানবাতিরিক্ত জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ,কিন্তু প্রত্যেক মানবের বিকাশের সীমা—সেরূপ আবদ্ধ নহে। ব্যষ্টি, মানব মানবত্বের ক্রমবিকাশ দ্বারা পূর্ণ নরোত্তম রূপে পরিণত হইতে পারে।

ভগবানের অনন্তজ্ঞানে সমষ্টিরূপে জাতি কল্পনা নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আর ব্যষ্টিরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার নিম্নস্তর হইতে উচ্চতম আদর্শের বা পূর্ণত্বের বিকাশ পরিকল্পিত। ভগবানের প্রকৃতি অধিষ্ঠিত জাতি শক্তি বলেই সেই জাতির ব্যক্তি বিশেষের বিকাশ হয়। আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, জাতি সমানপ্রসবারাত্মক (১)। ভাব বা সত্ত্বার ক্রমানুবৃত্তি বা ক্রমাভিব্যক্তি হেতুই জাতি বা সামান্য (২)। প্রাদুর্ভাব ও বিনাশাত্মক (রজঃ ও তমঃ) এই দুই, সত্ত্বের গুণ দ্বারা যে এক সামান্য সত্ত্বা বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই জাতি। (৩) নিত্য একানুগত প্রত্যয় হেতু অনেকের সমবায়েই জাতি। (৪) ভগবানের এই মানব জাতি রূপ পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণাময়ী জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তি মানবঅন্তরে অধিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আদর্শ মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে ধারণা করে—যত সেই আদর্শের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, মানব ততই সেই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। ততই মানব ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া সমষ্টি মানবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই জাতিত্ব ভাবই সত্য ; ব্যক্তিত্ব ভাব অসত্য।

"সত্যং যত্ত্র সা জাতিত্য ব্যক্তয়োমতাঃ।" এই জাতিত্ব ভাব হইতেই ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। স্বয়ং ভগবতী বৈষ্ণবী শক্তি নারায়ণী সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা আছেন।

মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ভাবের মধ্যে জাতিত্বের অভিব্যক্তি হইতেই—সমাজের সৃষ্টি। সমাজ ব্যক্তি মানবকে সমষ্টি মানবত্বের দিকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যায় ; ব্যষ্টিকে সম্মিলিত করিতে, সমষ্টিতে পারিণত করিতে মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। সমাজ বহুত্বকে সম্মিলিত করিয়া একত্বের দিকে লইয়া যায়। অনেক মানবের সম্মিলনে এক সমাজ। সমস্ত ব্যষ্টি সমাজের সমষ্টিতে এক বিরাট মানব সমাজ সমগ্র মানব জাতি। সুতরাং সমষ্টিভূত সেই বিরাট মানব সমাজেই পূর্ণ মানবত্বের অভিব্যক্তি। সমাজের সমষ্টি একীভূত হইয়া পূর্ণ সমাজত্বের বিকাশ হয়। সেই পূর্ণ বিরাট সমাজই ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্মের বিরাট রূপ।

আর্য্য ঋষিগণ এই বিরাট সমাজ শরীর তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভকে জীবত্বের সূক্ষ্ম রূপ বা শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মা বা মহাজীব শরীরের চারি অংশ।

(১) সমান প্রসবাত্মিকা জ্যোতিঃ। ন্যায়দর্শন ২।২।১

(২) ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। বৈশেষিক দর্শন।

(৩) প্রাদুর্ভাব বিনাশাভ্যাং সত্ত্বস্য যুগপৎগুণৈঃ।
অসর্ব্বনিষ্কং বহুর্থাং তাং জাতিং কবয়োবিদুঃ॥

(৪) "নিত্যৈকানু সত্য প্রত্যয় হেতুরনেক সমবায়িনী জাতি, ইতিদশমী।

ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তক, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার উরু (trunk) ও শূদ্র তাঁহার পদ। হিরণ্যগর্ভে যত জাতীয় জীব কল্পনার অভিব্যক্তি হয়, সকল জাতীয় জীবের সমষ্টি বা বিরাট দেহে এই চারি অঙ্গের অভিব্যক্তি হয়। নবজীবনের দ্বিতীয় ভাগে শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর বসু মহাশয়ের প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম, "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, প্রকৃতি সম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব অংশটী ব্রহ্মা নামে অভিহিত। * * জীবেতে সমষ্টি ভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভোগবাসনা সম্বন্ধে যত বিধি বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। * *। সেই সার্ব্বভৌমিক দশইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মহা মানসবীজ হইতে জীব সমষ্টির প্রবৃত্তি রাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্ম ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। তৎ সমুদায়ই ব্রাহ্মণ প্রজাপতি শব্দে উক্ত হয়। মরীচি অত্রি...... প্রভৃতি দশজন ব্রাহ্মণ প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব। মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্র রূপ ধাতুর অংশ, এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (দ্বিতীয় ভাগ নবজীবন ৫১৩।১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দেবতাদের মধ্যেও এইরূপ বিভাগ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অগ্নি দেবতা ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রহ্মার মুখ, সকল দেবতার মুখ, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতা ক্ষত্রিয়। বসু, রুদ্র, আদিত্যাদি গণদেবতাগণ বৈশ্য, আর পৃথিবী শূদ্র দেবতা।

এইরূপ মানব প্রভৃতি জীব জাতির মধ্যে সমষ্টি মানবরূপ ব্রহ্মার বিরাট দেহের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি অংশ বা অঙ্গ আছে। তবে আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের সমষ্টি মানব সমাজরূপ বিরাট দেহের কথা ও তাহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণোৎপত্তির কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা শ্রুতি হইতে পাই,

> "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।
>
> ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।১০।৯০ (পুরুষসূক্ত)
> শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩১।১১।
> অথর্ব্ব বেদেও এইরূপ মন্ত্র আছে।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, বিরাটরূপী ভগবানের বিরাট শরীরের অঙ্গ মাত্র। গীতায় গুণকর্ম্ম বিভাগ হইতে যে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির কথা পাই, তাহা এই অর্থে বুঝিতে হইবে। পুরাণে ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি, তাহাও এই অর্থে বুঝিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভে তাহার কল্পনা হইতে বিরাট রূপে তাহার অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। এইরূপে আমরা হিরণ্যগর্ভ হইতে সমষ্টি জীবের ও তদন্তর্গত সমষ্টি মানবের বিরাট দেহ বিশেষের কথা বুঝিতে পারিব। হিরণ্য গর্ভের যাহা মানস-সৃষ্টি, তাহাই ভগবানের বিরাট দেহে অভিব্যক্তি হয়, তাহা বুঝিতে পারিব।

এইরূপে আর্য্য ঋষিগণ সমষ্টি মানবের ও সমগ্র মানব জাতির এক বিরাট সমাজের ধারণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল হিন্দু বা আর্য্য সমাজের জাতি বর্ণ ভেদের কথা বলেন নাই, সমগ্র মানব জাতির বর্ণ ভেদের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, সমগ্র জীবন মধ্যে এই বর্ণভেদ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। বর্ণ ভেদ বা সমাজ শরীরের বিভিন্ন অংশের গুণ ও

কর্ম্মবিভাগ তত্ত্ব আর কোন দেশীয় কোন পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তবে অনেক আধুনিক পণ্ডিত সমগ্র মানব জাতির একত্ব ধারণা করিয়াছেন। সমস্ত বিভিন্ন সমাজ একীভূত করিয়া humanity রূপ বিরাট সমাজদেহের কতকটা আভাষ দিয়াছেন। ফরাসি পণ্ডিত কোমত বোধ হয় তাহারও অগ্রণী। তিনি humanity ব্যতীত অন্য ঈশ্বরই স্বীকার করেন নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্তে (Fichte) এইরূপ মানব জাতির একত্ব ধারণা করিয়াছেন,—

This living and visible manifestation of the divine life we call human race. * * as Being absolute Being, constitutes the divine life and is wholly exhausted therein (?) so does existence in time, or manifestation of the divine life constitutes the whole united life of mankind and is thoroughly and entirely exhaushted therein (?) Thus in its manifestation, the divine life becomes a continually progressive existence. * * The progressive culture of the human race is the object of the Divine Idea. * * The Life of Man which in truth essentially one and indivisible is divided into the life of many proximate individuals.

Fichte "On the nature of the scholar."

জর্ম্মান পণ্ডিত হেগেল, সমাজদ্বারা আত্মার মায়িক বিকাশ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের প্রকাশিত এই তত্ত্ব ইটালীর অসাধারণ কর্ম্মবীর ম্যাটসিনি তাঁহার প্রচারিত "মানুষের কর্ত্তব্য" শীর্ষক অসাধারণ গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ম্যাট্‌সিনির বাক্য আমরা ২।১ টী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Humanity is the word (Logos) living in God. The spirit of God fecundales it, and manifests itself through it * *

Humanity is the successive incarnation of God. In your terrestrial existence, limited both in education and capacity, the realisation of this Divine Idea can only be most imperfect and momentary. Humanity only ....is capable of gradually evolving, applying and glorifying the Divine idea.

We have yet to teach mankind that as humanity is one sole body, all we, being members of that body, are bound to labour for its development * * we can only elevate ourselves towards God through the souls of our fellowmen........

Mazzini "On the duties of man."

অন্য কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এতক্ষণ যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সমগ্র মানব জাতি বা সমাজ এক। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমগ্র মানব সমষ্টির কল্পনা হইতে এই বিরাট, এক অখণ্ড মানব সমাজের ধারণা হয়। এই সমাজে মানব প্রবাহ অনন্ত। প্রতিদিন লক্ষ লোকের জন্ম হইতেছে, লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে। কিন্তু এই নিত্য মানবপ্রবাহ মধ্যে এক অখণ্ড মানবত্ব, এক অনন্ত মানব সমাজ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই সমগ্র মানব সমাজ ভগবানের বিরাট শরীরের একরূপ। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ সেই এক বিরাট সমাজের আংশিক বা ব্যষ্টি সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র। ভগবানের সমষ্টি মানবত্বের ধারণা হিরণ্যগর্ভের মানসরূপে প্রকট হইয়া তাঁহার বিরাট রূপে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে থাকে। সমষ্টি মানবত্বের এই ক্রমবিকাশ হেতু খণ্ড মানবসমাজ। আমরা দেখিয়াছি যে, শরীর মাত্রই পরার্থ সংহত, তদন্তরস্থ আত্মা বা চৈতন্যের প্রয়োজন জন্য অভিব্যক্ত সমাজ শরীরাভ্যন্তরস্থ এই চৈতন্য, এই সমাজাত্মা হিরণ্যগর্ভ প্রত্যেক দেহকে ক্ষেত্র বলে। তদধিষ্ঠিত চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। স্বয়ং ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে প্রতি শরীরে (সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে) অধিষ্ঠিত। বিরাট সমাজ ক্ষেত্রের ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ। পরম জ্ঞাতা রূপে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। আর সমাজ শরীরে সেই শরীরাভিমানী আত্মা

রূপে বা পূর্ণ এক মনুষ্যত্ব ভাবে তিনি হিরণ্যগর্ভ। সমগ্র মানব সমাজ সেই হিরণ্যগর্ভের বিরাটরূপ। হিরণ্যগর্ভের মানব সৃষ্টি কল্পনা বীজই মনু। প্রত্যেক মানব এই সমষ্টি মনুষ্যত্বের এই মনু ভাবের ব্যষ্টি বিকাশ। এই জন্য মানব মনুর সন্তান।

এই বিরাট সমাজ শরীরের ধারণা সহজে সম্ভব নহে। "মানুষে মানুষে পৃথক" —যতক্ষণ আমাদের এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ আমরা এই সমষ্টি মানবত্বের ধারণা করিতে পারি না। ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতীত, আমাদের এই একত্ব ধারণা সম্ভব নহে। ব্রহ্মের বিরাটরূপ না বুঝিলে, আমরা এই অদ্ভুত সমাজ শরীরের কথাও ঠিক বুঝিতে পারি না। যে সম্প্রদায় মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট দাস রূপে কল্পনা করেন, তাঁহারা মানুষে মানুষের একত্বের কোন মূলসূত্র ধরিতে পারেন না—তাঁহারা এই বিরাট সমাজ শরীর তত্ত্ব ধারণা করিতে পারেন না। ভক্তাবতার খ্রীষ্ট আজ উনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথমে পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন, সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই ভাই ভাই, সকলে সমান। তিনি এই মহা সাম্যবাদ স্থাপন করিয়া প্রথমে মানবের মধ্যে একত্বের আভাস দিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া ও ঈশ্বরের সহিত তাঁহার একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি মানবে মানবে একত্ব আরও পূর্ণরূপে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পুস্তকে (বাইবেল)এ সমাজ শরীরের আভাষ আছে, সেণ্টপল বলিয়াছিলেন,—

"For as we have many members in one body, and all members have not the same office; so we being many, are one body in Christ, and every one members one of another" (Romans XII. 4. 5.)

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান্ ইউরোপে এই তত্ত্বের সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই। রূসো যখন ফরাসীদেশে তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করেন, তখনও এই তত্ত্ব অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ছিল। কেন না তাঁহার সাম্যবাদ বিকৃত আংশিক। তাই তাঁহার সমাজ বিজ্ঞান আংশিক অপূর্ণ। যতক্ষণ প্রকৃত সম্যবাদ না শিক্ষা হয়, যতক্ষণ সনাতন ধর্ম্মের সহায়ে আমরা প্রকৃত একত্বের ধারণা করিতে না পারি, যতক্ষণ আমরা কেবল ভাই ভাই নহে, শুধু এক পিতা মাতার সন্তান নহে, কিন্তু আমরা মূলতঃ সক এক, একথা না বুঝিতে পারি, যতক্ষণ তুমি আমি এক, আমরা সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, আমাদের এই তুমি আমি প্রভেদ ব্রহ্মের মায়াময় কল্পনাজাত অজ্ঞান-প্রসূত, একথা না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ আমরা সমাজ শরীর-তত্ত্ব মনুষ্যত্ব কথা বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ আমরা সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্ম না হইতে পারি, যতক্ষণ আমরা এই প্রকৃত সাম্যে অবস্থান করিতে না পারি, ততক্ষণ মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। ততক্ষণ আমরা ব্যষ্টি সমাজ শরীরের ক্রম বিকাশ দ্বারা মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব ধারণা করিতে পারিব না।

আমাদের ধর্ম্ম ও আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে, আমাদের এই শিক্ষা দেয়। আমরা সাধনা বলে সেই শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ব করিতে পারিলে ক্রমে আমাদের মধ্যে 'তুমি' 'আমি' এই পার্থক্য জ্ঞান ক্রমে হীন হইতে থাকে, আমাদের ব্যষ্টি সমাজ সেই একত্ব জ্ঞান সাধন করি-

বার তুমি, সেই একত্ব জ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার প্রকৃত ক্ষেত্র।

এই একত্ব জ্ঞানের বীজ আমাদের সকলের অন্তরেই নিহিত আছে, পরের সঙ্গে সহানুভূতিতে, আমাদের স্নেহ, প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে আমরা সেই একত্ব জ্ঞানের আভাষ পাই, আমাদের "আত্মীয়তাতে" সেই একত্ব জ্ঞানের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয়। তোমাতে মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশ দেখিয়া আমার অন্তরে যে স্ফূর্ত্তি, যে আহ্লাদ হয়, আমার নিজের মনুষ্যত্বের প্রসার বৃদ্ধি হইল মনে করিয়া অলক্ষ্যে যে আন্তরিক ভাবের বিকাশ হয়, তাহাতে আমরা এই একত্ব জ্ঞানের আভাষ পাই। ঐ যে বুরবীর তাহার সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, সদলে নির্ম্মূল হইবে জানিয়াও আত্মসমর্পণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছে না, অন্যদিকে যে ইংরাজবীর তাহার দেশের, তাহার সমাজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে; সেই যুদ্ধের কথা শুনিতে আমরা এত উদগ্রীব হইয়া থাকি কেন? তাহাদের জয় পরাজয় সংবাদে আমরা এত আকুল হই কেন? মুষ্টিমেয় বুরদিগের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয়ে, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষাবৃত্তির বিশেষ বিকাশ দেখিয়া, অধিকাংশ ইংরাজ কেন তাহাতে নিজের নিজের মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশ মনে করিতেছেন, তাহাদের শত মুখে প্রশংসা করিতেছেন?

পৃথিবীর এক প্রান্তে আমাদের সহিত সংস্রববিহীন স্থানে, কে ঐ অবতীর্ণ হইয়া দারুণ বাধা বিঘ্ন সত্বেও মহাসত্য প্রচার করিতেছেন, তাহার জন্য নিজে লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতেছেন, এমন কি, আত্মবলি দিতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইতেছেন, তথাপি সে সত্য পথ পরিত্যাগ করিতেছেন না; সে সত্য প্রচার দ্বারা সমাজের উন্নতি চেষ্টা হইতে বিরত হইতেছেন না? তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়া ভক্তিভরে কেন অবনত হও? কেন তাঁহার দ্বারা তোমার নিজের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতেছে মনে কর? অথবা ঐ যে বিদেশী ধর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেছে, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া অগ্নিতে জীবন ভস্মীভূত হইতেছে, উহার মাহাত্ম্যে তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময় হইয়া যাও কেন?

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তুমি আপনাকে অতীত ঘটনার সহিত তন্ময় করিয়া দাও কেন? আমাদের দেশে বা গ্রীস, রোম প্রভৃতি সমাজে পুরাকালে কত বীর দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পরের জন্য, অকাতরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া আত্মহারা হও কেন? যে বীর একদিন হলদি ঘাটে বা থাম্মপলিতে স্বদেশ রক্ষার জন্য অদ্ভুত বীরত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন, সেই বীরত্বের বিকাশে নিজের বিকাশ মনে কর কেন? যে সব ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মস্থাপন ও জীব দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণ শুনিয়া উৎফুল্ল হও কেন, আত্মহারা হও কেন? তাহাদের সহিত তুমি আপনাকে একীভূত করিয়া দিতে চাও কেন? তুমি সেই সকল অতীত, বর্ত্তমান মহাপুরুষের প্রতিবিম্ব আপনাতে দেখিতে পাও, তোমার মনুষ্যত্বের কতদূর বিকাশ হইতে পারে, তাহা হইতে তুমি বুঝিতে

পার, সমষ্টি মানব কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা হইতে কতকটা ধারণা করিতে পার। তোমার বিকাশ কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, তোমার বিভূতি কি, তাহা বুঝিতে পার। তোমাতে ব্যাসাদির ঋষিত্ব, বাল্মিকীর কবিত্ব, কপিলের সিদ্ধি, বুদ্ধের জ্ঞান, ধ্রুব প্রহ্লাদাদির সাধনা, নারদাদির ঈশ্বরভক্তি, চৈতন্যের প্রেম সকলেরই বীজ নিহিত আছে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভাব, ভীমের সামর্থ্য, অর্জ্জুনের বীরত্ব, রামের মহত্ব, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব, কর্ণের দানবৃত্তি, দধীচির আত্মত্যাগ অথবা বর্ত্তমান কালের [illegible], ম্যাটসিনির দেশ ভক্তি, শঙ্কর, [illegible]র জ্ঞান, নিউটনের পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ মানবের মনুষ্যত্ব বীজ তোমাতে আছে। তোমাতে সীতার পাতিব্রত্য, সাবিত্রীর সতীত্ব, পদ্মিনীর তেজস্বিতা, সকলেরই বীজ আছে। তোমাতে তানসে[illegible]নের গীতশক্তি, র‍্যাফেলের চিত্রবিদ্যা, কালিদাস বা সেক্ষপীয়রের কাব্য-শিল্প প্রভৃতি সকলের বীজ নিহিত আছে। তোমাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বীজ আছে, সাধনাবলে, সেই বীজের পরিণতি হইলে, তুমি সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পার। যখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র আমিত্বকে ভুলিয়া সমগ্র মানব সমাজে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে পারিবে, যখন তুমি তোমার সংকীর্ণ আমিত্বকে, ব্যক্তিত্বকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়া প্রকৃত আত্ম সম্প্রসারণ দ্বারা তোমার সকল 'তুমি' কে 'আমি' করিতে পারিবে, তখন তোমার পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের পথ উন্মুক্ত হইবে। সমাজ এই আত্ম সংপ্রসারণ শিক্ষার প্রকৃত ভূমি। সমাজের সমষ্টি জ্ঞান. হইতে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়, সাহিত্য সেই সমষ্টি জ্ঞানের ভাণ্ডার। সমাজের সমষ্টি কর্ম্ম হইতে আমাদের কর্ম্মশক্তি বিকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। আমরা সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকের আচরণ হইতে, তাহাদের মনুষ্যত্বের সমষ্টি হইতে, যে পরিমাণ আদর্শ লাভ করিতে পারি, আমরা সেই আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হই। আমরা সমস্ত মানব সমাজের একীভূত ধারণা করিতে না পারিলেও আমরা যাহাকে নিজের সমাজ বলি, তাহা হইতে আমরা সচরাচর এই আদর্শ পাই। নিম্ন শ্রেণীর সমাজে যে আদর্শ মলিন, সংকীর্ণ। আবার মানবের মধ্যে মনুষ্যত্বের সঙ্গে পশুত্বের বীজ আছে। সমাজ সেই পশুত্বের বীজ ধ্বংস করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব বীজের বিকাশ কল্পে সাহায্য করে। মানবকে সমাজ শরীরের অন্তর্গত করিয়া লয়।

প্রথমে সমাজ মধ্যে পরিবারই আমাদের আমিত্বকে, পশুত্বকে, স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম পরিবারের সকলকে আত্মীয় বোধ হয়। ক্রমে পরিবার হইতে সমাজে আমাদের আমিত্বের সম্প্রসারণ হয়, সমাজের সকলকে আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। যখন সমগ্র মানব জাতিতে এই আত্মীয়তার সম্প্রসারণ হয়, তখনই মনুষ্যত্ব লাভ হয়। পরিবারে ক্ষুদ্র আমির পরিবর্ত্তে পারিবারিক 'আমি'র বিকাশ হয়। পারিবারিক 'আমি' সামাজিক বা জাতীয় 'আমিতে' পরিণত হয়, আর সামাজিক 'আমি' সমগ্র মানবত্বের 'আমি তে' পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব বা সমষ্টি মানবত্ব হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব, ইহাই আমাদের মুক্তির এক সোপান। এই রূপেই মানুষ অণু হইতে মহৎ হয়।

ম্যাটসিনি বলিয়াছেন,—

"Family, fatherland, humanity are they not the three steps of the ladder which leads up from man to God."

আর সময় নাই, আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা এ স্থলে শেষ করিতে হইতেছে। আমরা সমাজ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, তাহা বলা হইল না। আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই বলিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান কালে আমরা সমাজের দুই প্রধান আদর্শ দেখিতে পাই। এক প্রাচীন হিন্দু আদর্শ, আর এক আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ। ইহার মধ্যে কোন্ আদর্শ শ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা আলোচনা করিবার অবসর পাই নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু 'কঃ পন্থাঃ' প্রবন্ধে এই স্থানে পূর্ব্বে সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সে কথা পুনরালোচনার প্রয়োজনও নাই। আমাদের সমাজ প্রকৃত আদর্শ হইতে কত দূরে পড়িয়াছে, তাহাও এস্থলে বুঝিবার অবসর নাই। সে যাহা হউক, আমরা যে তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে আদর্শ সমাজ কাহাকে বলে, তাহার আভাষ পাইয়াছি।

আমরা যে বিরাট সমাজের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা, আমাদের আদর্শ সমাজ কি, তাহা বুঝিয়াছি। যেমন সচ্চিদানন্দ ভগবান স্বয়ং আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ, তেমনই সচ্চিদানন্দ ভগবানই সমাজের আদর্শ। তাঁহারই কল্পনাস্থিত পূর্ণ জ্ঞানময়, পরার্থ কর্ম্মময়, পূর্ণ আনন্দময় পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্বের নিত্য আদর্শ ধারণা করিয়া আমরা সমাজের আদর্শ লাভ করি। যখন সমুদায় ব্যষ্টি সমাজ সেই এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত হইয়া যাইবে, সকলেই পার্থক্য মধ্যে সেই মহান একাত্মতা অনুভব করিবে, যখন যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইবে, সকল সমাজ মিলিয়া পরস্পরের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবে; যখন সমাজে আমাতে তোমাতে ভেদজ্ঞান সংকীর্ণ হইয়া আসিবে, তোমার প্রতি যে ব্যবহার করি, সে প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতিই ব্যবহার, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, তোমার সুখে, আমার সুখ, তোমার অবনতিতে আমার অবনতি মনে করিতে পারিব; যেমন শরীরের এক অঙ্গের ক্ষতি হইলে সমুদায় শরীরের ক্ষতি হয়, তেমনই কোন এক সমাজের অবনতি হইলে সেই বিরাট সমাজের অবনতি হইল, মনুষ্যত্ব বিকাশের বাধা হইল, তোমার নিজের মনুষ্যত্ব সংকীর্ণ হইল, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন সমাজের লোকেরা স্বার্থের ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণতা ভুলিয়া পরার্থ বৃত্তির বিকাশ দ্বারা ক্রমে আত্মসম্প্রসারণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, যখন সমাজের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য দূর হইয়া যাইবে, তখন সমাজ প্রকৃত আদর্শ সমাজের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তখন সমাজ শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে, যে সকল সম্বন্ধ হইতে সমাজবদ্ধ হয়, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়া পরস্পরকে এক ধর্ম্ম, এক কর্ম্ম, একরূপ করিয়া পরস্পরকে এক সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া দিবে; যখন সমাজ শরীরের পূর্ণবিকাশ হইবে, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কার্য্যবিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত থাকিবে, সমাজে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্গ বিভাগ গুণকর্ম্মানুসারে সমাজের বিভাগ সুব্যবস্থিত থাকিবে, শঙ্করবর্ণ উৎপন্ন দ্বারা সমাজের কোন বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিবে না; যখন সমাজের

উন্নতি, রক্ষণ, পোষণ, ও সেবার কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত, সুব্যবস্থিত থাকিবে, সমাজের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানার্জ্জন করিয়া সাধারণে সে জ্ঞান প্রচার করিবেন, ক্ষত্রিয় ও রাজা সমাজকে ও সমাজ-ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন, বৈশ্য প্রয়োজন মত সমাজের পোষণ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ জন্য কৃষি, শিক্ষা, পররক্ষা ও বাণিজ্য কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিবে, শূদ্র উক্ত সকল কর্ম্মের সহায়তা করিবে, যখন সমাজের সকল লোক বর্ণ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ভাবিয়া, তপস্যা ভাবিয়া, ঈশ্বর আরাধনার প্রকৃষ্ট উপায় ভাবিয়া সম্পাদন করিবে; যখন সমাজে সকলের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রভৃতির পূর্ণবিকাশের পূর্ণ সুবিধা থাকিবে, যখন সমাজে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা বিদ্যা ও শিল্পের যথোপযুক্ত চর্চ্চা থাকিবে, রাজা ও রাজকর্ম্মচারী প্রকৃষ্টরূপে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দ্বারা পরিচালিত হইবে, তখন সমাজ প্রকৃত আদর্শ সমাজাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যে ধর্ম্ম সমাজের প্রাণ, যে ধর্ম্মবলে সমাজের উন্নতি ও পরিণতি হয়, যে ধর্ম্ম হইতে সমাজ প্রকৃত আদর্শ লাভ করে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে সেই মহান আদর্শ অভিমুখে লইয়া যান্, যে ধর্ম্ম আমাদের পশুত্ব, স্বার্থ, ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ করিয়া ও পরার্থবৃত্তির বিকাশ দ্বারা আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ করেন, সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করেন, যখন সমাজ সেই প্রকৃত ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানীগণ ও রাজা সেই ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, সমাজে অধর্ম্ম প্রবেশ করিতে দিবেন না, তখন সমাজ আদর্শ অভিমুখে নীত হইবে। যখন সমাজে পরিবার পূর্ণ আদর্শে গঠিত হইবে, পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া আমিত্বের সম্প্রসারণ দ্বারা 'পরিবার জীবন' লাভ করিবে, পতিপত্নীর প্রেম পূর্ণ বিকশিত হইবে, সতীত্বের পূর্ণ পরিণতি হইবে, যখন সন্তানগণের ও উপযুক্ত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকিবে, তখন সমাজ আদর্শ অভিমুখে যাইবে। যখন সমাজের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তির সুবন্দোবস্ত থাকিবে, দারিদ্র্য, জরা, ব্যাধি, অকালমৃত্যু সমাজ হইতে দূরে যথাসম্ভব অপসারিত হইবে, তখন সমাজ আদর্শ লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইবে। যখন সমাজ পরকাল লক্ষ্য করিয়া, ধর্ম্ম ও মোক্ষ প্রধান পুরুষার্থ মনে করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইবে, ইহকালসর্ব্বস্ব হইয়া ইহকালের সুখ-সমৃদ্ধির লাভ, অর্থ, কাম, ভোগকে পরম পুরুষার্থ মনে করিবে না, যখন সমাজ ইহকালসর্ব্বস্ব সমাজের কর্ম্মশক্তির সহিত পরকালসর্ব্বস্ব সমাজের জ্ঞান একীভূত করিয়া উভয় সমাজের আদর্শের সামঞ্জস্য করিয়া আরও উচ্চতর আদর্শে সংগঠিত হইবে; যখন সমাজ তাহার কর্ম্মশক্তিকে সাত্বিকভাবে পূর্ণ পরিচালিত করিয়া সমাজের ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের জন্য নিযুক্ত করিবে, এক কথায় যখন সমাজ প্রকৃত সাত্বিক সমাজে পরিণত হইবে; তখন সমাজ আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে।

মানুষের ন্যায় সমাজমাত্রেই আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হয়, ক্রমে আমরা সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হই বটে, কিন্তু আদর্শ লাভ করিতে পারি না। প্রথমে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা জন্য আদর্শও বড় মলিন থাকে। যত আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ততই

আদর্শ পরিস্ফুট হইতে থাকে। মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই আদর্শ ইন্দ্রধনুর ন্যায় পিছাইয়া যায়, তাহাকে কেহ ধরিতে পারে না। বুঝি এ পৃথিবীতে সে আদর্শ মিলে না। তথাপি লোকে আদর্শ ধরিবার জন্যই আজীবন চেষ্টা করে। সমাজও তাহার আদর্শ ধরিবার জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে।

তবে আসুন সকলে, আমরা সেই এক বিরাট সমাজকে ভগবানের বিরাট শরীর বুঝিয়া, বিরাট সমাজ মধ্যে সেই সমাজাত্মা ভগবানকে জানিয়া, প্রত্যেক সমাজে সেই সমাজাত্মা ভগবানের সহায়ে তাঁহারই বিরাট রূপের আংশিক বিকাশ ধারণা করিয়া, প্রত্যেক মানবে সেই ভগবানকে দর্শন করিয়া, সমষ্টি মানব হইতে মনুষ্যত্ব তত্ত্ব লাভ করিয়া, সমাজকে সেই মনুষ্যত্বের ক্রম বিকাশিত ব্যষ্টিরূপ, পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্র সিদ্ধান্ত করিয়া, সমাজমধ্যে দেশকাল অনুসারে ভগবানের সেই মহামহিমাময় মনুষ্যত্ব কল্পনার পূর্ণ আদর্শরূপের অবতারকে অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিত্ব ও স্বার্থ ভুলিয়া, পরার্থ কর্ম্ম করিয়া, ভগবানের মহামমতাময়ী প্রকৃতির সহায়ে সেই মহান আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর হই। আর আমাদের অন্য কর্ম্ম নাই, আর আমাদের অন্য গতি নাই। ভগবান আমাদের সহায় হউন। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সমন্বয় কি অসম্ভব ?

সে আজ দুই শতাব্দীরও অধিক কালের কথা। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিক মহলে এক মহা আনন্দের রোল উঠিল। চক্ষুর অগোচর কত সৌন্দর্য্যের রাজ্য, প্রকৃতির কত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহা চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইয়া যে দেখিল—সেই মাতিয়া উঠিল।

সেই সময়ের একটী ঘটনার কথা তবে বলি।

সুবিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত স্বোয়ামার্ডাম (Swammerdam) স্বীয় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন ও একেবারে আনন্দে বিভোর হইয়া যান। এইরূপে বিজ্ঞান জগতকে উপহার দিবেন বলিয়া রাশি রাশি সত্য লিপিবদ্ধ করিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল "একি কথা? ভগবান যাহা সযতনে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন—প্রকৃতির সে সকল লুকান তত্ত্ব বাহির করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিতেছি—একি দুর্ম্মতি আমার!" এই সন্দেহে পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়া গেল। ধর্ম্মভীরু স্বোয়ামার্ডাম আপনার অতি আদরের ধন—সুযত্ন-সঙ্কলিত পুঁথি ধ্বংস করিলেন! বিজ্ঞানের এরূপ দুর্ভাগ্য এখন অনেক কমিলেও—একেবারে ঘুচে নাই।

ঠিক ইহার দুই শতাব্দী পরেও দেখুন—

অক্ষয়কিরীটী ডারুইন যখন ক্রমবিকাশবাদের প্রবর্ত্তনা করিলেন, তখন চারিদিক হইতে বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শর ও তীব্র প্রতিবাদের গোলাগুলি তাঁহার উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল। ডারুইনের মতের বিরুদ্ধে যাঁহারা খড়্গহস্ত হইলেন—ধর্ম্মাচার্য্যগণই তাঁহাদের অগ্রণী! তাঁহারা একমত হইয়া বলিলেন,

চিরন্তন বিশ্বাসকে যদি বাঁচাইতে চাও, সনাতন ধর্ম্ম মতকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই বিকারগ্রস্ত ডারুইন-প্রবর্ত্তিত মতের শৈশবেই তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধন কর। এই আক্রমণের ফলে, ডারুইনের হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। বুঝিবা লোকাভিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের প্রজারঞ্জনার্থে জানকী বর্জ্জনের ন্যায়—ডারুইনও প্রাণপ্রিয় ক্রমবিকাশবাদকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইতেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আরো কয়েকজন বীরপুরুষ ক্রমবিকাশবাদের পক্ষ সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সে তর্ক বিতণ্ডার কথা বৈজ্ঞানিকগণ আজিও ভুলিতে পারেন নাই। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড নগরে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সমিতি ব্রিটিস এসোসিয়েসনের অধিবেশনে অক্সফোর্ডের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (বিশপ) ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার প্রবর্ত্তককে তীব্র আক্রমণ করিয়া অকাতরে সুরুচি বিরুদ্ধ' পরুষ ভাষা প্রয়োগ করিলেন। পদমর্য্যাদার কবচে সুরক্ষিত বিশপ ভাবিয়াছিলেন, ক্রমবিকাশবাদকে একেবারে পিষিয়া মারিবেন। কিন্তু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। বিশপের হস্তে বৈজ্ঞানিক মত ও শিষ্টাচারের এরূপ লাঞ্ছনা কয়েকজন প্রসিদ্ধনামা যুবকের নিকট অসহ্য বোধ হইল; ইহার সম্যক প্রতিবাদে তাঁহাদের কণ্ঠ উচ্চারিত হইল। এই তর্কে বিশপ হটিলেন। তাঁহার প্রতিবাদকারীগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কুলতিলক সত্যনিষ্ঠ হাক্সলী (Huxley) ও উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিশারদ সুবিখ্যাত হুকারের (Hooker) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিস-সমিতি অনেক স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার অক্সফোর্ডে মিলিত হইলেন। দৈবের লিখন এমনই বিচিত্র যে, এই অধিবেশনেও আবার সেই চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার পুনরাভিনয় হইল! ব্রিটিস রাজতরণীর বর্ত্তমান কর্ণধার লর্ড সাল্‌সবেরী এই অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত হন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিতও সভাপতির বক্তৃতায় তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রমবিকাশবাদকে আক্রমণ করিলেন। এবারও হাক্সলী ক্রমবিকাশবাদের সমর্থনে দাঁড়াইলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রমবিকাশবাদ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপিও এই মত লইয়া 'ব্রিটিস বৈজ্ঞানিক সমিতির সভাপতি বিদ্রূপ করেন, ইহা বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রাণে বড়ই বাজিল। নির্ভীকচেতা হাক্সলী শুধু সেই সভাতে তাহার প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু সাল্‌সবারীর বিদ্রূপের সমুচিত উত্তর দানে আবার তিনি লেখনী ধারণ করিলেন।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিবাদ কিন্তু নূতন নহে। আবহমান কাল হইতে ইহাদের অনর্থক বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের জন্ম হইতেই ধর্ম্ম ইহাকে সপত্নী তনয়ের ন্যায় চক্ষুশূল মনে করেন। মানবজাতির অতি শৈশবাবস্থাতেই ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অনধিকার প্রয়াস ধর্ম্মের পক্ষে বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, পাষাণ-হৃদয় দুর্য্যোধন যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতীক্ষ্ণ সূচীশৃঙ্গে যতটুকু ভূমি আবৃত হইতে পারে, ততটুকুও বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না—তেমনি বিজ্ঞানও ধর্ম্মতত্ত্বের

কোন কথাই বিনা তর্কে গ্রহণ করিবেন না, পণ করিলেন। বিজ্ঞান এক একটী নূতন রাজ্য অধিকার করিতেছে, আর ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ যেন বাড়িয়া যাইতেছে। এক একটী অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, আর প্রাচীন ধর্ম্মমতের গোড়া পর্য্যন্ত নাড়া পায়।

বর্ত্তমান সময়ে একদিকে যেমন প্রাচীন ধর্ম্মে জনসাধারণের আস্থা উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সরল বিশ্বাসিদিগের হৃদয় আতঙ্কিত হইতেছে, এবং তাঁহারা বিজ্ঞানকেই এই পরম অনর্থের মূল জানিয়া তাহার প্রচারে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। এমন কি, ধর্ম্মাচার্য্যগণও প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞানের উদ্দেশে অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতেছেন। অপরদিকে, বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যাঁহারা প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ধর্ম্মতত্ত্বের নামে ভ্রূকুটি করেন, অথবা তাহাকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, তাঁহাদের এ সন্দেহের ভাব কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয়। বিজ্ঞানের শিক্ষায় মানুষের চিন্তা ও প্রকৃতিকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলে যে, তাহারা আপনা হইতেই নিয়ম ও শৃঙ্খলার নিকট মস্তক অবনত করে। বিজ্ঞানের রাজ্যে নৈসর্গিক নিয়মের আধিপত্য—এ সিংহাসন অচল অটল। নিয়ম ও শৃঙ্খলার চিরানুগত দাস যে হইয়াছে, সে যেখানে নিয়মের অভাব দেখিবে, সেখানে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে, তাহা কি বিচিত্র? বিজ্ঞানের বরপুত্রগণ নিসর্গকে স্বতন্ত্র চক্ষে দেখেন। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনা তাঁহাদের নিকট নিয়মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। বিজ্ঞানের প্রত্যেক তত্ত্ব নৈসর্গিক নিয়মের, অন্তর্ভূত এবং পরীক্ষা বা যুক্তিতর্কের কষ্টি পাথরে ঘষা। সত্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রথা যাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা, যে বিশ্বাস নিয়মকে অবজ্ঞা করে, অথবা যুক্তিতর্কের মস্তকে পদাঘাত করে, তাহাতে স্বভাবতঃই আস্থা স্থাপন করিতে নারাজ হইবেন। এই জন্যই কোন ধর্ম্মমত যে পরিমাণে অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের হাতে তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। ধর্ম্ম যদি এখন দাবী করিয়া বসেন, কোন যুক্তিতর্ক মানিও না, সত্যানুসন্ধিৎসাকে একেবারে বলিদান দাও—এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলার রাজত্ব অগ্রাহ্য করিয়া কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র বা পুরোহিতের আদেশে অচল বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে বিজ্ঞান তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য। বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র ধারণ করে নাই, কিন্তু বিজ্ঞান চায় যে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়—যেন ধর্ম্মমত জ্ঞানের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় না হয়। মনে করুন, কোন ধর্ম্মগ্রন্থ যদি বলেন যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার কি দশ হাজার বৎসর মাত্র—এবং ইহার সমর্থনে কেবল আপনার অভ্রান্ততা স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়া তাহার দোহাই দিয়া থাকেন,—অথচ বিজ্ঞান প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে যে, পৃথিবীর জন্ম হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কমে ধনধান্যে ভরা এই বসুন্ধরা ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই—এরূপ স্থলে সে ধর্ম্মগ্রন্থ নিশ্চয় বিজ্ঞানের নিকট হতাদৃত হইবেন।

বিজ্ঞানের জন্মকথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব জাতির আদিম অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব ছিল না। তখন

কেবল নৈসর্গিক ঘটনাবলী স্বতন্ত্রভাবে পরিলক্ষিত হইত। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না, অথবা কোন নিয়মের আভাষও কেহ দেখিত না। মানবচিন্তার সে শৈশবাবস্থায় কেবল বিস্ময় ও ভক্তিরই রাজত্ব ছিল। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনায় অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মানুষ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত এবং বিস্ময় ও ভক্তিভরে প্রকৃতির নিকট আপনার মস্তক অবনত করিত। মানুষ যখন দেখিত যে, ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রখচিত পাখা প্রসারিত করিয়া ধরিত্রীকে প্রেমভরে ঢাকিয়া রাখে,—আকাশদুহিতা সস্মিতবদনা ঊষা স্বীয় লাবণ্যছটায় জগতের আঁধার রাশি ঘুচাইয়া সুকোমল স্পর্শে সকলের ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দেয়, মিত্রের আদেশে নবোদিত রবির কিরণমালা ছড়াইয়া পড়ে ও প্রকৃতির সকল জীব জন্তু তাহার প্রসাদে নব জীবনে অনুপ্রাণিত হয়,—পর্জ্জন্য বজ্ররবে আপনার বারতা শুনাইয়া প্লাবনের বারিধারায় ধরাকে ভাসাইয়া দেয়—শিশু-প্রকৃতি মানুষ তখন নিসর্গকেই একমাত্র উপাস্য জানিয়া হৃদয়ের ভক্তিকুসুম চয়ন করিয়া প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশে পূজা দিত। ক্রমে জ্ঞানের বিকাশের সহিত মানুষ প্রকৃতির আড়ালে সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে দেখিতে শিখিল।

বিজ্ঞানের জন্ম ইহারও বহুকাল পরে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ যখন প্রকৃতিকে পড়িতে শিখিল, তখনই বিজ্ঞানের জন্মের পূর্ব্বাভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও নৈসর্গিক ঘটনাবলী কেবল স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন এই সকল রাশি রাশি ঘটনাসমূহ এক নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল, তখনই প্রকৃত বিজ্ঞানের জন্ম হইল। প্রকৃতির চারিদিকে যে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে—তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে বিশিষ্ট করা—ও তাহাদের মধ্যে নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জলে স্থলে, ভূলোকে দ্যুলোকে, প্রকৃতির আসে পাশে, পরমাণুর অন্তরালেও সকলে নিয়মের অটুট ডোরে বাঁধা; এই বিজ্ঞানের শিক্ষা। বিজ্ঞান একবার নিয়মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপর আমাদের বিশ্বাসকে দাঁড় করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা "সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে, গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে" প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেছি ও আকাশের বজ্রবিদ্যুতকে ধরিয়া আমাদের সেবাতে খাটাইতে পারিতেছি।

এত বেশ কথা। এ বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মমতের সংঘর্ষণ কেন হইবে? তবে কি ধর্ম্মতত্ব নিয়মের রাজত্বের অতীত? •

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল প্রশ্ন ইংলণ্ডে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী প্রধান এই:—"বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সমন্বয় কিরূপে সম্ভব?" এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত অধ্যাপক ড্রামণ্ডের নাম স্মরণীয়। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে সুগভীর পাণ্ডিত্যে, ও অসাধারণ বাগ্মীতায় —উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত নব্য সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতে জনসাধারণের মন এখনও বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সমন্বয় ধারণা করিতে প্রস্তুত হয় নাই; তাঁহাদের মতে—এই দুই রাজ্য একেবারে

স্বতন্ত্র ও ইহাদের মাঝে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর বর্ত্তমান। ধর্ম্মাচার্য্যগণও অনেকেই এই ভ্রমে পড়িয়া ড্রামণ্ডকে বিষনয়নে দেখিতেন। কর্ম্মবীর ড্রামণ্ড যুগপৎ ধর্ম্মাচার্য্য ও বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক পরীক্ষার বিলক্ষণ সুযোগ ছিল। এই দুই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়—তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্রণীত "অধ্যাত্ম জগতে নৈসর্গিক নিয়ম" * নামক অভিনব গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন:—"প্রথমে ভাবিতাম, তাহারা আমার চিন্তার দুই বিপরীত সীমান্তে অবস্থিত। এই ধারণায়, কিছুকাল বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে আমার মনের দুই স্বতন্ত্র কক্ষে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমে এতদুভয়ের মধ্যস্থ প্রাচীর ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। দুই কক্ষস্থ জ্ঞানের উৎস দুইটীও উথলিয়া উঠিল—ও তাহাদের সলিল পরস্পরে মিশিল। এ মিলনে ধর্ম্মের কক্ষেই অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে উৎসের মূল যে শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—অথবা তাহার উৎসেচিত সলিল—বিজ্ঞানের প্রবল বন্যায় যে বিধৌত হইয়া গেল, তাহাও নহে। সে কক্ষে যাহা কিছু ছিল, তাহার একটুও বিনষ্ট হইল না—কিন্তু ধর্ম্মমতের পুরাণো দানাগুলি দ্রব হইয়া এক নূতন স্বরূপ প্রাপ্ত হইল ও অপূর্ব্ব গঠন স্ফটিক করকাদলে পুনঃ পরিণত হইল।" এইরূপ স্বাভাবিক উপায়েই ড্রামণ্ডের মন হইতে সকল বিসম্বাদী সংশয় দূর হইল। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি এ দায়ীত্ব বুঝিয়া লইয়া বিজ্ঞানের মন্ত্রেও আপনাদিগকে দীক্ষিত করেন—তবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রকৃষ্ট সহায়তা হইতে পারে।

* Natural Law in the Spiritual world' by Henry Drummond F. R. S. E.

বিজ্ঞানের উন্নতির স্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছে—এই স্রোতকে আর কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না। প্রলয় পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায়, ইহা সকল কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া টুটিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে ও নিরন্তর ছুটিবে। এই বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিলে ধর্ম্মের বলহানী হইবে। বিজ্ঞান যখন সত্যানুসন্ধান করে, তখন ধর্ম্মের সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াসী, তাহা জ্ঞানের উন্নতির পথে কাঁটা দিবে না। তবে ধর্ম্মবিশ্বাসীর প্রাণ বিজ্ঞানের নামে শিহরিয়া উঠিবে কেন? তবে ধর্ম্ম—বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ত্রাসে কম্পিত হইবে কেন?

ধর্ম্মভ্রষ্ট বিজ্ঞান দাঁড়াইতে পারিবে না। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে, জগতের চারিদিকে নিয়মের রাজত্ব;—কিন্তু নিয়ম কেবল কার্য্যপ্রণালী মাত্র—ইহা কারণ হইতে পারে না। জড় যেমন আপনা হইতে শক্তি জন্মাইতে পারে না—তেমনি নৈসর্গিক কোন নিয়মই আপনাপনি উদ্ভূত হইতে পারে না; এ নিয়মের মূলে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অনন্ত জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আমরা যে শৃঙ্খলা ধরিতে পারিতেছি তাহার কারণ—সেখানে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে। জীবতত্ব, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ভূতত্ব প্রভৃতি সকল বিভাগেই বিজ্ঞান—সৃষ্টি-কৌশল দেখাইয়া—

স্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান, অচিন্তনীয় শক্তি ও অপার করুণার পরিচয় দিতেছে। বিজ্ঞান বলিতেছে—জগতের সর্ব্বত্রে—সকল বিচিত্রতার ভিতর দিয়া—এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এক বিরাট ঐক্য বর্ত্তমান, যাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেই একমেবাদ্বিতীয়মকেই দেখাইয়া দিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আধিপত্য দেখিয়া যাঁহাদের হৃদয় সন্দেহে আন্দোলিত হইতেছে—তাঁহারা আশান্বিত হউন—ভগবানের কৃপায় এ প্রলয়-সম ঝটিকার অবসানে হৃদয়াকাশ যুড়িয়া বিশ্বাসের ইন্দ্রধনু শোভা পাইবে। হৃদয় বিলোড়নকারী এ মহা মন্থনের পর—ভগবদ্ভক্তির অমৃত ও প্রেমের শশধর উঠিবে এবং সকল হলাহল হইতে সেই দেবাদিদেব মহাদেবই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিবেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

বৌদ্ধধর্ম্ম—সমালোচনা।*

বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এই দুই, বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে অধুনা এই দুই বিষয়ের পুস্তক অতি অল্পই বিরচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারি খানি বুদ্ধচরিত প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের সমগ্র ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। বড়ই সুখের বিষয়, সংপ্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি ও সুবিখ্যাত লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস্ মহোদয় বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম বৌদ্ধধর্ম্ম।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। পুস্তক খানির আকার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং গ্রন্থকারের বুঝাইবার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক শব্দ সমূহ অতীব দুর্ব্বোধ্য, এই হেতু ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে উক্ত দর্শনের অনুশীলনে অগ্রসর হন না। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান গ্রন্থকার দুরবিগম্য দার্শনিক শব্দ সমূহকে কাব্যের ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে জটিলতা দোষ একেবারেই নাই। গ্রন্থকার একজন চিন্তাশীল ও পরিপক্ক লেখক, এই হেতু তিনি যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, উহাই সুন্দর ও পরিস্ফুট হইয়াছে। অনেক দার্শনিক লেখক কোন বিষয় নিজে না বুঝিয়াও উহা পরকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এবং নিজের অজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পরের নিকট বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেরূপ চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থে অব্যক্ততা দোষের লেশ মাত্রও নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত কপিলবাস্তু নগরে শাক্য

* বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৭ সালের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়, ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম মায়াদেবী ও পিতার নাম শুদ্ধোদন। তাঁহার ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। সংসার দুঃখময় বিবেচিত হওয়ায়, তিনি উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ক্রম কালে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চরণের পর তিনি জগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খল অবলোকন করেন। এই সময়ে কামরাজ্যাধিপতি মারের সহ তাঁহার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। মারকে পরাজিত করিয়া তিনি "বুদ্ধ" এই নাম লাভ করেন। তদনন্তর তিনি অনেক লোককে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মগধরাজ বিম্বিরাজ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় হন। এক সময়ে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে, মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে করিয়া কপিলবাস্তু নগরে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলেন, "এই কি "আমাদের শাক্যকুল-প্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ কেন?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমার কুলধর্ম্ম এই। আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথা অনুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, যোগপ্রভাবে ও প্রজ্ঞাবলে সেই মলিনবসন দীন হীন ভিখারী, মহাপ্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও উচ্চতর আসন পাইবার যোগ্য। আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন উপহার লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি, আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি উহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।"

কপিলবাস্তু নগরে প্রথমতঃ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ, পিতৃব্য-পুত্র অনুরুদ্ধ, শ্যালক দেবদত্ত ও নাপিত উপালি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র রাহুলও বৌদ্ধসমাজ ভুক্ত হন।

বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রণালী অতি সরল। এক সময়ে কোন স্ত্রীলোক তাহার মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া বুদ্ধের নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, "প্রভো! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; এমন একটী ঔষধ বলিয়া দিন, যাহাতে আমার ছেলেটী প্রাণদান পায়।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আচ্ছা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি; আগে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া দেও। এমন গৃহ হইতে উহা আনিতে হইবে, যেখানে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য প্রভৃতি কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই।" স্ত্রীলোকটী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল ও অনেকের সহ আলাপ করিল। কেহ বলিল, "আমার একটী পুত্র মরিয়াছে," কেহ বলিল, "আমার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে"; কেহ বা স্বীয় মাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিল। তখন স্ত্রীলোকটী বুদ্ধের নিকট আসিয়া বলিল "প্রভো! আপনি যেরূপ সর্ষপ চান, তাহা পাইলাম না, শুনিলাম, সকল গৃহেই পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য প্রভৃতির কেহ না কেহ মরিয়াছে"। তখন বুদ্ধদেব তাহাকে জগতের অনিত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন এবং স্ত্রীলোকটী বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুশীনগরের শালবনে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তকে গ্রন্থকার উল্লিখিত বিষয় সমূহ ব্যতীত আর যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বুদ্ধদেবের কপিলবাস্তুতে আগমন ও যশোধরা, রাহুল প্রভৃতির সহ সাক্ষাৎকার।

(২) রাহুলের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

(৩) সুরাপরান্ত দেশের জনৈক বণিক্ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

(৪) স্ত্রী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

(৫) দেবদত্তের ষড়্‌যন্ত্র।

(৬) বুদ্ধদেবের দৈনিক জীবনকৃত্য।

(৬) বুদ্ধদেবের জীবনের শেষ তিন মাস।

(৮) তাঁহার শেষ বাক্য।

(৯) তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

(১০) বৌদ্ধগণের চারিটী মহাসভা।

(১১) আলেক্‌জান্দরের ভারত আক্রমণ।

(১২) চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(১৩) বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

(১৪) কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।

(১৫) বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম।

(১৬) বৌদ্ধনীতি।

(১৭) বৌদ্ধ দর্শনের ভ্রান্তিমূলকতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা।

(১৮) তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ।

(১৯) বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত।

(২০) জীবদেহ ও পঞ্চ স্কন্ধ।

(২১) কর্ম্ম বল।

(২২) ধ্যান ও নির্ব্বাণ।

(২৩) নির্ব্বাণ ও শূন্যতা।

(২৪) বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুক্তির ভেদ।

(২৫) মৈত্রেয় বুদ্ধ।

এই গ্রন্থে অনেক দার্শনিক তত্ত্বও সমালোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দ্বাদশ নিদানের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বাদশ নিদান যথাঃ—

(১) অবিদ্যা, (২) সংস্কার, (৩) বিজ্ঞান, (৪) নামরূপ, (৫) ষড়ায়তন, (৬) স্পর্শ, (৭) বেদনা, (৮) তৃষ্ণা, (৯) ভব, (১০) উপাদান, (১১) জাতি, (১২) জরামরণ।

তদনন্তর চারিটী মহাসত্যের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। চারিটী মহাসত্য যথাঃ—

(১) দুঃখ, (২) দুঃখের উৎপত্তি, (৩) দুঃখের ধ্বংস ও (৪) দুঃখ ধ্বংসের উপায়।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুধাবনই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা :—

( ) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্ (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যগাজীব, (৬) সম্যগ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি ও (৮) সমাক সমাধি।

প্রত্যেক গৃহস্থের পাঁচটী: অনুশাসন প্রতিপালন করা উচিত। সেই পাঁচটী অনুশাসন যথাঃ—

(১) বধ করিও না, (২) অপহরণ করিও না, (৩) ব্যভিচার করিও না, (৪) মিথ্যা কহিও না, (৫) সুরাপান করিও না।

অনন্তর পঞ্চ স্কন্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধ যথা :—

(১) রূপ স্কন্ধ, (২) বেদনা স্কন্ধ, (৩)

সংজ্ঞা স্কন্ধ, (৪) সংস্কারস্কন্ধ ও (৫) বিজ্ঞান স্কন্ধ।

যদিও গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি তিনি বুদ্ধদেবের একজন অকৃত্রিম ভক্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"শুধু উপদেশ নহে, বুদ্ধের মহৎ জীবন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা মহত্তর। বুদ্ধদেবের ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, যেমন ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তিতে, তেমনি ভক্তদিগের মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ছিলেন, সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার মধ্যে-লালিত পালিত হইয়া, পিতৃদেবের অতুল সুখ-সম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া লোকহিতার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে দ্বাদশ (?) বৎসর কি সুদুঃসহ তপঃসাধন বলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে জ্ঞানধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্যজাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া কিরূপে ভারতেও দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারে জীবন ক্ষেপণ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে আনন্দ মনে তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বর্গারোহণ (? পরিনির্ব্বাণ লাভ) করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—হায় বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল! বুদ্ধজীবনের ছবি আমাদের সকলেরই মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছে।"

২০—২৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার নৈরাত্ম্যবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সহ আমার সম্পূর্ণ ঐকমত্য নাই। বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে জ্ঞান সমূহের সমষ্টি দ্বারা আত্মার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার করেন না। হিন্দু দার্শনিকগণের মত এই যে, গুণী গুণাতিরিক্ত, গুণগুলি ছাড়িয়া দিলেও গুণী বর্ত্তমান থাকে। বৌদ্ধগণ বলেন, গুণাতিরিক্ত গুণী নাই, গুণগুলি ছাড়িয়া দিলে গুণীর পৃথক্ সত্তা থাকে না। ঘট নামক একটী দ্রব্যকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক। ঘটের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, গভীরতা, পরিমাণ, গুরুত্ব, আকৃতি, আস্বাদ ইত্যাদি অনেক গুণ আছে। এই গুণগুলির সাধারণ নাম ঘটত্ব। হিন্দু দার্শনিকেরা বলেন, এই ঘটত্ব ছাড়াও ঘট নামে একটী পৃথক্ দ্রব্য আছে। বৌদ্ধেরা বলেন, ঘটত্ব ছাড়িয়া দিলে ঘট থাকে না। ঘটত্ব নামক গুণ সমবায় দ্বারা ঘট ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ ঘটত্ব ব্যতীত ঘট নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার না করিলেও ঘট ব্যবহারের কোন বাধা হয় না, সেইরূপ স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও জ্ঞানসমূহ দ্বারা আত্মার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে লিখিয়াছেন :—

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্। ·দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগ বিভাগেষকারণ মনপেক্ষম্ ইতি গুণলক্ষণম্।

পক্ষান্তরে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন লিখিয়াছেন :—

লক্ষ্যাল্লক্ষণ মন্যচ্চেৎ স্যাত্তল্লক্ষ্যমলক্ষণম্।
তয়োরভাবাস্তথে বিস্পষ্টং কথিতং ত্বয়া॥

নাগার্জ্জুন বলিতেছেন—লক্ষ্য (দ্রব্য) যদি লক্ষণ (গুণ) অপেক্ষা পৃথক্ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্য (দ্রব্য) অলক্ষণ (নির্গুণ) হইয়া পড়ে। সংযোগ ও অপ্রাপ্তি এই দুইটী পৃথকত্বের লক্ষণ। গুণ ও দ্রব্য এতদুভয় যদি সময় বিশেষে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণকে পরস্পর পৃথক্ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দ্রব্য গুণ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্ নহে। অপিচ গুণ হইতে যদি দ্রব্য বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্রব্য নির্গুণ হইয়া পড়ে। নির্গুণ দ্রব্যের লক্ষণ কি? যদি তাহার কোন লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে উহা মিথ্যা। আর যদি কোন লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণই ঐ দ্রব্যের গুণ। অতএব গুণ হইতে পৃথক্ দ্রব্য নামক কোন পদার্থ নাই। গুণের সমবায়ে দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।· যতদিন দ্রব্য ও গুণ একই পদার্থ কি উহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইবে, ততদিন কেহই বৌদ্ধ দর্শনোক্ত নৈরাত্ম্যবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিচার করিতে সমর্থ হইবেন না।

বৌদ্ধ দর্শনোক্ত শূন্যবাদেরও যথার্থ তাৎপর্য্য অনেকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। যিনি শূন্যবাদ সুন্দররূপে বুঝিয়াছেন, তিনি কখনই (১) ঈশ্বর আছেন কি না, (২) আত্মা নিত্য কি অনিত্য, ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা বলেন, অবিদ্যাই অস্মদ্ ও যুষ্মদের উৎপত্তির কারণ। অবিদ্যা হইতে অহং ও সংসার এতদুভয়ের জন্ম হইয়াছে। অবিদ্যার ধ্বংসে অহং ও সংসার উভয়েরই ধ্বংস হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অহং ও সংসার এতদুভয়ের উচ্ছেদ হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? অহং ও সংসারের উচ্ছেদ হইলে যাহা ঘটিবে, তাহা "থাকিল" ও "থাকিল না" উভয়ের অতীত। এই "অস্তি" ও "নাস্তির" অতীত পদার্থই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা। সেই পদার্থ ভাব (positive) ও নহে। অভাব (negative) ও নহে। ভাব ও অভাব উভয় পদার্থই অনিত্য। এই হেতু বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ বা শূন্যতা পদার্থকে ভাবাভাবের অতিরিক্ত * বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই শূন্যতা কি পদার্থ, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে শূন্যতা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্।
শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদুত অপ্রমেয়মিতি।
যে চ সুভূতেঃশূন্যা অক্ষয়া পি চ তে।
যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তাপি সা॥" ইত্যাদি।
(প্রজ্ঞা পারমিতা অষ্টসাহস্রিকা)।

এই অসীম, অনাদি, অতি গম্ভীর, শান্তির নিকেতন, মহাসাম্যের আশ্রয় ও বাঙ্মনের অগোচর শূন্যতা নামক পদার্থে বিলীন হওয়াই বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতে পরম পুরুষার্থ। শূন্যতায় লয়ই নির্ব্বাণ। নির্ব্বা-

* "ন চাভাবোহপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
ভাবাভাব বিনির্মুক্তঃ পদার্থো নির্ব্বাণ মুচ্যতে॥"
(রত্নকূট সূত্র)।

ণের অবস্থা বর্ণনাতীত। সে অবস্থায় সুখও নাই, দুঃখও নাই, আলোকও নাই, অন্ধকারও নাই। বস্তুতঃ সে অবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তনশীলতা নাই।

বেদান্তিগণ বলেন, অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব। অবিদ্যা রূপ আবরণের উচ্ছেদ হইলে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ কি না তিনি নিত্য-বুদ্ধ—মুক্ত স্বভাব; অস্থূলোঽচক্ষুরমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ। উপনিষদে তাঁহার স্বরূপ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

বেদান্তিগণ প্রায়শঃ ব্রহ্মকে (১) সৎ (a positive substance) (২) নিত্য eternal এবং (৩) চৈতন্য বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধগণের মতে সৎ (positive) ও অসৎ (negative) পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ।

সৎ পদার্থ মাত্রই সময় বিশেষে অসৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া বর্ণন করিলে তাঁহাতে অনিত্যতা দোষের আরোপ করিতে হয়। ব্রহ্মকে সৎ বলিলে তাঁহাকে অনিত্যও বলিতে হয়। বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বীয় শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন "সৎ যৎ তৎ ক্ষণিকম্"। যাহাই সৎ, (বিদ্যমান positive), তাহাই ক্ষণিক (momentary, unstable, transient)।

আবার চৈতন্যও দুই প্রকার (১) সাকার চৈতন্য ও (২) নিরাকার চৈতন্য। ঘট, পট, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি বিষয়ক চৈতন্যের নাম সাকার চৈতন্য। সাকার চৈতন্য মাত্রই বিনাশশীল। অতএব ব্রহ্ম সাকার চৈতন্য নহেন। তাহা হইলে তিনি নিরাকার চৈতন্য। নিরাকার চৈতন্যের অপর নাম শূন্যতা। যে চৈতন্য দ্বারা কোন সাবয়ব পদার্থের উপলব্ধি হয় না, তাহাই নিরাকার চৈতন্য। এই নিরাকার চৈতন্য কোন দ্রব্যের ব্যঞ্জক নহে। এই অব্যঞ্জক চৈতন্যই শূন্যতা।

যাঁহারা ভাবেন, বস্তুর অভাবই শূন্যতা, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত পদার্থই শূন্যতা।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিচার করিলে দেখা যায়, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও শূন্যতা একই পদার্থ। ব্রহ্ম বা শূন্যতা ইঁহাদের কেহই ভাব (positive) ও নহেন, অভাব (negative)ও নহেন। উভয়েই ভাবাভাবের অতীত। ব্রহ্মকে ভাব পদার্থ বলিলে তিনি সগুণ, সাকার ও অনিত্য হইয়া পড়েন। আর ব্রহ্মকে সাকার ও সগুণ বলিলে বেদান্ত দর্শন ও পুরাণ তন্ত্রাদির কোন পার্থক্য থাকে না। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

টমাস কার্লাইল। (৩)

"কেহ যেন আমার জীবনী না লিখে"—কার্লাইল তাঁহার উইলে এইরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর যাহা কার্য্যে পরিণত হইবে, নিজ সম্পত্তি বিভাগ এবং শাসন সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের সেই অভিপ্রায়কেই উইল বলে। ঐ

রূপ নিষেধ বাক্য আইনতঃ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। উহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও কোন অপরাধ হয় না, সুতরাং উহাকে অনুরোধ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার এই অনুরোধ প্রতিপালিত হইবে না; এই জন্য তাঁহার বন্ধু ফ্রুডের (Froude) নিকট তাঁহার স্মৃতি-লিপি এবং অনেক পত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহা এবং জেন্-লিখিত পত্রাবলীই তাঁহার জীবনীর প্রধান উপাদান। তাঁহার জীবন কোন ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ নহে; তিনি চিরদিন নির্জ্জনে থাকিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন। আজকাল ইংলণ্ডে জীবনের গুরুত্ব পার্লমেণ্টের তৌলদণ্ডে পরিমিত হইয়া থাকে, যেন রাজনীতি ভিন্ন মনুষ্যের চিন্তা করিবার আর কোন বিষয় নাই। এ পর্য্যন্ত কার্লাইলের যে সকল জীবনী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তৃপ্ত হওয়া যায় না। ফ্রুড যেন সন্তর্পণে তাহার কতক আভাষ দিয়াছেন। আরও কিছু কাল অতীত না হইলে কার্লাইলের প্রকৃত জীবনী লিখিত হইবে না। অভাব না হইলে বস্তুর প্রকৃত গুণ উপলব্ধি হয় না; জীবিতাবস্থায় মনুষ্যের গুণনিচয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, কুসংস্কার প্রভৃতি মৃত্যুর সহিত নির্ব্বাপিত হয়; এই সকল নয়ন এবং মনের আবরণ স্বরূপ, সম্যক দৃষ্টির অন্তরায়। উন্মোচিত হইলে দিব্যদৃষ্টি জন্মে। তাহা সময় সাপেক্ষ। জল কিছুকাল রাখিয়া দিলে শীতল হয়, এবং তাহার ময়লাভাগ পাত্রের নিম্নদেশে পতিত হয়। তখন জলের প্রকৃতি সম্যক অবগত হওয়া যায়। নিরপেক্ষ জীবনী লিখিতে হইলে এই নীতির অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কার্লাইল যে তাঁহার জীবনী লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই, তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য, তাঁহার গ্রন্থের গুণাগুণ, তাঁহার ভাবপরম্পরা এবং তাঁহার আদর্শ নিচয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; তাহারা জীবনী লেখিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করিবে।

কার্লাইলের দাম্পত্য জীবন।

কার্লাইলের দাম্পত্যজীবনই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা; জেনকে তাঁহার পার্শ্ব হইতে স্থানান্তরিত করিলে তিনি নিষ্প্রভ; তাঁহার জীবন দীপ্তিহীন—অসম্পূর্ণ। জেন এবং কার্লাইল পরস্পর আপেক্ষিক; এক জনকে বাদ দিয়া আর এক জনকে চিন্তা করা যায় না। তাঁহার জীবনের এই গর্ভাঙ্ক সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত কি না, পাঠক তাহা প্রশ্ন করিতে পারেন। জেন-লিখিত পত্রাবলী আর প্রকাশ হইতেছে না, অনেকে উহা প্রকাশ করা আপত্তিজনক মনে করেন। উহাতেই তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত উপাদান রহিয়াছে। আমাদিগের ভাগ্যে তাহা পাঠ করিবার সুবিধা হয় নাই। কার্লাইলের জীবনী-লেখকগণ জেনের অনেক পত্র ঐ জীবনীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে মতামত দেওয়ায় বোধ হয় অপরাধ হইবে না। জেনের বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ কার্লাইলকে নৃশংস, পাগল বলিতেও ত্রুটী করেন নাই; ফ্রুড (Froude) প্রভৃতি কার্লাইলের বন্ধুগণ তাঁহার দোষ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ। এই উভয় সীমাই পরিহার্য্য। জেন তাঁহার পিতা মাতার

এক মাত্র কন্যা, অতি আদরের ধন। তাঁহাদের অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল। কৃষক-তনয় কার্লাইলের তুলনায় তাঁহাকে রাজ-নন্দিনী বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। জেন বড় আদরের মেয়ে; দেখিতে সোণার পুতলী; তাঁহার পিতামাতার নয়নতারা। তাঁহারা তাঁহাকে চক্ষে হারাইতেন। যাহারা এইরূপ আদরে প্রতিপালিত, তাহারা কথাবার্ত্তায় এবং আচার ব্যবহারে একটু অসংযত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। জেন যে স্কুলে পড়িতেন, তথায় বালক-বালিকাগণ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে অধ্যয়ন করিত। একদিন কোন বালকের সহিত বিবাদ করিয়া জেন তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া রক্তপাত করেন। শিক্ষক আসিলে স্বয়ং সকল কথা বলিয়া ফেলিলেন; শিক্ষক হাসিতে হাসিতে বালিকাকে মৃদু ভৎ‍সনা করিলেন। এক দিন জেনের পিতামহ তাহাকে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন; যে রাস্তায় গিয়াছিলেন, সে রাস্তায় না আসিয়া অন্য রাস্তায় আসিয়াছিলেন। আসিবার কালীন বলিয়াছিলেন "Varry the sane." জেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের এই উচ্চারণ দোষের ব্যঙ্গ করিতেই ছাড়েন নাই। জেনের বিবাহের পরে জেনের মাতা এক দিন তাহাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে দিবস কতিপয় ভদ্র লোক তাহাদিগের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। জেনের মাতা সমাগত ভদ্র লোকদিগের তৃপ্তি জন্য দুটী অতিরিক্ত আলোর বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইলে, জেন তাঁহার হস্ত হইতে ঐ আলোদ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন। জেনের মাতা তাহাতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমরা স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। উহা ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। আশৈশব জেন উপহাস এবং বিদ্রূপপ্রিয় ছিলেন—উহা অনেক সময় সরল উৎপাদন করিত। পেনিলোপের (Penelope) ন্যায় তিনিও অনেক প্রেমিকের হস্তে পড়িয়াছিলেন, সকলকেই আলাপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, কখনও বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। Edward Irving কিছু দিন তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অল্প সময়ের মধ্যেই আসক্তি জন্মিয়াছিল। যদি মিস্ মার্টিনের এর সহিত আর্ভিং পরিণয়-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না থাকিতেন, তাহা হইলে জেন তাঁহাকেই বিবাহ করিতেন। সংসারের নিয়মে এইরূপ বলা অসঙ্গত নহে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভগবানের তাহা অভিপ্রায় নহে। সক্রেটিস এবং জ্যান্‌টিপিকে যিনি একত্র করিয়াছিলেন, ভোলানাথ শিব এবং পার্ব্বতীকে যিনি একত্র করিয়াছিলেন, জেন এবং কার্লাইলকেও তিনি একসূত্র করিবেন। অন্য চেষ্টা সকলই বিফল হইবে। আর্ভিং তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী মিস্ মার্টিনকেই বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণমন জেনের নিকটই রহিল। ধর্ম্মের অনুরোধে, প্রতিজ্ঞার বাধ্যবাধকতায় Irving মিস মার্টিনকেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু জেন যে তাহার হইল না, ইহাতে তাঁহার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রতিভাবলে এক সময়ে যশের শীর্ষস্থানে উঠিয়া ঢুপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন; আর উঠিলেন না। জেন-বিচ্ছেদে সকলই ফুরাইয়া গেল। আর্ভিং জানিতেন, জেন এক নারীরত্ন বিশেষ; কার্লাইল ভিন্ন ইহার

প্রকৃত অধিকারী আর কেহ হইতে পারে না। জেনের শিক্ষার সৌকার্য্যার্থে কার্লাইলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। আর্ভিং, ধন্য তোমার মহত্ব! ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল। তুমি যে নারীরত্ন পাইলে না, দেবচরিত্র মনীষী কার্লাইল যাহাতে সেই অপার্থিব রত্ন লাভ করেন, তাহার পথ তুমিই করিয়া দিলে, ইহা কেবল তোমার ন্যায় দেবচরিত্রেই সম্ভবে। অচিরে জেন বুঝিতে পারিলেন, কার্লাইল এক অসাধারণ মনীষী; আর্ভিং অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর। কার্লাইলও বুঝিলেন, এ বালিকা মূর্ত্তিমতী প্রতিভা। পরস্পর আকর্ষণ জন্মিল। ক্রমে বিবাহ-প্রস্তাব হইল। জেন প্রথমে রাজী হন নাই। কালে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কার্লাইল ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারেন না। কার্লাইল জেনকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহ করিলে তাহার সুখ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। জেন তখন আর কিছু মানিলেন না। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন; কার্লাইল তাহাই। সাংসারিক বিষয়ে এবং বংশ মর্য্যাদায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ অসামঞ্জস্য ছিল, উভয়েই তাহা উপেক্ষা করিলেন। মাতা এবং প্রতিবেশীদিগের নিষেধও মানিলেন না। শিবের জটা জুট, ফণীফণা, শিঙ্গা ডমরু, ছাইভস্ম, শ্মশান মশান, পিনাক বাঘাম্বর দেখিয়া মেনকা ভীতা হইলন, পার্ব্বতী দেখিলেন, ইহা কেবল বহিস্থপরিচ্ছদ, ভয়াবহ ও ভীম, কিন্তু অন্তরে সকলেই কোমল ও সুধা-সিক্ত—তিনি বিচলিতা হইলেন না। শিব যে ভোলানাথ আশুতোষ। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র দেখিতে ভয়ঙ্কর; ডুবিলেই তাহাতেই রত্ন মিলে। শিব কি পদার্থ, পার্ব্বতীই তাহা বুঝিয়ছিলেন, এবং পার্ব্বতী কি পদার্থ, শিবই বুঝিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে অতীব ভালবাসাও ছিল, কোন্দল ছিল। যাহাদের অন্তর বিনিময় হইয়াছে, বাহ্যিক অসদৃশতায় তাহাদের কি করিবে? কার্লাইলরূপ পতি-রত্ন লাভ করিয়া যদি ভিক্ষা করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়; জেন ইহা স্থির করিয়া তাঁহারই গলে মালা অর্পণ করিলেন। কমলে কঠিনে মিলন হইল; রুদ্রভাব কমনীয়তায় মিলিয়া গেল; কালমেঘে সৌদামিনীর রজত রেখা দেখা দিল; সহতরুতে কনকলতা জড়িত হইল। পৃথিবীর সকলে শোভা দেখিয়া কখন মোহিত, কখন স্তম্ভিত। এ এক অপূর্ব্ব মিলন! এক দিকে সকলই চারু এবং কমনীয়, অপরদিকে সকলই ভীম এবং ভয়াবহ; একদিকে উদ্দাম প্রকৃতির ভৈরব ভাব, অপর দিকে প্রকৃতির সহিত শিল্প এবং কারুর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ; একদিকে সৌন্দর্য্যের মনোলোভা মূর্ত্তি, অপর দিকে বিকট দর্শন রুদ্রমূর্ত্তি। একদিকে দেবরূপ, অপর দিকে মানবীরূপ। কার্লাইল ভাবিলেন, আজ তিনি জেন-রূপ নারীরত্নের অধিকারী, তখন পাইপ মুখে ধরাকে সরা দেখিতে লাগিলেন। রত্ন পাইয়া আর তাঁহার তাহাতে যত্ন রহিল না। কেন না, এখন তিনি নিশ্চিন্ত, রত্ন যে তাহারই। জেনও কার্লাইলকে পতি পাইয়া ভাবিলেন, তাহার মত ভাগ্যবতী আর কে? উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানরাজ্যের কর্ণধারকে তিনি জীবনতরী সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু কোমলেও কণ্টক-

আছে; ভালবাসার গতি নিষ্কণ্টক কোন কালে নহে। জেন দেখিলেন, কার্লাইল সংসারের জীব নহেন, দেবতা, অনেক উচ্চে রহিয়াছেন; মর্ত্ত্যলোকের সকল বিষয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। পতিপ্রাণা সতী স্বামীসেবায় অহর্নিশি কাটাইতে লাগিলেন। কার্লাইল তাঁহার প্রতি একবার ভাল করিয়া তাকাইতেনও না; জেন কেমন আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন না। তিনি তাঁহার নিজ ভাবে বিভোর, তিনি নিশ্চিন্ত এবং সুখী—জেনও তাঁহারই। কার্লাইল জেনকে তাঁহার অন্তরের এক নিভৃত কক্ষে রাখিয়াছিলেন; লোকে তাহা দেখিতে পাইত না; জেনও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। জেন মনে করিতেন, তিনি কার্লাইল কর্ত্তৃক উপেক্ষিত। এই ভাব ক্রমশঃ তাঁহার বদ্ধমূল হইল। ক্রমে তাঁহার প্রাণমন ভাঙ্গিয়া গেল। তথাপি কার্লাইল যাহাতে নিরুপদ্রবে জ্ঞান-চর্চ্চা করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত তিনি করিতে লাগিলেন। কার্লাইল এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতেন; জেন বাহিরে থাকিতেন; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেও যেন কার্লাইল বিরক্ত হইতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, তাহার অন্য কোন পিপাসা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জেন তাঁহার অন্ন সকল করিবেন, তাঁহার যে জেনের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহা তিনি ভাবিতেন না। তবে কি তিনি জেনকে ভালবাসিতেন না, উপেক্ষা করিতেন? আমরা ইহা স্বীকার করি না। তাঁহার অন্তর জেন-ময়; তাঁহার প্রেম অতলস্পর্শী। বাহিরে তাহার কোন বিকাশ নাই। সংসারের লোক তাহা বুঝিল না, জেনও বুঝিলেন না। ইহাকে যদি স্বার্থপরতা বলিতে চাও বল; আমরা কিন্তু ইহাকে অন্যভাবে দেখি। সংসারের বিচার-দণ্ডে উহা পরিমিত হইলে ইহার যুক্তি পাওয়া যাইবে না; দেবতাকে মনুষ্যের চক্ষে দেখিলে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা তাহাতে আরোপিত হইবে। ভগবানের কাছে ত মনেরই বিচার! কার্লাইলের মনে জেনের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা কিছুই নাই। ভালবাসা অন্তরের কথা; বাহিরে তাহার বিকাশ দেখিতে চাও কেন? যদি চাও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিব, তুমি মানবী। ধর্ম্মের নিকট কার্লাইলের পথ পরিষ্কার। জেন আবদেরে মেয়ে, সুতরাং অভিমানিনী। কার্লাইলের ব্যবহারে তাঁহার প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেহও ভাঙ্গিল। স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যেন এই কথা বাহির হইল

> "আমি চাই না তোর ভালবাসা,
> আমি আপনি ভালবাসি।
> আমি ম'রলে পরে জানবি,
> আমি কেমন সর্ব্বনাশী॥

যিনি দেবতার সঙ্গিনী হইয়া যোগিনী সাজিয়াছিলেন, তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন, আবার মানবীর ভাব ধরিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি পরম দুঃখিনী। বন্ধুদিগের নিকট তাহার দুঃখ-কাহিনী লিখিতে লাগিলেন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু তথাপি কার্লাইল জেনকে তুচ্ছ করিতেন, ইহা ভাবিতে পারি না। বন্ধুদিগের নিকট জেন যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে কেবল তাহার দুঃখের কথা "I feel myself neglected for un-

born generations." "Let no woman who values peace of soul ever marry an author." "C. is a domestic wandering Jew, when he is at work, I hardly ever see his face from breakfast to dinner." "Poor little wretch that I am, I feel as if I were already half-buried......in some intermediate state between the living and the dead.........oh, so lonely." "Living beside him the life of a weather-cock in high wind." "I married for ambition, Carlyle has exceeded all that my wildest hopes ever imagined of him." "Had Irving married me, there would have been no tongues."

জেন মাতার বাক্য অবহেলা করিয়াছিলেন, প্রতিবেশীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কার্লাইলের জন্য তিনিও সন্ন্যাসিনী হইবেন, মনে সংকল্প করিয়াছিলেন। কার্লাইলও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"in that great sacrifices on both sides, the possibility of our union is an empty dream." ইহা জানিয়া শুনিয়াও জেন যখন কার্লাইলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এরূপ বলা ভাল দেখায় না। কার্লাইল জেনকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহার বাহ্যিক বিকাশ ছিল না। গুরুতর কর্ত্তব্যের জন্য তিনি সকলই তুচ্ছ মনে করিতেন। যে নেপোলিয়ন জোসেফাইন ভিন্ন জানিতেন না, গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে ফ্রান্সের জন্য তিনি তাঁহাকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কার্লাইল জেনের প্রতি সংসারের নিয়ম-বিহিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর কোন অপরাধ নাই। সংসারের প্রচলিত সংজ্ঞায় উহাকে 'অপরাধ' বলে, আমরা তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যিনি গুরুতর, মহত্তর, পবিত্রতর কর্ত্তব্য প্রতিপালনে নিযুক্ত, তাঁহার অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে ক্রটী হওয়াই স্বাভাবিক; তাহাতে অপরাধ হইতে পারে না। তবে একথা স্বীকার করি যে, এ আদর্শ সংসারের পক্ষে নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কার্লাইলের বিবাহ করাই ভুল হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, উহা ভগবানের অভিপ্রেত—সংসারের এক নব আদর্শ দেখাইবার জন্য! জেনকে বিবাহ না করিলে কার্লাইল কি কখন চিরস্মরণীয় হইতেন? জেন এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"I will not marry to live on less than my natural and artificial wants."

এইরূপ কথা জেনের উপযুক্ত হয় নাই। ইহা অতি নীচ আদর্শ! তাঁহার বিদ্রূপোক্তি অসহ্য। তিনি অনেক লোকের সম্মুখে কার্লাইলকে বলিয়াছিলেন,—

"Apply your talents to gild over the inequality of our births."

ভয়ানক তীব্র কথা। কামিনীর হৃদয়ের কোমলতা কি এই? পৌরুষ এবং রুদ্রভাব কি ইহাতে প্রশমিত হয়? Lady Ashberton এর প্রতি কার্লাইলের যে পবিত্র ভালবাসা ছিল, জেন তাহাতেও তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। এ সকল জেনের দুর্ব্বলতা এবং দোষ। তাঁহার প্রেম উচ্চভাবের হইলেও স্বর্গীয় নহে। কার্লাইলের প্রেম অপার্থিব, তাহাতে স্বর্গীয় পারিজাতের বিমল সৌরভ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কার্লাইল তাঁহার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; জেনের সেরূপ কোন ভাব দেখা যায় না। তিনি একটু উদ্ধত, শান্তি-নাশক বিদ্রূপপ্রিয়। তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ প্রভৃতি কোমল ভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। জেন কার্লাইলের জ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গিনীর সকল কর্ত্তব্যই প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীর সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন নাই; তিনি একটুকু কঠোর প্রাণবিশিষ্ট ছিলেন। আর্ভিংএর প্রতি যে তাঁহার

ভালবাসা জন্মিয়াছিল, এবং তাহার সহিত যে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা তিনি কার্লাইলের নিকট প্রথমে প্রকাশ করেন নাই, পাছে কার্লাইল তাহাতে অন্যরূপ ভাবেন। ইহাতে জেনের মহত্ব অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। এই সকল দোষ সত্বেও জেন যে অবলাকুলের আভরণরূপিনী, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জেনের প্রতি কার্লাইলের কি গভীর প্রেম ছিল, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল। কথাকে দৃষ্টান্ত বলা বিধেয় নহে; কিন্তু কার্লাইলের ভিতর দুই রকম ভাব একেবারেই ছিল না; তিনি যাহা বলিতেন, সকলই প্রাণের কথা। সুতরাং তাঁহার কথাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

"I am richer with thee than the whole world could make me otherwise." "Heaven-knows the sun shines not upon the spot that could be pleasant to me where she. were not." "I perceive that of all woman my own Jeannie (Jane) is the wife for me; that in her bosom.........a man's head is worthy to lie.................. keep thy arms around me; through life I fear nothing." "We two are indivisible." "She flickered round me like a perpetual radience." "We have had a sore pilgrimage together, much bad road. Oh forgive me!"

জেন! তুমি কি এখনও বলিতে চাও, কার্লাইল তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন! এরূপ গভীর ভালবাসা আর কোথায়? তোমার জীবন ধন্য যে, তুমি কার্লাইলরূপ পতি-রত্ন লাভ করিয়াছিলে। কার্লাইল! তোমারও জীবন ধন্য যে, তুমি জেনরূপ স্ত্রী রত্ন লাভ করিয়াছিলে। কার্লাইলের সাধনায় জেনই সিদ্ধিবিধাতৃ হইয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহার জীবন নৈরাশ্যময় হইত; তিনি পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। কার্লাইলের যদি কিছু অপরাধ থাকিয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিয়াছেন। জেন-কার্লাইলের দাম্পত্য-জীবন পাশ্চাত্য জগতে চিরদিনের জন্য এক নূতন আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে কার্লাইলের মত। যৌবনে কার্লাইল প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণ লোকের দারিদ্র্য দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; তাই তিনি তাহাদিগের উপরই শাসনভার অর্পণ করা উচিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের অবিমৃষ্যকারিতা, বুদ্ধিশক্তির অভাব, নৈতিক শিথিলতা দেখিয়া এত দূর বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, উত্তর কালে শাসনকর্ত্তা মনোনয়ন করার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে তিনি দিতে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি গুণে শ্রেষ্ঠ, রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদেরই হস্তে অর্পিত হওয়া উচিত। সমাজ শাসনও তাঁহাদের অভিপ্রায়নুযায়ী হওয়া উচিত। প্লেটোরও এইমত ছিল। তিনি দার্শনিকদিগের হস্তে রাজ্য এবং সমাজ শাসন ভার দিবার পক্ষপাতী ছিলেন; সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহা জ্ঞানীগণই-সুস্থির করিবেন। তিনি স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু জাতীয় উন্নতি যে কেবল জাতীয় ধনের প্রতি নির্ভর করে, ইহা তিনি মানিতেন না। সর্ব্বসাধারণকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মত দিবার অধিকার দেওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ; যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা, কিসে রাজ্যের হিত হয়, তাহা কিরূপে বুঝিবে?

তাঁহার রাজনৈতিক মতেও বীর-পূজার আভাস রহিয়াছে। "যার লাঠি, তার মাটি"

তিনি Chartisan গন্থে এত মই প্রচার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি কেবল পাশব বলকে লক্ষ্য করেন নাই; নৈতিক বল ইহার অঙ্গীভূত।

"Of conquest we may say that it never yet went by brute force; conquest of that kind does not endure. The strong man what is he? The wise man."

মনুষ্যের স্বাধীনতার প্রতি যত কম হস্তক্ষেপ করা যায়, ততই মঙ্গল। অন্যের স্বাধীনতার প্রতি অন্যায়রূপ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করাই ব্যবহার শাস্ত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য। পারিশ্রমিক কিরূপ হারে দেওয়া হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট করা বিধেয়।

কার্লাইলের ধর্ম্মমত এবং নীতি— তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, একথা নির্বিবাদে বলা যাইতে পারে। কোন কোন সময় তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ"। মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান বস্তু ধর্ম্ম,—

"A man's religion is the chief fact with regard to him, and creatively determines the rest."

তাহার কার্য্যকলাপ ইহারই মুখ্য এবং গৌণ ফল মাত্র। তিনি কর্ম্মফল বিশ্বাস করিতেন; ইহা হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠদণ্ড স্বরূপ। খ্রীষ্টানগণ কর্ম্মফল মানেন না; আজকাল কেহ কেহ মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে এবং কতকগুলি বিষয়ে তাহার কিছুই স্বাধীনতা নাই। যে সকল ঘটনা তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, উহাই তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ। পাপের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী জয়, এই বিশ্বাস কার্লাইলের জীবনের ভেলা স্বরূপ। তিনি বাইবেলের (Revelation)এ বিশ্বাস করিতেন না। ভগবান নিষ্ক্রিয় নহেন; তিনি দয়া, প্রেম এবং সত্যের অবতার। ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। প্রার্থনা ভিন্ন কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর নহে; যদি কিছু থাকে, তাহা নীরস ধর্ম্ম; তাহাতে আত্মার উন্নতি হয় না। প্রার্থনা আত্মার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। প্রার্থনা সরল হওয়া আবশ্যক; বাঁধা ছড়ার মত প্রার্থনাকে তিনি প্রার্থনার মধ্যে গণনা করিতেন না। তোমার কি অভাব, তুমিই জান; তোমার প্রার্থনা তদ্‌-জ্ঞাপক হইবে। আত্মা অবিনশ্বর।

"The possibility, nay, (in some way) the certainty of perennial existence daily grows plainer to me."

ঈশ্বর মঙ্গলময়, দয়াময়, পূর্ণ, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টজগৎ মঙ্গলের আকর নহে। তিনি উহাকে 'Divine infernal universe' বলিয়াছেন। ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তিনি সকল সময় সামঞ্জস্য দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার স্বীয় জীবনই এক ধর্ম্ম-বেদ। গুরুতর কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না। অর্থের সৎব্যবহার তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। প্রকৃতির পবিত্র নিলয় স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার শৈলমালার অভ্যন্তরে এবং চেলসিয়ার নির্জ্জন কুটীরবাসী যোগীর ন্যায় দিনযাপন করিয়াছেন; এবং আসন, প্রাণায়াম, এবং মুদ্রা প্রভৃতি অভ্যাস না করিয়াও তিনি যে নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, নিষ্কাম জীবনের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বিলাসিতা এবং দুর্নীতির পাপস্রোত যখন খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখনই

ভগবান এই যোগীবরকে প্রেরণ করেন। তাঁহার অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া ঐ গতি ফিরিয়াছিল। তাঁহার লেখনীতে কখন সুধা ঢালিয়াছেন, কখনও অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছেন; প্রেমিক এবং পুণ্যাত্মা তাঁহার বংশীরব শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন; পাপী এবং দুরাত্মা তাহার ভৈরবনাদে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। আর সে প্রাণস্পর্শী বংশীনাদ জগদ্বাসী কখনও শুনিতে পাইবে কি?

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

জাতিভেদ ও কৌলীন্য।

জাতিভেদ কিরূপ হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ শিক্ষা-প্রণালী পুঁথিগত বিদ্যাদান নহে, কোন শিক্ষাপ্রণালীই কেবল পুঁথিগত বিদ্যাদান নহে। পুঁথিগত বিদ্যা সকল শিক্ষাপ্রণালী-রই সহায়তা করে মাত্র। যেস্থলে সেরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, সেই স্থলেই পুঁথি-গত জ্ঞান সহায়তা করে। নহিলে শিক্ষা-প্রণালীর অর্থই কার্য্যোপযোগী তরিবদ। লোক-চরিত্র সুগঠন করা সকল মানুষী শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই প্রকার চরিত্র গঠনোপযোগী তরিবদ পাইয়া যদ্দ্বারা লোকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপযোগী হয়, এরূপ শিক্ষাই হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী ও জাতি-ভেদ। সেই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই একদা নিজ নিজ বৃত্তি ও ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইয়া পারলৌকিক এবং ঐহিক সুখভাগী হইত। এরূপ শিক্ষাপ্রণালীর তাই দ্বিবিধ অঙ্গ ছিল, একের দ্বারা পারলৌকিক এবং অন্যের দ্বারা ঐহিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। যদ্দ্বারা পারত্রিক উদ্দেশ্য সাধন হইত, তাহাই তপস্যা এবং যদ্দ্বারা ঐহিক সুখসাধনোপায় হইত, তাহাই জীবিকা। তজ্জন্য প্রতি বর্ণ ও জাতিরই শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত তপস্যা ও জীবিকা উভয়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য; তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন তপস্যা এবং যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহই জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য, তন্মধ্যে যজন (যজ্ঞাদি) অধ্যয়ন ও দান তপস্যা এবং অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা জীবিকা। বৈশ্যেরও যজন, অধ্যয়ন ও দান তপস্যা এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজ-সেবাই তপস্যা এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা।"

প্রতিবর্ণই এই প্রকার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট তপস্যা এবং জীবিকার্জ্জনে সুশিক্ষিত হইয়া জাতিভেদের সুন্দর উদ্দেশ্য সাধন করিত। তদ্দ্বারা একদা প্রতিবর্ণের সাধন-ধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্ম লাভ হইত; প্রতি বর্ণই তপস্যা দ্বারা স্বকীয় আধ্যাত্মিক ইষ্টলাভ করিত, অথচ, তাহার জীবিকার্জ্জন হইত। শুধু জীবিকার্জ্জন নহে, তৎসঙ্গে লোক-সমাজের সর্ব্বকার্য্য এবং বৃহৎ ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। তাই প্রাচীন আর্য্যসমাজ একদা সামাজিক অভ্যুদয়ের এবং সভ্যতার পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিল কেবল জাতিভেদের সুব্যবস্থা

ও সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী-হেতু। সেই শিক্ষা-প্রণালী কিরূপে সম্পন্ন হইত? প্রতিবর্ণের শিক্ষা স্বতন্ত্র ভাবে প্রদত্ত হইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার সহিত ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা, ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার সহিত বৈশ্যের শিক্ষা এবং বৈশ্যের শিক্ষার সহিত শূদ্রের শিক্ষা মিশিত না। ক্ষত্রিয়ের যে প্রকার অস্ত্র-ব্যবহার-শিক্ষা, তাহা অপর জাতীয় শিক্ষার সহিত মিশিবার যো নাই; সর্ব্ব সমাজেই সে শিক্ষা স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হয়। বৈশ্যদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্মাদির শিক্ষা স্বতন্ত্র ভাবে এবং শৈশব কাল হইতে প্রদত্ত হইলেই তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে সুদক্ষ হইতে পারে বলিয়া সে শিক্ষা স্বতন্ত্রই থাকিত এবং স্বতন্ত্র থাকিত বলিয়াই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। ইদানীন্তন কালেও এ প্রকার ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্মাদির শিক্ষা সুসম্পন্ন হইবার জন্য সর্ব্বসমাজেই স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আর শূদ্রগণের শিল্পাদির ত কথাই নাই; তাহা আজিও সর্ব্বসমাজে স্বতন্ত্রই রহিয়াছে এবং যে স্থলে স্বতন্ত্রভাবে Technical Education রূপে প্রদত্ত হয়, সেই স্থলেই সেই শিক্ষা হইতে সুফল প্রসূত হয়। সর্ব্বজনের শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দিবার ভার কেবল ব্রাহ্মণের উপর সমর্পিত ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণই অধ্যাপনার নিমিত্ত সেই শাস্ত্র-জ্ঞানে সুসম্পন্ন হইতেন এবং তিনি সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সদাচারী, সাধু ও পবিত্র থাকিতে হইত। সমাজে সর্ব্বজনকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, দানে ও ধ্যানে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সুসম্পন্ন করিয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত ছিল, আজিও আছে। তাহাই তাহার জীবিকা, যাহার জীবিকা যাহা, তাহা অবহেলা করিবার যো নাই বলিয়া তাহা জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ভার সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে সদাচারী ও শুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত, তাই ব্রাহ্মণ চরিত্রের পবিত্রতা ও শুদ্ধাচার সর্ব্ব জাতিরই আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-সংসর্গে সকলকেই আসিতে হইত। যে শূদ্র সুব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষার্থ নিয়োজিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণসেবাই নিজ পারমার্থিক সাধন এবং ঐহিক জীবিকারূপে গ্রহণ করিত, তাহাকে ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতে হইত। প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণই আবার ক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্রদাতা ছিলেন। রাজকার্য্য তাঁহারই মন্ত্রবলে সম্পাদিত হইত। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণকে বড়ই শুদ্ধাচারে থাকিতে হইত। ব্রাহ্মণের শুদ্ধাচারেই প্রাচীন আর্য্যসমাজের পবিত্রতা সুরক্ষিত হইত। তিনি নিজে সদাচারী হইয়া সকল বর্ণকে সদাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দিতে দিতে শুধু শাস্ত্র-জ্ঞানে নহে, নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজের সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে পবিত্রতার সঞ্চার করিয়া দিতেন।

সর্ব্বদেশেই সামাজিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছে। লাইকার্গস, ড্রেকো, সোলন প্রভৃতির রাজ ব্যবস্থায় এক এক প্রকার সামাজিক শিক্ষা-প্রণালী বিধানিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইউরোপীয় সমস্ত রাজ্যেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী রাজধর্ম্ম-প্রণোদিত। ভারতীয় প্রজাবর্গের শিক্ষাকার্য্যের সুব্যবস্থা ও সহায়তা করা ইংরাজরাজের কর্ত্তব্য মধ্যে গণনীয়। প্রাচীন আর্য্যসমাজ এই কর্ত্তব্যজ্ঞানে

চালিত হইয়া জাতিভেদের সুব্যবস্থা ও সুনীতি প্রচলিত করিয়াছিল। সেই জাতিভেদকে কুল-ক্রমাগত করা সমাজনীতি। সুব্যবস্থা-ক্রমে সমাজের সর্ব্বাঙ্গকে সমাজ-সেবায় সুদক্ষ করিয়া আনা সেই সমাজ-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। যে কর্ম্মবিভাগের জন্য জাতিভেদ, সেই কর্ম্মবিভাগ কুলক্রমাগত হইলেই তাহাতে সুদক্ষতা জন্মিতে পারে এবং তদ্রূপ সুদক্ষতালাভেই সমাজসেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সমাজের মঙ্গলসাধনাই সমাজ-নীতি এবং সমাজ-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করাই রাজধর্ম্ম। ডাক্তার রবার্টসনের উদ্ধৃত বাক্যে প্রতীত হয় যে, সমাজের মঙ্গলার্থ লোক-বিশেষের ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অকিঞ্চিৎকর। লোক-বিশেষের ক্ষতি-বৃদ্ধি যেমন অকিঞ্চিৎকর, তেমনি সমাজস্থ কোন বিশেষ শ্রেণীবিভাগের বা জাতির ক্ষতি বৃদ্ধিও অকিঞ্চিৎকর। তাই, আর্য্যসমাজে শূদ্রজাতির কুলক্রমাগত কর্ম্ম-বিভাগও বৃত্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমাজের মঙ্গল-মন্দিরে স্বার্থপরতার বলি জাতিভেদ শিক্ষা দেয়। কিসের জন্য হিন্দু-সমাজের শূদ্রজাতিসমূহ কুলক্রমাগত হইয়া আসিয়াছে? কেবল সমাজের ইষ্টার্থলাভ। সমাজের ইষ্টই মানবজাতির ইষ্ট, মানব জাতির যাহা সাধারণ ইষ্ট, তাহাই প্রধান সামাজিক ধর্ম্ম। এই সামাজিক ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত যদি স্বার্থপরতার বলি দিতে হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই কেবল সমাজ সেবার্থ আজীবন সমাজের অধস্তলে থাকিয়া নিজ ভাগ্যে শূদ্রগণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। সমাজ সেবার এইরূপ সুব্যবস্থা ও ধর্ম্ম আর্য্য সমাজ-নীতি রূপে গণ্য হইয়াছিল।

শুধু যে শূদ্রগণকে সমাজ মধ্যে নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমাজের ইষ্ট সাধনার্থ সমাজ-সেবা করিতে হইত, এমত নহে; বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়গণকেও তদ্রূপ করিতে হইত। করিতে হইলে কাহারও পরমার্থ আধ্যাত্মিক মঙ্গলের ব্যাঘাত হইত না। সমাজসেবার্থ প্রতি হিন্দুর জন্ম হইলেও যে আধ্যাত্মিক ইষ্ট তাহার পরম অর্থ, তল্লাভে সবাই সমসত্ত্ববান। সমাজসেবা বরং সেই হিতব্রত সাধনের উপায় স্বরূপ ছিল। সমাজসেবার্থ যে স্বার্থপরতার বিসর্জ্জন আবশ্যক, সেই স্বার্থ-পরতার বিসর্জ্জনে পরার্থপরতা অভ্যস্ত হইতে থাকে। স্বার্থপরতার বিসর্জ্জন ও পরার্থপরতার সাধনায় আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলেই ধর্ম্মের বৃদ্ধি, ধর্ম্মের বৃদ্ধিই হিন্দুর প্রকৃত সমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধি শুধু ব্রাহ্মণের পরমার্থ ও সম্পত্তি নহে, তাহা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও প্রধান অর্থ ও সম্পত্তি বলিয়া গণনীয়। সেই পরমার্থ লাভের জন্যই মানুষের জীবন ধারণ। এই সম্পত্তিতে সুসম্পন্ন করিয়া আনা জাতিভেদ প্রথার প্রধান নীতি বলিয়া প্রতীত হয়। সেই নীতি একদা ধর্ম্মপ্রণোদিত বলিয়া ধর্ম্মনীতি এবং সমাজের ইষ্টসাধক বলিয়া সমাজ-নীতি। হিন্দুসমাজের সমস্ত ব্যবস্থাই এইরূপ ধর্ম্মার্থসাধক। আর্য্য রাজনীতি এইরূপ ধর্ম্মনীতি-নিয়োজিত সমাজ-নীতিকে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমাজ-ধর্ম্মকে রক্ষা করা রাজধর্ম্মরূপে গণনীয় হইয়াছে। এই রাজধর্ম্ম প্রাচীন আর্য্যসমাজে আর এক রীতিকে পরিপুষ্ট করিয়া জাতিভেদের সমাজনীতিকে চরমোৎকর্ষে লইয়া গিয়াছিল। সেই রীতি কৌলীন্য। কৌলীন্য জাতিভেদ রূপ সামাজিক শিক্ষাপ্রণালীর

অতি উৎকৃষ্ট ফল। সেই সামাজিক শিক্ষা প্রণালীকে কৌলীন্য পরিণত অবস্থায় লইয়া যায়। তাহা সেই শিক্ষাপ্রণালীর একদা পরিপাক ও পরম ফল, সেই শিক্ষার পুরস্কার ও আদর্শ। এ কথা আমরা একে একে বিশদ করিয়া বলিতেছি।

অনেকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গালার বল্লাল সেন থাককেই কৌলীন্য বলে; তৎপূর্ব্বে কৌলীন্য ছিল না। কিন্তু সমাজতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীত হয়, যেখানে মনুষ্যসমাজ, সেই খানেই কৌলীন্য; আজিও আছে, চিরকালই ছিল। মনুষ্য-সমাজ সুশৃঙ্খলা ও নিয়মনিবদ্ধ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্যের সৃষ্টি হয়। সমাজ মধ্যে উচ্চনীচতা এবং ভালমন্দের সমাবেশ স্বাভাবিক, সুতরাং কৌলীন্য যদি সেই উচ্চনীচতা এবং ভালমন্দের বিচার ধরিয়া হয়, তবে সমাজসৃষ্টির সহিত কৌলীন্যের উদ্ভব না হইবে কেন? বিশেষতঃ যে সমাজে রাজা আছে, যে সমাজ রাজশক্তি ও রাজনিয়মদ্বারা শাসিত, তথায় কৌলীন্য স্বতই সম্ভূত হইয়া থাকে। সমাজপতি রাজা কাহাদিগকে লইয়া সমাজ সংগঠন করিবেন? কাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবেন? কাহাদিগের পরামর্শে ও কার্য্যকুশলতায় রাজ্য চালাইবেন? তাঁহার সংসর্গ ও সহবাস কি অভদ্র ও ইতরের সহিত ঘটিতে পারে? সমাজে কি কখন জ্ঞানী ও সাধুদিগের সৎপরামর্শ এবং সংসর্গ অবজ্ঞাত হইয়া মূর্খ, নীচ এবং অধম লোকের বৃদ্ধি হইতে পারে? তাহা হইলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে কেন? রাজা যেমন সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহার প্রধান কর্ম্মচারী, সচিব, বন্ধু বান্ধব এবং অনুচরবর্গও তদোচিত সম্ভ্রান্ত, এবং গুণধর শ্রেষ্ঠ লোকই হওয়া চাই। তজ্জন্য প্রতি সমাজেই এইরূপ একদল লোকের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। তাই সর্ব্ব সমাজেই সেইরূপ লোকের রাজসম্মান ও মর্য্যদা। তাঁহারাই সর্ব্ব সমাজে কুলীন বলিয়া কিম্বা তদ্রূপ নামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকেন। আজিও করিতেছেন, অনাদিকালই করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজ পর্য্যালোচনায় এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়। পূর্ব্বতন আর্য্যসমাজ সর্ব্ব প্রাচীন লোকসমাজ; সেই লোকসমাজে আবহমান কাল কৌলীন্য বিদ্যমান ছিল। বৈদিক আর্য্য সমাজে যে কৌলীন্য ছিল না, এমত নহে, তবে সে সমাজের কৌলীন্য তত স্পষ্ট লক্ষিত নহে বলিয়া মনু সেই কুলধর্ম্মকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। ভগবান বশিষ্ঠ সেই কথাই বলিয়াছেন:—

"দেশধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ।"

"বেদে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

মনুসংহিতার প্রারম্ভেই তাই আমরা দেখিতে পাই, ভৃগু বলিতেছেন যে, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বংশ-পরম্পরাগত কুলধর্ম্ম এবং বেদ বাহভূর্ত পাষণ্ডগণের ধর্ম্ম ভগবান্ মনু এই সংহিতায় বিবৃত করিয়াছেন। মেধাতিথি বলেন, প্রখ্যাত-বংশ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই কুলধর্ম্ম। এই কুলধর্ম্ম কত কাল চলিয়া আসিতেছে? যাহা বংশ-পরম্পরাক্রমে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে, কল্লুকভট্ট তাহাকেই কুলধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই কুলধর্ম্ম রক্ষা করা প্রাচীন আর্য্য সমাজে রাজধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মরূপে গণ্য ছিল। মনু কোন্ কুলকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন দেখুন;—

"মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলাত্মল্পধনান্যপি।
কুলসংখ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্‌যশঃ।"
৩ অ ৬৬।

"যে কুল বেদদ্বারা সমৃদ্ধ, যে কুলে বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম্মের নিত্যই অনুষ্ঠান হইতে থাকে, সেই কুল অল্প ধনশালী হইলেও কুলগণনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মহা সুখ্যাতি লাভ করে।"

শুদ্ধ বেদজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেই হইবে না, সেই বেদজ্ঞান যে কুলকে সদাচার ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া যশস্বী করিয়াছে, সেই কুলই উৎকৃষ্ট। জ্ঞান-লাভ কিসের জন্য? উচ্চ জ্ঞান যদি সদাচার প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারে, তবে সে জ্ঞান লাভ নিরর্থক। আমাদের শাস্ত্রে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের যে এত মান মর্য্যাদা ও গৌরব ছিল, তাহা শুদ্ধ তাঁহার বেদজ্ঞানের জন্য নহে, সেই জ্ঞানানুমত কর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অর্থই সদাচারী বেদজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। ভগবান্ অত্রি সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন;—

"বেদশাস্ত্রাণ্যধীতে যঃ শাস্ত্রার্থঞ্চ নিষেবতে।
তদাসৌ বেদবিৎ প্রোক্তো বচনন্তস্য পাবনম্॥"

"যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার উপদেশ মত কার্য্য করে, তাঁহাকেই 'বেদবিৎ' বলা যায়। তাঁহার বাক্য পবিত্রতা জনক।"

এখন কথা এই, কিরূপ সদাচার সম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাচীন আর্য্য সমাজে কুলীন নামে প্রথিত হইত। মনু এইরূপ ব্রাহ্মণকে কুলীন বলিয়াছেন;—

"দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ॥"

"বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা, পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণেরও কি রূপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে। এই রূপ বংশ-পরম্পরা-শুদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য বহনের তীর্থ স্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

মনু তৎপরেই বলিয়াছেন, এরূপ একজন বেদবিৎ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দশলক্ষ মূর্খ অকুলীন ব্রাহ্মণের তুলনা হয় না। সেইরূপ আভিজাত্য (কৌলীন্য) সম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। বলিতে পার, মনু এই ব্রাহ্মণকেত স্পষ্ট কুলীন বলেন নাই, আভিজাত্য-সম্পন্ন বলিয়াছেন মাত্র। এরূপ ব্রাহ্মণ যে স্পষ্টাক্ষরে "কুলীন"-পদবাচ্য, তাহা সম্বর্ত্ত সংহিতায় পরিদৃষ্ট হয়;—

"শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় অর্থিনে চ বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে ভক্ত্যা তদ্বৈ তৎ মহৎফলম্॥"

"বেদজ্ঞ, সদ্বংশজাত কুলীন এবং ধন-প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্তু ভক্তি-পূর্ব্বক দান করা হয়, তাহা মহাফলজনক হয়।"

এস্থলে স্পষ্ট "কুলীনায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কুলীন শব্দ যে শুধু সম্বর্ত্ত সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমত নহে, বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ উল্লেখ করিয়াছেন!—

"কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্যস্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি।"

"বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়, অতএব সদ্বংশীয়া কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।।"

রাজা কিরূপ গুণ সম্পন্ন লোক দেখিয়া রাজ্যে নিযুক্ত করিবেন, তাহাই ঋষি বলিতেছেন :—

"বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, কুলীন, সত্যবাদী, পবিত্র" ইত্যাদি।

তবেই দেখা যাইতেছে, মনূক্ত সেই প্রাচীন আর্য্যসমাজে সদ্বংশোদ্ভব জনগণকে "কুলীন" বলিত। এই কৌলীন্য ও আভিজাত্য কুলক্রমাগত ছিল। মনু বলিয়াছেন, অতিদূর বংশ পর্য্যন্ত আভিজাত্য দেখিবে। তবে কত পুরুষে কুলীন সন্তান প্রশস্ত? তাঁহার মতে দশ পুরুষে কুলীনই প্রশস্ত। এইরূপ দশ পুরুষে কুলীন সন্তানের সংসর্গ অতি পবিত্রকর। তাঁহাকেই পংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে। যাঁহার সংসর্গে দুষ্ট লোকও অদুষ্ট হয়, তিনিই পংক্তি পবিত্র করেন। সেই পংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিরূপ?

"অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তি পাবনাঃ।।"
৩ অ। ১৮৪।

"সমুদায় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।"

এই দশ পুরুষে কুলীনই যে মুখ্য কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন, এরূপ অনুমান যুক্তি সঙ্গতই জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যসমাজে কৌলীন্য যে পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিল, একথা নিশ্চিত। শুধু এক পুরুষে কুলীন হইত না, পিতামহাদি দূর পূর্ব্বপুরুষগণের আভিজাত্য দেখিতে হইত। যাঁহার সেইরূপ আভিজাত্য থাকিত, অথচ নিজে বেদজ্ঞ, বিদ্যাবান ও শুদ্ধাচারী, তিনিই প্রশস্ত কুলীন। এখন আমরা কুলীনের ছেলেকে কুলীন বলিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু মনূক্ত সমাজে সেরূপ হইত না। তখনকার কালে কুলীনের ছেলে মূর্খ হইলেও যদি সদাচারী হইতেন, তবে তিনি কুলীনের মর্য্যাদা লাভ করিতেন। সে মর্য্যাদা সেই মূর্খ পাত্রের নহে, তাহা তাঁহার উচ্চ বংশ ও কুলের প্রাপ্য। এই দেখুন মনু তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন :—

"অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা যস্য পুত্রঃ স্যাদ্বেদপারগঃ।
অশ্রোত্রিয়ো বা পুত্রঃ স্যাৎ পিতা স্যাদ্বেদপারগঃ।।
জ্যায়াংস্ত্বয়োর্বিদ্যাৎ যস্য স্যাচ্ছ্রোত্রিয়ঃ পিতা।
মন্ত্র সংপূজনার্থস্তু সৎকারমিতরোঽর্হতি।।"
মনু। ৩ অ। ১৩৬। ১৩৭। :৮

"যাঁহার পিতা বেদপারগ নহেন, কিন্তু যিনি স্বয়ং বেদপারগ অথবা যিনি নিজে বেদজ্ঞ নহেন, কিন্তু পিতা বেদজ্ঞ—এই দুই জনের মধ্যে যাঁহার পিতা বেদজ্ঞ, তাঁহাকেই প্রশস্ততর পাত্র বলিয়া জানিবে। কিন্তু বেদমর্য্যাদার জন্য ইতর অর্থাৎ অশ্রোত্রিয় পিতৃক বেদজ্ঞও সৎকারার্হ বেদপারগ পিতার পুত্র বিশিষ্ট সংস্কারবান্ হেতু তাঁহার পাত্রত্ব অধিক।"

তবেই মনু বলিতেছেন, বেদজ্ঞের পুত্র বিশেষ পূজার্হ কেন? যেহেতু সৎকুলোদ্ভব হইয়া উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়া সদাচারী হইয়াছেন। তাঁহার সংস্কার অতি পবিত্র। সে সংস্কার পবিত্র কেন? তিনি পবিত্রকুলে আশৈশব পবিত্র পথে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বলিয়া। মনু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, যাঁহার পিতৃ পিতামহাদির আভিজাত্য অতি উৎকৃষ্ট, তিনিই প্রকৃত পক্ষে কুলীন। সেই নীতি অনুসারে এস্থলে কুলীনের পুত্র কুলীন।

একবার লোকে কৌলীন্য লাভ করিলে, তাঁহার বংশধরগণ বংশপরম্পরা-ক্রমে কুলীন হইয়া থাকেন। কারণ এই, সর্ব্ব দেশেই বংশ-মর্য্যাদা আছে। সকলেই বীজগত পার্থক্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই বীজগত মর্য্যাদা সমাজ দিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই, প্রতি সমাজেই কুলীন বংশধরগণের এত মান ও মর্য্যাদা। সদ্বংশজাত হইলেই লোকে সৎশিক্ষার প্রত্যাশা করে। অনেক স্থলেও সেই প্রত্যাশা মিথ্যা হয় না। তবে সকল নিয়মের নিপাতন আছে। নিপাতন কখনই নিয়মস্থানীয় হইতে পারে না। শুধু আর্য্য সমাজ কেন, এসিয়ার সমস্ত রাজ্যে কি এই নিয়মে কৌলীন্য প্রথা কুলক্রমাগত হইয়া চলিয়া আসিতেছে না? ইউরোপীয় বিলাতী সমাজের কৌলীন্য প্রথা কিরূপ? সেখানে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়,তাঁহাদিগকেই অবশ্য কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একবার এক জন "কমনর"নিজ গুণগৌরবে "লর্ড" হইয়া গেলে, তাঁহার বংশধরগণ সেই লর্ড বংশভুক্ত বলিয়া কি সমাজে সম্মানিত হন না? বিলাতে বংশমর্য্যাদা যথেষ্ট আছে। ভারত অপেক্ষা যে কিছু ন্যূন,এমত অনুমান হয় না। তবে ভারতেরই বা দোষ কি? বীজগত মর্য্যাদা দিতে সর্ব্বসমাজই প্রস্তুত, ভারতের মতই প্রস্তুত। বড়ঘরের ছেলে প্রায়ই বড়ই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তে দেখা যায়, অনেক স্থলেই তাহা ঘটিয়া থাকে; যেখানে না ঘটে, সেই বংশধর কুলাঙ্গার বলিয়া সমাজে কলঙ্কিত হয়েন। অনেক স্থলে সংসর্গদোষে সেরূপ কুলাঙ্গার জন্মে। বরং এমতও দেখা যায়, সেই কুলাঙ্গারের সন্তান-সন্ততিগণ আবার নিজ কুলানুযায়ী উৎকর্ষলাভ করিয়া বংশের পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতে বিলাত হইতে যখন কোন "লর্ড" বংশভুক্ত সম্ভ্রান্ত আমাদের বড়লাট হইয়া আসেন, আমরা তখন মনে মনে খুসি হই কেন? আমরা মনে করি, বড় বংশধরেরা প্রায়ই উচ্চমনা হইয়া থাকেন; উদারতা ও সদাশয়তা উচ্চকুলেই সম্ভাবিত। সদাশয় এবং উদারচিত্ত লোকের প্রভুতায় নীচাশয় সচিবগণকে হীনতেজ হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং ভারতের মঙ্গলাশা সর্ব্বসাধারণের মনে উদয় হয়। তাহাই হর্ষের কারণ।

সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বরাজ্যেই গুণের গরিমা এবং প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বরাজ্যেই উচ্চগুণধরগণই নিজ নিজ কার্য্য-গরিমায় সম্ভ্রান্ত পদে উত্তোলিত হইয়া থাকেন। কৌলীন্য লাভ করাতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তপ্রসন্নতা জন্মে। চিত্তপ্রসাদ হেতু উদারতার উদয় হয়। উদারতার সহিত দান, ধ্যান, ও সামাজিক গৌরব লাভের জন্য সদাশয়তা সঞ্জাত হয়। সুতরাং যেখানে চিত্তপ্রসাদ, সেই খানে ঔদার্য্য, যে খানে ঔদার্য্য, সেই খানে সদাশয়তা, যে খানে সদাশয়তা সেই খানে সহৃদয়তা, যে খানে সহৃদয়তা, সেই খানে বদান্যতা, ও দান, ধ্যান। প্রাচীন আর্য্য সমাজেও সময়ে সময়ে যে নবকুলীনের সৃষ্টি হইত না, এমত নহে। অনেক বেদবিৎ দ্বিজ নব কুলীন রূপে অবশ্য সময়ে সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। নিজ কুলগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং অপরাপর ও পূর্ব্বকালীন সম্ভ্রান্তগণের সহিত সমগৌরব লাভ করিবার জন্য সমচিত্ততা প্রদর্শন করিতে না পারিলে নবকুলীনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তাই তাঁহাকে উক্ত উচ্চগুণ সমূহের পরিচয়

দিতে হয়। একবার বংশে অধিষ্ঠান করিলে বংশপরম্পরা-ক্রমে সেই গুণ সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, সম্ভ্রান্তগণ একবার উচ্চকুলে উত্তোলিত হইলে স্বীয় বংশধরগণকে তৎপদোচিত গুণে ভূষিত করিবার জন্য উদ্যোগী হয়েন। সেই বংশধরগণও পরিবারমণ্ডলে সমুচিত শিক্ষা লাভ করিয়া বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকেন। উদারতা এবং সদাশয়তার শিক্ষা প্রায়ই দৃষ্টান্তানুসরণে প্রচালিত হয়। দৃষ্টান্তের শিক্ষাগৌরব সর্ব্বপেক্ষা সমধিক। মুখের কথায় ফল যত না হয়, দৃষ্টান্তের ফল তদপেক্ষা শতগুণে বেশী। উচ্চ কুলের বদান্যতা, ঔদার্য্য, সদাশয়তা, মহত্ত্ব ও সমচিত্ততা পিতা মাতার দৃষ্টান্তেই প্রদর্শিত হয়। সেই পিতা মাতার সংসর্গ এবং দৃষ্টান্ত কত অধিক প্রবল হইবার কথা, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। এ শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র ক মহাশয় রাখিতে হয় না এবং উপদেশ ব ্যরও আবশ্যকতা হয় না। সন্তান সন্ত ণ: আশৈশব যেমন দেখিয়া শুনিয়া আসি ন, তদনুসরণে তাঁহারা স্বতই প্রবৃত্ত ত থাকেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি আপনা উচ্চাশয়ে ধাবিত হয়। নিজ নিজ কুল রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে পিতৃপিতাম ম বজায় করিয়া চলিতে হয়। উচ্চ ব হইলেই এইরূপ প্রবৃত্তি স্বতই সদাশয়তা, উদার। সুতরাং উচ্চকুলে প্রতিষ্ঠান্যতা বংশ-পরাম্পরাক্রমে কৌলীন্য সামাজিক পড়ে। তাই হইয়াছে। তাই, রূপে গণ্য করিয়া রাখাই প্রতি লক্রমাগত নিয়মবদ্ধ হইয়া আসি প্রকার বাতে

সমাজেরই মঙ্গল। কারণ, সমাজ মধ্যে যত উচ্চগুণধরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ততই সমাজ লাভবান হয়। সুতরাং কৌলীন্যকে কুলক্রমাগত করাতে সমাজে বরাবরই শুভফল ফলিয়া আসিতেছে। ভারতেও এজন্য কৌলীন্য কুলক্রমাগত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যসমাজে কৌলীন্য কুলক্রমাগত হওয়াতে বরাবর, সুফল প্রসব করিয়াছিল বলিয়া যিনি সমাজপতি রাজা, তিনি তাই কুলধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নবান হইতেন। কুলধর্ম্ম রক্ষা করা এবং কুলীনের বংশমর্য্যাদা দেওয়া রাজার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গননীয় ছিল। সেই জন্য আর্য্যসমাজে কুলীনগণের রাজবৃত্তি নিয়োজিত হইত। মনু বলিতেছেন,—

> "শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।
> সংরক্ষেৎ সর্ব্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্॥"
> মনু সং। ৭ম। ১৩৫।

"শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেদাদি শাস্ত্রে ও নীতি শাস্ত্রে কতদূর অধিকার, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজা তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি অবধারণ করিবেন এবং স্বপুত্র নির্ব্বিশেষে চৌরাদি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।"

বাস্তবিক, কৌলীন্য সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরব। সেই মর্য্যাদা ও গৌরবের উৎস সমাজপতি রাজা। রাজা সমাজের ভালমন্দের বিচারকর্ত্তা। কৌলীন্যের সামাজিক ফল যখন শুভপ্রদ, তখন রাজা কুলীনগণকে রাজ্য মধ্যে মর্য্যাদা দান করিবেন না কেন? ইউরোপীয় সমাজেও রাজাই কৌলীন্যদাতা। মানুষকে সম্ভ্রান্তপদে উত্তোলিত করা রাজারই কার্য্য। প্রকৃত গুণবানের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দান না করিলে সমাজে গুণের গৌরব হয় কই? তাই মধ্যে

মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি উচ্চ গুণবান রাজকর্ম্মচারী সম্ভ্রান্ত পদে উত্তোলিত হইতেছেন। গুণবান নিজ গুণানুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া সমাজে গৌরবের সহিত চিরদিন কাটাইতেছেন। তদ্রূপ, ভারতীয় আর্য্যসমাজেও কুলীনগণ রাজপ্রসাদে চিরসম্বর্দ্ধিত হইতেন। তাঁহারা রাজারই পোষ্য। তাঁহাদিগকে পোষণ ও রক্ষা করা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত। কারণ, যাঁহাদের অবস্থানে রাজ্যের সুমঙ্গল ও গৌরব, তাঁহাদিগকে পোষণ ও রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই, মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজাপালন করা এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া যেমন রাজার প্রধানধর্ম্ম, বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা ও রক্ষা করাও তাঁহার সমান রাজধর্ম্ম ছিল। কুলীন ভিন্ন রাজা নিজ পৌরোহিত্য কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত করিতে-পারিতেন না। বিষ্ণুসংহিতায় আছে :—

"বেদেতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ।"

বিষ্ণুসংহিতা, ৩ অধ্যায়। ৪৯

"বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত কুলীন, সম্পূর্ণাবয়বসম্পন্ন,তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন।"

শুধু কুলীন হইলে হইত না, রাজপুরোহিতকে বেদবিৎ হইতে হইত। শুধু বেদবিৎ নহে, তৎসঙ্গে সদাচারী, তপোনিষ্ঠ হইতে হইত। এরূপ কুলীনের মান রাজার কাছেই ছিল। সৎকুলীনের মানমর্য্যাদা রাজা ভিন্ন আর কে দিতে পারেন? রাজা কুলীন দেখিয়া শুধু যে নিজ পৌরোহিত্য কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেন, এমত নহে, রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে কুলীনগণই প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তাঁহার সভাসদ্গণ কিরূপ হইত, তাহাও বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"জন্ম কর্ম্মব্রতোপেতাশ্চ রাজা সভাসদঃ কার্য্যাখিনো মিত্রে চ সমাঃ কামক্রোধভয় লোভাদিভিঃ কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ।"

বিষ্ণুসংহিতা, ৩ অধ্যায়। ৭২।

"সদ্বংশে যাঁহাদিগের জন্ম, যাঁহারা সংস্কার-শোধিত, নিয়মী ও শত্রু মিত্রে সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থীগণ, যাঁহাদিগকে কাম, ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিম্বা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে," অর্থাৎ ঘুসখোর নহেন, রাজা এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ করিবেন।"

সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ রাজপারিষদ হইতে পারিতেন না। শুধু সদ্বংশোদ্ভব নহে, সেই সদ্বংশীয়কে আরও কত গুণে বিভূষিত হইতে হইত, তাহাও উক্ত হইয়াছে। রাজার সংসর্গ এইরূপ হওয়াই চাই। তিনি যাঁহাদিগকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, সৎকুলোদ্ভব হওয়া ... তাঁহাদিগের একান্ত আবশ্যক, তাহা ম... বলিয়াছেন :—

"মৌলান্‌শাস্ত্রবিদঃ শূরান্‌লব্ধ লক্ষান্‌ কুলো[illegible] সচিবান্‌ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষি[illegible]

৭ অ। ৫৪।

"দেবস্পর্শ করিয়া শপথক ... Cove-nanted) পুরুষানুক্রমে রাজ... বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী, যাঁহারা শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ এবং সৎকুলোদ্ভব (কুলীন), এরূপ আটটী মন্ত্রী ..."

প্রত্যেক রাজার থা... এরূপ বৃত্তান্ত

এস্থলে সংক্ষি... অনুমান হয় দেওয়া হইল, ... রাজমন্ত্রিগণকে না যে, সেই হইবে। তন্মধ্যে একান্তই ব্র...

যুদ্ধ-বিদ্যায় সুনিপুণ ক্ষত্রিয় কুলীনও স্থান লাভ করিতে পারিতেন এবং পুরুষানুক্রমে বৈশ্য বণিক রাজকর্ম্মচারীও শপথ লইয়া অভিষিক্ত হইতেন। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য সকলেই দ্বিজসম্প্রদায় ভুক্ত, সুতরাং তাহাদিগের কাহারই বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার বাধা ছিল না। যাঁহাকে স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ হইতে হইত, তাঁহার ক্ষত্রিয় বর্ণ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। রাজা যে স্থলে প্রধান সচিব সভায় রণবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় মন্ত্রী রাখিতেন, সে স্থলে বৈশ্য কার্য্যের মন্ত্রদাতাও অবশ্য গ্রহণ করিতেন। বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্যগণও যে রাজসচিবত্ব প্রাপ্ত হইতেন, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

স্বরন্ধ্রু গোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ॥"
১ অ। ৩১১

রাজাভিষিক্ত মন্ত্রী কিরূপ হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—অপরাপর গুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহাকে আরও এই সকল গুণে ভূষিত হইতে হইবে। সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে যদি বিশৃঙ্খলা থাকে, তবে তিনি যেন তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর হয়েন, আর তিনি যেন তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, ত্রয়ী, এবং কৃষিবাণিজ্যাদিবিষয়ক বার্ত্তা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন। সেই বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কি ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে যে একান্ত সৎকুলোদ্ভব কুলীন হইতে হইত, সে কথাও যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, তাহাতে সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, সেকালে দ্বিজত্রয়ই কৌলীন্য লাভে সমর্থ হইতেন এবং সেই ত্রিবিধ দ্বিজই রাজপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইতেন না। সেই দ্বিজত্রয়ই বেদজ্ঞ হইয়া সৎকুলোচিত সদাচারীও হইতে পারিতেন। যে বেদজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান ও সদাচার কৌলীন্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য ছিল, সেই গুণে ভূষিত হইয়া দ্বিজত্রয়ই সুতরাং কৌলীন্যলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিতেন। সমাজে সর্ব্বজাতি মধ্যেই কৌলীন্য থাকা উচিত। যেহেতু সর্ব্বজাতীয় গুণধরগণের মর্য্যাদা লাভ করাই প্রশস্ত। তাহা হইলেই কৌলীন্য রীতি হইতে সমাজে সুফল ফলিতে পারে। ভারতীয় আর্য্য সমাজে সেইরূপ প্রথাই প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য সমাজে দ্বিজত্রয়ই কৌলীন্য লাভে সমর্থ হইতে পারিতেন।

এক্ষণে বোধ হয়, অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্যসমাজে কৌলীন্য প্রথা বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই প্রথা বজায় রাখা এবং সৎকুলোদ্ভব কুলীনগণকে সর্ব্বতঃ রক্ষা করা রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। সৎকুলোদ্ভূত কুলীনগণকে রক্ষা করার অর্থই এই, সমাজমধ্যে উচ্চবংশীয় গুণধরগণকে রক্ষা করা আবশ্যক। কোন্ নীতি ধরিয়া এ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? সুবীজ রক্ষা করাই এই প্রথার মূল নীতি। সুবীজ রক্ষা করা কেন? ক্ষেত্র যেমন তেমন হউক না কেন, বীজ যেরূপ হইবে, সেইরূপ বৃক্ষ ও ফল জন্মিবে। তদ্রূপ মানবকুল সম্বন্ধেও নীতি এই যে, যেমন সদ্বংশ ও সুবীজ হইবে, তেমনই গুণাধার সন্তান সন্ততি জন্মিবে। তাই, কৌলীন্য নীতি কুলক্রমাগত করা আবশ্যক। কারণ, সদ্বংশেই সৎশিক্ষা ও সদাচার বংশপরম্পরাক্রমে প্রবর্ত্তিত থাকে।

সেই সৎশিক্ষা এবং সদাচার প্রভাবে উচ্চ বংশধরগণের গুণগৌরব বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং কৌলীন্য এক মহা সামাজিক শিক্ষা নীতি।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে কৌলীন্য কিরূপ সামাজিক ইষ্টার্থ সিদ্ধ করিত, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, স্ববৃত্তিতে না থাকিলে কৌলীন্য লাভ করা যায় না। কুল লক্ষণের মধ্যে তাই "বৃত্তির" স্থান। এ রীতি যে প্রাচীন আর্য্য সমাজেও প্রচলিত ছিল, তাহা স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত বাক্যাবলিতে সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রাচীনকালে রাজসচিব-সভা প্রতি বর্ণভুক্ত কুলীন দ্বারা সংগঠিত হইত। এখন যেমন আমাদের বড়লাটের সভায় এক এক বিষয়ের জন্য এক এক জন সচিব নির্ব্বাচিত হয়, তদ্রূপ প্রাচীন আর্য্যসমাজেও আর্য্য-রাজবর্গের সচিব সভা ধর্ম্মশাস্ত্রপারগ, শস্ত্র-বিদ্যাদক্ষ, রাজনীতিজ্ঞ, বার্ত্তাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলীতে ভূষিত থাকিত। রাজা প্রতি জাতীয় কুলীনের যথাবিধি মর্য্যাদা দান করিতেন। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, প্রতি বর্ণ ও প্রতি জাতি মধ্যে কৌলীন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই রাজ নীতির সামাজিক ফল অতি শুভদায়ক ছিল। এতদ্দ্বারা প্রতি বর্ণ ও জাতি মধ্যে আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রতি জাতি মধ্যে কুলীনগণ আদর্শরূপে সমাজ মধ্যে শোভা পাইতেন।

ইউরোপীয় সমাজে ইদানীন্তনকালে যে কৌলীন্যরীতি প্রবর্ত্তিত আছে, তদ্দ্বারা সমস্ত সম্ভ্রান্তগণ এক জাতি বিশেষে পরিণত হয়। সর্ব্বশ্রেণীস্থ কুললক্ষণসম্পন্ন মহাপুরুষগণ ইউরোপে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যসমাজে এরূপ নীতি ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অভ্যুদয় সর্ব্বজাতি মধ্যেই সম্ভাবিত হইতে পারে। সেরূপ লোক নিজ জাতির গৌরব স্বরূপ। তাঁহারা যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল উজ্জ্বল হয়। যে জাতির মধ্যে অভ্যুত্থিত হন, সে জাতিকে প্রদীপ স্বরূপ আলোকিত করেন। ইউরোপীয় রীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ শ্রেণী হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, বাহির করিয়া লইয়া এক স্বতন্ত্র লোকশ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট করা হয়। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় কুলপ্রদীপ সমস্ত একত্র করা হয়। তাঁহারা একত্র হইয়া সমাজের মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ জ্বলিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যসমাজে সেরূপ ঘটিত না। প্রতি জাতীয় কুলীন সেই জাতির গর্ব্ব ও নেতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রতি জাতি মধ্যে আদর্শ পরম পুরুষরূপে দেখা দিতেন। দেখা দিয়া আত্মকুলগৌরব স্থাপন করিয়া যাইতেন। সেরূপ লোক নিজ জাতীয় ব্যবসা বৃত্তিরই শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। কারণ, প্রতিভা সম্পন্ন লোক নহিলে কোন জাতির গৌরব বা শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয় না। ডাক্তার রবার্টসন বলিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যসমাজে যে জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই প্রথানুসারে কখন কখন নীচ কুলে এমত লোকও জন্মগ্রহণ করিত, যিনি হয়ত কোন উচ্চ জাতির গৌরব সম্পাদনে সমর্থ। এ কথা ঠিক, এই কথা প্রমাণই ইউরোপে তদ্রূপ লোক সকল সম্ভ্রান্তপদে উত্তোলিত হইয়া রাজমর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্য রাজনীতি স্বতন্ত্র ছিল। সর্ব্ব জাতি

মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখাই আর্য্যসমাজের সুনীতি ছিল। কারণ, তদ্রূপ করিতে পারিলেই প্রতি জাতীয় ব্যবসাবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে। প্রতিভাসম্পন্ন লোকদিগকে সমাজের এক স্থানে আনা আর্য্যনীতি ছিল না, কিন্তু সমাজে তাহাদিগকে সর্ব্বজাতি মধ্যে বণ্টন ও বিভক্ত করিয়া দেওয়াই আর্য্য সমাজ নীতি ছিল। রাজনীতি এই সমাজ নীতির সমর্থনকারিণী। প্রতি জাতি মধ্যে প্রতিভা এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আর্য্য সমাজকে সর্ব্ব বিষয়ে সুসম্পন্ন করিয়া তাহাকে একদা চরমোৎকর্ষে লইয়া গিয়াছিল।

শুধু প্রতিভাসম্পন্ন লোক নহেন, সাধু সচ্চরিত্র জনগণও সদাচার বলে কৌলীন্য লাভ করাতে প্রতি জাতি মধ্যে নিজ নিজ সাধুতার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। কি রজোগুণসম্পন্ন, ক্ষত্রিয়, কি তমোগুণান্বিত বৈশ্য সকলেই কুলীনে সাত্ত্বিকতার আদর্শ নিজ নিজ বর্ণ ও জাতি মধ্যেই দেখিয়া তল্লাভে যত্নবান হইতেন। সাত্ত্বিকতা যে সর্ব্বজাতি মধ্যে সম্ভব ও অর্জ্জনীয় হইতে পারে, সমাজে সর্ব্বজাতীয় কুলীনগণ সে বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন করিতেন। তাই, সবাই নিজ জাতীয় কৌলীন্যলাভার্থ সৎপদবী ও সদাচারাবলম্বনে বিশেষ উদ্যোগী হইতেন। কৌলীন্য এইরূপে সর্ব্বদ্বিজাতি মধ্যে বিরাজিত হইত এবং সর্ব্বজাতীয় জনগণকে সৎপথে ও সাত্ত্বিকতালাভে আকৃষ্ট করিত। সর্ব্ব দ্বিজাতীয় সামাজিক শিক্ষার চরমোৎকর্ষ ফল কৌলীন্য। একদিকে প্রতিভা যেমন সর্ব্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিত, অন্যদিকে কৌলীন্য সেই প্রতিভাসম্পন্ন জনগণকে সাত্ত্বিকতার গৌরবে উত্তোলিত করিত। তাই সমাজের সর্ব্বাঙ্গে কুলীনগণের গৌরব ও সৎশিক্ষা দেখা দিত। রাজা তাঁহাদিগের গৌরব ও মর্য্যাদা বাড়াইতেন। বীরসিংহের রাজধানী কান্যকুব্জ সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনগণের যশোগৌরবে পূর্ণ ছিল। তাই বঙ্গাধিপ আদিশূর সেইরূপ কুলীনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজযজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের আদর্শ দিয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে সর্ব্বজাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতীয় কুলীনগণের সদাচার অতি উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হইত। তাঁহারা অপর সর্ব্ব জাতীয় কুলীনগণের চক্ষে সাত্ত্বিকতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। যেহেতু, ব্রাহ্মণ কুলীনগণের সাত্ত্বিকতাই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই, মনু তাঁহাদিগের এত গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। কি রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয়বীর, কি বিষয়ী বৈশ্য, কি তমোগুণান্বিত শূদ্র, সবাই সেই দেবোপম ব্রাহ্মণ তেজ ব্রাহ্মণ কুলীনগণে দেখিয়া ধর্ম্মের গৌরব, সাত্ত্বিকতার পবিত্রতা, এবং দেবত্ব লাভের সামর্থ্য মানুষীতে উপলব্ধি করিতেন। ততই পবিত্রতা, ততই দেবত্ব মানুষের সামর্থ্যাধীন জ্ঞান করিতেন। তাই ক্ষত্রিয়রাজ রাজর্ষি হইতেন, বৈশ্যগণ দানধ্যানে সমাজে বরেণ্য হইতেন। সদনুষ্ঠানের ও পুণ্য কার্য্যের ধূমধামে আর্য্য সমাজ পরিপূর্ণ থাকিত। ব্রাহ্মণগণ যজন যাজন দ্বারা সর্ব্বজাতি মধ্যে দীপরূপে বিচরণ করিয়া সর্ব্বত্র পবিত্রতা সঞ্চারিত করিয়া দিতেন। পাপাচারী ও নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের সমূহ অপযশ হইত। সুব্রাহ্মণগণের গৌরব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইত। সর্ব্বো-

পরি ব্রাহ্মণ কুলতিলক কুলীনগণের গুণ-গরিমা সমাজে দেদীপ্যমান হইত। প্রাচীন আর্য্য সমাজ তাঁহাদের পুণ্যবলে পবিত্র হইয়া যাইত। যথায় তাঁহারা পংক্তিপাবন-রূপে উদয় হইতেন, তথায় তাঁহাদের সংসর্গ-শক্তি-প্রভাবে ব্রহ্মতেজ ও দেবভাব সঞ্চারিত হইত। বারব্রত, যাগযজ্ঞ ও সদনুষ্ঠানের পুণ্যফলে সর্ব্বত্র দিব্য শোভা ধারণ করিত। হায়, আজি সেদিন কোথা! সে দিন কি আর ভারতে কখন উদয় হইবে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ওমা এত নাম তুই কোথা পেলি?

কি নামে যে ডাকবো তোরে,
(ওমা) এত নাম তুই কোথা পেলি?
(আমি) এক নামেতে ডাকতে গেলে,
আর যত নাম যাই মা ভুলি!
(তোর) নামের দেখি নাই মা অন্ত,
(আমার) মন হয়ে যায় পরিশ্রান্ত!
(তুই) বসে আছিস গায়ে দিয়ে মা,
(তোমার) আপন নামের নামাবলী!!
(ওগো) পিতামাতা আদর করে,
(লোকের) নাম রাখে মা এ সংসারে,
(তোর) নেইকো পিতা, নেইকো মাতা,
(তাতেই) তুই এত মা নাম-কাঙ্গালী।
(ওগো) হয়নি মা তোর অন্নপ্রাশন,
(তোর) ছেলের হাতেই নামকরণ,
(তুই) নামের কাঙ্গাল, প্রেমের কাঙ্গাল,
কাঙ্গাল যে তুই চিরকালই!
(ওমা) কোটি কোটি তোর ছেলে,
(তারা) যে নামটী তোর যে জন পেলে,
(মা তোর) সে নামটীই সে রেখে দিলে,
(মা তুই) তাতেই সুখে গলে গেলি।
(ওমা) কেউ বলে তোর নাম "ত্রিগুণা"
কেউ বলে নাম "গুণহীনা"
(আবার) কেউ বলে "অনন্তগুণা।"
(ওমা) তোরে শোভা পায় সকলি।
(কেউ) "নিত্য, সত্য" ডাকে শুনি,
(ওমা) কেউবা ডাকে "প্রেমরূপিণী"
(আবার) কেউ ডাকে "জ্ঞান," কেউ "জ্ঞানদা"
(মা তোর) নামের কথা কি আর বলি!
(তোরে) যখন যেজন যেমন দেখে,
(সে) তখন তেমনি নামটী রাখে,
(নিজের) মনের মতন নামে ডাকে;
(ওমা) আর যত নাম যায় সে ভুলি।
(মা তোর) আগা গোড়া কেউ দেখে না,
(তাই) সকলে এক নাম রাখে না,
(ওমা) অন্ধের যেমন হাতী দেখা,
তুই তেমনি লোকে দেখা দিলি!!
(তোর) নাম নাই, তুই অনামিকা,
(তোর) গুণ নাই, তুই গুণাত্মিকা,
(আমার) মাতৃরূপে দেখা দেমা,
(আমি) ডাকি তোরে "মা, মা" বলি।
(তোরে) "মা, মা" বলেই ডাকি তবে,
(ওগো) নামে কি আর এসে যাবে?
(আমার) মন বুঝে নে মনের ভাবে,
(ওমা) নামতো কেবল মুখের বুলি।
(ওমা) মধুমাখা "মা" নাম তোমার
(সদা) কণ্ঠে লেগে থাকুক আমার,
আমি "মা" ডেকেই যে মোক্ষ পাব,
(তাই) ডাকি তোরে "মা, মা" বলি।

(ডাকি) "মা মা মা, মা মা, মা"
(একবার) প্রাণভরে "মা" ডাকতে দে মা,
(একবার) প্রাণে এসে বোস্ না গো মা,
(আমার) মা কিগো ঘুমিয়ে রলি?
(আমি) নাম জানিনা, ডাক জানিনা,
(তাই) ডাকি তোরে "মা মা মা"
(একবার) দয়া করে দেখা দেমা,
(ওমা) ছেলের কথা যাস্‌নে ভুলি।

প্রেমানন্দ।

ভারতেশ্বরীর স্মারক।

(লর্ড কর্জ্জন ও তদীয় ব্যক্তিত্ব)

ভারতরাজ্যে, ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার কীর্ত্তি-স্মৃতির "স্মারক"—সংস্থাপন, এ মুহূর্ত্তে, ভারতীয় ভূপতি নিচয় ও ভারতবাসী প্রজা সাধারণের মধ্যে, সর্ব্ব-প্রধান ও সবিশেষ আলোচিত এবং আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। মহারাজ্ঞীর মৃত্যুতে সাম্রাজ্য-ব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, "স্মারক"—প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থিত হইয়া, তদর্থে বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসন-কেন্দ্র ও রাজধানী কলিকাতায়, নানা উদ্যোগ, আয়োজন এবং অর্থ-সংগ্রহ হইতেছে। প্রধানতঃ দুইশ্রেণীর স্মারক সংস্থাপনের প্রসঙ্গ শুনা যাইতেছে।

১ম:—সমগ্র সাম্রাজ্যের সংযুক্ত, সাধারণ স্মারক। ২য়:—সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন-কেন্দ্রে বা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় প্রধান নগরে; এবং দেশীয় নৃপতি ও ভূপতিগণের স্ব স্ব রাজ্যে বা রাজ্যের রাজধানীতে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, প্রাদেশিক বা স্থানীয় "স্মারক"।

"সংযুক্ত স্মারক" স্বকীয় আখ্যাতেই স্বভাবতঃ সূচিত করিতেছে যে, উহা সম্মিলিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রদত্ত যৌথ অর্থেই, সমুত্থিত হইবার কল্পনা। পরন্তু, "স্থানীয় স্মারক" ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রজা ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজাদিগের স্ব স্ব দত্ত ও সংগৃহীত স্থানীয় অর্থে, সংস্থাপিত হইবার কথা। উভয় প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত।

"স্থানীয়" বা প্রাদেশিক "স্মারক" সংস্থাপনার্থে, প্রদেশীয় নিজস্ব অর্থই যখন অমিশ্রিত ও একমাত্র উপায়, তখন উহা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে, ভিন্ন, ভিন্ন প্রদেশীয় ভূপতি প্রজাপতি, প্রধান এবং প্রজাগণের, স্ব স্ব সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক যুক্ত আবশ্যকোপযোগী ও সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষানুরূপ আকারে এবং স্থানীয় লোক সাধারণের অভিরুচি ও অভিলাষানুসারে, গঠিত বা স্থাপিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি। কেননা, তাহাই স্বাভাবিক এবং ন্যায্য।

পরন্তু, দেশীয় নৃপতি, স্বরাজ্যে স্বকীয় স্বাধীনেচ্ছানুসারে বা প্রধানগণের প্রার্থনা ও পরামর্শানুসারে, খণ্ড স্মারক সংস্থাপন করিতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের বৃথা বাক্য ব্যয় করার কিছুমাত্র অধিকার দেখা যায় না।

বোম্বে বা বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ বা পঞ্জাব বা উঃ পঃ প্রদেশ,—যে কোনও শাসন-কেন্দ্র

হউন, স্ব স্ব স্থানীয় "স্মারক" সম্বন্ধে স্বাধীন ও পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, আপনাপন আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি অনুসারে স্মারকের আকৃতি প্রকৃতি নির্ব্বাচন এবং তদ্রূপে তাহা সংস্থাপন করিতে পারেন। অপিচ, "সংযুক্ত স্মারক" সম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যেকে আপনাপন প্রদত্ত অর্থ ও আপনাপন খণ্ড অধিকারের অনুপাতে, আত্ম মতামত ও যুক্তি পরামর্শ ব্যক্ত এবং উক্ত "সাধারণ স্মারক-সংস্থাপন সমিতির" কার্য্যকরী কমিটীর নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেও ন্যায়তঃ অধিকারী বটে।

কিন্তু এক প্রদেশের "খণ্ড স্মারকের" আকৃতি প্রকৃতির নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে, অপর প্রদেশের কোনও কথা কহা চলে না। উপযাচক হইয়া সে রূপ মতামত দিতে যাওয়া আদৌ অসঙ্গত অনধিকার চর্চ্চা। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ অযথা "অধিকার" অন্ততঃ এখনও কেহ পরিচালনা করেন নাই।

পক্ষান্তরে, সংযুক্ত সাধারণ স্মারকের আত্মা, অবয়ব ও সংস্থাপন স্থানাদি সম্বন্ধে, কোন এক প্রদেশের বা ততোধিক প্রদেশ বিশেষের,—সমাজ সম্প্রদায় বা স্বার্থ বিশেষের মতামতে কার্য্য হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে, কোনও দুইটী প্রদেশই এক মত হওয়া অসম্ভব। এমন কি, একই প্রদেশে, এসম্বন্ধে, প্রধানদিগের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিমতের সঞ্চালন ও সমর্থন হইতে দেখা যাইতেছে। এরূপ স্থলে, কোন দুইটী প্রদেশ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আশা নাই; আশা করাই বিড়ম্বনা।

স্বীকারই করা যাউক, দুই তিন চারি বা ততোধিক প্রদেশের লোক,—তাহার অর্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, কুইন ভিক্টোরিয়ার কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপনের স্থান সম্বন্ধে, তাহার আকার প্রকার ও অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে, তাহার সৌকার্য্য বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ রূপেই এক মতাবলম্বী হইলেন,—একই সিদ্ধান্তের সংগঠক ও সমর্থক হইলেন এবং তদনুসারে স্মারক স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, তাদৃশ প্রস্তাব আদৌ সম্ভব হইলে, (যদিও তাহা একান্ত অসম্ভব), সে প্রস্তাবানুসারেও প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কেন না, কয়েকটী প্রদেশ এক মতাবলম্বী হইলেও, বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের আরও বহু প্রদেশ অবশিষ্ট থাকে। বিশেষতঃ এই "সংযুক্ত সাধারণ-স্মারক"এর জন্য;—সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি "প্রতিষ্ঠা মন্দির" প্রকটের জন্য; যে সকল "চন্দ্র সূর্য্য বংশোদ্ভব" সামন্তগণ—ভারতীয় ভূপাল ও লোকপালগণ লক্ষ লক্ষ পরিমাণে ও নিযুত পরিমাণে অর্থ রাশি প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিদিন বদান্য চিত্তে ও মুক্ত হস্তে অর্থ রাশি প্রদান করিয়া, এক অপরের সহিত, প্রশংসার্হ প্রতিযোগিতা দ্বারা, রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদান করিতেছেন, এবং যাঁহারা—কেবল যাঁহারাই, এই সুমহৎ সংযুক্ত স্মারকের সর্ব্বমূলাধার মূল্য-দাতা অতএব প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, এবং কার্য্য-সম্পাদক-সমিতির সদস্য,—তাঁহারা—সেই ভারতীয় নৃপাল ও ভূপালবর্গ সকলেই অবশিষ্ট থাকিবেন। কেন না, তাঁহারা আত্ম রাজ্যে, আপনাপন অভিরুচি অনুসারে, স্বাধীন খণ্ডস্মারক সংস্থাপন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু, এ ক্ষেত্রে,—সাধারণ স্মারক সংগঠন কল্পে, তাঁহারা অজস্রঃ অর্থ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন; স্মারকের রূপ ও স্বরূপাদি সম্বন্ধে,

আদৌ কোনও বাক্য-ব্যয় করা, সম্ভবতঃ বিহিত বিবেচনা করিবেন না। "বিহিত বিবেচনা" না করার নানা কারণ। নানা কারণের প্রধান একটী কারণ এই যে, রাজাই হউন বা প্রজাই হউন, এ দেশীয়-দিগের, এ বিষয়ে, এক মত হইবার সম্ভাবনা নাই; কোন্ বিষয়েই বা আছে? পরন্তু, বিষয় বিবেচনা করিয়াই বাক্য-ব্যয় করা উচিত। উপস্থিত বিষয় অর্থ ব্যয় করারই ব্যাপার; বাক্য-ব্যয় করার নহে। রাজ-প্রীতি উৎপাদনই যখন, স্মারক স্থাপনের প্রথম ও প্রধান কারণ, এবং এই সংযুক্ত স্মারক যখন সাধারণের কার্য্য, তখন দেশীয় নৃপতিগণ কখনই এ বিষয়ে কোন কথা কহিবেন না। যাহাতে করিয়া রাজ-প্রীতি উৎপন্ন হয়, স্মারক সম্বন্ধে স্বভাবতই তাঁহারা কেবল তাহাই করিবেন। এবং তাহাই করা উচিত। তবে, স্মারকের অর্থের যদি অপলাপ হইত, অপব্যয় বা অপচয় হইবার শঙ্কা থাকিত, স্মারকের অর্থে স্মারক সংস্থাপন না হইয়া, সে অর্থ অন্য প্রকারে ধ্বংস বা অপর কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত বা হইবার সন্দেহ শঙ্কা থাকিত, তাহা হইলেও বরং তাঁহাবা তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতেন। ফলতঃ সেরূপ স্থলে রাজা প্রজা সকলেরই প্রতিবাদ করার অধিকার ও অবসর থাকিত। আমরা এখনি 'দেখিব, সে অবসর কতদূর আছে; আদৌ আছে কিনা।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, দেশীয় রাজগণ এই স্মারক ব্যাপারে কেবল "অর্থের শ্রাদ্ধ" করিতেছেন মাত্র। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা এই "অর্থের শ্রাদ্ধ" না করিলে, স্মারক-সমালোচক বোদ্ধাগণের বাক্যের শ্রাদ্ধ করার উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে হইত। এ অর্থের শ্রাদ্ধের আলোচনা আমরা এখনি পুনঃ করিব।

উপরের আলোচনা হইতে, ইহা অনুভব হইবে,—সাধারণ মতামতের সংঘর্ষে নিত্য হইা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, স্মারক সম্বন্ধে আমাদের স্বদেশীয় পক্ষের ঐক্যমত আদৌ অসম্ভব আকাশ-কুসুম। ভাল হউক, মন্দ হউক, সমগ্র ভারত মিলিত হইয়া, যদি কখনও কোনও একটা কাজ করিতে পারিত, তাহা হইলে আর চিন্তা ছিল কি? ভারত ত ভারত,—ভয়ানক লম্বা চওড়া কথা! ভারতের একটা অতি ক্ষুদ্র বিভাগ, ধরুণ এই বঙ্গ প্রদেশ মিলিত হইয়া,—তা বঙ্গও যাউক. উহাও খুব বড়;—বঙ্গভূমির একটা জেলা, একটা নগর, বা একটা পল্লী-রও সব লোক সম্মিলিত হইয়া,—এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, কোনও একটা কাজ করিতে পারিত, তাহা হইলেও ত এক দিন কাল মুখ থাকিত। তা সে আশা নাই। কিছুতেই নাই। এই "স্মারক" ব্যাপারেও নাই।

এমতাবস্থায়, ভারতেশ্বরীর এই "সংযুক্ত স্মারক" যখন রাজা প্রজা আমাদের সকলেরই সাধারণ কার্য্য এবং সমগ্র ভারতবর্ষের অকৃত্রিম রাজভক্তির পরিচায়ক ও শরীরী প্রতিমা বলিয়া অভিহিত, পরন্তু, এই "স্মারক" যখন ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তদীয় সুনাম ও স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বর্ত্তমান সম্রাটের ও সম্রাট্ বংশীয়দিগের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য উদ্দিষ্ট; সর্ব্বোপরি এই স্মারক যখন পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাজ্ঞীর এবং আদর্শ রমণীর অমর ঐতিহাসিক নামের উপযুক্ত এবং

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত হওয়া অতীব আবশ্যক;—যখন এই স্মারক একাধারে মহান, মনোহর—একাধারে গভীরতম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার এবং অক্ষয় উপকার্য্য ও সৌকার্য্যের আকর হওয়া আবশ্যক, একাধারে শিক্ষাপ্রদ, স্মরণীয়ের সুস্মৃতির উদ্দীপক এবং স্মরয়িতার সুনামের পরিব্যঞ্জক হওয়া সর্ব্বথা প্রয়োজন, যখন উহা কাল-বিজয়ী, পৃথিবীর প্রীতি-প্রশংসা-পরিতোষ-আকর্ষণ ক্ষম এবং ভারতীয় ভবিষ্য বংশাবলির সম্মান, সুশিক্ষা ও গৌরব স্থল হওয়া উচিত এবং যখন এই স্মারক একাধারে পণ্ডিত ও মুর্খ উভয়েরই উপভোগনীয় হওয়া প্রার্থনীয়; আর যখন একাধারে এতাধিক রূপ, স্বরূপ ও সত্বা, সৌন্দর্য্য ও সৌকার্য্য এবং সজীবতা থাকিলে বা ইহা অপেক্ষা আরও অধিক থাকিলে, তবে, এই স্মারক জগৎ পূজিতা মানবী-শক্তি কুইন ভিক্টোরিয়ার উপযুক্ত স্মারক হইতে পারে বা হইলেও হইতে পারে; আর যখন দেখিতেছি, আমরা ভারতবাসী জন সাধারণ বা তাহাদের মুখপাত্র ও সংবাদপত্রগণ, যখন দেখিতেছি, এ কার্য্য উদ্ধার করা, সর্ব্ব প্রকারেই আমাদের সাধ্যাতীত; যখন স্মারকের রূপ স্বরূপ পরিকল্পন ও উদ্ভাবন করিতেও আমরা যেমন অক্ষম, উহার রূপ ও স্বরূপের সংগঠন ও সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতেও তেমনি অসমর্থ; আমরা ইহার উভয় দিকেই যখন অজগর আনাড়ি; এতাবৎ কালের মধ্যে আমাদের কেহই যখন একটী মাত্রও উপযুক্ত ও শরীরী স্মারকের স্বপর্য্যায়স্থ, কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সক্ষম হন নাই; যখন আমরা প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত পদে পদেই কেবল অনভিজ্ঞতার ও বিষয়-বোধ-বিহীনতার, বিপর্য্যস্ত রুচির ও বিকৃত কল্পনারই পরিচয় দিয়া আসিতেছি; যখন এ সম্বন্ধে, আমাদের না আছে অর্থ সংগ্রহের শক্তি, না আছে আলোক দিবার শক্তি এবং না আছে সকলে ঐক্যমত হওয়ার উপায়, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই অসংখ্য অবস্থা, অতি প্রমাণিত ও প্রত্যক্ষ অবস্থা সকল বিবেচনাধীনে গ্রহণ ও যথা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া, আমরা বুদ্ধি ব্যবসায়ী ও বাক্যজীবী বিজ্ঞগণ, আমাদের কি করা কর্ত্তব্য হয়?

আমাদের অতি পরিষ্কার কর্ত্তব্য এই যে, আমরা মহা মহা যোদ্ধাগণ, আমাদের বেগবতী বুদ্ধি-মন্দাকিনীর মূল উৎসে, আপাততঃ একটী বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া এবং দিন কয়েকের জন্যে, আমাদের রসনা-কণ্ডূয়ন ও লেখনীর বিক্রম কিঞ্চিন্মাত্র প্রশমিত করিয়া, এই স্মারক-পরিকল্পন ও সংস্থাপনের কার্য্য এমন কোন যোগ্য হস্তে—যোগ্যাদপি যোগ্য হস্তে অসন্দিগ্ধ ভাবে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই, কেবল যে এক মাত্র হস্তই এই ভারত সাম্রাজ্যে, আজ এই অসাধারণ সাধারণ কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে ও অপেক্ষাকৃত সর্ব্বাবয়ব-সমন্বিত ভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ।

ফলিতার্থে অবশ্য ঘটিয়াছে তাই। যে একমাত্র হস্ত এখানে, এ মুহূর্ত্তে, এই অসামান্য কার্য্যের সংসাধনে সক্ষম, সেই সিদ্ধ হস্তই, সৌভাগ্য ক্রমে, এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় রাজা প্রজা উভয় পক্ষেরই প্রতিনিধি হইয়া, স্বয়ং এদেশীয় প্রজা-স্বরূপ তিনি এ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আব-

শুক হইতেছে কেবল নিশ্চিন্ত হওয়া এবং যাহার যেমন সাধ্য তাঁহার সমর্থন ও সহায়তা করা, আর সুবুদ্ধি ও সুমিষ্ট বাক্য ও ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া, এই উদ্যোগে ও উপলক্ষে আরও কিছু অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া লওয়া।

দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা নানা অকারণ-মূলক অসার কারণে নিশ্চিন্তই হইতে পারিতেছি না। প্রদেশীয় খণ্ড স্মারক লইয়া যে সকল বিরোধী আলোচনা উত্থিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, তাহার বেগশীলতা ও বিস্তার নিত্য অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে। বোম্বেতে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে, মহাত্মা টাটা মহাশয়ের কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে প্রদত্ত ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানীয় স্মারকের "হেরফেরে" পড়িয়া নাকি প্রায় মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা বড়ই ভয়ঙ্কর সংবাদ! প্রদেশীয় খণ্ড "স্মারক" আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। এখানে আমাদের আলোচ্য সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ভারতীয় প্রজাপক্ষের

সংযুক্ত সাধারণ স্মারক।

এই স্মারক বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের কোন্ স্থানে সংস্থাপিত হওয়া উচিত—কোন্ স্থানে সংস্থাপিত হইবে এবং কি আকৃতি ও কি প্রকৃতি ধারণ করিবে এবং করা আবশ্যক, এই কথা প্রসঙ্গে, বিগত তিন চারি সপ্তাহ কাল ধরিয়া, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, প্রবল এক আন্দোলন স্রোত ছুটিয়াছে।

ইহা দেখিতেছি, ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া। সাধারণের অসাধারণ শোক-সন্তাপের বিপুল বিষণ্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ স্মৃতি-চিহ্ন-সংস্থাপনের সুবিশাল কলহ-চপলতা! মনুষ্য প্রকৃতির অবস্থাই এই!

উপস্থিত বিষয়ে যেরূপ বেগে বাক্-বিতণ্ডা চলিয়াছে, সংবাদ পত্রের পাঠক, প্রতিদিনই প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। স্মৃতি-চিহ্ন সম্বন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় মতামত সংঘর্ষের খরস্রোত, স্ব স্ব অভিলাষ, আসক্তি অভাব-অভিযোগ, আকাঙ্ক্ষা আবদার, আত্মগরিমাদির যুক্তি তর্কের তরঙ্গ তুলিয়া, প্রহরে প্রহরে আসিয়া, রাজধানীর অগণিত মতামত মুখরিত, শতবিধ সাদ বিসাদ-বিধুনিত সমালোচনা সাগরে মিশিতেছে। লিপি-বিতণ্ডা ও বাক্য যুদ্ধ, প্রতিদিনই প্রবল হইতে প্রবলতর ও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সৌভাগ্য যে, এই শত হানা মোহানা-সঙ্কুল সমালোচনার উত্তাল তরঙ্গে, বিচার-বিতর্ক-বিদ্রূপের এই বিপুল তুফানে, স্মারক-সংস্থাপন পোতের প্রধান কর্ণধার কাণ্ডারী প্রকৃত কার্য্যোপদেষ্টা কার্য্যকরী কর্ম্মী স্বয়ং রাজ প্রতিনিধি

লর্ড কর্জ্জন।

আরও এবং অধিকতর সৌভাগ্য যে, এই রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন, কেবল অসীম রাজশক্তি-সমন্বিত রাজপ্রতিনিধি মাত্র নহেন, ইনি প্রকারান্তরে 'প্রজা প্রতিনিধিও বটে। এই লর্ড কর্জ্জন শত পদ্মানুগত সাধারণ ছাঁচের ভারতীয় ভাইস্রয় নন; প্রত্যুত ইনি প্রভূত স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী, অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় প্রদীপ্ত, প্রকৃত, প্রজা-পালক এবং প্রজা-রঞ্জক। ইনি প্রজার সহিত অপরিমেয় সমবেদনায় সংযুক্ত, মানসিক সরলতায় অতীব সমর্থ, অটল অজেয় *

* লর্ড কর্জ্জন আর এ আখ্যার উপযুক্ত কিনা, সে দিনের কুলি আইনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে।

অথচ অতুল সহিষ্ণুতার বিনয় নম্রতার ও বিচক্ষণতার আধার। ইনি ঘটনাক্রমে আজ আমাদের রাজপ্রতিনিধি; কিন্তু, স্বভাবতঃ লোক-প্রতিনিধি ও লোক-পরিচালক করিয়াই বিধাতা ইহাঁকে সৃজন করিয়াছেন।

লোকের উক্তি,—সে উক্তি ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্রের হউক, অগণ্যেরও নগণ্য হউক, কঠোরাদপি কঠোর হউক, বিদ্বেষের বিষে বিষাক্ত হউক বা বিদ্রূপ-কালিমায় কলুষিত হউক,—লোকের উক্তি শুনিতে, লোকের যুক্তি শুনিতে, লোকের অভিযোগ আপত্তি ও আবদার শুনিতে, প্রজা লোকের প্রার্থনা, প্রসঙ্গ ও পরামর্শ শুনিতে এবং তাহা শুনিয়া, তাহা পরিপাক ও পরিচালনা করিতে,তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে, অসম্ভব না হইলে, তাহার প্রতিকার করিতে এবং আবশ্যক স্থলে, প্রিয় বাক্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে ও সুপরামর্শ দিতে, লর্ড কর্জ্জনের মত অত অত্যুচ্চ আসনে অবস্থিত বা নিম্নতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ব্যক্তি আপাততঃ এ রাজ্যে নাই। ইহাঁর পূর্ব্বে, এমন তরটী আর কখনও এখানে আসিয়াছিলেন, এমনও কেহ বলিতে পারে না। লোক চালাইতে,লোক ভুলাইতে, লোক মাতাইতেও লর্ড কর্জ্জন, এ দেশে অদ্বিতীয়। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, তিনি লোক-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, লোক-প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্জ্জন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সদস্য ও সমর্থক। রক্ষণশীল রাজনৈতিক রক্তে মাংসে তাঁহার আপাদ মস্তক গঠিত। রাজ-তান্ত্রিক শিক্ষা সংস্কারে ও প্রকৃতি প্রবণতায় তিনি পরিপূর্ণ। রাজকীয় প্রভু শক্তির সার্ব্বভৌমিকত্ব ও নিরঙ্কুশ সর্ব্বময়ত্ব তাঁহার রাজনৈতিক শিক্ষা দীক্ষার মূল সূত্র, রাজনৈতিক জীবনের মূল মন্ত্র, এবং রাজনৈতিক পরীক্ষার ও সে পরীক্ষায় কীর্ত্তি ও উন্নতি লাভের অতি মূল্যবান ও অমোঘ অভিজ্ঞান।

অথচ এই লর্ড কর্জ্জনকে, রাজকীয় সর্ব্বময়ত্বময়, রাজোপম ও রক্ষণশীল লর্ড কর্জ্জনকে, জনসাধারণেরই একজন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া,তাঁহার উক্তির উচ্ছ্বাস,আন্তরিকতা ও অমায়িকতা অনুভব করিয়া তাঁহাকে মনে হয়, তিনি পদদলিত ভারতীয় প্রজার কেবল প্রতিপালক পিতা বা পরিত্রাতা মাত্র নহেন;—প্রত্যুত, তিনি ভারতীয় প্রজার প্রতিনিধি,পরিচালক ও পরামর্শদাতা ভারতীয় প্রজার সুখের দুঃখের সাথী, তাহাদের সম্মান গৌরব আকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বোপরি এই লর্ড কর্জ্জন, স্বকার্য্যে, ভারতীয় প্রজার, ভারতবাসী জন সাধারণের সমর্থন সংরক্ষণ-প্রার্থী, প্রশংসা ও উৎসাহ-কামী।

এ এক অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব ভাব। দুর্ভাগ্য ভারতবাসী, এ ভাব আর কখনও অনুভব করে নাই। তাহারা সামান্য, নগণ্য, তৃণাপেক্ষাও লঘু, বালুকণা অপেক্ষাও তুচ্ছ; তারা চৌকিদারের চড় চাপড় খায়, বড়

চা-করের কুহকে একাদশ মুহূর্ত্তে আত্ম প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আততায়ী শিবিরে প্রবেশ নিশ্চয়ই অটলভাব ও অজেয়তার লক্ষণ নয়। লর্ড কর্জ্জন মুহূর্ত্তেকের দুর্ব্বলতায় তাঁহার লোক প্রিয়তার অর্দ্ধ পরিমাণ বিনষ্ট করিয়া বসিয়াছেন। কর্জ্জন-কটনের মিলনে লোকে মণিকাঞ্চনের সম্মিলন মনে করিয়াছিল। নিষ্ঠুর চা-কর মণি অপহরণ করিয়াছে। কুলির মুখের অন্ন মুষ্টির মত তাহারা কর্জ্জন-চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল আলোক ছটাকেও আহত করিয়াছে।

সাহেবের চোপদারের চৌকির চৌদ্দ হাত তফাত হইতে করযোড়ে কুর্ণিশ করে। তাহারা তাহাই করিতে জন্মিয়াছে, যুগে-যুগে তাহাই করিয়া আসিতেছে, অনন্তকাল তাহাই করিবে! হায়! তাহারা আবার মানুষ! তাহাদের আবার সম্ভ্রম সম্মান, তাহাদের আবার স্বাধীন মতামত! ইহা কি কখনও সম্ভব! পুনশ্চ, তাহাদের কর্ত্তৃক উচ্চাদপি উচ্চের "সমর্থন সংরক্ষণ"—উচ্চাদপি উচ্চ তাহাদের "সমর্থন সংরক্ষণ" কামী,—রাজোপম রাজপ্রতিনিধি তাহাদের অভিমত ও উৎসাহ পাইতে অভিলাষী, তাহাদের প্রীতি ও প্রশংসার প্রার্থী! হায়! "তাহাদের" যাহাদের সত্ত্বা নাই, স্বরূপ নাই, সজীবতা নাই, মনুষ্যত্ব নাই;—যাহাদের মনুষ্য নাম অবধি লুপ্ত হইয়াছে,—"তাহাদের"!

ইহা কি স্বপ্ন! না স্বপ্নাপেক্ষাও অধিক অলীক, অসম্ভব, অসম্ভাব্য!

তা, ইহা যাহাই হউক, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক বা সত্যবৎ প্রতিভাত মহা অসত্য হউক, সর্পবৎ বিলম্বিত রজ্জু মাত্র হউক—ইহা যাহাই হউক, এই অভূতপূর্ব্ব অভিনব ভাব লর্ড কর্জ্জন ভারত-সন্তানকে, মুহূর্ত্তেকের জন্যও, তাহার মনের অন্তস্তলে, অনুভব করাইয়াছেন। চির অসম্মানিত ভারতসন্তান বড়ই সম্মান বোধ করিয়াছে।

লর্ড কর্জ্জন যুবা পুরুষ। যুবত্বে, প্রবীণের প্রবীণত্ব লাভ করিয়াছেন, কুটিলতা প্রাপ্ত হন নাই। প্রবীণবৎ পরিপক্ক বুদ্ধি ও ধীর প্রকৃতি হইয়াও যুবত্বের সরলতা ও মিষ্টতা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছেন; অথচ যুবা জনোচিত চাপল্যের বশীভূত হন নাই। পার্থিব সুখে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, মনুষ্য জীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, লর্ড কর্জ্জন, যৌবনের প্রথম সোপানেই, সে সমস্তই, পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথচ মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়েন নাই।

অত্যুচ্চ য়্যুনিভারসিটীর উচ্চতম উপাধি, —নানা দিক্ প্রসারিণী বিদ্যাবত্তা; অসাধারণ বাগ্মিতা, অত্যুজ্জ্বল লিপি নৈপুণ্য, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত নাম; রাজনীতিক ক্ষেত্রে ততোধিক সম্মান; এ সমস্তই যুবক কর্জ্জনের নিজের।

রাজোপম পদ; যে পদের আসন ভারত সাম্রাজ্যের রাজ-সিংহাসন! যুবক লর্ড কর্জ্জন আজ রাজ-প্রতিনিধি; আগামী কল্য সম্ভবতঃ সর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী হইবেন!

বৃটিশ পার্লামেণ্টে অবিসংবাদিত খ্যাতি প্রতিপত্তি, রাজ-দ্বারে অবিচলিত সম্ভ্রম, অভ্যুচ্চ রাজ প্রসাদ; প্রভূত ঐশ্বর্য্য, পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা; গুণবতী রূপবতী পত্নী, শান্তিময় পরিবার, সুন্দর দেহে সদা পুলকিত স্বাস্থ্য, সুমার্জ্জিত মানস ক্ষেত্রে সদা প্রদীপ্ত প্রতিভা;—মনুষ্য জীবনে যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সবই লর্ড কর্জ্জনের নিজের, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুবর্ণ হাসির সব সুষমা-খানিই লর্ড কর্জ্জনের অঙ্গে অঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। আর এই লর্ড কর্জ্জন যুবা পুরুষ; যুবা কর্জ্জন আত্মাভিমানে স্ফীত হন নাই। আত্মাভিমানে স্ফীত হন নাই; অথচ এই কর্জ্জন অ্যারিস-টোক্র্যাটিক স্কুলের ইম্পিরিয়াল ক্লাসের ছাত্র। জাত্যাংশে খাঁটি "জন বুল।" ইহার কারণ এক দিকে লর্ড কর্জ্জনের অন্তর্নিহিত প্রতিভা জনিত আত্ম সংযম। অপর দিকে ইংলণ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর শিক্ষার শাসন; পরন্তু প্রজাতৈন্তিক বৃটিশ পার্লামেণ্টের ডেমক্রেটিক আব-

হওয়ার পরাক্রম। এই তিন শক্তিতেই আমাদের বড় লাট সাহেবকে "হামবড়া" হইতে দেয় নাই। বাল্যজীবনে, বিদ্যালয়ে বোধ হয় একটু বেগড়াইবার পথে উঠিয়াছিলেন, তাই ছড়া উঠিয়াছিল,—সহাধ্যায়ী ছাত্র বৃন্দে ছড়া গাঁথিয়া গাইয়াছিল:—

জর্জ্জ ন্যাথানাল কার্জ্জন।
আমি এক সুপিরিয়র পারষন॥

এ শাসন বড়ই স্বাস্থ্যকর। সুবোধ কর্জ্জন শোধরাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর, "বৃটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্স।" সেখানে বড় হইতে হইলে, ছোটোর কাছেও ছোট হইতে হয়; মুদী বা মালীর কাছে ও মাথা নোয়াইতে হয়। কৃষক কারিকর তেলী মালী জুগী জোলা সকলেরই হাতে ধরিয়া "সেকহ্যাণ্ড" করিতে হয়। সাম্য স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, লর্ডগিরি, রাজা বাহাদুরি করা কাহারই চলে না।

লর্ড কর্জ্জন কমান্সের ফেরত। পাতসাহী সা এন্‌ সাহী তক্ত তাউসে বসিয়াও বৃটিশ "কনষ্টিটিয়েণ্ট"দের কথা মনে আছে; মক্কেলের মর্য্যাদা জানা আছে, প্রজাপ্রতিনিধিত্বের প্রতাপ ও পবিত্রতার সহিত পরিচয় আছে। রাজ-সিংহাসনের নবীন মোহে, রাজ শক্তির অসীম বিক্রমে, রাজৈশ্বর্য্যের অভিনব ও অতি প্রজ্জ্বলিত প্রভাবেও, লর্ড কর্জ্জন প্রজা-প্রতিনিধিত্বের সেই "পুরাতন প্রণয়" ভুলিতে পারেন নাই; কখন পারিবেনও না। কর্জ্জনের উচ্চাদপি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রাজা হইয়া, রাজ-তক্তে বসিয়া, রাজ প্রতিনিধিত্বের প্রভূত প্রতাপ পরিচালনা করিয়াও, পূর্ণ হয় না, পরিতৃপ্ত হয় না। সে অপরিসীম ও অতলস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার আরও অনেক খানি যেন খালি থাকে। প্রজা প্রতিনিধিত্বের পুষ্টিকর অন্ন পান দ্বারা আকাঙ্ক্ষার সেই অতৃপ্ত অংশ বোধ হয়, তিনি পূর্ণ করিতে চাহেন।

তাই, সময়ে সময়ে, বিস্মৃতি ক্রমে বা অনুরাগ-বিভ্রমে এই রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বলেন;—

"সমগ্র ভারতভূমি আমার "কনষ্টিটিয়েন্সী" আর সমস্ত "ভারত-সন্তান আমার "কনষ্টিটিয়েন্স।" বৃটিশ রাজ দ্বারে "ও বৃটিশ পার্লামেণ্ট গৃহে, আমি ভারতীয় প্রজা পুঞ্জের "প্রতিনিধি।"

বলিবার অবসর পাইলেই, লর্ড কর্জ্জন, এই অর্থ বোধক বাক্য উক্ত ও পুনরুক্ত করেন। এই স্মারক সংস্থাপন প্রসঙ্গেও লাট সাহেবের এবম্বিধ উক্তি আমাদের সম্মুখে দেখিতেছি।

জঠর জনবুল, এ উক্তিতে জ্বালাতন হন। সরকারি সমাজের ও সেরেস্তার বৃদ্ধ বকগণ, এ উক্তিতে বিরক্ত হন, বিদ্রূপ করেন, কুপিত হন, কটু কহেন। সময়মত কতক শৈত্যে, কতক শ্লেষে, সুদে আসলে তাহা ফিরে পেয়ে তবে নির্বাক হন। অপর দিক দিয়া অনর্থক আবার আঘাত আরম্ভ করেন। ফলতঃ কবি-বাগ্মী কর্জ্জনের সহিত বাক্যে ও বিতর্কে বিজয়ী হইয়া যাইতে পারেন, এমন "জান্টুমান" আপাততঃ ইণ্ডিয়ায় ও এসিয়ায় নাই;—এ মুলুকেই নাই। তাঁহার বাক্য বড়ই জীবন্ত, বিতর্ক বড়ই অমোঘ দুরন্ত, অবস্থার বিবৃতি ও বিবৃতির উদ্দীপনা সর্ব্বথা চিত্তস্পর্শী, তাঁর সদা সংযত ও কচিৎ অভিব্যক্ত আবৃত শরীরী শ্লেষ-কণিকা-গুলি আততায়ীকে আহত ও অধীর করিতে শক্তিশেল সম। তথাচ পদের অপরিসীম গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব বশতঃ বাগ্মীবর স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস

ও স্বতঃ উত্থিত উদ্দীপনাকে অনবরত অঙ্কুশ স্পর্শে সংযত রাখিয়াই, অতীব সাবধানতা ও সতর্কতা সহকারে প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই প্রয়োগ করিতে কার্য্যতঃই বাধ্য হইয়া থাকেন। নহিলে, তদীয় সহৃদয়তা ও কবিতা-প্রবণ বাগ্মিতার উন্মুক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং তাহার উত্তাপ এবং শৈত্যের আলোক ও ছায়া সম্যক রূপেই অবলোকন ও উপভোগ করিবার অবসর থাকিত।

লর্ড কর্জ্জনের উপরি উক্ত উক্তি তদীয় সৌহৃদ্যের সাময়িক উচ্ছ্বাস মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। বৃটিশ পলিশি-পর্য্যবেক্ষণশীল পোলিটিকাল ফিলজফার উহাতে প্রগাঢ় চিন্তার বা প্রকৃত আলোচনার কিছুই না পাইতে পারেন। তথাচ জনসাধারণ প্রজাপুঞ্জের পক্ষে, উহা যে উৎসাহ, অনুরাগ ও প্রীতি-বর্দ্ধক তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় উদীয়মান ও অত্যুজ্জ্বল, বৃটিশ-ইম্পিরিয়াল-ইজমের মন্ত্রণা-সচীব ও বৃটিশ পার্লামেন্টের অনতিদূরবর্ত্তী অধিনায়ক ভারতীয় প্রজা সম্বন্ধে এতাদৃশ-ভাব স্থায়ী ভাবে পোষণ করিতে থাকিলে বৃটিশ প্রজা সত্বাধিকারী বা উপনিবেশিকের স্বায়ত্ত শাসন ভারত সাম্রাজ্য কখন প্রাপ্ত হউক বা না হউক, কিছু না কিছু ভাবী কল্যাণের আশা অবশ্যই করিতে পারে। তা লর্ড কর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাটী যেমন বিরাট হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, কনষ্টিটিয়েন্সীটীও তেমনি বিপুল, ইহা তাঁহারই প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বটে। কিন্তু ভারতবর্ষ কি কখনও কাহারও প্রতিনিধিত্বক্ষেত্র হইতে পারে, কখনও কাহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া বৃটিশ পার্লামেন্টে পাঠাইতে পারে! তাহার সে অধিকার, সে অহঙ্কার কোথায়, সে সারবত্তা কোথায়? ভারতবর্ষ যে ইংরাজ রাজের, ইংরেজ সাধারণের, ইংরেজ সওদাগরের একটা অস্থাবর সম্পত্তি, একখানা আসবাবের মধ্যে পণ্য, কর্জ্জন কি কখনও তাহার অন্যথা করিতে পারেন? কেই বা পারে! তা, সে যাই হউক, লর্ড কর্জ্জন এই। সৌভাগ্য যে, এই লোকের হস্তে সম্প্রতি ভারত সম্মানের ভার বিন্যস্ত। এই প্রকৃতির লোক, এই রূপ প্রশস্ত প্রাণের লোক ভারতের চিরস্থায়ী, চিরন্তন শাসয়িতা হওয়া, ভারতবাসী, নানা কারণেই আকাঙ্ক্ষা করে।

ভারতে ভারতেশ্বরীর স্মারক-সংস্থাপন-তরীর কর্ণধার এই লর্ড কর্জ্জন, ইহাও সৌভাগ্য। নহিলে সমালোচনার শত-বিরোধী বাতাসে বোধ করি, এ তরী বানচাল হইত। কর্ণধার নিজেই কহিতেছেন ;—

> I have devoted much anxious thought to a consideration of the numerous suggestions that have been made. I have read many scores, if not hundreds of these and have been struck by the fact, that meritorious as many of them are, no two are identical. In other words, there is no sort of national unanimity on the subject.

লর্ড কর্জ্জন কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিবার লোক নহেন। বিশেষতঃ এই স্মারক সংস্থাপন যখন সর্ব্ব সাধারণের কার্য্য, তখন তিনি সকলেরই কথায় কর্ণপাত করিয়া সে সকল কথার মীমাংসা করিতে বাধ্য। তিনি করিতেছেনও তাই। স্মারক-সমালোচক পক্ষ হইতে, স্মারকের প্রকৃতি সম্বন্ধে, এপর্য্যন্ত যত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, প্রতিনিধি তাহার প্রত্যেকটীই আগ্রহাতিশয় সহকারে, চিন্তা ও আলোচনা

করিয়া দেখিয়াছেন। এরূপ বহু "কুড়ি" প্রস্তাব—যদি বহুশত প্রস্তাবই না হয়,—তিনি পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেক প্রস্তাবকে গুণ বিশিষ্ট বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন। তবে দুঃখ এই যে এত "কুড়ি কুড়ি" প্রস্তাবের কোন দুইটী প্রস্তাবই, এক অপরের সদৃশ নহে,—সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ফলতঃ এ সম্বন্ধে জাতীয় ঐক্যমত একেবারেই নাই।

আমরা দেখিতেছি, লর্ড কর্জ্জনের এ কথার কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার কোন কথারই সত্যতা ও সারত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। অলঙ্ঘনীয় যুক্তির স্বাভাবিক শক্তিতে, অগত্যা বাধ্য হইয়া, সকলকেই অবনত মস্তকে তাঁহার কথা স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহা করিতে যাঁহাদের সরলতায় ও সৎসাহসে কুলাইতেছে না, তাঁহারা সে কথা আদৌ আবৃত রাখিয়া আত্মগীতি গাইয়া যাইতেছেন। দায়িত্ব-বিহীন সমালোচনা-বৃত্তির এমনি বদান্যতা!

সংযুক্ত জাতীয় স্মারকের সংগঠন ও স্বরূপ সম্বন্ধে, আমাদের যখন জাতীয় অভিমতের আদৌ একতা নাই; আমাদের বহু সংখ্যক প্রস্তাব যখন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ও বিরোধী এবং সে সকল যখন ভারতেশ্বরীর স্মারকের উপযোগিতার অনুকূল নহে, অন্ততঃ অনুকূল বলিয়া আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছি না এবং যখন আমরা রাজ প্রতিনিধির প্রস্তাবিত স্মারকের উপযোগিতা অপ্রমাণিত ও অস্বীকার করিতে পারিতেছি না এবং তদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তদনুরূপ একটী প্রস্তাবও সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া উপস্থিত করিতে পারিতেছি না; তখন আমরা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কেন যে তাহার সমর্থন ও সহায়তা করিব না, আমি ত বুঝিতেই পারি না।

সংযুক্ত জাতীয় স্মারকের কল্পনাই প্রথমত কাহারও ছিল না। ইহার উদ্ভাবক, প্রস্তাবক, প্রতিপাদক ও প্রচারক, পরিচালক ও অধিনায়ক লর্ড কর্জ্জন নিজে। এই স্মারক ব্যাপারের সাথে তিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। এ অনুষ্ঠানের শরীর এবং আত্মা তিনি নিজে এবং অনুষ্ঠিতব্য স্মারকের শরীর এবং আত্মা তাঁহারই প্রতিভা কর্তৃক পরিকল্পিত। ইহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহারই কর্তৃক হইবে। এবং কার্য্যে পরিণত হইলে উহা কেবল ভারতেশ্বরীর স্মারক নয়, সমগ্র ভারতের জাতীয় একতার, এই ৩২ কোটী ভারত সন্তানের সমবেত কার্য্যের এক অভূতপূর্ব্ব অক্ষয় নিদর্শন—এক অত্যুদার সুমহান সাক্ষী সমুত্থিত হইয়া, যুগে যুগে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। লর্ড কর্জ্জনের ইহাই ইচ্ছা, ইহাই অভিপ্রায়। ইহা অপেক্ষা মহদভিপ্রায় কি হইতে পারে, আমি জানিনা। বিবিধ এবং যে কোন প্রকারের একতা সূত্রে, এক জাতি বা Nation হইতে প্রথমত এইরূপ একটী শরীরী সাক্ষী সংস্থাপন করিয়া, বংশের পর বংশানুপরম্পরায়, তাহারা তাহার স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করাইয়া ক্রমে ক্রমেই এক জাতিত্বে উত্থিত হইতে পারে। এই আদর্শ, এই ভাব, ভারতের ভাবী জাতীয় একতার এই মহা বীজ, প্রতিনিধি প্রস্তাবিত স্মারকের অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমাদের স্বদেশহিতৈষীগণ কেন দেখিতে পাইতেছেন না, ভাবিয়া একান্ত বিস্মিত হইতেছি। লর্ড কর্জ্জন আমাদের এই

এক জাতীয়তা বন্ধন ও তাহার সুচির-স্থায়ী নিদর্শন ও সাক্ষী সংস্থাপন কার্য্যের কেন্দ্রস্থল। তাঁহাকে লইয়া অনেক কথা হইয়াছে, আরও অনেক কথা হইবে; তজ্জন্যই আমি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবেই তাঁহার চরিত্রের কোন কোনও অংশ, বিশেষ করিয়া, দেখাইতে বাধ্য হইয়াছি।

বক্ষমান কার্য্য অগ্রসর করিতে লর্ড কর্জ্জন, এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ কার্য্য করিয়াছেন ও যত প্রমাণ কার্য্য করিতেছেন, তাহার অল্লাংশই সাধারণ্যে প্রকাশিত। সাধারণের সম্মুখে যাহা উপস্থিত তাহা তিনটী সূত্রে গ্রথিত;—

১ম, সংযুক্ত স্মারক যে প্রকারের ও যে প্রকৃতির হইলে ভারতেশ্বরীর স্মৃতির উপযোগী হয়, তাহার অর্থাৎ লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবিত ভিক্টোরিয়া হলের আভাস বিবৃত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসের মন্তব্য লিপি।

২য়, সংযুক্ত স্মারক ভিক্টোরিয়া হল ভারতের যে স্থলে হওয়া এবং যেরূপের ও যে যে স্বরূপের হওয়া সঙ্গত ও শোভনীয়, তাহা বিবৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি নিচয়ের সদুত্তর দিয়া এবং তজ্জন্য সর্ব্ব সাধারণ ভারতবাসী ও ভারত প্রবাসী জনগণের সহায়তা আহ্বান করিয়া লর্ড কর্জ্জনের টাউনহল-বক্তৃতা। ইহা ১ম বক্তৃতা—

৩য়;—সংযুক্ত স্মারকের আবশ্যকতা ও এক জাতীয়তা প্রতিপাদন করিয়া স্মারক সম্বন্ধে, অপরাপর প্রস্তাবের মীমাংসা করিয়া, ও তাহাদের অনুপযোগিতা দেখাইয়া, এবং সর্ব্বোপরি ভিক্টোরিয়া হল, যে সকল ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক সামগ্রী, ধারণ করিয়া ঐতিহাসিক চিত্র-শালায় পরিণত হইবে ও ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার সবিস্তার আভাস দিয়া ও সে বিষয়ে, সাধারণ অভিমত ও প্রস্তাবাদি আহ্বান করিয়া, পরন্তু স্মারক সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর প্রস্তাবে ও সারবান সাধারণ অভিমতে সবিশেষ মনোযোগ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও নিজের বিনয় নম্রতা ও সেবাভিপ্রায় জানাইয়া, ডলহৌসী ইনিষ্টিটিউটে, লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা। ইহা ২য় বক্তৃতা—

উপরিউক্ত তিনটী বিবৃতিতে, লর্ড কর্জ্জন, একদিক নিজের বক্তব্য কথা যেমন বলিয়াছেন, অপর দিকে তাঁহার সমালোচকগণের সমস্ত সার কথারই সুবিশদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। উহাতে স্মারকের ও সাধারণ মতের কোন কথাই আলোচিত হইতে অবশিষ্ট নাই। সব কথাই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে ও সহৃদয়তার সহিত সমালোচিত হইয়া সাধারণের সম্মুখে ধৃত হইয়াছে।

লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা দুইটী, তথ্য জ্ঞাপনে, দৃশ্য অঙ্কনে, এবং চিত্তবৃত্তি উদ্দীপনে অতি উচ্চ স্থানীয়। উহাদের উদ্দেশ্যগত মূল্য ভিন্ন সাহিত্য ও শিল্পগত মূল্যও বিস্তর। এরূপ বক্তৃতা এদেশে অপূর্ব্ব ও অভিনব বলা যাইতে পারে। বক্তৃতা, কর্ণে শুনি নাই; লিপিতেই দেখিতেছি। স্থানে স্থানে বক্তার লোকময়তা ও ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি লোক সভায়, লোক সাধারণ সমীপে, এই দুই বক্তৃতা দান কালে নিজের অলোকসামান্য পদগৌরব যেন বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জ্জনের অবশ্যই ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতে পারে যে, এই সুবৃহৎ কার্য্য সুসম্পাদনার্থে, এ সম্বন্ধে তাঁহার সদুদ্দেশ্যমূলক উক্তি নিচয়, তাঁহার প্রস্তাব এবং

প্রকৃত মনোভাব, এক কথায় তাঁহার উচ্চারিত ও লিখিত বাক্যাবলী অবিকলাঙ্গ ভাবে জনসাধারণের মধ্যে, সুপ্রচারিত ও সুব্যাখ্যাত হয় এবং লোকে তাহার সদর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই বিচার করে। সত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে, পরন্তু, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার এবং সাধারণ লেখক এবং সংবাদ পত্রাদির পরিচালক ও সাময়িক সাহিত্যের সম্পাদকগণের কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তাহা হওয়াও উচিত ছিল। বড় দুঃখের বিষয় এবং লজ্জার কথাও বটে যে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাহার বিপরীতই হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। ইংরেজি কোন কোন সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্ট-হৌসের অনুধ্যান-লিপি ও লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতাদ্বয়ের কোথাও পূর্ব্ব কোথাওবা আংশিক রিপোর্ট মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু, তাহার আমূল সম্পাদকীয় আলোচনা বা অন্ততঃ তাহাদের প্রধান প্রধান অঙ্গের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। অপর দিকে আমাদের অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকগণের প্রায় কেহই এ কার্য্যে, আবশ্যক ও কর্ত্তব্যানুরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই কোন কোন ইংরেজি সংবাদ-পত্রের সুরের অন্ধ অনুবর্ত্তী হইয়া, লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবিত স্মারক—ভিক্টোরিয়া হল ও ঐতিহাসিক চিত্রশালার এবং তৎপ্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাবকের কার্য্যের ও কথার বিপক্ষে, অতি কঠোর ও কটু কথায়, সমালোচনা ক্রমাগতই করিতেছেন; কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের আসল কথা গুলি কি, তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, "ভিক্টোরিয়া হল" ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার ও চিত্রশালা বস্তুতঃ ব্যাপারটা কি, লর্ড রাজপ্রতিনিধি তাহাদের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের একটা আমূল অনুবাদ বা মোটামুটি ব্যাখ্যা স্ব স্ব পত্রে প্রকাশিত করিয়া, পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ও সঙ্গত মনে করিতেছেন না। ইহা সমালোচক সম্প্রদায়ের স্বকর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচায়ক বলা যাইতে পারে না। পরন্তু, এরূপ আচরণ ও আবরণ সমীচীন সমালোচনার স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধও বটে। অপিচ, এ সকল বিষয়, কেবল সাময়িক আবশ্যকতায় সীমাবদ্ধ নহে, শিল্প সাহিত্যাদির হিসাবেও ইহারা সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং ইহাদের সুপ্রশস্থ ও স্থায়ী মূল্য বিলক্ষণই আছে। অতএব, সে হিসাবেও বক্ষ্যমান বিষয়ের সবিস্তার ব্যাখ্যা, পরীক্ষা ও আলোচনা হওয়া উচিত।

সর্ব্বপ্রধান এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্র 'পায়োনিয়র' শিক্ষিত মাত্রেই জানেন, চিরকালই রাজপুরুষ পক্ষের পক্ষপাতী, রাজপ্রতিনিধির অনুচরবর্গের পার্শ্বচর, তাঁহাদের ন্যায়ান্যায় সকল বিষয়েরই সমর্থক, 'পায়োনিয়র' সরকারী সাহেব ও দেশীয়-বিদ্বেষী-সাহেব সম্প্রদায়ের মুখপাত্র; লর্ড রিপণ ও তৎসদৃশ গবর্ণর জেনারল ভিন্ন যখন যে গবর্নর জেনারল আসিয়াছেন, পায়োনিয়র তাঁদের সকলেরই তৈল সেবা ও চন্দন চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। এবং তাহা করাতেই পায়োনিয়রের প্রাধান্য প্রসার এবং প্রতিপত্তি। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন ও তদীয় শাসন-নীতি সম্বন্ধে 'পায়োনিয়রের" পলিশি ও লিপি-চালনা-প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত প্রকৃতির। ইহার কারণ কি, তাহাও শিক্ষিতের অজ্ঞাত নহে। যে কারণে 'পয়ো-

নিয়র' এবং তৎশ্রেণীর সংবাদ পত্র সকল লর্ড রীপণের শাসন-নীতি ও কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে দুরন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণেই ঐ 'পায়োনিয়র' প্রভৃতি লর্ড কর্জ্জনের প্রায় প্রতি পদ-ক্ষেপে প্রতিবাদ করিতেছেন, বিপক্ষতা ও শত্রুতা করিতেছেন। এখন দেখুন, সে কারণ কি। সে কারণ এই যে, লর্ড রীপণের ন্যায় লর্ড কর্জ্জনও গতানুগতিক নহেন; তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসননীতি; তিনি কোন বিষয়ই সেক্রেটারী ও সহকারী সাহেবদিগের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহাদের মন্ত্রণায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধিদের মত যন্ত্রবৎ পরিচালিত হন না, সকল কাজই নিজে দেখিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া সুঝিয়া এবং সাধারণ মতামতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং দেশীয়দিগের স্বার্থ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাহ করেন। পরন্তু,কারণ এই যে, দেশীয়দের প্রতি লর্ড কর্জ্জনের করুণা ও দেশীয়দের সহিত সমবেদনা। গতানুগতিকত্ব-বিহীনতা, সাধারণ মতামতের প্রতি আস্থা এবং দেশীয় প্রজার সহিত সমবেদনা, পরন্তু, স্বদেশীয়দের সম্বন্ধেও উচিত সমালোচনা, এই কয়টী কারণে লর্ড কর্জ্জনের প্রতি "পায়োনিয়র" কোম্পানীর কোপ। পায়োনিয়র কোম্পানী লর্ড কর্জ্জনের বিপক্ষ, ইহারও প্রচুর প্রমাণ যে লর্ড কর্জ্জন দেশীয়-বৎসল ও ভারত-বন্ধু। বলা বাহুল্য যে, লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবিত স্মারক সম্বন্ধে, 'পায়োনিয়র'ই প্রধানতঃ প্রতিবাদ করিতেছেন ও প্রবল বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। যখন এ দেশীয়দের স্বার্থ পায়োনিয়রের স্বার্থের প্রতিকূল, এবং লর্ড কর্জ্জন এ দেশীয় স্বার্থে অনুকূল, তখন পায়োনিয়রের ত উহা করিবারই কথা; করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য—বড়ই লজ্জা এবং ঘৃণার বিষয় যে,আমরা এ দেশবাসী,আমরাও আমাদের চিরবিদ্বেষী পায়োনিয়রের—আমাদের মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে পাদুকাঘাতকারী পায়োনিয়রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া লর্ড কর্জ্জনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। হা! ধিক্!

উপস্থিত প্রবন্ধাবলীতে আমাদের যাহা কল্পনা, উপসংহারে নিবেদন করিতেছি। প্রথম বা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে :আমরা বহু সমালোচিত স্মারকের স্থূল আভাস দিয়াছি এবং তৎপ্রসঙ্গে লর্ড কর্জ্জনের ব্যক্তিত্বের ও বিশেষত্বের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছি। পর পর প্রবন্ধে আমরা যথা ক্রমে স্মারক সম্বন্ধে প্রধান কয়েকটী প্রস্তাবের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবের সহিত তাহাদের তুলনা করিয়া, স্মারক সম্বন্ধে, উহাদের কাহার কিরূপ উপযোগিতা, পরিষ্কার রূপে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। পরন্তু, "ভিক্টোরিয়া হল" ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্যশালার" যে বাক্য-চিত্র লর্ড কর্জ্জন ইংরেজীতে অঙ্কিত করিয়াছেন, স্বদেশীয় বর্ণে তাহার একটী প্রতিলেখ্য প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে যত্ন করিব। সর্ব্বশেষ প্রবন্ধে লর্ড কর্জ্জন যে একটী কথার আলোচনা করা বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই, আমরা সেই কথাটীর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ও বিচার করার চেষ্টা করিব। এই স্মারক সংস্থাপন কল্পেই কথা উঠিয়াছে এবং কথাটা খুবই বেগে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে যে, মহারাণীর স্মারক সৌন্দর্য্যমূলক না হইয়া সৌকার্য্যমূলক হওয়াই উচিত। অর্থাৎ স্মারকে বিউটীর (Beauty) আবশ্যক

নাই; কেবল (utility) ইয়ুটীলিটীই চাই। ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, বিউটীর কিছুমাত্র ইয়ুটিলিটী নাই; সৌন্দর্য্যে কিছুই সৌকর্য্য বা উপকার্য্য নাই। ইউটিলিটী ভিন্ন বিউটী যেন হইতেই পারে; সৌকর্য্যবিহীন সৌন্দর্য্য যেন স্বভাবতঃই সম্ভব। এই উক্তি, এই সংস্কার কিন্তু আদৌ অবৈজ্ঞানিক। ফলতঃ ইয়ুটিলিটী ভিন্ন বিউটী একেবারেই সম্ভবে না; সৌকর্য্য নহিলে সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই হইতে পারে না; ইহা কেবল জড় বিজ্ঞানের কথা নয়; মনো-বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যদি সময় পাই, সর্ব্বশেষে কথাটী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

শিখগুরু নানক।

ইরাবতী-স্রোতবিধৌত তলবন্দী গ্রামে যখন নানকের জন্ম হয়, তখন বহলোল লোদী দিল্লীর অধীশ্বর। তলবন্দী লাহোরের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ১৪৬৯ খৃঃ অঃ যখন নানক জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন কেহই মনে করে নাই যে,একদিন সেই ক্ষুদ্র শিশুই শিখজাতির জাতীয় জীবনে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটাইবে।

নানকের পিতা কালু ছত্রীদিগের মধ্যে বেদী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তখন চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে জাট ও ভট্টি নামক দুই জাতীয় লোক বাস করিত। রায়বুলার. সেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভট্টি জাতির একজন। নানকের জন্মকালে তলবন্দী রায়বুলারের শাসনাধীনে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, নানক তাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * প্রথমবার সন্তান হইবার সময়, পঞ্জাবের রমণীগণ প্রায়ই আপন আপন পিতৃভবনে গমন করে এবং যে সমস্ত সন্তান মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করে, পঞ্জাবরমণীরা তাহাদিগকে আদর করিয়া "নানকী" বলিয়া থাকে। অনেকে বলেন, এই কারণেই শিখগুরুর নাম নানক হইয়াছে।

আপন প্রতিভাবলে পৃথিবীতে যে ব্যক্তি সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, তাহারই বাল্যজীবনের নানারূপ কৌতুহলপূর্ণ ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। নানকের বাল্য জীবন সম্বন্ধেও অনেক অভিনব কাহিনী আছে। শাক্যসিংহ বল, ঈশা বল, মুশা বল, ইহারা সকলেই যে ঈশ্বর দূত, তাহারই অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাল্যজীবনকেই লোক-বিস্ময়কর অভিনব গুজবের এক একটী অনন্ত অফুরন্ত ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু আমাদের দেশ কেন, সকল দেশেরই এই প্রথা। নানকের জীবনেরও তেমন অনেক ঘটনা আছে। কিন্তু তাহা যে সমস্তই সত্য, এরূপ বিশ্বাস হয়না। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন মহাজ্ঞানী ফকিরের উপাসনা বলে নানকের জন্ম হয়। জন্মের পূর্ব্বে সেই ফকির বলিয়াছিলেন যে, কালে এই নানক পৃথিবী মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক হইবে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, নানক যে শিখের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসে একটী পুণ্যো-

*Vide Cunningham's History of the Shiks.

জ্জ্বল অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নানক যদিও হিন্দু ছিলেন, কিন্তু এক জন মুসলমান শিক্ষকের নিকট তিনি যে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন. সায়র উল-মুতাক্ষরীণে তাহা লিখিত আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলেন, 'He was a desciple of Kabir"* অর্থাৎ তিনি কবিরের একজন শিষ্য ছিলেন। কিন্তু সায়র-উল-মুতাক্ষরীণের প্রণেতা বলেন, পুত্রকলত্রবিহীন অর্থশালী সৈয়দ হোসেন, নামক জনৈক মুসলমানই নানকের শিক্ষাগুরু।† ঐতিহাসিক কানিংহ্যাম সাহেবের অভিমতও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনিও বলিয়াছেন‡—

"A manuscript compilation in Persian mentions that Nanak's first teacher was a Mahometan. * * * Nanak is reported by the Mahometans, to have learnt all earthly sciences from, Khizzer *i.e*, the prophet Elias."

সপ্তমবর্ষ বয়সে নানক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, নানক তখন সংসার ভুলিয়া তন্ময়চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই সময়েই তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ জটিল প্রশ্ন করিতেন যে, নানকের শিক্ষকও তাহার সদুত্তর দিয়া উঠিতে পারিতেন না। ঈশ্বর যে "একমেবদ্বিতীয়ং"§ অতিশয় বাল্যকাল হইতেই নানকের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল।

নানকের পবিত্র জীবনের অধিকাংশ সময়ই নির্জ্জন বাস ও ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত হইত। এবং অল্প বয়সেই তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। মুসলমানের কোরাণ ও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সেই সময় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ঘরে থাকিলে ধর্ম্মচিন্তার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া নানক প্রায়ই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। আপন সহচরদিগের নিকট হইতে পৃথক থাকিবার মানসে নানক শৈশবেই অনেক দিন গৃহ ছাড়িয়া গহন বনের ভিতর লুকায়িত হইতেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী কানন-প্রবাসের জন্য নানকের পিতা কালু, এতই চিন্তিত হইয়া পড়িতেন যে,তিনি কতবার পুত্রের জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, নানকের বয়স যখন নবম বর্ষ মাত্র, তখন হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত উপবীত ধারণ করাইবার জন্য কালু পুরোহিত আনাইয়া উপনয়নের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য সকল অনুষ্ঠান করিলে পর নানক বলিয়াছিলেন যে, "উপবীত ধারণ করিলেই যে তাঁহার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইবে, তাহা বোধ হয় না। ঈশ্বরের নামই শ্রেষ্ঠ উপবীত। সেই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিয়া আত্মার উন্নতি করাই মনুষ্য মাত্রের উচিত। লৌকিক উপবীত ধারণে কি ফল হইবে?"

কালু সংসারী ছিলেন। পৃথিবীর নিত্য দুঃখ দৈন্য প্রভৃতির তীব্র কোলাহলে তিনি অস্থির হইতেন। তাই নানক যখন পঞ্চদশ বর্ষের তরুণ যুবক, তখন বালা নানক

---

* Vide Elphinstone's History of India.

† Vide Brigg's translation of Seir-ool-Mootakperun.

‡ Vide Cunningham's History of the Shiks. Vol. I.

§ "He was a sort of Hindu deist, but his peculiar ten et was universal toleration. Elphinstone".

একজন ভৃত্যের সহিত চল্লিশ মুদ্রার লবণ ক্রয় করিবার জন্য তিনি নানককে প্রেরণ করেন। পিতা মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্র যতই বয়োবৃদ্ধ হইবে, ততই তাঁহার সাংসারিক পরিশ্রম অনেকটা কমিয়া আসিবে, তিনি আর একজন 'দোসর' পাইবেন। কিন্তু নানকের হৃদয়ের গুপ্ত অন্তরালে ধর্ম্মের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছিল, ঈশ্বরপ্রেমের মোহন সঙ্গীতে নানক তখন হইতেই মোহিত হইয়াছিলেন। তাই পার্থিব লবণ তৈল ক্রয় বিক্রয় তাঁহার ভগবত্তত্ব-জিজ্ঞাসু জ্ঞানপিপাসু ধর্ম্মপ্রবণ জীবনের মার্গ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিত।

নানক পিতার আদেশে লবণ ক্রয় ব্যপদেশে গৃহের বাহির হইয়া পথিমধ্যে একদল ক্ষুৎপীড়িত ফকিরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। লবণ ক্রয় করিয়া ব্যবসার কথা নানক ভুলিয়া গেলেন। লবণ ক্রয় করা আর হইল না, সেই টাকা দিয়া প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া নানক তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। বালা কিন্তু নানকের ব্যবহার দেখিয়া বড় তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন দীন নয়নে বালার মুখের দিকে চাহিয়া নানক বলিয়াছিলেন "মনুষ্যের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে যে লাভ, ঈশ্বরের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ।"

ভীত নানক ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন। পিতার ভয়ে তিনি একটী বৃক্ষের পত্রসমাকুল শাখার উপর বসিয়া রহিলেন। অর্থের অপব্যবহার হইয়াছে শুনিয়া কালু সেবার পুত্রকে যথেষ্ট প্রহার করিতে ক্রটি করেন নাই। পিতা কর্ত্তৃক বারম্বার তাড়িত, ভর্ৎসিত, প্রহৃত, লাঞ্ছিত হইয়াও নানক তাঁহার স্বভাবজাত বদান্যতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুযোগ পাইলেই পিতৃভবন হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন।

ধর্ম্মচিন্তা-নিরত নানকের হৃদয় যখনই শিক্ষার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত, নানক তখনই গৃহের বাহির হইতেন। তিনি বেদও পাঠ করিতেন, কোরাণও পাঠ করিতেন—যোগী সন্ন্যাসী, দরবেশ, ফকির যাহাকে পাইতেন, তাহার নিকটেই ধর্ম্ম পথের কথা—ঈশ্বরের কথা—শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। তিনি বলিতেন, সমস্তই ভ্রম।* আমি কোরাণ পাঠ করিয়াছি, পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি—কিন্তু কোথায়ও ঈশ্বর মিলিল না।

সংসারের প্রতি পুত্রের এইরূপ বিরাগ দেখিয়া কালু স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, বিবাহ দিলেই নানকের ঘরে মন বসিবে—নানকের উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল মন বাঁধা পড়িবে। তাই গুরুদাসপুর জেলার লাখোকীর অধিবাসী মূলার কন্যা সুন্দরী "সুলক্ষ্মীর" সহিত নানকের বিবাহ হইল। কিন্তু সেই নবযৌবন-বিকশিত নববিবাহিত জীবনের প্রথম প্রেম—পত্নীর সেই সরল সুন্দর বদনমণ্ডল, তাহার সেই অগাধ অসীম ভালবাসা—কিছুতেই নানককে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। নানকের কর্ণমূলে যেন কি এক মোহিনী বাঁশরীর মোহন সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। নানক গৃহের বাহির হইলেন।

* "All was error, he said; he had read Korans and Poorans, but God he had no where found."—Cunningham's History of the Shiks.

ভ্রমণব্যপদেশে তিনি ভারতের সকল স্থানেই গিয়াছিলেন। * শুনিতে পাওয়া যায়, নানক পারস্য দেশের ভিতর দিয়া মক্কায় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

নানকের মক্কা ভ্রমণ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। † একদিন পরিশ্রান্ত নানক মক্কার সেই মন্দিরের দিকে পা রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নানক বলিলেন আমি যে দিকেই চরণ রাখিব, সেই দিকেইত ঈশ্বরের মন্দির। সায়র-উল-মুতাক্ষরীণ হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে, দেশ ভ্রমণের সময় নানক মুসলমান দরবেশের বেশ পরিধান করিতেন। তাঁহার সঙ্গীদিগের ভিতরে মরদানা, লহনা, বালা ও রামদাসের নামই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রশস্তি উদ্দেশে নানক যে সমস্ত পদ্য রচনা করিতেন, মরদানা তাহা বীণায় বাজাইয়া বাজাইয়া গাইত।

নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর যে এক এবং মনুষ্যের অগোচর, এই বিশ্বাসই নানকের হৃদয়ে চিরদিন বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানকের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে একটীমাত্র সত্য ধর্ম্ম সৃষ্ট হয়। সকল মানুষই একধর্ম্মী ছিল। পরে কুটিল মনুষ্যের কৌশলে ও আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম —ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতেই নানকের প্রাণের ভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মানব প্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নহে। আচার্য্য মোক্ষমূলরও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন জড় ও জীবজগতে একটা একতা আছে—যেমন ভাষাতত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিতর একটা একতা আছে—যেমন মানবতত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য সম্প্রদায়ের ভিতর একটু সাদৃশ্য আছে, তেমনি আবার ধর্ম্ম জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরেও একটা একতা, একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং মোক্ষমূলরের কথা হইতেও অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে সকল মানুষই একধর্ম্মী ছিল। এই সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। মানব মনে অনন্তের একটা ভাব প্রকৃতিগত, স্বতঃসিদ্ধ। ধর্ম্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে। প্রকৃতিদেবীর নানারূপ মূর্ত্তি অবলম্বনে এই ভাবের সর্ব্বপ্রথম স্ফুরণ—তারপর কল্পনাদেবীর মোহিনী মায়ায় দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া—দেবতার উপাসনা। তারপর আত্মতত্ত্ব অবলম্বনে ঈশ্বর তত্ত্বের বিকাশ। ইহাকেই ধর্ম্মতত্ত্ব বলা যাইতে পারে। অল্প কথায় বলিতে গেলে, মোক্ষমূলরেরও ধর্ম্মতত্ত্ব অনেকটা এইরূপ এবং নানকের ধর্ম্মতত্ত্বের মূলেও এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

যদিও নানক কোরাণ ও পুরাণ উভয়ই অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন, এবং উভয় পুস্তক হইতেই সার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে শুনাইতেন, তথাপি তিনি বলিতেন যে, প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের তত্ত্ব কোথাও নাই।

হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতির ধর্ম্ম

* Vide Cunningham's History of the Shiks.
† Vide Malcolm's Sketch of the Shiks.

গত, সমাজগত, জাতিগত বিরোধ ভঞ্জন করা এবং এই উভয় ধর্ম্মের পরস্পর একটা সুসামঞ্জস্য করা নানকের জীবনের একটী ব্রত ছিল। এ বিষয়ে তিনি যে একেবারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহা নহে। মনুষ্যের ভিতর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করা— সর্ব্বত্র চিরশান্তি বিস্তার করা, সকলকে ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করা, এই সমস্তই নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার উপদেশ। নানক বলিতেন যে, পরমেশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা এবং চিত্তশুদ্ধিই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন।

নানক হিন্দুদিগের অবতার মানিতেন— মহম্মদকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনই বলিতেন না যে, তাঁহার নিজের ধর্ম্মোপদেশ বা বর্ত্তৃতা ঈশ্বরাদিষ্ট। তাঁহার যে কোন বিশেষ শক্তি আছে, এ কথাও তিনি কখন বলিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—আমি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে একজন, আমি একজন ঘোর পাপী।

"তুহায় নিরঙ্কার, কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা"—অর্থাৎ "ঈশ্বরের দ্বারের আমি একজন সামান্য ফকির মাত্র" ইহাই ধার্ম্মিক নানকের মহৎ হৃদয়ের উচ্চকথা। গুরু নানক বলিতেন "ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। তিনি বুদ্ধির অতীত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি অনন্ত—তিনি আযোনিসম্ভব। কেবল মাত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ব্বাণ লাভ হয় না—সে জন্য সত্য ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরে প্রকৃত প্রাণপণ বিশ্বাস আবশ্যক। ঈশ্বরই আমাদের ইষ্টানিষ্টের মূল—তিনিই আমাদিগের অভাব দূর করিয়া থাকেন। নানক বলিতেন, পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করিও,পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফলাফল এজন্মেও ভোগ করিতে হয়।

তিনি শিখদিগকে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক উপদেশ দেন নাই। শিখজাতির জাতীয় উন্নতি নানক কালের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ছিল। তিনি শিখদিগের সামাজিক রীতিনীতির কোনই পরিবর্ত্তন করেন নাই।

যদিও সত্য অনুসন্ধানের জন্য অতি অল্প বয়স হইতেই নানক গৃহ ছাড়িয়া কখনও বা সন্ন্যাসীর বেশে,কখনও বা দরবেশের বেশে দেশে দেশে ফিরিতেন, কিন্তু অবশেষে নানা দেশের নানা প্রকৃতির লোকের সংসর্গে পড়িয়া ও তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ে সমাজের উপর নানকের চিরন্তন অশ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল।

যে নানক নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অল্প দিনের জন্য একবার তলবন্দী গ্রামে প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার পিতা মাতা, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি সকলে আসিয়া নানারকম উপদেশ দিয়া ও বারম্বার অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে ফকিরের বেশ পরিত্যাগ করাইয়া সংসারী করিতে পারেন নাই— যে নানক সেই সময় স্বীয় সুন্দরী পত্নীর বিরহ ব্যাকুল ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়াছিলেন, —কালের চক্রে সেই নানকেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ ধার্ম্মিক নানক শেষে শিখিলেন যে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার ত্যাগ নিষ্প্রয়োজন, পরমেশ্বরের চক্ষে ফকির ও রাজার কোনই প্রভেদ নাই—ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী এবং ভক্ত গৃহী উভয়েই ঈশ্বরের সম্মুখে সমান। তাই অবশেষে নানক পরিবারবর্গ সহ একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

নানক আবার গৃহী হইলেন—কিন্তু মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের চিন্তা ভুলিলেন না। তাঁহার গৃহে সর্ব্বজাতীয় লোক আশ্রয় পাইত। ফকির বেশে জীবন অতিবাহিত করিয়াও নানক বহু সংখ্যক লোকের উপর রাজার অধিক প্রভুত্ব করিতেন। নানকের শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশজ্ঞানে ভক্তি করিত। নানক সুরাপান নিষেধ করিয়াছিলেন এবং নিজে কখনও আমিষ আহার করিতেন না। ধার্ম্মিক নানকের পবিত্র জীবনের শেষ ভাগ ইরাবতী তীরে অতিবাহিত হইয়াছিল। ইরাবতীর কলতানমুখরিত তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের চিন্তায় নানক জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার সেই ধ্যানমগ্ন দেহে যেন তখন একটী স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠিত।

নানক তাঁহার গৃহে একটী অতিথিশালা প্রস্তত করিয়াছিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য লোক নানক-প্রতিষ্ঠিত সেই অতিথিশালায় দেবপ্রসাদ পাইয়া চরিতার্থ হইত। ইরাবতী তীরস্থ নানকের সেই বাটীর অংশবিশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা "ডেরা-বাবা-নানক" নামে প্রসিদ্ধ।

জালন্ধর জেলায় নানক কর্ত্তারপুর নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভক্ত শিখের নিকট ইহা একটী পবিত্র তীর্থস্থান।

কালের অপ্রতিহত নিয়মে নানকের স্বর্গারোহণের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। অবশেষে একদিন ঈশ্বর চিন্তামগ্ন নানক শান্তির সহিত শান্তি ধামে চলিয়া গেলেন। ১৫৩৮ খ্রীঃ অঃ নানক পরলোকগত হইলেন। তাঁহার জীবনের শেষ ৪০ বৎসর ৫ মাস এবং ৭ দিন তিনি "গুরু" খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া "গুরু" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। নানকের পবিত্র স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেকদূর হইতেই তাহার অভ্রভেদী উচ্চচূড়া দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রতিবৎসর নানকের মৃত্যুদিবসে লক্ষ লক্ষ লোক সেই স্থানে সমবেত হইয়া উৎসব করিত। ইরাবতীর খরস্রোতে সেই সমাধিমন্দির এখন ভাঙ্গিয়া, ধসিয়া, ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক শিখহৃদয়ে নানকের স্মৃতি, ভক্তির সহিত—স্নেহের সহিত, সম্মানের সহিত অদ্যাপিও রক্ষিত হইতেছে। যতদিন একজন শিখও থাকিবে, ততদিনই হইবে।

এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। শুনিতে পাওয়া যায়, স্বর্গারোহণের পর নানকের মৃতদেহের সৎকার লইয়া হিন্দু মুসলমানদিগের ভিতর একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা বলিত 'নানক একজন মুসলমান সাধু পুরুষ। কারণ যদিও নানক স্পষ্টতঃ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্মে তিনি কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই—বরং মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত স্বর্গের দূত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কারণে তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা নানকের কবর দিবে। আবার হিন্দুরা নানককে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া ভক্তি করিত। তাই তাহারা নানকের দেহ অগ্নিসাৎ করিতে চাহিল। অনুযোগ, অনুনয়, বিনয় সমস্তই বৃথা হইল। কেহ কাহারও যুক্তি তর্ক শুনিল না। নানকের মৃতদেহের সম্মুখে উভয় পক্ষেরই শাণিত

তরবারী সেই উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে ঝলসিয়া উঠিল। তখন কতকগুলি পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নানকের দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক। তাহাই স্থির হইল। কিন্তু দেহাবরণ উন্মোচন করিয়া সকলেই দেখিল, নানকের মৃতদেহ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহের আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ কোন এক পক্ষের লোক পূর্ব্বেই উহা চুরি করিয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে সেই দেহাবরণখানিই দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিন্দুরা তাহার একাংশ চিতানলে ভস্মীভূত করিল, আর অপরাংশ মুসলমানেরা কবর দিয়া ফেলিল।

গুরু নানক চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সমাধি-মন্দিরও গিয়াছে—আছে কেবল নানকের স্মৃতি—আছে কেবল তাঁহার ধর্ম্ম—আছে কেবল তাঁহার গুণকীর্ত্তন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

বিবাহের উপদেশ।

* * *, বিধাতার অযাচিতা এবং অপরাজিতা দয়ায় আজ তোমাদের দুটী প্রাণ এক হইয়াছে—পুষ্পদলের দুই নীরবিন্দু মিলিয়া গিয়াছে, ঝরণার দুটী ধারা এক ধারায় পরিণত,—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা, তোমাদের আত্মীয়বর্গ, এ দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইতেছি। একের জ্ঞান, অপরের প্রেম;—একের প্রতিভা, অপরের কোমলতা; একের ন্যায়, অপরের দয়া; একের ধর্ম্মানুরাগ, অপরের সেবা,—মিলিয়া, মিশিয়া কি এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রূপে অপরূপ মিলিয়াছে—পুরুষ ও প্রকৃতি আজ সম্মিলিত। স্বর্গ হইতে অজস্রধারায় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে; মর্ত্ত্যের নরনারীর শুভ ইচ্ছা অর্পিত হইতেছে। জয় বিশ্বপতির জয়। আজ তোমরা প্রাণ ভরিয়া বল, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

তোমরা জান, দাম্পত্য জীবন, অতি মধুর জীবন। তোমাদিগের এত দিনের কামনা এবং প্রার্থনা আজ পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে তোমরা কত আনন্দিত। কিন্তু জান কি, কেন দাম্পত্য-জীবন এত মধুর? এই বিবাহ-মণ্ডপ, আত্ম-ত্যাগের এক অপূর্ব্ব ক্ষেত্র। এতদিন তোমরা নিজ নিজ স্বার্থ, নিজ নিজ কামনা, নিজ নিজ ইচ্ছা লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছিলে। আর আজ করিলে কি? নিজের স্বার্থ, কামনা ও ইচ্ছা,—মধুময় জীবন অপরকে উৎসর্গ করিয়া যাইতেছ। "আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক"—এ প্রতিজ্ঞা আত্ম-ত্যাগের মহা মন্ত্র,—বড় কঠোর, বড় কঠিন। দিতে আসিয়াছিলে, দিতেছ; নিতে আসিয়াছিলে, নিতেছ। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন মহাদেব, তিনি এ দেশে মহাযোগী বলিয়া বিখ্যাত। আত্মত্যাগে সিদ্ধা হইয়াছিলেন, গৌরী, তিনি এদেশে সতীর আদর্শ। শিবনিন্দা শুনিতে অসমর্থা হইয়া তিনি মৃত্যুকে চুম্বন করিয়াছিলেন, সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের মহানৃত্য এ দেশের কাহিনীতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর কাহিনী। প্রেম-মন্ত্রের

গূঢ় রহস্য আত্মত্যাগে। আপনাকে যিনি রক্ষা করেন, তিনি পরের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিতে অক্ষম। নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয় শূন্য করিতে হয়। সেই শূন্য হৃদয়ে অন্যকে বসাইতে হয়। নিজের মান অভিমান, বিদ্যা বুদ্ধির গরিমা, বিলাস বাসনার কামনা, পাপ প্রলোভন, সব বিসর্জ্জন দিয়া পবিত্র ও নির্ম্মল হইতে হয়। তোমরা এ সকল বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছ কি? যদি পারিয়া থাক, দাম্পত্য-জীবন কেন এত মধুর, তাহা বুঝিবে; আর যদি সে সকল বজায় রাখিয়া থাক, বিবাহের নবীনত্ব ঘুচিলে বুঝিতে পারিবে, দাম্পত্য-জীবন কত তিক্ত। জ্ঞান বড়, কি প্রেম বড়, কেহ মীমাংসা করিতে পারে নাই। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কি প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, তাহাও অমীমাংসিত। তোমরাও, নিজেদের নিজত্বের অভিমান আজ এই আত্মত্যাগ-ক্ষেত্রে পরিত্যাগ কর; বিশ্বপতি তাহার সাক্ষী থাকুন। আর সাক্ষী থাকুক, এই সংসার। দুই নদী মিশিয়া একাকার হইয়া যাক্—ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিশিয়া একাকার রূপ ধারণ করুক। তোমাদের আদর্শ প্রেম-সলিলের স্নিগ্ধতায় এই উষ্ণ ধরা সুশীতল হউক।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার কথা বলিতেছিলাম। * * এবং * *, তোমাদিগকে আমি ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ন্যায় আজ বুঝিতেছি। ভারতের দুই বিভিন্ন প্রদেশ উর্ব্বরা করিয়া, সুশীতল ও সরস করিয়া, এই দুই নদী মিলিয়া যেখানে পদ্মা নাম ধারণ করিয়া বিশাল-বক্ষ হইয়াছে, আমি পূর্ব্ববঙ্গের সেই সুন্দর সঙ্গম-স্থান দেখিয়াছি। মিলনের পর কতক-দূর—এই দুই নদীর জলের বর্ণ-পার্থক্য বুঝা যায়, কিন্তু শেষে দুইয়ের জল একবর্ণ, এক-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট,—একাকার। আহা, তাহার জল কত গভীর, কত স্নিগ্ধ, কত সুশীতল, কত মধুর! সেই জল পান করিয়া কত লোক নীরোগী হয়, কত তৃষার্ত্তের তৃষ্ণা দূর হয়, কত অনুর্ব্বরা জমী উর্ব্বরা হয়;—ঐ বিশাল-বক্ষের সুশীতল বায়ু সেবনে কত লোকের ব্যাধি-যন্ত্রণা তিরোহিত হয়। কেবল কি তাহাই? ঐ বিশাল উদার বক্ষের জলে কত বংশের কত সঞ্চিত পাপরাশি বিধৌত হইয়াছে, কে না জানে? কত বংশের কত কলঙ্ক-হলাহল-রাশি পদ্মা হজম করিয়া মহাযোগিনী বেশে আজ পূর্ব্ববঙ্গে শোভিতা। লোকে দুর্নাম করিয়া তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম রাখিয়াছে, কিন্তু আমি বলি, পদ্মার প্রকৃত মাহাত্ম্যই পাপ-প্রক্ষালনে। আজ দুই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকুমারী মিলিয়াছে;—ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মহামিলন হইয়াছে;—দুই বিভিন্নপ্রদেশ ও দুই বিভিন্ন বংশ একাকার হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা দেখিতে চাই—ঐ পদ্মার ন্যায়, দিনে দিনে তোমাদের বিশেষত্ব, পৃথকত্ব, বিভিন্নত্ব ঘুচিয়া একবর্ণ, একধর্ম্ম, একহৃদয়—একাকার ভাব আসুক; এবং তোমাদের সেই উদার এবং বিশাল হৃদয়ের সুস্নিগ্ধতায় উত্তাপ যাক্, তৃষ্ণা যাক্, সন্তাপ যাক্,—পূর্ব্ববঙ্গের এবং তৎসহ সমগ্র বঙ্গের পাপরাশি বিধৌত হউক। জগৎ সুশীতল ও মধুময় হউক।

নিজের সুখ অন্বেষণে যাহারা ব্যস্ত, এ জগতে তাহারা ঘোরতর অসুখী;—সুখ এ সংসারে তাহাদের পক্ষে যেন মৃগতৃষ্ণিকা। ধরি ধরি করিতেই জীবন যায়, ধরা যায় না। ধন বল, যৌবন বল, রূপ বল, এ সকল কদিনের? আমি লিখিয়া দিতে পারি, আজ যাহা আছে, দশ বৎসর

পর আর তাহা থাকিবে না। সব যেন পদ্মপত্রের জল, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে তাহা স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত হয়। অচঞ্চল, নিত্য, ধ্রুব সত্য এ জগতে কি, তাহা জান কি? তাহা এজগতে আত্মত্যাগ। যে কিছু চায় না, সে সব পায়। যে আপনাকে অর্পণ করে, সে জগৎকে পায়। আপনাকে ভুলিলে তবে জগৎকে চেনা যায়—জগৎকে চিনিলে তবে জগন্ময় যিনি, তাঁহাকে পাওয়া যায়। লোকে বলে, নিরাকারকে ধরা যায় না। আমি বলি, নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। চিন্ময়ীর এই দিব্য মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে ধ্যান করিয়া, জগতের সহিত একাত্মক হওয়াতেই প্রকৃত সুখ। সম্ভব নয় যে ক্ষুদ্র মানব, ক্ষণস্থায়ী জীবনে, জগতের সকলকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে;—কিন্তু হৃদয় যদি বিশাল হয়,—ইচ্ছা যদি মহান ও উদার হয়, সকলকেই আপনার বলিয়া অন্তরে ধারণা করা যায়। সাধনার পথে, আমি এই ধ্রুব সত্য পাইয়াছি;—আমরা ও জগৎ একাত্মক;—আমরা ও জগৎ, একে স্থিত, একে রক্ষিত, একে সঞ্জীবিত। এই অমূল্য সত্য সাধনে তোমাদের যুগল রূপ আজ জগতের সহিত একাত্মক হউক। জগতের সুখ, তোমাদের সুখ হউক; জগতের মঙ্গল, তোমাদের মঙ্গলের বস্তু হউক; তোমরা জগতের এবং তৎসহ জগন্ময়ীর অতুল রূপে বিসর্জ্জিত হও। পদ্মার অতুল স্নেহ-বর্ষার প্লাবনে পূর্ব্ব বঙ্গ ভাসিয়া যাক্।

* *, তুমি হও কায়া; * *, তুমি হও ছায়া। * *, তোমার পিতা চরিত্রের আদর্শে পূর্ব্ববঙ্গকে মধুময় করিয়াছিলেন, ব্রহ্মপুত্র, তুমি আজ পিতৃকুলের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কায়া রূপ ধারণ কর। * *, তোমার পিতা মধুময় সুস্নিগ্ধ প্রকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গকে সুস্নিগ্ধ করিয়াছেন; তুমি গঙ্গার ন্যায় সুস্নিগ্ধ পতিতপাবনী প্রকৃতিতে অনুপ্রাণিতা হইয়া আজ ছায়া রূপ ধারণ কর। প্রকৃতির দুই রূপ কায়া ও ছায়া, ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যা, আজ মিলিয়া দুই কুলের মুখ উজ্জ্বল করুক; এবং মিলিয়া, একাকার হইয়া, সরল আত্মীয় ও সকল নরনারীর স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া, বঙ্গকে সুশীতল করিয়া, ঐ মহা প্রেমসাগরের দিকে ধাবিত হউক। স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বতন্ত্র কামনা, স্বতন্ত্র রূপ—আজ মিলিয়া যাক্। পৃথিবী আজ মধুময় হউক।

তোমাদের পিতা মাতা তোমাদের নিকট কি চান? আমরা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ, কি চাই? আর কিছুই নয়—কেবল এই চাই, তোমাদের জীবন পুণ্যময় হউক, তোমাদের আদর্শে এই ধরার পাপ সন্তাপ রাশি বিদূরিত হউক,—বিধাতার পবিত্র সিংহাসন এই জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমরা সংসারকে প্রেম ও সেবা বলে আত্মস্থ করিতে করিতে শেষে অকূল প্রেমসাগরে মিলিত হও। তোমরা তাঁহার সংসার এবং তাঁহার সহিত একাত্মক হও। বিধাতা তাহাই করুন, বিধাতা কেবল তাহাই করুন।

রাঁচি, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

৺ নলিনীকান্ত সেন।

"Every friend whom not thy fantastic will, but the great and the tender heart in thee craveth, shall lock thee in his embrace. And this because the heart in thee is the heart of all."—Emerson.

আকাশে পূর্ণচন্দ্র; রহস্যময় চন্দ্রালোক প্রকৃতির অন্তরের লুকানো সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছিল। আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার সম্মুখেই একটী স্বচ্ছ-সলিলা বাপী চন্দ্র-কিরণে আপনার কৃষ্ণবারিতে সত সহস্র মুকুতা সৃজন করিতেছিল। আমাদের বাম পার্শ্বে পবিত্র শিবমন্দির উন্নত চূড়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাত্র তখন ৯টা। মাঝে মাঝে কোথা হইতে সঙ্গীতের ক্ষীণ ছিন্ন সুরগুলি আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে করিতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিল। আমরা দুজনে সেই চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া কত কথা বলিতে-ছিলাম—সে আজ সাত বৎসরের কথা, সমস্ত মনে নাই। তবে এইটুক মনে আছে যে, মুক্ত বিহঙ্গমের মতন দুটী প্রাণ সমস্ত প্রকৃ-তিতে ভ্রমিয়া বেড়াইতেছিল। হায়, তখন ভাবি নাই, এত শীঘ্র সেই সুখকাহিনী শোক-কাহিনীতে পরিণত হইবে!

প্রিয়তম সুহৃদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহার অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট আমার দুটী নিবেদন আছে; আমি তাহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহার সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল, কেবল তাহাই এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি আমার অক্ষমতায় সেই দেব-শিশুর অঙ্গে একটুও কালিমা-চিহ্ন পড়ে, তজ্জন্য অপরাধী আমি। আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য কি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন্ না?

চট্টগ্রামের একটী সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে ৺ নলিনী জন্মগ্রহণ করে। তাহার শৈশব জীবনের কথা আমি জানি না। যাহা মনে আছে, তাহাও কুয়াসার মতন; মনে হয় একটী সুন্দর ছেলে কখনও গম্ভীর ভাবে, কখনও বা হাসিমাখা মুখে আমাদের খেলায় যোগ দিত। এ দেশের রীতি অনুসারে তাহার মাথায় একটী জটা ছিল; আমি দুই একবার তাহা স্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু বাল-সুলভ চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া! কারণ শৈশবে আমরা মিলিত হই নাই।

ইংরাজি ১৮৯৪ সাল হইতেই আমরা উভয়ে উভয়কেই বুঝিতে, ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ই এক বিদ্যালয়ে পড়িতাম, নলিনী আমার এক শ্রেণী উপরে পড়িত। নলিনীর বাড়ী হইতে আমার বর্ত্তমান বাসা বাড়ীর দূরত্ব তত বেশী ছিল না; কাজেই অবসর পাইলেই সকালে, বিকালে, দ্বিপ্রহরে তাহার কাছে যাইতাম। এমন অনেকদিন গিয়াছে, যখন সমস্ত পৃথিবী সূর্য্য কিরণে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রকে মাথায় করিয়া নলিনীকে দেখিতে গিয়াছি। স্কুলেইত তাহার সহিত দেখা হইত, আলাপ হইত, তবে এ কষ্ট স্বীকার কেন? সে কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা আমার নাই; তবে তাহাকে দেখিলে প্রাণে আনন্দ হইত। শুধু ইহা নহে, তাহার কাছে বসিয়া কথা কহিলে অন্য কিছু মনে থাকিত না। যেন আমাদের কথা ফুরাইতে জানে না! আমি ঘড়ির দিকে চাহিলে, নলিনী

বলিত—"এখনও অনেক বেলা আছে।" কিন্তু তখন হয়ত সূর্য্য অস্ত যাইতেছে! বালককাল হইতেই সে কবিতা লিখিত। আমাদের অনেক দিন কেবল কবিতার প্রসঙ্গেই কাটিয়া যাইত। তাহার কবিতা কখন আমি পড়িতাম, কখন সে নিজে পড়িত—আমি অল্পদিনই পড়িবার ভার লইয়াছিলাম। কারণ সে যখন পড়িত, তাহার রাঙা ঠোঁট দু খানি কেমন কাঁপিতে কাঁপিতে শব্দ-উচ্চারণের সাহায্য করিত; উজ্জ্বল চক্ষু দুটী কখন বিস্ফারিত কখন সজল হইত; সুকেশ-সজ্জিত মস্তকটী কমন মৃদু সঞ্চালিত হইত;—আমি কবিতা ভুলিয়া তাহাই দেখিতাম। জানিনা তাহাতে কি মোহ, কি আকর্ষণ ছিল। কবিতা শেষ হইলেই তাহার সমালোচনা হইত। আমি অনেক সময়ই তাহার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতাম; সে বিরক্ত হইত না; আমি একটু লজ্জিত হইতাম!

"১৮৯৫ সালে সে আমাকে বাঙ্গালায় কিছু লিখিবার জন্য অত্যন্ত পিড়াপিড়ি করিল। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নাই; কিন্তু কেমন তাহার এক একটী কথার শক্তি ছিল যে, তাহা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইল। আমি "আমার পাখী" শীর্ষক একটী পাখীর কাহিনী লিখিলাম। নলিনী বলিল "এইত তুমি সুন্দর লিখিতে পার। দেখত এতদিন কিছু লেখ নাই, বড় অন্যায় করিয়াছ।" আমি বলিলাম—"ও ছাই লিখিয়া কি হইবে?" "আমি পড়িয়া সুখী হইব।" আমি শেষের কথাটী ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম। দুই তিন দিন মনের সহিত অনেক ঝগড়া করিলাম, শেষে নলিনীরই জয় হইল;—আমি "পাখীর" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার ১৫।১৬ দিন পরে এক দিন প্রাতঃকালে নলিনীর একখানি পত্র পাইলাম। ঐ বৎসরে আমাদের এরূপ পত্র-বিনিময় সপ্তাহে ৪।৫ দিনই হইত। অতি আগ্রহের সহিত পত্র খানি খুলিলাম। নিম্নে তাহার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।—সংসারের কোন বিজন বনের একৈক দেশে একটী ক্ষীণ প্রাণী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কে তার খবর নেয়? এই অনন্ত পাখীগুলির মধ্যে কোন্ পাখীটীর পাখা ভাঙ্গা, কে তাহা জানিতে চায়? কিন্তু ভাই, ঘটনাচক্রের অজ্ঞেয় আবর্ত্তনে কে তুমি আসিয়াছ আমার অশ্রুজল মুছাইতে? আমার জন্য সমপ্রাণতার একবিন্দু অশ্রু ফেলিতে। ভাই * * *! লোকের প্রাণ সর্ব্বদাই সমপ্রাণতার ভিখারী। তোমরা যদি প্রীতি-বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাও, আমি হাসি, আপনা ভুলিয়া হাসি। তাই প্রায়ই তোমাদিগকে বিরক্ত করি। ক্ষমা করিও, তাতেই আমার সুখ! তোমরাত ঢের সহিতে পার, আমার এই বিরক্তি সহিবে না? আজ তোমার "পাখী" আর একবার পড়িলাম; বইখানি বড় প্রাণময় হইয়াছে। শীঘ্রই শেষ দেখিতে চাই।" আমি পত্রখানি বাক্সের ভিতরে রাখিলাম; তখন তাহার কোন উত্তর দিলাম না—মনে একটা অভিসন্ধি ছিল। তাহার দুই দিন পরে বেলা ৫ টার সময় তাহার কাছে গেলাম। তাহাকে প্রায়ই তাহাদের রাস্তার ধারের পড়িবার ঘরটীতে দেখিতে পাইতাম; এই ঘরেই সে তাহার বন্ধু বান্ধবকে লইয়া কথা বার্ত্তা বলিত। আমি গিয়া দেখি, সে মেঘ-

ভূত পড়িতেছে। 'মেঘদূত' সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল; সে সব কথা মনে নাই, তবে আমরা উভয়েই বলিতেছিলাম—'মেঘদূতের' আখ্যানবস্তু সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অত্যন্ত সুন্দর। মেঘদূতের কথা শেষ হইলে পর, আমি ধীরে ধীরে "পাথীর" দ্বিতীয় অধ্যায় তাহাকে দিলাম। সে অন্য প্রকোষ্টে চলিয়া গেল; আমি একাকী বসিয়া মেঘদূতের পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার কর মর্দন করিল, আর কিছু বলিল না। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। ১৮৯৫ সাল হইতে নলিনী একটী যুবককে সহোদরের মতন ভালবাসিতে লাগিল। যুবকটী ভিন্ন দেশীয়। আমি প্রথমে ততটা বুঝিতে বা জানিতে পারি নাই; কিন্তু কয়েক দিন পরে কোন ঘটনাচক্রে সে আমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল, আমি তাহার হৃদয়ের উচ্চতা, পবিত্রতা ও প্রেমের চিত্র অনুভব করিয়া একেবারেই বিস্মিত হইয়া গেলাম। সেই দিন হইতে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলাম। আমি লুকাইয়া তাহার হৃদয়ের ভিতর পাতি পাতি করিতাম; যখন ধরা পড়িতাম—বড় সুখ বোধ হইত। ১৮৯৫ সাল আমার পক্ষে বড় স্মরণীয় বৎসর। কারণ ঐ বৎসরেই নলিনীর সহিত আমার ঘনিষ্টতা অত্যন্ত বাড়ে; এবং তাহার জীবনের উচ্চভাবগুলি স্ফূরিত হইয়া তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে।

নদী যেমন আপনার ভিতর আপনাকে রাখিতে না পারিয়া হঠাৎ তীর অতিক্রম করিয়া কত দেশ ভাসাইয়া আপনার পথ করিয়া লয়; নলিনীর ভিতরেও তেমনি হঠাৎ অনেকগুলি উচ্চ চিন্তা ও ভাব আসিয়া তাহার ভিতর যুগান্তর উপস্থিত করিল। এই সময়ে তাহার উৎসাহ দেখিয়াছি। সে উৎসাহ যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। ভয়, নিরাশা কিছুই সে উৎসাহের কাছে তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন হইতে সে সমস্ত ভারতবর্ষকে "আমার দেশ" এবং সমস্ত ভারতবাসীকে "আমার আত্মীয়, এক মায়ের সন্তান" বলিতে লাগিল। আমরা কেন এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত; কিসে আমাদের মঙ্গল হইবে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল। আমাদের উন্নতি পরস্পরের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, এ কথা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল বলিয়াই বিশ্বজনীন্ প্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যেন এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখা সমস্ত বিশ্বে আপনার স্থান করিতে চাহিল; আমি একটু পিছাইয়া পড়িলাম। সে তেজঃপূর্ণ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়া কি আমার সাধ্য? কিন্তু সে আমাকে ছাড়িল না। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিলাম। আমার মতন তাহার অনেকগুলি বন্ধুই ঘুরিতে লাগিল। যেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, কাহারও পলাইবার ক্ষমতা নাই, এমনি সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি! সে বলিত—"আমরা সমস্ত ভাই হিন্দু মুসলমান একত্রে কাজ করিতে না পারিলে আর আমাদের মঙ্গল কোথায়?" "ভাই হিন্দু, মুসলমান্ যাহার ভিতর একটু 'প্রাণ' দেখিতে পাইল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এমন নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রীতি এ দেশে অত্যন্ত বিরল। নলিনীর মৃত্যু উপলক্ষে আহুত সভায় * বাবু দ্বিজদাস দত্ত এম্, এ; এম-আর-এ-এস (M. A. M. R. A. S.) মহাশয় বলিয়াছিলেন—"নলিনীর কথা চিন্তা করিলে আমার মনে হয়, সে একজন প্রকৃত ভারতসন্তান ছিল। আমরা এইরূপ সুসন্তানের অভাবেই দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।" সেই সভায় National School এর প্রোপ্রাইটার ও প্রধান শিক্ষক বাবু হরিশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন—'নলিনী আমাকে এক দিন বলিয়াছিল—'দেখুন আমাকে লোকে বিবাহ করিতে বলে, কিন্তু

* Foot note—ভূতপূর্ব্ব অনারেবল্ বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

আমার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; আমার মাতৃভূমিতে আমি বিবাহ করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবন এখন তাহার জন্য। আমি কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিব ?" কি তেজঃপূর্ণ কথা! কি অটল প্রতিজ্ঞা! এ কথা ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এমন কথা কয়টী ভারত সন্তানের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ?

১৮৯৫—৯৬ সালে চট্টগ্রামে স্বদেশী কাপড়ের খুব আন্দোলন হয়। প্রতি সপ্তাহে ৩।৪টী করিয়া সভা হইয়াছিল। কুমিল্লা নোয়াখালী হইতে যে সমস্ত তাঁতীরা মোটা কাপড় বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, তাহাই অনেকে ক্রয় করিলেন। তাঁতীদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাহারা ইতিপূর্ব্বে এত ধুতি ও চাদর এক সঙ্গে আর বিক্রয় করে নাই। ইহার মূলে আমার প্রিয়তম নলিনী। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে মুহূর্ত্তের জন্যও চট্টগ্রামের লোকের অন্তরে স্বদেশপ্রীতি সঞ্জীবিত হইয়াছিল। ইহা কি কম গৌরবের কথা! সেই দিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নলিনী স্বদেশী কাপড়, চাদর ব্যবহার করিয়াছিল! দৃঢ় প্রতিজ্ঞা —সহজে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না! জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ ঘটনা বশতঃ নলিনীর সেই ভীষণ উৎসাহ স্রোত কিছু দিনের জন্য একটু ম্রিয়মান হইয়াছিল। যে যুবকটীকে সে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত ; যাহার মঙ্গল ইচ্ছা তাহার সতত প্রার্থনা ছিল, সেই সুকুমার বন্ধুটী, বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। এ সংবাদ বজ্রের ন্যায় নলিনীর বক্ষে বাজিল। নলিনী হেলিয়া পড়িল! সেই সময় আমাকে অনেকগুলি প্রাণস্পর্শী পত্র লিখিয়াছিল। এখন সে গুলিই আমার সাত রাজার ধন একমাণিক হইয়াছে! সে সময় কবিতা ও দর্শন শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রায়ই আমাদের কথা হইত। একখানি পত্র হইতে তাহার কয়েকটী ভাব এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "আকাশে হস্তপরিমিত মেঘ উঠিয়া ক্রমে সমস্ত সুনীল গগনে কালিমা ব্যাপ্ত করে। আমাদের প্রাণেও ত তাই! সামান্য একটী দুঃখের ছায়া প্রথম উঠিয়া শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া ফেলে! কিন্তু ইহাতে কি লাভ? Worldly wisdom বলিবে, কিছুই না। Philosophy শির নাড়িয়া বলিবে কিছুই না। কিন্তু Poetry তোমার নয়নে ইহার মধুময়ী ছবি আঁকিয়া ধরিবে। আমি Poetry ভালবাসি। ফুলের মধ্যে বিকাশোন্মুখ মাধুরী দেখিয়া প্রাণ Philosophy ভুলিয়া যায়। ভাই, আমি Poetryর সেবক হইব। কোন্ পথে যাইব? উপদেশ চাই। উপদেশ দিবে ত? তুমি আমার Constitu tion অনেকটা বুঝিয়াছ। তাই তোমাকে বলি ;আর বলিব কাহাকে? যে স্বর্গীয় বন্ধনে তোমার সঙ্গে সংবদ্ধ হইতেছি, তাহা বড়ই অচিন্ত্যপূর্ব্ব। কখনও জানিতাম না ও ভাবি নাই যে, কাঁদিবার সময় তোমার মতন এমনি সাথী পাইব।" নলিনী কবিতারই সেবক ছিল।

"The poetry of earth is never dead :
When all the birds are faint with the hot sun
And hide in cooling trees, a voice will run,
From hedge to hedge about the new-mown mead." (Keats)

ইহাই তাহার হৃদয়ে রসময়ী কবিতা সৃজন করিয়াছিল।

১৮৯৬-৯৭ সালে তাহার হৃদয়ে আর একটী শুভইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। চট্টগ্রামে সাধারণ পুস্তকালয় নাই, এ চিন্তা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অমিত পরিশ্রম করিয়া National School গৃহে "অধ্যয়ন-সম্মিলনী"র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল। কিসে ইহার উন্নতি হইবে; ইহার দ্বারা ছাত্র বন্ধুদের কি কি অসুবিধা দূর হইবে, কেবল ইহাই তাহার প্রধান চিন্তা হইল। নলিনীর বাটী হইতে "সম্মিলনী" প্রায় ২॥ মাইল ব্যবধান হইলেও প্রত্যহ ৫ টার সময় সে সম্মিলনীতে যোগ দিত। তাহার এই সাধু উদ্যম দেখিয়া দেশের অনেক শিক্ষিত (?) লোক কত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল 'ওসব ছেলে খেলা'; কেহ বলিল 'ওকি হয়?' কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রূপ ও নিরাশার অভিনন্দন পত্র তাহাকে দমিত করিতে পারিল না। সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া

আপনার মনে আপনার কাজ করিতে লাগিল। এই সময় তাহার একটী প্রকাণ্ড যুবকদল গঠিত হইয়াছিল। সেই দলের প্রত্যেকেই নলিনীর নামে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, নলিনীর কাছে থাকিতে ভাল বাসিত। যখন "সম্মিলনী" গৃহে বসিয়া সম্মিলনী সম্বন্ধে কোন কথা হইত, তখন নলিনীকে আমাদের মধ্যে সম্রাটের ন্যায় বোধ হইত, যেন তাহার একটী অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত হইতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাহার অভ্যাস ছিল না। সামান্য কথায়ও সাধারণ মত গ্রহণ করিত। যে দিকে ভোট বেশী, তাহাই গৃহীত হইত। ধীরে ধীরে সম্মিলনীর উন্নতি দেখিতে লাগিলাম। একটী দুইটী করিয়া বিদ্রূপকারীরা ইহার মেম্বর হইতে লাগিল। নলিনী দ্বিগুণ উৎসাহে ইহার কার্য্য করিতে লাগিল। সম্মিলনী হইতে মাঝে মাঝে সভা আহুত হইত। একবারের সভায় নলিনী 'কবি ও কবিতা' পাঠ করিয়াছিল; সভাপতি ছিলেন, আমাদের কবিবর নবীনচন্দ্র। 'কবি ও কবিতা' লেখকের উপযুক্ত হইয়াছিল। "সম্মিলনী" হইতে Dr. Martineau এবং John Ruskin র মৃত্যু উপলক্ষে শোক সভা আহূত হইয়াছিল; ইহা সম্মিলনীর—সমস্ত চট্টগ্রামের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। সম্মিলনীর প্রথম সভায় আমাদের ক্ষমতাবান কবি শ্রীযুক্তবাবু শশাঙ্ক মোহন সেন বি-এ, বি-এল্ মহাশয় কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কবি! যাহাকে এত ভালবাসিতে, স্নেহ করিতে, আজ সে কোথায়? যে তোমাকে সম্মিলনীতে যোগ দিতে এবং "আলো" তে কবিতা লিখিতে পিড়াপিড়ি করিত, আজ সে নাই! আর সে তোমায় কবিতা লিখিতে পিড়াপিড়ি করিবে না—নিশ্চিন্ত থাক; কিন্তু যদি তোমার অনিন্দ্যসুন্দর বিশাল হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হৃদিতন্ত্রীতে—

"আমার ক্ষুদিত তৃষিত তাপিত চিত্ত, ফিরে এস!" বাজিতেছে শুনিতাম। সম্মিলনীর জন্য নলিনীর উৎসাহ ও দায়িত্ব চিন্তার কথা তাহার একখানি পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—"ভাই, মহিম বাবুর একখানি পত্রে সম্মিলনীর সঙ্গে তোমার পুনঃ সংশ্লেষ শুনিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে তোমার সহানুভূতিপূত উদ্যম ও কর্ম্মকুশল অধ্যবসায় নিয়োগ করিবে আশা করি। এ সময় দূর বিদেশে স্থিত তোমার স্নেহ-পিপাসু ও সম্মিলনীর মঙ্গলেচ্ছু একটী হৃদয়কে বিস্মৃত হইও না। আমাকে আমাদের "অধ্যয়ন-সম্মিলনী"র বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইও। আমি আর কার কাছে তেমন আশা করিতে পারি? আমাদের ব্যায়াম বিভাগ চলিতেছে ত? মেম্বর কয়জন? উৎসাহ কেমন? কাজ চলিতেছে কেমন? নূতনতর কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি?" ইত্যাদি। নলিনী নাই,—তাহার অধ্যয়ন-সম্মিলনীও মৃতপ্রায়। কিন্তু সমস্ত চট্টগ্রাম-বাসীর পক্ষে অধ্যয়ন-সম্মিলনী একটী স্মরণীয় বিষয় বলিয়া মনে হয়। জাতীয়তা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি কল্পে এখানে এইরূপ একটী সম্মিলনীর অত্যন্ত আবশ্যক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র এখানে একটী Town Hall এবং সাধারণ পুস্তকালয়ে স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই; কবে হইবে, তাহা জানি না।

১৮৯৭ সালে নলিনী কলিকাতায় বি-এ অধ্যয়নার্থ গেল। সেখানে থাকিয়াও স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয় নাই। কিসে আমরা উন্নত হইব, কেমন করিয়া আমরা ভিন্ন জাতি একপ্রাণ হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বিপদের সম্মুখীন হইব, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় মাতিয়া উঠিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি না হইলে আর দেশের রক্ষা নাই। আর দেশীয়েরা বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া এই শুভ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ না করিলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে না। অনেকে মুখে দেশীয় শিল্পের কথা বলিয়া থাকেন

কিন্তু নিজের জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখান না। নলিনী ধনবান হইয়াও স্বদেশী সাধারণ ধুতি, চাদর প্রভৃতি ব্যবহার করিতে একটুও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইত না। সে যাহা হিতকর বলিয়া মনে করিত, তাহাই নিজের জীবনে উদাহরণ দ্বারা দেখাইত; কাহারও মুখাপেক্ষী হইত না; ইহা তাহার চরিত্রের একটী প্রধান বিশেষত্ব। এখানে তাহার একখানি দীর্ঘ পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি "আমাদের বালহৃদয়ের আরো কটী শুভোদ্যমের কথা কিছু বলিব। তাহা আমাদের জাতীয়-শিল্প-রক্ষিণী সমিতি বিষয়ক।' এই শুভ জীবন-সঞ্চারী বিষয়টী ভুলিও না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভ্রাটের সময় ইহার গুরুত্ব শতগুণে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেদিন কবিবর রবীন্দ্র নাথের বাটীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে যে যে কথা হইল, তাহার প্রায় সবি এই * * * সম্পৃক্ত। বরী বাবু প্রভৃতি বিলাতী কাপড় পরিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সমিতিতে যাহা ধার্য্য হয়, তাহা আমাদিগকে জানাইবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে একটী গৌরবে আমার বুক ফুলিয়া উঠে; এই ক্ষেত্রে অগ্রে আমরাই অগ্রসর হইয়াছি, আমি তাঁহাকে আমাদের শিল্পরক্ষণী সমিতির কথা নিবেদন করিলে তিনি মধুর হাসিয়া তাঁহার অভিমতি ও সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। সেই সময়, সরল হাসিটুকু এই দেশীয় শিল্প-আন্দোলন-জনিত আমার সমগ্র পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার স্বরূপ হইয়াছে। তোমরাও বোধ হয় গৌরব অনুভব করিবে। এখন কথা, আমাদের সমিতির জীবন রক্ষণ ও নূতন উদ্যম সঞ্চার! এখানে আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে আশ্রয় করিতে পারি? কাহার দ্বারস্থ হইতে পারি? আমি এ সম্বন্ধে * * * কে একখানি পত্র লিখিয়াছি; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে সম্বন্ধে যাহা বিবেচনা কর, তাহা করিবে। এই সব কার্য্যে তোমার হাতে হাত ও বুকে বুক দিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছে, তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, এই সুন্দর স্থান হইতে (কলিকাতা) আমার হৃদয়খানি সহানুভূতিপূর্ণ করিয়া তোমাদের হৃদয়ে মিশাইতে বিস্মৃত হইব না।" শেষের মধুর কথা গুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে নলিনীর বিশাল হৃদয়, অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেমের নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা এইরূপ জীবনইত চাই। যদি একাধারে প্রেম, বৈরাগ্য এবং উৎসাহে একটী গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাই আমাদের আদর্শ জীবন হইবে। নলিনীর জীবন আদর্শ জীবন।

নলিনী চট্টগ্রাম হইতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। শিক্ষায় চট্টগ্রাম বহু পশ্চাতে; কিসে তাহার স্বদেশীয়গণ শিক্ষিত হইবে, যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবোৎকর্ষের কেন্দ্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্র কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছিল। তাহার এক একটী কথায় এমন জ্বলন্ত সত্য ও স্বদেশপ্রীতি নিহিত ছিল যে, তাহা মৃতপ্রায় অবসন্ন ব্যক্তির প্রাণেও বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিত। তাহার চেষ্টায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেল হইতে "আলো" প্রকাশিত হইল। সমুদ্র যেমন কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে না, বহু নদ নদীকে আপনার বক্ষে টানিয়া লয়; আবার আপনার প্রেম বারি নদ নদীর প্রাণের অন্তস্থলে ঢালিয়া দেয়, আমি নলিনীতেও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছি। কলিকাতায় গিয়া সেখানেও নলিনী আর একটী দল গঠন করিয়াছিল। সকলেই একমন্ত্রে দীক্ষিত। "সিন্ধু সঙ্গীতের" প্রতিভাশালী কবি গাহিয়াছেন—

অগ্রসর, অগ্রসর, ধীরে ধীরে কমিছে আঁধার,
ঘুমাইছে ঝঞ্ঝাঝড়, এস এস বিশ্বপরিবার!
ভাই ভাই দাও দাও কোল,
বল মুখে জয় জয় বোল,
তারাহীন মহাকাশে ভাসে শশী মহা পূর্ণিমার;
ক্ষিতি ব্যোম একাকার, এই মহামহোৎসবে
ভাই ভাই হও একাকার।" (শকারমোহন।)

ইহাই নলিনী ও তাহার বন্ধুগণের মূল মন্ত্র ছিল। যেন ধীরে ধীরে আকাশের এক কোণে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি একত্র হইয়া আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল; কিন্তু হায়! অকস্মাৎ কোথা হইতে মহাপ্রলয়-কারী তুফান আসিয়া সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল; কেহই মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর পাইলনা। "আলো"র প্রথম সংখ্যা পড়িয়া আমি নলিনীকে অনেক ঠাট্টা করিয়াছিলাম; "আলো"র তীব্র সমালোচনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। নলিনী তদুত্তরে লিখিল—"তুমি 'আলো' সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সত্য। তবে আমাদেব সুকুমার উদ্যোগ তোমার নিকট সহানুভূতি লাভ করিবে, আশা করি।" "আমি একটু বিস্মিত হইলাম; কারণ এমন ভালবাসা-মাখা মধুর উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। তাহার সহাধ্যায়ী এবং বন্ধুগণ "আলোর" লেখক হইলেন। তাঁহাদের অনেকের কথাই নলিনীর মুখে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও সহিত পরিচিত নহি। যখন প্লেগ রাক্ষসী কলিকাতাবাসীকে বায়ুবিক্ষোবিত তরঙ্গের ন্যায় কোথায় ভাসাইয়া নিতে লাগিল, তখন কলিকাতায় "আলো" কে বাঁচান কঠিন ব্যাপার হইল। লেখকেরা স্বদেশে চলিয়া যাইতেছেন, প্রেসের লোকেরা পলাইতেছে, "আলো"র নিজের কোন প্রেস নাই,—বড় বিপদ। কিন্তু কর্ম্মবীর নলিনী তাহাতে টলিল না। গগনস্পর্শী পর্ব্বতের ন্যায় প্রচণ্ড বায়ু-চাপেও স্থানচ্যুত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল। নলিনী বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে "আলো" কে আনিতে ভুলিল না। আমরা ছুটিয়া নলিনীকে দেখিতে গেলাম। তাহার বন্ধুগণ সমাগত হইতে লাগিল। সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন, মিষ্ট হাসির বিনিময়। যে দৃশ্য মনে পড়িলে এখনও শরীর হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমি গিয়া দেখিলাম, নলিনী এবার একা নহে, সঙ্গে তাহার অতি আদরের "আলো"ও আসিয়াছে।

ক্রমশঃ।

কটকে।

"যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

কটকে আসিয়া প্রথম দিনে নিম্নশ্রেণী উড়িয়ার মুখে ঐ গানটী শুনিলাম। শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল।

যদি কেহ আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় এবং আর কখন তাহার সহিত দেখা না হয়, যাইবার সময় তাহার যে চেহারা ছিল, চির দিন তাহার সেই চেহারা আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে। আজ বার বৎসর হইল, চতুর্দ্দশ বৎসরের পুত্র হারাইয়াছি। কল্পনায় মনে হয়, তাহার সেই লজ্জাভয়-স্নেহ-প্রীতি-মাখা মুখ খানি লইয়া সে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে! বাঁচিয়া থাকিলে এ বার বৎসরে কত পরিবর্ত্তন হইত, কিন্তু অমরালয়ে পরিবর্ত্তন নাই, সে যেমনটী গিয়াছিল, তেমনিটী আছে।

পঁচিশ বৎসর পরে কটকে আবার আসিয়াছি। কলিকাতা হইতে যখন বাহির হইয়াছিলাম, সে প্রাচীন স্মৃতিটা একবার ঘসিয়া মাজিয়া সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। তখন জাহাজে দুইদিনে চাঁদবালী আসিয়া গরুর গাড়ী চড়িয়া তিনি চারি দিনে কটক পৌঁছিতাম। ছয় দিনের পথ এখন বার ঘণ্টায় আসা যায় —। কিন্তু কটকে রেল আজ দু তিন বৎসর হইতে চলিতেছে। এত অল্প দিনে রেল দেশের অবস্থা বেশী পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই, নিশ্চয় জানিতাম। সুতরাং উড়িয়ার আচার ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন দেখিব, অনুমান করিতে পারি নাই। কটকে আসিয়াই নিম্নশ্রেণী উড়িয়ার মুখে গান শুনিলাম।

"যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

তখন চমক ভাঙ্গিল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উড়িয়া রমণী মোটা সুতার দেশী কাপড় পরিত। আজ কাল দেশী কাপড় অল্প, পাছা পেড়ে বিলাতী সাড়ী ধনী দরিদ্রের ঘরে ঘরে।

তখন স্ত্রীলোকে কাছা দিয়া কাপড় পরিত। অকচ্ছ স্ত্রীলোকের পর্য্যুপাসিত অন্নজল আচরণীয় বলিয়া গণ্য হইত না।

কাছাদিয়া কাপড় পরা যেরূপ কদর্য্য ভাবে সাধিত হইত, তাহাতে লজ্জা নিবারণ হইত না। তথাপি দেশীয় প্রাচীন প্রথা বলিয়া অবাধে চলিত। এবার আসিয়া কাছা দেওয়া স্ত্রীলোক একটীও দেখিতে পাইতেছি না। কাপড়ও পরিবার ধরণ ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মত হইয়াছে।

উড়িয়ানীর সে অলঙ্কার কোথায় গেল? হাত পায়ের অলঙ্কারের ভারে কত সময় স্বামীকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইয়া উড়িয়ানী তাহাকে স্বর্গে পাঠাইত। সে খড়ু, তাড় বিদ ও পাউড়ের বোঝা কখন কখন পনর কুড়ী সের হইত শুনিয়াছি। আজ কাল তাহার একটী দেখিতে পাই না। এয়োৎ রাখিবার জন্য সীমন্তে সিন্দূর ও হাতে বালা, বাহি কি শাঁখা পরে। ভদ্র গৃহের উড়িয়া রমণী ও ভদ্র গৃহের বাঙ্গালী বেশ ভূষায় কোন পার্থক্য নাই। বারাঙ্গনাদেরও বেশ ভূষা এইরূপ। দরিদ্র গৃহে খড়ু ও তাড় স্থানে বাহি ও শাঁখা ব্যবহার হয়। পাউড় পল্লিগ্রামে চলিয়া গিয়াছে।

তখন নদীর ধারে বসিয়া স্ত্রীলোকেরা এক হাত দেড় হাত লম্বা একটা খেজুর ডাল লইয়া দাঁত ঘসিত। একটা দাঁতন দু চারি বৎসর চলিত! মুখ ধোয়া হইলে একতাল হলুদ ও এক বাটী তেল গায়ে মাখিত। এখন মুখ ধোয়া ও তেল মাখা গৃহে সমাধা হয়। হলুদ মাখা উঠিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধেরা এ পরিবর্ত্তন রোধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু নারী-বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সম্রাট লুই যখন অক্ষম হইয়াছিলেন, উড়িয়া বৃদ্ধেরা অক্ষম হইবেন, আশ্চর্য্য কি?

বেশ ভূষায় উড়িয়ানী বাঙ্গালীর প্রতিকৃতি। কিন্তু পিকা চুয়া ও গুণ্ডী ব্যবহার ছাড়েন নাই, কখন ছাড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না। বরং বাঙ্গালিনীকে উহাদের ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়াছেন। গুণ্ডী ও চুয়ার চালান এখন অনেক বাড়িয়াছে। উড়িয়া পুরুষদের বেশ ভূষার পরিবর্ত্তন সামান্য হয় নাই, তখন ঘাড় কামান ও লম্বা টিকি সকলের দেখিতাম। এখন শতকরা কুড়ি জনের দেখা যায় না। যাহারা কিছু মাত্র লেখা পড়া শিখে নাই, তাহারাও টিক রাখে না বা ঘাড় কামায় না। দেখিলে বাঙ্গালা কি উড়িয়া, বুঝা যায় না।

গায়ে সাদা চাদর কি একটা জামা দেখিলে তখন বাঙ্গালী বলিয়া চিনিয়া লইতাম। বিদ্যালয়ের বালকদের মধ্যে তখন শতকরা কুড়ি জনে জামা পরিত, এখন জামা গায় নাই, এখন একটী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তখন তিন শত ছাত্রে দশ জনের পায় জুতা দেখিতাম, এখন দশ জনের পায় জুতা না থাকিতে পারে। তখন উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ পান খাইতেন না, পানে যে চুণ আছে। আজ সম্মাননীয় সুপণ্ডিত আশী বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে পান খাইতে দেখিলাম।

বাহিরে বাহিরে এই কয়দিনে যাহা দেখিলাম, তাহাই লিখিলাম। ঘরের ভিতরে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। বাড়ী গুলিতে এখন জানালা রাখা হয়, বাঙ্গালীর বাড়ীর মত আলোক ও বাতাস প্রবেশ করে, বোধ হয় গৃহসজ্জা ও অন্যান্য বিষয়েও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদি চুয়া গুণ্ডী বিদায় লইত!

সহরে যত পরিবর্ত্তন, পল্লীগ্রামে তত হইয়া থাকিবে সম্ভব নহে। কিন্তু কিছুই যে হয় নাই, তাহাও নহে। তখন সহরে পরিবার আনা নিষিদ্ধ ছিল। কোন ভদ্র লোক সহরে পরিবার আনিতেন না। এখন সে দোষ কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং সহরের সভ্যতা পল্লি গ্রামেও যে কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, অনুমান করা যাইতে পারে।

পরিবর্ত্তন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালী উড়িয়ার আদর্শ। পূর্ব্বকালে উড়িষ্যা দক্ষিণাপথ হইতে সভ্যতার আমদানী করিয়াছিল। উড়িষ্যার প্রধান রাজ

বংশ মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিলেন, নাগপুর হইতে মারহাট্টারা গত শতাব্দীতে উড়িষ্যা প্রভাবিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী রাজা নহে, তথাপি বাঙ্গালী এক প্রান্তে আসাম ও অন্য প্রান্তে উড়িষ্যার আদর্শ হইয়াছে। পূর্ব্বে আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর তাহা উঠিয়া গিয়াছে। আচার ব্যবহারের সঙ্গে যদি এই দুই প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিত, তবে একীকরণ কত অগ্রসর হইত? ভাষা ভিন্ন হইলেও, ভাবে আসামী, বাঙ্গালী ও উড়িয়া এক হইয়া উঠিতেছে। কি করিয়া বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসামীর আদর্শ হইল, চিন্তার বিষয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

হেম-কলস।

'কিনি' 'কিনি' কিঙ্কিনি বোলত মধুর,
রূপ গাথা 'কঙ্কণ' ঘোষয়ে প্রচুর,
কানাড়া ছাদনে গুম্ফিত কবরী,
মালতী মালিকা তাহার উপরি,
তনুরুচি, পঙ্কজ—মৃদুল বিকাশ,
প্রেমভরা অন্তরে, চামেলী সুবাস;
নবীন যৌবনে প্রফুল্ল গুরুয়া,
সুনীল নিচোলে আবরি তনুয়া,
ধনি বনি রঙ্গিনী, কুঞ্জর গমনে,
একু একু ভ্রমিছে নিকুঞ্জ ভবনে।
পুষ্পিত কাননে মলয় সমীর,
হরষে কম্পিত, বিকল অধীর,
শাখী শাখে, কোকিল পঞ্চম তানে,
ঢালি দেয় মরন্দ, জনু সব প্রাণে;
উগারে মাধুরী শ্যামল লতিকা
ঢালিছে সুরভি, নবীন যূথিকা,
বিচকিত 'সম্বর,' নয়ন প্রসারি
রসবতী অম্বর যতনে নেহারি
প্রেম মাখা অপঘন, অপঘন প্রেম
রাধা নহে সুধুরাধা, সুধা ভরা হেম।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বিদেশিনী।

কলস্বরা মন্দাকিনী আনন্দ-সলিলে
বেষ্টিত কনক-কান্তি অমর-নন্দনে
পুষ্প-বিরচিত পথে ভ্রমিবার কালে,
উদাসিনী স্মৃতি, তথা কহিল কি তোমা
সুদূর মর্ত্ত্যের বার্ত্তা? ভাসিল কি মনে,
নির্ম্মল শারদাকাশে পূর্ণচন্দ্র সম,
অতীত সুখের স্বপ্ন, অভিনব সাজে?
নিষ্পেষিত হৃদয়ের অনল-যাতনা
স্মরিয়ে কেঁদেছে প্রাণ, কুসুম কোমল,
নীরব নিশীথে তাই দাঁড়ায়ে শিয়রে
মনোরমা শান্ত বেশে, স্থির, অচঞ্চল,
ঢালিতে আশ্বাস বাণী, অমৃত নির্ঝরে
"অচির বিচ্ছেদ এই—অনন্ত অপার
প্রণয়ের পুণ্য রাজ্যে মিলিব আবার"।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

নদী।

অবিরত শুধু কল কল,
কোন্ সমাচার ল'য়ে কোথা যাস বল?
কত বিরহীর ব্যথা,
নিরাশার আকুলতা,
তোর ওই কল গানে যেন উছলায়!
তোর—উন্মাদিনী প্রাণ কারে চায়!

তালে তালে নাচিয়া মোহন!
কত ভূত ভবিষ্যৎ করাও স্মরণ।
কখনো বালিকা বেশে,
মৃদুল মধুর হেসে,
তারাবধূ-সহ খেল কি খেলা মহান্।
শত আঁখি ল'য়ে করি পান।

যৌবনের তীব্র সম্মিলনে,
কি খেলা খেলাও সতি! বীরাঙ্গনা সনে।
হৃদয়ের শশধরে,
আছাড়ি গরব ভরে,

চুমিছ উন্মত্ত প্রাণে বেলার বদন,
কি অপূর্ব্ব সে প্রেম মিলন।

তোর সেই প্রেম আলিঙ্গন,—
পারেনা সহিতে তার সে ক্ষুদ্র জীবন।
সব বাধা পায়ে ঠেলে,
আপনা হারায়ে ফেলে,—
কতজন পদ ল'য়ে লইছে শরণ
তোরবুকে—কি চিত্র ভীষণ!

তরি গুলি যায় তর্ তর্
তোর যে আক্রোশ ভরা তাদের উপর।
নাহি দয়া নাহি মায়া,
কিবা সে কঠোর ছায়া,
শুধু লোল জিহ্বা তোর বলে "দাও দাও"
প্রকৃতিও বলে নাও নাও।

নিজ পাশে টানি তরিদল,—
গ্রাস যে কতবুকে শোক অশ্রুজল।
কেনলো যৌবন বেলা,
তোর এ ভীষণ খেলা,
বল্‌না কাহার ভাবে এমন বিভল!
কিবা গাস ক'রে কল্ কল্!

তুইকি তাপিত আঁখিজল?
সারাবিশ্বে না পাইয়া দাঁড়াইতে থল—
ছেন উন্মাদিনী বেশে,
ধাস কি অনন্ত দেশে,
আমার মাথার কিরে সত্য ক'রে বল!
মোরে তবে সাথে ল'য়ে চল।

আমার এ হৃদয়-নদীর—
অনন্ত উচ্ছ্বাস কত ভাঙিছে দুতীর।
কতস্তূপাকার স্মৃতি,
দহিতেছে মোরে নিতি,
সে তীব্র অনল শিখা নিবাইয়া দাও।
পূতবুকে মোরে টেনে নাও।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

মানব-জন্ম।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে
ছিলাম অজ্ঞাত, অজ্ঞ, নিদ্রিত, নীরব,—
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, স্থির, অচঞ্চল,
সুখহীন, দুঃখহীন, সত্য-সিন্ধু-কণা,
কম্পহীন দীপ যথা নির্ব্বাত নিলয়ে!
কে পেয়ে সন্ধান, মোরে দিল মোহ-জ্ঞান?
জাগায়ে আনিল এই স্বপ্নময় দেশে!—
কোলাহল, অস্থিরতা খেলিছে প্রাঙ্গণে;
সত্যহীন সুখ দুঃখ ধাঁধিছে নয়ন!
মহাধ্যান্-সিন্ধু-নীরে ছিলাম মগন
মুদিত নয়নে, বাহ্য জ্ঞান বিরহিত;—
বলে নাই কেহ কিছু, জিজ্ঞাসেনি মত,
কখন আপন মনে ধ্যান-মগ্ন-জনে
আনিয়াছে নীরহীন শুষ্ক মরু মাঝে!
নীরবাসী—জানেনা সে স্থলের বারতা,
নিদ্রিত সে—জানে না কো জাগ্রতের কথা,
নীরব সে, জানে নাকো শবদের রীতি,
সুস্থির সে, জানেনা কো অস্থিরের গতি!
কে আমি? কি হেতু জন্ম? কেন যাওয়া আসা?
ঘোরা ফেরা, সুখ দুঃখ উত্থান পতন?—
কারে আমি বলিয়াছি চরণে ধরিয়া,
জন্মিতে মানব হ'য়ে এ ধরণী মাঝে?—
কে দিবে উত্তর হায়! কারে জিজ্ঞাসিব?
অনন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে আছে দাঁড়াইয়া!
নাহি পাই আদি অন্ত সৃষ্টির কারণ!
কেবলি সংশয়, আর কেবলি স্পন্দন,
নাচিছে অদৃষ্ট, দৃষ্ট ধাঁধিয়া নয়ন!
কোথা আজ? কোথা কাল? কি আছি কি হ'ব?—
কোথা স্নেহ, কোথা মায়া, অন্তরের টান,
প্রেমের বন্ধন হায়! হৃদয়ের মহা আকর্ষণ!
অশক্ত বলিতে নর এসব বারতা!
দুর্ব্বোধ অবস্থা হায়! নিয়ন্তা নরের!
নর-জন্ম, দাস-জন্ম; দুর্ব্বল, দুর্ব্বহ!

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

ইটের বই।

৺ পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের উৎপত্তি, উন্নতি ও উদ্বৃত্তির কৌতুককর বিবরণ-মালা, অতীব মনোনিবেশ সহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিলে, জ্যামিতির সংজ্ঞার ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া প্রমাণীত হয় যে, স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন এবং শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত জগতের কোনও জাতিই উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ফ্রান্স দেশের সীন্ (Seine) নামক সুন্দর নদবরের উপকূল-স্থিত দরিদ্রপর্ণকুটীরে প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া, যে মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মা (Monseiur Reabox) পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের আদি, উৎপত্তি, উন্নতি, স্থিতি এবং বিস্তৃতির বিচিত্র ইতিহাস আলোচনা করতঃ ধরাধামে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর তিন সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, মৃতপ্রায় সমাজকে, পদানত জাতিকে, অধঃপতিত মানবকে এবং ধর্ম্মবিহীন আত্মাকে পুনর্জ্জীবিত, জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতায় মন্ত্রপূঃত করিতে হইলে, স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। একখানি নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক দর্পণকে মুখমণ্ডলের সম্মুখে অবস্থাপন করিলে যেমন তাহাতে স্বকীয় প্রতিকৃতি অতি পরিষ্কার রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হওয়া যায়, স্বদেশীয় সাহিত্য-মুকুরে সেইরূপে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ এবং স্বজাতির আকৃতি, প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, উন্নতি, উৎপত্তি, অবনতি, অবরতি, শিক্ষা, বিভিক্ষা প্রভৃতির সম্যক পরিচয় লাভে অতি সহজে সমর্থ হওয়া যায়। বাস্তবিক আধি-দৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নামক ত্রিতাপ হরণ করিবার জন্য সাহিত্যই আমাদের প্রধান সহায়। এই জন্যই জাতীয় ভাষার আলোচনায় সভ্যজাতি সতত সমুৎ-সুক; এই জন্যই সংগীতাচার্য্য নিধু বাবু গাইতেন—

> "নানা দেশে নানা ভাষা
> বিনা স্বদেশীয় ভাষা
> পূরে কি আশা ?"

এই জন্যই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিতেন "বাঙ্গালায় মা বলিলে মনে যে মাধুর্য্য হয়, ইংরাজিতে Mother বলিলে তেমন হয় কি ?" এই জন্যই মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স অষ্টাবিংশ প্রকার ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াও বলিয়াছিলেন, "আমার মাতৃভাষা ইংরাজির আলোচনায় আমি যে আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করি, তাহা অন্য কোনও ভাষাতে প্রাপ্ত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" মাইকেল মধুসূদন বলিতেন "আমি যতগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, তাহার সমুদয়ের একত্রিত মূল্য, আমার মাতৃভাষা বাঙ্গালা অপেক্ষা শতগুণে ন্যূনতর।" এই ভাবাই ইউরোপীয় মাইকেলকে ভারতীয় মাইকেল করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ, মানব সমাজশরীরে সাহিত্য যেন নাড়ীবৎ অবস্থান করি-তেছে; মানবের দেহস্থিত নাড়ীতে যেমন তাহার ধাতু (Pulse) বাঁধা থাকে, সমাজ-

শরীরের সাহিত্য-নাড়ীতে জাতির ধাতুও সেইরূপ বাঁধা রহিয়াছে।

পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে মানবজাতি স্বকীয় মনোভাব অভিব্যক্ত করিবার জন্ত যে সকল কৌতুককর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে লিখন (writing), পঠন (Reading) এবং কথন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু রসনার অধিকার ভুক্ত, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্থিরতা নাই, কিন্তু যাহা কিছু লেখনীর আয়ত্বাধীন, তাহা বংশপরম্পরায় স্থির থাকিয়া চিরস্থায়ী রূপে পরিণত হইতে পারে, এই জন্তই চিত্রণ (painting), খোদন (Engraving), অশ্মাঢ়ণ (lithographing), হিরোগ্লিফ্ (Hieroglyphs), ক্রমোগ্রাফ্ (Chromograph), মিউকোগ্রাফ্, উইকোগ্নীফ্ প্রভৃতি প্রণালী অনুসারে লিখিবার প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুর অপৌরুষেয় শ্রুতিশাস্ত্রে, মুসলমানের কোরাণে এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে শব্দ "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত; যদি লিখন প্রণালীর সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে শব্দের ব্রহ্মত্ব প্রতিপালিত হওয়া কঠিনতর অপেক্ষা কঠিনতম হইয়া উঠিত, এই জন্তই বেদান্ত বলিয়াছে—

"ঈক্ষতে র্নাশব্দং"

[বেদান্তসূত্র]

লেখনী সহায়ে লিখিত এই শব্দমালা সংক্ষিপ্ত বা বিশদ কিম্বা বিক্ষিপ্ত বা একত্রিত রূপে সংগৃহীত হইলেই পুস্তকের প্রথম উৎপত্তি হয়; পুস্তকের প্রচার দ্বারাই সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয় এবং সেই পবিত্র সাহিত্য অবশেষে নানা উপাধিতে অভিহিত হইয়া জাতির মর্য্যাদা, গৌরব, শক্তি খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতির সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া পূজনীয় হইয়া উঠে। এই জন্তই প্রাচীন পুস্তককে-রক্ষা করা সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা; এই জন্তই ব্রহ্মস্বরূপ শব্দ-মালাকে একত্রিত করিয়া পুস্তকাদির প্রণয়ন করা প্রাচীন জাতির পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহাদের লিখিত বা সংগৃহীত শব্দ মালা অবশেষে পুস্তক, গ্রন্থ, পুঁথি, বই, বুক্, বিব্লিয়স্, কেতাব, কল্মা, নিয়োশ্, নিমশ্, কেরেক্‌া, তক্তাই ইজিফান্ প্রভৃতি একশত সপ্তবিংশাধিক উপাধিতে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা করা অত্যন্ত আনন্দ, আমোদ ও কৌতুকের বিষয়। মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সেই ভাবটীকে বংশ পরম্পরায় রক্ষা করিবার জন্ত কত প্রকার অদ্ভুত পুস্তকাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। অদ্যকার এই কৌতুককর প্রবন্ধে এইরূপ একখানি অত্যদ্ভুত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য।

ভূর্জ্জ পত্রে, তাল পত্রে, তমাল পত্রে, মেষ চর্ম্মে অথবা কাগজে লিখিত কিম্বা মুদ্রিত পুস্তক অনেকে দেখিয়াছেন, পড়িয়াছেন, অথবা শুনিয়াছেন, কিন্তু ইটের বই কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কেবল 'আগা গোড়া' ইট!—গাছের পাতা নহে, বৃক্ষের বল্কল নহে, ভেড়ার পার্চমেণ্ট নহে, কিম্বা দেশী বা বিলাতী কাগজ নহে—কেবল আগা গোড়া ইট! কেবল আগা গোড়া ইট! এমন অদ্ভুত পুস্তকের বিবরণ কখনও কাহারও শ্রুতিগোচর হইয়াছে কি? পুরাকাল হইতে সাহিত্যের অধুনাতন অত্যুন্নতির কাল পর্য্যন্ত লেখকেরা যে সকল বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, এই অপূর্ব্ব পুস্তকে তাহার একটী অক্ষরও

ব্যবহৃত হয় নাই ; মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য লেখকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল মসী বা লেখনীর সহায়তায় লিপি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদনুরূপ কোনও মসী বা লেখনী এই অদ্ভুত পুস্তকের লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই ; পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিবার জন্য সকল দেশে, সকল সমাজ এবং সকল ভাষায় গণিত শাস্ত্রের ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু এই অদ্ভুত গ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে পাতায় পাতায় ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন দ্বারা পত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; সাহিত্যামোদী সুধীগণ বলিতে পারেন কি, এই অত্যাশ্চর্য্য পুস্তকের অস্তিত্ব কোথায় ?

মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কাগজের পাতাগুলি ক্রমান্বয়ে উল্টাইয়া লইতে হয় ; আমাদের প্রস্তাবশির্ষোক্ত অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে ইটের পর ইট, তাহার পর ইট উল্টাইয়া লইতে হইবে ; কখনও কখনও রাশি রাশি ইষ্টক উল্টাইতে উল্টাইতে পাঠকের ক্ষীণ হস্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠে, সুতরাং নিকটে কোনও সহযোগী পাঠক কিম্বা কোনও বলবান মজুর (cooly) উপস্থিত না থাকিলে পাঠককে পরিক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় ; কখনও বা রাশিকৃত ইষ্টক সমাবৃত স্তূপের মধ্যে উপবেশন বা দণ্ডায়মান হইয়া পাঠককে পঠন ক্রিয়া সমাপন করিতে হয় ; এই অত্যাশ্চর্য্য পুস্তকের আকৃতি, অক্ষর, ভাষা ও ভাব দেখিলে সাহিত্য জগতের ধুরন্ধরগণ কিম্বা প্রত্নতত্ত্বসমাজের প্রাড়বিবেকগণ গালে হাত দিয়া 'কাশী যাই কি মক্কা যাই' ভাবিয়া আকুল হইবেন। প্রস্তাব শীর্ষোক্ত ইটের বই জগতে অপূর্ব্ব পদার্থ—এক অভিনব আশ্চর্য্য আবিষ্কার ! ! সাহিত্য জগতে এমন অদ্ভুত গ্রন্থ আর আছে কি ?

যাঁহারা লাইব্রেরী সাজাইতে ভালবাসেন, এই অদ্ভুত গ্রন্থের এক অধ্যায়েতে তাঁহাদের লাইব্রেরীকে এক বিপুল বপুর পুস্তকালয় রূপে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে। মিশরের হাইরোগ্লীফ্ কিম্বা কিউফায় কুফ্রা অথবা পোলাণ্ডের সোবিঙ্কি অক্ষর হইতেও এই 'ইষ্টক-নির্ম্মিত পুস্তকের' অক্ষর অধিকতর কৌতুকাবহ। কৌতুকের আরও কারণ এই যে, সকল সভ্য সমাজেই লেখকেরা স্বহস্তে লিপি কার্য্য সমাপন করেন, অথবা সময় বিশেষে নিযুক্ত লেখককে নিকটে বসাইয়া বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনা (Dictate) করিতে থাকেন এবং লেখক তাহা লিখিয়া লইতে থাকে ; কিন্তু এই ইটের বইয়ের লিখন কার্য্য নিরক্ষর কুলি বা মজুর বা মিস্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হয় ; যিনি গ্রন্থের প্রণেতা বা প্রকাশক, গ্রন্থের লিখন কার্য্যের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই ; এখনকার কালে মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর-সংযোজকগণ (compositors) গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ "কম্পোজ" করিয়া দেন বটে, কিন্তু কম্পোজিটারের বর্ণমালায় জ্ঞান আছে. ভাষার উপর যৎকিঞ্চিৎ অধিকারও থাকে, কিন্তু ইটের বইয়ের লিপিকর ভাষা বুঝে না, রচনা বুঝে না, বিষয় বুঝে না, অক্ষরের নাম জানে না, অথচ সেই ব্যক্তিই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের অপূর্ব্ব লেখক ! ! এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিস্ময়াত্মক বিবরণ পাঠ করিতে কাহার কৌতুহল না জন্মে ?

স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের

শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল সাহিত্যামোদী সৎপুরুষেরা অতীব অধ্যবসায়, অত্যন্ত অনুসন্ধান, অতিশয় অনুরাগ এবং নিতান্ত সাবধানতার সহিত পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট এ কথা অবিদিত নাই যে, কেবল হংসবংশ ধ্বংস করিয়া "কুইল্" (quills) বা কলমের দ্বারায় পৃথিবীর ৪৬১ প্রকার ভাষার বর্ণমালা লিখিত হয় নাই।* কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি নানা উপাদানে লেখনী নির্ম্মাণ করিয়া জগতের লেখকেরা লিপিকার্য্য সমাপন করিয়াছেন; 'ইটের বই'য়ে ইহাদের কোনও প্রকারেরই লেখনী ব্যবহৃত হয় নাই। সাহিত্য জগতের সহিত যে সকল পণ্ডিতের দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ আছে, অথবা বহুবর্ষ কাল ব্যাপিয়া যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের নিকট মসীর ইতিহাস এখনও অশ্রুত, অজ্ঞাত এবং অপঠিত। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত লেখনকার যত প্রকার মসী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সকলে তাহাদের নাম বা উপকরণ গুলি শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছেন কি? প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত 'ইটের বই'য়ের লিখন কার্য্যে কি প্রকার মসী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়ীকরণ জন্য আমাদিগকে মসীর ইতিহাস আড়োলন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম, জগতে যত প্রকার মসী ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে, 'ইটের বই'য়ে তাহাদের একটীও ব্যবহৃত হয় নাই। অনেক দিনের অনুসন্ধানে আমরা ৫৩ প্রকার মসীর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি; এই সকল মসী কোনও না কোনও সময়ে লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলির ব্যবহার এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল মসীর বিবরণ অতীব কৌতুকাবহ, প্রস্তাবের বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল কথার এখানে প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল ইটের বই সম্বন্ধে যাহা লিখিবার আছে, তাহাই লিখিয়া যাইব।

যে তুরস্কের নামে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ হিংসায়, ঘৃণায়, ক্রোধে এবং কখনও কখনও ভয় ও লজ্জায় ভিন্নমনা হইয়া পড়েন, সেই তুরস্কের শাসিত ও অধিকৃত সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে প্রাচীনকালের অসংখ্য পণ্ডিতের আবাস ভূমি ছিল। আসিরিয়া (Assyria) এবং আল্জিজিরা নামক দুইটি ক্ষুদ্র দেশের মধ্যবর্ত্তী মেসোপোটেমিয়া (Mesopotamia) নামক বিখ্যাত বিভাগে বাবিলন (Babylon) নামক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মহানগর এখনও বিভববিহীন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রীক পণ্ডিত হিরোদোতসের সময়ে এই সহরের এক এক দিক সার্দ্ধ সপ্তক্রোশ দীর্ঘ ছিল, এখনও ইহার প্রাচীরের উচ্চতা ২০০ শত কিউবীক্ ফিট্। খ্রীষ্টীয় ২২৩২ পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হয়; বাইবেলের (Genesis) নামক পুস্তকের দশম অধ্যায়ে "সীনার" জাতিদিগের ইহা আবাসভূমি বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। বাবিলনের 'নেবো' নামক দেবতার পরম প্রিয় নরপতি নেবোকড্নেজার (Nebochadnezzar) এখানে বহু-

* ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণা এবং বহুকাল-ব্যাপী আলোচনা দ্বারা স্থির করিলেন যে, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সভ্য সমাজে ৪৬১ প্রকার ভাষা বর্ত্তমান আছে। ইহার অধিক সংখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু ৪৬১ প্রকার মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাল রাজত্ব করিয়া খৃষ্টের ৫৬১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। পারস্যের সাইরশ্ (Cyrus) এবং গ্রীশের আলেক্জন্দর (সেকেন্দর সা) এইখানেই ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। বাবিলন শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের দ্বারদেশ," সুতরাং পুরাকাল হইতে ইহা পবিত্র বলিয়া অনেক জাতির নিকটে প্রসিদ্ধ। মেশোপোটেমিয়া বিভাগের আসিরিয়া প্রদেশস্থিত বাবিলন নগরে এই অদ্ভুত ইটের বই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বয়ক্রম ছয় সহস্র বৎসর। খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণের চারি সহস্র পূর্ব্বে ইহা প্রণীত হইয়াছিল; তদপেক্ষা ইহার বয়স আরও অধিক কিনা, জানা যায় নাই।

পরিব্রাজকেরা যখন সর্ব্ব প্রথমে এই গ্রন্থকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইহাকে গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, ঐ গ্রন্থের অক্ষর যে কোনও ভাষার অক্ষর অথবা ইহার কোনও অর্থ বা উচ্চারণ আছে, কিম্বা ইহা যে কোনও বর্ণমালার আদি, কেহই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইহার কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্পেনদেশীয় কোনও প্রাজ্ঞ পরিব্রাজক ইহা আবিষ্কার করেন।* ক্রমে ক্রমে তের খানি ইটের বইয়ের আবিষ্কার হয়। আকারে ও প্রয়োজনীয়তায় ইহাদের মধ্যে যে খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহারই বিশেষ ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। অপরাপরগুলি পুস্তিকা, এই খানিই প্রকৃত পুস্তক বা গ্রন্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আসিরিয়গণ সূর্য্যোপাসক ছিল, এই সৌরগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদিতম শাস্ত্রের নাম "অন্তক্" (Antoch) ইহা তাহাদের বেদ বলিলেই হয়। প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত ইটের বই খানি এই আসীরিয় বেদ অথবা অন্তক। যে ভূমি খণ্ডে এই অন্তক শাস্ত্র অবস্থিত, তাহার দীর্ঘতা ¼র্থ মাইল, প্রশস্ততা প্রায় তদ্রূপ; প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূমি square সমচতুষ্কোণ। ঐ ভূমিখণ্ডের উপরে মোটা অর্থাৎ মসৃণ লোহার বহু সংখ্যক পাৎ সমূহ প্রসারিত আছে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইলেও লোহের শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পর সংযোজিত আছে; ঐ শৃঙ্খলের সংযোগ স্থল সমূহ এত সুকৌশলে অথচ সুদৃঢ়রূপে অবস্থিত যে, সহজে তাহা চিনিয়া উঠা ভার। পাতের সংখ্যা অধিক নহে, মোটে নয়টী; ইহাতেই বুঝুন, পাতগুলি কত বড় বড় আকারের। ভূমির উপরে লোহার পাৎগুলি প্রসারিত থাকায়, পাতের উপস্থিত ইষ্টক সমূহ কোনও উপায়েই নষ্ট বা জীর্ণ বা ক্ষয়গ্রস্ত হইতে পায় না। ঐ পাৎসমন্বিত ভূমি খণ্ডের নাম "কুরীদা" বহুবচনে কুরীদন্। এই কুরীদার উপরে এক এক খানি করিয়া অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক প্রসারিত আছে; ইটের উপরে ইট, ইটের উপরে ইট, তাহার উপরে ইট; এই রূপে চতুর্দ্দিকে ইট সাজান। প্রাচীরাদি প্রস্তুত করিতে হইলে ইটের উপরে ইট বসাইয়া মশালা দিতে হয়, কিন্তু এস্থলে মশালা দেওয়া হয় না, সুতরাং যখনই ইচ্ছা ইট তোলা যায়, আবার বসান যায়। ইট গুলি ছোট বড় নাই; শত হউক, সহস্র

* "They had been seen by travellers, but no one seems to have dreamed that these strange marks could have any meaning. It was a Spanish ambassador, who, on a visit to Persepolis in 1618, first conjectured that those signs must be characters in some unknown language, and he had a line of their copied. Through the labours of successive scholars the characters have been deciphered, and numerous books have been translaed."
—Assyria" by Sayce p. 99.

হউক, লক্ষ হউক, সংখ্যায় যতই হউক না, সকল ইট গুলি আকারে সমতুল্য হওয়া চাই। এইরূপে ক্রমাগত ইট্ সাজাইয়া গেলে যখন সাজান শেষ হয়, তখন ইহার আকারও 'কুরীদা'র আকারের মত হইয়া থাকে, শোভার জন্য কেন্দ্র স্থলে অথবা ঠিক মধ্য স্থলে ষড়কোণ বিশিষ্ট খুব স্থূল স্তম্ভ এবং ঐ স্তম্ভের উপরে ধনুর্ব্বাণাকৃতি একটা মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। অনুতকের উচ্চতা কলিকাতার গড়ের মনুমেণ্ট (monument) হইতে কম হইবে না; স্তম্ভের পরিধি মনুমেণ্টের পরিধির প্রায় সমতুল্য। কিঞ্চিৎ কম হইলে হইতে পারে; ধনুর্ব্বাণাকৃতি ইট তাহাদের সূর্য্য-দেবতার মূর্ত্তি, ইহার উচ্চতা ২৬ হস্ত। সমুদয়ে এক প্রকাণ্ড পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সকল ইটের গাত্রে 'অস্তুকের' কবিতা আছে; এক খনি ইটের দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া পরে পরে অপর ইটখানির দুই পৃষ্ঠা পড়িতে হইবে; এইরূপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ক্রমান্বয়ে ইটগুলি পড়িয়া যাইতে হইবে। প্রথম ইষ্টকে কোনও চিহ্ন নাই, দ্বিতীয় ইষ্টকে সূর্য্যের, তৃতীয় ইষ্টকে চন্দ্রের, তৃতীয় ইষ্টকে 'অরুণা' নক্ষত্রের, চতুর্থ ইষ্টকে গাড়ু পক্ষীর, পঞ্চম ইষ্টকে মৎস্যের, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল ইটের উপরে ছবি আছে; ছবিগুলি উপরিভাগে বড় বড় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য, অর্থে ১, চন্দ্র অর্থে ২, অরুণা নক্ষত্র অর্থে ৩, গাড়ু পক্ষী অর্থে ৪, মৎস্য অর্থে ৫ ইত্যাদি। আসিরিয়ার সৌরদের বিশ্বাস, সৃষ্টিপ্রকরণে প্রথমে সূর্য্য, তৎপরে চন্দ্র, তাহার পরে অরুণা, তদন্তর গাড়ু, তাহার পরে মৎস্য ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়; সুতরাং ইটের বইয়ের পাতা ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন হয় না। 'অস্তুক পুস্তকে কত ইট আছে, এখনও তাহার সংখ্যা হয় নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত একখানিও ইট নষ্ট হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি যতনে রক্ষিত আছে। গ্রন্থের শ্লোক সমূহ ছন্দোবন্ধে বিরাজিত, কিন্তু ছন্দ বলিলে এখানকার কাব্যছন্দের কবিতা মত দেখা যায় না, কোরাণের "আয়েতের" মত অদ্ভুত কবিতাময় গদ্য মত দেখায়। কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা শুনিলে পাঠকের মনে অস্তুকের কবিতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে। কোরাণের গদ্যময় কবিতা এই—

আল্‌হাম্ দোলিল্লাহো রব্বিউল্ আলমীন্।
বিস্‌মোল্লা আল্‌রহমা নীর রহীম্।
মালিকে ইয়ামুদ্দীন্।
ইয়াকা ন বুদো ইয়াকা নস্তাইন্।
ইহ দিনশ্ সরাতীল্ মুস্তকীমা।
সরাতীম্ লজীনা অনাআম্‌তা আলেহিম্।
গয়েব উল মুক্‌দুবে আলেহীম্।

বলদ্ দোয়াল্ লীণ।

অস্তুকের কবিতা ঐ রূপ। শব্দ সমূহের উচ্চারণ য়িহুদীদিগের হিব্রু ভাষার ন্যায়; অক্ষর গুলি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে (পারস্য ভাষার ন্যায়) লিখিতে হয়। ইট্ গুলি মাটীর কিন্তু দগ্ধ ইট্; ইট গুলি চতুষ্কোণ, বর্ণ লাল। সকল ইটের আকার প্রায় সমতুল্য। অক্ষরের আকার ধনুকের ন্যায়; বর্ণমালা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সকল অক্ষরই ধনুর আকার বিশিষ্ট; সহজে একটা অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরকে বিভিন্ন করা যায় না, অথচ সকল অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন। দুঃখের বিষয়, চিত্র দিয়া আমরা

অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিলাম না। সাধারণতঃ ইংরাজী পুস্তকের ছাপা T অক্ষরের আকৃতির মত। অতি কষ্টে কবিতাগুলি পাঠ করা যায়, কারণ ইহাদের ভাষায় Punctuation নাই। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় মাথু, মার্ক প্রভৃতির New Testament (বাইবেল) স্থিত Gospel সমূহের কবিতা যেরূপ punctuation শূন্য হইয়া লিখিত হইয়াছিল, ইহাও তদ্রূপ; নমুনা স্বরূপ, মনেকর "Death was met by him with calmness and resignation" এইটী লিখিতে এইরূপে লিখিত হইবে—

"Dethwasmetbyhimwithcalmnessand-resignation"

দেখিলেন, শব্দ সমূহ কেমন ঘন ঘন ভাবে সংযোজিত, মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ বা ব্যবধান নাই। বাঙ্গালা ভাষায় নমুনা দেখুন মনে কর "বসন্তের বিমান-বিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কলরব" এইটী 'অস্তকের' অক্ষরে লিখিতে হইলে এইরূপ হইবে—

"বসনতেরাবিমানবিহারীবিহঙগবর্গেরবিনোদকলরব"

তাহাদের ভাষায় যুক্তাক্ষর নাই, তাহাতেই 'বিহঙ্গ' শব্দ বিহঙগ লেখা হইয়াছে। অক্ষরের নাম 'বাঁশী'; বিরূপ্ অর্থে আসীরিয়ার ভাষায় তীর বা বাণ (arrow) বুঝায়। ইংরাজীতে ইহার নাম cuneiform characters। কাঁচা ইটের উপরে সরহু নামক মৃগের শৃঙ্গের দ্বারায় অক্ষর খোদিত হয়, তদনন্তর ঐ ইট অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অক্ষরের গায়ে "নোবাইন্দী" মসী দ্বারা রং করা হইয়া থাকে। বলদের অন্ত্রী হইতে চর্ব্বির ন্যায় পদার্থে নিমরুদ্ দেশীয় 'জেরো' নামক লতার রস মিশাইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে স্থাপন পূর্ব্বক যে ধূসর বর্ণের গাঢ়্ এবং চিরস্থায়ী মসী প্রস্তুত হয়, তাহার নাম নোবাইন্দী। কিউফা, বশোরা, বোগদাদ, মোশুল, উরফা, আলজিরিয়া, নিনেভা প্রভৃতি স্থানের দক্ষ মিস্ত্রিগণ আসিয়া ঐ অক্ষর খোদে; তাহারা অক্ষরের নাম বা উচ্চারণ জানে না, অস্ত ইটের নমুনা দেখিয়া অক্ষর খোদন করে; মিস্ত্রিদের পক্ষে অক্ষরের নাম জানা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। অস্তক শাস্ত্র ৪১ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহা অতীব বৃহৎ গ্রন্থ। কোনও পর্টুগীজ্ পরিব্রাজকের প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে অস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার নমুনা দেওয়া গেল—

"তদনন্তর শিউরিদশের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, পবিত্র আশুর সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। শিউরি দশের শোণিত মন্দিরে আনীত হইলে আকাশের নক্ষত্র সমূহ দিবসে উদিত হইল; প্রধান পুরোহিত একটী নক্ষত্রকে স্পর্শ করিলেন; ঐ নক্ষত্রের কিরণ মালা একটী সুবর্ণ পাত্রে বদ্ধ করিয়া আনীত হইয়াছিল; ঐ কিরণ হইতে শত শত দেবতার জন্ম হইয়াছে। হে কিরণ! তুমি আমাদের সহায় স্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের জ্যোতিস্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের জয়স্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের ভোগস্বরূপ হও;" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে, আশুর (Assur) নামক মহাপুরুষ আসিরিয়া দেশের স্থাপনকর্ত্তা। অস্তক নামক শাস্ত্র সকল সময়ে খোলা থাকে না; তুরস্কের বড় বড় আকারের মূল্যবান কার্পেট দ্বারা আবৃত থাকে; বৎসরে তিন

বার ইহা অনাবৃত করিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। প্রধান পুরোহিত আসিয়া জানুয়ারির শেষে এবং জুন মাসের শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষে ইহা দেখাইয়া দেন। জুন মাসে, বৃষ্টি না হইলে, ইহা তিন দিন খোলা থাকে; সূর্য্যের কিরণ এবং চন্দ্রের কিরণ স্পর্শ করান ইহাদের উদ্দেশ্য। জানুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র খোলা থাকে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের শেষে 'সবর্' শব্দ লেখা আছে; এই সবর্ শব্দ হিন্দুর 'ইতি' বা 'তথাস্তু' এবং মুসলমানের "আমীন্," য়িহুদীর "শোলা" এবং খ্রীষ্টানের Amen তুল্য। আসিরিয়া দেশে এখন বহুসংখ্যক খ্রীষ্টানের বাস, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন আসিরীয় মতের সৌরদিগের নিকটে ইটের বই এখনও মহা পবিত্র এবং মহা শক্তি সম্পন্ন বলিয়া পূজ্য। তাহাদের বিশ্বাস, এই অন্তক মানুষের হাতের তৈয়ারী নহে। অনেকে বলে, ইহার স্পর্শে রোগ, শোক, পাপ তাপ পলাইয়া যায়।

অপরাপর ইটের বই সম্বন্ধে আচার্য্য সেস্ সাহেব (Sayce) তাঁহার বৃহদাকার গ্রন্থে ইংরাজি ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। "বাবিলনের প্রাচীন অধিবাসীরা ত্রিশূলের মত কলমে এবং তীর ধনুর মত অক্ষরে কাঁচা ইষ্টকের উপরে তাহাদের পুস্তকাদি খোদিত করিত। ঐ ইট পোড়াইলে লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত। এই জন্য ইংরাজিতে ইহার নাম Cuneiform writing; নেবুকড্‌নেজার প্রভৃতি সম্রাটগণ প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে, সুবর্ণের ত্রিশূলাকার লেখনী নির্ম্মাণ করিয়া উপহার দিতেন। কোনও কোনও কলমের আকার বন্দুকের মত ছিল। তুরস্কের কৌঞ্জিক (Kounjik) নামক রাজকীয় পুস্তকালয়ে একখানি পুস্তক ছিল, তাহা ঐ কলমের সহায়ে খোদিত হইয়াছিল। আশুরবাণি এবং বৈরোঁ নামক প্রাজ্ঞপুরুষদিগের চেষ্টায় ঐ পুস্তক পরিশেষে সোণার পাতার উপরে খোদিত হয়। খ্রীষ্টের ৩৮০০ বৎসর পূর্ব্বে Cuneiform অক্ষরের প্রচলন ছিল, খ্রীষ্টের জন্মের ৭৫ বৎসর পরেও ইহার ব্যবহার শুনা গিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে হইতে এবম্প্রকার অক্ষরের প্রচলন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

৺ নলিনীকান্ত সেন। (২)

প্রথম সাক্ষাৎ দিনে আমি কম্পিত পদে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে না করিতেই নলিনী গৃহাভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল; আমার সমস্ত দেহে কি এক তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল। দুজনে দুখানি চেয়ারে বসিলাম। কত কথা হইল, সমস্ত মনে নাই। সে সব কথার কোন বাঁধন ছিল না, এলোমেলো—স্থানে স্থানে কথার সহিত ভাবের বিচ্ছেদ হইতেছিল। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাকালে যখন পাখীরা আপনাদের নীড়ে ফিরে, তখন তাহাদের ছানাগুলি তাহাদিগকে দেখিয়া এক অপরিমেয় আনন্দের সহিত অসংলগ্ন ভাবে কত কথা বলে; বড় পাখীরা আপনাদের ডানা ছড়াইয়া একবার ইহাকে একবার উহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে;

আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। কথা বলিতে বলিতে অনেক বেলা হইল। আমি বলিলাম—"তবে এখন যাই।" নলিনী তৎক্ষণাৎ বলিল—"আমি যাহাদিগকে একবার আমার করিয়াছি, তাহাদিগকে আর যাইতে দিব না; তবে ভাই তোমারা যদি আমাকে ছাড়িয়া যাও!" একটু দাঁড়াইলাম। নলিনী হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা বুঝেছি, এখন যাও। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। অবসর পাইলে আসিও!" আমি সরকারী রাস্তায় আসিয়াই দেখি, নলিনীর অনেকগুলি যুবক বন্ধু তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই সকলে উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি অভিমন্যুর ন্যায় ব্যূহ-বেষ্টিত হইলাম। কেহ তীর্থ দর্শন করিয়া আসিলে লোকেরা তাহাকে সেই তীর্থের কথা যেরূপভাবে জিজ্ঞাসা করে, তাহারাও আমাকে, তীর্থেশ্বর নলিনী সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি সকলের কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

রূপ, রস ও গন্ধ লইয়া বৃক্ষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কত পাখী আসিয়া সেই বৃক্ষের মধুর ফল খাইয়া আত্মহারা হইল। সময়ে এই বৃক্ষছায়ায় অনেকে বিশ্রাম করিতে পারিবে ভাবিয়া কেহ কেহ ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃক্ষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বহু ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতে হয়—নলিনীর ভাগ্যেও তাহা ঘটিল। কলিকাতা হইতে বি-এ পাস করিয়া আসিলে পর, তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে Law পড়িয়া উকিল হইবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ওকালতি করিতে গেলে স্বদেশ-সেবার অনেক অন্তরায় হইবে বলিয়া নলিনী সে পথ ত্যাগ করিল—আত্মীয়েরা বিরক্ত হইলেন। চট্টগ্রামে মিঞা কাজিম আলী সাহেব সুপরিচিত। তাঁহার স্কুলটী দরিদ্র ছাত্রদের এক মাত্র আশ্রয় স্থল। নানা কারণে স্কুলটীর অবস্থা খারাপ হইতেছে দেখিয়া নলিনী কাজিম আলী মিঞা সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিনা বেতনে সেই স্কুলের হেড মাষ্টার হইল। ইহার মূলে তাহার দুটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; আজকাল ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে আর তেমন ঘনিষ্টতা নাই। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া বাড়ীতে যান; ছাত্রও তাহার পাঠ শেষ করিয়া চলিয়া যায়; কেমন ছাড় ছাড় ভাব। নলিনীর ইহা ভাল লাগিত না বলিয়াই মাষ্টার হইয়া ছাত্রদের সহিত মিশিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দু ও মুসলমান একপ্রাণ হইয়া দেশের উদ্দেশে কার্য্য না করিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যতদিন একজন মুসলমান অপমানিত হইলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত না লাগিবে, ততদিন আমাদের উন্নতি কোথায়? সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুটী প্রধান জাতি; ইহাদের মধ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলে উন্নতি অসম্ভব। যেমন মনুষ্যের একটী হস্ত শক্তি সম্পন্ন এবং অন্যটী দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে তাহাকে বিকলাঙ্গ বলা যায়; তেমনি হিন্দু কি মুসলমান, ইহার একটী জাতি উন্নত হইলে ভারতের উন্নতিও অসম্পূর্ণ হইবে। কাজিমআলী সাহেবের স্কুলে অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে ভেদ জ্ঞান উৎপাটিত হইবে, ইহাও নলিনীর আর

একটী আশা ও উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষেত্রে নলিনী কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা তাহার বহু মুসলমান বন্ধু ও তাঁহাদের আক্ষেপোক্তি হইতে বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়, আমার অভিমত নিষ্প্রয়োজন।

নলিনী শিক্ষক হইল। বহু ছাত্র তাহার ভক্ত ও বন্ধু হইল। নলিনী ধীরে ধীরে তাহাদিগকে আপনার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। তাহারা মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যেক কথা ও কার্য্যে আপনাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল। বিরল-শ্মশ্রু, তেজপূর্ণ শ্রীবিশিষ্ট ২৩ বৎসরের যুবক যে এত শীঘ্র অতগুলি প্রাণের ভিতর আপনার স্থান করিতে পারিবে, তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবিতেও পারি নাই। ইহাইত প্রতিভা, মহত্ত্ব ও প্রকৃত মৌলিকত্ব। এই শিক্ষকতা লইয়া নলিনীকে আমি কত নিরাশার কথা বলিয়াছি। কত নিরুৎসাহের কাহিনী সযত্নে এক একটী করিয়া গাঁথিয়া তাহাকে ভালবাসার উপহার দিয়াছি। যখন শুনিলাম, নলিনী তাহার স্কুলটীর নাম পরাঞ্জপ্যে ইনীস্‌টিটিউসন্ রাখিবে এবং স্কুলের সংলগ্ন একটী অভিনব বোর্ডিং স্থাপন করিবে, তখন তাহাকে Arnold of Rugby প্রভৃতি বলিয়া কৌতুক করিতে লজ্জিত হই নাই। আমার বুঝিবার শক্তি কম, তাই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। চতুর্দ্দিক হইতে কত তীব্র কটূক্তি তাহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল, ছেলেটীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; কেহ বলিল, ও সব ভারত-উদ্ধারীদের কথা ছাড়িয়া দাও; আবার কোন কোন উদার হিন্দু বলিলেন—ও মুসলমানের সহিত মিশিতে চায়, পিতার এমন কুপুত্রও জন্মগ্রহণ করে। নলিনীর কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। সে অনন্ত সমুদ্রে আপনার ঘর বাঁধিয়াছিল, শিশিরকে ভয় করিবে কেন? তবে কিছুই তাহার চক্ষে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না, ইহা তাহার বিশাল হৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব।

এই সময়ে তাহাকে নানা কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকিতে হইত যে, কাহারো সহিত বহুক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে পারিত না। প্রতিদিন এত চিঠি লিখিতে হইত যে, চিঠির পৃথক রেজেষ্টারী বহি করিতে হইয়াছিল। আমি যখনই তাহাকে তাহাদের নূতন বাড়ীতে (পুরাতন হসপিটালের পূর্ব্বদিকে) দেখিতে গিয়াছি, নানা কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ভিন্ন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। এইখানে তাহার স্বহস্ত লিখিত দৈনিক কার্য্যাবলীর একটা তালিকা দিলাম।—

প্রাতে—

৫-৫½ প্রাতঃকৃত্য, ৫½—৬½ ব্যায়াম স্নান, &c ৬½—৮½ পড়া ও লেখা, ৮½—৯½ "আলোর" কাজ, ৯½—৪ স্কুল (তখন স্কুলের হেডমাষ্টার)।

অপরাহ্নে ৫—৬½ চিঠি পত্র, ডায়রি এবং বিবিধ, ৬½—৭½ খেলা &c, ৮—৯½ ডায়রী পড়া। ৯½—১১ আহার, বিশ্রাম, শয়ন। ১১—৫ নিদ্রা।

সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার কতটুকু বিশ্রাম করিবার সময় ছিল, তাহা এই তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অত্যধিক পরিশ্রম ও শরীরের প্রতি তাচ্ছল্যের জন্য ধীরে ধীরে তাহার সুন্দর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কে জানিত, শৈল-নির্ঝরিণীর ক্ষীণ জলরেখা আপনার

পথে বিশালতা লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ ধরণীর কোন অজানা স্থানে লুকাইয়া যাইবে! এক দিন প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই—'এস ভাই' বলিয়া টেবিলের উপর কাগজের স্তূপ সরাইতে লাগিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—"রাত্রি দিন ঐ সমস্ত ঘাঁটিয়া কি বিরক্তি বোধ হয় না?" সে দৃঢ়তার সহিত বলিল—"তোমার নিকট হইতে এইরূপ কথা শুনিব, আশা করি নাই।" "আলো' সম্বন্ধে অনেক কথা হইতে লাগিল। দেখিলাম, "আলো"র চিন্তা তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, সতন্ত্রী সেতারের যেখানেই অঙ্গুলি স্পর্শ কর না কেন, প্রত্যেকেই আপনার রাগিণী গাইবে, কিন্তু কেহ কাহারও হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এমনি সুর বাঁধা চিন্তাশক্তি অতি অল্পলোকেরই থাকে।

নলিনীর একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথা যাহাতে অন্যে জানিতে না পারে, তাহার যথেষ্ট সতর্কতা লইত। অসুস্থ দেহ লইয়াই দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায়, "আলোর" সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। একদিন প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিতে গেলাম। নলিনী তাহাদের নূতন বাড়ীর উত্তর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে "এসভাই" বলিয়া বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিল। আমি তাহাকে এত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল দেখিয়া একটুক বিস্মিত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রায় ১০।১২ দিন হইতেই তাহার জ্বর হইতেছে; কিন্তু আজ শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমি এক খানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে প্রস্তুত হইতে না হইতেই সে হাসিয়া আমার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইল। তাহার হাতে এক খানি নব প্রকাশিত মাসিক পত্র ছিল। আমি বলিলাম—"মাসিক পত্রের জ্বালায় দেশ ছাড়তে হবে দেখ্‌ছি।" নলিনী হাসিয়া বলিল—"বড় মিথ্যা নয়! একই লেখক সমস্ত বাঙ্গালা মাসিকে লেখেন; ইহাতে লেখক, পাঠক ও ভাষা, কিছুরই উন্নতি হয় না। কারণ লেখকেরা 'অনুরোধে'র যন্ত্রণায় চিন্তা করিয়া কোন সারবান্ প্রবন্ধ সৃষ্টি করিতে পারেন না।" আমি হাসিয়া বলিলাম—"তবে 'আলো' প্রকাশ করছ কেন?" নলিনী একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—" 'আলো'ত বাঙ্গালা ভাষার কর্ণধার হইতে চাহে না। তুমিত ইহার উদ্দেশ্য জান।" আমি অন্য কথা আরম্ভ করিলাম। আসিবার সময় বলিল "মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও। আজ কাল এত কম আস কেন? "কথাগুলি আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিল; আমি মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলাম। নলিনী আসিয়া আমার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করিল—আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। আসিবার সময় জানিতে পারি নাই যে, এই জ্বরই তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে।

নলিনীর জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ১০ দিন যায়, ২০ দিন যায়, জ্বর আর ছাড়ে না। আর উঠিতে পারে না। ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। দিন দিন চন্দ্রের হ্রাস হইতে লাগিল। বন্ধু আত্মীয় স্বজন সকলেই চিন্তাকুল হইল। একদিন গিয়া দেখিলাম, সোণার দেহ যেন পুড়িয়া গিয়াছে; সে রূপ যেন কেহ অপহরণ

করিয়া লইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মাথার কাছে বসিয়া পাখাখানি মাথার উপর দোলাইতে লাগিলাম। আমার দিকে একবার চাহিল—চারি চক্ষে মিলন হইল। সেই করুণ দৃষ্টি কেমন করিয়া ভুলিব? এখনও কোন রোগীর মস্তকের কাছে বসিলেই আমার সেই করুণ দৃষ্টির কথা মনে জাগে,—কত স্নেহ, মমতা, হৃদয়ের অফুরন্ত আশা, অব্যক্ত যন্ত্রণা, সেই সজল নয়নে কুসুম-কোরকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছিল! ডাক্তারগণের পরামর্শে নলিনীকে দেওঘরে লইয়া গেল। নানা কারণে তথায় থাকা হইল না। দেশে ফিরিবার পথে কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিল। কিছুতেই কিছু হইল না। আবার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে নলিনী ফিরিয়া আসিল। আমি গিয়া দেখিলাম, নলিনী ফিরে নাই;—গভীর ঘূর্ণীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কাষ্ঠ কি তৃণ যেমন মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই নক্ষত্র বেগে কোথায় অদৃশ্য হয়—নলিনীও অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র! কোন কারণ বশতঃ সে দিনের পর হইতে আর তাহাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। তখন বেলা ৯টা হইবে; আমি কোন পূজনীয় ব্যক্তির পাঠাগার হইতে দুইজন ইংরাজ কবির উপর সমালোচনা পড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম। এমন সময়, আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাড়াতাড়ি বলিল —"শুনেছ? আজ (২০এ জানুয়ারী, ১৯০১) ৬টার সময় নলিনী বাবু মারা গিয়াছেন।" তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বাসায় ফিরিতে লাগিলাম। সমস্ত রক্ত যেন মাথার উপর উঠিতেছিল, মাথাটা বড় ভারি বোধ হইল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার পার্শ্বেই আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বন্ধু সজলনয়নে নলিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত চট্টগ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। যে তাহার সহিত এক দিনের জন্যও পরিচিত হইয়াছিল, সেও "আহা, এমন লোকেরও মৃত্যু হয়! দেশের দুর্ভাগ্য" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধু গৃহে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরেই দেখিলাম, একখানি ছোট খাটিয়ায় একটী ক্ষুদ্র দেহকে বাঁধিয়া চারি জন বাহক নলিনীদের পুরাতন বাড়ী চকবাজারের দিকে যাইতেছে। বন্ধু বলিলেন, —"এইত"। আমি একবার দেখিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম; আর শ্মশান ভূমিতেও গেলাম না—বাসায় ফিরিলাম। যে উদ্যানে নলিনী স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ও বৃক্ষরোপণ করিয়াছিল, যেখানে তাহার কোমল চরণতলে কত ক্ষুদ্র গাছ, এবং দুর্ব্বা এবং মৃত্তিকা শিহরিয়া উঠিত, আজ ২৪ বৎসরের একটী কর্ম্মময় জীবন তথায় ভস্মীভূত হইয়া গেল!

এইরূপেই একটী অভিনব বিরল-দৃষ্ট জীবন শেষ হইল! স্নেহে, প্রেমে, উৎসাহে এবং প্রতিজ্ঞায় গঠিত, বর্দ্ধিত এবং অনুপ্রাণিত জীবনটী ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কত নূতন কথা, নূতন চিন্তা ও কার্য্য দেখাইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশহিতৈষী নলিনী কবি ছিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে কবিতার উৎস ছিল। তাহা সর্ব্বসাধারণের চক্ষের অগোচর হইলেও তাহার বন্ধুগণের অবিদিত ছিল না। এই কবিতার উৎস হইতেই

স্বদেশ-প্রীতি, বৈরাগ্য এবং প্রেমের সৃষ্টি হইয়াছিল। এত প্রতিজ্ঞা, আত্মত্যাগ, অভিসম্পাতের ভিতর কবিতাই তাহার প্রাণে আশ্বাসবাণী শুনাইত! কেহ কেহ তাহাকে কবি ও স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিদ্রূপ করিত, কেন না কবিরা উন্মাদ, তাহাদের দৃঢ়তা নাই। কিন্তু নলিনীর ভিতর ইহার আশ্চর্য্য মিলন দেখিয়াছি। এত দৃঢ়তার ভিতর কত যে করুণ ভাব ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না; কেবল কবির ভাষায়—

> "What wonder if a Poet now and then,
> Among the many movements of his mind,
> Felt for thee (County) as a Lover or a Child!"

বলিয়াই বিস্ময়ে নিরস্ত হইতে হয়। অনন্ত আকাশে বিচিত্র রামধনু দেখিলে নলিনীর বিচিত্র বিশাল হৃদয় মনে পড়ে। নলিনী বলিত, তাহার একজন "জীবন-নিয়ন্তা," "সৌন্দর্য্যের আদর্শ," "কবিতার উৎস" ছিল। যাহার মঙ্গল ইচ্ছাই তাহার সমস্ত প্রার্থনা ছিল; যাহাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, ভালবাসা দিয়া আপনার ভাবে গঠন করিতেছিল, অকালে তাহার মৃত্যু হওয়ায় নলিনী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মৎপ্রতি উৎসর্গিত একটী কবিতা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে—

> "যাব আমি বৃথা তুমি বাধা নাহি দিও হে!
> পাছ হ'তে ক্ষীণ কণ্ঠে আর না ডাকিও হে!
> অনন্তের বুকে আমি মিশাইব জীবন।
> তারি কোলে ঘুমাইব সুখে মুদে নয়ন।" *

আমাদের প্রিয়বর রা—র মৃত্যুসংবাদ নলিনীর কর্ণগোচর হইলে পর একদিন কথায় কথায় দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমি সমস্ত হৃদয় দিয়া রা—কে ভালবাসিয়াছিলাম; আজ সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আজ হইতে তাহাতে অর্পিত ভালবাসা, প্রেম সমস্ত পৃথিবীতে বিলাইয়া দিব; তাহা হইলে তাহার প্রেমের উপযুক্ত উপাসনা হইবে।" নলিনী সমস্ত পৃথিবীতে আপনার স্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সার্ব্বজনীন প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমরা বড় অল্প লোকের ভিতরই দেখিতে পাই। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, রা—ই তাহার ভাবী জীবন গঠন করিয়াছিল। রা—র মৃত্যুই তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য পথে আরও দৃঢ়তা,উৎসাহ ও প্রেমের সহিত অগ্রসর করিয়াছিল। একটী জীবনের কত শক্তি! নলিনী তাহার প্রিয়তম সুহৃদকে রা—র মৃত্যুর সাম্বৎসরিকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল,আমি তাহার কোন স্থান হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—"আজ আবার ১৬ই মার্চ্চ। আমার জীবন-নিয়ন্তা, হৃদয়-গঠক, সৌন্দর্য্যের আদর্শ, কবিতার উৎস রা—র মৃত্যুর সাম্বৎসরিক! আজ আবার সেই বিষাদপ্লুত, আনন্দ-স্মৃতি প্রাণে জাগিতেছে। আজ আমি স্বর্গ মর্ত্ত্যের সঙ্গম স্থলে দাঁড়াইয়া—আজ আমি মহৎ এবং উজ্জ্বল।" (১৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৮। †

---

* রা—র মৃত্যুই তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য পথে আরও দৃঢ়তা, উৎসাহ ও প্রেমের সহিত অগ্রসর করিয়া ছিল।

† আমার প্রিয় সুহৃদ্ অ—আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের অংশটুকু উদ্ধৃত করিতে স্বাধীনতা দিয়াছেন।

বাদ, প্রতিবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ

নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১৩০৭ সনের কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাস পর্য্যন্ত আপনার সুবিখ্যাত সুপরিচালিত পত্রিকার সংখ্যাত্রয়ে পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায় শ্রীমদ্গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়-উদ্ভাসিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্যের সমালোচনা করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করেন, এবং ঐ সঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার কয়েকটী সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করেন। উপাধ্যায় মহাশয় যথাসময়ে তাহার উত্তর দেন। ঐ উত্তরসমূহ এবং পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রত্যুত্তর বহুদিন হইল আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু ঐ সকল প্রকাশ করিতে উপাধ্যায় মহাশয়ের অনিচ্ছা থাকায় আমরা প্রকাশ করি নাই। ইহার কিয়ৎকাল পরে সাধারণের নিকট হইতে এই অভিযোগ হয় যে,—"কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর কেন দেওয়া হইল না।" তখন আমরা পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট উপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তাঁহার পত্র এক সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখি। বাদ প্রতিবাদ প্রকাশ করায় ফল নাই বলিয়া তিনি আমাদিগকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলেন। কিন্তু সাধারণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমরা ঐ সমস্ত পত্রস্থ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া পুনর্ব্বার কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখি, তিনি তাঁহার সমস্ত পত্র অবিকল প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, আমরা যে পত্রখানি প্রকাশ না করিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ পত্র অবোধ্য থাকিয়া যায়, সেই পত্রের ভাবার্থমাত্র প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপাধ্যায়ের পত্রগুলি অবিকল প্রকাশে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। সাধারণের অভিযোগ ও সংশয়-নিরাকরণার্থ পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে দয়া করিয়া যে সুবিধা দিলেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে বার বার অভিবাদন করি।

আশা করি, আপনিও নব্যভারতের আগামী সংখ্যায় এই সমস্ত পত্র প্রকাশ করিয়া আমাদিগের এবং সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন। কিমধিকমিতি—

একান্ত বশংবদ,

শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

গীতা-সমন্বয়-ভাষ্য-

প্রকাশক।

সসম্ভ্রম নিবেদন—

নব্যভারতে গীতাসমন্বয়ভাষ্যসম্বন্ধে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। জীবের পারলৌকিক গতিবিষয়ে ভাষ্যে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, সে মতে সায় দিতে না পারিয়া আপনি লিখিয়াছেন "আশা করি, উপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করি-

বেন।" ইহা অতিরিক্ত হইয়াছে। কারণ ভাষ্যের কোন্ অংশে স্বাধীনচেতা সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ সায় দিতে পারেন না, ইহা জানিতে আমি নিতান্ত সমুৎসুক।

পারলৌকিক গতিসম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তদ্দ্বারা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র-গ্রন্থের পারলৌকিক-মত-সহকারে পরবর্ত্তী শাস্ত্রসমূহের মতের ঐক্য সমাধান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি যে প্রকার সমাধান করিয়াছি, গীতাপ্রবক্তা সেই প্রকার সমাধান করিয়াছেন, ইহা না বলিয়া এই বলিয়াছি যে, "শ্রীমদ্যোগাচার্য্যস্তাং ভূমিমারূঢ়বান্ যতো বেদবেদান্তয়োরৈক্যং পুনঃ পুনঃ নীচোচ্চমধ্যাবস্থাপ্রাপ্তিরূপয়া পরিবৃত্তিধর্ম্মবদসংখ্যেয়লোকেম্বাবৃত্ত্যা সাধিতং ভবতি।" ভাষ্যোক্ত সমাধান বলপূর্ব্বক গীতাপ্রবক্তার উপর আরোপ করা হইয়াছে, এ দোষক্ষালনের জন্য আমি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছি, (৬।৪১)"যদি বদসি ন হি সম্ভবত্যাচার্য্যস্য সর্ব্বথা কালদেশপ্রভাবাতিক্রমঃ,ভবতু তৎ তথৈব; সত্যমুক্তাসয়তোঽন্তর্য্যামিণ ঈদৃঙ্‌মহিমা যৎ 'নামুত্র বিনাশঃ' ইত্যাচার্য্য মুখেনোদ্ঘোষ্য সত্যং তত্ত্বং নির্ব্বাচয়িতুং সোঽস্মানবকাশমদাৎ" এরূপ সমাধন করিবার মূল এখানেই বিশদরূপে ন্যস্ত রহিয়াছে—"বস্তুতস্তু ঋকসংহিতোক্তা (ঋক-স ১০ম ৮৮সূ ১৫ ঋক) 'দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানীম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ॥' ইতি ঋক্ ব্রাহ্মণবিভাগে বেদান্তে চোদ্ধৃতা প্রকারান্তরেণ পুরাণৈরনুমোদিতা সর্ব্বসামাঞ্জস্যমাপাদয়তি।" এরূপ সমাধান দ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অসম্মান করা হইয়াছে, ইহা আমি স্বীকার করি না, কেন না তাঁহারা এবং 'পৃথিবীং প্রাপ্য' এ কথা বলিয়া বেদান্ত যে স্থলে পৃথিবীতে আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে 'তথা লোকান্ সমাপ্নোতি যে দিব্যা যে চ পার্থিবাঃ।' এই অথর্ব্ববাক্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও বেদান্তবাক্য অবলম্বন করিয়া পৃথিবীশব্দে তৎসমানধর্ম্মাক্রান্ত অন্যান্য পৃথিবী আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি।

আপনি ব্যাখ্যাসম্বন্ধে যে চারি সন্দেহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তৃতীয় ও চতুর্থ সন্দেহসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই তাহা আছে। প্রথম সন্দেহসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অসংখ্য জগতে অসংখ্য জীব রহিয়াছে, এমন কি, সমুদায় বিশ্ব জীবে পূর্ণ। জীবগণের বিশ্বভ্রমণকালে এখান হইতে অন্যত্র, অন্যত্র হইতে এখানে আসা ঘটিলে জীবজন্ম আকস্মিক ও অহৈতুক হইতেছে না; পৃথিবীতে কোন কালে জীবাভাবেরও সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় সংশয়সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সংহিতা ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ পরলোকে জন্ম ও লোকলোকান্তরে গতি যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে,তাহাই যুক্তিযুক্ত, কেন না এখান হইতে গিয়া এখানে আইসার প্রমাণ কাহারও জীবনে পাওয়া যায় না, তবে আত্মাতে আত্মাতে যে ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞান তাহার কারণ অনেকটা নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কোন একটি অজ্ঞাত বিষয় আশ্রয় করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা জ্ঞাত বিষয় দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত।

আশা করি, তত্রত্য সমগ্র কুশল। আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এ পত্র প্রকাশ করা যদি কর্ত্তব্য মনে করেন, করিতে পারেন।

বিনত,
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
১২-২-০১

সসম্ভ্রম নিবেদন,

সমন্বয়ভাষ্যসমালোচনার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। কারণ সত্যানুরোধে যে সমালোচনা হয়, সে সমালোচনা তত্ত্বচিন্তার পক্ষে অনুকূল। বক্তব্য বিষয়টি কত দিক্ দিয়া দেখা যাইতে পারে, লেখক স্বয়ং তাহা তত দেখিতে পান না, যাঁহারা সমালোচনা করেন, তাঁহারা যত দেখিতে পান। বিশেষতঃ লিখিত বিষয়ের মধ্যে যাহা নিগূঢ় থাকিয়া যায়, সমালোচকগণ সেই নিগূঢ় বিষয় স্বয়ং বাহির না করুন, তাঁহাদের কথায় তাহা বাহির হইবার উপায় হয়।

"ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্" ব্যাকরণপরিভাষার এ কথা সর্ব্বত্র খাটে। শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত ষষ্ঠাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের ভাষ্যের সহিত তৎকৃত ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যের বিরোধপ্রদর্শনস্থলে বিরোধপরিহারজন্য আপনি যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার বিবেচনায় মনুর বচনোদ্ধার ও শ্রীমৎকল্লূক-কৃত টীকার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করের নিজ লেখা দ্বারাই উহার সমাধান হইতে পারিত, কেননা শ্রীমৎকল্লূকলিখিত "শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ" এ কথার সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করের বিরোধসম্ভাবনা আছে। একতো বৃহদারণ্যকে শ্রীমচ্ছঙ্কর 'বেদসন্ন্যাস' শব্দের স্বাধ্যায়ত্যাগার্থ করিয়াছেন (পারিব্রাজ্যে তাবদধ্যয়নং বিহিতং—"বেদসংন্যসনাচ্ছূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সংন্যসেৎ" ইতি) তাহার উপর তিনি পারিব্রাজ্য ভিন্ন অন্য আশ্রমে কর্ম্মত্যাগ প্রত্যবায়সাধক বলিয়া তত্তদাশ্রমে ব্রহ্মে স্থিতি অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন "(ব্রহ্ম সংস্থইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্যব্যাপারতারূপতন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়োন সম্ভবত্যননুষ্ঠাননিমিত্তঃ [বেঃ সূ ৩।৪।২০])"। এই কারণেই আপনি মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ের "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥" এই শ্লোকটিতে 'ন ত্বগ্নিহোত্রাদিপরিত্যাগপরতয়েত্যুক্তম্' শ্রীমৎ কল্লূকের এই টীকা দেখিয়া উহাকে গৃহস্থশ্রেণীসমুচিত বলিয়া যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্রীমচ্ছঙ্কর মতে তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। এখন দেখা যাউক, শ্রীমচ্ছঙ্করের নিজের কথায় সমাধান হয় কিরূপে?

তিনি ষষ্ঠাধ্যায়ের দশম শ্লোকের ভাষ্যে যেমন লিখিয়াছেন "রহসি স্থিতঃ একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ" তেমনি অষ্টাদশাধ্যায়ে যেখানে কি উপায়ে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইয়া অপরোক্ষজ্ঞানলাভ হয় তাহা বলিতে গিয়া যে ধ্যানযোগ উক্ত হইয়াছে, সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—"...পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ, তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা,' সুতরাং গীতোক্ত ধ্যানযোগকে তিনি পারিব্রাজ্যাশ্রম সমুচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; উহা অন্যাশ্রমীর পক্ষে নহে, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যকভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্য নিঃশেষং কৃত্বা অথ মননান্মুনির্যোগী ভবতি।" বেদান্তসূত্রে এই কথার উপর তিনি এই বিচার উত্থাপন করিয়াছেন যে, বাল্যাদিবিশিষ্ট কৈবল্যাশ্রম

থাকিতে ছান্দোগ্য কেন গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। ইহার মীমাংসা ভাষ্যে (৩৪।৪৮) তিনি এই বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমে বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদি আশ্রমকর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব আশ্রমান্তরোচিত অহিংসা ইন্দ্রিয় সংযমাদি সাধনও আছে,তাই ছান্দোগ্যে উপসংহারে গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'যথাসম্ভব' এই শব্দ থাকাতে'নির্জ্জনে স্থিতি, 'একাকিত্ব' ও 'অপরিগ্রহ' গৃহস্থাশ্রমে সম্ভব নয় বলিয়া তিনি যোগানুষ্ঠানকে পারিব্রাজ্যাশ্রমে বদ্ধ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, ছান্দোগ্যের ভাষ্যের কথাগুলির সহিত গীতাভাষ্যের বিরোধিতা নিষ্পন্ন হয় কিরূপে? ছান্দোগ্যের ভাষ্যে হৃদয়স্থ ব্রহ্মে সকল ইন্দ্রিয়গণকে অবরুদ্ধ করা যে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা উচ্চ যোগ নয়, ইন্দ্রিয়সংযমব্যাপারমাত্র বুঝাইতেছে। সুতরাং উহা পারিব্রাজ্যাশ্রমোচিত যোগানুষ্ঠান নহে।

যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তবে কেন আমি গীতাভাষ্যের সঙ্গে ছান্দোগ্যভাষ্যের বিরোধ দেখাইয়া গৃহস্থেরও যোগাধিকার আছে ইহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত? প্রবৃত্ত এই জন্য যে, ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত যোগের পন্থা ছান্দোগ্যের ভাষ্যে যাহা বলা হইয়াছে তদনুরূপ। কারণ শ্রীমচ্ছঙ্কর হৃদয়স্থ ব্রহ্ম বলিয়া সগুণ ব্রহ্মে ইন্দ্রিয়গণের অবরোধ এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, গীতাও হৃদয়স্থ ঈশ্বরে শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং এইরূপে শরণাপন্ন হইলে তদনুগ্রহে মোক্ষলাভ হইবে, ইহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ শরণাপন্নতা কি? প্রেরয়িতা ঈশ্বরের প্রেরণার সর্ব্বথা অনুবর্ত্তী হওয়া। সর্ব্বথা প্রেরণার অনুবর্ত্তী হইলে তাঁহার অনুগ্রহ হয়, এবং সেই অনুগ্রহে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হৃদয়স্থ ব্রহ্ম গীতার ভাষায় চিত্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব, অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা। গীতার সর্ব্বত্র ইঁহাতেই চিত্ত সমাধান বিহিত হইয়াছে। এই বাসুদেবই যখন সর্ব্বাতীত-সর্ব্বান্তর্ভাবক-রূপে পরিগৃহীত হন (বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ), তখন সগুণ নির্গুণবাদের সামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। ছান্দোগ্যভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর গীতোক্ত যোগের অবকাশ দিয়াছেন বলিয়া আমরা তৎকৃত গীতাভাষ্যের সহিত উহার বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছি। সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ না করিলে যোগ হয় না, এ কথা গীতার মতবিরোধী, কেন না গীতা 'যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু' এই কথা বলিয়া যোগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম থাকিলে তবে যোগ দুঃখাপনয়ন করে, ইহাই বলিয়াছেন। গীতার যোগ যে সাধনবিশেষ, তাহা তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, বহু জন্মান্তরে কলুষক্ষয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত গৃহস্থ অর্জ্জুনকে যোগী হইবার জন্য অনুরোধ ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। শ্রীমচ্ছঙ্কর যে যোগের কথা বলিয়াছেন, উহা নিবৃত্তিযোগের চরম সোপানের কথা। জ্ঞান সাধন করিতে করিতে সাধকে সর্ব্বনিবৃত্তি উপস্থিত হয়। এই নিবৃত্তিতে সংসারী জীব (Phenomenal Ego) অন্তর্হিত হইয়া যায়, কেবল অনন্তজ্ঞান ব্রহ্মমাত্র থাকেন। এই নিবৃত্তিযোগ যে চরম নহে, তাহা 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥' ষষ্ঠাধ্যায়ের এই চরম বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। সংসারী জীব পর্য্যন্ত নিবৃত্ত

হইয়া গিয়া যখন ব্রহ্মমাত্র থাকিলেন, তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই কথা সিদ্ধ পাইল; সাধকের ক্ষুদ্র 'অহম্' ব্রহ্মের মহৎ অহমে গ্রস্ত হইয়া গেল। এইরূপে গ্রস্ত হইয়া জীবেতে যখন স্বরূপাবির্ভাব সুদৃঢ় হইল, তখন আবির্ভূতস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মপ্রেরণায় তিনি চলিতে, বলিতে, কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইটি প্রবৃত্তি বা ভক্তিযোগ। যষ্ঠাধ্যায়ের অন্তিমশ্লোকে উহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই প্রবৃত্তি-যোগ আশ্রয় করিয়াই দাসপুত্রাদিভাবে জীবের নিত্যস্থিতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতেই শ্রীমচ্ছঙ্কর কেন জীবকে উড়াইয়া দিয়াছেন এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেন তাহাকে পুনঃস্থাপন করিয়াছেন, তাহার কারণ সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এখন দেখা যাউক, অচেতন জড়প্রকৃতির ন্যায় সচেতন জীবপ্রকৃতিকেও সমানভাবে শ্রীমচ্ছঙ্করের গ্রহণ করিতে হইয়াছে কি না? তিনি ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূতং প্রাণধারণমাত্মানমেবস্মরন্ত্যাহ—অনেন জীবেন আত্মনেতি। প্রাণধারণকর্ত্রাত্মনেতি বচনাৎ।" ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখনই সৃষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখনই পরম দেবতা যেমন তেজঃ প্রভৃতিকে দেখেন তেমনি জীবকেও দেখেন; তবে এ জীব তাঁহার বুদ্ধিস্থ অর্থাৎ চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশ্রিত। সৃষ্টি কালে জীব না থাকিলে চলে না কেন? জীব না থাকিলে দুঃখাদি সমুদায় যে সেই পরমদেবতাকেই স্পর্শ করে। "ননু ন যুক্তমিদমসংসারিণ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়া দেবতায়া বুদ্ধিপূর্ব্বকমনেকশতসহস্রানর্থাশ্রয়ং দেহমনুপ্রবিশ্য দুঃখমনুভবিষ্যামীতি সংকল্পনম্, অনুপ্রবেশশ্চ স্বাতন্ত্র্যে সতি। সত্যমেবং ন যুক্তং স্যাৎ যদি স্বেনৈবাবিকৃতেন রূপেণানুপ্রবেশেয়ং দুঃখমনুভবেয়মিতি চ সংকল্পবতী; নত্বেবম্। কথং ন? অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেতি বচনাৎ, জীবোহি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্।' জীব আভাস, প্রতিবিম্ব বা ছায়া এ সকল যে কথার কথামাত্র, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিচার দ্বারা বিশেষরূপে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সে বিচার তুলিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরম দেবতা কেবল অপরা প্রকৃতি নয়, স্বীয় পরা প্রকৃতি লইয়াও সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতি নিত্য, এ কথা বলিয়া যদি কেবল অপরা প্রকৃতির ব্রহ্মে সৃষ্টির পূর্ব্বে বা লয়ে অবিভাগে স্থিতি স্বীকার করিয়া তাহারই নিত্যত্ব সাধন করা হয়, তাহা হইলে পরা প্রকৃতিকে নিত্য বলা খণ্ডিত হইয়া যায়, কেন না যাহা ব্রহ্মেতে পূর্ব্ব হইতে অবিভাগে স্থিত নহে তাহার নিত্যত্ব নহে অনিত্যত্ব ঘটিতেছে। অপিচ তিনি সেই ছান্দোগ্যভাষ্যেই বলিয়াছেন, "ননু বাচারম্ভণমাত্রশ্চেজ্জীবঃ মৃষৈব প্রাপ্তঃ, তথা পরলোকেহলোকাদি বা কথং তস্য? নৈষ দোষঃ। সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যম্, বিকারজাতং স্বতস্ত্বনৃতমেব; বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়মিত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবোহপীতি। যক্ষানুরূপোহি বলিরিতিন্যায়প্রসিদ্ধিঃ।" এ কথার সার মর্ম্ম এই যে, সন্মূলক জন্য জগৎ ও জীব সত্য, তাহাদের বিকার অর্থাৎ বিবিধ প্রকার স্বতই মিথ্যা। জীব ও জগৎ সত্য হইলেই হইল, তাহাদের

পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বিবিধ বিকার মিথ্যা হইল, তাহাতে ক্ষতি কি? শ্রীমচ্ছঙ্করের মতে ব্রহ্মের সত্তার যেমন তিন কালেতে ব্যভিচার ঘটে না, তৎকার্য্যভূত জগতের সত্তারও তেমনি তিন কালে ব্যভিচার ঘটে না। তিনি যখন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তখন (তথা জীবোঽপীতি) এ কথা ছাড়াও যেমন যক্ষ তাহার বলিও তদনুরূপ, এই তাঁহার উল্লিখিত যুক্তিতে বলি অর্থাৎ ভোগ্য জগৎ যদি তিন কালে সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার ভোক্তা জীবও তিন কালে সত্য থাকিবেই থাকিবে। আশ্রয় ব্রহ্ম যখন নিত্য, তখন তাঁহাতে যাহারা আশ্রিত তাহারা নিত্য হইবে না কেন? ফলকথা এই, আভাস, প্রতিবিম্ব, ছায়া, এইরূপ স্বরূপসাম্যবাচক রূপক কথাগুলি উড়াইয়া দিলে শ্রীমচ্ছঙ্করকেও স্বীকার করিতে হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগাবস্থায় অপরা প্রকৃতি যেমন তাঁহাতে বিলীনভাবে ছিল, পরা প্রকৃতি জীবও সেইরূপ তাঁহাতে বিলীনভাবে ছিল। উভয় প্রকৃতির নিত্যত্ব স্বীকার করাতে যে ব্রহ্মেতে এ দুইয়ের অবিভাগাবস্থাতে স্থিতি স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা আর কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইবে?

পরিশেষে ভাষ্য নাম দিতে আপনার আপত্তিসম্বন্ধে আমি শাস্ত্রীয় কোন কথা তুলিতে চাহি না, বা অন্য ভাষ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার ভাষ্যত্ব স্থাপন করিতে আমি যত্নশীল নই, কেন না তুলনা নিরপরাধ নয়। আমি ইহাকে ভাষ্য নাম দিয়াছি কেন, কেবল তাহাই বলিতেছি। লেখক আপনি কিছু বলেন নাই, সত্য তাঁহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলাইয়াছেন; যে ব্যাখ্যায় এইরূপ ঘটে আমি তাহাকে ভাষ্য বলি। সত্য বলাইয়াছেন, ইহা মুখে বলিলে চলে না। সত্য বলাইয়াছেন তাহার লক্ষণ এই যে, পূর্ব্বে যে সকল বিষয় নিগূঢ় ছিল, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সূত্রাকারে প্রকাশ পাইয়াছে, ভবিষ্যতের ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত সর্ব্বতোবিসারী সর্ব্বসমঞ্জস সত্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইবে। কোন একটী সত্য আসিয়া যখন সমগ্র জীবনকে তদধীন করিয়া ফেলে, তখন সেই সত্যের পরিচালনাতে নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ পায় এবং সত্যের সর্ব্বতোবিসারিত্ব ও সর্ব্বসামঞ্জস্য ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সহিত অনুস্যূত মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়। সত্যের প্রভাবে সত্যের আত্মস্বরূপপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে, ইহা যদি আমার প্রত্যক্ষ বিষয় না হইত, আমি 'ভাষ্য' এ নামে ইহাকে অভিহিত করিতাম না। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারগণ যে সকল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা একই সত্যের নানাদিক্, সাধকের অবস্থা ও সোপানভেদে উহাদের উপযোগিতা আছে, ইহা যে স্থলে দেখিয়াছি, সে স্থলে কিছু বলি নাই, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্বাদি মূলতত্ত্বসম্বন্ধে যেখানে কথা উঠিয়াছে, সেখানে মিলনের ভূমি বা অমিলনের কারণ প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়াছি। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া উপসংহার লেখার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সমন্বয়সাধন উহার উদ্দেশ্য। তবে সর্ব্বতোভাবে সকল বিষয়ে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, আর কাহারও কিছু করিবার অবকাশ নাই এ অভিমান করা বৃথা,

কেন না সত্যাবতরণ করিলেও মানবের অপূর্ণ গ্রহণ-শক্তিতে গ্রহণ করিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদ হইবে না, ইহা কি কখন সম্ভব?

আপনি যে সমন্বয়ভাষ্যের সমালোচনায় সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন তজ্জন্য পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার জন্য বিদায় গ্রহণ করি।

বিনত
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপরিউক্ত পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বানপ্রস্থাদি সমুদায় আশ্রম গৃহস্থাশ্রমেরই অন্তর্ভূত। যাঁহারা নাগরিক গৃহস্থ তাঁহারা ঘোর কর্ম্মী, সংসারী, ব্রহ্মবিজ্ঞানানুষ্ঠানে একপ্রকার পরাঙ্মুখ। যাঁহারা বনবাসী, তাঁহারাও গৃহস্থ, তাঁহারা কতকটা কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান-পরায়ণ। শঙ্কর যে পারিব্রাজকাশ্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা এই গৃহস্থাশ্রমভুক্ত বানপ্রস্থাশ্রমেরই অত্যুৎকৃষ্ট শাখা। শঙ্কর নিষ্কর্ম্মী ব্যক্তিদিগকে ধ্যানযোগে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করাতে তিনি যে সংসারাশ্রমভুক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবিজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধ্যানযোগে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত। তিনি পবিত্র ধ্যানযোগকে কর্ম্মপরায়ণ সংসারাসক্ত নাগরিক গৃহস্থগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আরণ্যক গৃহিগণমধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া ভালই করিয়াছেন। আশ্রমসম্বন্ধে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকে একদেশদর্শী বলিয়া স্থির করাতে শ্রীমচ্ছঙ্করের গৌরবের হানি হইয়াছে; তিনি গৃহস্থাশ্রমকে এমন নিকৃষ্ট মনে করেন নাই যে, তাহাকে ধ্যানযোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবেন।

প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে নিবেদন,

কার্য্যব্যস্ততানিবন্ধন যথাসময় আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন।

যে দিন হইতে ভগবানের অনুগ্রহে আচার্য্যবর্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, সেই দিন হইতে তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দিতে এক দিনের জন্যও কুণ্ঠিত হই নাই। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল, অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের দৃষ্টান্তে এদেশে অর্চ্চর্চ্চানা প্রবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব ঘুচিয়া গিয়া সাকারত্বের প্রাধান্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুই মহৎ অনিষ্টনিবারণপূর্ব্বক নিবৃত্তিধর্ম্ম-বা-নিবৃত্তিযোগ স্থাপনজন্য শ্রীমচ্ছঙ্করের অভ্যুদয়। তাঁহার যতগুলি ভাষ্য আছে, সকলেতেই তাঁহার এই জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাসমান রহিয়াছে। তিনি এই উদ্দেশ্য প্রখর মনীষাযোগে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার গৌরব। সে গৌরব যাহাতে সকলে হৃদয়ঙ্গম করেন, তজ্জন্য আমার যত্ন। তিনি—যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই আমি তাঁহার পরিচয় পাই, এজন্য তাঁহার কথা ভিন্ন তাঁহার বিষয়ে অন্য প্রমাণের উপরে নির্ভর করি না। আশ্রমবিষয় লইয়া আমাদের দুজনের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত, তাহার মীমাংসা আমি তাঁহার কথাতেই করিতে চাই। এই পথ প্রকৃষ্ট পথ, এ পথে চলিলে আমি তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছি, দেব বা মানব কেহই আমায় এ অপবাদগ্রস্ত করিবেন না।

শ্রীমচ্ছঙ্কর বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম এবং তৎপ্রয়োজক শাস্ত্রকে অজ্ঞানবিজৃম্ভিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—"প্রাক্ চ তথাভূতবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথা হি 'ব্রাহ্মণোযজেত' ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে। অধ্যাসোনাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম।" এরূপ স্থলে বৃহদারণ্যকভাষ্যে যে তিনি ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে সন্ন্যাস বিধান করিয়া বলিবেন, "কর্ম্মাধিকারনিমিত্তবর্ণাশ্রমাদিপ্রত্যয়োপমর্দ্দাচ্চ" ইহা আর অসম্ভব কি? যাজ্ঞবল্ক্যকে কর্ম্মী নির্দ্ধারণ করিয়া অন্তে মোক্ষার্থ তিনি পরিব্রাজক হইয়াছিলেন, এ সিদ্ধান্তই বা তিনি কেন করিবেন না (কর্ম্মী সন্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ।)? এখন কথা হইতেছে, শ্রীমচ্ছঙ্কর বর্ণাশ্রমাদি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত বলিয়াও চতুর্থাশ্রমের সঙ্গে পরিব্রাজকের যোগ রাখিলেন কেন? ইহাতেওতো ভিক্ষাচর্য্যারূপ আশ্রমোচিত কর্ম্ম সংযুক্ত আছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার উত্তর এই যে, শরীরপাতপর্য্যন্ত ভিক্ষাচর্য্যা থাকিবে তৎপর নহে, সুতরাং তাহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যদি অনিষ্ট উপস্থিত হয়; তাহা হইলে ভিক্ষাচর্য্যাও ত্যাগ করিবে (তথাপি কিং তেনেতি)। যদি স্যাদাঢ়ম্, অভ্যুপগম্যতে হি তৎ।' টীকা—'যদিতু ক্ষুধাদিদোষপ্রাবল্যাদাত্মানং নিষ্ক্রিয়মপি বিস্মৃত্য প্রার্থনাদিপরো ভবতি,তদা নিবৃত্ত্যুপদেশোঽপি ভবত্যর্থবান্' শ্রীমদানন্দগিরিঃ।)

পরিব্রজ্যায় সর্ব্ববিধকর্ম্ম ত্যাগনির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্কর অপর আশ্রমত্রয়ের সহিত উহার স্বাতন্ত্র্যসাধন করিলেন তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, অন্য তিন আশ্রমকে তিনি ব্রহ্মসংস্থার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"অথ ন পরামৃষ্টস্ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়েব ব্রহ্মসংস্থ ইতি সেৎসতি।" অপিচ সে আশ্রমগুলি যখন অজ্ঞানসম্ভূত, তখন জ্ঞানসম্ভূত কি বিবিদিষা, কি বিদ্বৎসন্ন্যাস সহ উহার কোন যোগই হইতে পারে না। সত্য বটে গৃহস্থাশ্রম হইতেই সকল আশ্রমের উৎপত্তি—"এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ," এবং দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃগণ পরিশোধের জন্য গৃহাশ্রম করা সকলের পক্ষে বিধি, কিন্তু তথাপি যখন গৃহস্থাশ্রমী না হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারে পরিব্রাজক হইবার বিধি আছে ('যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ'; 'যদহরেব বিরজেত্ তদহরেব প্রব্রজেৎ') এবং শ্রীমচ্ছঙ্কর যখন আপনি তাহাই করিয়াছেন ও অপরের জন্য তাদৃশ সন্ন্যাস অনুমোদন করিয়াছেন, তখন যাঁহারা একবারও গৃহস্থ হইবেন না, তাঁহাদের সন্ন্যাসকে কি প্রকারে গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ শ্রীমচ্ছঙ্কর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রম সকলেতে 'অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্ব' দেখিয়া পরিব্রজ্যাকেই সর্ব্বোপরি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং উহাকে কোন আশ্রমের সহিত একীভূত করেন নাই বরং স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন ('যদি চ ব্রহ্মচার্য্যাস্তেষ্বাশ্রমেষু পরামৃশ্যমানেষু পরিব্রাজকোঽপি পরামৃষ্টস্ততশ্চতুর্থমপ্যাশ্রমাণাং পরামৃষ্টত্বাবিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কাশ্চচ্চতুর্ষ্বাশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতি')। কোন কোন স্থলে কোন কোন জ্ঞানীকেও যে গৃহে থাকিতে দেওয়া হয় তাহার কারণ এই যে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ যদি কেহ গৃহত্যাগ করিতে না পারেন, তবে তাঁহারই সম্বন্ধে গৃহে

থাকিয়া বাহিরে কর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্তরে কর্ম্মত্যাগ বিধিসিদ্ধ—"ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থানাং কেনচিন্নিমিত্তেন সন্ন্যাসাশ্রমস্বীকারপ্রতিবন্ধে সতি স্বাশ্রমধর্ম্মেষনুষ্ঠীয়মানেষপি বেদনার্থো মানসকর্ম্মাদিত্যাগো ন বিরুদ্ধ্যতে"। পরিব্রজ্যাশ্রম যে বানপ্রস্থাশ্রমের অন্তর্ভূ‍‍ত নয়,—'বনাদ্বা'; 'ব্রহ্মচারিগৃহস্থ বানপ্রস্থানাং' এই কথা বলাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

আপনি যে ক্রমোন্নেষের নিয়ম ধরিয়া সকলাশ্রমকে গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভূ‍‍ত করিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। 'সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ' ইত্যাদিতে অবিদ্যাবদ্বিষয়ক সকল প্রকারের আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্পর্কীয় সকল বিধির অতীত হইবার যখন ব্যবস্থা আছে এবং চারি আশ্রমের বাহিরে যখন অত্যাশ্রমিত্বপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রমের কিছুই যখন অন্তিম আশ্রমে বিদ্যমান থাকে না, তখন ক্রমোন্নেষের নিয়ম কি প্রকারে এ স্থলে খাটিবে। বিশেষতঃ পারিব্রাজ্যাশ্রমে কেবল জ্ঞানের খেলা, তাহাতে অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি আশ্রমান্তরের লেশমাত্র অংশেরও স্থান কোথায়?

পত্র দীর্ঘ হইল, অতএব আপনার পুনঃ পুনঃ পরিশ্রমস্বীকারেরর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দিয়া এখানেই পত্র শেষ করিতে হইল।

বিনত
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

বার-ভুঞা।

চাঁদ ও কেদার রায় *।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা একমতাবলম্বী হইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ তাঁহারাই বার ভুঞা নামে বিখ্যাত। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, সাতৈলের রামকৃষ্ণ, চাঁদ প্রতাপের চাঁদগাজি, ভাওয়ালের ফজল গাজি, খিজিরের ঈশা খাঁ মসনদী, তাহেরপুর, পুঁটিয়া ও দিনাজপুরের রাজগণ লইয়া, বারভুঞার দল গঠিত হয়। ইঁহারা শৌর্য্য বীর্য্যে কেহই ন্যূন না হইলেও, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় সর্ব্বাপেক্ষ ক্ষমতাশালী ও নির্ভীক বীর পুরুষ ছিলেন। এক জন বিদেশীয় বিধর্ম্মী ইতিহাস-লেখকের লিখিত বিবরণী হইতে উহার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মিঃ ফারনেন্ডে আরাকান, শ্রীপুর (চণ্ডীপুর), চণ্ডীখান্ (যশোহর) এই তিনটী রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহেব লিখিয়াছেন "মোগলদের পরাক্রম সত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিত। বিশেষত চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরা-

* এই প্রবন্ধটীর প্রথমাংশ "নির্ম্মাল্য" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু উহা পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ঐ পত্রিকা খানি উঠিয়া যায়। এই জন্য আমরা এখন উহার পরিশিষ্ট ভাগ নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

ক্রম সত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। * প্রবল পরাক্রান্ত মোগলাধিপত্য সময়ে যাঁহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা কোন রূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানী 'শ্রীপুর' নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের প্রচুর কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অত্যুচ্চ ও মনোহর হর্ম্ম্যমালা, দেবালয় ও বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, তৎকালে বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রীপুর যথার্থ শ্রীস্থানীয়া ও লোকলোচনানন্দদায়িনী হইয়া উঠিয়াছিল। পরে যদিও পদ্মার অন্যতর শাখা কীর্ত্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি একমাত্র কীর্ত্তিনাশার সহিত উহার যে অর্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতেই রায় রাজগণের কীর্ত্তির কতকটা আভাস ক্ষণস্থায়ী তড়িৎবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়।

বার ভুঞা দল ক্রমে এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে আর কোন মতেও বাধ্য রাখিতে পারিল না। দূরদূরান্তর হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এই বার বুঝি বঙ্গদেশ যবন করতলগত হইতে আবার হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গ সন্তানেরা কিছুকাল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে পরে কিন্তু তাঁহারা আর আত্ম সংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই কূটনীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিণামে সকলেই পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ফলানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন।

'আত্মদ্রোহিতা মহাপাপ' এই কথা ভারতবাসীরা যে কখনও বুঝিয়াছিল, অথবা বুঝিবে, তাহা বিশ্বাসাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যযুগই বল, আর কলিকালই বল, ভারতের যত কিছু বীরানুষ্ঠান সীমাবদ্ধস্থানে স্বজাতীয়ের প্রতিই খাটাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতীয় রাজগণের অশ্বমেধ ঘোটক, হিমালয়, মণিপুর, গান্ধার অতিক্রম করিয়া, কদনই ভিন্নদেশে শুভাগমন করে নাই। বিশেষতঃ পরকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিবাসীর গৃহভিত্তি উচ্ছিন্ন করিতে, এই ভারতীয় জনগণ যতদূর মজবুত, বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও, এমন দ্বিতীয় জাতি মিলে কিনা সন্দেহ। বঙ্গদেশ, এই ভারতের একাংশ মাত্র, সমভাবাপন্নাপেক্ষা স্বজন-নিপীড়ন-স্পৃহা, ইহাদের বরং এক ডিক্রী উপরে। বঙ্গের মৃত্তিকার এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে, তদ্দ্বারা শিব গড়িতে গেলেও বানর হইয়া দাঁড়ায়। উহা বঙ্গের নৈসর্গিক নিয়ম কি তদ্দেশীয় জনগণের ললাটের অখণ্ডনীয় দোষ, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উহারা দশে মিলিয়া কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা সাধারণ জনগণের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় দ্বাদশ

* Early Travels in India by Farnandez pp. 3 & 11.

ভূম্যধিকারীরা স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশ-দ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়া, তাঁহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন। এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি অত্যাচার ও প্রভুত্ব স্থাপনের ত্রুটি করেন নাই। উহার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে, কেহই আর সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া মস্তকোন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া যবন রাজার চরণচুম্বনে কৃতার্থম্মন্য হইল, যাঁহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন, তাঁহাদের মস্তক যবনের অসি প্রহারে, দ্বিখণ্ডিত হইয়া, ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। স্বদেশদ্রোহীরা শত ধিক্কার প্রদান করিলেও, সেই স্বদেশপ্রেমিকগণের দেশ-হিতৈষিতার ও আত্মত্যাগের কথা, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মৃত হইল না। তবে রাজ-নিগ্রহ ভয়ে তাহাদের সেই মনঃক্ষোভ হৃদয়ের অন্তস্থলেই লুক্কায়িত রাখিতে হইল।

গ্রহবৈগুণ্য বা দুরদৃষ্টবশতঃ যখন মানব স্কন্ধে দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া মিশিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা, আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যাইয়া যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন হইল না।

একটী সামাজিক বিষয় লইয়া, কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতির পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত উহার প্রতিকূলাচরণ করে। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীন-ভাবাপন্ন লোকের সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, যদাশ্রয়ে পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে, সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিল।

কোন সময়ে খিজিরাধিপতি ঈশা খাঁ, মিত্ররাজ কেদার রায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া, তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানারূপ আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। কেদার রায় যথাসাধ্য তাঁহাকে যত্ন ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, আমোদ আহ্লাদই পরিণামে তাঁহাদের বন্ধুতাছিন্নের ও চির মনান্তরের কারণে পরিণত হইল।

চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোণামণি, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী, ষোড়শী যুবতী রমণী ছিল। ভাগ্যদোষে বাল্যকালে তাহার পতির মৃত্যু হয়। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতা ও ভ্রাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, জীবন যাপন করিতেছিল। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোন ক্রমে সেই ললনারত্ন সোণামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতা স্খলনের প্রধান অন্তরায়

হইয়া, মিত্ররাজদ্বয়ের পক্ষে, ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে। ঈশা খাঁ যেমন সোণামণির রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, আবার সোণামণিও সেইরূপ খাঁ সাহেবের রূপগুণে মোহিত হইয়া, তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল কি না, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিবার কোন্ উপায় না থাকিলেও, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলে, অনুমান হয় যে, তাহারা পরস্পরের প্রতি নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ঈশাখাঁ, স্বদেশে প্রস্থানানন্তর সোণামণিকে পাইবার জন্য চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে, বিশেষতঃ তাহার মত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে রায়রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর, বিশেষতঃ একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট ঈশাখাঁর স্ত্রী কন্যা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, জন্মপ্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত তৎসাময়িক যবনেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে নাই।

দূতপ্রমুখাৎ ঈশাখাঁর মনোগত ভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্ত্তাবহকে দূরীকৃত করেন। পরে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশাখাঁর অধিকৃত কলাগাইছার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশাখাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁসাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্যা ভগ্নী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। তখন যাহাতে উভয় দিক রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদরায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিত। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু স্ফুণাক্ষরেও সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিত। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশাখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তার পর, ঠিক হয়, যে কোন উপায়ে হউক, শ্রীমন্ত সোণামণিকে আনিয়া ঈশাখাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে খাঁসাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণান্তর, শ্রীমন্ত ঐ সোণামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য, বিক্রমপুর প্রস্থান করে।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীপুর আসিয়া শ্রীমন্ত প্রকাশ করিল, রাজা ও কুমার শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশাখাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। কি রূপে রাজধানী ও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত, রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বৈদ্য বংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায়াবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্য রক্ষার জন্য যতদূর ব্যস্ত না হউন, কন্যা সোণামণিকে

রক্ষার জন্য, তদপেক্ষা অধিকতর উত্তলা হইয়া উঠিলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই ঠিক হইল যে, সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে, একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু রাণীকে কোনরূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে, ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোণার গাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য,সোণামণির সহিত শ্রীমন্ত খাঁ অচিরে সোণার গাঁ পৌঁছিয়া, চাঁদরায়ের সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এইরূপে সুসম্পন্ন হইল যে, চাঁদ বা কেদার রায় এ বিষয়ের কিছুমাত্র পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মনঃক্ষোভে চাঁদরায় যুদ্ধভার কেদার রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদরায় রাজধানীতে পহুঁছিয়া, অমাত্য, বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেননা, কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া, কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে, এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর, তদীয় ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন অকারণে এই লোকক্ষয়কর- যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদরায় মনে ভাবিলেন যে, সোণামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাদশাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। তৎপর কেদার রায়কে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরিত হইল। এই সময়ে কেদার রায়, খিজিরপুর মাথত ও ঈশাখাঁর দুর্গ গুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণী দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন পিতৃ আদেশ প্রাপ্তান্তে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশাখাঁ সম্বন্ধে সোণামণির মনোগত ভাব কিরূপ ছিল, তাহা পরিগ্রহ করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, ও ঈশাখাঁর প্রতি তাহার অনুরাগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, মনে এই উপলব্ধি হয় যে, সোণামণি ঈশাখাঁকে প্রাপ্ত হইয়া অনুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। বরং তাহার জীবনের কতগুলি মহদুদ্দেশ্য সাধন পক্ষে ঈশাখাঁর আশ্রয়ই তাহার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এই বীরললনার গুণবত্তার বিষয় আমরা ঈশাখাঁ মছনদ আলির প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

এই সকল ঘটনার পর, কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদ-

রায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। সেই বীরজীবন, পরিণত বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহ জগতের সুখদুঃখের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া, খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায়, বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবেশন করিলে আকবর বাদশাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রী অব্দে সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে সেরকে হত্যা করিয়া তৎপত্নী মেহেরুন্নসাকে নুর জাহান নাম প্রদান করতঃ আপন সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী করিয়া লন। এই সময়ে বঙ্গীয় জমিদারেরা বাদশাহের প্রতিকূলে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া পর্ত্তুগীস গেঞ্জালিস্ চাঁদরায়ের হস্ত হইতে সন্দীপের আধিপত্য কাড়িয়া লইল। বারভূঞাদল একযোগে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটিল। আবার রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিষম শত্রুতা হইয়া দাঁড়াইল। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খিজিরপুরের ঈশাখাঁ মসনদ আলির অনৈক্য ও যুদ্ধাদির কথা, ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অনর্থকর গৃহবিচ্ছেদে লিপ্ত থাকিয়া, বারভূঞা দল যখন স্বীয় স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সুযোগে বাদশাহ আপনার অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের প্রতি বাঙ্গালার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহ ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজমহলে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তৎকালে বঙ্গীয় ভূম্যধিকারিগণ, বাদশাহের প্রতিকূলে যে কিরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার একটী চিত্র জনৈক মুসলমান গ্রন্থকারের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"জাফর গুলনাৎ-উৎতওয়ারিখ নামক পারস্য পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষ্ণৌ নিবাসী সোর আমি-জাফর, "আরশ-ই-মহাফিল, নামক যে উর্দ্দু গ্রন্থ ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে অনুবাদ করেন, তাহাতে জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়," বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাট সরকারে রাজস্ব দেয় না, উহারা তাহার প্রতিফল পাইয়াছে।"

মানসিংহের সময়ে রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হয়, ঢাকা বাদশাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীর নগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্দ্ধমান ও ঢাকা এই দুইটিকে প্রধান কেন্দ্র স্থান করিয়া মান সিংহ বার ভূঞাদল নির্ম্মূল করেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক জমিদারগণকে অভদ্রই বলুন, যাহাই বলুন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারাই যে, সকল গোলযোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের অযথা আবদার ও অর্থ-লালসা পূর্ণ করিতে না পারায় অনেক ভূম্যধিকারী লাঞ্ছিত হন; এইজন্য আপনাদের মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধান কয়েক জন জমিদার একত্রিত হইয়া বাদশাহের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে স্বাধীন

ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন। জাহাজীরের সিংহাসনারোহণের সহিত সেরসা হত ও তৎপত্নী মেহেরুন্নেসা অপহৃত হওয়ায়, তাঁহার নিকট সুবিচারের আশাও কাহারও রহিল না, কাজেই বাদশাহের বিরুদ্ধে অনেক জমিদারই চলিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মানসিংহ, ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কুলাঙ্গারেরা তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মানসিংহকে ঘরের যাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিল। সৈন্য কিরূপ ভাবে, কোন পথে চালাইলে অনায়াসে যুদ্ধের সুবিধা হইতে পারে, তৎসমুদয় পরামর্শ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। মানসিংহ সমুদয় অবগত হইয়া, রাজগণের নিকটে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। যাহারা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া, মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায়, মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ঈশা খাঁ, বহুপূর্ব্বেই ভূঞাদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর মহারাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদার রায়, রাজা মুকুন্দ রায়, চাঁদ গাজি ব্যতীত আর সকলেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথম যুদ্ধেই মহারাজা প্রতাপাদিত্য অমানুষিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও, স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা আক্রমণ করিয়া, মোগল সেনাপতি, উহা বিধ্বস্ত ও হস্তগত করেন। তৎপরে মোগল বাহিনী ক্রমে অগ্রসর হইয়া, বিক্রমপুর আক্রমণ করিল।

মানসিংহ, শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, তৎ কর্ত্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদ্যপি কেদার রায়, শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না; অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুতার ভাব প্রকাশ করে, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করা হইবে। এতদ্ভিন্ন, ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে একটী শ্লোক লিখিত ছিল। দূতেরা, তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূতেরা, প্রভু-নির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা করিল; মানসিংহের প্রদত্ত পত্রও তাঁহাকে প্রদান করিল। কেদার রায়, প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা ছিল,

> "ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকালী
> সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।
> হয়-গজ-নর-নৌকা-কম্পিতা বঙ্গভূমি-
> বিষম সমর সিংহোমানসিংহঃ প্রযাতি।

ইহা পাঠান্তে কেদার রায় উহার উত্তর-সূচক আর একটী শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত, তোমার প্রভুকে যাইয়া বল, আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয়, তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার স্কন্ধ ছিন্ন হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাঁহা-

রই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হইবে। কেদার রায় উত্তর সূচক যে শ্লোকটী মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,-

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃপশুরেব নান্যঃ॥"

মানসিংহ, কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ ও তল্লিখিত শোক পাঠ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য, সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। আমরা এই স্থলে, কেদার রায়ের অন্যান্য কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ মানসিংহের সহিত তাঁহার সমরাভিনয়ের বর্ণনা করিব।

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্য এই সময়, রাজ সকাশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার জন্য, অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার রায়, তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, সেই কার্য্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্য্য সাধন মানসে, মৃণ্ময়ী কালী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া তদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ কেদার রায়ের এই কার্য্যহিতের পরিবর্ত্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রবাদ আছে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য,তান্ত্রিক বীরাচারী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা বন্দনাদি প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্ন ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণানন্তর, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজা বন্দনাদি করিতেন। গোসাঞি, এই অনুষ্ঠান দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে যাওয়ায়, কেদার রায় উহাতে রুষ্ট হন, অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরু পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য গ্রহণ জন্য, বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণ, কেদারের উপর গোসাঞির ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অর্চ্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল না। তখন আত্মক্ষমতার পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকনগুলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের রাজার এই দেবার্চ্চনার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাহার কল্যাণ কামনায়, নানা উপদেশ প্রদান করিয়া, বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিলাম, সে যখন তাহা শুনে নাই, তখনই জানিয়াছি, তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈবকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাও সে উপেক্ষা করিল। অতএব তাহার অশুভ অনিবার্য্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে অবলোকন কর। এই বলিয়া শাণিত খড়্গ তুলিয়া, প্রতিমার বুকে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষত স্থান হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি তৎক্ষণাৎ

কোথায় চলিয়া গেলেন। এই সকল সমাচার, অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন। পরে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর দর্শন পাইলেন না।

বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটী কালী ক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাঁচুর তলার ঠারিণ বাড়ী" অপরটী মাঐসারে দিগম্বরী বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মাণ্ডগিরি এবং মাঐসারে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ঐ উভয় স্থানে কি স্বদেশী, কি বিদেশী, হিন্দুরা আসিয়া পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকে। ঐ সময়ের তান্ত্রিক গুরুগণ সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মেহার প্রদেশে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধি করিয়া, উহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করণনান্তে, স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিল্বপুকুর-নিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য * সিদ্ধিলাভ করিয়া বেলপুকুরে ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করায়, হয় ত পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করা, বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। বহু চেষ্টায় যতটুকু জানা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে, কোন মতেও ইচ্ছা জন্মে না। এখন উহা পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে আর পাইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণে অস্বাভাবিক গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার কতকটা না রাখিয়া পারা যায় না। কেদার রায় মাতৃনিদেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাঁচুরতলার নিকটে অপর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া, অনায়াসে দেবীর অর্চ্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হয়। মিঃ রালফ্‌ফিস্‌ তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই রাজাবাড়ীর ১৮ মাইল ব্যবধানে ঈশাখাঁমসনদ আলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই রাজাবাড়ীর অনতিদূরে কেশার-মার দীঘী" নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ কেশা অথবা কেশবের মাতা, পতি-পুত্র হীনা হইয়া, পতিকুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। বিক্রমপুরাঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া যে এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে। তাহাদের রমণীরা বিপন্নাবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণানন্তর, প্রভু পরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। এই সিকদার শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রভু পুত্রের 'ধাই ভাই' হইতে পারে, তাহারা বড়ই সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাই ভাই বিক্রমপুরে 'আতা ভাই' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, চাঁদ রায় কেশার মাকে তাহার ধাত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া, পুত্রের প্রতিপালনভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ো-

* আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে (নির্ম্মাল্য ১৩০৭ সন জ্যৈষ্ঠ) রামচন্দ্রকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের জামতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, জামাতা নহে দৌহিত্র। রামচন্দ্রের পিতার নাম যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম লীলাবতী।

প্রাপ্ত হইয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীমাতার ইচ্ছানুসারে ঐ বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া, তদ্দ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই জন্য ঐ জলাশয়ের নাম হয়, "কেশার মার দীঘী"। আরও প্রবাদ এই যে, কেশার মা যতদূর হাটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে কেশার মা, প্রায় মাইলব্যাপী স্থান চলিয়া যাওয়ার পর, অন্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এই জন্য ঐ দীঘীও মাইলব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হয়। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দীঘীর পাড়ের হাটকে সাধারণে, দীঘীর পাড়ের হাট বলিয়া অভিহিত করে।

রায় রাজগণের রাজত্বকালে, এই সকল কীর্ত্তি ব্যতীত বিক্রমপুর আরও নানা প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাও কেহ কেহ এই সময়ে পুনরায় আগমন করেন। নবশাক সমাজ বিক্রমপুরে চিরন্তন বাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা অন্যান্য স্থানের অধিবাসী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে। রায় রাজগণ কর্ত্তৃক সাড়ে তিন ঘর কুলীন কায়স্থ বিক্রমপুরে আনীত হয়। তন্মধ্যে মালখানা নগরের বসু, রাগাস বরের (শ্রীনগরের) গুহ মুস্তফি ও পরে নীঘার ঘোষ পূর্ণ কুলীন তিন ঘর এবং কাঠাদিয়ার দত্ত অর্দ্ধ ঘর কুলীন ধরিয়া, সাড়ে তিন ঘর কুলীন নির্দ্দিষ্ট হয়।

যশোহরের কায়স্থ সমাজ, বিক্রমপুরের সমাজ সংস্থাপনের পরে সংগঠিত হয়। মালখানা নগর নিবাসী যদুনন্দন বসু, বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নীত হইয়া, যশোহরের অন্তর্গত মাঙ্গলপাড়া গ্রামে, প্রচুর বৃত্তিসহ বাস করিতে থাকেন। মালখানা নগর নিবাসী বাসুদেব ও রঘুনাথ বসু এইরূপে যশোহরের রাজাদের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ যশোহরের অন্তর্গত খোরগাছি ও শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন। এই সূত্রে বলা যাইতে পারে, যশোহর কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতা, রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, বিক্রমপুরের রায় রাজগণের সাহায্যেই এইরূপে বিক্রমপুর হইতে কুলীন উঠাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য, কায়স্থ সমাজ প্রবেশ কালে, সর্ব্ব প্রথম বিক্রমপুরাধিপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হন। তাঁহার দ্বারাই যশোহর ও চন্দ্রদ্বীপাধিপতি বাধ্য হইয়া, লক্ষ্মণের সমন্বয় কার্য্যে যোগদান করেন। এই সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে, বিক্রমপুর সমাজের যে যে গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়াছিল না, রাজাদেশে তাহারা কুলচ্যুত হয়। এইরূপে চতু মণ্ডল, চাঁদনী, চাকুলী ও বেজগাঁ বাসীরা কুলচ্যুত হইয়াছিল। এতদ্বিষয় রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের প্রকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর বিক্রমপুরে কতকগুলি সমাজ বিপ্লবকর কার্য্য উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে নানারূপ মতভেদ হইয়া পড়ে। এই অবসরে নবশাক সম্প্রদায় ও অন্ত্যজ হিন্দুরা স্ব স্ব ক্ষমতার বৃদ্ধির প্রয়াস পায়। কিন্তু রায় রাজগণের শাসন প্রভাবে, তাহারা সেই ক্ষমতা অর্জ্জনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিন জাতিকে গুরুবৎ সম্মাননা করিয়া

চলিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত এক সম্প্রদায় নীচ শূদ্র সম্মিলিত হইয়া তাহাদের সমাজকে অধুনা নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। বৈদ্য ও কায়স্থের পরস্পর সংঘর্ষণে অন্ত্যজ নবশাক প্রভৃতি জাতিরা পুনরায় অভ্যুদয় লাভ করিয়া, ঐ উভয় জাতিকে অমান্য করিয়া চলিতে চাহে। যে সকল শূদ্রেরা অধুনা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছে, রায় রাজগণের রাজত্ব কালে, তাহারা নিগ্রহ ভোগ ভয়ে কিছুতেই কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সাহসী হইত না। যাহারা এক সময়ে ক্ষত্রিয় জাতিকে স্ব সমাজে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যে স্ব সমাজে নীচ শূদ্রকে গ্রহণ করিত, তাহা কোন মতেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

রায়রাজগণের এই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডনিভ প্রখর শাসন প্রভাবে যখন নানাবিধ সুখ সমুদিত হইয়া বিক্রমপুরের ক্ষতদেহ পুনর্ব্বার পূর্ণ নিরাময় করিয়া তুলিতেছিল, সেই রমণীয় দিনে অকস্মাৎ মোগল ঝঞ্ঝাবাত সমুত্থিত হইয়া, সেই সুখশান্তিময় নিকেতনকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। উহা এত ত্বরিতে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, উহা ভাবিবার অবসরও কেহ পাইল না।

অচিরে মোগলবাহিনী পুষ্ট ও রাজপুত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বদেশ ও স্বজাতি-দ্রোহী মানসিংহ, বঙ্গের বীরপুত্রগণকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে প্রায় সকল ভূঞারাই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, মাত্র প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় ও চাঁদ গাজি কোন মতে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল না। গৃহশত্রুকুলের প্রতিকূলাচরণে এই বীরগণের বলবিক্রম ও অভিসন্ধির কথা মানসিংহ পূর্ব্বে [illegible] অবগত হইয়াছিল। পরে সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে আক্রমণ করিতে লাগিল। মানসিংহ যশোহর ও ভূষণা অধিকার করিয়া পরে, বিক্রমপুর আক্রমণ করিল। বিক্রমপুরাধিপ কেদার রায়, কোনরূপ পশ্চাৎপদ না হইয়া, সিংহবিক্রমে মোগল সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নয় দিবস পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম চলিল, কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না, দশম দিবসে কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবীর অর্চ্চনার জন্য দশমহাবিদ্যার মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করত ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ঐ সময় মোগল পক্ষীয় এক গুপ্ত ঘাতক অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ধ্যান-নিমগ্ন মহাবীর কেদারকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। গৃহশত্রু বিশ্বাস ঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ এই বিষয়ের প্রধান প্রযোজক হইয়াছিল।

বঙ্গজননীর সেই প্রিয় বীরপুত্র এইরূপে চিরনিদ্রিত হওয়ায়, বঙ্গের শেষ সৌভাগ্যের ও পরপদ শৃঙ্খল স্খলনের পথে চির অর্গল নিবদ্ধ হইল। বিক্রমপুরাধিপের এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার সৈনিকেরা ভীত হইয়া পড়ে, কিন্তু মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ও সেনাপতি কমল শরণ রায়, কোন মতে ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সেনানায়কগণ মধ্যে কালিদাস ঢালি, রাজরাজা সরদার, পর্টুগিজ ফ্রান্সিস এবং সেখ কালু ও তাহাতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু পরিণামে সেখ কালু ও ফ্রান্সিস্ বিপক্ষের সহিত যোগদান করে। মানসিংহ এই সময় রঘুনন্দনকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তাঁহারা এখনও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বাদশাহের আজ্ঞা

সত্য স্বীকার করে, তবে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে এবং বিক্রমপুরের প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া কেদার রায়ের পত্নীর হস্তে রাজকার্য্য সম্পাদনের ভারও রাখা যাইতে পারে।

একেইত রাজা বিহনে সৈন্যেরা নিরুৎসাহী, তাহাতে দুইজন সেনানায়ক তাহাদের দল পরিত্যাগ করায় উহারা অধিকতর, ভয়-বিহ্বল হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় রঘুনন্দন ও কমলশরণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই বিধেয়। রাণীকে এই বিষয় পরিজ্ঞাত করান হইল, তিনিও আর যুদ্ধের পোষকতা করিলেন না। পরে রঘুনন্দন, কমলশরণ, কালিদাস ও রামরাজা প্রভৃতি অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ মানসিংহ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহারা আনুগত্য স্বীকার করিলেন। সেই দুর্দ্দিনে বিক্রমপুরের এই শেষ অধঃপতনের সহিত, সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতার প্রয়াস, একেবারেই চিরবিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। যে কাল পর্য্যন্ত কেদার রায়ের মহিষী জীবিতা ছিলেন, ততদিন রাজকার্য্য তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রাণী লোকান্তরিতা হইলে পর, মোগলরাজ প্রতিনিধির আদেশ মত, চাঁদ রায়ের রাজ্য বিভক্ত হইল এবং বিক্রমপুর রঘুনন্দন, ইদিলপুর কমল শরণ, এবং সেক কালু কার্ত্তিকপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ বংশীয় কালিদাস ঢালি ও রামরাজা সরদার দেওভোগ ও মূলপাড়া পৃথক্ দুই তালুক প্রাপ্ত হইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিল। পরে এতদ্বংশীয়েরা মুখুটিও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করে। বঙ্গের শেষ স্বাধীনতার প্রয়াস এইরূপে বিলয় প্রাপ্ত হইলে পর, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির আশা, আর কাহারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। প্রবাদ কেদার রায়ের ছিন্নমুণ্ড, ভূপতিত হইয়াও "ছিন্নমস্তে নমস্তে" এই বলিয়া আপনার ইষ্টদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। পুণ্যময় স্বদেশ-প্রেমিক মহারাজ এইরূপে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, আপন কীর্ত্তির ও বীরত্বের শত শত নিদর্শন রাখিয়া, ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পথপ্রদর্শক হইয়া বীরভোগ্য সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। পরে কিন্তু তাঁহাদের অনুকৃতি আর বঙ্গে প্রদর্শিত হইল না।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনের কথা।

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরাজি ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ সাল। আজ রবিবার। ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংস দেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল মাষ্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা ১ টা ২ টার সময় কালীবাড়ীতে পঁহুছিলেন। তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণিলাল মল্লিক ইত্যাদি কয়েকজন ভক্ত বসিয়াছিলেন।

রাসমণির কালীবাড়ী গঙ্গার উপরে। বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিব মন্দির। সারি সারি শিব মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্দ্ধ মণ্ডলাকার বারাণ্ডা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারাণ্ডার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ীর পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহু দূরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্য্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত—যেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বে উদ্যানের প্রবেশ দ্বারদ্বয় পর্য্যন্ত। পরমহংস দেবের ঘরের কোলে দু একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ শ্বেত ও পদ্ম করবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে "পিটার জল মধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতেছেন" সে ছবি খানিও আছে। আর একটী বুদ্ধ দেবের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তক্তপোষের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজের উপর কেহ মাদুরে কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দময় মুর্ত্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালের খরস্রোত যেন সাগর সঙ্গমে পঁহুছিবার জন্য কত ব্যস্ত। পথে কেবল একবার মহাপুরুষের আরাম মন্দির দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক একটী পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত। বয়স ৬০ কিম্বা ৬৫ হইবে। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, আজ ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহার কাছে কাশী পর্য্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন।

[জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বাণ-মত।]

মণিমল্লিক। আর একটী সাধুকে দেখিলাম। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়-সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌লে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম দম তিতিক্ষা এই সব চাই। এরা নির্ব্বাণের চেষ্টা কর্‌ছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে। বলে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বল্‌ছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও মিথ্যা। স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

কি রকম জান? যেমন, কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন আমি তুমি জগৎ এ সবের খবর কিছু থাকে না।

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও জ্ঞানযোগ]

পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি মা, মা, কর্‌তুম, তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পঠিয়ে দিলুম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না? শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো। এতো জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না। কথা কয়ে

এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বল্লে, "ভক্তের সঙ্গ কর্‌বার কামনা ত্যাগে ক'রো, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত কর্‌বে।" বৈষ্ণব চরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল, আমায় আবার ব'ল্লে 'আপনি একটু শুনুন'। একটা সভায় বিচার হয়েছিল—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়, 'শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে। পদ্মলোচন এম্‌নি সরল, সে ব'ল্লে 'আমার চোদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখেন নাই।' কামিনীকাঞ্চন—ত্যাগ শুনে আমায় এক দিন ব'ল্লে, 'ওসব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা এটা মাটি, এ ভেদ বুদ্ধি জ্ঞান তো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বল্‌বো! ব'ল্লাম, কে জানে, আমার টাকা কড়ি, ও সব ভাল লাগে না।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাসাগর]

"একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মান্‌তো না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য কে বুঝ্‌বে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁষ হ'য়ে রৈল। একটু হুঁষ হবার পর কা! কা! কা! এই শব্দ কেবল ক'র্‌তে লাগ্‌লো।

একজন ভক্ত। মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো?

রামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোণা চাপা আছে। যদি সেই সোণার সন্ধান পেতো, তাহলে এতো বাহিরের কাজ, যা কর্‌ছে, তা কম প'ড়ে যতো, শেষে একবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন, একথা জান্‌তে পার্‌লে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারুর কারুর নিষ্কাম কর্ম্ম অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ ক'র্‌ছে, সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল, দয়া আর মায়া, অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগনে বাপ্‌মা এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা।

(ক্রমশঃ)

দর্শন শাস্ত্রে প্রমাণ। (১)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ কি; তাহা জানিবার আবশ্যক হয়, তখনই প্রমাণ তত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করা দর্শন শাস্ত্রের এক উদ্দেশ্য। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই প্রমাণের স্বরূপ বুঝা যায়।

আমাদের এক দিকে বাহ্যজগত ও অন্য দিকে তাহার প্রকাশক জ্ঞাতা। মধ্যে আমাদের অন্তঃকরণ ব্যবধান রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তিকে এই অন্তঃকরণের অন্তর্গত ধরিলে এই অন্তঃকরণ বৃত্তিকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে সম্বন্ধ এই তিন বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ দ্বারাই স্থাপিত হয়। অথবা এই অন্তঃকরণ বৃত্তিতেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব পরিস্ফুট হয়।

যোগ শাস্ত্রে আছে, আমাদের দৃক্ শক্তি

ও দর্শন শক্তি এক নহে। আমাদের অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও জ্ঞাতা এক নহে। এই জন্য যোগসূত্রে বৃত্তিস্বরূপে অবস্থান ও জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখান হইয়াছে। দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান কাহাকে বলে, তাহা যথাস্থানে দেখান হইবে। এ স্থলে বৃত্তিস্বরূপে অবস্থান কি—তাহাই আলোচ্য। কেন না, বৃত্তিস্বরূপে অবস্থান হইতে আমাদের যতদূর জ্ঞানার্জ্জন সম্ভব, তাহাই সাধারণতঃ দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

এই জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয় জানিতে পারি। যখন অন্তঃকরণে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার সহিত যে আমি এই বাহ্য বিষয় জানিতেছি, সেই আমি বা জ্ঞাতার জ্ঞানও অল্লাধিক স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়। কেন না বাহ্য বিষয়জ্ঞান আমাকে অনুরঞ্জিত করে—আমাতে সুখ দুঃখাদির অনুভূতি উৎপন্ন করে। তদনুসারে জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়া হইতে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় ভাবই অল্লাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়।

যখনই অন্তঃকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব পরিস্ফুট হয়, তখনই যে বাহ্যজগতের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয়, তাহা নহে। যখন নিদ্রাবৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ অভিভূত থাকে, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব আদৌ থাকে না। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব থাকে। ইহার মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যজগতের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকে না। তখন অন্তঃকরণের পূর্ব্ব সংস্কারই জ্ঞেয়রূপে জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। এই সকল পূর্ব্ব সংস্কার, বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের পূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে জন্মে। যাঁহারা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন যে, কেবল এই জন্মে বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ বা ক্রিয়া হইতে যে এই সকল সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও এইরূপ যে সম্বন্ধ ও ক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা হইতেও সংস্কার উৎপন্ন হইয়া মরণান্তস্থায়ী অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এই বিষয় ও অন্তঃকরণ মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে ক্রিয়া বা যে ঘাত প্রতিঘাত হয়, তাহা হইতে অন্তঃকরণে যে ছাপ্, যে ছায়া বা যে দাগ্ পড়ে, তাহা নষ্ট হইবার নহে। তাহার দ্বারা অন্তঃকরণের কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তাহাই অন্তঃকরণে সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তাহার নাশ হয় না। কিন্তু সে সকল বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে। (১)

(১) এই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।—

'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের বিষয়াকারা বৃত্তি জন্মে। সেই সকল মনোবৃত্তির নাম মনঃপ্রচার। আত্মা সেই মনঃপ্রচারে উপস্থিত (জ্ঞাতা) বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রত আখ্যা প্রাপ্ত হন। আবার তিনিই সেই জাগ্রদ্বাসনাবিশিষ্ট মনোমাত্রে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন। জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি সুপ্ত হন। সুপ্ত অবস্থায়...মনের বৈচিত্র্য থাকে না, সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, কাজেই সেই কালে আত্মা আপন স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হন, আপনাতে লীন হন। (পাতঞ্জল দর্শনে আছে, নিদ্রা সমাধি সোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা)।' (শাঙ্কর ভাষ্য, ১৮৫ পৃ)

অন্যত্র আছে, সুপ্তিকালে যে প্রাণবৃত্তির অলোপ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপ হয়, প্রবোধ কালে আবার তাহাদের আবির্ভাব হয়, এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

(ঐ ২৪৪ পৃঃ)

অন্যত্র আছে, আত্মা-স্বপ্নে বাসনাময় বিষয়ে বিচরণ করেন। (ঐ ৪৫৬ পৃঃ)

আমাদের অন্তঃকরণের আর এক শক্তি আছে, তাহাকে স্মৃতি বলে। এ জীবনে বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে অন্তঃকরণে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, স্মৃতি শক্তির দ্বারা উত্তেজনা বিশেষ হইতে তাহার স্মরণ হইতে পারে। তাহা হইতেও জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব অন্তঃকরণে পরিস্ফুট হয় (২)। এই স্মৃতি দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার জানা যায় না। এই স্মৃতি হইতে, এবং বাহ্যজগতের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হইতে, আর এক প্রকার অন্তঃকরণবৃত্তির ক্রিয়া হইতে পারে, তাহাকে কল্পনা বা বিকল্প বলা যায়। ইহা ব্যতীত এই সংস্কার হইতে বিপর্য্যয় বা

আর এক স্থানে, সম্প্রসাদ শব্দ বোধ্য জীব জাগ্রদবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যক্ষ হইয়া বহিশ্চর থাকেন। পরে বাসনানির্ম্মিত স্বপ্নানুভব করিতে নাড়ীচর হন। অনন্তর শ্রান্তি প্রযুক্ত অন্তঃশরণ প্রার্থী হইয়া উক্ত দ্বিবিধ শরীরাভিমান ত্যাগ করেন; করিলে সুষুপ্তি হয়। (ঐ ৪৬২ পৃঃ)

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্মিতা হেতু (দৃক্ বা দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তি,—বুদ্ধিতে ইহার একাত্মতা ধারণাই অস্মিতা,—পাতঞ্জল দর্শন ২।৬ দ্রষ্টব্য) জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদের এই নিদ্রা জাগরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপ সিদ্ধান্ত করেন। ইঁহারা অহং জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে—

"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততং। (স্মৃতি)

এই মতানুসারে পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন, that power (will) which sleeps in the stone dreams in animal, and wakes in man.'

(২) এস্থলে স্বপ্ন ও স্মৃতির পার্থক্য উল্লেখ করা উচিত। স্মৃতি রূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি বর্ত্তমান হইলেই স্মৃত বিষয় বা সংস্কার যে অতীত, তাহার ধারণা থাকে। কিন্তু স্বপ্নে যে সকল বিষয় মনে উদিত হয়, তাহা বর্ত্তমান বলিয়াই ধারণা হয়। স্মৃতি ও স্বপ্নের সহিত কল্পনার সংস্রব থাকে।

মিথ্যাজ্ঞানও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-জাত। এই বিপর্য্যয় বিকল্প, স্মৃতি ও নিদ্রা হইতে প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই প্রমা জ্ঞান— প্রমাণবৃত্তিজাত। পাতঞ্জল দর্শন মতে এই প্রমাণ বৃত্তি—অন্তঃকরণের এক বিশেষ বৃত্তি মাত্র। কেবল এই বৃত্তি হইতে প্রমা জ্ঞান হয়। এবং এই জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। বৃত্তি স্বরূপে অধিষ্ঠিত জ্ঞাতাই জ্ঞেয় বিষয় জানিতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ—ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা। (১।৫)
প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ। (১।৬)

সাধারণতঃ এই প্রমাণের দ্বারাই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতায় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"জ্ঞান এক প্রকার মনোবৃত্তি, অবগতি তাহার ফল। অর্থাৎ জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞেয়রূপ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ পাওয়ার নাম জানা। সুতরাং অবগতি পর্য্যন্তই জ্ঞান শব্দের বোধ্য।"

(ভাষ্যোপক্রমণিকা, ২৫ পৃষ্ঠা)।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেনঃ—

"জ্ঞান এক প্রকার ক্রিয়া বটে, মনোব্যাপার বটে, কিন্তু তাহা বিধিযোগ্য বা নিয়োগাধীন নহে। জ্ঞান ও ক্রিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন। জ্ঞান মাত্রেই বস্তুস্বরূপ সাপেক্ষ, কিন্তু ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ......ক্রিয়া পুরুষের চিত্তের অধীন।

এইরূপ ধ্যান ও চিন্তা বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবে। ধ্যান যেমন ক্রিয়া, জ্ঞান সেরূপ নহে। ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। যদিও তাহা মানস ব্যাপার, তথাপি তাহা পুরুষের অধীন। ইচ্ছা করিলে পুরুষ তাহা করিতে পারে, না ও করিতে পারে, অন্যথাও করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নহে।

জ্ঞান প্রমাণ নিষ্পাদ্য—প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। কাজেই তাহা ইচ্ছানুসারে করা না করা বা অন্যথা করা যায় না। তজ্জন্য তাহা

বস্তুর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে পুরুষেরও অধীন নহে। অতএব জ্ঞান পদার্থ মানস হইলেও—মনোব্যাপার বা মানসক্রিয়া হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ আছে। * * । প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নি বুদ্ধি, তাহা ··না পুরুষে অধীন, না নিয়োগের অধীন, এবং না কেবল চিত্তে অধীন। তাহা সেই প্রত্যক্ষীভূত অগ্নিবস্তুরই অধীন অগ্নি স্বরূপ প্রত্যক্ষ. হইলেই তাহা হইবে, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।"

শঙ্করভাষ্য, ১।১।৪ সূত্র (১২৩-২৪ পৃঃ

বেদান্ত পরিভাষায় আছে যে, "বৃত্তিরূপ জ্ঞানের মনোধর্ম্ম। কামনা, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী—এই সকল মন—ইহা শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়। ধী শব্দে বৃত্তি জ্ঞান বুঝা যায় এই জন্য কামনাদিও মনের ধর্ম্ম।" সুতরাং প্রমাণরূপ জ্ঞানবৃত্তি যে অন্তঃকরণ ব্যাপার, ইহা বুঝা যাইবে। *

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যেমন একদিকে বাহ্যজগতের সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সম্বন্ধ হয়—সেইরূপ অন্য দিকে জ্ঞাতার সহিতও অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয়। যুগপৎ এই উভয় সম্বন্ধ হওয়াতেই এই জ্ঞানের উদয় হয়। আমরা এখানে বলিতে পারি যে, মনে এই উভয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একদিকে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া অথবা দেহ বিষয়ে মানস অনুভূতি দিয়া—বিষয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপনা হয়, অন্য দিকে বুদ্ধিযোগে জ্ঞাতার সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপন হয়। আর এইরূপে অন্তঃকরণবৃত্তিতে এই সম্বন্ধ হইতেই জ্ঞান হয়। প্রমাণবৃত্তি এই সম্বন্ধ হইতে জাত।

* According to Locke, perception, retention or contemplation and memory, descernment and comparison, composition abstracction the will with pleasure, pain and the passions—are operations of the mind. (Cousins' History of philosophy, vol. 2).

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের এই সম্বন্ধ লইয়া প্রধানতঃ তিন রূপ মত প্রচলিত আছে। এইরূপ বিভিন্ন মত হইবার কারণ এই যে, শুধু প্রমাণের দ্বারা এই সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। আত্মা নিরবয়ব, কিন্তু বিষয় অবয়বযুক্ত। জ্ঞাতা আত্মার স্থানব্যাপ্তি স্বীকৃত হয় না, জ্ঞেয় বিষয় স্থানব্যাপক। নিরবয়ব বস্তুর সহিত অবয়বী বস্তুর সম্বন্ধ, আত্মবস্তুর সহিত অনাত্ম বস্তুর সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। তথাপি দার্শনিকগণ ইহার একরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বাহ্য জগৎ হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম অণু বা শক্তি-প্রবাহ বা গতি বা কম্পন ইন্দ্রিয়দ্বারে গিয়া ক্রিয়া উৎপন্ন করে। ইন্দ্রিয়পথে সেই ক্রিয়া, মন ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর কার্য্য করে। জ্ঞান সেই ক্রিয়ার ফল। সেই ক্রিয়া হইতে জ্ঞাতা বা আত্মার উৎপন্ন—তাহা হইতেই আমি এই সকল বিষয় দেখিতেছি, বা শুনিতেছি, কি অনুভব করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান হয়। সুতরাং এই আমি বা জ্ঞাতা জড়। মস্তিষ্কই সেই জ্ঞানের আধার—তাহার অন্য আধার নাই। যেমন চারিদিক হইতে আলোক রশ্মি—সুগোল স্ফটিক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেন্দ্রীভূত হয়, ও কেন্দ্রস্থলে ঘনীভূত তেজঃ স্বতঃপ্রকাশিত হয়—সেইরূপ বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয় পথে গিয়া মনোমধ্যে যে ঘনীভূত হয়, তাহারই ফল জ্ঞান। অতএব যাহারা এই বাহ্যপ্রবাহ বা প্রতিলোমপ্রবাহ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি কল্পনা করেন, তাঁহারা অখণ্ডনীয় যুক্তি বলে—অবশেষে জড়বাদী হইয়া পড়েন। আমাদের দেশে,চার্ব্বাক, তার্কিকগণ ও পাশ্চাত্য দেশে, লক, হিউম্, কণ্ডিলক্

প্রভৃতি এই বাহ্যপ্রবাহবাদী। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের সাধারণতঃ এই মত যে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব যখন মনে গিয়া পতিত হয়—এবং মন যখন তাহা গ্রহণ করে, তখন মনও সাকার এবং জড়। এই মনই কোন অজ্ঞাতশক্তি বলে, জ্ঞাতা হইয়া এই বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করে। যাহা হউক, এই সিদ্ধান্ত ধারণা করা যায় না, এবং যুক্তিবলেও তাহা অকাট্য রূপে স্থাপিত হয় না। তাহা যদি হইত, তবে জড় ব্যতীত আত্মবাদ অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্ব—পরকালত্ব প্রভৃতি, কোন দার্শনিক সিদ্ধ করিতে পারিতেন না। মনোধর্ম্ম জ্ঞাতার জড়ত্ব ও উক্ত বহিঃপ্রবাহের জ্ঞানজনন-শক্তি কল্পনার পক্ষে সেই জন্য অনেক বাধা আছে। সে সকল বিষয় আমাদের এস্থলে বিশেষ রূপে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এই বহিঃপ্রবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বহিঃপ্রবাহ বলিলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বাহ্য ব্যাপারের ছবি বা ছায়া দ্বারা এবং আন্তরিক সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি অনুভূতির প্রতিক্রিয়া মনে বা বুদ্ধিপটে পতিত হয়। তাহা হইতে সেই ব্যাপারের অনুভূতি বা প্রতীতি জন্মে। এই প্রতীতি একরূপ ক্রিয়ার ফল। আমাদের মস্তিষ্কে এই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়া হইতে মস্তিষ্কের মধ্যে একরূপ পরিবর্ত্তন হয়—এক প্রকার ছাপ পড়ে—তাহা থাকিয়া যায়।(১) অবস্থা বিশেষে বা সম্বন্ধ বিশেষ হইতে সেই ক্রিয়ার আভাস মস্তিষ্কে উদয় হইতে পারে। তাহারই ফল স্মৃতি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, কার্য্যাবস্থা ও

(১) আধুনিক বিলাতী পণ্ডিতদিগের মধ্যে 'লক' এই বাহ্যপ্রবাহবাদ বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার কৃত "Human Understanding" নামক পুস্তকে কেবল মাত্র এই একটী তত্ত্ব বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে সেই তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝান সম্ভব নহে। এজন্য আমরা এস্থলে কেবল তাহার আভাষ দিলাম মাত্র।

লকের মূল কথা এই ;—

"Our observation, employed either about external sensible objects or about the internal operations of our minds, perceived and reflected on by ourselves, is that which supplies our understanding with all the materials of thinking. These two are the foundations of knowledge from which all the ideas we have, or can naturally have, do spring (Essay on Human understanding Book I, ch. I § 2).

First our senses convey into our mind several distinct perceptions of things, and thus we come by these ideas (of white, hard, sweet &) and all those other things we call sensible qualities. This source of our ideas is *perception.*

Second, in the perception of the operations of our mind within us, which the *soul comes to reflect* on and consider, do furnish the understanding with another set of ideas (thinking perceiving doubting believing, reasoning, knowing, willing &c). The source of these ideas is *Reflection.*

Thus external objects furnish the mind with all the ideas of sensible qualities, and the mind furnish the understanding with ideas of its operations. The understanding has no glimmering of any ideas which it does not receive either from sensation or reflection. According to Locke understanding is only an instrument whose whole power is spent up on sensation : all abstract ideas can be ultimately traced to sensation. Cousin says, "But Locke did not confound the sensation with the operations of the soul—though his sucessors did, when only the sensualistic school was constituted."

আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে বেকন, গেসেণ্ডি, হব্‌স হিউম, কাণ্ডিলাক্ হারবার্ট এবং প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে ইপিকিউরস, আনাক্সাগোরস্ স্কেপ্টিক্স্ ষ্টোইক্স্ ও একুইনস্, ইঁহারাই প্রধানতঃ এই বহিঃপ্রবাহবাদী। আমাদের দেশের চার্ব্বাক, বৃহস্পতি ও ক্ষণভঙ্গবাদী সৌগত বৌদ্ধগণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এস্থানে সংক্ষেপে ইঁহাদের দুই চারি জনের মত দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

Anaxagors—"Sensous perception

কারণাবস্থা পরস্পর সম্বন্ধ। কার্য্য কারণে লয় হইলেই সাধারণতঃ লয় হইল মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে কার্য্যের অত্যন্ত অভাব হয় না। আবার উপযুক্ত অবস্থার সমাবেশ হইলে সেই কারণ পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করে। সুতরাং এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বাহ্যবিষয় ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কে যে ক্রিয়া উৎপাদন করিবে, যে ছাপ বা যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দিবে,—তাহার ফল মস্তিষ্কেই থাকিয়া যাইবে। উপযুক্ত অবসর পাইলে তাহা পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্ত হইবে। অনেক গুলি ব্যাপার পরস্পর সম্বন্ধ জন্য, যদি এক সময়ে মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া উৎপাদন করে, তবে তাহার কোন একটী রূপ ক্রিয়া পরে আরম্ভ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যাপার গুলিই উদিত হইতে পারে, জ্ঞানে সূক্ষ্ম বা লীন অবস্থা হইতে স্থূল বা প্রকাশিত অবস্থায় আসিতে পারে। ইহাকেই স্মৃতি বলে। এই রূপ একটী ব্যাপারের অব্যবহিত পরে যদি আর একটী ব্যাপার জ্ঞানে উদিত হয়—এবং এই উভয় ব্যাপার কার্য্যকারণ সূত্রে সম্বন্ধ বলিয়া ধারণা হয়, তবে ইহার একটীর ক্রিয়া পরে উদিত হইলে—মস্তিষ্কে তাহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার স্ফুরণ হইবে। সুতরাং মস্তিষ্কে বা জ্ঞানের আধারে বাহ্য বিষয়ের এইরূপ ক্রিয়া—সংস্কাররূপে সেই ক্রিয়ার বীজ মস্তিষ্কে থাকিয়া যাওয়া এবং উপযুক্ত অবসরে তাহার পুনঃপ্রচার হওয়াই আমাদের জ্ঞান জন্মাইবার কারণ।

কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অনেক গোলযোগ হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কে উপ্ত থাকা স্বীকার করিলেও, সে ক্রিয়ার সহিত জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। সকল ক্রিয়া কিছু যুগপৎ আরম্ভ হয় না—সকল সংস্কার কিছু একেবারে প্রস্ফুটিত হয় না। এক একটী

is not the source of knowledge, but knowledge itself."

Epikuros—Copies of things enter materially in us, their repeatation gives rise to images of memory, and from these the soul attains to the knowledge of the universals.

Stoics—"all our knowledge springs from actual impressions on us of the external things, from the objective experience of sense, which are thus combined into notions by the understanding, knowledge then is not one to the subject out to the object, and therefore it is true."

Aquinas—Human knowledge is possible by the action of the objects on the knowing soul. Senses grasp external accidents and intellect requires their phantasms, which it renders intelligible by the power of abstraction.

Bacon—All knowledge must he given by experience.

Hobbes—Consciousness is the result of organisation, all ideas come from the senses: all sensible perceptions are movements of infinitely small atoms that act upon the organs of sense, and cause motion in them. To think is to calculate; reasoning is reducible to addition and subtraction.

Condillac—In agreement with Locke he began from the proposition that all our knowledge begins from experience. Whilst Locke however assumed two sources of this empirial knowledge—sensation and reflection or external and internal sense. Condillac contended for the reduction of both into one of sensation.

Herbert—The foundation and starting point of philosoply is the common view of things—knowledge given by experience.

Hume—He completed Locke by assuming and drawing attention to this, that on that standpoint experience is indeed the foundation of what is known or perception, contains all that happens; but causation universality and necessity are not given by experience but by custom.

লোকায়ত মত এই—"চক্ষুরাদ্যক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্ম্মনঃ। অন্তঃকরণ বহিরিন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র। স্বতন্ত্ররূপে বাহ্য বিষয় অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

ক্রিয়া বা এক একটী সংস্কার মণির ন্যায় মস্তিষ্ক আধারে যদি গ্রথিত হয়, তবে তাহাদের কোন্ সূত্র দ্বারা বদ্ধ করা যাইবে? মস্তিষ্কের মধ্যে সে সূত্র কেহই খুঁজিয়া পান না। কোন যুক্তিতে সে সিদ্ধান্ত করা যায় না। যদি তাহাই হইত, তবে আমি এই সকল উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ বিষয় আমিই স্মরণ করি—এই আমিজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? মস্তিষ্ক বা তদধিষ্ঠিত বুদ্ধি বা মন জড়—তাহার চৈতন্য বা অহংজ্ঞান কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? জড়ের শক্তি বিশেষ হইতে মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, জৈবশক্তি বা প্রাণ এ সকলই উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই জড়শক্তি হইতে মনশক্তির ন্যায় অহংজ্ঞান বা চৈতন্য যে উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা ধারণার অতীত। (১)

আর শুধু এই অহংজ্ঞান বলিয়া নহে। আমাদের কতকগুলি ধারণা আছে, তাহা উক্তরূপ কোন ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। আমাদের দিক্ কাল জ্ঞান এরূপ কোন ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। ইহা বাহ্যজ্ঞানের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। আমাদের অনন্তের ধারণা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ পুণ্যের ধারণা—এ সকল স্বতঃসিদ্ধ। ইহা

(১) কেবল বহিঃ প্রবাহ ধরিয়া যে অহং বা জ্ঞাতা আত্মার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তাহা বিলাতী পণ্ডিত লকের অনুবর্ত্তী প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে হিউম্ সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখাইয়াছি—

পণ্ডিত কুজেঁ বলিয়াছেন—

"It was a Frenchman who gave the philosophy of Locke its true character and systematic unity in suppressing the insignificant and equivocal part which Locke has left for reflection. Condillac demonstrated that such a reflection is scarcely anything else than sensation itself a little modified; he reduced all human faculties to different modes, of sensation, so that sensation is the only element, and even the only instrument of knowledge. In fact according to Condillac, by means of certain circumstances, sensation becomes successively attention, comparison reasonnig; it becomes intelligence entire, and even the entire will; it becomes whole consciousness, the entire soul. What then is the soul? a collection of sensation more or less general but always without unity, without substance without causative power. Condillace is the true metaphysician of the school. Heleveticus its true moralist. The sensations.........are agreeable or disagreeable. To avoid sensation which may give pain, to secure sensation which may give pleasure, that is the whole morality in its general principle. Saint Lambert is charged with drawing from this principle its applications and from them, composing a code of which pleasure is the founndation and in text the supreme law ... .It was necessary that the morality should have its politics; it declared that collection of individuals called nations, have no other law than their will; that is that is prevailing system of their desires that in their good pleasure; that in a work, the sovereign of the people was the ultimate dogma. The same theory has been applied to all sciences to medicine........"

Cousu's History of philosopy oftry vol. I. p. 203.

এই মত অনুসারে হিউম্‌ও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

The self or Ego is nothing else, in fact, than a complex of numerous swiftly succeeding ideas under which complex we then suppose is placed an imaginary sustrate named by us the soul, self or ego. The self, or ego, therefore rests wholly on an illusion. In the case of such preapposition, then cannot be any talkn aturally of the immortality of the soul."

Scwegler's History of philosophy, p. 183.

কেবল বাহ্য প্রবাহ অনুসরণ করিয়া চার্ব্বাক, বৃহস্পতি প্রভৃতি আত্মানাস্তিবাদী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ও ঠিক উক্ত ফরাসী দার্শনিকদের মত ইহজগতের সুখকেই পরম পুরুষার্থ স্থির করিয়াছিল। চার্ব্বাক মত এইরূপ—

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

বাহ্য বিষয় জ্ঞান বা আন্তরিক সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা আধুনিক দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

তাহার পর, এই যে বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহার মধ্যে ত সাধারণতঃ আমরা কেবল এক পরিবর্ত্তন মাত্র দেখিতে পাই। পদার্থ সকল নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহার পুষ্টি বৃদ্ধি, হ্রাস ক্ষয়, বিনাশ হইতেছে। জগতের সকল পদার্থই ত ষড়্‌ভাববিকারযুক্ত বলিয়া আমাদের নিকট সদা প্রতিভাত হইতেছে। এই সকল বিকারের মধ্যে কি কোন নিত্য অবিকারী সত্ত্বা আছে? বাহ্য প্রবাহ হইতে আমাদের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ত এই সত্ত্বা পাওয়া যায় না। আর এই যে নিত্য পরিবর্ত্তন পরিণাম বা বিকার আমাদের জ্ঞানে সদা প্রতিভাত হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন নিত্য অচ্ছেদ্য নিয়মও ত এই প্রবাহ হইতে ধারণা করা যায় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কার্য্যকারণমূল ধরিয়া অনুমানবলে আমরা সে ধারণা করিতে পারি। আমরা কারণতত্ত্ব আলোচনা করিলেই এই বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লই। এক পদার্থের সহিত আর এক পদার্থের নিত্য সম্বন্ধ অথবা এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থের উৎপত্তি ইত্যাদি ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে আমরা কারণসূত্র ধরিয়া লই এবং তাহা হইতেই উল্লিখিত সকল তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের মতে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা হইতেই এই কার্য্যকারণসূত্র ও এই নিয়ম পাওয়া যায়। যে সম্বন্ধের ব্যতিক্রম আমরা দেখিতে পাই না—যে নিয়ম সম্বন্ধে আমরা ব্যভিচার দেখিতে পাই না, তাহা হইতেই, বা সেই "অবিনাভাব" হইতেই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের ধারণা করি। আর এই কার্য্য কারণসম্বন্ধসূত্র

ইঁহারা বলেন, "দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণ বাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রমাণাভাবাৎ; তৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এব আত্মা।" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)।

বৃহস্পতির "যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—"বচন অনেকেই অবগত আছেন।

নাস্তিক বৌদ্ধদর্শনেও বাহ্যপ্রবাহবাদ হইতে এইরূপ মত আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা আত্ম বিশ্বাস করেন না।

"None of the five Skandas are permanent—none of these is the soul, the body constantly changes.........than is never the same for consecutive moments, and there is within him no abiding principle whatever."

Sutta Pitaka states—the unlearned regard the soul either as identical with, or as possessing, or as containing or as residing in one of the five skandas (রূপ বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান)। By regarding the soul in one of the twenty ways, he gets the idea "I am." Then there are five organs of sense and mind, and qualities, and ignorance. From sensation the unlearned derive the notion of "I am."

যাহা হউক, এইরূপ বৌদ্ধবাদ হইতে চার্ব্বাকদর্শনের ন্যায় আত্মসুখবাদ সৃজিত হয় নাই—ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

জগৎ বা বহিঃপ্রবাহ কেন্দ্র করিয়া চার্ব্বাক প্রভৃতি এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। চার্ব্বাকদর্শন সেই জন্য অনেক পূর্ব্বে আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল নামমাত্রাবশেষ হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইউরোপে এই দার্শনিকমত সমাজ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছে ফরাসীবিপ্লব ঘটাইয়াছে। সে খানে এ দর্শন কবে যে নামমাত্রাবশেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ধরিয়াই আমরা জগতের মধ্যে নিত্য সত্বার উপলব্ধি করি।

এই কার্য্যকারণসূত্র সম্বন্ধেও যে জ্ঞান হয়, তাহা বাহ্যপ্রবাহ হইতে কখন সম্ভব নহে। সুতরাং যে সূত্র অবলম্বন করিয়া জগতের সত্বা বা নিয়ম জানিতে অগ্রসর হইব—আমাদের সেই সূত্রই ছিন্ন হইয়া যায়। কার্য্যকারণসম্বন্ধই বা কিরূপ? কেহ বলেন, কারণ লয় হইয়া কার্য্য উৎপত্তি হয়। ইঁহারা কার্য্যকারণসূত্র হইতে কোন মূল জগৎ তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। কেহ বলেন, কার্য্যকারণের অনুরূপ উৎপত্তিকালে কারণ কার্য্যরূপ প্রাপ্ত হয়—আর লয় কালে কার্য্য কারণে লীন হয়। কারণের মধ্যেই কার্য্যউৎপাদিকা শক্তি থাকে। সুতরাং কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া মূল কারণে আসিতে পারা যায়। কেহ কারণ ও কার্য্যের নিত্য সম্বন্ধ আদৌ স্বীকার করিতে পারেন না।

এই বাহ্য প্রবাহ হইতে যেমন বাহ্য জগতের মধ্যে কোন মূল সত্বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তেমনি কারণ সূত্রও তাহা হইতে মিলে না। আমাদের এই কার্য্যকারণসূত্রের জ্ঞান কোথা হইতে হইল? যদি বলা যায় যে, বাহ্য প্রবাহ হইতেই এ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তবে নানা রূপ দোষ হয়। বাহ্যপ্রবাহবাদী আমাদের মন বা বুদ্ধির কোন স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বা সংস্কার স্বীকার করেন না। বলিয়াছি ত, ইঁহাদের মতে আমাদের মস্তিষ্ক এই মন বা বুদ্ধির আধার, অথবা মন বা বুদ্ধি এই মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষের নামান্তর মাত্র। আমাদের জন্মকালে এই মস্তিষ্ক সাদা দাগবিহীন মোমের মত থাকে, তাহার পর, বাহ্যজগতের শক্তি ইন্দ্রিয়ের উপর যে ক্রিয়া উৎপন্ন করে, সেই ক্রিয়া স্নায়ু বিশেষ অবলম্বন করিয়া বা স্নায়ুপথ দিয়া মস্তিষ্কে গিয়া ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা হইতেই মস্তিষ্কে দাগ পড়ে, আমাদের সংস্কার উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে মস্তিষ্কে কোন পূর্ব্ব সংস্কার, কোন সহজাত ভাব থাকে না—মস্তিষ্ক ছাড়া মন বুদ্ধির কোন অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং কার্য্যকারণের সম্বন্ধসংস্কার বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক হইবার পূর্ব্বে থাকে না। এই সম্পর্ক ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মস্তিষ্কে দাগের উপর দাগ পড়িতে থাকে, তাহা হইতেই এই জ্ঞানোৎপত্তি হয়। সুতরাং এই জ্ঞান ক্রমে পরিসর প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতেই কার্য্যকারণসূত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (১)

যাহা হউক, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কেন না, সর্ব্ব প্রথমে যে জগৎজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানের মূলই এই কার্য্যকারণসূত্র। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে বাহ্যজগৎ হইতে একটী প্রবাহ আসিয়া প্রথমে ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য করে, সেই কার্য্য হইতে ইন্দ্রিয়ে এক প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই বহিঃপ্রবাহজনিত ক্রিয়া স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে যায়। সেখানে কোনরূপে এই ক্রিয়া বা তদনুরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্য মস্তিষ্কের স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক শক্তি—অন্ততঃ এইটুকুও যদি স্বীকার করা যায়, তবে না হয় বলিতে পারি যে, জ্ঞান এই ক্রিয়া অনুভব করে, অর্থাৎ এই ক্রিয়ার জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু তাহা হইতে এই ক্রিয়ার কারণ যে মস্তিষ্কের বাহিরে আছে, এই কারণসূত্র যদি ঐ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে

তাহার মস্তিকে বা বুদ্ধিতে কি মনে প্রতিভাত না হয়, তবে এই ক্রিয়ার কারণ যে বাহ্য জগৎ, তাহা সর্ব্ব প্রথম বাহ্য জগতের দ্বারা মস্তিষ্কে ক্রিয়া উৎপত্তি কালে কোথা হইতে জানা যাইবে? যদি বলা যায় যে, আমাদের নিজ ইচ্ছারূপ কারণ হইতে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালন রূপ কার্য্য অনুভব করিয়া প্রথমে এই কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলেও এ আপত্তি খণ্ডিত হয় না। কেন না, ইচ্ছাবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তির সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ব্বেই আমাদের বাহ্যজগৎজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং যে মূল অবলম্বন করিয়া আমরা বহিঃপ্রবাহ সিদ্ধান্ত করিতে যাই—সেই মূলই ছিন্ন হইয়া যাইবে। কাজেই কেবল বহিঃপ্রবাহ মাত্র স্বীকার করিয়া কি জগৎ (১) কি আত্মা কোন তত্ত্বই সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার দ্বারা জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। যাহা হউক, এই তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে অল্প কথায় বুঝান অসম্ভব। এ স্থলেও তাহার আর বিস্তারিত উল্লেখ করিবার স্থান নাই।(২) শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

শিশু ও সর্পিণী।

'সূতিনী—বাঘিনী হীরা, কাল ভুজঙ্গিনী,'
প্রতিবেশী নর নারী জনে জনে কয়;—
'এমন ডাকিনী মেয়ে কখনো দেখিনি,—
কচি ছেলে গিলে খেয়ে আজো বেঁচে রয়!'

হীরা নামে আছে এক রাক্ষসী রমণী,
স্বামী তার মহা স্ত্রৈণ—ভেড়ার সমান;
দ্বিতীয় পক্ষের নারী—মস্তকের মণি—
'হীরা—'হীরা' ক'রে মরে, তাই সে অজ্ঞান।

(১) কেবল বহিঃপ্রবাহ হইতে কার্য্যকারণসূত্রে উপনীত হওয়া যায় না, তাহা বিলাতী দার্শনিক হিউম সাহেব এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে Custom বা আমাদের অভ্যাস হইতে এই সূত্র আমরা ধরিতে পারি। যদি আমরা বার বার ধূমের স্থানে বহ্নির আবির্ভাব দেখি, তবে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্মে, ইহা হইতেই কার্য্য কারণ-সূত্র পাওয়া যায়। চার্ব্বাক দার্শনিকদিগেরও ঠিক এইরূপ মত। এই সকল মত এ স্থলে বিস্তারিত বুঝাইবার স্থান নাই।

(২) কেবল বহিঃপ্রবাহ হইতে যে বাহ্যজগৎ সিদ্ধ করা যায় না, তাহা পণ্ডিত লকের উক্ত দার্শনিক গ্রন্থেই আভাস পাওয়া যায়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা বাহ্যপদার্থের রূপ, বর্ণ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি যে গুণ জানিতে পারি, যাহাদিগকে আপেক্ষিক বা, Secondary গুণ বলা যায়, উহা পদার্থের স্বরূপ নহে; উহা আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিবিশেষ হইতে ইন্দ্রিয়যোগে পদার্থে উৎপন্ন হয়। তবে বস্তুর আকৃতি, পরিমাণ, বিস্তৃতি প্রভৃতি যে কতকগুলি গুণ ইন্দ্রিয়যোগে উপলব্ধি করি, তাহাই মুখ্য, তাহা বাস্তবিক বস্তুরই গুণ। সেইরূপ স্থান, কাল, সংখ্যা প্রভৃতি সংজ্ঞা সকলও বস্তুর স্বরূপ বাচক। এইরূপে স্বয়ং লকই বাহ্যজগতের অর্দ্ধেক উড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া বার্কেলে বাহ্য জগৎ একেবারে উড়াইয়াছেন। কাণ্ট সেই তত্ত্ব আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। এস্থলে সে সকল বিষয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার স্থান নাই।

পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন—"Realism starts from an arbitrary assumption. It ignores the fact that all we know is within our consciousness beyond which there can be no immediate certainty."

এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল বাহ্যজগৎ স্বীকার করিয়া বাহ্য প্রবাহ অবলম্বনে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইয়া শেষে পশ্চাতাবলোকন করিলে আর বাহ্য জগৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কেবল বাহ্য প্রবাহ হইতেই বাহ্য জগৎ সিদ্ধ হয় না—এই তত্ত্ব কেবল একমাত্র বৌদ্ধ দর্শনে বুঝান আছে। ইহাকে "ক্ষণভঙ্গবাদ" বলে—" এ স্থলে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

সতী লক্ষ্মী গেছে চ'লে বাছারে রাখিয়া,—
সে বাছা দুখের ছেলে 'মণি' নাম তার ;
চাঁদ-মুখে ডাকে চাঁদে,—'মা চাঁদ' বলিয়া,
সোহাগে ঢলিয়া পড়ে কোলে বিমাতার !

মা-হারা সে যাদুমণি সোণার পুতলি;—
অকলঙ্ক শশী সে যে অমরার ফুল ;
হৃদয়ে বাজিছে তার,—কৃষ্ণের মুরলী,—
হাসে খেলে নাচে তাই আহ্লাদে আকুল ।

খল কি সহিতে পারে স্বর্গের সুষমা ?
জগতের আলো কভু দেখে সয়তান ?
রিশ-বিষে জ্ব'লে মরে পিশাচী ভীষণা,—
'সপত্নী দুলাল মরে—কোথা সে কৃপাণ ?'

মূর্ত্তিমান্ পাপ যেই কি অসাধ্য তার,—
সপত্নী-কণ্টক হীরা করিবার দূর,—
মিশাইয়া মৃদু-বিষ দুধেতে বাছার,
প্রতি দিন্ তাই খেতে দেয় ভরপুর !

আহা-হা ! সোণার শিশু, বুক-ভরা ধন,
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু মলিন আকার ;
বিষে জর্জ্জরিত দেহ,—শিয়রে শমন,—
নীরবে মুদিল আঁখি, কোলেতে পিতার !

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত ।

বুয়র যুদ্ধ ।

বহু নরকঙ্কাল-ভূষিতা উনবিংশ শতাব্দী যখন মৃত্যুশয্যাশায়িনী, তখন জগতের আর একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার অভিনীত হইল। মৃত্যুমুখ-পতিতা শতাব্দীর আজন্ম-নররক্ত পিপাসার শেষ তৃপ্তির নিমিত্তই যেন দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ এবং বুয়র জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বিগত শতাব্দীকে অনেক জাতি অনেক ভাবে স্মরণ করিবেন, কিন্তু অশ্রুবিহীন নয়নে গৌরব-ভূষিত জয়ী জাতিরও ইঁহাকে স্মরণ করিবার শক্তি হইবে না ; গত শতাব্দী এখন অতীতের ক্রোড়ে, তাঁহার সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা অনুদারতার পরিচায়ক ।

কিন্তু একটী কথার সমালোচনা করা আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি ; মঙ্গলময় কারণ-সম্ভূত এই জগৎ, ইহাতে এরূপ অমঙ্গলের অভিনয় কেন ? অথবা আমরাই আমাদিগের বুদ্ধির ভ্রমে মঙ্গলকে অমঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছি ? আজি বুয়রজাতির স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত, বুয়র রমণী পতি-পুত্র-গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাবৃত প্রান্তরে পটগৃহবাসিনী ! বুয়র জাতির বলদর্প, স্বাধীনতার বিস্তৃতি, পরস্বাপহরণ, আজি অতীত ইতিহাসের সম্পত্তি। একি প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ ? অথবা বিশ্বশাসিনী শক্তিতে কোন বিধি নাই, কোন নিয়ম নাই, কেবল যথেচ্ছাচার ?

আমরা ব্রিটীশ প্রজা, ভারতবাসী হিন্দু, রাজশক্তি আমাদিগের ধর্ম্মে ভগবচ্ছক্তির প্রতিকৃতি ; এই শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইলে পাপ সঞ্চয় হয়। বুয়র যুদ্ধের নানা কথা, আমাদিগের দেশীয় লোকেরা শুনিয়াছেন ; তাহা হইতে নানা প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন ; সুতরাং এই যুদ্ধের প্রকৃত দায়িত্ব কাহার শিরে, তাহা আমাদিগের বুঝা আবশ্যক। যে যুদ্ধে সহস্র সহস্র শোক-তপ্ত পরিবার তীব্রতম শোকের কালিমা-ছায়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সহস্র সহস্র গৃহ ভস্মীভূত ও বিনষ্ট হইল, সহস্র সহস্র লোক নিরন্ন হইল, এবং মানবজাতির কতকাংশের

উন্নতি দীর্ঘকালের নিমিত্ত স্থগিত হইল; ইহার দায়িত্ব কাহার শিরে? ইংরেজদিগের মধ্যে অনেকে এই সমস্ত লোমহর্ষণ দায়িত্ব ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আরোপ করিতেছেন, আবার গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় দল এই সমস্ত দায়িত্ব বুয়রদিগের শিরে আরোপ করিতেছেন। জগতের স্বাধীন জাতিদিগের মধ্যে উন্নত ইংরেজ জাতিকে অনেকেই প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারেন না; তাঁহাদিগের অধিকাংশেই বুয়র যুদ্ধ ইংরেজ অপকীর্ত্তির ইতিহাসের অন্যতম পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর আমরা মনে করিতেছি যে,এই যুদ্ধ অপরিহার্য্য কর্ম্মফল। যে কারণে কুরুকুল এবং যদুকুলের ধ্বংস, যে কারণে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগৌরব-সূর্য্য অস্তমিত, যে কারণে রোম সাম্রাজ্য বিনষ্ট, সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মকারণে আজি বুয়র জাতি বিগতস্বাধীনতা এবং পরমুখাপেক্ষী। শ্বেত দেহে অস্ত্রাঘাত কর্ম্মদর্শী ভগবান যে ভাবে দর্শন করেন, কৃষ্ণকায়ে অস্ত্রাঘাতও সেই ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন। অনেক সময় অত্যাচারী এবং অপকার্য্য-প্রিয় ব্যক্তিকে কিছুদিনের নিমিত্ত উচ্চ হইতে উচ্চতর সাংসারিক উন্নতির সোপানে উঠিতে দেন বটে, কিন্তু সে কেবল পতনের আঘাত তীব্ররূপে অনুভব করাইবার নিমিত্ত; তীব্রানুভবের দ্বারা জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করাইবার নিমিত্ত। কথনও বা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উৎপাটিত হয়, কথনও বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ব্যবহৃত হয়, কোন সময় বা প্রাকৃতিক নিয়মে বিদ্ধ স্থান পচিয়া গলিয়া কণ্টক বহিষ্কৃত হয়। কি কারণ দ্বারা কোন্ সময়ে যে কি কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি যে, জগতে যে দৃষ্টান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা কর্ম্মজগৎ হইতে তিরোহিত হইবেই হইবে। আজি হউক আর কালি হউক,ফল নির্দ্ধারিত ও অপরিহার্য্য। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কথনও বা কর্ম্মীরূপে কথনও বা কর্ম্মরূপে অনন্তশক্তি জগতে বিকাশিত হন, এবং লোকশিক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া দেন।

> "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই মহাবাক্য আমরা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি এবং মানব জগতের ইতিহাস ইহার সত্যতা সম্বন্ধীয় নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

বুয়রদিগের দোষ অথবা ইংরেজদিগের গুণকীর্ত্তনের নিমিত্ত আমরা লেথনী ধারণ করি নাই, দোষগুণের বিচারক যিনি, সেই সর্ব্বদর্শী অনন্ত শক্তিশালীর বিচারাসন সমক্ষেই তাহার অভ্রান্ত বিচার হইবে। কিন্তু বুয়র যুদ্ধের দ্বারা জগৎ কি উপকার প্রাপ্ত হইল; অনন্ত মঙ্গলময়ী প্রকৃতি এই মহাযুদ্ধ দ্বারা কি মঙ্গল সাধিত করিলেন এবং কি দৃষ্টান্তই বা জগতের নিমিত্ত এই শিক্ষাশালায় রাখিয়া দিলেন; তাহাই আমাদিগের পরিমিত জ্ঞানালোকে আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। এই বিষয় আলোচনা করিতে হইলে বুয়র জাতির অভ্যুত্থান এবং তাহাদিগের সহিত ইংরেজ জাতির সম্বন্ধের ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠকবর্গের সম্মুখে রাখিয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মতের সারবত্তা দেথান আবশ্যক। সুতরাং পাঠক এই প্রবন্ধের অনেক স্থলই মৃত ইতিহাসের কঙ্কাল পূর্ণ দেখিতে পাইবেন।

ভরসা করি পাঠক লেখকের এই অপরিহার্য্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

হলাণ্ড এবং ফরাসী দেশ নিবাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান এবং কোন কোন বিষয়ে মতের অনুবর্ত্তন করিতেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে তাঁহাদিগের মাতৃভূমি বড়ই আপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিল; তখন তাঁহারা উত্তমাশা অন্তরীপে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন; উত্তমাশা অন্তরীপ তখন ওলন্দাজ দিগের শাসনাধীনে ছিল; বলা বাহুল্য যে, যখন এই ওলন্দাজ এবং ফরাসীয় খ্রীষ্টীয়ান গণ আফ্রিকার সর্ব্ব দক্ষিণাংশ নিজদিগের বাসস্থান স্থির করিলেন; সেই সময়ে সেই অংশে আফ্রিকার আদিমবাসীদিগের বসতি ছিল, তাহারা ইয়ুরোপীয় অস্ত্রবল, বুদ্ধি এবং বীর্য্যের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, হতভাগোরা তাহাদিগের জন্মভূমির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত, আবাল্যপরিচিত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত এবং তাড়িত হইয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইল। এইরূপে স্বাধীনতার নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত যাঁহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার অপরকে দেশত্যাগী করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই ওলন্দাজ এবং ফরাসী হিউজিনটদিগের বংশধরেরাই দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র বলিয়া পরিচিত।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপের উপনিবেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল, এবং ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ প্রিন্সঅব অরেঞ্জ ৬,০০০,০০০, পৌণ্ড মূল্য গ্রহণে ঐ স্থানের সম্পূর্ণ দাবি দাওয়া এবং অধিকার ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিলেন। এই ভাবে উপনিবেশীগণ ইংরেজগবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়ার পর, ইংলণ্ডের শাসন নানা কারণে তাঁহারা তীব্র এবং অসহনীয় বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে বুয়র উপনিবেশীদিগের কতকাংশ রাজদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে এই রাজদ্রোহীতা অপরাধে ছয়জন বুয়রের প্রাণদণ্ড হয়, বুয়র লেখকেরা এই দণ্ডাজ্ঞা এবং দণ্ডবিধান প্রণালী উভয় বিষয়ই অতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, অপরাধীদিগের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জোর করিয়া বধ্যভূমিতে আনা হয় এবং তাহাদিগের সম্মুখে ছয় ব্যক্তিকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ফাঁসীকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া পড়ে; তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় অভিভূত সেই ছয়টী মানবকে আবার ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বুয়রগণ, ইংরেজ জাতির প্রতি আরো জাতক্রোধ হইলেন।

এই সময়ের মধ্যেই হতভাগ্য আদিম অধিবাসীগণের অনেককে স্বাধীনতা হারাইয়া বুয়রদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে; ইংরেজ মিসনারিদিগের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ সমদর্শী এই আদিম অধিবাসীগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাহাদিগের দুঃখকাহিনী ইংলণ্ডের সহৃদয় মহাপুরুষদিগের নিকট জ্ঞাপিত করিলেন। ইংলণ্ডে বুয়রদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন কোন সমদর্শী ব্যক্তি বলিলেন, "ভগবানের চক্ষে বর্ণভেদে ব্যবহারের কোন তারতম্য নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায় ব্যক্তির মধ্যে আইন ও ব্যবহারের তারতম্য রাখিবেন কেন?" এই

বিষয় উপলক্ষে কোন কোন বুয়র আদালতে অভিযুক্ত হন, কিন্তু নিরাপরাধ বলিয়া খালাস পান। কিন্তু দাসদিগের দুঃখে যাঁহারা কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা আদালতের বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আদালত নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের মধ্যে মনের ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না।

ইহার পর ব্রিটিস্ সাম্রাজ্য হইতে দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিবার নিমিত্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন এবং ২,০,০০০,০০০, পৌণ্ড দাসদিগের মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার নিমিত্ত মঞ্জুর করিলেন। বুয়রদিগের তিন লক্ষ পৌণ্ড পরিমাণ ক্ষতি হইবে বলিয়া স্থানীয় ব্রিটিস্ রাজপুরুষগণ নাকি স্থির করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১২৫০০০ পৌণ্ড মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার নিমিত্ত অবধারিত হয়। তাহাও আবার লণ্ডনে পাইতে হইবে। বুয়র জাতি কৃষিজীবী, চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত, পুত্র পরিজন এবং সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের পক্ষে দূরদেশ গমন তত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; অনেকেই বাধ্য হইয়া নাম মাত্র মূল্যে দালালের নিকট দাসদিগকে বিক্রয় করিলেন। সুতরাং অনেককে হঠাৎ ধনী অবস্থা হইতে অতি নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইতে হইল।

উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধেও বুয়রেরা ইংরেজের কার্য্য-প্রণালীকে অতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, ইংরেজ দাস ব্যবসায়ীরা, বিলাতী জাহাজে আনিয়া বুয়রদিগের নিকট দাসদিগকে বিক্রয় করিয়াছিল; ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে স্বদেশীয়দিগের ব্যবসায়ে কোন বাধা দেন নাই; তার পর বুয়রগণ দাসদিগকে ঠিক আপন পরিবারের লোকের মত ব্যবহার করিতেন, আমেরিকার দাসত্বের তীব্রতা বুয়র দাসগণ, কখনও অনুভব করে নাই; তথাপি যদি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট দাসদিগকে স্বাধীনতা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তবে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ যাহাতে সকলে পাইতে পারে, তদ্রূপ বিধান করা উচিত ছিল। তদনুরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিয়া বুয়রদিগের ক্ষতি করার অভিসন্ধিতেই ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট অন্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক ফ্রাউড্ যাহা লিখিয়াছেন, বুয়রেরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের কথার সারবত্তা প্রমাণ করিয়া থাকেন। *

ইহার পর আর একটী ঘটনায় বুয়রগণ ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আরো জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। ইংরেজগণ যে নির্দ্ধারণ দ্বারা অন্তরীপস্থ উপনিবেশ নিজদিগের আয়ত্বাধীনে আনিয়াছিলেন, সেই নির্দ্ধারণপত্রে মীন নদ (Fish River) এই উপনিবেশের, পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্ধারিত ছিল। বলা বাহুল্য, যে মীন নদ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট কখনও কোন রাজকীয় শক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচালিত করেন নাই; তৎকালে অতি পরিমিত স্থানে ওলন্দাজদিগের শাসন শক্তি পরিচালিত হইত, তাহার বাহিরে মীন নদ

* "Slavery at the cape had been rather domestic than predial; the scandal of the West India plantations were unknown among them."

"Because the Dutch are a deliberate and slow people, not given to enthusiams for new ideas, they fell into disgrace with us, where they have ever since remained. The unfavourable impression of them became a tradition of the English press, and unfortunately, of the Colonial Office. We had treated them unfarely as well as unwisely, and we never forgive those whom we have injured."

Aceana p. 34.

পর্য্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অরণ্যবাসী আদিমনিবাসী কাফ্রি কখনও তাঁহাদিগের রাজশক্তি স্বীকার করে নাই; যে স্থান ইয়ুরোপীয়গণ কাড়িয়া লইলেন, বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারা অন্যারণ্যে যাইয়া আবার পর্ণকুটীর বান্ধিল এবং মনে ভাবিল, সেইখানেই বুঝি তাহারা নিরাপদে থাকিবে! কিন্তু হতভাগ্যগণ অতি সত্বরেই বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের আশার অট্টালিকা কি প্রকার অস্থায়ী বালুর ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিল। যদিও উপরোক্ত নির্দ্ধারণ পত্রের লিখিত সীমানা দ্বারা, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে, এ কথা বুঝা যায় না যে, তাহার মধ্যে আর কাহারো কোন সত্ব নাই; তথাপি অন্তরীপের স্থাপিত গবর্ণমেণ্ট এবং বুয়রগণ মনে করিলেন যে, যখন নির্দ্ধারণ পত্রে মীন নদ পর্য্যন্ত উপনিবেশের সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন এই নদের পশ্চিম পর্য্যন্ত আদিমবাসী কাফ্রিদিগকে তাহারা যথেচ্ছা তাড়িত ও অপসারিত করিতে পারেন; তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করে, তাহার বিরুদ্ধে যে কোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া বুয়রগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত উপনিবেশের বিস্তৃতি বাড়িয়া চলিল, তৎসঙ্গে হতভাগ্য কৃষ্ণকায় আদিমবাসীও তাহার গৃহ এবং ভূমি হইতে তাড়িত ও অপসারিত হইতে লাগিল। কত মৃত উপায় অবলম্বনে বুয়রগণ এই কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আদিমবাসী কাফ্রিগণ যখন বুঝিল যে, তাহারা আর কোন স্থানেই নিরাপদ নয়, তখন প্রতিহিংসার আগুন তাহাদিগের প্রাণে জলিয়া উঠিল; ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বুয়র উপনিবেশীদিগকে আক্রমণ করিল। অনেককে হত্যা করিল, ধন ও গবাদি হরণ করিয়া লইয়া গেল, আরো নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচারে উপনিবেশীদিগকে প্রপীড়িত করিল। দুর্ব্বল ও উচ্চজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যদি অত্যাচারীকে আয়ত্ত করিতে পারে, তখন তাহার প্রতিহিংসা-প্রজ্জলিত মন কোন কার্য্যকেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। নিতান্ত অমানুষী অত্যাচারও তাহার চক্ষে যথেষ্ট দণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

উপরোক্ত ঘটনার পর কেপের গবর্ণর, বুয়রদিগের প্রার্থনানুসারে, বুয়রদিগের সাহায্যে, মীন নদের অপর পারে স্থিত স্থানও কাফ্রিশূন্য করিলেন, এবং তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিলেন যে, তাহারা পুনরায় আবার উপনিবেশ আক্রমণ করিতে সাহসী না হয়; কিরূপ ভাবে এই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠক মহাশয় অবশ্যই অনুমান করিতে পারেন। অপহৃত গবাদি আবার ফিরিয়া আসিল; একের পালের গরু অপরের পালে মিশিয়া হারাইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থে এক এক পালের গরু এক একটী বিশেষ চিহ্ন দ্বারা বুয়রগণ চিহ্নিত করিতেন, ঐ চিহ্নানুসারে যাহার যে গরু, তাহা তিনি বাছিয়া লইলেন। তদ্ব্যতীত কাফ্রিদিগের নিকট হইতে, আর যাহা কিছু অপহরণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাও ধর্ম্মভীরু এবং সমদর্শী যোদ্ধাগণ নিজদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন।

এই সময়ে লর্ড গ্লিনেল্গ (Lord Glen-

elg) ব্রিটিস্ মন্ত্রী সভায় কলোনিয়াল সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উল্লিখিত রূপে কাফিরদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রতি-হিংসা গ্রহণের সংবাদ যখন তাঁহার নিকট গেল, তখন তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, গবর্ণর বাহাদুর এবং বুয়রগণ যে নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের কৃতকার্য্য ধর্ম্মানুগত ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেক্রেটরী সে নীতির অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাফির-দিগের নিকট হইতে তাৎকালীয় অপহৃত ভূমি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং অতি তীব্র ভাষায় উল্লিখিত কার্য্যের সমালোচনা করিলেন; তাঁহার মতে আফ্রিকার ভূমিতে আদিমবাসীর দাবি বুয়রের দাবি হইতে অগ্রগণ্য এবং যে সমস্ত অত্যাচারে মনুষ্যত্বের পবিত্র অঙ্গ মানব কলঙ্কিত করিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা তৎকালে বুয়রদিগের কার্য্যের মধ্যে যত পরিমাণে পাওয়া যাইত, আদিমবাসীদিগের কার্য্যে তত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। ইহার পর আবার কাফিরদিগের নিকট হইতে আনীত গবাদি বিক্রয় করিয়া সেই যুদ্ধের খরচ সঙ্কুলন করা হইল। সুতরাং বুয়রদিগের পুনঃপ্রাপ্ত গবাদিও এই ব্যয়ভার সঙ্কুলন করিতে বিক্রীত হইয়া গেল।

এই ঘটনায় বুয়রগণ বড়ই মর্ম্মাহত এবং ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ষ্টকেন ষ্টরাম এবং কেপকলনীর এটর্নী জেনেরেল অলিফাণ্ট সাহেবের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা বলিলেন, বুয়রগণ যদি স্থানান্তরে যান, তাঁহাদিগকে নিবারণ করা যাইতে পারে, এরূপ কোন আইন নাই, আর তদ্রূপ বিধান থাকিলেও তাহাকে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী বিধান ব্যতীত আর কোন আখ্যাতেই অভিহিত করা যাইতে পারে না। বুয়রগণ ব্রিটিস্ রাজ্যের অধীন সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, তাঁহাদিগকে আর ব্রিটীস্ সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে না। এইরূপ ঘটনা প্রত্যহই ঘটিতেছে, ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া শত শত লোক উত্তর আমেরিকায় যাইয়া বসতি করিতেছে। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট হইলেও তাহা নিবারণের কোন উপায় নাই।

অরেঞ্জ নদের উত্তরে এবং ড্রাকেন্-বার্গেসের পূর্ব্বে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কোন অধিকার তৎকালে দাবি করিতেন না, সেই অংশে আদিমবাসীদিগের নিবাস ছিল; তাহাদিগের মধ্যে বসতি করা যতই বিপজ্জনক হউক না কেন, তাহাদিগের নিকট হইতে কতক স্থান আপোষে লইয়া সেই স্থানে বসতি করিবেন এবং কেপকলনীতে তাঁহাদিগের যে বাড়ী ঘর জমি প্রভৃতি ছিল, তাহা সমুদয়ই বিক্রয় করিবেন, বুয়রগণ এই স্থির করিলেন।

বুয়রদিগের তাৎকালীয় নেতাদিগের মধ্যে পাইট রিটিফ্ (Piet Retief) নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার বসতিস্থান গ্রাহাম-ষ্টাউন পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, তাঁহাদিগের মর্ম্ম-বেদনার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, আমরা এস্থানে তাহার অনুবাদ পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত সন্নিবেশিত করিতেছি :—

"অজ্ঞাত কুলশীল এবং নিরন্ন লোক

দ্বারা এই দেশের সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইতে দেওয়া হইতেছে। তাহাদিগের অসভতা এবং অশান্তিকর ব্যবহার-জনিত অসুবিধা হইতে উপনিবেশীদিগকে রক্ষা করার কোন উপায় দেখিতে পাই না; এবং যে দেশ এত অন্ত-বিগ্রহে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন,সে দেশে যে আমাদিগের বংশধরগণ সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে, আমরা এরূপ আশাও করি না।

আমাদিগের দাসদিগকে যে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগের গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে যে অত্যন্ত অনিষ্টকর বিধান বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, আমরা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি।

কাফ্রি এবং অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতি-দিগের দ্বারা অনেক দিন হইতে আমাদিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদিগের কর্তৃক শেষ আক্রমণে উপনিবে-শের প্রান্তদেশস্থিত উপনিবেশীগণ একে-বারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, এবং ঐ অংশ জনমানবশূন্য হইয়াছে। আমরা ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি।

স্বার্থ-পর এবং অসভতা-তৎপর কতক-গুলি লোক ধর্ম্মের ভাণে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অসঙ্গত সমস্ত দোষারোপ করিয়াছে, ইংলণ্ডে তাহাদিগের সাক্ষ্যই বিশ্বাস করা হয় এবং আমাদিগের স্বপক্ষের কোন প্রমা-ণই গ্রাহ্য করা হয় না; আমাদিগের বিরুদ্ধে গঠিত এইরূপ মতের অপরিহার্য্য ফল এ দেশের সর্ব্বনাশ। সুতরাং আমরা তাহার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করিতেছি।

ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের আমাদিগের প্রতি আর কোন দাবি দাওয়া থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে আমরা আমাদিগকে শাসন করিতে পারিব, তাহাতে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না,এই মর্ম্মে স্থির ভাবে আশ্বাসিত হইয়া আমরা এই উপ-নিবেশ পরিত্যাগ করিতেছি।

আমরা এইক্ষণে ফল-শস্য পরিপূর্ণ আমাদিগের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম। এই ভূমিতে আমরা অপরিমিত ক্ষতি এবং অশান্তি সহ্য করিয়াছি, এবং অপরিচিত ও বিপদসঙ্কুল নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি; কিন্তু যিনি সর্ব্বদর্শী পরম-দয়াল এবং ন্যায়পরায়ণ, আমরা তাঁহারই উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিয়া চলিয়াছি। সর্ব্বদাই আমরা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিব, এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভয় করিব!

আমার সঙ্গে যাঁহারা এই উপনিবেশ ত্যাগ করিতেছেন, তাহাদিগের সকলের পক্ষে

পি,রিটিফ্।

বুয়রগণ তিনটী দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেন। ট্রিচার্ডের দল, ব্রান্স্বার্গের দল এবং পাইট্ রিটিফের দল। যাঁহারা স্বাধী-নতার নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত, দেশত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় আসিয়া বসতি করিতে-ছিলেন, তারপরও ব্রিটিস অধীনতা অসহ্য বোধ করিলেন, এবং জগতের তাৎকালীয় ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের বিচারালয়ে উল্লিখিতরূপ অভিযোগ পত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,তাহারাই আদিমবাসী-দিগকে তাহাদিগের পিতৃপিতামহের বসতি-ভূমি হইতে তাড়িত ও বিদূরিত করিয়া নিজদিগের একটী রাজ্য সংস্থাপন আশায় বাহির হইলেন। তবে শ্বেতকায়গণ সভ্য ইয়ুরোপের সভ্য মানব, কৃষ্ণকায় আদিম-

বাসীগণ অসভ্য আফ্রিকার অসভ্য জাতি, এতদুভয়ের মধ্যে তুল্যাধিকার কল্পনা করিলে তাহা কি মূর্খতা নয়? কিন্তু এই সভ্যতা এবং অসভ্যতা, যদি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবাধিকারের প্রতি সম্মানের পরিমাণ দ্বারা তারতম্য করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান সভ্য জগতের শির্ষস্থানীয় সভ্য জাতি এবং অসভ্য আদিমবাসীর মধ্যে প্রভেদ অতি কম।

ব্রাঙ্ক্‌বার্গের দল কাফিরদিগের হস্তে নিহত হইল; ট্রিচার্ডের দল ডিলাগোয়া উপসাগর পর্য্যন্ত অতি কষ্টে পৌঁছিল। সেখানে তাহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তৃতীয় দল পাইট রিটিফের নায়কতার অধীনে বাহির হন। এবং এইক্ষণে যে স্থানটী ন্যাটাল নামে পরিচিত, সেই স্থানটী জুলুরাজ ডিঙ্গায়ামের নিকট হইতে পণ দ্বারা খরিদ করিয়া লন। ঐ স্থানের কি সত্ব খরিদ বিক্রয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জুলুগণ বুয়রদিগকে আক্রমণ করে, ৬৬ জন বুয়র এবং ৩০ জন অনুবর্ত্তীকে হত করে। তৎপর আবার বোঁসমানস্ নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে স্ত্রী পুরুষ এবং বালক সহ ২৮২ জন বুয়রকে এবং ২৫২ জন ভৃত্যকে হত্যা করে। সুতরাং প্রথম যে তিন দল বাহির হইয়াছিল, সে তিন দলই অভীষ্ট সাধনে অকৃতকার্য্য হয়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।

বুয়রগণ ব্রিটিস-শাসিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া মনে করিয়াছিলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের কার্য্যে আর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, কিন্তু সে আশা-কুজ্ঝটিকা অতি অল্প কালের মধ্যেই তিরোহিত হইল,১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিস পার্লেমেণ্ট এক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন যে, তাহাদিগের শাসনাধীন রাজ্যের বাহিরেও কতক দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা অপরাধী বুয়রের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন; বুয়রগণ যখন সেই নির্দ্ধারিত সীমানাও অতিক্রম করিল, তখন লর্ড গ্রে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, প্রয়োজন বোধ করিলে, এই আইনের কার্য্যক্ষেত্র দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হইবে।

এই দৃশ্য দেখিবার ও মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিবার বিষয় বটে। আদিমবাসী তাহাপেক্ষা সভ্য বুয়র কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে আশ্রয় লইতেছে। আবার বুয়র অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ইংরেজ জাতি বুয়রকে পাছে পাছে তাড়াইয়া চলিয়াছেন! অপরিমেয় ব্রিটন রাজশক্তি কি কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি দ্বারা অনুসারিত হয় নাই? সভ্যতা, ধর্ম্ম, তোমাদিগের নামে কত অপকার্য্যই প্রত্যহ এ জগতে না সংসাধিত হইতেছে! ভগবন, নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, মানব স্বাধীনতা-বিনাশ যে সভ্যতার এবং ধর্ম্মের আশ্রয়-ভূমি, সেই ধর্ম্ম এবং সেই সভ্যতা হইতে জগৎকে তুমি কত দিনে উদ্ধার করিবে!

ন্যাটাল।

মানব গুরু ঈশা, লোক শিক্ষার্থ বলিয়াছিলেন," প্রতিহিংসা ভগবানের। যে তোমার বামগণ্ডে আঘাত করিবে, তাহাকে দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিও"; এই ক্ষমার প্রতিমা পরম দয়ালু পুরুষের স্বর্গীয় মন্ত্রে দীক্ষিত বুয়রগণ নিজদিগের ধর্ম্মমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া জুলুদিগের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত সুসময়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হতাবশিষ্ট বুয়রগণ ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ,১৬ ডিসেম্বর তারিখে দলবদ্ধ হইয়া জুলুদিগকে আক্রমণ করিলেন; কথিত আছে যে, ৪৬৪ জন মাত্র বুয়র ১০,০০০ জুলু যোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া অনেক জুলুকে হত,অনেককে আহত এবং তাহাদিগের একটী প্রধান পল্লীকে ভস্মীভূত করেন। এই ১৬ই ডিসেম্বর, বুয়রগণ গৌরবের সহিত তাঁহাদিগের স্মৃতিপটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, প্রতি বৎসরে এই দিবসে তাঁহারা এই জুলু পরাজয়ের উৎসব করিয়া থাকেন। বুয়র জাতির নিকট এই ১৬ই ডিসেম্বর "ডিঙ্গাগামের দিন" (Dengaam's day) নামে পরিচিত।

জুলুদিগকে পরাজয় করিয়া বুয়রগণ নাটালে বসতি স্থাপন করিলেন এবং প্রজাতন্ত্র নিয়মে নিজদিগকে শাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এই সুখের স্বপ্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না; ক্রমে কেপ-কলনী হইতে অবশিষ্ট বুয়র উপনিবেশী দুই একটী করিয়া এই নূতন প্রজাতন্ত্র রাজ্যে আসিতেআরম্ভ করিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, বুয়রদিগকে যদি একটী প্রজাতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিতে দেওয়া যায়, তবে বড়ই কুদৃষ্টান্তের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এবং ব্রিটীশ উপনিবেশ রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। ১৮৩৮ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে গবর্ণর সার জর্জ নেপিয়র কলনিয়াল সেক্রেটরী লর্ড গ্লেনেল্‌কে লিখিয়াছিলেন, বুয়রগণ যাহাতে অস্ত্র শস্ত্র, বারুদ গুলী না পায়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করা উচিত হইবে। তাহা হইলে, উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার স্রোত নিবারিত হইতে পারে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, নাটাল তাঁহারা অস্ত্রবলে হস্তগত করিবেন এবং একদল সৈন্য সেখানে কতক দিনের নিমিত্ত রাখা হইবে, কিন্তু ব্রিটিস্ কলনী আফ্রিকার সেই অংশে বিস্তৃত করা হইবে না।* বুয়রদিগের নেতৃদল এ কথায় বড়ই বিরক্ত হইলেন; ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট যেস্থানে স্বকীয় রাজত্ব বিস্তার করিতে ইচ্ছা করেন না, সে স্থানে বুয়রগণ কি করে বা না করে, তাহাতে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহারা মনে করিলেন, ইংরেজ অকারণে কেবল মাত্র বিদ্বেষবুদ্ধি-পরবশ হইয়া বুয়রজাতির অনিষ্ট কামনায় এই সভ্য-সমাজ-নিন্দনীয় নীতি অবলম্বন করিলেন; কিন্তু এই নীতি অবলম্বিত না হইলে, আফ্রিকায় ব্রিটিস্ উপনিবেশ যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা বুয়রগণ বুঝিলেন না, ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৪২ খ্রীঃ,১০ এপ্রেল তারিখে লর্ড ষ্ট্যানলী গবর্ণর নেপিয়রকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন যে, বুয়রগণ যেন কোন স্থানে যাতায়াত, কোন স্থান হইতে কোন দ্রব্যাদি আনয়ন বা প্রেরণ, সংবাদাদি গ্রহণ বা প্রেরণ করিতে সমর্থ না হয়; এবং তাঁহাদিগকে যেন এ কথা জানান হয় যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বুয়রগণের প্রতিকূলে অসভ্যদিগের সহায়তা করিবেন এবং বুয়রদিগকে রাজদ্রোহী গণ্যে তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হইবে।

বুয়রগণ সহজে মস্তক অবনত করিবার

* It was apparently the fixed determination of Her Majesty's Government not to extend Her colonial possessions in this quarter of the globe.

Governor Napeer to Lord Russell on the 22nd June, 1840.

পদার্থ নহে। মুষ্টিমেয় বুয়র, সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক নাটাল ইংরেজ করতলস্থ না হয়, তাহার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন; দুইবার তাহাদিগের সঙ্কল্প সুসিদ্ধও হইল; কিন্তু পরে কমিসনর ক্লিটী (Clocte) নাটাল ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত করিলেন; বুয়রদিগের নাটালে রাজ্য স্থাপনের সকল আশা ফুরাইল; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ব্রিটিস প্রজা হইয়া নাটালে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু সে ধাতুতে বুয়র গঠিত হয় নাই।

১৮৪২ খ্রীঃ অঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বুয়রদিগের মরিজবর্গস্থ রাষ্ট্রীয়সমিতি (Valksraad of Marizburg) ইংরাজ গবর্ণরকে নিম্নলিখিত রূপে চিঠী লিখিয়া পাঠাইলেন;—

"আমরা জানি যে, স্বর্গ মর্ত্ত্যের শাসনকর্ত্তা ভগবান আছেন, এবং অত্যাচারীর হস্ত হইতে তদপেক্ষা দুর্ব্বলতর অত্যাচারিতকে রক্ষা করার ইচ্ছাও তাঁহার আছে। তাঁহার প্রতি এবং আমাদিগের ন্যায়ানুগত দাবির প্রতিই আমাদিগের নির্ভর। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, আমাদিগের স্ত্রী পুত্র, সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই বিনষ্ট হইবে, আমরা অবনত মস্তকে, তাঁহার হস্ত হইতে, সেই দণ্ড আমাদিগের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিব। কিন্তু মানুষের হাত হইতে তাহা কখনই গ্রহণ করিব না। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের শক্তির কথা অবগত আছি, সেই ক্ষমতার অবমাননা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পক্ষান্তরে আবার মানবের ন্যায্য সত্ব পাশব বলের নিকট পরাজিত হইবে, এবং তাহা নিবারণের নিমিত্ত আমরা আমাদিগের সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিব না, ইহাও আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।"

সাধ্যানুসারে কেন? সাধ্যাতীত চেষ্টা করা হইয়াছিল, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু শত সহস্র নির্দ্দোষী আদিমবাসীর রক্ত অনন্ত বিচারালয়ে বুয়রদিগের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী, ইংরেজের বিরুদ্ধে বুয়রের দাবি যাহাই হউক না কেন, আফ্রিকার ভূমিতে আদিমবাসীর দাবি যে সর্ব্বশ্বেতকায়ের দাবি হইতে অগ্রবর্ত্তী, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেননা। কিন্তু বুয়রগণ তাহা দেখিলেন না, বুঝিলেন না বুঝিবেনই বা কেন? বুয়রেরা শ্বেতাঙ্গ, আদিমবাসীগণ কৃষ্ণকায় আত্মশূন্য পদার্থ!

বুয়র পুরুষদিগের মনের ভাব ত পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব্বোক্ত চিঠী হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন; বুয়র রমণীগণও নীরব থাকিবার পদার্থ নন; তাঁহারা ব্রিটিস্ কমিসনরকে জানাইলেন যে, ইংরেজ শাসন স্বীকার করা অপেক্ষা, নগ্ন পদে ড্রেকেনবর্গস্ পর্ব্বতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহার অপর দিকে স্বাধীনতা অথবা মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়াও তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

বুয়রগণ অস্ত্রবলে ব্রিটিস্ সিংহের গতি প্রতিরোধ করিতে অশক্ত হইয়া, মনে করিলেন, গবর্ণরকে বুঝাইয়া তাঁহাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবেন; শত শত মাইল দুরতিক্রম্য পথ অতিক্রম করিয়া বুয়র অধিনেতা এনড্রিস্ প্রিটরিয়স্ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার সকল পরিশ্রমই বিফল হইল, গবর্ণর সাক্ষাৎ করিলেন না। প্রিটরিয়স্ ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, ড্রাকেনস্বর্গের সন্নিকটস্থ পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, অধিকাংশ বুয়র নাটাল পরিত্যাগ

করিয়া চলিয়াছেন; তন্মধ্যে তাঁহার পীড়িত শয্যাশায়িনী স্ত্রীও এক শকটারোহণে চলিয়াছেন; স্বামীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা তাঁহার সহ্য হইল না। তাঁহার কন্যা শকট পরিচালকের কার্য্য করিতেছেন। শকটবাহী ষাঁড় তাঁহাকে গুরুতর রূপে আহত করিয়াছে, তথাপি তিনি ইংরেজাধিকার পরিত্যাগের নিমিত্ত ব্যাগ্র হইয়া শকট পরিচালন করিতেছেন।"

এইরূপ দৃশ্য ইংরেজ গবর্ণরের প্রাণকেও ব্যথিত করিয়াছিল; সার হেরি স্মিথ, পটিঙ্গার মহোদয়ের স্থলে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং বুয়রদিগের কষ্টকাহিনী তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

"তাহারা যে প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত, মেসেনা কর্ত্তৃক পর্টুগাল আক্রমণের ইতিবৃত্তে ব্যতীত, আর কুত্রাপিও তাহার তুলনা দৃষ্ট হয় না। দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবেই হৃদিদারক।"

নাটালত্যাগী বুয়র দলের কতকাংশ ফ্রিষ্টেটে নিজদিগের আবাস স্থাপন করিলেন অবশিষ্ট বুয়রগণ ভ্যাল নদের অপর পারে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

মৃত্যু কি?

মৃত্যু নামে জীবমাত্রেই শিহরিয়া উঠে:—সংসারাসক্ত লোকেরা ভয়ে এবং সাধনশীলেরা আশায় ও পরকাল চিন্তায়, মৃত্যু একটী আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার জন্য কত চিন্তাশীল মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু নিঃসংশয় রূপে এখনও মানব-সাধারণ এ তত্ত্বের মীমাংসায় উপনীত হয়েন নাই। কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই কখন না কখন এ প্রশ্নের আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না। মৃত্যু যখন সাধারণের ভাগ্য বা অধিকার, তখন প্রত্যেকের ইহাতে কথা বলিবার অধিকার আছে। পণ্ডিত, মূর্খ, সংসারী বা উদাসীন, সকলেই এ তত্ত্বালোচনায় দুই চারিটী কথা বলিলে অনধিকার চর্চ্চা হইবে না; এজন্য কিছু বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলাম।

মৃত্যু কি? এ প্রশ্ন মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জন্ম কি ও জীবন কি, তাহাও যুগপৎ মনে উদিত হয়। জীবনের দুই দ্বার, জন্ম দ্বার দিয়া জীব প্রবিষ্ট হয় এবং মৃত্যু দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। কেন জীব আইসে ও কেন চলিয়া যায়, তদ্বিষয় এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। জন্ম কি, তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিয়াছেন যে, শুক্র ও শোণিতের মিলনে জীবদেহ উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে ভ্রূণ রূপে মাতৃগর্ভে থাকে। তথায় ক্রমে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া দশম মাসে ভূমিষ্ট হয়। জরায়ুজ জীব সম্বন্ধে এই মীমাংসা। মনুষ্য এই জরায়ুজ জীব মধ্যে গণ্য। এই প্রস্তাবে কেবল মানব সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে, এজন্য জরায়ুজ জীবের জন্ম সম্বন্ধেই শারীর বিজ্ঞানের মীমাংসা বলা হইল। এখন কথা এই, শুক্রশোণিত জীবন বিশিষ্ট পদার্থ নহে।

তাহা হইতে জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? পিতৃমাতৃ অংশে সন্তানের দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা স্বীকৃত হইলেও সন্তানের প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা লইয়া সন্তান সংসারে আসিল,তাহা কি রূপে গঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শারীরবিজ্ঞানের মীমাংসা সমীচিন নহে। কোন কোন পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,সন্তানেরা পিতামাতার নিকট বুদ্ধিবৃত্তি,ভাব ও নীতিবৃত্তিও পাইয়া থাকে, এবং তাঁহাদের পাপ ও পুণ্য বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতার শারীরিক শক্তি ও ভাব যেমন সন্তানে সংক্রামিত হয়, বুদ্ধি বৃত্তি ও নৈতিক ভাবসম্বন্ধেও যে পিতামাতার সহিত সন্তানের সেরূপ কোন সংশ্রব নাই,ইহা বলা ধৃষ্টতা বটে; কিন্তু শরীর সম্বন্ধে পিতামাতার সহিত সন্তানের যতদূর সম্বন্ধ, শরীরাতীত বিষয়ে সে রূপ সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কেন না, ধার্ম্মিক পিতা মাতার সন্তান সর্ব্বদা ধার্ম্মিক হয় না এবং পাপী পিতামাতা হইতেও পুণ্যাত্মার জন্মগ্রহণ হইতে দেখা গিয়াছে।

এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা পিতামাতার সন্তান উদ্ভব হইবার সময়ের প্রকৃতি অনুসারে সন্তান প্রকৃতি পায়, মীমাংসা করেন। এ সমস্ত অনুমান যে রূপই হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে মানুষ অন্য লোকের দোষ গুণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, ইহা অনুমান করা অপেক্ষা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, এই সিদ্ধান্ত সমধিক ন্যায়ানুগত মনে হয়। এ সমুদয় অনুমান যে রূপেই হউক না কেন, জন্ম কি, তাহার মীমাংসা এতদ্বারা স্থির হইতেছে না। জন্ম বাস্তবিক পক্ষে ছিল না—হইল। কেমন করিয়া হইল এবং কি কারণ অবলম্বনে অস্তিত্ব ঘটিল, তাহাই যতদূর পারা যায়, আলোচনা করিয়া দেখা যউক। ইহসংসারে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়,তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, জড় ও জড়াতীত আর কিছু সংসারে কার্য্য করিতেছে। জড় আপনি কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। জড়াতীত আত্মা বা শক্তি তাহাকে কার্য্য করাইয়া লইতেছে। এইটী যখন জগৎ কার্য্যে দেখা যাইতেছে, তখন জন্ম সম্বন্ধে ইহাই প্রয়োগ করা সঙ্গত। শুক্র-শোণিত মিলিত হইয়া একটী পিণ্ডাকার গঠিত হইলে তন্মধ্যে জড়রূপী আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া ঐ জড়রূপী ভ্রূণকে চালিত করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ভ্রূণ হইতে আকার প্রকার গঠিত হইতে আরম্ভ হইল, এবং যতক্ষণ এরূপ আকার না হইল, যাহা ভূপৃষ্ঠে আসিলে নষ্ট হইতে পারে, ততক্ষণ জরায়ু মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তৎপর গর্ভ হইতে নির্গত হইল এবং তখনই তাহার জন্ম হইল বলিয়া আমরা স্থির করিলাম ও তাহার জীবন আরম্ভ হইল। শুক্র-শোণিত সর্ব্বদাই ভ্রূণ রূপে পরিণত হয় না, ইহা স্থির কথা। যখন ঐ মিলনে আত্মা সংস্পর্শ হয়, তখনই ভ্রূণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অন্যথা জীব গঠিত হয় না। দুইটী জড় পদার্থ মিলিত হইলে তাহার রাসায়নিক সংস্পর্শে নূতন প্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে জড় ও আত্মার মিলনেও কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হইবে, এটী স্থির নিশ্চয়। মন এই মিলনের প্রকাশ। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা মনকে জড় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য পক্ষে ইউরোপীয় তত্ত্বদর্শিগণ অজড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ রূপে

পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মনে জড় ও আত্মা উভয়ের কার্য্য রহিয়াছে। জড় আশ্রয় ভিন্ন মনের কার্য্য হয় না। অন্য দিকে মনের শক্তি জড় নহে। এতদ্বারা দেখা যায় যে, চৈতন্য জড়াশ্রিত হইলে জন্ম হইয়া থাকে। অথবা চৈতন্য শুক্র শোণিত মিলন কালে তদাশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের উৎপত্তি হয় এবং পরস্পর আনুগত্য হইতে ভ্রুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। একদিকে জড় ভাগ যেরূপ বৃদ্ধি পায়; অন্য দিকে চৈতন্যের প্রকাশ পাইতে থাকে।

উপরে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে দেখা গেল যে আত্মায় জড় সংযোগ হইলে মানবের জন্ম হয়—এবং আত্মা ও জড়ের মিলনে মনের উৎপত্তি হয়। মন ক্রমে বিষয় সংযোগে সংসারজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া নানাদিকে আপনার অধিকার বিস্তার করে। মানব জীবন দেখিতে গেলে আর কিছুই নহে, মনের বিকাশ ও জড় রাজ্যে তাহার বিস্তার মাত্র। জড় রাজ্য লইয়া মন যত আন্দোলন করিতে থাকে, তত তাহার বিকাশ হয়। প্রকৃত পক্ষে দর্শন, বিজ্ঞান সকলই মনের বিকাশ মাত্র। এমন কি, শান্তি নামে যে যোগ রাজ্যের সাধন বা প্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহাও মনের বিস্তার বা বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পণ্ডিতেরা এই মনকে নানাদিকে সংযোগ দ্বারা জড় জগতের নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। মন, মানব জীবনের মহতী লীলা। কিন্তু মন যতই প্রসারিত হউক না কেন, এমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, শরীর হইতেই মনের বল ও শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে, এবং শরীর বিনষ্ট হইলে মনের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। অন্য পক্ষে দেখা যায়, জড়ীয় শরীরে মনের অস্তিত্ব নাই এবং জড়দেহ হইতে মনের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। শরীরের সঙ্গে আর কিছু সংযুক্ত না থাকিলে যে মন তিষ্ঠিতে পারে না, তাহাও সহজেই প্রমাণিত হইতেছে। জড় ও আত্মার মিলনেই মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা সামান্য চিন্তা দ্বারাই উপলব্ধি হইতেছে। অনন্ত চিন্ময় আত্মা জড় সম্মিলনে জীব নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং মনের উৎপত্তি-জনিত সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দাধীন হইয়া জড় মধ্যে বিচরণ করিয়া জীব নামে ঐহিক জীবন যাপন করিতে লাগিল।

সময় ক্রমে জীবরূপী চৈতন্যের জড়রূপী দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইল। স্বাবাবিক গতিতে ক্রমে ক্রমে শরীরের ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়াই হউক, পীড়ারূপ অন্তরায় দ্বারাই হউক, অথবা অস্বাভাবিক কোন কারণ দ্বারাই হউক, এই বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন মনরূপী কারণ অন্তর্হিত হয় এবং জড়ীয় দেহ জড় জড় রূপীত্ব প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য তখন আপনার অস্তিত্বে অবস্থান জন্য এই সংসারে ঐ জীবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে চৈতন্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইলেই তাহাকে মৃত্যু কহে। প্রকৃত পক্ষে ভৌতিক দেহও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং আত্মারূপী চৈতন্যের ত বিনাশ নাই, তবে উভয়ের মিলন

ভার তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনের অস্তিত্ব আর থাকে না, তাহার জড়ভাব জড়ে বিলীন হয় এবং চৈতন্যাংশ চৈতন্যে বিলুপ্ত হয়। ফল কথা জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। কেবল সংযোগ বিয়োগ বশতঃ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এ জগৎ পরিণামশীল অর্থাৎ সর্ব্বদা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বালক, যুবত্বে; যুবা বৃদ্ধত্বে পরিণত হইতেছে। মনের গতিও প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং চৈতন্যে এই পরিবর্ত্তনের অধ্যাস হইয়া জীবচৈতন্য তাহার ফলভোগ করিতেছে, কিন্তু চৈতন্যের প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে না। চৈতন্যের আধার অনাদি চৈতন্য এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ন্তা রূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিয়াও পরিণামী নহেন। এবং ঐ অপরিণামীত্ব প্রত্যেক জীব চিন্তা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে। কেন না, আমরা দেখিতে পারি, যদিও সর্ব্বদাই আমাদের শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি, কিন্তু আমরা দশ বৎসর পূর্ব্বে—এমন কি, অতি বাল্যকালেও যে আমি ছিলাম, সেই আমিই এখন বৃদ্ধকালে আছি, আমার মনের ও শরীরের নানা প্রকারে বিবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চৈতন্য প্রকৃত পক্ষে কোন পরিবর্ত্তনের অধীন নহে। স্বীয় অস্তিত্বে চিরদিন বিদ্যমান রহিয়াছে ও থাকিবে।

জ্ঞান প্রেম জীবের বিকাশ সম্পাদন করিয়া চৈতন্যের উৎসকে ক্রমে জীবের নিকট জীবের উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম ভাবে প্রকাশ করিতেছে।

এই সকল সমালোচনা করিয়া তত্ত্বদর্শীরা মৃত্যুকে কোন প্রকার ভয়ানক বিপদ বা ক্লেশের অবস্থা মনে করেন না। এক দিকে যেমন মৃত্যুর জন্য কোন ভয় দ্বারা ভীত হয়েন না, অন্য পক্ষে ইহলৌকিক কোন প্রকার ক্লেশ বা বিপদ হইবে আশঙ্কা করিয়াও মৃত্যু কামনা করেন না। তাঁহারা জানেন, মৃত্যু স্বভাব ক্রমে একদিন উপস্থিত হইবে এবং তাঁহার সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আশান্বিত হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। ইহলোকের করণীয় কার্য্য অপ্রলুব্ধ ভাবে, কামনা-শূন্য ভাবে সম্পন্ন করেন। সুখকেও চাহেন না, এবং দুঃখকেও ঘৃণা করেন না। সুখ দুঃখ তাঁহাদের নিকট সমভাবে প্রতীয়মান। ভগবল্লীলা সমান ভাবে সকল অবস্থায় পরিদর্শন করিয়া তাঁহারই যশঃ গান করেন ও আপনাকে ধন্য মনে করেন। ইহা যদিও অতি উচ্চ অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সকলেরই এই স্পৃহণীয় অবস্থার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং ভগবান সর্ব্বদাই পুরুষকার দ্বারা তদীয় কৃপা উপভোগের উপযুক্ততা নির্দ্ধারণ করেন। এজন্য সকলেরই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত নহে এবং অন্য পক্ষে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া তাহার হাত এড়াইবার জন্যও চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যত দিন জীবন থাকে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া সেই মৃত্যু দিনের অপেক্ষা করিয়া থাকাই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। ভগবান দয়া করিয়া প্রতি মনুষ্যের এই প্রকার অবস্থা আনিয়া দিউন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

জনৈক বৃদ্ধ।

বিনাশের নানা উপায়।

এই চরিত্রহীন বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী যুবকের চরিত্র-বিনাশের শত শত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। রমণীগণের তত সুবিধা নাই, কিন্তু তথাপি সাহিত্য নামক প্রচ্ছন্ন বন্ধুনামধারী শত্রু সকলের অভাব পরিপূর্ণ করিতেছে। এ হতভাগ্য দেশে ধর্ম্মের নামে নট নাটিকার ব্যভিচার-সূচক প্রেম, সাহিত্যের নামে পাপিষ্ঠ ব্যভিচারীর গোপনীয় ব্যভিচার প্রাচীন বঙ্গকে কলুষিত করিয়াছিল, আজি আবার সুরুচি বিনাশী নাট্যাভিনয়, সুনীতির উপর কটাক্ষকারী সংবাদ-পত্রের জঘন্য রসিকতা, আর সাময়িক পত্রের কুৎসিৎ রুচিময় নাটক ও উপন্যাস, গৃহে গৃহে পূজার সময়ে বারাঙ্গনার কুৎসিৎ গান ও নৃত্য। আহা, অধঃপতনের এত পরিষ্কার পন্থা থাকিতেও যে দুই একটী সাধু জীবন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা মনুষ্য চরিত্রের প্রকৃত মহত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

অনেক সাহিত্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা কেবল ছোট ছোট উপন্যাসে পরিপূর্ণ। সে সকলের মধ্যে না আছে সুনীতি, না আছে কবিত্ব, না আছে রচনা-মাধুর্য্য। কেবল ঠাকুরমার পুরাতন বেগম বেগমীর গল্পের ন্যায়। ঐ সকল গল্পে এমন কথা থাকিত না, যাহা ঠাকুর মাতা লজ্জাশীলতার ভয়ে নাতি নাতিনীদিগকে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু এখানে সে সঙ্কোচ নাই, কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নির্ব্বাচনের জন্য দুই একটী প্রকাশিত হয় না। কিন্তু স্থান পুরণের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় আবার সে বালির বাঁধও অতিক্রম করে। একদিন একখানি উপন্যাসে দেখিলাম, একটী বালক এম্ এ পরীক্ষা দিয়া শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিল, সঙ্গে হাইড্রোসিয়েনিক এসিড্ ছিল, জনরব শুনিল যে, সে ফেল হইয়াছে, অমনি তীব্র বিষপানে আত্মহত্যা করিল। পরদিন সংবাদ আসিল যে, যুবক পাশ হইয়াছিল। এ গল্পে কি নীতিশিক্ষা হইল? ইহাতে না আছে রস, না আছে ধর্ম্ম, পড়িতেও মিষ্ট নহে, অথচ এক সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রাণের প্রতি অবজ্ঞা ঘোরতর কুদৃষ্টান্ত উপস্থিত করে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, আত্মহত্যার ইতিহাস যতই অধিক প্রচারিত হয়, ততই সেই শ্রেণীর পাপীগণ নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করে, এবং তাহাদের সংখ্যা অধিক হয়। প্রেম নামে যতরূপ কুরুচি পূর্ণ প্রলোভনময় চিত্র যুবক যুবতীর নিকট উপস্থিত করা হয়, যাহা পাপ পথে যাইবার পক্ষে সহায় হয়, অনেক পাপীয়সী ও পাপিষ্ঠ সেই সকল উদাহরণ গ্রহণ করিয়া নরকের গভীরতম কূপে নিমগ্ন হয়। আমি কাহারও নাম করিতে চাহি না। অদ্য সাময়িক পত্রের একটী উপন্যাস পড়িলাম, বোধ হইল, যেন পড়িতে পড়িতে পাপের গভীরতম কূপ দর্শন করিলাম। পরে আবার দেখি, গ্রন্থকার শান্তিরস প্রচার করিতেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, পাপের গভীরতম কূপ প্রদর্শন না করিয়াও কি পবিত্র জাহ্নবীর পূত সলিলে অবগাহন করিতে পারা যায় না? কেহ কেহ বলিবেন, তাহা স্বাভাবিক হয় না।

গ্রন্থকারগণ, কি দৈনিক জীবনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সকল ঘটনাই লোকের চক্ষে উপস্থিত করিতে বাধ্য, না কতকগুলি সম্বন্ধে পাঠকগণের কল্পনা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর শ্রেয়ঃ? তিনিই সুকবি, যাহার রচনা পাঠকের হৃদয়ে শত শত সুচিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত করে। কিন্তু যিনি বাহ্য চিত্র দেখাইয়াই সকল বুঝাইবেন, ইচ্ছা করেন। তাঁহার চিত্র কেহ দেখিতে চায় না। অরুচিকর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র কে দেখিতে চায়? গ্রন্থকারগণ যদি পাপের মধ্যে ডুবিয়া পাপচিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হয়েন, সে নরক চিত্র কোন সাধু লোকে দেখিবে না। ভারতচন্দ্র,রেনল্ড সাধুলোকের সংসর্গ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তাই নূতন ভারতচন্দ্র মহাত্মাগণের নিকট অনুরোধ, যেন বঙ্গভাষায় আর সে সমস্ত পাপ চিত্র অঙ্কিত না করেন।

সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা সতর্ক হউন। যে সময়ে বঙ্কিম বাবু সাময়িক সাহিত্যের নেতা ছিলেন, সে সময়ে কোন গ্রন্থকার কোন ঘৃণাকারজনক কুৎসিৎ গ্রন্থ এদেশে চালাইতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সাময়িক পত্রের নেতৃগণের প্রতি আমাদের বিশেষ আশা। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এ বিষয়ে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ বিশেষরূপে তাঁহাদের নির্ব্বাচন-ক্ষমতা পরিচালন করিবেন; যেন তাঁহারা মার্জ্জিত বঙ্গ সাহিত্য মধ্যে কুরুচিকে স্থান দিয়া পাঠকগণের রুচিবিকৃত ও নব্য পাঠক পাঠিকাগণকে কুপথে পরিচালিত না করেন।

লেখকগণের প্রতিও আমাদের অনুরোধ, কেন না, সমগ্রজাতির হিতাহিত চিন্তা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত। ভল্টেয়ার ও রুসো কেবল লেখনী দ্বারাই ফরাসী জাতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন্‌। এক সময়ে আমাদের বাঙ্গালা লেখক ও বক্তাগণ এই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে ভাব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সুফল এক্ষণেও দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণেও আমাদের জাতীয় চরিত্র কোন বিশেষ সুপন্থায় ধাবিত হয় নাই। সুতরাং সমগ্র জাতির চরিত্র গঠনের ভার আপনাদের হস্তে। তাই বিনীত অনুরোধ, আর এ অধঃপতিত জাতিকে আরও অধঃপতনের মুখে পরিচালিত করিবেন না। কলঙ্কিত লেখনী পরিচালনা দ্বারা অনেক যুবক চিরদিনের তরে সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া অকারণ আত্মীয়বর্গকে কান্দাইয়া জীবনলীলা বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আবার সেই কলঙ্ক এই দরিদ্র দীনহীন অধঃপতিত জাতির সমক্ষে যেন না উপস্থিত হয়। দুর্দ্দশার কি একশেষ হয় নাই, আর দুর্দ্দশায় এ হতভাগ্য জাতিকে নিক্ষেপ করিবেন না।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

অনুকরণে—বিষপান।

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার কোল জাতির রাজধানী রাঁচি সহরে গিয়াছিলাম। মদের দোকানে বসিয়া যে সকল কোল মদ্যপান করিতেছিল,সেই সময়ে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমরা মদ্যপান কর কেন? এই বিষপানে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, এবং হইবে, ইহা পরিত্যাগ কর।" ইহার উত্তরে তাহারা বলিয়াছিল,—"এখান-

কার বাবুরাও মদ্যপান করেন, সুতরাং ইহা ভাল কাজ।” এই সর্ব্বনেশে যুক্তির কথা শুনিয়া প্রসঙ্গক্রমে একদিন সেখানে বক্তৃতায় বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে সতর্ক করিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—“ইহাদের প্রকৃতিই এইরূপ, বাঙ্গালীর অনুকরণের জন্য ইহারা মদ্যপান করে না;—অনুকরণে ইহাদের কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই।” চতুর্দ্দশ বৎসর পর এবার আবার রাঁচি গমন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালীর অনুকরণে কোল জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়াছিলাম।

২।৪ দিন কোন স্থলে বাস করিয়া যদি কোন দেশের অবস্থা কতক জ্ঞাত হইতে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে হাট বাজারে গমন করিলেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। দেশের নরনারীর প্রকৃতি, স্বভাব, অবস্থা, দেশের উৎপন্ন, অন্তর এবং বহির্বাণিজ্য তত্ত্ব সমস্তই ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আমরা ২।৪ দিনের জন্য কোন স্থলে যদি যাই, অগ্রে হাট বাজার দেখি। রাঁচি সহরে একটী বড় হাট আছে, সপ্তাহে দুইবার সে হাট বসে। এখানে বহুদূর হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দশ, পনর হাজার কোলও কখনও কখনও সমাগত হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রাঁচির হাটে যাইয়া দেখিয়াছিলাম, কোল রমণীগণ প্রায় উলঙ্গবেশে হাটে আসিত, কটিদেশে কেবল একটু কাপড় জড়ান থাকিত, কিন্তু কি যুবতী, কি বৃদ্ধা সকলেরই বক্ষ অনাবৃত থাকিত। এবার ১৪ বৎসর পরে রাঁচির হাটে যাইয়া একটীও অনাবৃতবক্ষ স্ত্রীলোক দেখিলাম না। বাঙ্গালীর রমণীর ন্যায় সকলেই বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল, বিধাতাই জানেন। বাঙ্গালীর চরিত্রানুকরণের স্রোত কি তীব্র বেগে দেশে প্রবাহিত হইতেছে। হায়, বাঙ্গালীর চরিত্রহীনতাও কি অসভ্যদিগের মধ্যে সেইরূপ সংক্রামিত হইতেছে? তাহারও পরিচয় পাইয়া অনেক স্থলে বিষম আঘাত পাইয়াছি।

যে কারণেই হউক, বাঙ্গালীর আচার, ব্যবহার ও চরিত্র—আজ কাল ভারতের অনেক স্থলের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর দায়িত্ব দিন দিন বড় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।

মহাত্মা ৺ রাজনারায়ণ বাবু কথা প্রসঙ্গে এক দিন বলিয়াছিলেন—“আজ কাল ইংরাজের অনুকরণে এদেশে যেমন চা-পান চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে ঐরূপ মদ্যপান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। এখন পাঁচ বন্ধু মিলিয়া যেমন সকালে চা পান করে, এক সময়ে আমরা ঐরূপ মদ্য পান করিতাম। শেষে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হায়, চা-পান কি সমভাবেই চলিবে।”

ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জন বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে একদিন চাকরদিগকে বলিয়াছেন যে, চায়ের কাটতির জন্য বিদেশের দিকে না চাহিয়া, এই ভারতবর্ষে যাহাতে চায়ের খরিদদার বাড়ে, তজ্জন্য চেষ্টা করা হউক।” এই প্রস্তাবের পর বণিকমহলে বিশেষ আয়োজন হইতেছে। যাহাতে, কেরোসিন তৈলের ন্যায়, চা ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়, বিপুল ভাবে তাহার আয়োজন হইতেছে। আফিং-বাণিজ্যের কূট নীতিতে চীনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মহা গৌরবান্বিত

চীন আজ সকলের পদতলে পতিত। ইংরাজ ভারতকে স্বাধিকারে রক্ষা করিবার যেন আর কোন উপায় পাইতেছেন না, গবর্ণমেণ্ট, প্রকারান্তরে এই উষ্ণ ভারতকে শীতপ্রধান দেশের পানীয় সুরা ও চা পান করাইয়া, স্নায়ুকে নিস্তেজ করিয়া, চীনের ন্যায়, হীনতেজ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতে ইচ্ছুক। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি, কিন্তু এই বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরাজের অনুকরণে দিন দিন চা পান যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, এবং বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার দিন দিন যেরূপ ভাবে চতুর্দ্দিক অনুকরিত হইতেছে এবং লর্ড কর্জ্জনের ইঙ্গিতে, এদেশের ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় চা প্রচারের জন্য যেরূপ বিপুল আয়োজন করিতেছেন, আমাদের ভয় হইতেছে, অচিরে, ঘরে ঘরে এই বিষ-পান সংক্রামিত হইবে। শীতপ্রধান দেশের কথা বলিতেছি না, ভারতের ন্যায় গরম দেশে চা-পান বিষপানের ন্যায় অনিষ্টকারী, সঞ্জীবনীতে চা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার একটু আমরা এস্থলে দিলাম।

"আমাদের দেশজাত চার অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রথম যখন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চা প্রেরিত হয়, তখন প্রত্যেক পাউণ্ড ছয় হইতে দশ পাউণ্ড মূল্যে (বর্ত্তমান ৯০ হইতে ১০০) বিক্রয় হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরকে দুই পাউণ্ড দুই আউন্স চা উপহার দিয়াছিলেন, উহার প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য হইয়াছিল চল্লিশ শিলিং (বর্ত্তমান ৩০.) ইহার পরে আবার পৌণে তেইশ পাউণ্ড চা উপহার দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডে পঞ্চাশ শিলিং (বর্ত্তমান ৩৭।০) পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে গড়ে প্রতি পাউণ্ড আট আনা কি নয় আনার বেশী বিক্রয় হয় না। আমাদের দেশ হইতে ইংলণ্ডেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা রপ্তানি হইয়া থাকে। তারপরে মার্কিন যুক্তরাজ্যে। ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে পাঁচ পাউণ্ড চা খায়। এ বিষয় চীনাম্যানরাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, পরে ইংরেজ। ডচেরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এ বৎসর চার ব্যবসাতে চা-করদিগের বিশেষ লোকসান হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিগত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে, ইংলণ্ডের জন্য ৮১,২৭,৭৪৫ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে ১,২৫,৫৩,৫৬৯ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছে। অনেকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ব্যবসাদার জাত সহজে ছাড়িবার নয়। সমস্ত চা কোম্পানী মিলিত হইয়া চার কাট্‌তি বৃদ্ধি করিবার জন্য পরামর্শ ও সংকল্প আঁটিতেছেন। শুনিতে পাইতেছি, পারস্য প্রভৃতি দেশে এজেণ্ট পাঠাইয়া চা বিক্রীর বন্দোবস্ত করা হইবে। আবার শুনিতেছি, দরিদ্র ভারতবাসীকে চা পায়ী করিবার জন্য সমস্ত চা কোম্পানি ছয় লক্ষ পাউণ্ড চা বিনা মূল্যে বিতরণ করিবেন। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। গাঁজা, তামাক, তাড়ি, মদে আমাদের শ্রমজীবীরা দিন দিনই দুর্ব্বল, পরিশ্রমকাতর, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছে; ইহার উপর আবার চা ব্যাধির আধিপত্য হইলে আমাদের নিম্ন শ্রেণী একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। স্বদেশহিতৈষী প্রত্যেক সম্পাদকেরই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা উচিত এবং সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, চা পান অভ্যাস করিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে;"

কুচবেহারের ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস গুপ্ত, এম-বি, স্বাস্থ্য নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। কাগজ খানিতে অনেক সারগর্ভ প্রসঙ্গ থাকে। বিনা আড়ম্বরে, নীরবে, এদেশের কিরূপ উপকার করা যায়, "স্বাস্থ্য" তাহার দৃষ্টান্ত। এই স্বাস্থ্যের আষাঢ় সংখ্যায় চা সম্বন্ধে একটী ছোট সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটী এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

চা।

"সভ্যদেশ মাত্রেই চার বহুল প্রচলন আছে! দেখা দেখি আমাদের দেশেও দিন দিন ইহার প্রচলন বাড়িয়া যাইতেছে। একটু অবস্থাপন্ন লোকের চা নহিলে চলে না, কাহারও সকালে বিকালে চা চাইই চাই। ভাত রুটি না হইলে বরং এক দিন চলে কিন্তু চা না হইলে চলে না। কাহারও আবার ৪।৫ বার চা চলে। বাঙ্গালী বাবুর ত কথাই নাই, হিন্দুস্থানীরাও ঘোর চাপায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ কাল উড়ে বেহারা, হিন্দুস্থানী চাকরদের মধ্যেও চা চলিতেছে। চার দোষ গুণ উভয়ই আছে।

পরিমিত চা পান করিলে মনে একটা স্ফূর্ত্তি জন্মে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মনের বল বৃদ্ধি পায়, শরীরের জড়তা ঘুচিয়া কার্য্যে উৎসাহ জন্মে। মদ্য বা আফিম সেবনের পর প্রথম উত্তেজনা ঘুচিয়া গেলে যেমন শরীরে একটা দুর্ব্বলতা আইসে, চা পানে সেরূপ হয় না। ইহার সে দোষ নাই। ঔষধরূপেও চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাথা ধরা রোগে, বিশেষ ঐ মাথাধরা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত হয়, চা বিশেষ উপকারী। মাথাধরা নিবারণের জন্য তীব্র চা পান করাই বিধেয়। কালবর্ণের চা অপেক্ষা সবুজবর্ণের চায় অধিকতর উপকার হয়।

পরিমিত চায় যেমন গুণ অপরিমিত হইলে ইহার তেমনি নানা দোষ। অধিক পরিমাণে চা পান করিলে নিদ্রাল্পতা ঘটে, রক্তের গতি বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ু মণ্ডলীকে দুর্ব্বল করে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ জন্মে।

কেহ কেহ বলেন চা দ্বারা ডিস্‌পেপসিয়া হয় না, চা পানের রীতির দোষেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়া থাকে। অনেকেই খালি পেটে চা পান করিয়া থাকেন। খালিপেটে চা পান করিয়া পরে যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা রীতিমত পরিপাক হয় না। সুতরাং অগ্নিমান্দ্য জন্মে। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে চর্ব্বণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। চর্ব্বণক্রিয়া সম্যক না হইলে নিয়মিত পরিমাণে গ্যাষ্ট্রিক রস নির্গত হইতে পায় না, স্যালিভা ও (লালা) উৎপন্ন হয় না, সুতরাং পরিপাকের জন্য যে দুইটি প্রধান রসের আবশ্যক তাহার অভাব ঘটে। পরিপাক শক্তি প্রবল থাকিলে বা তা খাইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু পরিপাক শক্তি কম থাকিলে অতি সামান্য বিষয়েও সাবধান হইতে হয়। যাহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাহাদের পক্ষে চা পান না করাই ভাল, অন্ততঃ খালিপেটে চা পান করা কোন মতেই উচিত নহে। গরম গরম তীব্র চা পান করা কোন মতেই উচিত নহে, কারণ, চা যত তীব্র হইবে, তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তি তত অধিক হইবে। চায় থিয়েন নামে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, চা অধিকক্ষণ সিদ্ধ হইলে থিয়েনের ভাগ অধিক হয়, কাজেই তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

চার সর্ব্বজনিত ব্যবহার দেখিয়া চার উপকারিতা অনুপকারিতা বিষয়ে ডাক্তারগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে চায় দুই প্রকার অনিষ্টকারী বিষ আছে, এক প্রকারের নাম থিয়েন অপর প্রকারের নাম ট্যানিন। চায় শতকরা ৬ ভাগ থিয়েন ও তাহার ওজনের সিকি ভাগেরও অধিক ট্যানিন থাকে।

কাফিতেও থিয়েন ট্যানিন উভয়ই থাকে, তবে চা অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে থাকে।

কোকা ও চকুলেটেও থিয়েনের ন্যায় একপ্রকার অনিষ্টকারী বিষাক্ত পদার্থ থাকে, কিন্তু তাহারও পরিমাণ চার অপেক্ষা অনেক কম।

চা প্রিয় বাবুরা একথা শুনিলে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু সত্য গোপন করা ত সঙ্গত নহে।

পরীক্ষা করিয়া চা ও কাফি হইতে থিয়েন বাহির করা হইয়াছে। এবং ঐ থিয়েন যে একটী তীব্র বিষ, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে ঐ বিষে মানুষ ও ইতর জন্তু উভয়েরই মৃত্যু ঘটিতে পারে।

থিয়েন যে ষ্ট্রিকনিয়া জাতীয় বিষ এবং নবাবিষ্কৃত কোকেন বিষের সহিত ইহার যে অনেকটা তুল্যতা আছে তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। কোকেন নামক বিষ কোকো হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই ইহার নাম হইয়াছে কোকেন। এদেশে যেমন চা পানের প্রথা, দক্ষিণ আমেরিকায় সেইরূপ কোকেন পানের প্রথা আছে। আফিম মদিরা বা অন্য যত

প্রকার মাদক আছে, কোকেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অহিতকারী।

অনিষ্টকারিতা ও রাসায়নিক সংযোগ বিষয়ে কোকেন বা থিয়েনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ডাঃ এইচ, সি,উড অন্যান্য পরীক্ষকগণ চার থিয়েনের পরিমাণ স্থির করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিষের এক গ্রেণের সা? ভাগের এক ভাগ দ্বারা অতিঅল্প সময়ে একটী ভেককে মারা যায়। ৫ গ্রেণ খাওয়াইলে একটী বৃহৎ বিড়ালকে মারা যায়। ষ্ট্রিকনিয়া খাইলে যে সকল উপসর্গ হয়, থিয়েন দ্বারাও সেই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে। রোগী দড়কার স্থায় হাত পা কসিতে থাকে, শ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এবং অল্প সময় মধ্যেই হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হয়।

চায় শতকরা তিন ভাগ থিয়েন থাকে এবং এক আউন্সে ১৫ গ্রেণ থিয়েন পাওয়া যায়।

এক পাউণ্ড চায় যে থিয়েন থাকে, তাহা দ্বারা ১৫ শত ভেক ও প্রায় ৪০টী বিড়াল মারা যাইতে পারে।

১৫ গ্রেণ থিয়েন পান করিলে মানুষের শরীরে বিপদজনক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহার উপর ২।৪ গ্রেণ বাড়াইলেই মৃত্যু সম্ভব। আধ আউন্স তীব্র চায় ১ পিয়ালায় প্রায় ৬।৭ গ্রেণ থিয়েন থাকে। অথচ দেখা যায়, অনেকে প্রত্যহ ৬।৭ পিয়ালা চা পান করিয়া থাকেন। ঐ পরিমাণ চায় যতটুকু থিয়েন থাকে, অনভ্যস্ত ব্যক্তি তাহা এককালে পান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে।

তবে এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি চায় এত অধিক বিষাক্ত দ্রব্যই থাকিবে, তবে চা দ্বারা সচরাচর বিষক্রিয়া হয় না কেন? তাহার একই উত্তর —অভ্যাস। অভ্যাস সামান্য জিনিষ নহে, যত তীব্র বিষই কেন হউক না, অভ্যাস দ্বারা তাহার অনিষ্টকারিতা শক্তিকে আমরা অনায়াসে কমাইতে পারি। অভ্যাস করিলে হলাহল পানেও আশু অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণাম ফল অত্যন্ত মন্দ। অভ্যাস করিলে সর্পবিষ পান করিয়াও অনিষ্ট হয় না, তা বলিয়া কে সর্পবিষ পান করা অভ্যাস করিয়া থাকে? -

চা-পানোন্মত্ত বাবুরা এই কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শীতকালে, অতি শ্রমের পর, ঠাণ্ডার দিনে ২।১ পিয়ালা চা পান কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু চা না হইলে অন্ন হজম হইবে না, কোন কাজ করিতে পারিব না, আফিম খোরের স্থায় চায় সময় অতীত হইলে হাই তুলিতে থাকিব, স্বাস্থ্যকামী লোকের পক্ষে ইহা কোনক্রমেই ভাল নহে।" স্বাস্থ্য, আষাঢ়, ১৩০৮।

"স্বাস্থ্য" চায়ের গুণ উল্লেখের সময়ে চাকে মদ্য ও আফিমের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, চা ঐ দুই জিনিস অপেক্ষা ভাল। ইংলণ্ডে চা-পায়ীদিগকে tea-totaler বলে। চা পান করিয়া যাঁহারা মদ্যপানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাঁহারাই এই উপাধিতে ভূষিত। বাস্তবিক, চাও কি মদ্যপানের সমতুল্য?

"স্বাস্থ্য" চায়ের যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! বহুদর্শী বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক চায়ের অপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন বিষাক্ত অপকারী জিনিস,বহুল এবং বাহুল্য রূপে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকিলে, এই দরিদ্র উষ্ণপ্রধান দেশ রক্ষার উপায় কোথায়? কি সর্ব্বনাশের সংবাদ!!

আমরা চা-পায়ী বহু বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়াছি। অনেক বন্ধুই ইহার অপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন বন্ধু দিনের মধ্যে ৪।৫ বার চা পান করিয়া থাকেন। ইহা না হইলেই নয়। তিনি বলেন—"আমি চা পান করি বলিয়া ইহার অপকারিতা বলিতে কুণ্ঠিত নই। ইহা এক প্রকার নেশা বই আর কিছুই নয়।" আরো বহু বন্ধু এইরূপ কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। আমরা কখনও চা পান করি নাই। তবে বহু ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিয়াছি, আমাদের ন্যায় গরম দেশে চা পানে খুব অপকারের সম্ভাবনা। যাঁহারা রীতিমত চা পান করেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বীকার করেন, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই তাঁহাদের অপকার হয়। স্নায়ুকে অযথা রূপে উত্তেজিত রাখিলে, সময়ান্তরে অবসাদ আসিবেই আসিবে। চা পানের অপকারিতা একদিন না একদিন, মদ্য পানের অপকারিতার ন্যায়,সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইলে মদ্যপানও দোষের নয়। ঔষধ হিসাবে, চা পানের প্রয়োজনীয়তা থাকিলে, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষপাতী আমরা নই। সুস্থ শরীরে চা পানে যদি বিশেষ উপকার না হয়, তবে অযথা, বিলাসের জিনিসের ন্যায় ইহা ব্যবহারের আবশ্যকতা কি? দরিদ্রদেশে বৃথা খরচ বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? সকলেরই একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র। হিসাবে দেখা গিয়াছে, গড়পরতায় ভারতের অধিবাসীর বার্ষিক আয় ৩০্ টাকার অধিক নয়। নিম্নশ্রেণীর অবস্থা আরো শোচনীয়। গড়পরতায় প্রতি পরিবারের আয় ৮শিলিং*। এরূপ দরিদ্র দেশ আর কোথাও আছে কি? কিসে ভারতের দারিদ্র্য নিবারিত হইবে, প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। বিলাসের দ্রব্যাদি যাহাতে পল্লীগ্রামে স্থান না পায়, খোলাভাটীর ন্যায় যাহাতে দেশের দরিদ্র মহলের অনিষ্ট করিতে না পারে, প্রত্যেকের সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। এদেশের দরিদ্র শ্রেণীকে রক্ষা করিতে হইলে কেবল উপদেশে হইবে না, দৃষ্টান্তের একান্ত প্রয়োজন। সংযমরূপ মহা সাধনা অবলম্বনে, প্রত্যেক হিতৈষীকে, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাকে শ্মশানে ভস্ম করিয়া, তদুপরি মহাযোগীর ন্যায় এদেশে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমার কু-অভ্যাসে যদি ছেলেমেয়ের সর্ব্বনাশ হয়, তবে সে কু-অভ্যাস কি পরিত্যাগ করা উচিত নয়? আমার কু-দৃষ্টান্তে যদি এদেশের দরিদ্র শ্রেণীর সর্ব্বনাশ হয়, তবে তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য নয় কি? হায়, যে দেশের কোটী কোটী লোক দুবেলা দুমুষ্টি অন্ন পায় না,—কোটী কোটী লোক শীত ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, বৃষ্টি ও উত্তাপ নিবারণের গৃহ পায় না, সে দেশে বিলাসের দ্রব্য, মদ্য, চা, যাহা না হইলে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, যাহাতে প্রচলিত না হয়,তাহা করা কি সকল সহৃদয়

* John Bright said in 1879 :—'The people of India are poor to an extremity of poverty of which the poorest class in this country, has no coception, and to which it affords to parallel.' Thirty years ago, Lord Lawrence said: 'India is on the whole a very poor country, the mass of the population enjoying only a scanty subsistence.' The late Agricultural Reporter to the Government of Madras, Mr. Robertson, says of the Indian peasant in general: 'In the best seasons, the gross income of himself and his family does not exceed 3d. per day throughout the year, and in a bad season their cicumstances are most deplorable.' Less than 8s. for a whole family for a month! An English day labourer or a factory operative would earn more than that in a week, working for a much shorter time. And when we remember that, however cheap living may be in India, if can not be managed under the most favourable circumstances at less than Rs. 2-8 a month per head: and that an average Indian family consists of 5.4. persons, as revealed in the last census, it is really a puzzle to understand how they can make the two ends meet.. But alas! the two ends never meet, for even in the best of times, according to the most reliable of authorities, 40,000,000, people always remain on the actual verge of starvation!" "The Poverty Problem in India, p. 157 & 158.

লোকের একান্ত কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু হায়, নিজের আশু সুখ পরিত্যাগ করিয়া সে কথা কে ভাবিবে!!

এদেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহেন না;—দেশের উন্নতি, দরিদ্র-রক্ষা, এ সকল কথা তাঁহাদের নিকট বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আজ কাল এক শ্রেণীর সহৃদয় ব্যক্তি জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, জাতীয় একতা ও উন্নতিসাধন, দরিদ্ররক্ষা প্রভৃতি কাজে কতক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন, আমরা করযোড়ে আজ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত। লর্ড কর্জ্জনের ইঙ্গিত মত যাহাতে এদেশে চা পান বিস্তৃত হইতে না পারে, সকলেরই সে জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আমরা আর কিছু যদি করিতে না পারি, নিজেরা চা পান না করিয়া দৃষ্টান্তও ত দেখাইতে পারি। আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালীকে অনুকরণ করিবার জন্য এ দেশের সকল লোক প্রস্তুত। বাঙ্গালীর চরিত্র যাহাতে উন্নত হয়, ব্যবহার যাহাতে সংযত হয়, আচার যাহাতে ধর্ম্মানুগত হয়, প্রত্যেক সহৃদয় বাঙ্গালীর তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনুকরণের স্রোতে মদ্যপান, চা-পান, বিষ পানের ন্যায় এদেশে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, আমাদের বিশ্বাস। বিধাতা এদেশকে অশেষ অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

স্বপ্নে কমলাকান্ত।

যৌবন চলিয়া গিয়াছে, এবং যৌবনসুলভ প্রগাঢ় নিদ্রা আর নাই। বহু দিনের পর গত রাত্রে একটুখানি বেশী ঘুম হইয়াছিল। সেই নিদ্রায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকদিগের নিকট কৌতুকপ্রদ হইতে পারে।

মনে হইল যেন আমি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উড়িতেছি। একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু সে বৃষ্টিধারা আমার সূক্ষ্মশরীরে লাগিতেছে না। শরীরে মেঘ-সংস্পর্শ হইতেছে, অথচ স্পর্শানুভূতি নাই। কিন্তু পবন-সঞ্চালিত মেঘের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাসিয়া যাইতেছি, ও ভাসিয়া ভাসিয়া অথবা উড়িয়া উড়িয়া বহুদূর চলিয়া গেলাম। তখন সহসা একখানি নানা বর্ণ চিত্রিত অপার্থিব আলোকচ্ছুরিত মেঘ-মণ্ডলে একজন্ জ্যোতির্ম্ময় দেহবিশিষ্ট পুরুষকে উপবিষ্ট দেখিলাম। মেঘমণ্ডল, অথবা মেঘমণ্ডলস্থিত পুরুষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতেছেন মনে হইল। আমারও কৌতুহল বাড়িল, আমিও দিব্য পুরুষের পথানুসরণ করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। অল্পসময়ের মধ্যেই আমরা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-পূত প্রয়াগতীর্থে উপনীত হইলাম। মাটিতে পা পড়িল, একটু সাহস বাড়িল। অগ্রসর হইয়া দিব্যদেহধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর করিলেন "আমি কমলাকান্ত

চক্রবর্ত্তী" আমি ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবার কোন কথা না কহিয়া অঙ্গুলি সংকেত করিয়া, নদী সৈকতে একটী লোককে দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, লোকটী বঙ্গবাসী, নদী-সৈকতে বসিয়া শুষ্ক বালুকা লইয়া পিণ্ড চটকাইতেছেন। কমলাকান্ত বলিলেন, দেখিতে পাইলে ঐ ব্যক্তি নিতান্ত অনধিকারে আমার পিণ্ড চটকাইতেছে, আমি এই পিণ্ড প্রাপ্তির ভয়ে আজন্ম বিবাহশূন্য ছিলাম; তবুও আমার দুর্ভাগ্য ঘুচিল না। আমি বলিলাম, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, একালের সাহিত্য-ব্যবসায়ীদিগের আপনি পিতৃস্থানীয়। সরস ও সুস্বাদু পদার্থের অভাবে বালির পিণ্ডও শাস্ত্রসম্মত, তবে এই কাণ্ডটা অস্থানে না হইয়া দু পা অগ্রসর হইয়া, গয়াক্ষেত্রে গিয়া ইহার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হইত। কথাটা কমলাকান্ত শর্ম্মার মনোমত হইল না; তিনি ইংরাজী ভাষায় বলিলেন (রাগ হইলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় চিরকাল ইংরাজীতে কথা কহিতেন), This fellow is counterfeiting Apollo's coin। জিজ্ঞাসা করিলাম, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সে কি? কমলাকান্ত বলিলেন যে, ইনিই utilityর বিশদার্থকারী এবং এখন M. A., পাশ করিয়া বিদ্যার বঁগস গলায় পরিয়াছেন; ইনিই আমার জীবদ্দশায় জীমূতনাদ বধ লিখিয়াছিলেন; এখন ব্রহ্মাণ্ডনার বিড়ম্বনা করিতেছেন। যাহা করিতে হয় করুন; আমরা এই পরলোকবাস টুকু ক্লেশকর করিয়া না তুলিলেই হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পিণ্ডদাতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই কাণে তুলিলেন না; কেবল বিকট ভাবে মুখব্যাদান করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তিনি হাসিতেছেন। এমন অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কমলাকান্ত শর্ম্মাও নিরুপায় হইয়া পুনর্ব্বার বিষণ্ণ মনে আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন। আমি এখনো বুঝিতে পারিতেছি না, এ সত্য ঘটনা না সপ্নদর্শন?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ।(২২)

বিগত সংখ্যায় মায়া বা প্রকৃতির যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুদ্ধিমান পাঠক শঙ্করের প্রবর্ত্তিত মায়াবাদটী কিরূপ বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিলেও, আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায়, সেই তত্ত্বের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাঃ প্রাউট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গ বলেন যে, যাহাকে আমরা পরমাণু (দৃশ্য) বলিয়া থাকি, সে গুলি বাস্তবিক পক্ষে, অন্য কোন অল্পসংখ্যক মূল সূক্ষ্মতম অণুর পরস্পর সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। আদিতে এইরূপ অণুর সংখ্যা অল্প-পরিমাণ থাকিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা;

সেই গুলিই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এই দৃশ্যমান অনন্ত পরমাণুর উৎপাদন করিয়াছে। এখন যে পরিমাণে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, যদি তদপেক্ষাও অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা সম্ভব হইত, তবে এখনকার নির্দ্দিষ্ট এই পরমাণু গুলিকে আরও বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিতে পারা যাইত। বর্ত্তমান সময়ের নির্ণীত কতকগুলি মূল ভূতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও, এ কথার যাথার্থ্য অনুমিত হয়। Florine, Clorine, Bromine প্রভৃতি ভূত-পদার্থ গুলি যদিও পরস্পর বিভিন্ন ও পৃথক্, তথাপি ইহাদের যে জাতিগত সৌসাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের মূল যে কোনরূপ একমাত্র পদার্থ, ইহাতে আর এখন বড় একটা সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে যে একটা একটীমাত্র-জাতিগত সম্বন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও, এখন আর ইহাদিগকে কোনমতে বিশ্লেষ করিতে পারা যায় নাই। এই সমস্ত কারণে অনুমিত হয় যে, হয়ত আদিতে মূল অণু সকলের সংখ্যা খুব কমই ছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মূল অণুগুলির সংযোগ-বিয়োগ বলেই, পরিদৃশ্যমান ভূতগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এই দৃশ্য জগতের আদি অবস্থায় নানাবিধ অত্যল্প সংখ্যক পরমাণুপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং ইহাদের মধ্যে লুকায়িত শক্তি নিহিত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ক্রমে যতই ইহারা ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল,—যতই পুঞ্জীকৃত বা সংস্থান-বিশিষ্ট হইতে লাগিল,—ততই অন্তর্নিহিত শক্তি গুলি পরিদৃশ্যমান্ তাপ ও গতিতে পরিণত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাই সৃষ্টের ব্যক্ত অবস্থা। এইরূপে গতি ও তাপ বিকীর্ণ হইতে হইতে যতই পুঞ্জগুলি শীতল হইতে আরম্ভ করিল, ততই ক্রমশঃ এই ঘূর্ণিত পরমাণুপুঞ্জ হইতে কতক কতক অংশ-সকল ইতস্ততঃ বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং তদ্দ্বারা গ্রহ উপগ্রহাদির প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। মধ্যস্থিত কেন্দ্রগত পুঞ্জটী সূর্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইল। সূর্য্যের অত্যধিক উষ্ণতার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ, ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী অণু সমূহের ক্রমশঃ ঘনীভবন-ক্রিয়া। আর একটী কারণ এই যে, এই পুঞ্জটী অতি বৃহৎ বলিয়া, ইহা শীতল হইতে বহু সময়ের আবশ্যক। এইরূপ ক্রিয়া বলেই সমস্তগ্রহ উপগ্রহাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আবার এইরূপেই ইহারা কালে চূর্ণীভূত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্য হইতে সর্ব্বদা অত্যল্প পরিমাণে তাপ ও আলোকশক্তি বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহারা আর তাহাতে ফিরিয়া যাইতেছে না। আবার, চতুর্দ্দিকস্থ ইথর নামক পদার্থের সহিত ঘর্ষণ বশতঃও, সূর্য্যাদির গতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে শক্তি-ক্ষয় হইতে থাকিলে, পরিশেষে এমন একটী সময় আসিবে, যখন সূর্য্য হইতে আর তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইতে পারিবে না। সুতরাং আমাদের পৃথিবীরও গতি ক্ষয়িত হইয়া যাইবে। তখন পৃথিবী যাইয়া সূর্য্যে পতিত হইবে এবং ইহার ক্ষয়াবশিষ্ট গতি-শক্তি তাপে পরিণত হইয়া, পৃথিবী ও সূর্য্য এক হইয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় গ্রহ উপগ্রহ ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়া অদৃশ্য বাষ্পাবস্থায় পরিণত হইয়া পড়িবে। এ সমস্ত তত্ত্ব আমরা আরো বিস্তারিত ভাবে "হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ও তাঁহার মত" নামক

প্রবন্ধের শেষাংশে বলিব ইচ্ছা রহিল। যাহা হউক, উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাই-তেছে যে, আদিমাবস্থায় অদৃশ্য অণু সমূহে যে শক্তি লুকায়িত ছিল, তাহা যতই ক্ষয়িত হইতে লাগিল,—আলোক ও তাপরূপে যতই উহারা বিকীর্ণ হইতে লাগিল,—ততই সেই শক্তি-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু গুলি পুঞ্জাকারে (Aggregation of mass) পরি-ণত হইয়া পড়িতে লাগিল। অতএব দৃশ্য-মান্ জগতের একটা নির্দ্দিষ্ট সংস্থান বা আকৃতি-দৃষ্টেই বেশ অনুমান হয় যে, ইহা একটা নির্দ্দিষ্টকালে (শক্তিক্ষয়ের প্রারম্ভে) আবির্ভূত হইয়াছে বা দৃশ্যাবস্থায় আসি-য়াছে। এবং ইহা এইরূপে একটা নির্দ্দিষ্ট-কালে ধ্বংস পাইবে। অর্থাৎ ইহা কালে সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থা ধারণ করিবে।

এইরূপে আমরা ভৌতিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলাম। এখন দৈহিক সৃষ্টি ও লয়ের সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা বলিব। দেখা যায় যে, যাহার মধ্যেই প্রাণ-ক্রিয়া বা জীবনীশক্তি আছে, তাহারই একটা নিয়ম-বদ্ধ (regular) আকার আছে। বালুকাকণা ও মনুষ্য শরীর গ্রহণ কর, পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। বালুকাকণার আকার এক একটী এক একরূপ; কোনটী ত্রিকোণ, কোনটী কিছু চেপ্টা, কোনটী বা অন্যরূপ আয়তন-বিশিষ্ট। কিন্তু মনুষ্যদেহ মাত্রই প্রায় একই প্রকা-রের সুসম্বদ্ধ আকৃতি বিশিষ্ট। যখন পৃথিবী শীতল হইয়া গিয়া, প্রাণী সমূহের বাসের উপযুক্ত হইয়া পড়িল, যখন আদিম নানা প্রকারের অণু সমূহ মিলিত হইয়া নানাবিধ পদার্থে পরিণত হইল, তখন প্রাণীবর্গেরও শরীর ব্যক্ত হইল। এক এক জাতীয় প্রাণী এক এক রূপ। জাতিগত বৈলক্ষণ্য প্রাণীতে দেখা যাইতেছে। যে কালেই ইহারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকুক, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল (অশ্ব, ব্যাঘ্র, মনুষ্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে) সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা যে স্মৃতি ও স্মৃতির যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যাদি প্রাণী অব-শ্যই অব্যক্তাবস্থা হইতে একটা নির্দ্দিষ্টকালে ব্যক্তাবস্থায় আসিয়াছে। যাহা সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল, তাহাই উপযুক্ত সময়ে স্থূলভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জড় বা জড়শক্তি হইতে আত্মা কদাপি উদ্ভূত হইতে পারে না। আত্মা পূর্ব্ব হইতেই সূক্ষ্মভাবে ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। একথা স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত Law of Con-tinuity নামক নিয়মের বাধা পড়ে। সূর্য্যাদি হইতে যে তাপ ও আলোক সর্ব্বদা বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহা অবশ্যই চতুর্দ্দিকস্থ ইথর-তরঙ্গে, উদ্ভিদে, প্রাণীতে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। এই তাপ ও আলোক শক্তি যাহারই মধ্যে সঞ্চারিত ও গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই অণুপুঞ্জের কিছু পরিবর্ত্তন ক্রিয়া সংসাধিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ আবার, মনুষ্যাদির প্রত্যেক চিন্তা-শক্তি (thought) মস্তিষ্কস্থ প্রতি অণুর পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। অতএব সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণতি স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। ব্যক্ত, স্থূল জগৎ ও তাহার পদার্থরাশি যেরূপ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম অণু ও শক্তিনিচয় হইতে ক্রিয়া ও গতি প্রভৃতি লাভ করিতেছে, তদ্রূপ এই ব্যক্ত জগতের ক্রিয়াদিও অব্যক্ত, সূক্ষ্ম জগতের উপরে সর্ব্বদা ক্রিয়া সঞ্চারিত করিতেছে। এই

সকল শক্তি দ্বারা, উহারও অন্তর্ভূক্ত শক্তি-নিচয়ের অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাই-তেছে। এইরূপে মনুষ্যদেহাদির সূক্ষ্মাবস্থা ঘটিবে কি ঘটিবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীস্থ যাব-তীয় পদার্থই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলে আসি-য়াছে এবং স্থূলাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইয়া যাইবে। পরমাণু বা শক্তি কদাপি, একান্ত ধ্বংস হয় না, উহাদের অব-স্থার পরিবর্ত্তন মাত্র হইয়া থাকে। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রলয়ে কিছুই একান্ত ধ্বংস হয় না, সূক্ষ্মাবস্থায় ঈশ্বরে লীন থাকিয়া যায় মাত্র। তিনি কি বলিতেছেন শুনুন :—

"প্রাণি কর্ম্মাণি ক্রিয়াত্বাৎ সংস্কারং জনয়ন্তি। সংস্কার বশাদেব স্বোপাদানে লীনকার্য্য সংস্কার রূপ শক্তিবলাৎ উত্তর সৃষ্টিঃ পূর্ব্ব সৃষ্টি সজাতীয়া ভবতি। অন্যথা সংস্কার-প্রলয়ে জগদ্বৈচিত্র্যস্যাকস্মিকত্বং (i. e. breach of the law of continuity) স্যাৎ। স্বোপাদানে লীন কার্য্যরূপ শক্তিস্তু বীজে মহানুস্তত্রোধস্তিষ্ঠতীতি সিদ্ধঃ। ইদমেব ব্যাকৃতং নামরূপ বিভিন্নং জগৎ প্রলয়াবস্থায়াং পরিত্যক্ত ব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্ত শব্দ-যোগ্যং ভবতি, তদাত্মনা শরীরানামপি অব্যক্ত শব্দার্হত্বং"।

পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিকল বিজ্ঞান-সম্মত কিনা।

যাহা হউক, এই জগতের ও জাগতিক পদার্থের সূক্ষ্মাবস্থায় শক্তিরূপে যে পরিণতি, তাহারই নাম যে শঙ্করের "মায়া" তাহা বুঝিতে পারিলাম। এই মায়া যে সত্য পদার্থ ও পরমেশ্বরের নিত্য-শক্তি, তাহাও আমরা ক্রমে শঙ্করোক্তি হইতে প্রমাণ করিব। কিন্তু তাহা প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে শঙ্কর-কথিত "ঈশ্বর-সংকল্প" কি এবং ঈশ্ব-রের সংকল্পই যে প্রকৃতি বা মায়ার ব্যক্তা-বস্থার কারণ, তাহাও বিজ্ঞান-সম্মত কিনা, আমরা তাহাই দেখাইব। এবং প্রকৃতির পরিণতি-ক্রিয়াতে এই ঈশ্বর-সংকল্প করাতে, বেদান্তদর্শন যে সাংখ্যদর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিয়াছে, আমরা তাহারও আভাষ প্রদান করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শ্রাবণে—শূন্য মন্দির।

দেখিতে যাদেরি সাধ নাহি দেয় দেখা
আমি বড় একা আজ আমি বড় একা !!

শঙন গগনে ঘেরা নীরদ-কাজল,
শিখীদেব করিয়াছে বড়ই চঞ্চল,
পড়েছে মেঘের ছায়া তমালে বকুলে,
বসে আছি আনমনে মেঘদূত খুলে,
কেতকী কদম্বে ঢালে পবনে সুবাস,
মরম ঢালিয়া দেয় নিবিড় নিশ্বাস।
নবতৃণে শ্যাম শোভা উঠেছে জাগিয়া,
'বউ কোথা'? পাখী কাঁদে থাকিয়া থাকিয়া
অশরীরী পাখী ওটি, অশরীরী পাখী,
নীরবে মরম মাঝে, ডাকে থাকি থাকি,
শব্দ নাই রাব নাই, নাহিক কূজন
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে জাগে মৃদুল কম্পন,
গরজি বিরহ সিন্ধু উঠে আস্ফালিয়া,
অশ্রুসিক্ত চক্ষু আসে সুধীরে মুদিয়া।

নহে শ্যামা, বিগলিত কাঞ্চন বরণা
নহে সেই সহচরী শিখরি-দশনা,

নয়ন ঘোষে না তার হরিণী প্রেক্ষণ,
কেশরী জিনিয়া নহে ক'টির গঠন,
রূপের বৈচিত্র্য যাহা হৃদয় তাহার
ভিতরের শোভা করে বাহিরে বিস্তার,
প্রেমদীপ্ত ব্যথাতুর যুগল নয়ন
সমভাবে হাসি অশ্রু করে বরিষণ।

সেই মম প্রেমকুঞ্জ, যৌবন-বরষা,
লাবণ্য শীকরে তারে করিছে সরসা
"ইন্দুরেখা" "তরলিকা" দুটি চন্দ্র কলি,
পুষ্পরূপা অলি কণ্ঠে করিছে কাকলি,
(তাদের) সুধামাখা আধ ভাষা দৈবতে জাগায়,
(তাদের) সুবাসে চামেলি-চম্পা গৌরব হারায়,
কাছে তারা নাহি বলে হৃদয় গুহায়
হর্ষ গুচ্ছ মগ্ন, আছে গভীর নিদ্রায়।

চারি ধারে বিরহেরা করিতেছে খেলা,
বাহিরে বিষাদ ঘেরা নীরদের মেলা,
মন্দ্র ধ্বনি, মন্দাক্রান্তা, করি আলাপন,
প্রতিধ্বনি প্রাণ মাঝে করিছে সৃজন,
নিভৃতে মানসী বসি আপনার মনে,
তুলিছে নূতন করি শত পুরাতনে।

বাদলের রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি তান,
বাহিরে ভিতরে করে বিষাদের গান,
নিসর্গে বিজলি ছোটে, নয়ন সকাশে,
নয়নের অভিরাম বিজলি না হাসে;
দিনের বেড়েছে কায়, দীর্ঘতর তনু—
বিতত বিস্তৃত ম্লান বিভাবরী জনু—
আপনি আপন কাছে ছেড়ে চলে যাই,
উদ্দেশ্য বিহীন পদে হেথা হোথা ধাই।

এই আছি আপনার নিভৃত কুটীরে,
নিমিষে গিয়াছি চলে শিপ্রা নদী তীরে,
অবন্তী শিংশপা বনে 'উদয়'ন কথা,
কার মুখে শুনে যেন উপজিছে ব্যথা,
প্রাণ মাঝে ভেসে আসে পরের বেদনা,
নিজে কেঁদে, পরে বলি কেঁদনা কেঁদনা।
মেঘ কণ্ঠে দুন্দুভির হতেছে নিনাদ,
বিরহ বর্ষিছে ধীরে নীরব বিষাদ।

শ্রীবেণোয়ারী লাল গোস্বামী।

সাগরে।

(১)
নেহারি গগনে বিধু
সাগরে আবেগ উঠে।
কূল উপকূল ভাসি
উধাও তরঙ্গ ছুটে॥

(২)
উদার, গম্ভীর, সুধী,
জলধি চঞ্চল মতি।
বুঝিয়া বুঝেনা কেন,
বঁধুয়া সুদূর অতি॥

(৩)
আলোড়ি বিশাল বক্ষঃ
গরজে কাতর প্রাণ,
নিশ্বাসে তুফান বহে,
আঁখি জলে ডাকে বান॥

(৪)
ধরি ধরি করি বঁধু,
উছলি পড়িয়া যায়।
আবেশে অধর কাঁপে,
দুর দুর হিয়া, হায়!

(৫)
মোহন মুরতি ছায়া
বুকে ধরি বঁধুয়ার,
এক চাঁদে শত চাঁদ
চুমে সিন্ধু বার বার।

(৬)

পরাণের মধু টানে
দূরে দূরে এক হয়।
পাঁজরের হাড় খুলি
কলিজা মিশিয়া যায়॥

শ্রীরসিকলাল রায়।

চিতা পার্শ্বে।

তুমি আর আমি!
তুমি ডেকেছিলে তাই এসেছি হেথায়;—
আকাশ মেঘেতে ভরা,
লুকায়েছে কোটী তারা,—
স্বপনের মাঝে ধরা সব স্বপ্নময়!
তুমি আর আমি সত্য,
তাই হেথা আসি নিত্য,
তাইত দাঁড়ায়ে থাকি তব প্রতীক্ষায়;—
তাইত জোছনা রাতে,
শুনি যদি দূর হ'তে
সঙ্গীত মধুর;
মনে পড়ে কত গান,
[illegible]নয়ান—
পুরাতন সুর!
আমি ধন্য, তব গান,
হে সুন্দর, অবিরাম,
গাহি সঙ্গোপনে!
আধেক স্বপন ঘোরে,
ধরি যবে তব করে,
তুমিত তুলিয়া লও আপনার প্রাণে!
স্বপ্ন যবে হয় ছিন্ন,
তুমি আমি হই ভিন্ন,—
গান আর নাহি পড়ে মনে!
এস মোর সুমোহন,
ভাঙ্গ ভ্রান্তি; আকিঞ্চন,
তব পূর্ণ স্মৃতি;
হে হৃদয়-স্বামী!
হেথায় নাহিক অন্ত,—
ঊরধে অনন্ত শূন্য,—
আঁধার রাতি!
তুমি আর আমি!
তুমি আর আমি সত্য,
তাই হেথা আসি নিত্য,
তাইত দাঁড়ায়ে থাকি তব প্রতীক্ষায়;
তুমি ডেকেছিলে তাই এসেছি হেথায়। (১)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিরহে বঙ্গকবি।

চিরকাল বঙ্গ কবিগণ
ভালবাসে বিরহের সুর,
তাঁহাদের মধুময় বীণা
সেইগানে সদা ভরপুর।
শৈশব হইতে তারা সদা
শুনিতেছে বাঁশরীর স্বরে—
বিরহ-বিষাদময়ি গাথা
গোকুলের প্রতি ঘরে ঘরে।
কালীন্দির কল কল গানে
শুনে তারা বিরহের গীত।
পাপিয়া কোকিল কণ্ঠে শুনে—
বিরহের ভৈরব ললিত।
কদম্ব তমাল তরুশাখে
শোকতপ্ত শারীকার মুখে—
শুনিয়া বিরহময়ী গাথা,
মুদ্রিত হইয়া গেছে বুকে।
কাঁপিলে ললিত লতাবধূ,
হেরে তারা অশ্রুজলে ভাসি,

(১) আমার প্রিয়তম বন্ধুর চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে।

অই বুঝি বিরহ-বিধুরা,
"রত্নাবলী" রচে লতা ফাঁসী।
সানুমান শৈল দেহে দেহে
হেরে তারা জমাট বিরহ।
তাহাদের "সিন্ধু" "সিপ্রা" ঢালে
বিরহের ধারা অহরহ।
হেরিয়া নবীন মেঘমালা,
ভাবে তারা কম্পিত অন্তর—
অই বুঝি বিরহী যক্ষের
বার্ত্তাবাহী কম্পিত কুঞ্জর।
নদ, নদী, তরু, লতিকার,
বনচর বিহঙ্গের গীতে,
তারা যদি নিশি দিন পায়
বিরহের সঙ্গীত শুনিতে—
তবে বল তাহাদের বাঁধা
চির-সিদ্ধ বীণা সপ্তস্বরা
বিরহ সঙ্গীত গানে, কেন
হইবে না, অধিক মুখরা ?
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

"হৃদয়-তন্ত্রী"

হৃদয়ের তন্ত্রী মাঝে
কি সুরে যে বীণা বাজে
আমিই বুঝিনা তাহা বুঝাব কাহারে ?
আশা, নিরাশায় প্রাণ
টুটে হয় শত খান
তবু কেহ স্নেহ পাশে বাঁধে না আমারে।
আমি কি গো আজীবন
অশ্রু জলে সমাপন
করিব জীবন ব্রত বৃথাই কাঁদিয়া ?
কেহ আসিবেনা হেসে
বাঁধিবেনা স্নেহ-পাশে
ঝটিকা-বিচ্ছিন্ন লতা ভূমিতে লুটিয়া ?
অই যে মেঘের কোলে
আমার ভরসা দোলে,
ওই যে তটিনী মাঝে আমার গৌরব—
বৃথাই এসেছি ভবে
যাতনা গেলনা তবে,
নিদয় রবির করে শুকাল সৌরভ !
না, না, আমি শুধু একা নই—
কত বোন কত ভাই
সমস্ত জগৎ মাঝে রয়েছে আমার,
তাহাদেরি বুকে টেনে
চাহিয়া ভবিষ্য পানে
কাটাতে কি পারিব না জীবন আমার ?
আর, কিছুইত চির তরে
আসে নাই ধরা' পরে
দুদিনের তরে এ ত চির দিন নয়,
দুদিন হাসিয়া সুখে
দুদিন কাঁদিয়া দুখে
মানবের জীবলীলা সবি শেষ হয় !
তবু হৃদয়ের দ্বারে
আঘাতিলে বারে বারে
বাহিরায় যবে শোক বিচ্ছিন্ন ঝঙ্কারে,
তখনি মানব প্রাণ
টুটে হয় শত খান,
আপনি সে বোঝে না তা বুঝাবে কাহারে ?
শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ;—

(১) সাহিত্য-মন্দিরে তৎস্থানের অনুপযোগী কোন পদার্থ প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত সাহিত্য-সেবীদিগকে সতর্ক করা।

(২) তদ্রূপ কোন পদার্থ কোন কারণে

প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে, তাহা সেই মন্দিরের পবিত্র সীমা হইতে বহিষ্কৃত যাহাতে হয়, তদভিপ্রায়ে, সাহিত্য-সেবীদিগের দৃষ্টি সেই অপকৃষ্ট পদার্থে আকর্ষণ করা।

(৩) সাহিত্য-সেবী কোন ব্যক্তি তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ দোষে দূষিত করিয়া থাকিলে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত করা, এবং তাঁহাকে তদ্রূপ ভ্রম সংশোধন করিতে সুবিধা দেওয়া।

উল্লিখিত তিনটী অভিপ্রায়ের কোনটীই কোন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দ্বারা বিশদ রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। অথচ মাসিক পত্রে প্রত্যেক গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনাও সম্ভবপর নয়, সুতরাং, অনেক সময়েই, প্রাপ্ত গ্রন্থ মোটের উপর ভাল কি মন্দ, তাহা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়। এবারও আমরা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইলাম না, আশা করি, গ্রন্থকারগণ ও পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

১। বিজয়-গীতিকা।— বর্দ্ধমানেশ্বর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহাতাব্ বাহাদুর রচিত। যিনি বঙ্গদেশে লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্রদিগের অগ্রণী, তাঁহাকে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া বড়ই আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইল। মহারাজা তরুণ বয়স্ক; এখনও বিংশ বর্ষ পরিপূর্ণ হয় নাই—কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার কবিত্ব এবং কাব্যানুরাগের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে আশা হয় যে, ভবিষ্যতে ইনি প্রভূত কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। কাব্যের বিষয় গুলি যেমন সুনির্ব্বাচিত, রুচি যে প্রকার পরিমার্জ্জিত, ভাবও তেমনি মনোজ্ঞ। আজি কালি চারিদিকে দেখিতে পাই যে, কবিতা লিখিতে গিয়া অনেক নবীন কাব্য-যশঃপ্রার্থী কেবল প্রেমের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই অননুভূত প্রেমরসের ব্যাখ্যা, কতকগুলি হা হুতাশের বৃথা কথার সমাবেশেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু বিজয়-গীতিকায় কুত্রাপি এ প্রকার অসারতা নাই; কুত্রাপি বৃথা অনুকরণের অসৌন্দর্য্য নাই, এবং কুত্রাপি অননুভূত বিষয়ের কষ্ট কল্পনা নাই। কবিতার উৎসর্গ, কবির স্নেহময়ী জননীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। তাই এই উৎসর্গ পত্র পড়িয়াও তৃপ্তি লাভ করা গেল। ভাষা এবং ভাব কেমন সুন্দর, তাহা "প্রার্থনা" কবিতাটীর দুইটি ছত্র তুলিয়া দেখাইতেছি:—

চেতনে স্বপনে, নয়নে কি মনে,
দেখিতে না পাই তোমারে,
আছ হৃদি মাঝে, তথাপি না বুঝে
ভাসিছে অকূল পাথারে।

পূর্ব্বেই কবির পরিমার্জ্জিত রুচির কথা বলিয়াছি। সুরুচি সুশিক্ষার ফল। আমরা অনেক স্থলে এই সুশিক্ষার পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। বৃথা অনুকরণ-পরায়ণতায় দেশ যে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে, এই তরুণ বয়সেই কবি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এদেশে আজি কালি অনেকেই দুটী পয়সা রোজগার হইলেই, অপমান সঞ্চয়ের জন্য, স্বদেশীয় সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হয়েন। এরূপ স্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার ভাণ্ডারে, এবং যিনি স্বদেশীয় বিদেশীয় সকলের আদর এবং সম্মানে গৌরবান্বিত, তাঁহার মুখে এ কয়েকটী কথা বড় মিষ্ট লাগিল:—

অতলে ডুবায়ে নিজে, পরের সজ্জায় সেজে
আপন প্রকৃতি ত্যজে, কোন সুখ এরা চায়।
যে ঘৃণা করে তোমারে, তার সহ মিশিবারে
মন চায় কি প্রকারে বুঝিতে পারিনা হায়।

কবি "সত্য"কে উদ্দেশ করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা গীতিকার শেষ গান। এই শেষ গীতির শেষ ছত্রটী এই:—

যেন অনুক্ষণ তব প্রতি মন রত রাখি,
লোভে না টলে কখন—
ভোলেনা বিজয় অক্ষয় রতন, হে সত্য,
অনিত্য ভোগ প্রলোভনে।

আশীর্ব্বাদ করি, যিনি সত্যের আধার, তিনি নবীন কবির এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

২। মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ।— শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং নানাবিধ ধর্ম্ম, যোগ ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাদি সম্বলিত শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; তৃতীয় সংস্করণ; মূল্য ৷৷৹ দেড় টাকা। ইলিশিয়ম প্রেস। এই গ্রন্থখানি নূতন নহে; এরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের বিশেষ আদরের জিনিস, এবং আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, গ্রন্থকারের পরিশ্রম একবারে নিষ্ফল হয় নাই; কিন্তু ১০ বৎসর হইল গ্রন্থখানি প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; আমাদিগের দেশীয় গ্রন্থ প্রতি সংস্করণে যেরূপ অল্প সংখ্যক মুদ্রিত হয়, তাহাতে, এই কালের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণাপেক্ষা অধিকতর সংস্করণ হয় নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। জাতীয় সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে আর্য্য ঋষিগণ কত যে অমূল্য রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ এবং দিবারাত্রি অন্নচিন্তায় অস্থিরপ্রাণ লোকের পক্ষে অনুসন্ধান করিয়া জানা, তত সহজ ব্যাপার নহে; সেই বহু মূল্য রত্নের অনেকগুলি রত্ন একত্র সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমরা একমতাবলম্বী নহি। তাই বলিয়া এই গ্রন্থখানিকে আমরা নিন্দনীয় বলিতে পারি না। যে মহাসত্যের মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতভেদ অপরিহার্য্য। যত দিন মানব সমাজ থাকিবে, মানব চিন্তার স্বাধীনতা থাকিবে, তত দিন গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ে বিভিন্ন মতের প্রচার দেখিতে পাইব। এরূপ স্বাধীন মত হৃদয়ে পোষণ এবং তাহা প্রচার করার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু কোন প্রচারক যদি বিভিন্নার্থবোধক শাস্ত্রবাক্যের একই অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া নিজাবলম্বিত মতের সমর্থন করেন, তাহাতে নির্ব্বাক থাকা যাইতে পারে না; গ্রন্থকার মহোদয়ের গ্রন্থ আমরা এই দোষশূন্য দেখিতে পাইলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহার একটী দৃষ্টান্ত:—

"দ্বেপদে বন্ধ মোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমতে বধ্যতে জন্তু নির্মমেতি বিমুচ্যতে॥

এই বাক্যের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ প্রচারিত হইয়াছে:—

"মম অর্থাৎ 'আমি আমার' এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ। এবং নির্মম অর্থাৎ 'আমি আমার' এতদ্রূপ জ্ঞান রহিত হইলে অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপ পরমেশ্বরের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হয়।"

সর্ব্বশেষের 'অর্থাৎ' শব্দের পরিবর্ত্তী ব্যাখ্যা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। জীব এবং শিব এক, এই জ্ঞান না জন্মিলে আমিত্বের বিলোপ হয়

না। পক্ষান্তরে, আমি ভগবানের, এই জ্ঞানের মধ্যে আমার আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে। উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্যে জীবে শিবে অভিন্ন জ্ঞানকে মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে জীব এবং শিব স্বতন্ত্র এবং এক আশ্রিত অপর আশ্রয়, এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে।

গ্রন্থকর্ত্তা, মানব জ্ঞানের চিরালোচ্য দুরধিগম্য বিষয়ের আলোচনা কালে, নিজাবলম্বিত মতকে যে কোন প্রকার তর্ক যুক্তি দ্বারা স্থাপন করিতে পারেন, তাহাতে কাহারো কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু মুক্তিতত্ত্ব যাঁহার গ্রন্থের আলোচ্য, এবং যিনি মুক্তির সাধন সম্বন্ধে উপদেষ্টা, তাঁহার লেখনী হইতে পূজ্যপাদ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ভাষা নিঃসৃত না হইলেই সুখের বিষয় হইত।

" * * *

কারণ, জ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ও জড় জগৎরূপে স্বয়ং পরিণত হইলেন, একথা আদৌ গ্রাহ্য নহে। যদিও পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বিরহে আমাদের আত্মা জড় মাত্র এবং তিনিই আমাদিগের আত্মার আত্মা বা মুখ্য আত্মাস্বরূপ হন, তথাচ আমরা যে সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, ইচ্ছা করিয়া অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া সংসার তাপে তাপিত হইতেছি *

* * *

একথা উন্মাদ না হইলে গ্রাহ্য করা যায় না।"

গ্রন্থকর্ত্তার মত সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহিনা, তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, এই মতের এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য আছে কিনা, সে বিষয় আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্তার বহু গবেষণা এবং চিন্তার ফল, ধর্ম্মসাধনার্থী তত্ত্বান্বেষী পাঠক মাত্রেরই নিকট বিশেষ আদরণীয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

৩। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীকৃত সঙ্কট মোচন।—বিতরণার্থে চতুর্থ সংস্করণ। বসু প্রেস। বর্ত্তমান সময়ে জগতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং কলহ প্রভৃতি জনিত দুঃখের কারণ কি, এবং তাহা দূর করিবারই বা উপায় কি? এই বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে, পুস্তিকাকারে পরমহংস মহাশয় তাঁহার নিজের মত নানা বিষয়ে লিখিয়াছেন; উপসংহারে তাঁহার মতে বেদবিহিত অনুষ্ঠানই জগতের একমাত্র উল্লিখিত কষ্টাদি নিবারণের উপায়। এতৎ সম্বন্ধে সমালোচনা করা অনাবশ্যক।

৪। ঈশার অনুকরণ। প্রথম দুই পরিচ্ছেদ—ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনুবাদিত। মূল্য ছয় আনা। মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেস। সুবিখ্যাত Immitation of Christ, নামক গ্রন্থের অনুবাদ হইতে অনুবাদিত। ভাষা এবং অনুবাদ উভয়ই অতি সুন্দর হইয়াছে; মূল গ্রন্থখানি সাহিত্য-জগতের অমূল্যরত্ন, অনুবাদকর্ত্তা বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে সেই রত্নের কতকাংশ উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করি। গ্রন্থখানি পূর্ণ কলেবর হইলে আমরা আরোও সুখী হইব।

৫। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী।—শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ।

জয়ন্তী প্রেস। মূল্য ॥০ আনা। কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺ তর্কবাগীশ মহোদয় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সাহিত্য-সেবীদলের একজন অগ্রণী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি; তিনি কাব্যালঙ্কারে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার চরিত্রে প্রগল্‌ভতা বা আত্মম্ভরিতা কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। বালকের ন্যায় সরল, পুষ্পের ন্যায় পবিত্র, জ্ঞানী মহাত্মাদিগের জীবন মনুষ্য সমাজের অতি গৌরবের জিনিষ; সুতরাং এই জীবনচরিত বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের বিশেষ আদরের পদার্থ।

৬। নারীনীতি।—শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, জয়ন্তী প্রেস। যদিও হিন্দু সমাজের মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বহুবিধ নীতি গ্রন্থকর্ত্তা অতি দক্ষতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন; তথাপি যে কোন সমাজের যেকোন মহিলা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাঁহার সময় অপব্যয়িত হইবে না। প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় যে নীতি কথা সমীচীনরূপে লেখা যায়, এই গ্রন্থখানি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আলোচিত বিষয়গুলি সমস্তই গ্রন্থের উপযোগী, এবং তাহার সন্নিবেশও অতি সুন্দর। যদিও গ্রন্থকারের অনেক মতের সহিত আমাদের মতভেদ আছে, তথাপি এই গ্রন্থ বঙ্গীয় ভদ্র গৃহস্থের প্রতি গৃহে কুলকামিনীদিগের হস্তে দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব।

৭। সাহিত্য-সাধন। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১॥০, কাশিকা মেসিন যন্ত্র। "ছয়টী সাহিত্য সন্দর্ভ সংযোগে সাহিত্য-সাধনা রচিত। প্রবন্ধ কয়েকটী ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ভিক্টোরিয়া রাজত্বে বাঙ্গলা সাহিত্য, সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব, সাহিত্যের ভাগ, সংবাদপত্র ও থিয়েটার এবং মেঘদূত, এই ছয়টী সন্দর্ভে গ্রন্থের কলেবর গঠিত হইয়াছে; মেঘদূত নামক সন্দর্ভটী গ্রন্থকর্ত্তার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রক্ষিত কর্ত্তৃক লিখিত; মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের সমালোচনা। বিপিন বাবু, স্ত্রী পুরুষের কথোপকথন চ্ছলে, গল্প প্রসঙ্গে, এই সমালোচনা লিখিয়াছেন। লেখক সাহিত্য-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এই প্রবন্ধে তাহার পূর্ব্ব গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অপর কয়েকটী সন্দর্ভে গ্রন্থকর্ত্তার প্রাণের উচ্চাদর্শ, লিপিকৌশল, গবেষণা এবং সূক্ষ্মদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাহার একটী দৃষ্টান্ত এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—কথাটা যতবার—যত রকমে—যেমন ভাবে আলোচনা করিয়াছি, মনের মধ্যে ঐ একই উত্তর পাইয়াছি—"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে।"—হিন্দুর চরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই উপদেশ দেয়, মুসলমানের কোরাণও এই শিক্ষা দেয়, আর খ্রীষ্টানের বাইবেলও এই কথা বলে। সাহিত্য বা কাব্য এই মহাভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃত সাহিত্যকার এই মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার বিশাল কাব্যচিত্রপটে, জীব ও জগৎ অঙ্কিত করেন। জগতের বুকে যে কথা লুকানো আছে, তাহা টানিয়া বাহির করেন, জীব কি, জগৎ কি, উভয়ের সম্বন্ধ কি, মানবের কর্ত্তব্য ও পরিণাম কি, ইত্যাকার এবং

আরোও অনেক প্রকার চিন্তা ও ভাব, আপন তীক্ষ্ণ অনুভবক্ষম বিশাল হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া—সেই ক্ষণজন্মা শক্তিধর পুরুষ, কাব্যে, সাহিত্যে তাহাই চিত্রিত করিয়া থাকেন।”

৮। কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক কাব্য।—কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত, শ্রীযুক্ত শ্রীবরদাকান্ত মুখোটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর পদে উৎসর্গীকৃত এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয়ের শ্রীকরকমলে উপহৃত। মূল্য ১৲। গিরিশ যন্ত্র। অভিমন্যু-বধ উপলক্ষ করিয়া এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর এবং মিত্রাক্ষর ছন্দে এই গ্রন্থখানি লিখিত। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে পাঠকমাত্রেই আশা করিয়া থাকেন, গ্রন্থকর্ত্তা কোন নূতন ভাব নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। যে গ্রন্থে এই আশা পূর্ণ হয়, তাহাই পাঠকসমাজে আদৃত হইয়া থাকে। যে গ্রন্থে ভাব অথবা সাজ সজ্জা উভয়ের মধ্যেই নূতনত্বের বিশেষ অভাব, সে গ্রন্থের আদর করা বড়ই কষ্টকর। এই গ্রন্থখানিতে আমরা ভাবের অথবা ভাব-বিকাশ-প্রণালীর কোন নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম না। গ্রন্থখানির ছাপা মলাট প্রভৃতি অতি সুন্দর।

৯। সঙ্গিনী।—শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীতা। মূল্য এক টাকা মাত্র। কুন্তলীন যন্ত্র। এই গ্রন্থে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে; এই কবিতাগুলিকে ছন্দে বন্দে লিখিত কথা বলিয়া কবিতা বলিতেছি না, ইহার প্রত্যেকটীতেই অল্পাধিক ভাবের উচ্ছ্বাস এবং বিন্যাসের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহার মধ্যে একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি :—

মৃদু মৃদু ঢেউ তুলি জীবন-তটিনী
অকম্পিত স্রোতে ব'য়ে যায়,
উহারি বালুকাতটে নিভৃত হৃদয় পটে
অতি ক্ষীণ কুশাঙ্কুর প্রায়,
কি বীজ রোপিয়াছিনু, হায়।

জানি না কি মহাক্ষণে হ'ল অঙ্কুরিত
সৌরভে আকুল করি প্রাণ;
তিল তিল করি ধীরে বাড়িল সোহাগ নীরে
পুলকিত মোহের বপন;
ভাল করে দেখিনি তখন!

পর্ণ কিশলয়ে যবে হ'ল বিকসিত
বসন্তের চারু উপবন,
দেখিনু সোণার গাছে মুক্তাফল ফলিয়াছে;
মানবের সাধনার ধন,
ঝলকিছে প্রণয়-রতন।

বড় তৃষ্ণা! করিব কি সুধাপান আমি,
চির প্রিয় ভোগ দেবতার?
বাসনার চিতা জ্বালি, শ্মশানে দিব কি ডালি,
করিব হেলায় ছারখার,
চির প্রিয় ভোগ দেবতার?

না, না, আমি করিব না আবিল পঙ্কিল
স্বরগের নবনী নির্ম্মল;
সাজায়ে সোণার থালে, চন্দন লেপিত মালে
আনিয়াছি শত শতদল,
ধর ধর হৃদিজাত ফল!

১০। সহর-চিত্র।—বীডন বালা। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। পত্রিকা প্রেস। শীত সুন্দরী, বিডন বালা, ফাল্গুনের হাওয়া, বঙ্গাব্দ ১৩০৮, শৈবাল বিধবা, এবং সহর বধূ ও গ্রাম্য বধূ, এই কয়েকটী কৌতুক সন্দর্ভে এই গ্রন্থের অবয়ব গঠিত।

গ্রন্থকার পরিচিত লেখক; কিন্তু কৌতুক মঞ্চে তাঁহার সহিত বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না; তথাপি তাঁহার এই সন্দর্ভ গুলি পাঠ করিয়া, আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তিনি ধারকরা কাপড় পরিয়া পরের বান্ধা গীত গাইতে আসরে আসেন নাই। তাঁহার কল্পনায় নবীনত্ব এবং চিত্রে পরিস্ফুটন আছে এবং তাঁহার কৌতুক মাখান বিদ্রূপের শরগুলিও অবহেলার পদার্থ নয়।

১১। ত্রিবেণী।—তিনটী ক্ষুদ্র উপন্যাস—শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস প্রণীত, মূল্য ।৵০। নিউ ব্রিটানিকা প্রেস। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "মৎ প্রণীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুস্তক তিন খানি এবং বর্ত্তমান ত্রিবেণী কেবল মাত্র পাঠক সংগ্রহার্থে লিখিত—অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে নহে। পাঠক পাঠিকাগণের উপযুক্ত সহানুভূতি পাইলে বারান্তরে আমি প্রকৃত উপন্যাস লইয়া দেখা দিব।" লেখকের সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক, আমরা বিশেষ সুখী হইব। কিন্তু একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সামাজিক উপন্যাসে সমাজের অবস্থানুযায়ী চিত্র অঙ্কিত না করিলে, কবির পক্ষে সেটী অমার্জ্জনীয় দোষ। প্রথম উপন্যাসের নায়িকা ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা, পিতৃ মাতৃ হীনা, মাতামহের আদরের নাতিনী এবং ধনী মাতামহের এক মাত্র ভালবাসার পদার্থ। কিন্তু, তাই বলিয়া, কোন কারণ জিজ্ঞাসু না হইয়া এক হাজার টাকা কোন মাতামহ কোন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া নাতিনীর আবদার প্রতিপালনের নিমিত্ত দেন না। তার পর আবার এইরূপ বালিকার লেখনী হইতে নিম্নলিখিতরূপ পত্রখানিও যেন অস্বাভাবিক বোধ হয়:—

"পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি অতি সাবধানে থাকিও। ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কখনও আপনার নির্ম্মল চিত্ত কলুষিত বা বৃথা ব্যয়ে অর্থ নষ্ট করিও না। তোমার মূল ধন অতি সামান্য, —চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাবে ইত্যাদি।"

এই পত্রের পূর্ব্বাংশেও এইরূপ পাকা কথা।

পরবর্ত্তী দুইটী উপন্যাস সুন্দর হইয়াছে, গ্রন্থকারের লিপি সর্ব্বত্রই অতি সুন্দর।

১২। সারিগান। ৺ শ্যামচাঁদ গুপ্ত রচিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু রসিক চন্দ্র বসু মহাশয়ের মতে, বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে সারিগানের রচনা ৺ গুপ্ত মহোদয় সর্ব্ব প্রথম করেন, একথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। মৃত ব্যক্তির লেখনী নিঃসৃত কোন কথার তীব্র সমালোচনা করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। এস্মৃতি মধুর স্মৃতি। যাহারা দেশের পুরাতন গান সংগ্রহ ও পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকট এই গ্রন্থ অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

১৩। আকবর।—(উপন্যাস) শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আনা। হেয়ার প্রেস। পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। সাধারণতঃ, উপন্যাস বালক বালিকার হস্তে দেওয়া যায় না। কিন্তু এ খানি যেরূপ ভাবে লিখিত, তাহাতে কাহারো হাতে দিতে কোন আপত্তি জন্মিতে পারে না, বিশেষতঃ গ্রন্থখানি সদুপদেশ এবং সদ্দৃষ্টান্তপূর্ণ।

১৪। জম্বুদ্বীপে জাম্বুবান। বিদ্রূপাত্মক নীতিপূর্ণ সামাজিক মহাকাব্য। মূল্য ১৲ টাকা। পুরুলিয়া অন্নপূর্ণা প্রেস। মহাকাব্য নাম শুনিয়া পাঠক অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি কবিতাপূর্ণ, ভাবরসোদ্দীপক। এই গ্রন্থে নীতিপূর্ণ উপদেশ অনেক আছে, কিন্তু কবিতা বড়ই বিরল, প্রকৃত বিদ্রূপ আমরা একটীও খুঁজিয়া পাইলাম না। অনাবৃত তীব্র তিরস্কারে গ্রন্থ পরিপূর্ণ; রাজা রাজরা পাজি পাজরা কেহ গ্রন্থকারের হাত এড়াইতে সক্ষম হন নাই। এইরূপ গালাগালি দ্বারা যে সমাজের কোন উপকার করা যায়, তাহা আমরা মনে করি না। এই গ্রন্থের লিখিত বিদ্রূপের একটী

নমুনা পাঠক মহাশয়দিগকে আমরা উপহার দিতেছি :—

কোথা ওরে ভণ্ড উকীল কলঙ্ক!
হরিনামে কেন মাখাইছ পঙ্ক?
যম ভয় হ'তে হইতে নিঃশঙ্ক?
বলনা কি লাভ এ ছেলে খেলায়?

১৫। আলোক চিত্রণ বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা।—২য় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত—দাস যন্ত্রে মুদ্রিত—৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ॥০ আনা—ছাপা পরিপাটী— ভাল বাঁধাই।

বিগত শতাব্দী, প্রথমে 'আলোক চিত্রণ' (Photography) ও তৎপরে স্বরমুদ্রণ (Phonography) এই দুই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও প্রণালী আবিষ্কার করিয়া, কালের করাল-কবলে লুক্কায়িত বিস্মৃতিকে পরাভূত করিতে যে কি পরিমাণে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সামান্য বিবেচনায় উপলব্ধি করিতে পারেন। একে অতীত চিত্রসমূহ আমাদের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত করে, অপরে সে কালের প্রিয় জনমণ্ডলীর অবিকল ভাষা ও স্বর শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকে। এই দুই পদার্থ নব পর্য্যায়—দুই-ই উন্নতির পথে ধাবমান। আমরা দুইটীকেই স্বর্গীয় নূতন বিধান জানিয়া আদর করিয়া থাকি। বিশিষ্ট রক্ষণশীল আমাদের দেশেও আলোকচিত্রের আদর আরম্ভ হইতেছে—এ বিষয়ে পুস্তকাদির প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে—ইহাও সামান্য আনন্দের বিষয় নয়। এই পুস্তকখানি আমরা সেই জন্য অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৭২ পৃষ্ঠার ভিতরে গ্রন্থকার এত জিনিষ সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞানে, তিনি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিতে ভুলিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রসঙ্গক্রমে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বাহুল্য দোষে দুষী হইয়াছেন। মাত্র একটী উদাহরণ দিই—আমাদের মতে আলোকযন্ত্রের ইতিহাসের ভিতর অতটা প্রবেশ না করিয়া, গ্রন্থকার 'Stop' বা Diaphragms সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেও বলিতে পারিতেন। এই সকল ত্রুটী না থাকিলে পুস্তকখানি শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব্বাঙ্গরূপে সুন্দর হইত। যাহা হউক, অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা ও সদুপদেশ পাইবেন, আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল হইয়াছে জানিলে, আমরা অতীব প্রীত হইব।

১৬। বঙ্গজ কায়স্থতত্ত্ব।—(ফতেয়াবাদ সমাজ) প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ ও বল্লালকৃত কুলবিধিসহ বংশাবলী। শ্রীজানকীনাথ মিত্র, উকীল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কুড়িগ্রাম, রংপুর, মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তক প্রণয়নে জানকী বাবুকে অনেক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। ফতেয়াবাদ সমাজের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুন্দররূপে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাবে ইহা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। আমরা আশা করি, ফতেয়াবাজ কায়স্থ সমাজের প্রতি ব্যক্তি এই গ্রন্থের এক একখানি ক্রয় করিবেন। মূল্য অতি সুলভ—মাত্র ॥০ আনা। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কাহাকেও অর্থ অপব্যয় হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না।

১৭। শব্দার্থ মঞ্জরী।—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি সঙ্কলিত, এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট। প্রচলিত, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রায় সকল শব্দেরই সংক্ষিপ্ত ও অর্থ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার। বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

ভিক্টোরিয়া হল।

লর্ড কর্জ্জন ও তাঁহার সমালোচকগণ

ভিক্টোরিয়া হলের বিষয় বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া হল সম্বন্ধে বিতণ্ডারই ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বিতণ্ডা যেমন বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তেমনি অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার এখন আর প্রায় কিছুই নাই। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে যে, তাহার মূলে যুক্তি-হীন ও জীবন-বিহীন বচনের বোঝা বই আর বড় বেশী কিছু ছিল না।

ভিক্টোরিয়া হলের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ বিতণ্ডা বিলুপ্ত হইয়া, ভিক্টোরিয়া হলই বিজয় লাভ করিয়াছে। তথাচ, সে বিতণ্ডার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ইতিবৃত্ত আছে। এবং "অ্যানটেশিডেণ্টও" আছে। অতএব তাহার শরীরী মূর্ত্তি যায় 'অ্যানটেসিডেণ্ট' একত্রে অঙ্কিত, নির্ম্মিত বা খোদিত করিয়া এবং "সম্পাদকীয় আন্দোলন" আখ্যা দিয়া ভাবী ভিক্টোরিয়া হলের ঐতিহাসিক কক্ষে স্থাপন করা সমসাময়িক সংবাদ-পত্রের ইতিহাসের সবিশেষ সুপরিচায়কই হইবে, যদি হাস্য-রসোদ্দীপক সামগ্রীর সংস্থাপন দ্বারা, সেই সুমহান স্মারক গৃহের গাম্ভীর্য্যের হানি করা অবিধেয় বলিয়া নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ না হয়। কিন্তু, কাল-স্রোতে, কোন কোনও সময়ের ও কোন কোনও সামগ্রীর ইতিবৃত্ত 'সঙ'এরই দ্বারা সজীব ভাবে সূচিত হওয়া সম্ভব, ইহা সকলেই জানেন।

ভিক্টোরিয়া হল এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভাবী অনুষ্ঠান। সে ব্যপদেশে বাদানুবাদ ও প্রতিবাদ অব্যবহিত অতীতের বিচিত্র ইতিহাস। আমরা অতীতকেই ও অনুষ্ঠিতকেই অগ্রে আসন দিতেছি। অতএব 'বস্তু' কি রূপ বলিবার পূর্ব্বে, সে বস্তু লইয়া বচসা কিরূপ, বলিতে যাওয়াতে, খামাখা "ক্ষমা প্রার্থনা"র প্রয়োজন হইতেছে না।

সমগ্র ভারতবর্ষের সমবেত ভারতবাসীর পক্ষ হইতে সংস্থাপনীয়, অতীত ভারতেশ্বরীর স্মৃতিমন্দির কিরূপ হইলে ভাল হইবে এবং কিরূপ হইলে ভাল হইবে না?—কিরূপ হইলে স্মারক স্মরণীয়ের স্মৃতির উপযোগী এবং স্মারক সংস্থাপক সংমিলিত ও সংযুক্ত জাতির জাতীয় কীর্ত্তির উপযুক্ত হইবে, শোভনীয়, শিক্ষা-প্রদ, প্রকৃত স্মৃতি-উদ্দীপক হইবে, সারগর্ভ, চিরস্থায়ী এবং সর্ব্ব সাধারণের উপভোগ্য হইবে, সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজধানীর স্বরূপ ও রাজকীয় ভাবের জ্ঞাপক হইবে, একাধারে সুন্দর ও কার্য্যকর হইবে; পরন্তু, কিরূপ হইলে, তাহা হইবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর, দুই পক্ষ হইতে, উপস্থিত হইয়াছে। এক পক্ষ লর্ড কর্জ্জন, এবং অপর পক্ষ, লর্ড কর্জ্জনের সমালোচকগণ। এই সমালোচকগণ আর বড় বেশী কেহ নহেন। এ দেশে, যাঁহারা সংবাদ পত্র পরিচালনা করেন ও লেখেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক।

লর্ড কর্জ্জন প্রস্তাবক। সমালোচকগণ প্রতিবাদক ও পুনঃ প্রস্তাবক। উভয় পক্ষের

প্রস্তাবেরও প্রতিবাদের এখনি পরীক্ষা করা যাইবে। ইতিমধ্যে একটী কথা।

লর্ড কর্জ্জন বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া ও বহুদিন যাবৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া এবং সম্ভাবিত ও সম্ভাব্য অপরাপর প্রস্তাবের সহিত তাহার তুলনা দ্বারা তাহার প্রাধান্য ও সবিশেষ উপযোগিতা দেখিতে পাইয়াই তবে তিনি তাঁহার প্রস্তাব সাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন এবং জনসাধারণেরই জনৈক সদস্য স্বরূপ তাহাতে আলোচনা আহ্বান এবং উদ্দিষ্ট স্মারকের রূপ স্বরূপাদি সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত ও সমর্থ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও মন্ত্রণা প্রার্থনা করিতেছেন। পরন্তু, তিনি তৎকৃত প্রস্তাবের পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা এবং উপযোগিতাদি প্রচুর পরিমাণে প্রতিপন্ন করিয়া ইহাও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, তদপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ও সঙ্গত প্রস্তাব কেহ উপস্থিত করিলে তিনি স্বকীয় প্রস্তাব মূলত বা অংশত পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন করিবেন, এমন কি আবশ্যক স্থলে, তাহা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। তবে, যে প্রস্তাবই হউক এবং যাঁহার প্রস্তাবই হউক, তাহা উদ্দিষ্ট কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী ও সর্ব্ব-সাধারণ-স্পর্শী হওয়া চাই; সমীচীন ও সংসাধন-সাধ্য হওয়া চাই।

এ কথা সরলতা, উদারতা ও মহত্বের পরিচায়ক নয়, কে বলিবে? রাজ প্রতিনিধির এই প্রজা-রঞ্জন-প্রয়াসের এবং প্রজাসাধারণের পরিতৃপ্তি সাধন-স্পৃহার প্রশংসাই বা কে না করিবে? পরন্তু, উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহাও প্রতীত হইতেছে যে, লর্ড কর্জ্জন সবিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বহুদিন যাবৎ আলোচনা বিবেচনা করিয়া এবং বহু বিশেষবিদ্ ব্যক্তির যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আত্ম প্রস্তাবটী প্রচুর পরিপক্ক করিয়া তবে তাহা উপস্থিত করিয়াছেন। এবং সুযুক্তি ও সুনীতি দ্বারা তাহা পরিপুষ্ট ও প্রতিপন্ন করিয়া তবে তাহা কার্য্যে পরিণত করার কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ক্ষণিক একটা খেয়াল বশতঃ, খামাখা একটা অকিঞ্চিৎকর অসার কথা উঠাইয়া, প্রভুত্বের পেষণে, সেটাকে পূর্ণ করিবার জন্য লোকের উপর জোর জবরদস্তি করিতেছেন না। যাহা রাজ প্রতিনিধির পদে স্থিত ব্যক্তির এবং লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষের উপযুক্ত, লর্ড কর্জ্জন ঠিক তাহাই বলিয়াছেন।

একদিকে অবস্থা এই। একদিকে লর্ড কর্জ্জন এবং তাঁহাকে মন্ত্রণা দিতে সক্ষম, এমন মস্তিষ্কধারী ব্যক্তিগণ। এবং তাঁহাদের প্রগাঢ় চিন্তা ও দীর্ঘ আলোচনাপ্রসূত প্রস্তাব। আর অপর দিকে কি? লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবের প্রতিবাদকারী সমালোচকগণের এ প্রসঙ্গে, অবস্থা অবস্থিতি ও অভিমত কি উপাদানে ও কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? তাহা এখনি দেখা যাইবে। তবে কিনা তাহা দেখিলে—তাহা বলিলে, তাহাতে কেবল আমাদের স্বজাতীয় লজ্জারই পরিচয় দেওয়া হইবে। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ যত বেশী বড় লোকই হউন, তাঁহাদের বৃহদত্বে বিচলিত বা বিমুগ্ধ হওয়া অন্যায় হইবে। প্রত্যুত বিচারকালে সে বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া, কেবল মাত্র তাঁহাদের উক্তি, যুক্তি এবং অভিমতের সারবত্তা ও সঙ্গতি অনুসারেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপের নিরাকরণ ও মূল্যের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

কিন্তু, অতি সাবধানে এবং সবিশেষ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সহকারে, বিষয়ের প্রত্যেক অংশের অন্তর্ভেদ করিয়া, অনুধাবন ও 'ওজন' করিয়া, সে কার্য্য করা আবশ্যক। যে বিষয় প্রগাঢ় চিন্তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা-প্রসূত, তাহার বিচার বিশ্লেষ করিয়া গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সাধারণতঃই সেইরূপ প্রগাঢ় চিন্তা ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ যখন সেই বিষয়, আমাদের অপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক জ্ঞান-সমন্বিত ও তথ্যজ্ঞ ও দায়িত্বশালী ব্যক্তি-বর্গের সবিশেষ ও সুদীর্ঘ চিন্তা ও বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে, বাদ প্রতিবাদ করিতে হইলে বা মতামত গঠিত ও প্রকাশিত করিতে হইলে যে, কিরূপ গভীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত তাহার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার আবশ্যক হয়, তাহা কেবল মাত্র অনুভবনীয়। কোন সিদ্ধান্ত এক কথায় সমর্থন বা খণ্ডন করা খুবই সহজ। কিন্তু সে সমর্থন বা খণ্ডন বিশেষতঃ খণ্ডন, সিদ্ধান্তের শরীরাঙ্গও স্পর্শ করিতে পারে না। তাহাতে করিয়া তদ্রূপ খণ্ডনকারী কেবল হাস্যাস্পদই হন।

আমাদের অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ দেশীয় সম্পাদক ও রাজকীয় কার্য্য-কলাপের আন্দোলকগণ সাধারণতঃ অনেক স্থলেই রাজকীয় সিদ্ধান্তের তলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি না করিয়াই, খামাখা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসেন। বহু বৎসর যাবৎ বহু বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সে তথ্যরাশির ছেদ বিচ্ছেদ করিয়া, সবিশেষ সাবধানতার সহিত গবর্ণমেণ্ট একটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত করিয়া অভিমত আহ্বান করিলেন। আর আমাদের সর্ব্বজ্ঞ সম্পাদক বাবুগণ, বিনা অনুসন্ধানে, বিনা অধ্যয়নে, বিনা বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণে, এবং চিন্তা দ্বারা চিত্তকে বিন্দু মাত্রও চালিত না করিয়া, এক কলম কালী দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা আপাদমস্তক কাটিয়া দিলেন। তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, তৎকালে উপস্থিত নিজের মেজাজের "চড়াই উতরাই" অনুসারে মনে যে খেয়ালের উদয় হইল, তাহাই "জনসাধারণের সিদ্ধান্ত" বলিয়া, বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া, প্রকাশিত করিলেন। কে তাহার উপর কথা কয়? যদি কেহ কহিল, সম্পাদক তাহা ছাপাইলেন না। বস নিশ্চিন্ত। এক নিশ্বাসে কাজ শেষ হইয়া গেল। কাজেই, সম্পাদকীয় এরূপ কথার মতামতের যত মূল্য তাহা কেবল অনুমেয়। অতএব গবর্ণমেণ্ট প্রায় কোন কালেই, তাহা গ্রাহ্য করেন না; ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে পারে, অভ্রান্তও হইতে পারে। ধরিয়াই লওয়া যাউক, তাহা ভ্রান্ত। কিন্তু সে ভ্রান্তি প্রদর্শন ও প্রতিপন্ন করিতেও ত বিষয়ের অন্তর্ভেদ ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু, প্রায় অধিকাংশ সম্পাদকই গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পাতাগুলা ওলটানও আবশ্যক মনে করেন না, তাহার যুক্তি তর্ক ও তথ্যাদি অধ্যয়ন আয়ত্ত ও জীর্ণ করা ত বহু দূরের কথা! দেশীয় সম্পাদকীয় দপ্তরের দাঁড়া দস্তর এক আধটু দেখা আছে। এই জন্যই অবশ্য কথাটা একটু বলিতে সাহসী হইলাম।

গবর্ণমেণ্ট ভাল মন্দ যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন আর যে ব্যবস্থাই করুন, তাহার প্রতিবাদ কোনও না কোনও আকারে করিতেই হইবে, এক শ্রেণীর সংবাদ-পত্র সম্পাদকদের ইহা বাঁধা নিয়ম। কাজেই, তজ্জন্য

আর বেশী ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এমনও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সম্পাদকগণ নিজেরাই আজ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করিতেছেন, ঠিক সেই কার্য্যই যদি গবর্ণমেণ্ট কোন দিন করিতে প্রবৃত্ত হন, সম্পাদকগণ তাহারও বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ লিখিতে আরম্ভ করিবেন! এই অদ্ভুত ব্যাপার বা ব্যবহারেরও বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে; যাহা সংবাদপত্রের ফাইল উল্টাইলে পাওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহাতে যৎপরনাস্তি অশুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ এই কারণেই দেশীয় সংবাদ-পত্রের কথা,—সে কথা সময়ে সময়ে প্রকৃত কথা এবং জন-সাধারণের মর্ম্ম-যাতনার কথা হইলেও,—একেবারেই তাহা আমলে আনেন না,—তাহাতে অল্প মাত্রও আস্থা স্থাপন করেন না।

রাজকীয় সিদ্ধান্ত ও বিধি ব্যবহারের উপর দোষারোপ করা যেমন উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের অযথা প্রশংসাবাদও আমাদের অভিপ্রেত নয়। প্রত্যুত ভ্রম-প্রমাদ, দুর্ব্বলতা, প্রকৃত অবস্থানভিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে, নানা সময়ে, রাজকীয় নানা অনুষ্ঠান, যতই শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হউক, প্রজা লোকের হিতসাধনের পরিবর্ত্তে, অহিত ও উৎপীড়নেরই কারণ হয়। রাজদ্বারে জানাইয়া, তাহার যথাসম্ভব প্রতিবিধান করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়; এবং রাজশাসন কার্য্যেরও সবিশেষ সহায়তা করা হয়। দেশীয় সংবাদ-পত্র এবং সভা সমিতিতে আন্দোলন ও আবেদনাদি দ্বারা দেশের এই উপকার ও রাজ-শাসনের এই সহায়তা সম্পাদকদেরই করিবার কথা। রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যস্থলে, ইঁহারা দণ্ডায়মান। স্বগৃহীত বৃত্তি ও তাহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইঁহাদের করণীয় কার্য্যই এই। কিন্তু, আলস্যে, অজ্ঞতায় ও অযোগ্যতায়, সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় এবং ভ্রান্ত সংস্কার-সঞ্জাত কর্ম্মদোষে, ইঁহারা আপনাপন অত্যুচ্চ অধিকার অবনত করিয়া রাজা প্রজা উভয়েরই বিশেষতঃ রাজার (কেন না, প্রজা সাধারণ সাধারণতই কতক সংখ্যক উদাসীন, কতক সংখ্যক অদৃষ্টবাদী এবং অসংখ্য সংখ্যক জমাট জড়পিণ্ডবৎ অতি ব্যথায় বেদনা শূন্য) এমনি অপ্রত্যয়ভাজন হইয়া পড়িতেছেন যে, ইঁহাদের প্রকৃত কার্য্যকারিতা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর বলা বাহুল্য যে, প্রায় সকল বিষয়েই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত ও তথা কথিত "সাধারণ মত" সাধারণতঃ যেমন আকার ধারণ করিয়া থাকে, মহারাণীর স্মারক ব্যাপারে, লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও তাহার বিপরীত করে নাই। লর্ড কর্জ্জন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বহু সংখ্যক সম্পাদক তাহার আপাদমস্তক প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেন? না লর্ড কর্জ্জন রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রস্তাব রাজকীয় প্রস্তাব। অতএব, তাহার প্রকৃতি যেরূপই হউক, তাহা প্রতিবাদ-যোগ্য। পরন্তু, যেহেতু হরেন্দ্র বাবু সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং গবেন্দ্র বাবুর তাহা খণ্ডন করা চাই। নহিলে সম্পাদকীয় সম্ভ্রম থাকে না!! ইহা সদেশীয় বড় বড় সম্পাদকের সম্পাদকীয় সম্ভ্রম। ভার্ণাকুলার ভ্রাতাদের মধ্যে "উপহারী"রা আপন পক্ষ ও স্বার্থেরই অনুগামী। অনাহারীরা গড্ডালিকা। সকলেই ঐ একই কারণের অনুবর্ত্তী হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সম্পাদকগণের "গ্রিণরুমে" প্রবেশ করিয়া পরদা

তুলিয়া দেখিলে, প্রতিবাদের ঐ একই মাত্র কারণ পাওয়া যায়। বাহিরের অভিব্যক্তিতে অবশ্য অথাই উদারতা, বাক্য বিন্যাসেরও চমৎকার বার্ণিশ, আন্তরিকতার উত্তাপেরও অবধি নাই। প্রতিবাদেরও আপাদমস্তক পেট্রিয়টিক পরিচ্ছদ। লম্বাই চওড়াই সব দিকেই সমান বিদ্যমান। কিন্তু, নীতি ঐ একই ভিত্তিমূলক। তবে তাহা বর্ণরাগ বিহীন নহে। নীতিটী প্রস্ফুটিত পরস্পরের বিজাতীয় শত্রুতায়, বিরাট সংকীর্ণতায়, সাংঘাতিক স্বার্থন্ধতার সংঘর্ষে অথাই আত্মাভিমানে এবং অফুরন্ত "ডিফেমসনে।" অতঃপর আর বলা বাহুল্য, উপস্থিত বিষয়ে, লাট সাহেবের সমালোচক পক্ষের শক্তি, স্বভাব ও সারত্ব কেমন!

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন,—'কলিকাতা সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজধানী; অতএব সমবেত ভারতবাসীর সংস্থাপনীয় রাজরাজেশ্বরীর স্মৃতি মন্দির রাজধানী কলিকাতাতেই সংস্থাপিত হওয়া উচিত।'

সম্পাদক তখনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিলেন।—"না না না। তা কখনই হইতে পারে না। কলিকাতার মত কদর্য্য কুৎসিৎ স্থানে সংযুক্ত স্মারক সংস্থাপন করা কিছুতেই উচিত নয়। কলিকাতা অত্যল্প কাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। পতিত হইয়াই ত রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন, অন্যান্য অংশেও কলিকাতা নেহাত অকর্ম্মণ্য অনুপযুক্ত।" এমন কি, কলিকাতার অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্পাদকও এ কথায় সুদৃঢ় সমর্থন করিয়া আপনাপন অসীম উদারতা দেখাইয়া ফেলিলেন। পরন্তু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি বাঙ্গালীর সঙ্গে কন্‌গ্রেস করিয়া ভারতের একতা সাধনে দৃঢ়সংকল্প; অতএব তাঁহারা "ভেতো বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সহরে ভারতেশ্বরীর "সংযুক্ত স্থাপনের বিরোধী, সে ত হওয়াই চাই।

লর্ড কর্জ্জন প্রস্তাব করিলেন, যাহা স্মৃতির উদ্দীপক ও শরীরী ভাবে সুচিরস্থায়ী, শিক্ষাপ্রদ এবং অভাব পূরক এবং সর্ব্বজনহৃদ্য, তাহাই উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির। অতএব ভারতেশ্বরীর নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকালের এবং ভিক্টোরিয়ার কৃতকার্য্যের ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য নিচয় স্থাপন করিলে, তাহা একদিকে যেমন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া, শরীরী মূর্ত্তিতে ও সজীব ভাবে সে স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবে; অপর দিকে তেমনি তাহা সংযুক্ত ও একীভূত ভারতীয় জাতি নিচয়ের কর্ত্তৃক এক প্রাণে প্রতিষ্ঠিত সুমহান কীর্ত্তির সুচির সাক্ষী হইয়া, যুগযুগান্তর, বংশ বংশান্তর, ভারতবাসীর জাতীয় একতা এবং রাজনৈতিক সংযোগ সংসাধন ও স্বদেশহিতৈষিতার উদ্দীপন করিবে। পরন্তু, তাহা ভারতবর্ষের "ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্যশালার" ঐকান্তিক অভাব মোচন করিবে; মূর্ত্তিমান একখানি ইতিহাস হইয়া, ভারতেতিহাসের একখানি শরীরময়ী, শিল্পসৌন্দর্য্যময়ী, সুস্মৃতি সৌরভময়ী এবং প্রাঞ্জলতাময়ী প্রতিমা, শিক্ষিতের অধ্যয়নীয়, অশিক্ষিতের দর্শনীয় ও শিক্ষনীয় এবং উভয়ের উপভোগ্য হইবে। অতএব ইহাই লর্ড কর্জ্জনের বিবেচনায়, ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরীর স্মৃতি সংরক্ষণের ও তাহা যুগযুগান্তর সজীব করণের উপযোগী, উপযুক্ত স্মারক।

লর্ড কর্জ্জনের ঐ কথাগুলি সম্পাদকের

সম্পাদকীয় কর্ণ-কুহরের ভিতর ভাল করিয়া প্রবেশ না করিতেই, হস্তস্থিত শশব্যস্ত হংস-পুচ্ছ বা নির্ম্মম লৌহ লেখনী দৌড় ধরিল। দৌড় ত দৌড়—দ্রুত, দুরন্ত দৌড়। কোথাও বারেক দম ধরিল না; শ্বাস লইল না, চক্ষু চাহিল না, ফিরে তাকাইল না। শর ছুটাইয়া, শির হেলাইয়া, মশি ছিটাইয়া, কাগজ কাঁপাইয়া এবং মুদ্রাঙ্করকে রসাতলে পাঠাইয়া, চড় চড় শব্দে চোঁচা দৌড় দৌড়িল, সোজা ছুট ছুটিল। পাঁজায় পাঁজায় প্রবন্ধ, পণে কাহনে প্রতিবাদ, কুড়ি কুড়ি মন্তব্য, ঝুড়ি ঝুড়ি প্যারাগ্রাফ প্রসব করিয়া ফেলিল। প্রতিদিন পলকে পলকে প্রসবিতে লাগিল। রচিল, ছাপাইল, দিগ্‌দেশে পাঠাইল। তাহার সার সঙ্কলন এই যে, লর্ড কর্জ্জন নামক রাজপ্রতিনিধি যাহা বলিতেছেন, তাহা নেহাত না-পছন্দ, নিরর্থক নিষ্ফল ও না দেবায় না ধর্ম্মায়। তাহা অত্যন্ত অনুপযুক্ত, একান্ত অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনুপযোগী। তাহা কোন ক্রমেই অনুমোদন করা যাইতে পারে না। সেরূপ স্মারক কখনও হওয়া উচিত নয়। সে কেবল খোপসুরতী খোসপোসাকী মাত্র। তাহার কিছুমাত্র উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা নাই। ভারতবাসীর পেটে অন্ন নাই; পিন্ধনে বস্ত্র নাই। তাদের আবার সৌন্দর্য্য আলোচনা!! কাণা পুত্তের নাম পদ্মলোচন। যাদের ঘরে ভাত নাই, পুকুরে জল নাই, তাদের জন্যে আবার "ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য" তারা আবার ইতিহাসের প্রতিমা দেখিয়া, এতকাল পরে ঐতিহাসিক পাঠ পড়িতে, শিল্প সৌন্দর্য্যের বাহার দেখিতে যায়! বলি মহাশয়! তোমার ঐ সব ছবি দেখিয়া আর প্রতিমা পাঠ করিয়া, কাহারও পেট ভরিবে কি? ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইবে কি? তাহা যখন হইবে না, তখন ঐ বাহ্যাড়ম্বরের বাহারও বৃথা বাহাদুরীর দরকার কি?

"অন্ন ও জল" এই শব্দ দুইটী স্বভাবতই অতি করুণ। যে ক্ষেত্রে ও যেরূপ তর্কের স্থলেই হউক, তালে বা বেতালেই হউক, ঐ দুই শব্দের কোন এক শব্দ উচ্চারণ করিলে, অনেক সময়েই, তাহার উপর অপর কথা কহা চলে না। অন্ন জল আহরণ ও উৎপাদনের তর্ক, বিষয় বিশেষে, স্থান কাল পাত্র বিশেষে, যতই অযোগ্য, অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অসাময়িক হউক, উহার উত্থাপন করিলে, অন্য কারণাভাবে, কেবল মাত্র করুণার অনুরোধেও, অপর পক্ষের মুখবন্ধ করিবার এবং এক কথায়, সব কথা স্থগিত করিবার অমন অমোঘ মন্ত্র ও অতি সহজ উপায় আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের সম্পাদকীয় তর্কতূণে, এই দুই সুতীক্ষ্ণ শর সর্ব্বদাই মন্ত্রপূত করিয়া, মজুত রাখা হইয়াছে। স্থলাস্থল ভেদে, কেবলমাত্র তর্কেরই অনুরোধে, সম্পাদকীয় শক্তির শেষ সঙ্গতি, এ দুই শর নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। ইহার প্রহারে প্রতিপক্ষ, শক্তিশেলবিদ্ধবৎ ছটফট করে। বাস্। তাহা হইলেই হইল। কেন না, আসল উদ্দেশ্য সম্পাদকীয় যুক্তির বিষয় বই অন্ন জল নয়। অন্ন জলের অভাবে সম্পাদকীয় কক্ষ-দ্বারে, সম্পাদকীয় কেদেঁরার কুক্ষিতলেও, কোটী কোটী লোকের ক্ষয় হইলেও তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না; এক গণ্ডূস জল আর এক মুষ্টি অন্ন দ্বারা আত্মগৃহের পার্শ্বস্থিত একটী মুমূর্ষেরও প্রাণরক্ষা করাও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। তাহার দ্বারা তাঁহার লেখার জোর আর প্রবন্ধের

প্রখরতা বাড়িলেই হইল। দেশের রোগবৃদ্ধি যেমন ডাক্তারের, আর বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি উকিল ব্যারিষ্টারের উপজীব্য ও উপার্জ্জনের উপাদান; দেশে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপদ আপদের ও অশান্তির আগমন তেমনি সম্পাদকের সংস্থান বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, অন্ন জল বিষয়ক প্রশ্ন এমনি অসীম, জটিল এবং সমাধান অসাধ্য হইয়াছে যে, বিরাট বৃটিশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট ও ইহার মীমাংসা কল্পে ম্রিয়মাণ ও মলিন হইয়া পড়েন। সমাধানকারীর পক্ষে ইহা যেমন সাংঘাতিক, প্রশ্নকারীর পক্ষে এই প্রশ্ন প্রয়োগ করা তেমনি সহজ। সম্পাদক এমন সহজ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? সমাধানকারীকে কায়দা করিবার ও ফাঁফরে ফেলিবার এমন ফন্দী আর কি আছে? কিন্তু, এ প্রশ্নের অযথা ও যথা তথা কৃত্রিম প্রয়োগে, ইহার প্রগাঢ়তার ও পবিত্রতার লাঘব ও তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষ দরিদ্রতা-পীড়িতের অনিষ্ট করিয়া, প্রয়োগকারী তার্কিকগণ নিশ্চয়ই পাপ সঞ্চয় করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহারাণীর স্মারক সংস্থাপন কল্পে এ প্রশ্ন প্রয়োগের উপযোগিতা এবং প্রশ্নের সমাধান সম্ভাবনা থাকুক আর নাই থাকুক, সে চিন্তা কে করে,—তর্কযুদ্ধের খাতিরে প্রয়োগটা পুনঃ পুনঃ খুবই হইল। হইবারই কথা। লর্ড কর্জ্জনের প্রতিবাদকারী সমালোচকগণের কতক লোকে বলিলেন, মহারাণীর স্মৃতি-মন্দির স্থাপনার্থে উত্থিত অর্থে দেশের দুর্ভিক্ষ বিনাশ করা হউক। কতকে বলিলেন, "টেকনিকাল স্কুল স্থাপন করা হউক। যেহেতু, তাহাতে শিল্পকারিগরী শিখিলে, লোকের ডাল ভাত, রুটী তরকারী উপার্জ্জনের পথ হইবে; কেহ বলিলেন, আর কিছু নয়, গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটান হউক; কেহ বলিলেন, তা নয়, ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করা হউক; আবার কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন "ও সব নয়, ইয়ুরোপে, মার্কিনে, জাপানে ছাত্র পাঠাইয়া শিল্প-বিজ্ঞান শিখাইয়া আনান হউক, তাহা হইলেই শনির দৃষ্টি ঘুচিয়া লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িবে।" এইরূপ নানা লোকে, আপন আপন আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষানুরূপ যাঁহার যেমন খেয়াল হইল, নানা রকমের প্রস্তাব প্রকাশিত করিলেন। সে সব প্রস্তাব স্ব স্ব ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় ও উপকারী হইলেও মহারাণীর স্মারকের উপযোগী স্মৃতি-মন্দিরের উপযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা একেবারেই কাহারও বিবেচনাধীনে আসিল না। পরন্তু, "মৎ সম্পাদিত দশ লক্ষ খণ্ড সংবাদ পত্র" অনন্তকালের জন্য "সাবস্‌ক্রাইব্‌" করিয়া তাহার সহস্র বৎসরের মূল্য অগ্রিম দেওয়া হউক এবং দেশময় তাহার বিস্তার করিয়া লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি করা হউক বা আমার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতৃ যে যেখানে থাকেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার্থে ইয়ুরোপে জাপানে পাঠান হউক" ঠিক এই প্রস্তাব মুখ ফুটিয়া কেহ করিতে না পারিলেও, কিয়ৎপরিমাণে এই প্রকৃতির প্রস্তাবও যে পাঁচ সাত গণ্ডা উপস্থিত না হইল, এমন নয়। যাহা হউক, বহু প্রস্তাবের মধ্যে জোর বাঁধিল দুইটীতে। এক দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং অপর টেক্‌নিকাল স্কুল স্থাপন। লর্ড কর্জ্জন, এ উভয়েরই সুমীমাংসা করিয়াছেন। পরন্তু, কথা হইল, সাধারণের এই কার্য্যে লর্ড কর্জ্জন কে? তিনি কেন ইহাতে মোড়ল হইয়া মুরুলী

করিতেছেন ? স্মারক কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কমিটী করিয়া তাহা স্থির করা হউক। ইত্যাদি। সমালোচনা এখানেও নিবৃত্তি হইল না। সম্পাদক ধুয়া ধরিয়া বসিলেন, "রাজা রাজড়াগণ সম্রাজ্ঞীর স্মারক স্থাপনার্থে যে এই টাকা দিতেছেন, ইহা প্রকারান্তরে জোর জবরদস্তিতেই লওয়া হইতেছে। সরকারী চাপে ও চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া, কতক খাতিরে ও কতক শঙ্কাবশতঃ তাঁহারা এ টাকা দিতেছেন। ইহা ভারি অন্যায়।" লর্ড কর্জ্জন এ অভিযোগেরও উপযুক্ত উত্তর দিয়া স্মারক সংস্থাপনার্থে অর্থ প্রদানের এমন সুব্যবস্থা করিয়া, তাহা দাতার স্বেচ্ছাধীনে ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে আর কোন কথাই চলিতে পারে না। ফলতঃ এই স্মারক সম্বন্ধে যত প্রকারেরই আপত্তি ও অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, লর্ড কর্জ্জন তাহার একটীও উপেক্ষা করেন নাই। সদুত্তরে ও সমীচীন সুব্যবস্থায় সকলকেই নিরস্ত করিয়া প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণ করিতেছেন।

স্মৃতি-মন্দির ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ ফণ্ড

এ বিষয় লর্ড কর্জ্জন যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, দাতব্যের ন্যায় পুণ্য নাই। যে উপলক্ষেই হউক, দান বিতরণ দাতা গৃহীতা উভয়েরই কল্যাণকর। উপস্থিত স্মারক উপলক্ষে দাতব্যকল্পে—দুঃখীর দুঃখ দূর কল্পে ; যতদূর করা যাইতে পারে, করা হইবে। তাহাতে লর্ড কর্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখানুভব করিবেন। দুর্ভিক্ষ কালে দুঃখী লোকের অন্নকষ্ট এ দেশে অতীব নিদারুণ দৃশ্য। অন্নকষ্টের নিবারণ কল্পে, দান বিতরণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। দুর্ভিক্ষ কালে, ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্নদান দ্বারা জীবের জীবনরক্ষা করিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করিয়া থাকেন। এবং চিরকালই করিবেন। পরন্তু উপস্থিত উপলক্ষে সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি উদ্দীপনোযোগী শরীরী স্মারক সংস্থাপিত হইয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে। গত বৎসর জয়পুরের মহারাজার প্রদত্ত অর্থে যে দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, স্মারক তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থে সেই ফণ্ড বর্দ্ধিত করা হইবে, লর্ড কর্জ্জন সংকল্প করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যে লর্ড কর্জ্জন ভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ কালে, প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ করিয়া টাকা ব্যয় করিয়া, প্রায় বৎসর কালাবধি নিত্য কোটী কোটী লোককে অন্ন দান করিয়াছেন, যিনি এই সমস্ত কার্য্যের জন্য, নিজে ভিক্ষা করিয়া, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এই অন্নদান কার্য্যের পরিদেবনার্থে যে কর্জ্জন ভারত গবর্ণমেণ্টের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজে নিরতিশয় নিদাঘ তাপ ও মহামারির মধ্য দিয়া, যাবতীয় শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা ও প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়া, দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ পীড়িতের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, সমবেদনা জানাইয়াছিলেন, দয়ার্দ্র হইয়া নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, প্রায় প্রত্যেক অন্নছত্র পরিদর্শন করিয়া তাহার সুচারু পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—সেই কর্জ্জনকে আজ দুর্ভিক্ষে দানের জন্য, বোধ হয়, কাহারও বলিয়া দিতে

হইবে না। যে কর্জ্জন অসংখ্য গুরুতর রাজকার্য্যের মধ্যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণকে সর্ব্ব-প্রধান গণ্য করিয়া, তাহার উপায় চিন্তাতে নিত্য মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং কমিসনাদি নিয়োজন করিতেছেন, সেই কর্জ্জনকে "দুর্ভিক্ষ-দমন-কর্ত্তব্য" বলিয়া উপদেশ দিতে যাওয়াটা নেহাত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না, আর হয় ত তত ভালও দেখায় না। অন্যান্য গবর্ণর জেনারেলদের সময়ে যাহাই হউক, লর্ড কর্জ্জনের সময়ে কোন বিষয়ে ঢালোয়া কথা কহিয়া, রাজনৈতিক চিরাগত "বাঁধি গৎ" বাজাইয়া পার পাইবার ও "বাহাবা" লইবার উপায় নাই।

কিন্তু বস্তুগত্যা লোকের অন্নক্লেশ নিবারণ করাই কি সম্পাদকের আন্তরিক ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়? কাহারও কাহারও হইতে পারে। কিন্তু, সকলেরই কি তাই? অন্নদান করা অভিপ্রায় অথবা অন্নক্লেশ লইয়া একটা রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করণ ও প্রবন্ধ রচনাই উদ্দেশ্য। অন্নদানই যদি আসল অভিপ্রায় হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থে অন্নদান দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করা চলে কিরূপে? পরন্তু কৃষি ও আমদানি রপ্তানীর উন্নতি ও সুবিধার জন্য, রেলওয়ে ও কেনাল করিবার সময়ে তাহার বিরুদ্ধেই বা চীৎকার করা চলে কি করিয়া? আবার বদান্য লোকদের দুর্ভিক্ষে দানের বিপক্ষে বলা হয়ই বা কোন সন্নীতির আদেশে? অন্নদান করাই যদি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তবে ১৮৯৭ সনের কলিকাতা কংগ্রেস কালে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ সহ এই বঙ্গদেশও দুর্ভিক্ষের দাবানলে দাউ দাউ পুড়িতেছিল, তখন তোমার জাতীয় সমিতির তহবিল হইতে তাহার প্রশমনের জন্য একটী পয়সা দেওয়াও অপব্যয় বলিয়া স্থির হইয়াছিল কোন্ হিসাবে? পুনশ্চ, দেশীয় সভা সমিতি হইতে ও সভা সমিতির চেষ্টায়, যত্নে ও উদ্যোগে, চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, দুর্ভিক্ষে দানের অনুষ্ঠানই বা কেন সম্পাদকীয় নীতির অননুমোদিত? নব্যভারত-সম্পাদকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিনি সেবার তাঁহাদের সুহৃদ্ সভার পক্ষ হইতে, তাহার সেক্রেটারী স্বরূপ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যখন ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ দলিতদিগকে সহায়তা করিতেছিলেন, তখন কোনও নামজাদা রাজনৈতিক সম্পাদক বন্ধুভাবে তাঁহাকে কি পরামর্শ ও কি উপদেশ দিয়াছিলেন!!

লর্ড কর্জ্জনের উক্তি হইতে যাহা জানা ও যতটা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে মহারাণীর স্মৃতিসংরক্ষণ উপলক্ষে, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ফাঁক পড়িবে না। তবে, কোনও ফণ্ড বা তহবিল বিশেষের কায়াহীন কার্য্যের দ্বারা কখনও কাহারও স্মৃতি বিশেষতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রমণী ও রাজ্যেশ্বরী ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি চিরস্থায়ী তথা সর্ব্বজনহৃদ্য ও উপভোগ্য হইতে পারে না। তদর্থে কায়াময়ী কোনও মূর্ত্তিমতী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্মরণীয়ের জীবনের ও জীবনধারণ সময়ের সর্ব্ববিধ সদ্ভাব সংযোগের শরীরী সূত্রে সংযুক্তা ও সংবদ্ধা হইয়া থাকা আবশ্যক হয়। কোনও ফণ্ডেরই কার্য্য দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না। পরন্তু ফণ্ডের কার্য্য সর্ব্বলোকস্পর্শী হওয়া দূরের কথা, তাহার বিষয়ীভূত ও অধিকারাধীন সকল লোকের নিকটেও তাহা পৌঁছিতে পারে না। লর্ড কর্জ্জন ইহাই বলিতেছেন। ইহার মধ্যে অযৌক্তিক ও অন্যায় অসঙ্গত কথা কোন্‌টী,

কেহ দেখাইয়া দিলেও ত পারেন। নশ্বর সংসারে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর কিছুই হইতে পারে না; কিছুই নাই। তথাচ দুর্ব্বল মানবচিত্ত তাহার বিপরীত দিকে ধাবিত, তাহার জন্য লালায়িত হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি ও শিল্প স্কুল।

এ সম্বন্ধে লর্ড কর্জ্জনের অভিমত ও উক্তি এই যে, শিল্প শিক্ষা ও শিল্পের স্বাবলম্বী স্বতন্ত্র শিক্ষাশালা বা টেকনিকাল স্কুলের বিপক্ষে তাঁহার একটী কথাও বলিবার নাই। উহা নানা রূপেই ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু, ইহা সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে কোনও ফণ্ডের সমুৎপন্ন ও সঞ্চিত সুদের টাকার দ্বারা প্রতি বৎসর অত্যল্প মাত্র ভারতীয় যুবকের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। পরন্তু, কোন্ সূত্রমূলে এবং নিয়ম-প্রণালীর অনুমোদন মতে এ শিক্ষা সম্পাদিত হইবে ও শিক্ষা সমাপ্তির পর, শিক্ষিতগণ স্ব স্ব বৃত্তির শক্তি সামর্থ্য ও নৈপুণ্যাদি অনুসারে, কি কার্য্য, কোন্ পদ, পারিশ্রমিক ও প্রতিষ্ঠাদি পাইতে পারিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। তাহা অদ্যাবধি আদৌ কুয়াসাচ্ছন্ন। ইংলণ্ডে গত ১৫ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ের বিতর্ক বিতণ্ডা আলোচনা বিবেচনা হইয়া চলিয়াছে। তথাচ তথায়ও এখনও উহার নেহাৎ 'তরল অবস্থা'। তাহার পর শেষ কথা এই যে, অতীত মহারাণীর নামের ও স্মৃতির সহিত স্বতন্ত্র শিল্প শিক্ষার "টেকনিকাল স্কুল" সম্বন্ধীয় ব্যাপার সংযুক্ত করা লর্ড কর্জ্জনের একেবারেই ইচ্ছা নয়। কেন না, উহার সহিত সে নাম ও স্মৃতির কখনও কোনও সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ এবং সংযোগ ছিল না। অতঃপর লর্ড কর্জ্জনের উক্তি এই যে, এবম্বিধ অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় টেকনিকাল শিক্ষার অনুষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের নিজের ও যে সমাজ বা সম্প্রদায়ের জন্য তাহা উদ্দিষ্ট, সেই সমাজের বা সম্প্রদায়েরই সর্ব্বোত্তোভাবে করণীয় ও কর্ত্তব্য। অন্য দিকে বা অন্যের উপর নিক্ষেপণীয় নয়। ইহার পর লর্ড কর্জ্জন এ সম্বন্ধে এই বলেন যে, কতক লোকের এই ধারণা এবং এ ধারণা তাঁহারা কথিত ও লিখিত বাক্যে ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, শিল্প-শিক্ষাতেই যেন সত্য সত্যই ভারতীয় কৃষি সমস্যার সমাধান ও সুমীমাংসা হইবে এবং সেই শিক্ষাতেই শত অভাব-ক্ষুব্ধ ভারতীয় কৃষককুল শিল্পকুশল কারিকরে পরিণত হইবে। কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা সুদূর-পরাহত। সভা-গৃহে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী গতায়ু হওয়ার পর, যখন ধূলিকণায় পরিণত হইবেন, তখনও ভারতীয় কৃষিজীবী বিষয়ক এই কঠিন প্রশ্ন, অর্থনীতির এই জটিল সমস্যা ভারত শাসিয়তাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবে। ফলতঃ কতকগুলি শিল্প, শিল্প শিক্ষালয় ও শিল্পশালার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হইবার নহে। তাহাতে করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের সামাজিক ও শ্রামিক শক্তি রাশির অপার মহা সাগরে ক্বচিৎ একটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তরঙ্গ, একটী বুদ্বুদ ও উত্থিত হইবে কিনা, সমূহ সন্দেহ। কিন্তু এই প্রকার অপরিপক্ক ও অপরীক্ষিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় এই অনিশ্চিত, অপরীক্ষিত শিল্পানুষ্ঠান যদি অফলপ্রসূ, নিরর্থক ও নিষ্ফল হয়,—অস্মদীয় অভিব্যক্তির উপস্থিত স্তরে, উহা নিরর্থক ও নিষ্ফল হইবারই সমূহ সম্ভাবনা; অতএব উহা নিষ্ফলই যদি হয়, তাহা হইলে তখন এবম্বিধ স্মারকে মহারাণীর স্মৃতি, মহারাণীর

সম্ভ্রম কোথায় থাকিবে, কেমন করিয়া রক্ষা হইবে বলুন দেখি।'

তবে কি, এই অপরিপক্ক, অপরীক্ষিত ও পরীক্ষণীয় প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না? লর্ড কর্জ্জন বলেন, 'কেন হইবে না? অবশ্যই তাহার সবিশেষ ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা করা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিচয়, মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নিচয়, সওদাগরী সভা, ও কুঠি কারখানা সকলের সমবেত শক্তি, চেষ্টা, যত্ন ও প্রয়াস তথা মানবজাতির হিতৈষী উদ্যমশালী পুরুষ-সিংহগণের সমবেত শক্তি একত্রে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া উহার সুমীমাংসা ও সফলতার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।' কর্জ্জন সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন যে, গবর্ণ মেণ্টের সহিত একত্রিত হইয়া এ সঙ্কল্প সাধনার্থে তাঁহারা কার্য্য করেন।

শিল্প শিক্ষা ও টেকনিকেল স্কুল সম্বন্ধে লর্ড কর্জ্জনের অভিমত ঠিক হইলেও পারে, না হইলেও পারে। সাধারণ ও সবিশেষ ভাবে সে অভিমতের সহিত উপস্থিত বিষয়ের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। তবে টেকনিকেল স্কুল বা তদ্রূপ কোনও অনুষ্ঠান যে মহারাণীর স্মারকের উপযোগী হইতে পারে না, ইহা লর্ড কর্জ্জন সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া ভারতীয় জাতি নিচয়ের একতা সূচক এবং এক জাতিত্ব সংবর্দ্ধক ও সন্দীপক এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-মন্দির হইয়া, ভারতেতিহাসের, ভারতের সুসন্তানগণের এবং ভারতেশ্বরীর স্মৃতির একত্রে পরিচয় প্রদান করে এবং তাহা করিয়া ভারতীয় ভবিষ্য বংশাবলীর এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানবমণ্ডলীর সুশিক্ষাপ্রদ সম্ভ্রমের আস্পদ এবং সর্ব্বতোভাবে মানসিক উপভোগ্য হয় এবং ভারতে যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও অদ্যাবধি উদ্ভব হয় নাই, এমন এক অপূর্ব্ব উপাদেয়, সুবিস্তীর্ণ ও সুন্দর সামগ্রীর সৃষ্টি হইয়া ভারতের এক সবিশেষ অভাবের পূরণ করে, ইহাই লর্ড কর্জ্জনের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা সমদ্ভূত সম্পাদনীয় দ্রব্যের নাম ভিক্টোরিয়া হল। উহার যেরূপ আভাস লর্ড কর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা পরে সবিস্তারে বক্তব্য।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণ।(২)

পূর্ব্বে যতদূর বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অন্ততঃ এই কথা বুঝা গিয়াছে যে, কেবল বহিঃপ্রবাহ স্বীকার করিলে জড়বাদেরও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না—আত্মবাদের ত কথাই নাই। কাজেই অবশেষে এই শ্রেণীর দার্শনিকগণকে নাস্তিক বা অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং এই বহিঃপ্রবাহ হইতে জ্ঞানলাভে হতাশ হইয়া আর এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ কেবল অন্তঃপ্রবাহ মাত্র স্বীকার করেন। ইহাঁরা বলেন যে, জ্ঞাতার নিজ অস্তিত্বজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। এবং তাহার জ্ঞান চেষ্টাও স্বতঃসিদ্ধ। অন্তঃকরণে বা মনে সেই জ্ঞান চেষ্টার স্বতঃ উদ্রেক হয়। তাহা হইতে অন্তঃকরণে একরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়াই ইন্দ্রিয়পথে বাহিরে গিয়া বিষয় গ্রহণ করে, অথবা বিষয়রূপ জ্ঞান

উৎপন্ন করে। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথে গিয়া বাহিরে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। মনে কর, কোন বস্তু আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল, তখন সেই বস্তু হইতে সূক্ষ্ম অণুগুলি অথবা তাহা হইতে একরূপ গতি বা ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া সেইগুলি আমাদের চক্ষুতে আসিয়া ক্রিয়া উৎপাদন করিয়াছিল, এবং সেই ক্রিয়া মস্তিষ্কে নীত হইয়া তবে সেই বস্তুর দর্শন হইয়াছিল, এইরূপ এক বহিঃপ্রবাহ হইতে যে আমাদের ঐ বস্তু জ্ঞান হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না। আমাদেরই জ্ঞানবৃত্তি বাহ্যবিষয় গ্রহণে বা বস্তুজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অন্তঃকরণে একরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছিল—সেই ক্রিয়া বুদ্ধি হইতে মনে ও মন হইতে ইন্দ্রিয়ে নীত হইয়া পরে বাহিরে ক্রিয়া ঐ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বা বস্তুর আকার ধারণ করিয়াছিল, এইরূপই মনে করিতে হইবে। (১)

(১) এই অন্তঃপ্রবাহ তত্ত্ব আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ক্যাণ্ট তাঁহার Critique of pure reason নামক পুস্তকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। একরূপে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইতেই ইউরোপে অন্তঃপ্রবাহ বাদ প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার এ মত এস্থলে বুঝাইয়া দিবার আদৌ স্থান নাই। এই জন্য সংক্ষেপে দুই একটী কথা মাত্র এস্থলে বলা হইয়াছে।

ক্যাণ্টের মতে ইন্দ্রিয় হইতে ও অন্তঃকরণ হইতেই জ্ঞানকার্য্য আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয় স্থানকালরূপ জ্ঞান প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ হইতে প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রমাণ বৃত্তি হইতে প্রমা জ্ঞান হয়। প্রথমতঃ এই প্রমাণের একরূপ স্বতঃসিদ্ধ অবয়ব অন্তঃকরণের সহজাত। এবং তদনুসারে জ্ঞানের বিষয়ও স্থিরীকৃত। এই প্রমাণের অবয়ব পাঁচ প্রকার—যথা সংজ্ঞা (pure Concepts) বুদ্ধির অবয়ব সংস্কার (Forms of the understanding) ইত্যাদি। সেইরূপ প্রমা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ও আছে—যথা একত্বের ধারণা, এবং আত্মা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা।

কেবল অন্তরপ্রবাহ হইতে কিরূপে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও ক্রমে পরিস্ফুট হয়—তাহা ক্যাণ্ট অতি বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহার জন্যই আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে ক্যাণ্ট শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন।

ক্যাণ্ট ব্যতীত আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দেঃ কার্তে, বার্কলে, স্পাইনোজা, সপেনহর, ফিক্তে এবং প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে প্লেতো, লুক্রিসিয়স্, সেণ্ট অগষ্টিন্ প্রধান। আমাদের দেশে অধিকাংশ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এবং আংশিকরূপে হিন্দু অর্থাৎ আস্তিক দার্শনিকগণ কতকটা এইরূপ অন্তঃপ্রবাহ বাদী। তন্মধ্যে স্পাইনোজা ও বার্কলি ও ফিক্তে অনেকটা চৈতন্যপ্রবাহবাদী এবং প্রায় বেদান্ত-বাদী। তাহা পরে দেখান যাইবে। উপরি-উক্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই এক জনের মত এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

Plato—Reason and its conceptions constitute the first starting point of true knowledge. Reason is the property of the soul. Ideas are its a *priori* possessions.

Lucretius—Reason beheld its own image in the mirror of objective existence.

Descartes—credited the soul with certain innate ideas, the aboriginal possessions of certain truths from which all thought proceeds.

Schopenheaur—That the world is my idea, as inevitably conditioned through the subject, and exists only for the subject is a truth which holds good for every thing that exists and knows. This is the fundamental tenet of vedanta of Vyasa.

আমরা দেখিতে পাই যে, যখন আমরা অন্যমনস্ক থাকি, তখন বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিতে পারি না। যখন এক মনে কোন বিষয় ভাবনা করি, তখন বাহিরে কোন ঘটনা হইলে তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। তখন কেহ যদি আমাদের বার বার ডাকে, তবু হয়ত আমরা সে ডাক বা সে শব্দ শুনিতে পাই না। অতএব মনঃ-

সংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হয় না। এই জন্য আমরা বলিতে পারি যে, প্রথমে জ্ঞানবৃত্তিরই উদয় হয়। তাহার ক্রিয়াফলে মন বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য বহির্মুখী হয়। তখন আমাদের চৈতন্য ইন্দ্রিয়পথ দিয়া বাহিরে গমন করে, এরূপ বলিতে পারি। এইরূপ বহির্মুখী হইয়াই শেষে চৈতন্য বিষয়াকার হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভের জন্য এই অন্তঃপ্রবাহ নিতান্ত প্রয়োজন। যখন জ্ঞাতার জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়, তখন অন্তঃকরণ তাহার সমুদায় শক্তি লইয়া জ্ঞাতার নিকট উপস্থিত হয়—এরূপ বলিতে পারা যায়। জ্ঞাতা তখন সেই শক্তিকে আপনার জ্ঞানকার্য্যে বা বাহ্য বিষয় গ্রহণে নিযুক্ত করে। অন্তঃকরণ তখন বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিবার জন্য—জ্ঞাতার নিকট সেই বাহ্যবিষয় উপস্থিত করিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত হয়। সেই চেষ্টার ফলে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তখন যদি সেই সকল ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে গ্রহণোপযোগী কোন বিষয় থাকে, তবেই তাহা ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে। নতুবা ইন্দ্রিয়চেষ্টা বিফল হয়। অতএব এই বিষয়জ্ঞানের জন্য প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বও আবশ্যক।

এখন কথা হইতেছে, জ্ঞাতার জ্ঞান-ইচ্ছা হইতেই কি অন্তঃকরণে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়—না অন্তঃকরণের এই স্বতঃ জ্ঞানার্জ্জন করিবার শক্তি আছে? যাঁহারা অন্তঃকরকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের মতে জ্ঞাতার চেষ্টাতেই অন্তঃকরণ কার্য্যকরী হয়। অন্তঃকরণের নিজের কোন জ্ঞান চেষ্টা নাই। এই জন্য জ্ঞাতা হইতেই এই বহিঃপ্রবাহ আরম্ভ হয়। আর যদি অন্তঃকরণের স্বতঃজ্ঞান চেষ্টা থাকা সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে বলিতে হয় যে, এই অন্তঃকরণ ব্যতীত আর স্বতন্ত্র জ্ঞাতা নাই। এই অন্তঃকরণই চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত। সেইজন্য ইহাতে "আমি"জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদি ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তবে অন্তঃকরণকে চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত বলায় তাহাকেই জড়াতিরিক্ত আত্মা বলিতে হয়। কেননা, অন্তঃকরণ জড় অথচ চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত এরূপ বলিলে তাহা হইতে অন্তঃপ্রবাহ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না, জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইলেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। জড়ের স্বতঃজ্ঞানপ্রবৃত্তি কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বাহ্যবিষয়ের সহিত বহিঃপ্রবাহ হইতে অন্তঃকরণের সম্বন্ধ জন্মে এবং তাহারই ফলে জ্ঞানরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা ব্যতীত অন্য কথা বলা যায় না।

যতদূর বলা হইল, তাহা হইতে এই অন্তঃপ্রবাহের বিষয় একরূপ বুঝা যাইবে। এই অন্তঃপ্রবাহ হেতু জ্ঞাতা তাহার জ্ঞেয় অন্বেষণ করে। জ্ঞানে এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞেয় থাকিতে পারে না—আবার জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞাতা থাকিতে পারে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব উদয় হইবার পূর্ব্বে চৈতন্যের যেরূপ অনির্ব্বচনীয় বোধাতীত অবস্থাই থাকুক, যখনই তাহাতে জ্ঞাতা ভাব উদয় হয়, তখনই তাহাতে জ্ঞেয় ভাবও সেই পরিমাণে উপস্থিত হয়। এইরূপেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। একরূপ তাড়িত বা চুম্বক শক্তির আবির্ভাব হইলে যেমন তাহার সমান পরিমাণে বিপরীত তাড়িত বা চুম্বক শক্তি উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞাতাভাব উদয়

হইলেই চৈতন্যে জ্ঞেয়ভাব উদয় হয় ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় বা আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাবযুক্ত। জ্ঞেয় বিষয় দুইরূপ—অহং ও ইদং।* এই অহং ভাব অন্তঃকরণের। আর ইদংভাব বাহ্য ও আন্তর বিষয়ের। জ্ঞাতা যখন এই অহং বা আমি ভাবকে জ্ঞেয়রূপে গ্রহণ করে—তখন ইহা অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হয় বলা যায়। জ্ঞাতা এই আমি ভাবেই "ইদং" বা বাহ্য ও আন্তর বিষয় গ্রহণ করে। এই অবস্থায় "আমি" কে বিষয়ী বলা যায়। যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, তেমনি অহং ও ইদংএর মধ্যে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধের কিছু পার্থক্য আছে। অহং ও ইদংএর যোগফল জ্ঞেয়ের সমান। অহংভাব যত বৃদ্ধি হয়, ইদংভাব তত হ্রাস হয়—আর ইদংভাব যত বৃদ্ধি হয়, অহংভাব তত হ্রাস হয়। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব পরস্পর সমান। অঙ্ক শাস্ত্রের সঙ্কেত অবলম্বন করিলে আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞাতা = জ্ঞেয়। জ্ঞেয় = অহং + ইদং। আর অহং $\propto \frac{1}{\text{ইদং}}$ (subject varies inversely as the object) এবং জ্ঞান = জ্ঞাতা + জ্ঞেয়। †

পূর্ব্বে যে চৈতন্য ও জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছি, তাহাও এইরূপে বুঝিতে পারা যাইবে, যথা—
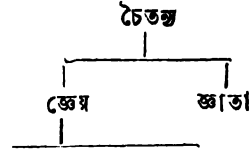
ব্যবহারিক অহং ইদং

সুতরাং অহং ও ইদংভাব এইরূপে বাহ্য বিষয় গ্রহণ কালে এইরূপ অহং বৃত্তির উদয় হইলে—যে বিষয় সুখজ, অনুরাগ বশতঃ বা আর্কষণ হেতু তাহাই গ্রহণ করায় প্রবৃত্তি হয়। এবং গ্রহণ করিয়াও তাহা ভোগ করিবার স্পৃহা জন্মে—তাহার স্বরূপ জানিতে প্রবৃত্তি হয় না। সেইরূপ যে বিষয় দুঃখজ বলিয়া মনে হয়—তাহার প্রতি দ্বেষ হয়—তাহা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব হয় না। তাহার পর এই গ্রহণ ও ত্যাগ চেষ্টা হইতে যে কর্ম্মবৃত্তির কার্য্য আরম্ভ হয়, 'অহং' যে কর্ত্তা ভাবে আপনাকে অনুভব করে, সেই কালে বিষয়ের স্বরূপ জানিতে আদৌ প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং এই ভাবে ধরিলে বলিতে হইবে যে, এই অহং বৃত্তি ইদং জ্ঞানের অন্তরায়। একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া একথা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। মনে কর, শবচ্ছেদ ব্যতীত দেহ বিজ্ঞান লাভ হয় না। পূতিগন্ধ-যুক্ত শব দেখিয়া আমাদের মনে ঘৃণার উদয় হয়,—তাহার প্রতি দ্বেষ জন্মে, তাহা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে শবচ্ছেদ সম্ভব হয় না—দেহ বিজ্ঞানও লাভ করা যায় না। বিষ্ঠা লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার স্বরূপ জানিতে কয়জন সমর্থ হয়? এইরূপ যে বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণ হয়—তাহা ভোগ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়। সেই ভোগ-ইচ্ছা দমন করিয়া তবে তাহার তত্ত্ব আলোচনা করা সম্ভব হয়। দিব্য সংগীত শুনিয়া যখন মন মুগ্ধ হয়, তখন সেই সঙ্গীত-তত্ত্ব তাহার স্বরলয় তত্ত্ব ইত্যাদি ভাবনা করিবার অবসর থাকে না।

যত দূর বলা হইল, তাহা হইতে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, এক হিসাবে 'অহং' বৃত্তি 'ইদং' জ্ঞানের

* জ্ঞাতারূপে অহংভাব স্বতঃসিদ্ধ—তাহা জ্ঞেয় হয় না। বৃত্তিউপহিত অহংই জ্ঞেয়। কিন্তু প্রমাণ বৃত্তিতে উপহিত অহং বা ব্যক্তিচৈতন্য জ্ঞাতা প্রমাতা রূপে জ্ঞেয় হয় না। মনঃপ্রধান অন্তঃকরণাধিষ্ঠিত বাসনা-বদ্ধ কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবযুক্ত বা প্রমাণ চৈতন্যযুক্ত অহঙ্কারস্বভাব অহংই জ্ঞেয়। এই অহং জ্ঞাতা ভাবের আবরক—প্রকাশক নহে। এই অহং কারকে জানিয়া তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিলে—জ্ঞাতা অহংএর পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয়। এই বিশুদ্ধ অহংই চৈতন্য স্বভাব আত্মার প্রকাশক।

† এই 'অহং' ভাবে 'ইদং' গ্রহণ সম্বন্ধে এস্থলে আরও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। ভোক্তা অহং ভাবে সুখ দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি অনুভূত হয়। ইদং বা

বুঝিলে, এই ভাব জ্ঞাতার নহে, তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইবে। এই তত্ত্ব নূতন, সুতরাং এত সংক্ষেপে বুঝান যায় না। কিন্তু এস্থলে তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইবার স্থান নাই। যতদূর বলা হইল, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, চৈতন্যের প্রথম বন্ধন এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ভাব। জ্ঞাতা চৈতন্যের নিকট জ্ঞেয় বিষয় নিত্য প্রতিভাত। আর এই জ্ঞেয় চৈতন্যের অহং ও ইদং ভাবও নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

এখন বুঝিতে হইবে, এই অহংজ্ঞানের স্থান কোথায়। আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়যুক্ত অন্তঃকরণই এই অহংজ্ঞানের স্থান। ইহাতে চৈতন্য বা জ্ঞাতা অধ্যসিত বা অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার উৎপন্ন করে। অর্থাৎ আমি দেখি শুনি, মনে করি, সুখ দুঃখ ভোগ করি, বুদ্ধিবলে জগৎ তত্ত্ব বুঝিতে পারি, এইরূপ ধারণা হয়। এই অহং বৃত্তি তিনরূপ,—কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ত্তা ও ভোক্তা অহংকারে জ্ঞানবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। কেবল জ্ঞাতাভাবেই জ্ঞান জন্মে। চিত্তের এই জ্ঞাতা ভাবকেই প্রমাণ বৃত্তি বলে।

যাহা হউক, এই চিত্ত বা অন্তঃকরণ বৃত্তির শক্তি অনুসারেই জ্ঞান উৎপত্তি হয়। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের সমান শক্তি থাকে না। ধৃতির অর্থাৎ ধারণা শক্তির, স্মৃতি শক্তির বা একাগ্রতা প্রভৃতি মনের শক্তির পরিমাণ সমান থাকে না। বুদ্ধিও সকলের সমান নহে। সাংখ্যদর্শনে যে অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তির কথা আছে, তন্মধ্যে একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের অশক্তি আর সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধির অশক্তি। সুতরাং এই অশক্তি হইতে আমাদের জ্ঞানের তারতম্য হয় (২) সকলের জ্ঞান সমান হইতে পারে না। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না। যে নির্ব্বোধ, সে দেখিয়াও দেখে না। যাহা হউক, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির এবং মনের কোনরূপ অশক্তি নাই, তাহারা সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা হইলেও প্রকৃত জ্ঞান উৎপত্তি হইবে, এরূপ বলা যায় না। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথা বুঝাইব।

সূর্য্যের আলোক আকাশ পথে আসিয়া

অন্তরায়। ইদং বা বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অহং বৃত্তিকে সম্ভব মত কমাইয়া লইতে হইবে। এই তত্ত্ব জর্ম্মন পণ্ডিত সপেনহর একরূপে বুঝাইয়াছেন—তিনি তাহার World as Will and Idea পুস্তকে বলিয়াছেন :—

"The individual is only the phenomenon ......every individual is on the one hand the subject of knowing *i. e.* the complemented condition of the possibility of the whole objective world, and on the other hand a particular phenomenon of the will ...but this double nature of our being does not rest upon a self-existing unity, otherwise it would be possible for us to be conscious of ourselves in ourselves and independent of the object of knowledge and will."

সপেনহর অন্যত্র বলিয়াছেন :—"But when some external cause or inward disposition lifts us suddenly out of the endless stream of willing, delivers knowledge from the slavery of the will—the attention is no longer directed to the motives of willing but comprehends thing, free from the relations to the will or personal interest, and as ideas but not as motives—then all at once peace comes to us of its own accord." সপেনহর আরও দেখাইয়াছেন যে, এই "Pure subject of knowing" প্রকৃত বাহ্যজ্ঞানের জননী, ইহাই art বা কলা বিদ্যার মূল।

(২) পাতঞ্জলদর্শনে আছে—ব্যাধি, স্ত্যান বা মনের অক্ষমতা, সংশয় প্রমাদ আলস্য অবিরতি বা বিষয় তৃষ্ণা, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব, দুঃখ দৌর্ম্মনস্য বা মনঃক্ষোভ, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এই সকল যোগের বিঘ্নকারী (১।৩০-৩১ সূত্র)। ইহাদের প্রায় সকল গুলিই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্নকারী।

পৃথিবীর সকল পদার্থে পতিত হয়। সেই আলোকে আলোকিত হইয়াই সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়। যখন সেই আলোক পাওয়া যায় না, তখন সকল পদার্থই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে—কিছুই প্রকাশিত হয় না। আবার সেই আলোক যদি ক্ষীণ হয়—তবে এই সকল পদার্থ আংশিক ভাবে বা অল্পান্ধকারে জড়িত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত যদি সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে মেঘ প্রভৃতির ন্যায় কোন আবরণ আসিয়া পড়ে—যদি সেই আবরণ নানারূপে অথবা বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হয়, তবে সেইরূপ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াই পদার্থ সকল প্রকাশিত হয়। আবার অনাবৃত চক্ষে আমরা যেরূপ দেখিতে পাই—চক্ষে চস্‌মা দিয়া সেরূপ দেখিতে পাই না—স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যে দ্রব্যের যেরূপ আকার দেখা যায়, চস্‌মা দ্বারা তাহা অপেক্ষাকৃত বড় বা ছোট দেখায়—স্পষ্ট বা অস্পষ্টতর দেখায়। আবার যদি চস্‌মা রঞ্জিত হয়—তবে তদনুসারে দ্রব্যগুলিও সেইরূপ রঞ্জিত দেখায়।*

আমরা চৈতন্যকে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় প্রকাশ স্বভাবযুক্ত মনে করিতে পারি। চৈতন্য হইতে জ্ঞানরশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই রশ্মিই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আসিয়া পদার্থ সকল প্রকাশ করে। যদি চৈতন্যের এই প্রকাশ শক্তি না থাকিত—তবে সহস্র সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াও পদার্থ সকল আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারিত না।

বেদান্ত পরিভাষায় আছে, চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রথা। ইহা অনাদি হইলেও অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহার অভিব্যঞ্জক। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব উপস্থিত হয়। একরূপে বলা যায় যে, তখন চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। তখন অন্তঃকরণ বৃত্তিতে জ্ঞানের উপচয় হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়াই 'আমি' জ্ঞান জন্মে। তখন অন্তঃকরণই চৈতন্যযুক্ত মনে হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথা বুঝান আছে। লৌহের দাহিকা শক্তি নাই। তাহা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দাহিকা শক্তি সম্পন্ন হয়। তখন লৌহ দগ্ধ করিতেছে এরূপ বলা যায়। তখন লৌহের বিশেষ ধর্ম্ম অনুভূত হয় না। অগ্নিযোগে দ্রবীভূত লৌহ, স্বর্ণ, সীসা সকল ধাতুই একরূপ বোধ হয়। সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন চৈতন্যযুক্ত হয়, তখন তাহার সহিত আত্মার অধ্যাস হওয়ায় আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি দ্রষ্টা এইরূপ মনে হয়। এই অনুভব মানস-প্রত্যক্ষ। এইজন্য মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে। এইরূপে জ্ঞাতা চৈতন্যের তিনরূপ আকার হয়, যথা প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য। প্রমাতৃ চৈতন্য অন্তঃকরণ রূপ, প্রমাণ চৈতন্য অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ, আর বিষয় চৈতন্য বাহ্যঘটাদি বিষয়রূপ। প্রথমে প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য অভেদ থাকে। যেমন তড়াগ হইতে জল পাত্রান্তরে গিয়া সেই পাত্রের রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ "তৈজস্‌" অন্তঃকরণ ও চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য বিষয়ে গিয়া তদাকার

---

* সে দিন কোন সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছিলাম যে, বিলাতে একটী স্ত্রীলোকের চক্ষু এরূপ ভাবে গঠিত যে, পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, আমরা সাধারণতঃ বস্তুর আকৃতি যেরূপ দেখি, সে তদপেক্ষা চল্লিশ গুণ বৃহৎ দেখে। আমাদের পরস্পরের মধ্যেও সম্ভবতঃ এইরূপ দৃষ্টির তারতম্য আছে। কিন্তু তাহার তুলনা সহজে সম্ভব নহে বলিয়া অনুমিত হয় না।

প্রাপ্ত হয়। সেই প্রমাতৃ চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য ও অভেদ। "আমি ইহা দেখিতেছি"—এইস্থলে "আমি" ও "ইহার" মধ্যে পার্থক্য আপাততঃ বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রমাতৃ সত্বা ব্যতীত অন্য সত্বা নাই। চৈতন্যই বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য চৈতন্য সত্বাই বিষয়ে আরোপিত বা অধ্যাসিত হয়। এই আরোপিত সত্বা ব্যতীত বিষয়ের অন্য স্বাধীন সত্বা অঙ্গীকার করা যায় না। সুতরাং প্রমাতৃ সত্বাতেই ঘটাদির সত্বা। তাহাদের স্বাধীন সত্বা অপরোক্ষ। আবার বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে যে কথা, আন্তর বিষয় সম্বন্ধেও সেই কথা। অন্তরে যখন তাপ শীত অনুভূত হয়—তখনও সেই তাপ শীতের চৈতন্যাতিরিক্ত সত্বা থাকা স্বীকার করা যায় না। বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ স্থলে তাহার রূপ, আকার ও পরিমাণ চক্ষুগোচর হয়। এই রূপাদি অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য এক। অতএব বলিতে হইবে যে, চৈতন্যাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে উপহিত প্রমাতৃ সত্বার অতিরিক্ত সত্বা নাই। চৈতন্য সাক্ষী। ইন্দ্রিয় অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারাই সাক্ষীত্ব। অহংকার—"অহং" আকার অন্তঃকরণ বৃত্তি মাত্র।

বেদান্ত পরিভাষার এই সকল কথা হইতে আমরা অন্তঃপ্রবাহের স্বরূপ একরূপ বুঝিতে পারিব। ইহা হইতে দেখা যায় যে, চৈতন্য অন্তঃকরণ বৃত্তির ভিতর দিয়া বাহিরে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। এখন স্বভাবতঃ এই অন্তঃকরণ বৃত্তি যদি স্বচ্ছ হয়, তাহা হইলে, চৈতন্যজ্যোতির বাহিরে গতি পক্ষে কোন বাধা জন্মায় না। কিন্তু যদি অন্তঃকরণ স্বচ্ছ না হয়, তাহা হইলে বিষয় বিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে চস্মার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে একথা বুঝা যাইবে, অথবা বলা যাইতে পারে যে, আলোক যেমন বিভিন্ন বর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকিলে—সে আলোক রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়, কিম্বা সেই কাচ নির্ম্মল ও সমতল না হইলে আলোক যেমন ছায়াযুক্ত বা ভঙ্গ ও বিকৃত হইয়া প্রকাশিত হয়,—প্রমাতৃ চৈতন্যও সেইরূপ বিষয় চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অন্তঃকরণ আবরণ দ্বারা বিকৃত ও রঞ্জিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে কতকগুলি দুর্ভেদ্য আবরণ রহিয়াছে। সেইজন্য জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি সহজে সম্ভব হয় না। এই জন্য আমাদের জ্ঞান স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, প্রমাণবৃত্তি যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেইরূপ জ্ঞানকে বদ্ধ করে, অর্থাৎ তাহা হইতে আমরা নির্ম্মল জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এস্থলে এই অন্তঃকরণবৃত্তির আবরণ কিরূপ, তাঁহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জল দর্শনে প্রমাণাদি আমাদের পাঁচ বৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে—সেই সকল বৃত্তি এই দর্শনমতে সাধারণতঃ ক্লেশজনক। অবিদ্যা বা ভ্রান্তবুদ্ধি, অস্মিতা বা সাধারণ অহংজ্ঞান, রাগ দ্বেষ, ও অভিনিবেশ ইহাই অন্তঃকরণ বৃত্তির ক্লেশের কারণ। সুতরাং পাতঞ্জল-মতে অন্তঃকরণবৃত্তি সাধারণতঃ মলিন—ইহা প্রকৃত জ্ঞানপ্রবাহকে অল্লাধিক পরিমাণে আবরণ করে। একটী আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত হইতে এই কথা বুঝা যাইবে। তড়িত শক্তি যে তারপথে গমন করে, সেই তারে অল্লাধিক পরিমাণে এই গতি বাধা প্রাপ্ত

হয়। এই বাধার পরিমাণ অধিক হইলে, তড়িত শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। সেইরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি যদি জ্ঞানপ্রবাহে বাধা উৎপাদন করে, তবে সেই বাধার পরিমাণ অনুসারে জ্ঞানপ্রবাহও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ভগবদ্গীতাতে আছে, আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকার বা ইন্দ্রিয় সকলই জড় প্রকৃতিজ। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। যাহাদের প্রকৃতি রাজসিক বা তামসিক—তাহাদের অন্তঃকরণও সেইরূপ। সেরূপ অন্তঃকরণে জ্ঞানপ্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ। কেবল যাহাদের চিত্ত সাত্বিক, তাহাদেরই জ্ঞানপ্রবাহ সম্ভব। এই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে, "সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং"। * পূর্ব্বে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বৌদ্ধ দর্শনে এই অন্তঃকরণ বৃত্তির কথা বিশদ করিয়া বুঝান আছে। এই দর্শন মতে আমাদের অন্তঃকরণ পঞ্চ স্কন্ধযুক্ত বা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, ও সংস্কার এই—পাঁচ স্কন্ধ। ইহারাই সংহত হইয়া সমস্ত আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহ করে। ইহারাই অন্তঃকরণ বৃত্তি। ইহার মধ্যে রূপ—বাহ্যজ্ঞেয় বিষয় মাত্র। বেদনা—সুখ দুঃখানুভূতি। আর সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহাই জ্ঞানবৃত্তির মূল। অতএব সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানানুসারেই আমাদের অন্তঃকরণবৃত্তি রক্ষিত হয়। ইহারা জ্ঞানকে কিরূপে রঞ্জিত করে, তাহা এস্থলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। (১)

এস্থলে সংজ্ঞা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। আমরা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই বাহ্য বিষয় গ্রহণ করি। এই পাঁচ ইন্দ্রিয় সাধারণতঃ পাঁচরূপ গুণ গ্রহণ করিতে পারে। চক্ষু কেবল রূপ, আকৃতি ও পরিমাণ গ্রহণ করে; কর্ণ কেবল শব্দ গ্রহণ করে। নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে; জিহ্বা স্বাদ বা রস গ্রহণ করে; ত্বক্ কেবল স্পর্শ বা বাধা অনুভব করে। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়গণ যখন এই সকল শক্তি লইয়া বাহ্য বিষয় গ্রহণ

---

* এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর সপেনহর বলিয়াছেন,—

"We may theoratically assumed *three* extremes of human life, and treat them as its elements. *viz*—(1) *Rajaguna*—the powerful will, the strong passion. It appears in great historical characters, and in the little world. (2) *Satwaguna*—pure knowing, the comprehension of the Ideas—conditioned by the freeing of knowledge, from the service of the will—the life of genius. (3) *Tamaguna*—the greatest lethargy of the will and of the knowledge attaching to it, empty longing, langour, life-benumbing langour. The life of the inivdidual is seldom fixed in one of these extremes but is a waring approch to one or the other."

World as Will and Idea, vol. I. Sec. 58.

(১) "যাহাদিগের দ্বারা বিষয় দর্শন হয়, সেই সবিষয় ইন্দ্রিয়গণই রূপ স্কন্ধ; আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি বিজ্ঞান প্রবাহই বিজ্ঞান স্কন্ধ; উক্ত স্কন্ধদ্বয় সম্বন্ধ জন্য সুখ দুঃখাদি প্রত্যয় প্রবাহই বেদনা স্কন্ধ; আর "গো" ইত্যাদি (জাতিবাচক) শব্দোল্লেখী সবিজ্ঞান প্রবাহই সংজ্ঞা স্কন্ধ, এবং বেদনাস্কন্ধ নিবন্ধন, রাগদ্বেষাদি ক্লেশ ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মই সংস্কার স্কন্ধ। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)।

বিলাতী পণ্ডিত রিজডেভিড্ কৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকে পাওয়া যায় যে, রূপ অর্থে immaterial, properties, qualities or attributes, চারি ভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা, দুই লিঙ্গ, চিন্তা, প্রাণ ও দিক এই তিন মূলিকার্থ ভঙ্গী বাক্য ও পদার্থের সাত গুণ—ইহাই রূপ। বেদনা বা—sensation ছয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট ও স্বথজ ভেদে অষ্টাদশ প্রকার। সংজ্ঞা abstract ideas ছয় ইন্দ্রিয় অনুসারে ছয় প্রকার। সংস্কার বা tendencies or potentialities সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ প্রকার এবং বিজ্ঞান বা Knowledge সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯ প্রকার।

করিবার জন্য বহির্ম্মুখী হয়, তখন ইহারা বাহ্য দ্রব্যের কেবল এই পাঁচ গুণই গ্রহণ করিতে পারে। তাহাদের যদি অন্য কোন গুণ থাকে, যাহা এই পাঁচ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে অশক্ত, তবে সেই গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। আমরা আরও বলিতে পারি যে, এই সকল দ্রব্যের প্রকৃত গুণ কি, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-শক্তিই তাহাদের এইরূপ পাঁচ গুণে ভূষিত করে এই মাত্র। যেমন নির্ম্মল দর্পণে আমাদের মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা দর্পণ দেখিতে পাই না—কেবল তাহাতে পতিত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, সেইরূপ বাহ্য কোন অজ্ঞাত বিষয়রূপ দর্পণে আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুণই প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের কি গুণ, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে,বাহ্য পদার্থের যাহাই কেন সত্ত্বা থাকুক না, তাহার স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। তাহার উপর আমরা যেরূপ আবরণ দিই, সেই আবরণে আবৃত হইয়া—অবগুণ্ঠিত হইয়াই তাহারা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহাদের স্বরূপ কিছুতেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। ইন্দ্রিয় তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। চক্ষু গিয়া সেই বাহ্য পদার্থকে আকার, রূপ, বর্ণালঙ্কার দান করে,কর্ণ তাহাকে শব্দালঙ্কার দেয়, নাসা তাহাকে ঘ্রাণ দেয়, জিহ্বা তাহাকে রস দেয়, ত্বক্ তাহাকে স্পর্শ দেয়। তাহার পর ঐ পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের রূপগ্রহণ শক্তি, রসগ্রহণ শক্তি, গন্ধগ্রহণ শক্তি, শব্দ গ্রহণ শক্তি ও স্পর্শগ্রহণ শক্তি হইতে আপনার উপযুক্ত শক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাই প্রতিবিম্বিত করিয়া ইন্দ্রিয়কে উপহার দেয়। সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়দত্ত নানা গুণে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া—আপনাকে অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় এক অর্থে আপন প্রতিবিম্বই আপনি গ্রহণ করে। এইজন্য বেদান্ত পরিভাষায় বলা হইয়াছে, বিষয়চৈতন্য ও প্রমাণচৈতন্য একই।

এই তত্ত্বের মধ্যে যে অনেক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহারা অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে দেখাইয়াছেন যে, বাহ্যজগতে কেবল শক্তিক্রিয়া কেবল গতি। এক অনন্ত অদ্ভুত বিশ্বব্যাপী শক্তিতরঙ্গ সর্ব্বদিক তরঙ্গিত। তাহারই তরঙ্গ আমাদের ইন্দ্রিয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই তরঙ্গে রূপ নাই, বর্ণ নাই, গন্ধ, শব্দ কিছুই নাই। একরূপ তরঙ্গস্পর্শে আমাদের বর্ণ জ্ঞান হয়—আর একরূপ তরঙ্গ স্পর্শে শব্দ জ্ঞান হয়। বিশ লক্ষ কোটী আলোকতরঙ্গ এক অনুপল মধ্যে চক্ষুতে আঘাত করিলে রক্ত বর্ণের জ্ঞান হয়। ত্রিশ লক্ষ কোটী তরঙ্গের আঘাতে বেগুণে বর্ণের জ্ঞান হয়। প্রতি অনুপলে পাঁচ শত বা পাঁচ সহস্র তরঙ্গ আঘাত হইলে তাহা চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না। কেবল কর্ণই তাহা গ্রহণ করে ও তাহার ফলে শব্দজ্ঞান হয়। ইহার অধিক তরঙ্গাভিঘাত হইলে কর্ণও তাহা শ্রবণ করিতে পারে না,তাহা তাপ রূপে বা সাধারণতঃ স্পর্শ রূপে কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, বাহ্যপদার্থ যাহাই কেন হউক না,আমরা তাহা যেরূপে প্রত্যক্ষ করি, তাহা কখনও সেরূপ নহে। তাহাদের প্রকৃত

স্বরূপ আমাদের নিকট কখন প্রকাশিত হয় না। (১)

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, এই অন্তরস্কন্ধ সংজ্ঞা হইতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় মধ্যে একটা আবরণ পতিত হয়। এই আবরণ জন্য জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। তাহার পর এই সংজ্ঞার অনুরূপ সংস্কার জন্মে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সংস্কার যেরূপ হউক, বদ্ধমূল হইয়া যায়। প্রথমে বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয়। সেই স্পর্শ হইতে বা মাত্রাস্পর্শ হইতে কতকগুলি সংস্কার উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে বেদনা অর্থাৎ সুখজ বিষয়ে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি ও দুঃখ বিষয়ে বিরক্তি জন্মে, ও তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে সুখ দুঃখ বিষয়ে একরূপ সংস্কার জন্মে। তাহার পর সংজ্ঞা সকলের অন্বয় ব্যতিরেকাদি হইতে চিন্তাপ্রবাহ জন্মে। বৌদ্ধদর্শন মতে ইহাই চেতনা, তাহার পরিপাক মানসীকার, এবং শেষ স্মৃতি। ইহা ব্যতীত একাগ্রতা, বিতর্ক, বিচার, জীবিতেন্দ্রিয়, বীর্য্য, অধিমোক্ষ, ছন্দ, মহায়তা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, প্রভৃতি আরও কতকগুলি মনের শক্তিকে সংস্কার বলে।

এই সকলগুলি দ্বারাই আমাদের বিষয় জ্ঞান বা জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞান অল্পাধিক পরিমাণে আবৃত হয়। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান আমাদের প্রবৃত্তি দ্বারা ও এই সকল সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত হয়, আমরা পরে দেখাইব যে, এই প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাধারণতঃ বিশ্বাস বলে। এইজন্য বিশ্বাসকে প্রকৃত জ্ঞানের সহায় বলা যায় না। তাহাও পরে বলা যাইবে।

এই সংস্কার অনুরূপ "বিজ্ঞান" এই সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়। এক ভাবে ধরিলে তাহাকেই বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ বিজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানের সহায় না হইয়া তাহার একরূপ আবরক হয়, তাহা বলিতে পারা যায়। যাহা হউক, যত দূর বলা হইল, ইহা হইতে অন্ততঃ এই টুকু বুঝা যাইবে যে, যে অন্তঃকরণপথে জ্ঞানপ্রচার হয়, যাহার দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই অন্তঃকরণ স্বচ্ছ নহে। তাহা যেমন একভাবে দেখিলে জ্ঞানোৎপত্তির সহায় বলা যায়, অন্য ভাবে দেখিলে, তাহাকেই জ্ঞানের আবরক বলা যায়। এই অন্তঃকরণ বাধা জন্যই জ্ঞেয়জগৎ হইতে জ্ঞাতার সিদ্ধান্ত করা যায় না। আবার জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় জগতের সিদ্ধান্ত হয় না। পূর্ব্বে যেমন দেখাইয়াছি যে, বহিঃপ্রবাহ বা প্রতিলোম গতি মাত্র স্বীকার করিলে, শেষে আত্মঘাতী হইতে হয়, সেইরূপ কেবল অন্তঃপ্রবাহ বা অনুলোম গতি হইতে বাহ্যবিষয় শূন্যতা স্থির করিতে হয়।

আমরা পূর্ব্বে বেদান্তপরিভাষা হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা

(১) বিলাতী পণ্ডিত রোমানিজ তাঁহার রিড্ লেক্‌চারে বলিয়াছেন,—

It is a demonstrated fact that all our knowledge of the external world is of necessity only a knowledge of motion, and implies some kind of motion agitation or alteration which worketh in the brain. For all the forms of energy are now proved to be modes of motion, and even matter if not in its ultimate constitution vortical motion, at all events is known to us as changes of motion.

পণ্ডিত হব্‌স্ (Hobbes) বলিয়াছেন,—

"All the qualities called sensible are—in the object which causeth them—but so many motions of matter by which it presseth upon our organs diversely."

হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে, কেবল অন্তঃপ্রবাহ স্বীকার করিলে বাহ্যসত্বা সিদ্ধান্ত হয় না। (২) চৈতন্য স্বত্বাই বিষয়াকার হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়, ইহাই ধারণা হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তকে স্বপ্নবাদ বা মায়াবাদ বলা যায়। এই মায়াবাদ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। বাহ্যজগৎসত্বা যে কেবল চৈতন্য সত্বার অভিব্যক্তি, এই কথা ঠিক্ মায়াবাদ নহে। জ্ঞেয় জ্ঞাতার ছায়া বা প্রতিবিম্ব অথবা ইদং অহং এর এক প্রকার অভিব্যক্তি, এই বাদই প্রকৃত মায়াবাদ। চৈতন্যসত্বাবাদ এক হিসাবে অদ্বৈতবাদ—তাহা পরে বুঝা যাইবে। যাহা হউক, এ স্থলে মায়াবাদ সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। মায়াবাদে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। দেশ বা স্থান ও কাল আধারে এই জগৎ স্থাপিত। মায়াবাদ মতে এই দেশ কালও আমাদের একরূপ সংস্কার বা বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র। বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। অতি প্রাচীন কালেই যে দিক্ কালের অনস্তিত্ববাদ প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে অনুগীতার শ্লোক

(২) অন্তঃপ্রবাহ হইতেই বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শন চারি প্রকার। তন্মধ্যে মাধ্যমিকগণ সর্ব্বশূন্যবাদী ও যোগচারীগণ বাহ্য শূন্যবাদী। ইঁহারা কিরূপে বাহ্যপ্রবাহ হইতে বাহ্য অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাহা এস্থলে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ হইতে সংক্ষেপে দেখান হইল—

"বুদ্ধি দ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থের স্বভাব অবধারণ করা যায় না। * * জ্ঞানগ্রাহ্য অর্থ ভাবপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ উৎপন্ন পদার্থের স্থিতি নাই। * * সুতরাং তৎস্বরূপ বুদ্ধি স্বয়ংই আত্মরূপে প্রকাশ পায়। যেমন সূর্য্য আপনি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বস্তু বিষয়ক বুদ্ধিও স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, বুদ্ধির অন্য অনুভাবনীয় কিছুই নাই, এবং বুদ্ধির ও অপর অনুভব অসম্ভব; তবে গ্রাহ্য ও গ্রাহকের বৈচিত্র্য বশতঃ স্বয়ংই বুদ্ধি প্রকাশ পায়। * গ্রাহ্য গ্রাহক (অহং ও ইদং) এই উভয়ে অভেদ। গ্রাহ্য গ্রাহক জ্ঞানের যে পৃথক্ প্রকাশ হয়, তাহা এক চন্দ্রেতে দ্বিত্ব জ্ঞানের ন্যায় ভ্রম মাত্র। যাহারা বিপরীতদর্শী, তাহাদিগের পক্ষে বুদ্ধি ও আত্মার অবিভাগ গ্রাহ্য গ্রাহক জ্ঞানের ভেদ বিশিষ্টের ন্যায় বোধ হয়।......বুদ্ধিই অনাদি বাসনা বশতঃ অনেকাকারে প্রকাশ পায়। ভাবনা বলে (যোগে) বাসনার উচ্ছেদ হইয়া বুদ্ধির বিবিধ বিষয়াকারতা নিবৃত্তি হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের 'মহোদয়' হয়।

"জ্ঞানের যে আন্তরিকত্ব তাহাও বাহ্য পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। .... জ্ঞানাকারে জ্ঞেয়পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে।"

এই অন্তঃপ্রবাহ হইতে যে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না—তাহা জর্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট অতি বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে বড় জোর আমরা বুঝিতে পারি যে, বাহ্যজগতে কি এক অজ্ঞাত সত্য আছে। কিন্তু তাহার স্বরূপ কি, তাহা আমরা কোন রূপেই জানিতে পারি না।

শুধু তাহাই নহে, ক্যাণ্ট আরও দেখাইয়াছেন যে, এই আন্তরপ্রবাহ ধরিয়া কি আত্মতত্ত্ব, কি ঈশ্বরতত্ত্ব, কি জগৎতত্ত্ব কোন তত্ত্বেই উপনীত হওয়া যায় না। তিনি ইহাকে Antinomy of Pure reason বলিয়াছেন।

ক্যাণ্টের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সপেনহর বলিয়াছেন—

"The truth which Kant propounded is also a leading doctrine of the Vedas and Purans—the doctrine *Maya* by which really nothing else is understood than what Kant calls Phenomenom in opposition to the thing in-itself:-for the work of *maya* is said to be just the visible world in which we are, a summoned enchantment, an inconstant appearance without true being like an optical illusion or dream, a veil which surrounds human consciousness, something of which it is equally false and true to say that it is ; and that it is not."

World as Will and Idea, vol. II. p. 9.

সপেনহর আরও বলিয়াছেন,—"It was reserved for Kant to ennoble the idealistic point of view to obtain the ascendancy in Europe in philosophy at least the point of view, which througout all non-mahomedan Asia and indeed essentially is that of religion." (Do).

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। অনুগীতায় আছে—

"দেশ কালাবুভৌ কেচিৎ নৈতদস্তীতিচাপরে।"

অর্থাৎ 'কেহ বলিত দেশ কাল উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কেহ বলিত, অস্তিত্ব নাই।' তাহার পর এই দেশ কাল ও বাহ্য জগতের অনস্তিত্ববাদ অর্থাৎ জ্ঞানের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, এই মত এক শ্রেণীর বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষ রূপে অবলম্বিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনে ইহাকে বিজ্ঞানবাদ বলে। ইহাই যোগাচার। বৌদ্ধ দর্শনে আছে "আকার সহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্ত সম্মতা।" ইহাদের মতে, এক সন্তানবর্ত্তী বাসনা সমূহই আলয়বিজ্ঞান। জ্ঞানের কদাচিদকত্ব নির্ব্বাহার্থ শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও গন্ধের বিষয় সকল সুখাদির বিষয় এবং ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ এই সমুদয়ই চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়ের অন্তর্গত হইয়া উৎপন্ন হয়। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

এই মত বেদান্ত দর্শনে "না ভাব উপলব্ধে" (১।২।২৮) এই সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই বিজ্ঞানবাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানবাদে প্রমাণ প্রমেয়(প্রমাণের বিষয়)ফল সমস্তই অন্তরে, কিছুই বাহিরে নহে। ঐ সকল বুদ্ধ্যারূঢ় রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন বা উৎপন্ন করে। যখন বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত কোনও বাহ্য পদার্থে প্রমেয়ত্বাদি ব্যবহার হয় না, তখন বিবেচনা করা উচিত; প্রমেয়সকল বুদ্ধিরই আকার বা পরিবর্ত্তন বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ নহে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু নাই। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞানের বিষয়াকার হওয়া মানিলে বাহ্য বস্তু স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র জ্ঞানের প্রকার ভেদ দ্বারা সমস্ত বাহ্য বস্তু নির্ব্বাহ হইতে পারে। আরও দেখা যায় যে, জ্ঞানের ও বিষয়ের সহোপলব্ধি নিয়ম আছে। * * * সেই নিয়মের দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান এ দুয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। * * * জ্ঞান পূর্ব্বক্ষণে বাহ্য বস্তাকার হইয়া, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রূপ ধারণ করে। বাহিরে কিছুই নাই। অথচ অন্তঃস্থ জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নদর্শন, মায়াদর্শন, মরীচিকা দর্শন, শূন্যে গন্ধর্ব্বনগর দর্শন, ইত্যাদি। বিচিত্র বাসনা প্রভাবে বিচিত্রজ্ঞান জন্মিতে পারে। এ সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি—এতদন্তঃপাতী বিজ্ঞান ও সংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য। তদনুবলে জ্ঞানবৈচিত্র অবধারণীয়। অন্বয় ও ব্যতিরেকে এই দ্বিবিধ যুক্তি দ্বারা স্থির হয়—বাসনাই কোন বৈচিত্রের কারণ।'

(পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানুবাদ)

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে দেশ কালের বাহ্য অনস্তিত্ববাদ বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না। এই তত্ত্ব আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে ক্যাণ্ট পুনঃ প্রচার করিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছেন। কিন্তু এ তত্ত্ব অতীব প্রাচীন। আন্তর প্রবাহ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে অবশেষে দেশ কাল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হইবে। এবং বাহ্যজগতের অস্তিত্বও অস্বীকার করিতে হইবে। এই ফল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বার ভুঞা।

ঈশাখাঁ মসনদ্ আলি। (১)

বঙ্গদেশ যবন করতলগত হইবার পর, বিক্রমপুরের রাজশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া, সোণার গাঁয়ে সংস্থাপিত হয়। প্রবাদ, শেষ হিন্দু-রাজা দ্বিতীয় বল্লাল বা পোড়ারাজা বাও আদম নামে একজন মুসলমান সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করেন। পোড়া রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রক্ষিত বার্ত্তাবহ কপোত তৎপূর্ব্বেই উড্ডীয়মান হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হয়। তদৃষ্টে রাজ-পরিজনেরা রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। পরে রাজা সেই সকল বিষয় অবগত হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ইউরোপখণ্ডের যুদ্ধবার্ত্তা বহন জন্ম কপোতের ব্যবহার দেখা যায়, আমাদের দেশেও উহা বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপে শেষ হিন্দু স্বাধীনতা বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে পর, সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে পরিণত হয়।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারী "রালফ ফিচ" ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণ গ্রামে ঈশাখার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, মেঘনা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে রাজাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী শ্রীপুর (বিক্রমপুর) হইতে ১৮ মাইল ব্যবধান সোণার গাঁয়ে ঈশাখাঁর রাজধানী ছিল। খাঁ সাহেব খ্রীষ্টান দিগকে বড়ই যত্ন করিতেন। তাঁহার অধীনে কতকগুলি ভূম্যধিকারী ছিল, তত্রত্য অধিবাসীরা তৃণাচ্ছাদিত ঘরে বাস করিত, অধিকাংশ লোক মাংসভোজী ছিল না। 'প্রাণী বধ করা মহাপাপ' ইহা তাহা-দিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল। দুগ্ধ, অন্ন, ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া লোকে জীবন-ধারণ করিত। সুবর্ণ গ্রামে অনেক ধনী লোক বাস করিতেন, ধনী দরিদ্র নির্ব্বি-শেষে সকলেই অল্প পরিসর ধুতি পরিধান করিত, চাউল, কাপড়, এই স্থান হইতে পেগু, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত।

---

(১) এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালের ৩০ আষাঢ়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত হয়। সভার সমা-লোচনা এস্থলে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; তবে এতৎসম্বন্ধে ঐ দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহাশয় যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি প্রয়োজনীয়। এই কথার উত্তরে আমি জানাইতেছি, প্রত্যেক পংক্তিতে চিহ্ন দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের বা গ্রন্থের নাম উল্লেখ আধুনিক ব্যবহার ও বহুদর্শিতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। যাঁহারা বহুদর্শী, একমাত্র তাঁহারাই এরূপ স্পর্দ্ধাবলম্বন করিতে পারেন। আমাদের মত ক্ষুদ্র লেখকদিগকে অনেক বিষয়ে বেড়াইয়াই সংগ্রহ করিতে হয়। স্থানীয় দৃশ্য ও প্রবাদ কথাই আমাদের প্রধান অবলম্বন; তৎপরে সুযোগ পাইলে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানীয় দৃশ্য ও প্রবাদের উপরই অধিক নির্ভর করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাক্তার ওয়াইজ লিখিত এসিয়াটীক জার্ণেলের ৪৩ সংখ্যার বারভূঞা এবং ষ্টুয়াটের ও রাজকৃষ্ণ রায়ের ইতিহাস হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকা-দেশের 'ইবন চতুতা' নামক পর্য্যটক দুর্ভেদ্য দুরাক্রম্য সোণার গাঁ নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় যাবাদ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্য-জাহাজ সকল দর্শন করিতে পান। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে 'সার্ জন হারবার্ট' সোণার গাঁ, বাকলা, শ্রীপুর ও চাটি গাঁ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরী সকলের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে 'পিটার হেলেন' সোণার গাঁকে একটী দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা যে বাকলা, শ্রীপুর, সোণার গাঁ প্রভৃতিকে দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত নহে। কারণ এই স্থানগুলির চতুর্দ্দিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায়, ঐ সকলকে দ্বীপ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

এই সুপ্রসিদ্ধ স্থান গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ফিরোজ সাহের আদেশে তৎপুত্র বাহাদুর সাহ কর্ত্তৃক ১৩১১ খ্রীঃ অব্দে আক্রান্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত শেষ হিন্দুরাজা এই যবনরাজের করদরাজ রূপে সোণারগার শাসন পরিচালন করিতে স্বীকৃত হন। বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিহাবুদ্দিনকে তাড়াইয়া সিংহাসনারূঢ় হইলে, সিহাবুদ্দীন দিল্লীশ্বর গিয়াসুদ্দীনের শরণাপন্ন হন। সম্রাট বাহাদুরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করায় ঢাকার নিকটবর্ত্তী আবদুল্লাপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। বাহাদুর ও শেষ হিন্দু করদ রাজা একমতাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া রাজা নিহত এবং বাহাদুর বন্দীকৃত হইলেন। এই সময়েই পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রথম দিল্লীশ্বরের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। ১৩২০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৩২৪ খ্রীঃ অব্দের কোন সময় মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

আজিও পূর্ব্ববঙ্গে গাজির গীত শ্রুত হওয়া যায়, তাহাতে পোড়ারাজার পরে গয়েস্, তৎপর সিকন্দর, তৎপরে বরণগাজি তৎপর কালুর নাম গ্রথিত হইয়াছে। ইঁহারা প্রায় সকলেই সুবর্ণ গ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালু একজন হিন্দুসন্তান, পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বদেশের যাবতীয় গোপনীয় বিষয় মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া দেশ আক্রমণ করতঃ অনায়াসে উহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়। মুসলমানেরা ফকির ও ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া এই দেশের যাবতীয় গুপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিত, পরে সুযোগ বুঝিয়া অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। শ্রীহট্টে ৩৬০ জন ফকিরের সাহায্যে ফকির সাহা জালাল, মুসলমান জয়পতাকা তদ্দেশে উড্ডীন করেন। এই ফকিরেরাই গাজি নামে বিখ্যাত ছিল।

গাজি পঞ্চকের নাম—গয়েস দি (বাদসাহ গয়েস্ উদ্দিন্), সমস্দি (পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দিন), সিকন্দর (প্রসিদ্ধ বাদসাহ, যাঁহার দ্বারা দেশে জরিপের প্রথা সৃষ্ট হয়), গাজি (ধর্ম্মযোদ্ধা গাজিসাহ), কালু (হিন্দুকুলাঙ্গার ফকির ও গাজি সাহার মন্ত্রী সহচর)। পিতা সেকন্দরের বর্ত্তমানেই গাজিসাহ মুকুটরাজার কন্যা চম্পাবতীর পাণিগ্রহণ করেন, পরে তথা হইতে ক্রমশঃ ভাটির দিকে অগ্রসর হন। একদিকে ধর্ম্ম ও অন্যদিকে রাজ্য বিস্তারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। নোয়াখালিও বাখরগঞ্জ

প্রভৃতি ভাঁটি প্রদেশে এই সময়ে বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই জন্য ঐ সকল স্থানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে অত্যধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাঁচ গাজির পাঁচটী মসজিদ, নেমাজের জন্য সোণারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুরাজগণের রাজ্য বিলোপ হইলে, সমসুদ্দিন ফিরোজসাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রথমত সুবর্ণগ্রামের টাঁকশালে প্রস্তুত হয়।

বাহাদুর পুনর্ব্বার সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। পরে স্বনামে মুদ্রা প্রচার ও শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করেন। এইজন্য সম্রাট তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইভান চটুটা বলেন, অকৃতজ্ঞ নরাধম শাসনকর্ত্তাদিগকে সাবধান করিবার জন্য, তাহার চর্ম্ম তৃণ পরিপূর্ণ করিয়া, সুবর্ণগ্রামে প্রদর্শন ও গৌড় এবং সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। ১৩৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাহাদুরসাহ সুবর্ণগ্রামে শাসন করিয়াছিল। এতৎপাঠে প্রতীতি হয়, তৎসময়ে গৌড়, সপ্তগ্রাম ও সোণারগাঁ, এই তিন স্থানে পৃথক তিন জন শাসনকর্ত্তা থাকিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতেন।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর তদীয় বর্ম্মবাহক ভ্রাতার, "বহরম খাঁ" উপাধি গ্রহণ করিয়া, সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৩৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তৎপর ফকির উদ্দিন, 'সুলতান সেকন্দর' উপাধি ধারণ করিয়া, ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম শাসন করেন। তৎপরে ১৩৫৩ খ্রীঃ অব্দে মুজাফর গাজিসাহ, সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদনন্তর ইলিয়াস্ খাজে সুলতান সমসুদ্দিন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। সম্রাট, এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া, তদ্বিরুদ্ধে আগমন করিয়া, নবাব সোণার গাঁর অন্তর্গত সুদৃঢ় একডালার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট্ উহা সহজে হস্তগত করিতে পারেন না। পরে সন্ধি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সমসুদ্দিনের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সেকন্দর সাহ; সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সম্রাট্ পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু বাদসাহ এইবারও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ৪৮ হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া ১৩৫৯ খ্রীঃ অব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইল। সেকন্দর একডালায় অবস্থিতি করিতেন, ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশ জরিপ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য শ্রুত হওয়া যায়। যথা,—

"আগ লাকড়ি, তোমৃকি পাকড়ি,
তোম্‌কে কে লেখা, হামকে সেকন্দর বাদস লেয়া,
তোম ক্যা করণে কো, হাম জারিপ করণে কো।"

সেকন্দরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গয়েসুদ্দিন, ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। এতদ্ভিন্ন গিয়াস সম্বন্ধে আর কোন দুর্নাম শ্রুত হওয়া যায় না। এই নবাব অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পারসিক কবি হাফেজকে, এদেশে আনয়ন জন্য ইনি যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই নবাব অতি সুবিচারক ছিলেন। জাতিগত বিদ্বেষ তাঁহার কিছু মাত্র ছিল না। একদা তীর পরিচালনা কালে, নবাব নিক্ষিপ্ত একটী তীর কোন দরিদ্র বিধবার একটী মাত্র পুত্রের চক্ষে প্রবিষ্ট হয়। ঐ বিধবা এইজন্য নবাবের বিরুদ্ধে কাজির নিকট অভিযোগ

উপস্থিত করে। কাজি প্রথমতঃ এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়া পরে ধর্ম্মের উপর নির্ভর করত নবাবের নামে শমন বাহির করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবাব বাহাদুর কাজির বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষী গ্রহণান্তে কাজি নবাবকে দোষী বলিয়া স্থির করেন। তখন নবাব বাহাদুর সাহ, কাজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি তোমার বিচারে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি অন্যায় বিচার করিতে, তবে আমার এই হস্তস্থিত অস্ত্র তোমার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিত। তখন ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক কাজিও সদম্ভে বলিল, যদি এই ধর্ম্মাধিকরণে নবাব সাহেব আমার এই বিচারের প্রতিকূলতায় কোন রূপ অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তবে আমার হস্তস্থিত এই ন্যায় যষ্টিও নবাব সাহেবের পৃষ্ঠদেশে নিপতিত হইত। বলা বাহুল্য, পরে ঐ বিধবাকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া নবাব সাহেব পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, মুসলমান রাজত্ব সময়ে একেবারে ন্যায় বিচার ছিল না, তাঁহারা একবার এই বিষয়টীর উপরে মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, তবেই তাঁহাদের সেই কুবিশ্বাস অনেকটা সংশোধিত হইতে পারিবে। গয়েসের পরে তৎপুত্র সইস্‌উদ্দিন হামদ সা দশ বৎসর এবং পৌত্র সমসুদ্দিন দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ১৪০৫ খ্রীঃ অব্দে পশ্চিম বঙ্গের রাজা গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করায় তদ্বংশীয়েরা ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজত্ব করেন। তৎপর ইলিয়াস সাহি এবং তদনন্তর হাবাসিরা এদেশে কতকটা রাজত্ব করিলে পর, ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে, সৈয়দ আলানুদ্দিন হোসেন সাহ, সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫২১ বা ২৩ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পরে আর কোন নবাব সুবর্ণ গ্রামে অবস্থান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

আলালুদ্দিন সাহের রাজত্ব সময়ে ১৪৯৪ হইতে ১৫২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে অযোধ্যানিবাসী কালিদাস গজদানি বাণিজ্য বা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়া পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ আলি।

যৎকালে ঈশা খাঁ অভ্যুদয় লাভ করেন, তৎসময়ে মোগল শাসনাধীনে ভারত পরিচালিত হইতেছে। পাঠানেরা এই সময়ে দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়াছে, উড়িষ্যা তখন একমাত্র তাহাদের আশ্রয় স্থান। বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে সংস্থাপিত ছিল। মোগল রাজপ্রতিনিধি তথায় থাকিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। এই সময়ে প্রতি পরগণায় ভূম্যধিকারী প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 'ভূঞা' আখ্যা প্রাপ্ত হন। এক এক ভূঞার অধীনে বহু পরগণা ন্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রতি সরকারে এক এক জন কালেক্টর ও ফৌজদার নিযুক্ত থাকিয়া রাজস্ব আদায় ও বিচারকার্য্য সম্পাদন করিত।

এই সময়ে সোণার গাঁ সরকারে ৫২টী মহাল ছিল। ঈশা খাঁ খিজিরপুর মহালের ভার প্রাপ্ত হন। সহর সোণার গাঁ বা মরু সহর রাজধানী ছিল, সর্ব্বসাধারণে তাহাকেই সুবর্ণ গ্রাম বলিত। সরকার সোণার গাঁ সম্বন্ধে আইন আকবরীতে যে যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। "সোণার

গাঁ সরকারে কাসা নামে এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই সরকার মধ্যে কাটা সুন্দর নামক একটী জলাশয় আছে। সেই জলাশয়ের জলে মলিন বস্ত্র ধৌত করিলে, তাঁহা তৎক্ষণাৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে।” সোণার গাঁ হইতে রাজকর ব্যতীত সম্রাট ইচ্ছামত ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ গজারোহী, ও ৪৬০০০ পদাতিক প্রাপ্ত হইতেন। এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে শাসনকর্ত্তা প্রচুর জায়-গীর প্রাপ্ত হইতেন।

আকবর বাদসাহের রাজত্ব কালে, বাঙ্গা-লার বারভূঞারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এইরূপ পরা-ক্রমশালী হইয়া উঠিলেন যে, বাদসাহের প্রতিনিধিকে আর মান্য করিয়া চলিতেন না। এই সময়ে ঈশা খাঁ, খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ,কলাগাইছা নদীর তীরে ও অন্যান্য স্থানে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন একডালা ও সুবর্ণ গ্রামের উত্তরবর্ত্তী এগার সিন্দুর দুর্গ দুরাক্রম্য করিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে সহর সোণার গাঁয়ের শাসনকর্ত্তা, এই ভূঞা দলের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক রাজধানী খিজিরপুরে সুদৃশ্য অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়া, উহার যথেষ্ট শ্রীসম্পাদিত করিয়াছিল। ভজনা-লয় এবং অন্যান্য কীর্ত্তির নিদর্শন সকল অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার অধিকাংশ ভগ্ন ও কতকগুলি একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সহর সোণার গাঁর শাসনকর্ত্তা বিতাড়িত হইলে, ঈশা খাঁ তৎসন্নিহিত স্থানগুলির, উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আকবর বাদসাহের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, তিনি ঈশা খাঁকে ধৃত করিবার জন্য ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঈশা খাঁকে মোগল সেনাপতি কোন ক্রমে পরাস্ত করিতে পারেন না। সাহাবাজ বিফলমনোরথ হইলে, এই জন্য বাদসাহের আদেশ মত রাজপুত বীর মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণ গ্রাম আক্রমণ করেন।

এই সময়ে ঈশা খাঁ একডালার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ ঐ দুর্গ অবরোধ করেন। এদিকে ঈশা খাঁর সৈন্যগণ, ক্রমে তাহার দল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। খাঁ সাহেব অনন্যোপায় হইয়া, অগত্যা মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রবাদ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে মানসিংহের জামতা ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক হত হয়, পরে মানসিংহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রথম আক্র-মণেই তাঁহার তরবারি ভগ্ন হইয়া যায়। ঈশা খাঁ তৎক্ষণাৎ স্বীয় তরবারি মানের হস্তে সমর্পণ করেন। মৃত্যুর পরিবর্ত্তে শত্রুর তরবারি তাঁহার হস্তগত হওয়ায়, সেনাপতি ঈশা খাঁর প্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হন। পরে ঈশা খাঁকে লইয়া দিল্লী প্রস্থান করেন। মানসিংহ প্রমুখাৎ ঈশা খাঁর বীরত্ব ও উদারতার বিষয় বাদসাহ শ্রুত হইয়া, খাঁ সাহেবকে এক বহুমূল্য পরি-চ্ছদ প্রদান করেন। পরে তাঁহাকে সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় হইতে অন্যান্য ভূঞাগণের সহিত, তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। তিনি বিশ্বস্তভাবে বাদসাহের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ঈশা খাঁ একবার মিত্রতার ভাণ করিয়া শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়ের রাজধানীতে উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করার পর, রায়ের বিধবা ভগ্নী সোণামণির প্রতি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। পরে কেদার রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর প্রযত্নে ঐ ললনাকে হস্তগত করেন। * এই ঘটনায় রায় রাজগণ ঈশা খাঁর রাজধানী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে চাঁদ ও কেদার রায়ের [illegible] করা গিয়াছে। অতএব এস্থলে তদ্বৃত্তান্ত পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোণামণি এই সময়ে "বিবিআলি নেয়ামত" নাম ধারণ করেন। † কিন্তু সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সোণাবিবি বলিয়া জানিত। ঈশা খাঁর শৌর্য্য সন্দর্শনে ও ও সৌজন্যতায়, সোণাবিবি তাঁহার বশীভূতা হইয়াছিলেন। ঈশা খাঁ অন্যান্য বনিতাগণ অপেক্ষা ইঁহাকেই সমাধিক প্রিয়তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁ যৎকালে এইরূপে দিল্লীশ্বরের বাধ্য হইয়া, অপর ভুঞাগণের সহিত বন্ধুতা বন্ধন ছিন্ন করেন, তৎ সময়ে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহার খুল্লতাত বসন্ত রায় কতিপয় পুত্র সহিত হত হন। মাত্র তৎপুত্র কচু রায় (রাঘব) ও চাঁদ রায় প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে রূপরাম বসু নামক তাঁহাদের জনৈক কুটম্ব বসন্ত রায়ের ঐ দুই শিশু পুত্রকে লইয়া অন্যান্য ভুঞাগণের সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্তু প্রতাপের সহিত বন্ধুতা ছিন্ন করিয়া কেহই তাঁহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। রূপরাম বসু অনন্যোপায় হইয়া বাদসাহের আশ্রিত ঈশা খাঁ মসনদ আলির নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন। ঈশা খাঁ ইহাতে সম্মত হইলেন। এই স্থলে প্রয়োজন বোধে আমরা অন্য একটী কথার অবতারণা না করিয়া পারিলাম না।

শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়, তৎকৃত প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, রূপরাম, কচু রায় ও চাঁদ রায়কে লইয়া এই সময় ঈশা খাঁ মসন্দরীর নিকট উড়িষ্যার অন্তর্গত খিজিরিতে উপস্থিত হন। কিন্তু আমরা যতদিন ঈশা খাঁ মসনদ আলি ও ঈশা খাঁ মসন্দরি এই দুই ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব অবগত হইতে না পারিব, ততদিন আমরা এই কথা বিশ্বাস করিতে কোন মতে সম্মত হইব না।

অতঃপর খাঁ সাহেব কচু ও রাঘব রায়কে সাদরে গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অচিরে এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরসহ কচুরায় ও রূপরাম বসুকে আগমহলে (রাজমহলে) মানসিংহ সদনে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ আবার এতদ্বিষয় জানিয়া শুনিয়া উহা দিল্লীশ্বরকে অবগত করাইলেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ, বারভুঞাগণের সম্যক্ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, মানসিংহকে উহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য অনুমতি পাঠাইয়াদিলেন। ঈশা খাঁ

* ব্রাহ্মণ সন্তান ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া যেমন তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল; শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ত খাঁও তদ্রূপ স্বীয় প্রভুর প্রতি কুব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

† ঈশা খাঁ প্রথমে হুসেন সাহের দৌহিত্রী "করিম কতেমা খাতুনের' পাণিগ্রহণ করেন।

মোগল আশ্রয় পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য রূপরাম তাঁহা দ্বারা সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় তৎরাজধানী খিজিরপুরে উপস্থিত হন। এবং তাঁহার চেষ্টাতেই সম্রাটের সাহায্য প্রাপ্ত হন।

ঈশা খাঁ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন যে, গুণুঙ্গের রাজা জানকীবল্লভ তাঁহার সহায়তা লইয়া আপনার তনয়াকে তাহেরপুরের রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ রায়ের সহিত বিবাহ দিতে সক্ষম হন। গুণুঙ্গের রাজবংশ হইতে কুলগৌরবে তাহেরপুরের রাজবংশ শ্রেষ্ঠ ছিল। একমাত্র ঈশা খাঁর পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই, ইন্দ্রজিৎ এই বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

ঈশা খাঁর শাসন সময়ে একবার বঙ্গদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই জন্য তিনি তৎপ্রতীকার মানসে অত্যন্ত যত্ন ও অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। দরিদ্রগণের সহায়তা করিবার জন্য এই সময়ে তাঁহার রাজ্য মধ্যে অনেক খাল ও জলাশয় খনন হওয়ায় একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক সমূহের অর্থোর্জ্জনের উপায় করিয়াছিল, অন্য দিকে তদ্দ্বারা স্বদেশের কতকগুলি স্থায়ী উপকারও সংসাধিত হইয়াছিল। এই খালগুলির মধ্যে আকালের জল প্রণালীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই খালের উপর এক প্রকাণ্ড ইষ্টকময় সেতু নির্ম্মিত হয়; উহাতে খিজিরপুর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মোগরাপাড়া হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত একটী জলপ্রণালী কর্ত্তিত হয়।

ঈশা খাঁ প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁহার সময়ে কৃষকেরা প্রতি কাণিতে চৌদ্দপণ করিয়া কর প্রদান করিত। ইহাতে বোধ হয়, প্রতি কাণিতে চারি আনার অধিক খাজনা দিত না। এই জন্য তাহারা খাঁ সাহেবের কীর্ত্তি সংযুক্ত গান গাহিয়া বেড়াইত। তাহার একটী পদে "কাণি ক্ষেতে লাগিল চৌদ্দ বুড়ি" এই একটী পদ সংযোজিত দেখা যায়। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে যখন সন্দীপের আধিপত্য লইয়া আরাকাণ ও পর্ত্তুগীজদিগের সহিত বাদসাহের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎসময়ে ঈশা খাঁ জীবিত ছিলেন কি না, বলা যায় না। কারণ ঐ যুদ্ধে তাঁহাকে উপস্থিত দেখা যায় না।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য কেদার রায়, ত্রিপুরেশ্বর এবং মঘরাজ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। সোণাবিবি হাজিগঞ্জের দুর্গে থাকিয়া মঘাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, আত্মরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই, তখন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বীরতনয়া, বীরবনিতা সোণাবিবি এই বিস্ময়কর যুদ্ধ করিয়া আপনার শূরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে জগৎ বিমুগ্ধ হইয়া এই বঙ্গাঙ্গনার আলৌকিক শক্তি ও পতিপরায়ণতার কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়াছিল। এক সময়ে যে জাতির মধ্যে এইরূপ শক্তিরূপিনী নারীর আবির্ভাব হইয়াছিল, সে জাতি যে কোন কালে নির্জীব কি ভীরু ছিল, তাহা কি কোন মতে বিশ্বাস করা যায়?

ঈশা খাঁর তিনটী পুত্র ছিল, প্রথম আদম খাঁ, দ্বিতীয় বিরাম খাঁ ও তৃতীয় আবদুল্যা খাঁ। পিতার মৃত্যুর পরে তাহারা সমানাংশে বিষয় বিভাগ করিয়া লয়। কিন্তু এই সময়ে তাহাদের পৈতৃক জমিদারী অধিক পরি-

হাতে অন্যের হস্তগত হইয়াছিল। এইরূপে ভুষানসাহি,আলাক্‌ সাহি, মমামসাহি প্রভৃতি পরগণা গুলি তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। খাঁ-বংশধরেরা আজিও হয়বতনগর এবং জঙ্গলবাড়ীতে বাস করিতেছেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

উপনিষদের উপদেশ। (১)

ভারতের উপনিষদ্‌গুলিতে যে সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, সে গুলি যে অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ, একথা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডের এবং জর্ম্মণ দেশের কতিপয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যবসায়শীল মহাপুরুষের যত্নে ও চেষ্টায়, এবং বঙ্গদেশের কতিপয় উদ্‌যোগী মহাত্মার প্রসাদে, এই রত্নভাণ্ডার উপনিষৎগুলির অধিকাংশই, ইউরোপে ও ভারতে অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হওয়ায়, এখন এই ঔপনিষদিক জ্ঞান লোকের সহজ-বোধ্য না হউক্‌, সহজ-প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশে যে অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ না থাকায়, এবং শঙ্করাচার্য্যকে অনেকেই প্রকৃতরূপে বুঝিতে না পারায়, ঐ সকল অনুবাদ দ্বারা বঙ্গভাষা যে বিশেষ লাভবতী হইয়াছে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, যতদূর এবং যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ভারতে এক সময়ে কতদূর উর্দ্ধভূমিতে অধিরোহণ করিয়াছিল। ঋগ্‌বেদাদি দেবদেবীপ্রধান ও কর্ম্মকাণ্ডবহুল বেদগ্রন্থে যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে উপদিষ্ট ও কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন কর্ম্মকাণ্ডের দুর্ভেদ্য জালের মধ্যে পতিত হইয়া, যে ব্রহ্মজ্ঞান লোক-লোচনের অন্তরালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্‌ তাহারই সবিক্রমে উদ্ধার-সাধন করিয়া,—সেই অদ্বিতীয়, নিত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রভৃতি মহাতত্ত্ব সকল অতি পরিস্ফুট ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোথাও বা গল্পচ্ছলে এই দুরূহ ব্রহ্ম-তত্ত্ব অতি মধুর ভাষায় এবং তদপেক্ষাও মধুর-ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানার্থীর হৃদয়ে অঙ্কিত ও পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিন্দু-দর্শন, যে সমুদয় মতের আলোচনা ও পূর্ত্তি-সাধন করিয়া, বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে, সেই সমুদায় দার্শনিক মতই গূঢ়ভাবে এই উপনিষদে, কোথাও পরিস্ফুট এবং কোথাও বা অস্ফুট ভাবে নিহিত ও বিবৃত রহিয়াছে।

প্রথম পাঠ কালেই, উপনিষদের প্রধানতঃ দুইটী অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অংশে খাঁটী ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে; অপর অংশ উপাখ্যান-বহুল। এই দ্বিতীয় অংশে, নানাবিধ মনোহর গল্পের অবতারণা করিয়া এবং বহুবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, সৃষ্টিতত্ত্বাদি নানা প্রকারের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, এই উভয় ভিত্তির উপরেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-ভাষ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের এই প্রথমাংশটাই খাঁটী দার্শ-

নিক অংশ। নব্য-ভারতের পাঠক বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, আমরা বহুদিন হইতে, আমাদের "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে, উপনিষদের ও বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা নিজে বহুদিনের পরিশ্রমে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই ব্যাখ্যা প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছি, তাহার বিচারভার সহৃদয় বুদ্ধিমান্ পাঠকের উপরে। উপনিষদের এই তর্ক-বহুল দার্শনিক অংশ বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়া, বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধন যেরূপ অত্যাবশ্যকীয়, সেইরূপ উপনিষদের এই গল্প ও দৃষ্টান্তাত্মক অংশও, বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই জন্য, আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, প্রামাণ্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ হইতে, উহার সেই সুমধুর গল্প ও হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত গুলি আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই, সেই সমস্ত গল্পে ও দৃষ্টান্তে, ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিস্ময়-কর তত্ত্ব নিগূঢ় রহিয়াছে, সে গুলিরও সহজ ও সকলের বোধগম্য ভাষায়, সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বিবৃতি প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। এই কার্য্যে আমরা মূলতঃ শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যেরই অনুসরণ করিব। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতমূলকই হউক্, আর অদ্বৈতমূলকই হউক্, শঙ্কর-ভাষ্যের সহায়তা ভিন্ন, অতি দুরূহ উপনিষদ্গুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং শঙ্কর-ভাষ্যই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান সহায়। আমরা ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে বিখ্যাত ও প্রামাণ্য উপনিষদ্গুলি হইতে, সেই সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান-মূল গল্প (Parable) এবং দৃষ্টান্তগুলি বাছিয়া লইয়া, প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সহজভাবে বুঝাইবার কিরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গল্পের ভাষা ও দৃষ্টান্তের ভাষা এত মধুর যে, বারবার পড়িলেও, প্রত্যেক বারেই নূতন বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তগুলি এত সহজ ও হৃদয়স্পর্শী যে যে, একবার তাহা শুনিয়াছে, তাহার চিত্ত-পটে সে গুলি পাষাণ রেখাবৎ অঙ্কিত না হইয়া পারে না। অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত-বুদ্ধি-ব্যক্তির মধ্যে, ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইবার এরূপ সহজ ও মধুর উপায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া, আমাদের ধারণা নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, এ বিষয়টী বড় গুরুতর এবং শ্রম-সাপেক্ষ। উপনিষদের ভাষা স্থানে স্থানে বড় জটিল এবং স্থানে স্থানে তাৎপর্য্য নির্ণীত হওয়াও সুকঠিন। অনেক অংশে, একই স্থলের ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়া পড়ে। সুতরাং এ কার্য্যে আমাদের ভ্রম-প্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। সেইজন্য আমরা বিনীত-ভাবে, সহৃদয় পাঠকবর্গের এবং যাঁহারা ভারতের প্রাচীনকীর্ত্তি রক্ষা করিতে ও তাহাদের পুনঃপ্রচারে আন্তরিক যত্নশীল, তাঁহাদের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

কোন কোন স্থলে, কোন কোন বিষয় ও মত কিছু অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে; সে গুলি আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অতি নিম্ন-স্তরের বলিয়া বোধ হয়। আমরা সেরূপ স্থল একেবারে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। অতি প্রাচীন-

কালে কোন্ কোন্ মত কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, লোকে দেহতত্ত্বইবা (Psycology) কতদূর অবগত ছিল, তাহা দেখাইতে হইলে সে সমস্ত স্থান বাদ্ দিলে চলিবে না। তবে যে গুলি নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক কথা, —দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা উত্তপ্ত লৌহ গোলোক দ্বারা তস্করের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি,—সেই সকল স্থল আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করিব। আরো একটী কথা আছে; এই আখ্যায়িকা ও তদন্তর্গত মতগুলি বিবৃত করিতে গিয়া, আমরা কেবল মাত্র সিদ্ধান্ত পক্ষেরই উল্লেখ করিয়া যাইব। কোন্ কোন্ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছিল, সেই যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে যে স্থলে যুক্তির অবতারণা না করিলে, সিদ্ধান্তটী বুঝিতে কষ্ট হইবে, কেবল সেই সেই স্থলেই সংক্ষেপে যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। এরূপ করিবার আমাদের বিশেষ হেতু আছে। একেত, আখ্যায়িকা ও সহজ উপদেশের ভিতরে যুক্তিতর্ক আনিয়া উপস্থিত করিলে, তাহা সাধারণ পাঠকের তত প্রীতিপ্রদ হয় না, তারপর এরূপ যুক্তিতর্কে গল্পের মধুরতারও হানি হয়। আর এক কথা এই, এইরূপ যুক্তি ও তর্কগুলি উপনিষদের দার্শনিক অংশের অন্তর্গত। শঙ্করাচার্য্য, সে গুলির অধিকাংশই বেদান্তভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন; আমরাও আমাদের "ব্রহ্ম ও জগৎ" নামক প্রবন্ধে, সেই যুক্তিতর্কগুলি যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রেরও অনুমোদিত, ইহা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি। ইচ্ছা হইলে পাঠক, সেই যুক্তি তর্কের জন্য, আমাদের সে প্রবন্ধটীও সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পারেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চেহেলম্।

মহাবীর মহম্মদের প্রবর্ত্তিত মুসলমান ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীগণ উদ্দীপ্ত উৎসাহ, অমিত ধর্ম্মানুরাগ এবং জলন্ত স্বজাতিপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের শাস্ত্র ও সমাজ অনুসারে যে সকল উৎসবের অনুশীলন, পরিপোষণ ও পরিপালন করিয়া থাকেন, সুপ্রসিদ্ধ "চেহেলম" তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম মহোৎসব। সূর্য্য বিনা জগৎ, কিরণ বিনা সূর্য্য, কিম্বা উত্তাপ বিনা কিরণ হওয়াসম্ভব, কিন্তু "চেহেলম" বিনা মুসলমান হওয়া সম্ভব নহে। খৎন (Circumcision) না হইলেও য়িহুদী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, খ্রীষ্টকে উপাস্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও খ্রীষ্টান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু 'চেহেলম' কে অমান্য করিয়া মহম্মদকে মান্য করিলেও 'প্রকৃত'মুসলমান' বলিবার কাহারও অধিকার থাকে না। মুসলমান সমাজে 'চেহেলম' এক অপূর্ব্ব উৎসব! মহম্মদের অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে 'রম্‌জান' কিম্বা রমজানের পরবর্ত্তী 'ইদ্' উৎসব অতীব পুণ্যজনক বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রম্‌জান কোনও

উৎসবের মধ্যে গণ্য নহে। রম্‌জানের পূর্ণ এক মাস কালের সমুদয় দিবসগুলি নিরম্বু উপবাসে, বিলাসশূন্যতায়, সর্ব্বপ্রকার আমোদ হীনতায় এবং সকলপ্রকারের সহিষ্ণুতা ও ক্লেশপরায়ণতায় অতিবাহিত হইয়া থাকে; রাত্রিকালে আহার করিবার'আদেশ' থাকিলেও কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ কিম্বা ভোগ-বিলাসের অধিকার নাই; সুতরাং 'রম্‌জান' একটা উৎসব নহে। রম্‌জানের পরবর্ত্তী 'ইদে' অনেক আনন্দ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু চেহেলমের মহোৎসব মুসলমান জাতির একমাত্র প্রকৃত মহোৎসব; এই মহোৎসবের সহিত মুসলমানের আর কোনও উৎসব তুলনীয় হইতে পারে না। 'মহাভারত পড়িয়া হরিবংশ না পড়িলে যেমন ভারতপাঠের ফল হয় না' অথবা 'ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা না দিলে যেমন ব্রাহ্মণভোজনের পুণ্যলাভ হয় না', সমুদয় উৎসবগুলি পালন করিয়া কেবল চেহেলম্‌ উৎসবকে অপালন করিলে মুসলমানের পক্ষে 'বেহেস্তার' (স্বর্গের)প্রশস্ত ও পবিত্র দ্বার উন্মুক্ত হয় না। মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুবর্ত্তীদিগের পক্ষে চেহেলম এক অপূর্ব্ব উৎসব!! হরিবংশ যেমন মহাভারতের শেষভাগ, 'প্রকাশিত বাক্য' (Revelations) যেমন বাইবেলের শেষ ভাগ,চেহেলম উৎসব'মহরমের' তেমনি শেষ ভাগ। সেণ্ট জনের 'রেভেলেশন' বাদ দিলে বাইবেল অসম্পূর্ণ হয়, চেহেলম বাদ দিলে মহরম অসম্পূর্ণ থাকে; চেহেলম ভিন্ন মহরম হয় না, মহরমের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'চেহেলম' উৎসবেই সংসাধিত হইয়া থাকে।* মুসলমান-উৎসব-কাননে 'মহরম'কে বীজ, 'দুপুরে মাতন'কে অঙ্কুর, ইন্‌হুবিদকে তরু এবং 'চেহেলম'কে ফল বলা যাইতে পারে। যে সকল মহৎগুণে মুসলমান সমাজ চতুর্দ্দশ শতাব্দী কালপর্য্যন্ত সজীব ও সতেজ হইয়া রহিয়াছে, চেহেলমের মহোৎসবে তাহার বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। যে অদমনীয় স্বধর্ম্মানুরাগ, যে দুর্দ্দমনীয় স্বজাতি-প্রিয়তা, যে অপরিমিত স্বদেশবাৎসল্য, যে অনিবার্য্য রাজনৈতিক স্ফুলিঙ্গ এবং যে জলন্ত ও জীবন্ত বিজয়-স্পৃহা যবন জাতিকে জগতের ভীতির কারণ করিয়া রাখিয়াছে, চেহেলমের উৎসবে সে সকল উপাদান অতি বিশদ ও সুন্দর ভাবে সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু কয়জন মুসলমান চেহেলমের উন্নত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে? 'চেহেলম' এখন একটা তামাসা বলিয়া পরিগণিত। মুসলমান যদি চেহেলমের উচ্চ অঙ্গের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কথায় কথায় হিন্দুর গলায় ছুরিকা প্রয়োগের জন্য প্রধাবিত হইত না; তাহা হইলে রামলীলা ও মহরম লইয়া হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামায় অসংখ্য নরনারীর অকালমৃত্যু অথবা অকারণে অধঃপতন হইত না। চেহেলমের উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে, মুসলমান জাতি অবনতির অন্ধকারে সারমেয়-তাড়িত মেষ শাবকের ন্যায় অথবা কর্ত্তিত-কণ্ঠ রোহিতের ন্যায় অর্দ্ধমৃত হইয়া এতদিন পড়িয়া থাকিত না; চেহেলমের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এবং ইহার উন্নত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি তদনুসারে তাহারা সাংসারিক জীবনের গতি ও নীতি সমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়, তাহা হইলে উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া জগতের

* ১৩০৮ সালের "চেহেলম্‌" ৮ই জুন,২৫এ জ্যৈষ্ঠ,শনিবার,ষষ্ঠি তিথিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাসে মুসলমানেরা আর একটী নূতন যুগের অবতারণা করিতে পারে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। অদ্যকার প্রস্তাবে চেহেলমের ইতিহাস ব্যাখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

খ্রীষ্টীয় ৬৩৫ অব্দে, জুন মাসে, ৬৫ বৎসর বয়সে, জ্বররোগে, মদিনা নগরে মহম্মদের মৃত্যু হয়। সান্নিপাতিক জ্বর ভোগ করিতে করিতে যখন তাঁহার দেহের বল, কণ্ঠের স্বর, দৃষ্টির শক্তি এবং নাসিকার শ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিল, তাঁহার কন্যা ফাতিমা বিবি সাশ্রুলোচনে পিতার মৃত্যুকালিমাগ্রস্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিয়াছিলেন, অনেক মুসলমান কবি পারস্য ভাষার নিম্নলিখিত কবিতায় অতি সুন্দররূপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অ্যায় পদর্ চশ্মে বদন্ সহবতে এয়ার
আখির সুদ্।
কয়ে গুল্ না দিদম্ বহার্ আখির সুদ্॥"

কন্যা-কণ্ঠ-বিনির্গত এই করুণ ধ্বনি মহম্মদের কর্ণে প্রবেশ করিল। মহম্মদ বলিলেন, "বাছা! রোদন করিও না; তোমার গর্ভে এবং আমার জামাতা আলির ঔরসে হোসেন ও হাসেন নামে দুই পুত্ররত্ন তোমার নয়নের মণি স্বরূপ বর্ত্তমান রহিল। আমার দৌহিত্রদিগের দ্বারাই আমার ও আলীর এবং তোমার মুখোজ্জ্বল হইবে; তাহাদিগের গুণে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, অতএব তুমি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর।" এই কথা বলিয়া মহম্মদ ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধর্ম্মগদি লইয়া মুসলমান সমাজে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। এই বিবাদে তদানীন্তন মুসলমান সমাজের নেতাদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; এক সম্প্রদায় বলিলেন, "মহম্মদের পুত্র নাই, কিন্তু দৌহিত্র রহিয়াছে, অতএব তাঁহার ধর্ম্মগদিতে দৌহিত্রেরই অধিকার; কিন্তু যতদিন জামাতা (অর্থাৎ দৌহিত্রের পিতা) বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন জামাতার অর্থাৎ আলিরই ধর্ম্মগদিতে অধিকার থাকা উচিত।" অন্য সম্প্রদায় বলিল, উপ-নবিদিগের মধ্যে ওশ্মান গণি গুণে ও বয়সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ মহম্মদের বিশেষ প্রিয়পাত্র, সুতরাং ধর্ম্মগদিতে তাঁহাকেই অধিরূঢ় করা ন্যায়সঙ্গত। যে সম্প্রদায় আলির পক্ষ সমর্থন করিল, তাহারা "সিয়া" নামে এবং যে সম্প্রদায় ওশমান গণির পক্ষ সমর্থন করিল তাহারা "সুন্নি" নামে বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় ৬৬০ অব্দে কিউফা (Kufa) নগরে, উপাসনার জন্য মসজিদে গমন করিবার সময়ে, সুন্নী সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের হস্তে আলি নিহত হয়েন।*

এই কিউফা নগরে কুফা নামে এক প্রকার অতি প্রাচীন বর্ণমালা প্রচলিত ছিল; মহম্মদের কোরাণ সর্ব্বপ্রথমে এই অক্ষরে লিখিত হয়। (১) আলির মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরৎ হোসেন তৃতীয় ইমাম্রূপে আলির ধর্ম্মগদিতে অধিরোহণ করেন। হোসেনের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম হাসেন। মহারাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

* "Kufa, which was one of the most celebrated cities of Islam, is now a small village, gathered round the Great Mosque, in front of which Ali, the son-in-law of Mahomed was assassinated on his way to offer public prayer. It was famous as a centre of learning."—*Turkey and its Sultan*, p. 59. (Published by the Madras Chrnistian Literature Society for India).

(১) Kufa was famous as a centre of learning, and gave its name to the characters in which thc earliest copies of the Koran were written."—P. 59 (Ditto).

সর্ব্বসাধারণ্যে যেমন একখানি (Edict) (ঘোষণাপত্র) প্রচার করিয়াছিলেন, হোসেনও সেইরূপ অবিলম্বে একখানি (Edict) জারী করিলেন। ঐ ঘোষণা-পত্রের মর্ম্ম এই—"বিদ্বেষীরা (অর্থাৎ সুন্নিরা) বিরোধী হইয়া আমার পূজ্যপাদ পিতার প্রবর্ত্তিত সিয়ামতের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অসত্য অপবাদ ঘোষণা দ্বারা ইসলামের মহৎ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহের ঐশিক ধর্ম্ম যাহাতে সমগ্র দেশে প্রচারিত ও প্রতিপোষিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা-করা আমার এবং সমগ্র মুসলমান জাতির কর্ত্তব্য। এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের পারস্পরিক দ্বেষ, হিংসা, অভিমান ভুলিয়া যাওয়া উচিত। দেশস্থ সমুদয় লোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য এই ঘোষণা পত্রের প্রচার জন্য আদেশ দেওয়া গিয়াছে। যাহারা এখনও ইস্লামের ধর্ম্মমতে অনুমোদন করে নাই, তাহাদের সকলকে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধনবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদিগের নিকটে এই ঘোষণাপত্র প্রথমে প্রচার করা উচিত। ইস্লামের শিষ্যত্ব ও দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার ঐশী ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে কোরাণের অনুজ্ঞা অনুসারে মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচার ও বিস্তার করিবার জন্য যাহা করা উচিত, তাহা যথারীতি করা যাইবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।" স্বল্পকাল মধ্যে এই ঘোষণা-পত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। এই সময়ে জেজিদ্ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অথচ মহাধনবান নরপতি ছিলেন। 'কোরীশ' নামক যে প্রাচীন বংশ হইতে মহম্মদ সমুদ্ভূত হয়েন, জেজিদ্ সেই বংশের অন্যতম রাজকীয় বংশধর। কোরীশ জাতির অনেকেই অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মহম্মদের ধর্ম্মমতে অনুমোদন করে নাই, সুতরাং তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন ধর্ম্মমত অনুসারেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। জেজিদের নিকট ঐ ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃণার সহিত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। জেজিদ্ হোসেনের মাতামহের (মহম্মদের) পূর্ব্ব পুরুষীয় বংশের অন্যতম সম্মানিত বংশধর এবং আত্মীয়, সুতরাং জেজিদের বিরুদ্ধে ঝটিতি যুদ্ধ-ঘোষণা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া হোসেন মনে করিলেন না। দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকটে ঘোষণা-পত্র প্রেরণ করা হইল, সেবারেও জেজিদ্ এই পত্রকে উপেক্ষা করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন; তৃতীয় বারে অর্থাৎ শেষবারে 'আখির পত্র' (Ultimatum) প্রাপ্ত হইয়া জেজিদ্ বলিলেন, 'আমার নিকটে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বালকোচিত ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা প্রগল্‌ভতার কার্য্য। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ প্রমাদের কার্য্য করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।' এইরূপে নানা কথা তুলিয়া জেজিদ্, হোসেনের অপমান করিলেন। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; হোসেনে এবং জেজিদে বিষম সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। মহম্মদের মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পরে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, সুতরাং মুসলমান জাতি এবং মুসলমান জাতির তখনও প্রভুত্ব, প্রভাব, বীরত্ব বা বিক্রমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই; মধ্য-

আসিয়ায় তখনও ইসলামের বিজয় পতাকা নিরাপদে স্থান পায় নাই। আসিরীয়া (Assyria) এবং আল্‌জিজিরা (Alzejirah) নামক দেশদ্বয়ের মধ্যস্থ মেশোপোটেমিয়া (Mesopotemia) রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ বোগ্‌দাদ্‌ নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কার্ব্বেলা নামক বিখ্যাত নগরের পার্শ্বস্থ এক সুবিশাল প্রান্তরে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশের স্থানের নাম Calvary; এই ক্যাল্‌ভারির নাম উচ্চারিত হইলে কয়জন খ্রীষ্টানের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়? কিন্তু কার্ব্বেলার নামে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি মুসলমান নরনারীর দেহস্থ ধমনীতে শোণিত-স্রোত খরতর বেগে বহিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য হোসেন এই কার্ব্বেলায় নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হয়েন। তাঁহার এই স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বধর্ম্মানুরাগের অমর চিহ্ন স্বরূপ কার্ব্বেলায় তাঁহার সমাধিস্থলকে (কবরকে) বহুমূল্যবান স্বর্ণ দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ঐ স্বর্ণাবরণের উপরে ছয়টি হিরণ্ময় স্তম্ভ, ঐ স্তম্ভের ভিতরে তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশের অসংখ্য মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত অগণ্য ধনরাশি ও রত্নাদি প্রোথিত আছে। এই স্তম্ভের পার্শ্বেই হোসেনের নামে একটী সুবৃহৎ হিরণ্ময় মস্‌জিদ উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে ইমাম আব্বাসের মস্‌জিদ্; এই মহাবীর হোসেনের যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কার্ব্বেলার এখন লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫ সহস্র, ইহার মধ্যে ৫৪ সহস্র সিয়া মতাবলম্বী। কার্ব্বেলায় যে ইষ্টক প্রস্তুত হয়, তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মুসলমানের বিশ্বাস; এখানে এক প্রকার চাদর প্রস্তুত হয়, সেই চাদরের দ্বারা মুসলমানের মৃতদেহ আচ্ছাদন করিলে, ভূত প্রেতের ভয় থাকে না, ইহাও অনেকের ধারণা। কার্ব্বেলার কবরস্থানে সমাধি হইলে বহু পুণ্য লাভ করা যায়, এই বিশ্বাসে অনেকে মৃতদেহকে কার্ব্বেলায় পাঠাইয়া দিয়া থাকে। পারস্যের সিয়ারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে, এবং কার্ব্বেলায় কবর হইলে জন্মান্তরে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ বিশ্বাস করে। জীবনে অন্ততঃ একবারও কার্ব্বেলায় আগমন করা প্রত্যেক সিয়ার 'ধর্ম্ম' বলিয়া গণ্য হয়। যে প্রকাণ্ড প্রান্তরে জেজিদে ও হোসেনে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ, প্রস্থে দেড় মাইলের অধিক হইবে না। প্রকৃত পক্ষে এই প্রশস্ত ময়দানের নাম কার্ব্বেলা। প্যালেষ্টাইনের উল্লেখ করিয়া মহাকবি সেক্ষপীর লিখিয়াছেন— "Those holy fields
Over whose acres walked those blessed feet
Which many hundred years ago were nailed,
For our advantage, on the bitter cross."

কার্ব্বেলার উল্লেখ করিয়া সিয়া সম্প্রদায়স্থ পারস্য কবি মোলনো রুম লিখিয়াছেন—

"হাম্‌চো সব্‌জা বার্‌হা
রোয়িদাম্‌ হপ্‌ৎসদ্‌
হপ্তাদ্‌ কালীদ্‌ দীদম্‌।"

অর্থাৎ "যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে এবং এই কার্ব্বেলার পবিত্রতায় বিশ্বাস করিলে যদি ৭০৭ বার জন্ম হয়, তাহা হইলেও আমি প্রতি জন্মে কার্ব্বেলার একটী ঘাষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত নহি।" খ্রীষ্টানের 'কাল্‌ভারী' এবং মুসলমানের কার্ব্বেলায় কত প্রভেদ!!

কার্ব্বেলার এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধে যে সকল

ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই যুদ্ধে হোসেন এবং হোসেন পক্ষীয় বীরেরা যে অসাধারণ অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ বীরত্ব, অমিত বিক্রম, উদ্দীপ্ত উদ্দীপনা, অতুলনীয় সাহস, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বজাতি-প্রিয়তা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিতে গেলে, অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথার বর্ণনা করিতে গেলে, মুসলমানের একখানি মহাভারত হইয়া উঠে; আরব্য, পারস্য এবং উর্দ্দু ভাষায় এরূপ মহাভারত অনেক বিরচিত হইয়া গিয়াছে, মুসলমানেরা অতি যত্ন সহকারে তাহা পাঠ করিয়া থাকে; বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় সে বিস্তৃত ইতিহাসের স্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। হোসেনের পক্ষে মোটে সাতশত সৈন্য ছিল, ইহার মধ্যে কেবল চারিশত সেনা তৎসময়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। জেজিদের পক্ষে দ্বাদশ সহস্র প্রবল পরাক্রান্ত এবং সুশিক্ষিত সেনা একত্রিত হইয়াছিল।* কার্ব্বেলার প্রশস্তক্ষেত্রে উভয় সেনা একত্রিত হইলে জেজিদ আসিয়া হোসেনের সৈন্যসংখ্যা দর্শন করতঃ মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু যুদ্ধকালে মুসলমানের উৎসাহ, অধ্যবসায়, সাহস, স্বার্থত্যাগ, ধর্ম্মানুরাগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে মারাথান, থার্ম্মাপলি অথবা হলদিঘাটের যুদ্ধ, কার্ব্বেলার যুদ্ধ হইতে ঐতিহাসিক বিশেষত্বে (significance) হীন বলা যাইতে পারে। অনাহারে, পিপাসায়, অপমানে, আঘাতে, নির্য্যাতনে, প্রখর রৌদ্রে, প্রবল ঝড়ে, নানা প্রকারের অসহনীয় অসুবিধা ও যন্ত্রণা সত্বেও হোসেনের সেনারা জেজিদের বিপুল সেনাকে পরাস্ত করিল। জেজিদের লোকেরা হোসেনের শস্যভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, অশ্ব উষ্ট্রাদি চুরি করিয়া লইল; সেই মরুভূমি সম ময়দানে যেখান হইতে পানীয় জল আসিত, তাহা বন্ধ করিয়া দিল; নানাপ্রকারের ছলনা ও কৌশলে হোসেনের সেনাদিগকে ভুলাইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি মুসলমানের সেনাদলের নিকটে কোরীশ সৈনিকেরা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইতে লাগিল। কোরীশরাজ জেজিদ বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং নিজে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া ভাণ করিতে লাগিলেন; হোসেনের লোকেরা তাঁহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া ভুলিয়া গেল। উত্তম অবসর পাইয়া জেজিদ আবার মুসলমানকে আক্রমণ করিলেন। হোসেনের সেনা কিছুতেই দমিত হইবার নহে; যবন আবার জয়লাভ করিল। দশ দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল, দশ দিবসেই মুসলমান বিজয়ী হইয়াছিল; অবশেষে জেজিদের লোকেরা একটা মিথ্যা ছলনার উদ্ভাবনা করিয়া মিত্রতার ভাণ করিয়া হোসেনকে হস্তগত করে এবং অতীব নিষ্ঠুরতা সহকারে তাহাকে নিধন করে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটী করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, নানা প্রকারে কঠোর যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, নিজ জাতির গৌরব রক্ষার জন্য, হোসেন তাহা অকাতরে

* উভয় পক্ষের সৈন্যের সংখ্যা সম্বন্ধে মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। জেজিদের দলের সহিত তুলনায় হোসেনের দল যে অতীব হীনবল ও হীনসংখ্যা ছিল, তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই।

সহ্য করিতে লাগিলেন। শেষে যখন যন্ত্রণা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, য়েজিদ্ বলিলেন, "তুমি যদি মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোরীশের ধর্ম্মের অনুগামী হও, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা করিবার আদেশ দেওয়া হইবে।" হোসেন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জগতের একেশ্বর হইতেও তাঁহার অভিমতি নাই; সুতরাং অত্যন্ত কঠোর যন্ত্রণার সহিত য়েজিদের লোকেরা হোসেনের প্রাণবধ করিল। ধর্ম্মের জন্য যে সকল মুসলমানেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা "সহিদ্" (Martyrs) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; হোসেন তাহাদের আদি, নেতা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া "সহিদ্-এ-আলা" উপাধিতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।" হোসেনের কনিষ্ঠ সহোদর (হাসেন):ক তাহারা এক স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নগরের পার্শ্বস্থিত এক গৃহে লইয়া গিয়াছিল। তথায় বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণ-সংহার করে। হোসেনের পক্ষের অধিকাংশ লোককে তাহারা যন্ত্রণা দিয়া অথবা ছলনা দ্বারা নিহত করিয়াছিল। স্বধর্ম্ম রক্ষা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা, স্বজাতির গৌরব রক্ষা, মুসলমান সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা, পিতার ধর্ম্মগদির সম্মান রক্ষা এবং ধর্ম্মের জন্য—সত্য বিস্তারের জন্য—আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষে স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ দিতে পারে, হাসেন হোসনের জীবন তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে মহোৎসবের পালন দ্বারা এই দৃষ্টান্তকে সজীব ও জলন্ত রাখা যায়, যে মহোৎসবের ঘোষণা দ্বারা মুসলমানের ধর্ম্মানুরাগ, স্বজাতি প্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ ইচ্ছা প্রভৃতি জাগ্রত রাখা যায়, সেই মহোৎসবের নাম "মহরম"; মহরমের অর্থ দুঃখ প্রকাশ। হোসেনের এই নিদারুণ যন্ত্রণায়, হাসেনের অসহনীয় বেদনা, মুসলমান সেনা ও সেনাপতিদিগের নিদারুণ আঘাত এবং কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য, বিশেষতঃ মুসলমানের পরাভব-জনিত অপমানে দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য, প্রতিবৎসর মহরমের উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে নিদ্রিত মুসলমান জাগ্রত হয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে; পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুসলমান নরনারী আছে, সেই খানেই মহরমের উৎসব। সিয়া ও সুন্নী উভয়ে মিলিয়া মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন করে। ভারতে, তুরস্কে, তাতারে, পারস্যে, আরবে, মিশরে, বেলুচী স্থানে, আফগানিস্থানে, কুর্দ্দিস্থানে, বল্‌গেরিয়ায়, মেশোপটেমীয়ায়, সীরিয়ায় অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনও দেশে, যে কোনও রাজ্যে, যে কোনও স্থানে মুসলমান আছে, সেইখানেই মহরম সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দু রাজাও এই মহরমে যোগ দেন এবং সাহায্য করেন। গোয়ালিয়র, উদয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি বহুল হিন্দু-রাজ্যের অধিপতিগণ অতি সমারোহে মহরম উৎসব সম্পন্ন করেন। ভারতবর্ষে মুর্শীদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, রায়বেরেলি, বিজয়নগর, কাশি, সালেম, কর্ণাট, জুনাগড়, টঙ্ক (Tonk) হায়দ্রাবাদ, ভোপাল প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানে মহরম দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়; মহরমের সময়ে মুসলমানকে কে পায়? সে দিন তাহার সাত খুন মাফ!! বিপুল বিক্রমশালী বৃটীশ বীরই বল, আর নেপালের গুর্খা, পঞ্জাবের শিখ কিম্বা রাজপুতানার মল্লই বল, মহরমের

কয়টা দিনে আগ্রত, উদ্দীপ্ত, প্রমত্ত এবং অনন্ত মুসলমানের সম্মুখে সকলকেই হীনবল হইয়া পড়িতে হইবে।

যুদ্ধের প্রথম দিনে জাতীয় সংগীত গান করিয়া হোসেন সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এজন্য মহরমের প্রথম দিনে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়; সে সংগীত শ্রবণ করিলে মৃতেরও দেহে নবজীবনের সঞ্চার হয়; সেই সংগীত এখনও মুসলমানের পক্ষে সঞ্জীবন মন্ত্র। ষষ্ঠ দিবসে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, উভয় পক্ষের অস্ত্র শস্ত্র সমূহ অহর্নিশি পরিচালিত হইয়াছিল, এইজন্য এই দিনে অস্ত্র সমূহ চালিত হইয়া থাকে। ৭ম দিনে মুসলমানগণ অত্যন্ত অপমানিত ও আঘাতিত হইয়া পরাজিত হয়, মহরমের এই দিনে সেজন্য অত্যন্ত শোক প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এই দিনের নাম "মাতম"; প্রায় মধ্যাহ্নকালে এই মাতম হয় বলিয়া, বাঙ্গালায় ইহাকে "দুপুরে মাতম" বলা হইয়া থাকে। দশম দিনে হোসেন এবং তাঁহার সেনাগণ জলাভাবে কাতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, "জল জল" করিয়া তাহারা চীৎকার করিতেছিল; এইজন্য মহরমের দশম দিবসে মুসলমানেরা সর্ব্বসাধারণকে জলদান করিয়া থাকে। মহরমের সময়ে মুসলমানেরা অনেক দিন ব্যাপিয়া দান খয়রাৎ করে, বহু লোককে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ এবং বিশেষতঃ জলদান করিয়া থাকে। মহরমে জলদান না করিলে অন্নদানের ফল হয় না; যে দিন বিশেষ করিয়া জলদান করা হয়, সে দিনের নাম "ছুল্ শবিল"। অনেক দিন ব্যাপিয়া মহরমের উৎসব হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে দশ দিনই প্রশস্ত। মহরমের সময়ে ভক্ত মুসলমানদিগের বাটীতে প্রায়ই প্রতি রজনীতে মজ্‌লিশ্ হয়, ঐ মজ্‌লিশে এই যুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস পঠিত বা ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, ঐ ইতিহাস পাঠ বা ব্যাখ্যার সময়ে যে যত কাঁদিতে পারে, সে তত পুণ্যবান বলিয়া গণ্য হয়। যেখানে কাঁদিবার লোক নাই বা কাঁদিবার লোকের সংখ্যা কম থাকে, সেখানে বাজার হইতে ভাড়া করিয়া পুরুষ বা রমণীদিগকে আনয়ন করা হয়, তাহারা চীৎকার করিয়া করুণস্বরে কাঁদিতে থাকে। মহরমের রজনীতে মজ্‌লিস্ মধ্যে এই যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করিয়া গান হইয়া থাকে, সেই গানের নাম "মর্শীয়া"; এই গান অতি সুন্দর ও অতি করুণাত্মক। এক একটা মর্শীয়া এত করুণাত্মক যে, শ্রবণ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। মহরমের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব হইতে সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান রমণীগণ "অ্যায় হোসেন" বলিয়া বুক চাপড়াইতে থাকে; দুপুরে মাতমের দিনে এবং দশম দিনে কোটি কোটি মুসলমান নরনারী পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমান দেশে বুক চাপড়াইয়া দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে। নবাব, বাদসা, বেগম হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই নগ্নপদে, নগ্নমস্তকে, প্রচণ্ড রৌদ্রে, বিমর্ষ বদনে "অ্যায় হোসেন" "অ্যায় হোসেন" করিতে করিতে বুক চাপড়াইয়া দুঃখ প্রকাশ করে; কাহারও কাহারও বক্ষঃস্থল হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা বহিতে থাকে; যাহার বুক যত আঘাতীত হয়, তাহার পুণ্য তত অধিক, ইহাই মুসলমানের বিশ্বাস। সিয়া ও সুন্নী উভয়েই এই মহরমে যোগ দেয়। মহরমের শেষ দিনে

হোসেনের সমাধি বা কবর; সে দিনের উদ্দীপনা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

এই মহরম শেষ হইলে চল্লিশ দিবস পরে হাসেন ও হোসেনের শ্রাদ্ধ। এই উৎসবের নাম চেহেলম্। এই উৎসবে মহরম যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। মহরম অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহে ও অধিকতর ব্যয়ে এবং অধিকতর সমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, অদ্যকার দিনে হোসেন ও হাসেনের বেহেস্তায় (স্বর্গধামে) প্রবেশ হয়। এই দিনে তাঁহারা মহাবীর মহম্মদের ক্রোড়ে গিয়া উপবেশন করেন এবং অমরত্ব লাভ করিবার অধিকারী হয়েন। মহরমের উদ্দেশ্য, চেহেলমে পরিস্ফুট আছে। মহরম তরুর চেহেলমই ফল।

চেহেলমের উদ্দেশ্য মুসলমান এখনও বুঝিল না। কার্ব্বেলার যুদ্ধের ইতিহাস অনুশীলন করিয়া ইহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে মুসলমানের এখনও বুদ্ধি হয় নাই; মহরম ও চেহেলম্ এখন তামাসার জিনিস এবং কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিবার অন্যতম উপায়; উদ্দীপনায় (Fanaticism) মুসলমান এমন গোঁয়ার হইয়া উঠে যে, ভাল করিয়া স্থির ভাবে চেহেলম্ বুঝিবার সহিষ্ণুতা তাহাদের থাকে না। চেহেলমের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমরা সংক্ষেপে এখানে বুঝাইতেছি। চেহেলমে যাহা শিখিবার আছে, তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১ম, সুশিক্ষা ভিন্ন সভ্যতা হয় না। ২য়, অভ্যাস ভিন্ন কেবল শিক্ষার দ্বারা সকল কার্য্য শেষ হয় না। ৩য়, মনের বল না থাকিলে কেবল দেহের বলে সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। ৪র্থ, কুসংস্কার এবং বিদ্বেষ, উন্নতির অন্তরায়। ৫ম, যাহা 'সত্য' বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা প্রকৃত সত্য (Truth) কি না, তাহা কুসংস্কারবিহীন হইয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত। ৬ষ্ঠ, কোনও জাতির ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপরে অকারণে হস্তক্ষেপ করিও না, ৭ম, পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের সহিত মিত্রতা না থাকিলে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পাদন করা সুকঠিন। ৮ম ধর্ম্মবিশ্বাসে যাহাতে ভক্তি, বিনয়, কোমলতা, দীনতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয় তাহা করিবে; অহঙ্কার, দর্প, আত্মম্ভরিতা, উন্মত্ততা (Fanaticism) ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। ৯ম, জীবে দয়া না থাকিলে কেবল ভগবানের নামে কোনও ফল হয় না। ১০ম, নিরপরাধী হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিলে তবে পুণ্য হয়। ১১শ, একতায় জয় এবং সুখ। ১২শ, স্বজাতি ও স্বদেশ অতি প্রিয়। ১৩শ, স্বধর্ম্ম সর্ব্বদা অপরিত্যজ্য। ১৪শ, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ বা স্বজাতিকে রক্ষা করিতে প্রাণ দেওয়া বা যুদ্ধ করা ধর্ম্মসঙ্গত। ১৫শ, অত্যাচারের দমন করা ধর্ম্ম। ১৬শ, স্বার্থত্যাগ পরম ধর্ম্ম। ১৭শ, কষ্ট স্বীকার উন্নতির উপায়। ১৮শ, চরিত্র বল শ্রীবৃদ্ধির পরম সহায়। ১৯শ, হিংসা ও বিদ্বেষ সর্ব্বদা নিন্দনীয়। ২০শ, মূর্খতা ও উদ্ধতা সকল সুখের বিঘ্নকারী। ২১শ, ভগবানে ভরসা না থাকিলে সকল কার্য্যেই ভয় এবং পরাজয়।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিত মহাত্মা ফ্রিমেন (Freeman) সাহেব লিখিয়াছেন *;—

"There are to be found in Mahomedan history all the elements of greatness in faith, courage, endur[illegible]-sacrifice. But enclosed within the narrow walls of a rude theology, and a barbarous polity; from which the capacity to grow and the liberty to modify have been sternly cut

* "Islam under the Arabs" P. 75.

off, they work no deliverance upon the earth. They are strong only for destruction. When that work is over, they either prey upon each other, or beat themselves to death against the bars of their own prison house. No permanent dwelling place can be erected on a foundation of sand; and no durable or humanising polity upon a foundation of fatalism, fanaticism, despotism, polygamy and slavery."

মুসলমান জাতির পক্ষে তাঁহার ক্রিমানের উপদেশ অতীব সারগর্ভ এবং তজ্জন্য ইহা মনোযোগ সহকারে বিচার যোগ্য।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী (সন্ন্যাসী)।

ভক্ত কবীর।

পরম ভাগবত কবীর [illegible] জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশৈশব রামচন্দ্রে অনুরক্ত। দিবানিশি রামনাম ধ্যান করিয়া কাটাইতেন। ভগবান রামচন্দ্র কবীরের ধর্ম্মতৃষ্ণায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া, আকাশ-বাণীতে কবীরকে রামানন্দ স্থানে মন্ত্র দীক্ষার জন্য আদেশ করিলেন। রামা-নন্দের আশ্রয়ে রামচন্দ্রকে পাইবেন। কবীর আকাশবাণী শুনিয়া ভাবিতে লাগি-লেন, "আমি যবন, অস্পৃশ্য, আমার মুখ দেখিতে নাই; রামানন্দ কেন আমাকে দয়া করিবেন? যাহা হউক, কোনরূপে তাঁহার শিষ্য হইতেই হইবে"। প্রত্যহ প্রাতে রামানন্দস্বামী মণিকর্ণিকায় গিয়া স্নান করেন। কবীর নিশা প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঘাটে যাইয়া সকলের নিম্ন সিঁড়িতে শয়ন করিয়া রহিলেন। স্বামীজী অতি প্রত্যূষে স্নান করিবার জন্য পূত-সলিলা মণিকর্ণিকার ঘাটে আগমন করিলেন এবং কবীর যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া অজ্ঞাতে কবীরের শরীরে পদ অর্পণ করিলেন। [illegible] কবীরের শরীরে সংলগ্ন হওয়ায় "রাম বল" বলিয়া [illegible] উঠিলেন। কবীরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সেই মহামন্ত্র হৃদয়ে গোপন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

"গুরু রামানন্দ স্বামী প্রত্যূষে উঠিয়া।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া॥
অতি ভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুতি রহে তবে।
গুরু রামানন্দ স্নানে আইল সেই কালে।
অজ্ঞাতে চরণ তার অঙ্গেতে অর্পিলে॥
তটস্থ হইয়া স্বামী "রাম কহ" বলে।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণমূলে॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিয়া।
হৃদয় সম্মুখে রাখে গোপন করিয়া।" ভক্তমাল।

কৌপিন, বহির্ব্বাস, তুলসীমালা, তিলক ধারণ করিয়া সেই দিবস হইতে কবীর বৈষ্ণব ভক্তদলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দিবানিশি রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতা এবং বন্ধুগণ সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল; কিন্তু যে একবার ভগ-বানের নামের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে সামান্য সংসার-বন্ধনে কি করিতে পারে? সে নাম যে মধু হইতেও মধু! যে নামে হরিদাস উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে নামের সুধা আস্বাদনে, বাইশ বাজারে নবাবের পাইকগণ দ্বারা প্রহৃত হইয়াও হরিদাস নাম ছাড়েন নাই; কবীর সেই নামে মাতিলেন। পিতা মাতার তিরস্কার, ভয় প্রদর্শন, কাকুতি মিনতি, বন্ধুগণের প্রেমপূর্ণ আবদার কিছুতেই তাঁহাকে [illegible]ইতে পারিল না।

"সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণে তিরস্কার করে॥
আপনার ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দু ধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাইল করিতে হেন কর্ম্ম॥"
ভক্তমাল।

কবীরের মাতা কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর গুরু কে? কে তোকে কাফেরের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল?' কবীর গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, 'রামানন্দ স্বামী আমার গুরু, তিনিই আমাকে মহামন্ত্র দিয়াছেন, তাই সাধন করিতেছি।' কবীরের মাতা আলুথালু বেশে রামানন্দ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'তুমি কেন আমার পুত্রকে শিষ্য করিয়াছ, কেন তাহার পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছ?' রামানন্দ বলিলেন, 'তোমার পুত্রকে আমি জানি না, শিষ্যও করি নাই।'

"কেটা সে নাহিক জানি নাহি করি শিষ্য"

তৎপর কবীর আসিয়া রামানন্দ স্বামীজির পদতলে পড়িলেন এবং কলি ভব নিস্তারের মহামন্ত্র চমক আবেশে প্রদান করিয়াছেন, তাহা বলিলেন। স্বামীজি সকল কথা শ্রবণ করিয়া কবীরের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"আনুষঙ্গ রাম নাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা নিষ্ঠা হইল মহামন্ত্র করি জানি॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈল তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥"
ভক্তমাল।

তুমি যবন-পুত্র, তুমি বিপ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ। রাম নামে তুমি যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছ, তাহা বিপ্রের মধ্যেও দুর্লভ।

ভক্তি পাত্রাপাত্র দেখেন না, সেস্থানে যবন হিন্দুতে কোন প্রভেদ নাই। শবরী চণ্ডাল কন্যাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই চণ্ডাল কন্যার উচ্ছিষ্ট ফল রামচন্দ্র অতি উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহাকে একমন একচিত্তে আহ্বান করেন, তিনি তাঁহারই দাসী হন। রামপ্রসাদ বলিতেন, "সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" হায়, হায়! সেই ভক্তি ধনে বঞ্চিত হইয়া আজ হিন্দুর এই দশা! আমরা এখন পাশ্চাত্য মহাপুরুষদিগের নিকট তাহার পাঠ লইবার জন্য ব্যস্ত, ধিক্ আমাদিগকে!

প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আসিয়াছি। কবীর ব্যবসায়ে তন্তুবায় ছিলেন। বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন এবং নলী চালাইতে চালাইতে তালে তালে "সীতারাম সীতারাম" বলিতেন। এক দিবস একখানি কাপড় বুনিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া গিয়াছেন। হাটের এক দিকে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে এক বৈষ্ণব আসিয়া সেই কাপড় খানি চাহিলেন; কবীর বলিলেন, 'তুমি আধখানা ছিঁড়িয়া লও।' বৈষ্ণব কহিলেন, 'সব খানি ভিন্ন আমার কাজ হইবে না।' কি করেন কাপড় খানা বৈষ্ণবকে দিয়া শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং ঘরে গেলে মাতা তিরস্কার করিবেন, এই ভয়ে এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। অন্নের কোনই সংস্থান নাই। সে দিবস জীবন ধারণোপযোগী কোন বস্তুই গৃহে নাই। কাপড় বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা খাদ্য বস্তু ক্রয় করিয়া আনিবেন, তবেই জীবন রক্ষা; সুতরাং গৃহে আর যাওয়া হইল না; গৃহে গিয়া মাতাকে কি বলিবেন, এক স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র কবীরের অবস্থা

জাত হইয়া কবীরের রূপ ধারণ করতঃ নানাবিধ সামগ্রী বলদে বলদে বহন করাইয়া কবীরের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। কতক জিনিস প্রতিবাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং গৃহপূর্ণ করিয়া উঠাইয়া রাখিলেন। মাতা কহিলেন, 'এত সামগ্রী কোথা হইতে পাইলি, বুঝি ডাকাইতি করিয়া আনিয়াছিস্?' কবীর গৃহ পানে রওনা হইলেন, ছদ্মবেশী রঘুবীরও এ দিকে অন্তর্দ্ধান্ হইলেন।

কবীর সেই দেশের রাজার সভায় এক দিবস উপস্থিত হইলেন। রাজা কোন কারণে তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন। কবীর রাজসভা হইতে উঠিয়া তাহার করোঁয়া স্থিত বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। রাজা অবজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং মনে মনে একটু ভয় হইল—বলিলেন "সাধু! তুমি আমার কি কোন অনিষ্ট করিলে?" মহাভক্ত কবীর উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! জগন্নাথ শ্রীমন্দিরে আগুন পড়িয়াছিল, লোক জনতায় কাহার চরণ দগ্ধ হইবে, এইজন্য অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে বারিসিঞ্চন করিয়াছি, আপনার কোন অনিষ্ট করা আমার অভিলাষ নয়।" রাজা ঐ তারিখ লিখিয়া রাখিয়া জগন্নাথ সেবাইতকে সবিশেষ জানাইলেন। সেবাইত উত্তর লিখিল, "ঘটনা প্রকৃত।" রাজা এই সংবাদে রাণী সহ কবীরের চরণে আসিয়া পড়িলেন এবং সেই দিবস হইতে ভক্তিধনে ধনী হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতিতে ধর্ম্মের চর্চ্চা দেখিলে ঈর্ষা পরবশ হইয়া থাকেন, এই প্রবাদ যে একেবারে সত্য নয়, এমন নহে। কবীরের ভক্তি ও প্রেম তাঁহাদের অসহ্য হইল, বাদসাহের নিকট আসিয়া তাঁহারা অভিযোগ করিলেন। বাদসাহ বোধ হয় হিরণ্যকশিপুর ইস্‌লাম-সংস্করণ। প্রহ্লাদ যেরূপ নির্যাতিত হইয়াছিলেন, কবীরকেও সেই সকল শাস্তি প্রদত্ত হইল। ভক্তবীর অচল অটলভাবে সকল সহ্য করিলেন। অগ্নিতে, নদীতে তাঁহাকে কিছুই করিতে পারিল না, শত্রুরা হারি মানিলেন। কবীরের অপ্রকট আশ্চর্য্যরূপ হইয়াছিল। চাদর গায়ে দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। তৎপর হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার দেহ লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। হিন্দুরা পোড়াইতে চাহে, মুসলমান কবর দিতে চাহে, কিন্তু এ দিকে শব অন্তর্ধান। মুসলমানেরা চাদরে যে ফুল ছিল, তাহা কবর দিল, হিন্দুরা তুলসী সমাহিত করিলেন।

"বস্ত্র আবরণ অঙ্গে করিয়া শুইল।
অমনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল॥
হিন্দু আর মুসলমান দুই পক্ষে মিলি।
কলহ হইল বোলা বুলি ঠেলা ঠেলি॥
কবর দিবার হেতু মুসলমান কহে।
হিন্দু তাহা না মানে জ্বালাইতে চাহে॥"

ভক্তমাল।

এরূপ ঘটনা বিরল নহে। ভগবান্ ভক্তের বিপদে নিজকে বিপদাপন্ন জ্ঞান করেন এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধার না করিয়া কখন নিরস্ত হন না।

কবীরের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিষয় জানা যায়। আর একটী বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ উপসংহার করিব। হরিদাসকে যেরূপ মায়া দেবী তাঁহার গঙ্গাতীরের সাধন স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কবীরকেও তদ্রূপ মায়াদেবী মহা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তের শরীর ভগবানের নিজস্ব, তাহা কি আর সহজে আবিষ্ট করিতে পারে? মায়া-

দেবী মোহিনীরূপে ভুলাইতে আসিয়াছিলেন।

"সাধু তাহা দেখিয়া দৃক্‌পাত না কৈলা,
হরির ভকত স্থানে হারি মানি গেলা।"

আমরা অন্ত কবীরের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

মৃত্যুশয্যায় গ্লাডষ্টোন

যে গ্লাডষ্টোনের মেঘমন্দ্রানুকারী কণ্ঠনিনাদে পার্লামেণ্ট মহাসভার বিরাট গৃহ কম্পিত হইত—পাশ্চাত্য জগতের ধনী, নির্ধন, রাজা প্রজা, যাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিত—দেশ দেশান্তর হইতে কত জ্ঞানী, মানী, পণ্ডিত, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি যাঁহাকে দর্শন করিবার আশায় ইংলণ্ডে আগমন করিত—ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে যিনি আপন প্রতিভা বলে ভাস্বরতম নক্ষত্রস্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন, অবশেষে সেই মহামতি গ্লাডষ্টোনও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না।

North Wales এবং Liverpool রেলওয়ে যখন প্রথম খোলা হয়, তদুপলক্ষে লিভারপুলে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি বলিয়াছেন—

"It is quite true, this enterprise has for me a particular interest ; for in Liverpool, which may be considered one of its termini, I first drew the breath of life and saw the light of heaven. With Hawarden, if it please God, my last acquaintance with the air is likely to be connected."

কে জানিত যে, মহাপুরুষের সেই কথা দৈববাণী হইবে, হাওয়ার্ডেনেই এই গ্লাডষ্টোনের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে? কিন্তু তাহাই হইয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বার্দ্ধক্য এবং অমানুষিক পরিশ্রম এতদুভয়ই ইহার কারণ। ব্যাধিপীড়িত গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যখন বায়ুপরিবর্ত্তন করিবার জন্য গমন করিলেন, তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে, শান্তি এবং বিশ্রাম তাঁহার ভগ্নজীবনে আবার শক্তি সঞ্চার করিবে—আবার তাঁহার সেই বজ্র-গম্ভীর বক্তৃতায় পার্লামেণ্ট মহাসভা ঘন আন্দোলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আর তাহা হইল না।

গ্লাডষ্টোন কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্রাম লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কর্ম্মঠ জীবন কখনই আলস্যপ্রিয় হইতে পারে না। তাই তখনও গ্লাডষ্টোন নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া কাগজে কাগজে তাহা পাঠাইতেন—নানা স্থানে বক্তৃতা দিতেন—এমন কি, দুই একখানি করিয়া পুস্তক পর্য্যন্ত প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

একস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে পৌছিবার দিন এবং সময় প্রকাশিত হইলে গ্লাডষ্টোনকে দেখিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেসনে জনতা হয়, পাছে অন্ততঃ ছোটখাট রকমেরও একটী বক্তৃতা তৎক্ষণাৎ করিতে হয়—এই সকল ভয়ে যতদূর সম্ভব, তাঁহার গতিবিধি গোপন রাখা হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের অধিবাসীরা মহামান্য গ্লাডষ্টোনকে এতই ভালবাসিত যে, অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তাঁহার

আত্মীয় বন্ধুগণ সাধারণের উদ্বেগপূর্ণ ব্যগ্রদৃষ্টি হইতে গ্লাডষ্টোনকে অন্তরে রাখিতে পারিতেন না। গ্লাডষ্টোন কোন্ সময়, কোন্ স্থানে কোন্ ট্রেনে (Train) যাত্রা করিবেন, তাহা কেহ জানে না, অথচ যেমন সেই ট্রেন, সেই মহাপুরুষকে মস্তকে করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ৫।৭ মিনিট পরেই সে স্থানে আর লোক ধরিত না। কি জানি, কি এক বিদ্যুতের বলে গ্লাডষ্টোনের আগমন-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইত। দলে দলে লোক আসিয়া সেই মহাপুরুষকে দর্শন পূর্ব্বক ধন্য হইত। গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের দেবতা হইয়াছিলেন।

দিন দিন তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন সমস্ত সভ্য জগতের একাগ্র আকুল দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল। লণ্ডনের মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক এবং যে সকল পত্র পত্রিকা একদিনে দুই তিনবার করিয়াও মুদ্রিত হয়, তাহাতে গ্লাডষ্টোনের সংবাদ থাকিত। ইহা ভিন্ন প্রথম প্রথম কিছু দিন প্রত্যহ ৫।৬ বার করিয়া গ্লাডষ্টোনের শারিরীক অবস্থার সংবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত, তাহার পর প্রতি ঘণ্টায়। বুঝি কোন আত্মীয়ের পীড়া হইলেও কেহ এত ব্যগ্র হয় না।

হাওয়ার্ডডেনের সেই সুন্দর প্রকাণ্ড গৃহের সম্মুখে প্রতিদিন শত সহস্র লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আমরা দেবদর্শনে গেলেও বুঝি অমন করি না। কিন্তু গ্লাডষ্টোনের সংবাদ লইবার জন্য লোকে এমনি করিত। সকলে দেখা করিতে আসিয়া গ্লাডষ্টোনের বিশ্রাম ভঙ্গ করিবে বলিয়া তাঁহার পুত্রগণ কটক সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতি দিন ৪।৫ বার করিয়া, গ্লাডষ্টোনের অবস্থা সেই গৃহ প্রাচীরে লিখিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইত। কম্পিত দেহে, আকুল হৃদয়ে, ব্যাকুল আগ্রহে লোকে তাহা পাঠ করিত, আর তখনি অমনি কত ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত সেই সংবাদ তারযোগে শত সহস্র ক্রোশ দূরে প্রেরিত হইত। ধন্য গ্লাডষ্টোন! ধন্য ইংলণ্ড! আর ধন্য সেই জাতি—যাহারা প্রতিভার সম্যক্ সম্মান জানে।

গ্লাডষ্টোনের নিকট, তাঁহার পীড়ার জন্য দুঃখ জানাইয়া, কত স্থান হইতেই যে তারের সংবাদ আসিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাপুরুষ গ্লাডষ্টোন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও সেই সকল সংবাদের প্রত্যুত্তর দিতেন। তিনি বলিতেন, আর তাঁহার পুত্রগণ লিখিত। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারও (Kruger) প্রিটোরিয়া হইতে তারে দুঃখ জানাইয়াছিলেন। ক্রুগারও বৃদ্ধ—গ্লাডষ্টোনও বৃদ্ধ; ক্রুগারের শরীরও তখন খুবই অসুস্থ, আর গ্লাডষ্টোনত তখন মৃত্যু-শয্যায়। তাহার উপর, গ্লাডষ্টোনের উদারতার গুণেই সেবারকার মত ইংরাজের হস্ত হইতে প্রিটোরিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। তাই এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তারযোগে সেই সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রুগারের নিকট হইতে তারের খবর পাইয়া গ্লাডষ্টোন খুব সুখী হইয়াছিলেন।

যখন গ্লাডষ্টোনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার চিকিৎ-

সকগণ চমকিত হইলেন। কিন্তু গ্লাড-ষ্টোন বলিলেন, "যদি আমার সময় হইয়া থাকে, তবে কেন আপনারা সে কথা গোপন করিতেছেন।" চিকিৎসকদিগের নিকট যখন গ্লাডষ্টোন শুনিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি তিল মাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্ত হইলেন। *

রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন, মৃত্যু যাহাতে সত্বর হয়, নিজেই তাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেন। তাঁহার পবিত্র জীবন ধর্ম্মের প্রতি পুণ্যময় জীবন্ত বিশ্বাসের একটী আদর্শ। তাই মৃত্যু দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠেন নাই। তাই তিনি শুধু মনে করিতেন যে, ইহা আর কিছুই নহে, তাঁহার আত্মার ইতিহাসের একটী অধ্যায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে মাত্র।

হাওয়ার্ডেনে বসন্ত সমাগম হইল। আকাশ বেশ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হইল —বায়ু উষ্ণ হইল। অনেকেই মনে করিল যে, বাসন্ত পবনের স্নিগ্ধোষ্ণ মধুর শ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া গ্লাডষ্টোনের জীবন-সূর্য্য বুঝি আরও কিছুদিন পশ্চিমগগনের সুদূর শেষ প্রান্তে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দাঁড়াইবে। যাঁহার অমঙ্গল দেখিলে আমাদের হৃদয়ের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, যাঁহার মঙ্গল সংবাদ শুনিলে আমরা বড় সুখী হই, যাঁহার অভাব হইলে আমরা বিবেচনা করি যে, পৃথিবীর অর্দ্ধেক সৌভাগ্য বুঝি হ্রাস হইয়া যাইবে—আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হয় যে, তাঁহার জীবন-প্রদীপ পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকুক। এই বাতাসের পরিবর্ত্তনে, আকাশের পরিবর্ত্তনে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে সকলে বিবেচনা করিল যে, মহামতি গ্লাডষ্টোন বুঝি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিবেন। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডাইবে?

এই সময় হইতেই গ্লাডষ্টোনের বড় ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। যাহারা তাঁহার রোগ-শয্যায় প্রাণপণ পরিচর্য্যা করিত, তাহারা অনেক সময়ই শুনিত যে, গ্লাড-ষ্টোন ফরাসী কিম্বা অন্য কোন ভাষায় আপনমনে অস্পষ্টভাবে দুই চারিটী করিয়া কথা কহিতেছেন। কখনও বা শুনিতে পাওয়া যাইত যে, তিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতেছেন।

তখন পর্য্যন্তও গ্লাডষ্টোনের বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন—তখন পর্য্যন্তও দূর দূরান্তর হইতে তারের সংবাদ তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিত। লর্ড রোজবেরী, মিঃ জন মার্লি এবং মিঃ জর্জ ডবলিউ ই রাসেল (George W.E. Russel) গ্লাডষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গ্লাডষ্টোন তখন অধিক কথা কহিতে পারেন নাই—তাঁহার সেই অপরিসীম শক্তি তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

গ্লাডষ্টোনের স্বর্গারোহণের সময় নিকট হইল। দুইদিবস তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিশাল ভুজযুগল সেই প্রশস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত ছিল। নিদ্রা যাইবার সময়ও তিনি এই রূপ ভাবে শুইয়া থাকিতেন। গ্লাডষ্টোনের

---

* "Mr. Gladstone is fully informed of his own condition; he asked the doctors to tell him the truth, and he was thankful when informed that there is no chance of recovery. It will be a comfort to all his friends to know that his state of mind is one of complete happiness; his life goes on quietly and evenly.' The Westminster Gazette, Monday, 28th March, 1898.

সেই কারুকার্য্যবিহীন, অতি সাধারণ, লৌহ পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে তাঁহার পত্নী, পুত্রগণ এবং অন্যান্য সকলে উপবিষ্ট। সকলেই বিষণ্ণ—সকলেই আকুল—সকলেই নির্ব্বাক্।

সেই ১৯শে মের (১৮৯৮) সুন্দর, প্রফুল্ল প্রভাত হাওয়ার্ডেন্ গ্রামের উপর দিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। গ্লাডষ্টোন-পত্নী তখন তাঁহার স্বামীর হস্তখানি নিজহস্তে ধারণ করিয়া ব্যাকুলাগ্রহান্দোলিত কম্পিত হৃদয়ে তাঁহার নিমীলিত নেত্রের দিকে সেই * সুন্দর, প্রশান্ত, চিন্তাশূন্য, বেদনাশূন্য বদনমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই একটী রুদ্ধ আবেগ, ব্যথিত বেদনা, কাতর নিঃশ্বাস যেন তাঁহার যাতনা-মথিত বক্ষের জীর্ণ অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল। তিনি সেই ভীষণ শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অবশেষে সময় আসিল। পাঁচটা বাজিবার কিছুক্ষণ পরই গ্লাডষ্টোন তাহার স্নেহময়ী পত্নীর কম্পিত হস্তে হস্ত রাখিয়া একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সহিত স্বর্গে যাত্রা করিলেন। আর তাঁহার সেই নশ্বর দেহ পৃথিবীর ধূলার উপর পড়িয়া রহিল।

মৃত্যুর সময় গ্লাডষ্টোনের মুখমণ্ডল একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকের ধারণা আছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই মানস নয়নে তাহার গত জীবনের কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও গ্লাডষ্টোন সুখী হইয়াছিলেন—তিনি শান্তিতে মরিতে পারিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার গতজীবন বিশ্বনিয়ন্তার প্রশংসাবাদে, এবং ন্যায়ের জন্য, শান্তির জন্য, দয়ার জন্য, শক্তির জন্য পবিত্র পুণ্যময় শোণিতবিহীন যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়াছে—তাঁহার বিগত জীবন সেই পুণ্যকিরণ সম্পাতে আলোকিত। তাই বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গ্লাডষ্টোনের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্লাডষ্টোন গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে। যতদিন ইতিহাস থাকিবে, ততদিন গ্লাডষ্টোন জীবিত থাকিবেন। পৃথিবীতে কয়জন গ্লাডষ্টোনের জন্ম হয়? পার্লামেণ্ট মহাসভার মন্দির কয়জন গ্লাডষ্টোনের সারগর্ভ জীবন্ত বক্তৃতায় কম্পিত হইয়াছে? কয়জন বিদেশীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণ বলিয়া থাকেন—"যাহাই মহৎ এবং পবিত্র এবং কোমল, তিনি তাহারই অধিনায়ক। অন্ধতমোরাশি পরিব্যাপ্ত পৃথিবীতে উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার উদারতাও সমুজ্জ্বল।" শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* "Another visitor declaed that, beautiful as Mr. Gladstone's face had been during the best days of his public career, it had never looked so beautiful as when it lay upon the pillow of his dying bed"

ভাদরে অবসাদ।

এখন
গৃহের কোণে বো'সে বো'সে
পুঁথি ঘেঁটে দিন কাটাই,
হুগো পড়ি হাইনে পড়ি
জয়দেবেতে মন মাতাই;
ভাজা পোড়া নিম্‌কি খে'য়ে
শ্রাবণ গেল চ'লে,
বিরহটা এসেছিল
ভালই হ'ত ম'লে!!

সবাই পোড়ে ওই আগুনে
লাগ্‌ল না আঁচ আমার গায়,
ভিজ্‌ল না'ক এমন দিনে
পটল চেরা আঁখি হায়!
হাল প্রেমিকে বল্‌বে মোরে
ওটা একটা চিত্তহীন,
কেবল কঠোর, বিষয় কর্ম্মে
হ'য়ে আছে নিত্য লীন।
যে যা বলে তাই স'ব ভাই
পয়সা যে পাই ফল,
ওদের
টাকা আছে নাইক খরচ
আছে লম্বা গল্প।
ভাব্‌ছি বো'সে, হুগো হতে
না হয় করি তরজমা,
স্পিরিটটা রাখ্‌তে নাল্লে
হ'তে হবে দরকমা,
পক্ক হস্ত জ্যোতিরিন্দ্র
"বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়,
আঁধার সে দিন মাখিয়ে দেছেন
হুগোর শুভ্র চন্দ্রিকায়।
"Veni Vidi Vizi"* ওটি
যেম্‌নি আছে তেম্‌নি থা'ক্,
তরজমাটার কণ্ডূয়ন,
যেথা ইচ্ছা সেথায় যা'ক্।
মাহ ভাদর, পূর্ণ বাদর,
ঘিরেছে গগন মুদিরে,
গর্জ্জে জীমূত বর্ষে জীমূত
মুদে আসে আঁখি সুধীরে।
সখাদের কুসুমিত
হাসি ভরা মুখগুলি,
স্মৃতির মাঝে আস্‌ছে যেন
পুরাতন সুর তুলি।

* হুগোর একটী কবিতা।

রঙ্গপ্রিয় 'বিনয়চন্দ্র'
ব্যঙ্গপ্রিয় 'হরি'
বউ-আদুরে 'প্রমথ করে'
কেন আজি স্মরি?
মনে আসে তরী বেয়ে
আমোদ করে যাওয়া,
গ্রাবু খেলে হুকা ধরে
রাম রাজত্ব পাওয়া;
মুড়ী চিড়ের খস্‌খ'সে গা
মাজিন্‌ ক'রে ঘীতে,
কাড়াকাড়ি ক'রে খেয়ে
আরাম পেতাম চিতে।
আরাম হ'ত, বেসুরো গান
কোরস্‌ ক'রে গেয়ে,
আরাম হ'ত কুলোবিধুর
সঙ্গটুকু পেয়ে,
সখার বধূর সকাশ হ'তে
সখায় কেড়ে নিয়ে,
পূর্ণ হ'ত হর্ষরসে
পাঁচটী সখার হিয়ে;
সতীন বলে বোধ হইত,
সকল সখার যোষায়
আমোদ পেতাম উদ্দীপিত
করে তাদের গোসায়।
এখন
সখায় সখায় ছাড়াছাড়ি
সখি সখায় মেশা,
আমাদের
ভাড়ামি আর নিন্দা-চর্চ্চা
হ'য়ে পড়েছে পেশা।
সরল চেতায় ডিপুটি চারু,
ডিপুটি আশুভায়া,
স্বপ্নে যেন ভেসে এসে
ঢাল্‌ছে প্রাণে মায়া।

ওদের যদি কাছে পেতাম
আজকে ভবে প্রাণ,
মর্ত্ত্যে বো'সে দিব্য সুধা
কত্তো ধীরে পান।
এমন দিনে C. S. অতুল
আছে গো কেন ভুলি,
এমন দিনে, মনের কথা
লেখে না কেন খুলি?
আমরা কি তার পর হয়েছি,
তাইতে আছে ভুলে?
স্মৃতি নদীর জল কি গো তার
ছোটেনি কূলে কূলে?
ধুতির তুলা, এক মনেতে
আপনি পিঁজে পিঁজে
নয়ন দুটি আস্‌ছে দেখ্‌ছি
একটু একটু ভিজে,
'যতীন'ওতো পর হয়েছে
শরচ্চন্দ্রও তথা
ভুলে যাওয়া আর কিছু নয়
মরে যাওয়ার কথা।
বয়স হ'লে বর্ত্তমানে
স্বার্থে ভরে প্রাণ,
প্রেম-নদীতে থাকেনাক
বিন্দু মাত্র টান,
ভুলের কথা মনে ক'রে
কেন আর ফোঁস ফোঁসাই,
কৃষ্ণে করি আত্ম দান
আমরা ত ভাই মূল গোঁসাই।
হরিকে দয়াময়—
আঁধার রাতের দ্বারটি খুলে
পথ ক'রে দেও প্রাণবধূ,
আমি
জগত ছেড়ে সেথায় গিয়ে,
প্রাণ ভরে খাই প্রেম-মধু।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

কোকিল।

যেমন হরি ছাড়া কীর্ত্তন নাই, তেমনি, কোকিল ছাড়া বোধ হয় বিরহ বর্ণনা হয় না। কোকিল না থাকিলে সুদীর্ঘ বিরহ বর্ণনায় মল্লিনাথের টীকা সমেত শ্রীহর্ষ কবির এক কুড়ি শ্লোক পড়িবার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। কাব্য রাজ্যে কোকিলের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। উৎকল দেশে যে কোন প্রকার বিলাপ গীতির নাম "কোইলি"। এত বড় ক্ষমতাশালী পক্ষীর জীবন চরিত লিখিলে কাব্য-রসিকেরা একবার তাহা পাঠ করিবেন, আশা করি।

পক্ষীটী যে পরান্ন প্রতিপালিত, একথা কাহারও অবিদিত নাই। কোকিলবধূ, কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া, সন্তান পালনের কর্ত্তব্যভার এড়াইয়া, আত্মসুখ অন্বেষণে বাসন্ত-শোভা-পরিশোভিত, মলয়-সমীরণ-সেবিত, কুঞ্জে কুঞ্জে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায়। কোকিল বসন্তের পাখী, এবং সে বসন্ত ক্ষণস্থায়ী। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করিয়া লইতে হইবে; বনে বনে ফুল ফুটিয়াছে, শাখায় শাখায় নব মঞ্জরী দুলিতেছে, তাহার উপর আবার সেই পুষ্পিত ও মঞ্জরিত শাখা হইতে, প্রণয়ী, পঞ্চম স্বরে 'কুহু কুহু' করিয়া ডাকিতেছে। কোকিল-বধূ কি তখন সন্তান লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে? তাড়াতাড়ি সুখভোগ সমাপ্ত করিবার জন্য, পরের ঘাড়ে সন্তানগুলির ভার চাপাইয়া, প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করে। মাতার পক্ষে এ প্রকার নির্ম্মমতার দৃষ্টান্ত বিহঙ্গ জগতে বড় বিরল। খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাইবেল গ্রন্থে, সন্তানবাৎসল্য পরিশূন্যা বলিয়া, অষ্ট্রিচ্-বধূর প্রতি তিরস্কারের বাণী আছে। কিন্তু আমাদের বেদ-পুরাণে কোকিলের নামে কোন অভিযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাক বেচারা, আপনার ভাবিয়া পরের ডিমে তা দিয়া, কোকিলের বংশরক্ষা করে, কিন্তু কোকিল-শাবকের সেজন্য কৃতজ্ঞতা দূরে থাকুক, বরং জন্ম মাত্রে আপনার ঈর্ষা এবং আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া, কাকশিশুগুলিকে ঠোক্‌রা-

ইয়া ঠোক্‌রাইয়া দূর করিয়া দিয়া, সকল খাদ্য আপনি খায়। যাহারা পিতৃমাতৃ স্নেহে প্রতিপালিত হয় না, অথবা যাহাদিগের পিতামাতা স্বার্থপর এবং নির্ম্মম, আশৈশব তাহাদিগের স্বার্থপরতা আশ্চর্য্য নহে। ইহাও বলিতে পারা যায় যে, কোকিল কেন, পরান্ন প্রতিপালিত মানুষেরাও অনেক সময়ে প্রত্যুপকারটা, বুকে বসিয়া দাড়ি ছিঁড়িয়াই শেষ করেন।

স্বার্থপরতা এবং আত্মম্ভরিতা কোকিলের জাতির দোষ, বংশের দোষ। কিন্তু এসকল দোষের জন্য কোকিলকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। বেচারার দেহযন্ত্র যে প্রকার ভাবে গঠিত, এবং যে প্রকার ঘটনাচক্রের মধ্যে উহাকে জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাতে উহার পাপ, বিধিলিপির ফল বলিয়া, একটু কৃপার চক্ষে দেখা ভাল। মানুষও অবস্থার দাস, একথা ভাল করিয়া মনে রাখিলে, অনেক হিংসা-বিদ্বেষ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিতাম। যত চেষ্টা করিলেও বিধাতার কলমের কালি পুঁছিতে পারা যায় না।

একবার কোকিলের দেহযন্ত্রের প্রতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথমতঃ, স্ফীত নীচ-বিন্যস্ত পাকস্থালী, এবং শরীরের তুলনায় ক্ষুদ্র জননেন্দ্রিয়, এই পক্ষীজাতির সকল চরিত্রের মূলে। পাকস্থালীর বিশেষ গঠন প্রণালীর ফলে, কোকিল বড় উদরপরায়ণ, অবিশ্রান্ত আহার করিয়াও দগ্ধোদর প্রশমিত হয় না। ক্ষুধার আতিশয্য এবং ভোজনলোলুপতা বৃদ্ধি হইলে, প্রেমের ভাব এবং শান্তিময় আসঙ্গ-লিপ্সা বিকশিত বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অপিচ, জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র বলিয়া, এবং সেই জননেন্দ্রিয়ে রক্তপ্রবাহের অল্প সঞ্চার হয় বলিয়া, সাধারণতঃ সন্তান-জনন প্রবৃত্তির প্রবলতা নাই। সন্তান জনন প্রবৃত্তির গভীরতার উপর যে প্রেমের মধুর ভাব প্রতিষ্ঠিত, একথা অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা স্বীকার না করিলেও, ইহা সত্য। প্রবল আসঙ্গলিপ্সা নাই বলিয়া, কোকিল জাতির মধ্যে "জোড় বাধা" দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের আকর্ষণের অভাবে, এবং অধিকাংশ সময় নিঃসঙ্গ বাসের ফলে, স্নেহ মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিকশিত হয় না। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই একটা নিয়মিত কালে আসঙ্গলিপ্সা জাত হয়; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে এই প্রবৃত্তি নিত্যস্থায়ী। এই জন্য মনুষ্য সমাজ বিস্তৃত ও দৃঢ়বদ্ধ, এবং মানবজাতির মধ্যে প্রেমাদি সর্ব্বপ্রকারের সদ্গুণ অধিক পরিমাণে বিকশিত। স্থায়ী আসঙ্গলিপ্সা নাই বলিয়া কোকিলেরা সঙ্গচ্যুত হইয়া বাস করে; কিন্তু আবার যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জননাভিলাষ জাত হয়, তখন পুংস্কোকিলের ক্ষণিক উত্তেজনা অদম্য হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় কথা, কোকিল জাতির মধ্যে পুংস্কোকিলের সংখ্যা অধিক। ৬টী কোকিলের মধ্যে প্রায় ৫টী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। সতীত্বের অভাবে কোকিল-বধুর মনে মাতৃধর্ম্ম পরিস্ফুট হইতে পারে না, এবং হৃদয় স্নেহমমতা শূন্য হয়।

তৃতীয়তঃ, কোকিল এক প্রকার হুল্ বিশিষ্ট পোকা বহু পরিমাণে আহার করে। এই হুল্‌গুলি অজীর্ণ উৎপাদন করে বলিয়া, পেটুক কোকিল জাতি, একটু অজীর্ণ রোগগ্রস্ত। (Dyspeptic)।

অপরিমিত বুভুক্ষা, স্থায়ী অজীর্ণতা, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতা, সঙ্গশূন্যতা, পরগৃহে কোকিল শাবকের দ্রুত পরিবর্দ্ধন, এবং পুরুষজাতির আধিক্যের ফলে, কোকিলেরা স্বার্থপর এবং স্নেহমমতা-শূন্য। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম যে, কুচরিত্রতার জন্য কোকিলের উপর রাগ করিতে ইচ্ছা হয় না।

যে পঞ্চমস্বরে—যে কুহু ধ্বনিতে জগৎ মুগ্ধ, উল্লিখিত শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি তাহারও কারণভূত। বুভুক্ষা, অজীর্ণতা এবং বসন্ত-কালজাত ক্ষণিক এবং অদম্য কাম প্রবৃত্তি, কুহুরবের মূলে। দেখ ঐ কুহুস্বর, কেমন সহসা সমুত্থিত, আকাঙ্ক্ষাভরা অতৃপ্তি জ্ঞাপক, ব্যগ্রতাময় এবং চাঞ্চল্যপূর্ণ! সেই জন্য শুধু রোহিণী কেন, সকল বিরহিণীর মনেই, ঐ কুহুস্বরে কতকগুলি

বিশ্রী কথার উদয় হয়। কোকিলের স্বরের যে প্রকৃতির বর্ণনা করা গেল, স্বর শ্রবণে যে বিরহিণীর মনের ভাব ঠিক সেই প্রকারের হইয়া উঠে, একথা অতি সুন্দর ভাবে বঙ্গের অতুল্য অমর কবি, কৃষ্ণকান্তের উইলে লিখিয়া গিয়াছেন। পড়িয়া দেখ, যে কোকিলের স্বরের যে বিশ্লেষণ করা-গেল, তাহার সহিত রোহিণীর মনের ভাব এক সুরে বাঁধা। * কথা কয়েকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কারণ আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, চাঞ্চল্য এবং ব্যগ্রতা প্রভৃতির ছবি, অত দক্ষতার সহিত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে, কাহার সাধ্য? বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন যে কোকিলের ডাক শুনিলেই মনে হয় "কি যেন হারাইয়াছি যেন তাই হারাইবাতে জীবন সর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কে নাই—কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারে অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।"

হে বসন্তদূত, হে নির্ম্মম, হে কৃষ্ণকায়, হে স্বার্থপর, হে অকৃতজ্ঞ, হে পরভৃৎ, তোমার চরিত্র বুঝিয়াছি—আগামী বসন্তে আর তোমার কুহুরবে ভুলিব না। যখন কলিকাতার সহরে, টবে ফুল ফুটিবে, টানা পাখা মলয়সমীরণ প্রবাহিত করিবে, তখন তুমি পিঞ্জর-নিকুঞ্জ ভেদ করিয়া যত কুহু কুহু করিলেও কেহ কর্ণপাত করিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বুয়র যুদ্ধ। (২)

অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট।

বুয়রগণ পরাধীনতা অসহ্য মনে করিয়া নাটাল পরিত্যাগ করিলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে পরস্বাপহারী দুর্ব্বল-পীড়ক প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ সাধু সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া বহির্গত হইলেন? তাঁহাদিগের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে ন্যূনতর এবং অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ আদিমবাসীদিগকে তাহাদিগের পিতৃপিতামহের ভূমি হইতে তাড়িত ও অপসারিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, এই মহদুদ্দেশ্য! অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট এই মহৎ সঙ্কল্প-প্রসূত।

অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট্ স্থাপিত হওয়ার কতিপয় দিবস পরই, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, বুয়রদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত,একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। বুয়রদিগের নেতৃগণ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহাতে আবার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন, এবং ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে ফ্রি-ষ্টেট্ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার নিমিত্ত রেসিডেণ্টকে নোটিস্ দিলেন। এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার যেরূপ ফল হইতে পারে, তাহাই ঘটিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ ২৯ আগষ্ট তারিখে বুমপ্লাযটস্ নামক স্থানে বুয়র এবং ইংরেজের মধ্যে এক যুদ্ধ হইয়া গেল। বুয়রগণ তাহাতে পরাজিত হইলেন।

অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অরেঞ্জ নদ পার্শ্বস্থ রাজ্য (Orange River Sovereignty) নামে আখ্যাত হইল। ফ্রি-ষ্টেট্ বাসী বুয়র দিগের স্বাধীনতার স্বপ্ন আবার ভাঙ্গিল।

ইংরেজগণ কেবল রাজ্যলোভে বুয়রদিগের স্থাপিত ফ্রি-ষ্টেট্ ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় ফ্রি-ষ্টেটের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তৎকালীয় ব্রিটিস্ রেসি-

ডেন্ট অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত করার মূল কারণ ছিলেন; তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী; কিন্তু শীঘ্রই একথার সত্যতা অপ্রমাণিত হইল। ফ্রি-ষ্টেট্ ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, বশতুদিগের রাজা মশেশের সহিত ব্রিটিস-দিগের কলহ আরম্ভ হইল। তখন নবরাজ-শক্তি রক্ষা করার নিমিত্ত এক সহস্র বুয়রকে বশতুদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করা হইল; তন্মধ্যে ৭০ জন মাত্র বুয়র সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ব্রিটিস্ রেসিডেণ্ট বিপন্ন হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রিটরি-য়সের সাহায্য ব্যতীত তিনি নিজের ক্ষমতায় বুয়রদিগকে অস্ত্রধারণ করাইতে সক্ষম হইবেন না। প্রিটরিয়স্ তখন দেশত্যাগী, কেপ-গবর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহী প্রিটরিয়সের মস্তকের মূল্য ২০০০ পৌণ্ড নির্দ্ধারণ করি-য়াছেন। অথচ সেই প্রিটরিয়স্ ব্যতীত নবস্থাপিত গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব জন্য বুয়র বীরগণ অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নন। এ ঘটনায় ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, বুয়রগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী নহেন। আরল্ গ্রে, ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে গবর্ণর সার্ হেরি স্মিথকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যে অধিবাসীগণ ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যাধীনে বাস করিতে ইচ্ছা করে, এই কথা জানিতে পারিয়া ফ্রিষ্টেট ব্রিটিস্ রাজ্য-করা ভুক্ত হইয়াছিল; তাহারা যদি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব প্রাণের সহিত ইচ্ছা না করে, তবে তাহাদিগকে আর শাসনাধীনে রাখা উচিত নয়। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের এই উদার রাজনীতির প্রতিও কোন কোন ইতিহাস-লেখক অন্যায়রূপ দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিতে পাইলেন যে, ফ্রি-ষ্টেট হস্তগত করিয়া কিছুই লাভ হয় নাই, বরং অনর্থক বহুল অর্থের ক্ষতি হয় এবং অসভ্য জাতিদিগের সহিত বারম্বার নিষ্ফল কলহ বিবাদে লোকক্ষয় ব্যতীত আর কোন ফল হয় না, তখন বুয়র এবং অসভ্যদিগকে তাহাদিগের অদৃষ্টহস্তে অর্পণ করিয়া অপ-সৃত হওয়াই ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন। * এইরূপ অনুদার ভাব দ্বারা ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইয়াছিলেন, একথা আমরা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারি না। আর্থিক লাভ ব্যতীত, শিক্ষা, সভ্যতা এবং ধর্ম্মের বিস্তার যে প্রত্যেক সুসভ্য জাতির প্রধান কর্ত্তব্য, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট তাহা কোন দিনই বিস্মৃত হন নাই; এবং বর্ত্তমান অলাভজনক স্থান যে পরিণামে বিপুল লাভের সম্পত্তি হইবে, ইহা তাঁহারা অবশ্যই জানিতেন। সুতরাং আমরা এই মহৎ ও আদর্শ কার্য্যকে কখনও অনুদার-নীতি-সম্ভূত সঙ্কীর্ণতার ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এবং বুয়র কৃষকদিগের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধি পত্রের কয়েকটী অবধারণার স্থূল মর্ম্ম মাত্র আমরা পাঠকবর্গের নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি—

বুয়র কৃষকগণ (farmers) তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত বিধানানুসারে তাহাদিগের শাসন কার্য্য পরিচালিত করিবেন, তদ্বিষয়ে, এবং ভয়াল নদের অপর পরস্থিত রাজ্য প্রতি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করিবেন না।

রঞ্জিতকায় জাতিদিগের সহিত (Coloured nations) সহিত সর্ব্ব প্রকার মৈত্রী

---

* "Grown sick at last of enterprises which led neither to honor nor peace, we resolved, in 1852, to leave Boers. Kaffirs, Basutas, and Zulus to themselves, and make the Orange river the boundary of British responsibilities. we made formal treaties wlth the two Dutch states binding ourselves to interfere no more between them and the natives, and to leave them either to establish themselves as berrier between ourselves and the interior of Africa or to Sink, as was considered most likely, in an unequal struggle with warlike tribes,by whom they were infinitely outnumbered."

aceana p. 36.

সন্ধি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতেছেন।

আদিম অধিবাসীদিগের নিকট অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করা, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং বুয়র কৃষককুলের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বুয়রগণ বলেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত তিনটী নির্দ্ধারণই অতি অল্পকাল মধ্যেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ধিভঙ্গাপরাধে অপরাধী কিনা, তদ্বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নহে; কিন্তু যে যে বিষয়োপলক্ষে সন্ধিভঙ্গের অপরাধ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আরোপিত হইয়াছে, সেই কয়েকটী ঘটনা মধ্যেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে বুয়রগণ কি ভাবের দ্বারা তাঁহাদিগের জাতীয় অস্তিত্বের আরম্ভ হইতে পরিচালিত হইয়াছিলেন; এবং সেই ভাবের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় কি না?

পাঠকগণ মনে করিবেন না, যে আমরা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে রাজশক্তির অকলঙ্ক আদর্শ চন্দ্রিমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বুয়র এবং ব্রিটিস জাতির কৃতকার্য্যের যখন নিকাশ হইবে, তখন কোন্ জাতির বিরুদ্ধে কি রূপ দায়ধারা হইবে, তাহা কেবল সর্ব্বদর্শী সর্ব্বপরিক্ষকই বলিতে পারেন। ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ইংরেজজাতি কেবল পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর কয়েকটী মহাদেশে, দ্বীপ এবং উপদ্বীপে রাজত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। বহু-যুদ্ধজয়ী বহু-দেশ-শাসক ব্রিটিসজাতির হস্তে যত নরক্ষয় হইয়াছে, মুষ্টিমেয় বুয়র কৃষক পরিমিত পরিমাণ ভূমিখণ্ডে তত নরহত্যা করিতে কখনই সক্ষম হন নাই। তবে ব্রিটিস জাতি জয়ী, গৌরবান্বিত এবং উন্নত হইতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা উপসংহারে দিব। এইক্ষণে বুয়রজাতির কার্য্যকলাপ আমাদিগের আলোচ্য, তাহাই পাঠক মহাশয়কে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রথমাভিযোগ—এইক্ষণে যে স্থান কিম্বার্লী নামে পরিচিত, এবং বর্ত্তমান বুয়র যুদ্ধে যে স্থান সর্ব্বত্র পরিচিতনামা, ব্রিটিস শাসনকালে ঐ স্থান ফ্রি-ষ্টেটের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণ শাসন করিতেন; প্রকৃত প্রস্তাবে তৎকালে কিম্বার্লী ফ্রি-ষ্টেটের অন্তর্ভূক্ত রূপেই শাসিত হইত। এই কিম্বার্লীতে বহু মূল্যবান হীরকখনি আবিষ্কৃত হইল। পরে ফ্রি-ষ্টেট যখন ব্রিটিস সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কৃষকগণের শাসনাধীনে আসিল, তখন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কিম্বার্লী পরিত্যাগ করিলেন না। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, ফ্রিষ্টেট কিম্বার্লীর অধিকারী ছিলেন না, তদ্দেশীয় এক জন আদিমনিবাসী ঐ স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, সুতরাং কিম্বার্লী প্রত্যর্পণ না করা, কোন প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কিম্বা সন্ধি-বিরুদ্ধ কার্য্য হয় নাই। বুয়রগণ বলেন যে, ব্রিটিস ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে এই কথা অমূলক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং তৎপর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থানের মূল্যস্বরূপ ৯০,০০০ পাউণ্ড দিয়াছেন। ঐ পণ স্থানের মূল্যানুরূপ হয় নাই।

বুয়রদিগের অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তথাপি উপরোক্ত ঘটনা মধ্যে মাত্র এই দেখা যাইতেছে, যে বুয়রগণ দুর্ব্বল আদিম-বাসীদিগকে হত আহত তাড়িত এবং অপসৃত করিয়া তাহাদিগের যে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাই আবার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের মুখ হইতে কাড়িয়া লইলেন; পাপের ধন ভোগে আসিল না। পক্ষান্তরে অপর যে প্রশ্ন পাঠক মহাশয়ের মনে সমুদিত হওয়ার সম্ভাবনা, আমাদিগের উপসংহারে আমরা তাহার উত্তর দিব।

দ্বিতীয় অভিযোগ—বশতুগণ বুয়রদিগের সর্ব্বগ্রাসী বাসনার তাড়নায় স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইল; এমন দিন অতিবাহিত হইত না, যে দিন তাহাদিগের রক্ত পাতিত না হইত। যখন অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল, ক্ষিপ্ত বশতুগণ তাহাদিগের সর্ব্বস্বাপহারী, সুখস্বচ্ছন্দনাশী বুয়রদিগকে আক্রমণ করিল, এবং অকথ্যরূপে বুয়রদিগকে পীড়িত ও অত্যাচারিত করিল। বুয়রগণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহার

শতগুণ প্রতিহিংসা নিলেন, তাহাতেও তাঁহাদিগের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। তখন ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট, বশতুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। বুয়রগণ বলেন, যে এ কার্য্যেও সন্ধিভঙ্গ করা হইয়াছে।

এই কার্য্যে যে সন্ধিভঙ্গ করা হইয়াছে, একথা আমরা স্বীকার করি না। যদিও ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, যে ভয়াল নদের অপর তীরস্থ রাজ্যের কোন কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না, তথাচ তাহা দ্বারা এরূপ কিছু বুঝা যায় না যে, বুয়রগণ অমানুষী নৃশংসতা দ্বারা কোন জাতিকে ইহলোক হইতে একেবারে অপসৃত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেও তাহাতে কথা বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। তুরস্কের সুলতান তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে কি করেন বা না করেন, তাহার সমালোচনা করার, তাহা নিবারণের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করার, অধিকার যদি পাশ্চাত্য রাজন্যগণের থাকিতে পারে, তবে বুয়র এবং বশতু-কলহে মধ্যবর্ত্তী হইয়া শোণিতপাত নিবারণাধিকার ইংরেজের ছিল না, একথা বলিতে পারি না! রাজশক্তি যে স্থানে যত দুর্ব্বল অথবা সবল হউক না কেন, তাহা একই উপকরণে একই উপাদানে গঠিত। ইহার পবিত্রতা স্বর্গীয়; অপবিত্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নারকীয় অবস্থা। কোথাও কোন রাজশক্তি কোন কারণে পঙ্কিল ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত হইলে, সেই শক্তির স্বাধীনতায় বাধা দিয়া তাহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ করিবার অধিকার মানব মাত্রেরই আছে। কিন্তু এই অধিকার নিয়মিত রূপে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। ব্রিটীশগবর্ণমেণ্ট কি সন্ধিদ্বারা মনুষ্যের সেই সাধারণ অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন? সন্ধিপত্রের নিয়ম দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এই পর্য্যন্ত বাধ্য ছিলেন যে, বুয়রদিগের বিরুদ্ধে আদিমবাসীদিগের কোন প্রকার সাহায্য করিবেন না, এবং ভয়ালনদের অপর পারে ব্রিটিস রাজ্য বিস্তার করিবেন না। সন্ধি পত্রের এই মর্ম্ম রক্ষিত হয় নাই, বুয়রগণই এরূপ কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন না।

তৃতীয় অভিযোগ— ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধি পত্রের নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে আদিমবাসীদিগের নিকট অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় করিয়াছেন। এবং ফ্রিষ্টেট্ সন্ধি পত্রের মর্ম্মানুসারে অস্ত্র-শস্ত্রবাহী শকট তাঁহাদিগের ষ্টেটের মধ্যে অবরুদ্ধ করিলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লন। ফ্রাউড্ তাঁহার লিখিত ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন,"ফ্রিষ্টেট্ এই টাকা দিলেন বটে,কিন্তু প্রতিবাদের সহিত দিলেন; তাঁহারা ধর্ম্মমূলাধার ভগবানের নিকট পুরাপ্রচলিত প্রণালীতে এই কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা ভগবানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"

ইংরেজ ইতিহাস লেখকদিগের লিখিত ইতিহাস যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তবে এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। ইতিহাস লেখক ফ্রাউড্ বলেন, কিম্বার্লীতে দশ সহস্র আগ্নেয় অস্ত্র আদিমবাসী দিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল, এবং জেনারেল সার্ আর্থার কানিংহাম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সেনাবিনায়কের পদে ছিলেন, তখন ৪০০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র আদিম অধিবাসী দিগের নিকট বিক্রীত হয়। সুতরাং এই তৃতীয় অভিযোগ যে অমূলক, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য পাঠক যেরূপ চক্ষে দেখিতে হয় দেখিবেন, কিন্তু আমরা যে কথায় সত্যতা প্রমাণের প্রয়াসী, এই তৃতীয় অভিযোগটীও তাহার অন্যতম প্রমাণ। আমাদিগের কথাটী আমরা সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ইংরেজ এবং বুয়র কেহই আদিমবাসীর মিত্র নহেন। আদিমবাসী অস্ত্রে শস্ত্রে বলীয়ান হইলে, উভয় জাতিরই বিপুল অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত সন্ধিপত্রে আদিমবাসীর সহিত অস্ত্র-ব্যবসায়

নিষিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। তবে ইংরেজ আদিমবাসীর নিকট এত অস্ত্র বিক্রয় করিলেন কেন? অর্থ লোভ? যে অর্থ-লোভ পরিণামে বিনাশের কারণ, ইংরেজ কি তদ্রূপ লোভে কখনও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন? ইংরেজের শত দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু মূর্খতা তাঁহার চরিত্র গঠনের কোন উপকরণ নয়, একথা ইংরেজের পরম শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী প্রশ্ন এই, ইংরেজ বুয়রকে অস্ত্রবলে বলীয়ান করিতে সাহসী হইলেন, বুয়র তাহাতে ভীত কেন? উভয়েই ত সমাবস্থাপন্ন,তবে উভয়ের কার্য্য এত বিসদৃশ কেন?

একটুকু সমিহিত ভাবে চিন্তা করিলে, এই দুই প্রশ্নের মাত্র একই উত্তর পাওয়া যায়। ইংরেজ, প্রথমতঃ, যেরূপ ব্যবহারেই দোষী হউন না কেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে আদিমবাসীগণ ইংরেজকে দুর্ব্বলের সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহারা ইংরেজের দৃষ্টি এইক্ষণে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; এবং বুদ্ধিমান ইংরেজও বুঝিয়াছেন যে, আদিমবাসী হইতে ইংরেজের কোন আশঙ্কা নাই, বরং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহারা সহায়। আফ্রিকার অসভ্য অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে মনুষ্যের আহারোৎপাদক কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করার অবলম্বন। সুতরাং তাহারা আদিম অধিবাসীকে রক্ষা করায় নিমিত্ত প্রয়াসী।

পক্ষান্তরে, বুয়র শত্রুভাবে আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছেন,শত্রুভাবেই বাস করিতেছেন। আদিম অধিবাসীর রক্তে তাঁহার জাতীয় অস্তিত্বের অভিষেক, তাহার স্বাধীনতা ধ্বংসে তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। তাহার সর্ব্বস্ব বুয়রের সম্পত্তি। আদিম অধিবাসীর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন, এরূপ কোন কার্য্যে বুয়র কখনও অপরাধী হন নাই। সুতরাং বুয়র আদিমবাসীকে বলীয়ান দেখিয়া ভীত এবং সঙ্কুচিত। আদিমবাসীর বলবিধান বুয়র রাজ্য বিস্তৃতির অন্তরায়, বুয়রের পাশব বলের প্রতিরোধক, এবং অসভ্য আদিমবাসীর স্বার্থ রক্ষার সহায়; কাজেই বুয়র তাহাতে ক্ষুণ্ণ। ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

চাহিও না আর।

১

উষার আলোকে আর নিশার আঁধারে
মিছা মোরে কেন ডা'ক আর—
ভেঙেছে সে মোহ নিদ্রা, চিনেছি সবারে
বুঝেছি যে কেমন সংসার!

২

বেঁচেছি কি মরে গেছি পারিনি জানিতে
বুঝেছি সে আমি আর নাই—
কি ছিলাম কি হয়েছি পারিনি শিখিতে
জানিতো একটা কিছু চাই!

৩

সে নহে মধুর গীতি ক্ষুদ্র ভালবাসা
সে তো নহে সাধের খেলানা,
ক্ষুদ্রতায় মিটিবে না সে মহা পিপাসা,
সে যে মোর অগস্ত্য কামনা!

৪

সুনীলা তটিনী তটে নিকুঞ্জ-কাননে
সে বাঞ্ছিত নাহি কভু মিলে,
লুকায়ে সে অন্তঃপুরে আছে নিরজনে
পা'ব তারে সারা প্রাণ দিলে।

৫

পা'ব শ্মশানের ঘাটে কাঁদে যে ভামিনী
তারে যদি শান্তি করি দান,
পা'ব, সে আনন্দ মঠে আনন্দ-কাহিনী
শুনি যদি হরিনাম গান।

৬

পাব মহাকাব্য, পাব প্রেমের বিজ্ঞানে,
পা'ব আমি হ'লে আত্মহারা;
ভাসিয়া ডুবিয়া যাব অমৃত-তুফানে
একেবারে হয়ে যাব সারা।

৭

অযোগ্য অধম আমি হ'ব যোগ্যতর,
লভিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ,
"মহা সাধনার সিদ্ধি" মা' দিবেন বর
ঘুচি যাবে সকল বিষাদ!

৮

তুমি মোরে ডাকিও না ক্ষুদ্র খেলা ঘরে,
দিওনা'ক পুতুলের ভার—
যদি ডুবিবে না মোর অমৃত-সাগরে
আমারেও চাহিও না আর।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৮। অশোকা। শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। "হাসি ও অশ্রু" লিখিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সাহিত্যপ্রিয় পাঠকগণের নিকট পরিচিত হন। "অশোকা" তাঁহার দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মান। পাহাড়ী রাগিণী যে কোন কারণেই হউক মহিলা লেখিকাগণের বড়ই প্রিয়। দুঃখ যাতনা প্রিয় বিচ্ছেদ হেতু একই সুরে সকলের গান। সরোজ কুমারীর প্রকৃতি প্রফুল্লতাময়, হাসিতে ও হাসাইতে তাঁহার যথেষ্ট শক্তি আছে—কিন্তু হাসিবার সময়েও দু ফোটা জল চোখের কোণে দেখা দেয়। সন্তান-বিরহ-বিধুরা জননী গান্ধারীর মনোভাব যেমন অনুভব করিতে পারেন, আমরা তেমন পারি না। তাঁহার গান্ধারী বিলাপ মর্ম্মভেদী। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি ছাপাইবার সময় গ্রন্থকর্ত্রী আপন নির্ব্বাচন শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করেন নাই। সোণার কণাগুলি এত ছাই দিয়া ঢাকা হইয়াছে যে, খুঁজিয়া লইতে পাঠককে কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা অলস, এই আয়াস স্বীকারে ত্রাসিত হইলে তাঁহারা রত্নলাভে বঞ্চিত হইবেন। ইংরাজী কবি শেলীর অনুকরণে সরোজকুমারী কি কাব্য-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, একটু দেখাইতে চাই।

আমি সুশীতল বারিধারা, নির্ম্মল স্ফটিক পারা
ফেলি এনে কুসুমের তৃষিত অধরে।
আমি মৃদু ছায়া করে থাকি, পল্লবের দলে ঢাকি
মধ্যাহ্নে ঘুমের মাঝে স্বপনের ঘরে।
আমার কোমল পাখা, আর্দ্র শিশিরেতে মাখা
জাগাইয়া তোলে প্রতি কুঁড়িটী সুন্দর
যখন গাছের কোলে, সুখ হিন্দোলায় দোলে
নেচে উঠে পাখাগুলি পেয়ে রবিকর।

সরোজ কুমারীর ভাবের নদীতে এখন ভাদ্র মাসের ভরা বাদরে বাণ আসিয়াছে। প্রভূত জলরাশির তীব্র স্রোতে কাদা মাটী গাছ পাতা সকল ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কার্ত্তিকের শিশির ও ফাল্গুনের হাওয়া লাগিলে, খরস্রোত মন্দ হইলে, জল থিতাইলে বড় মনোরম হইবে। যিনি কাঁদিতে ও কাঁদাইতে, হাসিতে ও হাসাইতে জানেন, তাঁহার শক্তি অনন্য-সাধারণ। শ্রীমতীর সে শক্তি যথেষ্ট আছে। তবে ঘোড়াটার মুখে কঠিন লাগাম দিয়া টানিয়া ধরিতে হইবে। শ্রীমতী সেই কৌশলটী এখনও শিখেন নাই।

১৯। সাবিত্রী লাইব্রেরী—১৫শ—২১শ—বার্ষিক বিবরণী। সাবিত্রী লাইব্রেরী, একসময়ে দেশের গৌরবের জিনিস হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ, চিরকাল সমভাবে থাকে না, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বুঝিবা সাবিত্রী লাইব্রেরি নীরবতার গাম্ভীর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন। সেই নীরবতা আবার দূর হইয়াছে, আবার উৎসাহের বন্যা ছুটিয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।

সপ্তভূম।

"কত মায়া জানো আল্লা, কত মায়া জানো।
দরিয়ার ভিতর ফেলে জাল্, ভিতায় বোসে
টানো॥
ঝুলির ভিতর থাবা চাল্, ধানের ভিতর খই।
হাতীর ভিতর গজমুক্তা, দুধের ভিতর দই॥
কতমায়া জানো আল্লা, কত মায়া জানো।
মাটীর ভিতর মানুষ গোড়ে,'পাহাড় দিয়ে
টানো॥"

(সত্যপীরের গান)

"কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে" ইংরাজি ১৯০১ অব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমাংশে উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম। চিল্কা-হ্রদ, অর্কতীর্থ, উদয়গিরি, সাক্ষীগোপাল, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি প্রভৃতি প্রাচীন ও পবিত্র স্থান সমূহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কটকে মহানদ এবং বালেশ্বরে বুড়াবলং নদ অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরের পথে ময়ূরভঞ্জে শিরাশৈলের পার্শ্বে সুবর্ণরেখাতটে বিশ্রাম-লাভ করিলাম। এই শোভাময়ী সুবর্ণ-রেখার বালুকাময় তটে সপ্তভূমের প্রথম সীমা; এই কৌতুকাবহ সপ্তভূম বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বশাস্ত্রে এখনও অপরিচিত। এই বহু যোজনব্যাপী সপ্তভূম মূর সাহেবের ইউটোপিয়া (Eutopia) অথবা পলাতুশের (Plato) আট্লাণ্টিশের (Atlantis) সহিত তুলনীয়। কাকের বাসায় কোকিল প্রতিপালিত হয় কিম্বা জরদের (Ziraffa) সনে তুরঙ্গ প্রতিপালিত হয়, এ কথা শুনিয়াছ, কিন্তু মাতঙ্গের দ্বারা মনুষ্য প্রতিপালিত হয়, একথা শুনিয়াছ কি? স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্র আদৌ স্পর্শ করে না, হীরক দেখিলে তাঁহার পূজা করে, কাপড় পরা মানুষ দেখিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ভয়ে পলায়, ভুজঙ্গকে ভৃত্যবৎ বশে রাখে এবং কেবল ফল; মূল খাইয়াই প্রাণ-ধারণ করে, কলিকালে এমন অদ্ভুত মানুষ দেখিয়াছ কি? ঋষির ন্যায় বর্ণ, ঋষির ন্যায় মূর্ত্তি, মুনির ন্যায় চরিত্র অথচ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, সম্পূর্ণ নিরক্ষর এমন আশ্চর্য্য মানব সম্প্রদায়ের অধিবাস কোথায় বলিতে পার? দিনে সূর্য্য উঠে না, রাত্রে দিন হয়, প্রভাতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যায় প্রভাত হয়, এমন অদ্ভুত দেশ কি কোথাও দেখিয়াছ? এই কৌতুকা-বহ দেশের নাম সপ্তভূম; ইহা প্রভূত শিক্ষা ও আমোদের অতি প্রশস্ত আকর। পাঠকবর! আপনি 'দিল্লী, লাহোর, ঢাকা সহর' প্রভৃতি ঘুরিয়া 'টাকা মোহর'আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য সিন্ধু মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃতের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আসিয়া ও আফ্রিকার প্রাচীন ও নবীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত করিতে আপনি বিশেষ ক্ষমতাশালী, তাহা জানি, কিন্তু আপনার গৃহের পার্শ্বে কৌতুকাবহ "সপ্তভূম" কোথায় অবস্থিত, তাহা কি বলিতে পারেন? হয়তঃ এই সপ্তভূমের পার্শ্ব বা মধ্য দিয়া আপনি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় কিছুই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কারণ এই যে, 'ভ্রমণ' বা 'পরিব্রজণ' যাহাকে বলে, তাহা আপনারা প্রায়ই করেন

না; অমাবস্যা তিথির সায়ংকালে হাওড়া ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি গাড়ীর মধ্যে সুনিদ্রা সম্ভোগ করতঃ প্রতিপদ তিথির সায়াহ্নে দিল্লীতে অবতরণ করিলে যেমন বঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ পর্য্যটন করা হয়, বোধ হয়, সেইরূপেও আপনি সপ্তভূম দেখিয়া থাকিবেন। কলিকাতা হইতে ডাকগাড়ীতে দিল্লী যাত্রা করিলে বাষ্পীয় শকটখানি বঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম এবং পঞ্জাবের কিয়দংশ দিয়া গমন করে, সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি গাড়ীতে বসিয়াই ভারতবর্ষের চারিটা প্রধান প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া থাকেন! বোধ হয়, এই রূপেই সপ্তভূম দর্শন হইয়া থাকিবে! কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ভ্রমণ বলে না, এবং এইরূপ অর্থ-শূন্য ভ্রমণে কোনও জ্ঞান বা বহু দর্শিতা জন্মে না। কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।"

বাঙ্গালার অনেক শিক্ষিত পুরুষের ভ্রমণ কার্য্য ঠিক এইরূপেই নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভৌগলিক জ্ঞান প্রায়ই সঙ্কীর্ণ দেখা যায়। বাঙ্গালায় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা গৃহের বহির্দ্দেশে আসিতে অনিচ্ছুক, অথচ কেবল মানচিত্র দেখিয়া কিম্বা কতকগুলি লেখক বা গ্রন্থকারের পুস্তক বা প্রবন্ধের উপরে নির্ভর করিয়া সমস্ত বিশ্বসংসারের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস বা ভূগোল লিখিতে প্রবৃত্ত!! এরূপ পুস্তকের অভ্যন্তরে নূতন কথা বা বিশেষ আদিমত্ব কিছুই থাকে না, সুতরাং এরূপ গ্রন্থাদি দ্বারা আমরা কোনও উপকারও প্রাপ্ত হই না। যাহা হউক, এই অপূর্ব্ব সপ্তভূমের কৌতুকাবহ বিবরণ পাঠ করিয়া, বাঙ্গালী লেখক, বাঙ্গালী পাঠক এবং বাঙ্গালী পরিব্রাজকদিগের চিত্তে নব নব তত্ত্বাবিষ্কারের ইচ্ছা বলবতী হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। সপ্তভূম সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞান কোনও সম্বাদ পত্র বা মাসিকপত্রের প্রবন্ধান্তরে নিহিত নহে, কোনও পুস্তক বিশেষের উপরে নির্ভর করিয়াও এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই; এই কৌতুকাবহ প্রদেশে আমি স্বয়ং কিছু কাল বাস করিয়াছি এবং এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার আছে।

প্রথমে সপ্তভূমের ভৌগলিক পরিচয় দিব। মল্লভূম, সিংহভূম, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, শিখরভূম এবং বীরভূম, এই সাতটী প্রাচীন ভূমের সমষ্টির নাম সপ্তভূম। বীরভূমের বর্ত্তমান নাম বীরভূমি বা সিউড়ি। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাঁইতা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে অশ্বশকট যোগে সিউড়ি নগরীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। এই বীরভূমি ব্যতীত অপর ছয়টী "ভূম" ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত এবং রাঁচি নগরীর কমিশনর সাহেবের শাসনাধীন। পূর্ব্বে বীরভূম সপ্তভূমের অন্তর্গত ছিল, অনেক দিন হইল বাঙ্গালার ছোটলাট সাহেব বাহাদুর ইহাকে ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া একটী নূতন জেলায় পরিণত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে বীরভূমির বিবরণ না দিয়া আপাততঃ কেবল ষড়ভূমের বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এই ষড়ভূম এখনও ষড়রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। নিম্নে ইহাদের

রাজধানী (অথবা রাজার বাসস্থান) উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভূমের নাম।	রাজধানী।
১। মল্লভূম	ঝাড়গ্রাম।
২। সিংহভূম	চৈবাসা।
৩। ধলভূম	নর্শীংগড়।
৪। মানভূম	মানবাজার।
৫। বরাভূম	বরাবাজার।
৬। শিখরভূম	পঞ্চকোট।

আমরা ময়ূরভঞ্জের "শিরা" শৈলের পাদদেশস্থ প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া সুবর্ণরেখা অতিক্রম করতঃ চলিতে চলিতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের "রায়োর কেলা" ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। চক্রধরপুর হইতে রায়োর কেলা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, রাওরকেলা হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে ব্রাহ্মণী, শঙ্খা এবং কোয়েলা, এই তিনটী নদী যে ঘাঁপাকার স্থানে একত্রে সম্মিলিতা হইয়াছে, তাহাই শ্রীবেদব্যাস মহাপ্রভুর জন্মস্থান। এই স্থান হইতে পদব্রজে আমরা সপ্তভূমে আসিয়াছিলাম।

মল্লভূমের কিয়দংশ এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। ঝাড়গ্রাম ইহার রাজধানী। রাজারা "মল্ল" নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমান রাজা "দ্বিতীয় ভীমাবতার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা স্বচক্ষে রাজা মহাশয়কে একাদশ মণ বৃক্ষগুঠ একাকী উত্তোলন করিতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহার আহারের বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে বোধ হয় অনেক পাঠক মহাশয় আমাদিগকে গল্প-লেখক বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। সিংহভূমের রাজধানী চৈবাসা এক্ষণে একটী ক্ষুদ্র নগর এবং জেলার হেড্‌কোয়ার্টার; ধলভূমের রাজধানী নর্শীংগড়, পূর্ব্বে ঘাটশীলা নামক স্থানে রাজধানী ছিল। মানভূমের বর্ত্তমান রাজধানী মানবাজার, ইহা পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে কাশীযোড়া নামক প্রসিদ্ধ স্থানে মানবাজারের রাজধানী ছিল। মানবাজারের অনেক অংশ এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই কাশীযোড়ার দুর্দ্দান্ত রাজাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ চপরাসী-সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসের পাঠক মহাশয়দিগের বোধ হয় একথা স্মরণ থাকিতে পারে। বরাভূমের রাজধানী বরাবাজার, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বলরামপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বরাবাজারে যাওয়া যায়। শিখরভূমের বহুপূর্ব্ব রাজধানীর নাম বনবিষ্ণুপুর, ইহা এক্ষণে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। এই বনবিষ্ণুপুর এক সময়ে বহুল ঐতিহাসিক লীলার প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ছিল। শিখরভূমের বর্ত্তমান রাজধানী পঞ্চকোট, ইহার ইংরাজী নাম পাচেট্। এক সময়ে এই ধনধান্য পূর্ণ সুবৃহৎ রাজ্যের পঞ্চকোটী টাকা আয় ছিল, এখন পঞ্চাশ সহস্র আছে কিনা সন্দেহ। সেই পুরাতন নামে পঞ্চকোট এখনও প্রসিদ্ধ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ষড়ভূমের সমগ্র বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, এই জন্য আমরা আপাততঃ কেবল কতকগুলি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিব। বিষয়গুলি কেবল যে নূতন, তাহা নহে; ইহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ, আমোদকর এবং শিক্ষাপ্রদ। বলা বাহুল্য, ষড়ভূমের সর্ব্বত্র নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ; ধলভূম হইতে বরাভূম পর্য্যন্ত এতাদৃশ গহন বনে সমাচ্ছন্ন যে, বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে আমরা পার্শ্বস্থিত বন্ধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই; চারি দিক ঘোর

অন্ধকারময়—যেন অমাবস্যার রজনী বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতা হইতে খড়্গাপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বাষ্পীয় শকট পরিবর্ত্তন করতঃ শাখা লাইন দিয়া নর্শীংগড়ে অবতরণ করিতে হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ। নর্শীংগড়ে অবতরণ করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, বহুক্রোশব্যাপী এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পাহাড় এবং জঙ্গল ভিন্ন তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না "বেৎড়া" নামক এক মহাবনের কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া নর্শীংগড় ষ্টেশন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আমি তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার হরি বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ষ্টেশনের স্থানে শার্দ্দূলাদি ভয়ানক শ্বাপদ সমূহ বাস করিত, বনের অতি সামান্য অংশ কাটিয়া ষ্টেশন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এজন্য এখনও বন্য পশ্বাদির ভয় যায় নাই; যে রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণ অহর্নিশি প্রাণ হাতে রাখিয়া এখানে বাস করেন। সায়ংকালে সিগ্‌নালের (Signal) জমাদারগণ উচ্চ লৌহস্তম্ভোপরে আলো দিতে গিয়া সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া আইসে। নর্শীংগড় গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র; ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামের চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। রাজবাটী গ্রামের মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহার চারি পার্শ্বে একটী মৃন্ময় গড় এবং খাদ; ক্রমে ক্রমে ঐ গড় এবং খাদ অদৃশ্য হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থানের গড় একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজবাটীটীকে দেখিলে একটী পর্ণকুটীর বলিয়া বোধ হয়, একজন সামান্য মধ্যবিৎ অবস্থার কৃষকের গৃহ হইতেও সামান্যতর বলিয়াও বোধ হইতে পারে। অতি পূর্ব্বে এই কুটীর কেবল বৃক্ষ পত্রে নির্ম্মিত হইত, ক্রমে এখনকার ধরণের সামান্য খড়ের চালযুক্ত ঘরের ন্যায় কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; দেখা গেল, রাজা মহাশয় সত্বরে ঐ কুটীরগুলিকে ইষ্টকালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজার আকৃতি, বেশ, ভূষা, গৃহ, কাছারি প্রভৃতি দেখিয়া, বর্ত্তমান কালের সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত রাজার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা বা গুল্মের পক্ষে এরণ্ড যেমন বৃহদ্রুম বলিয়া পরিগণিত, রাজা মহাশয়ও তেমনি এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুরুষ বলিয়া গণ্য। "বন গাঁয়ের শিয়াল রাজা" যেমন, রাজাও ঠিক তেমন। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের তিনি অধিনায়ক এবং শাসনকর্ত্তা। অসভ্য জাতিদিগের রাজাদিগকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, নর্শীংগড়ের রাজারও অবস্থা ঠিক তাহাই—অতি সামান্য প্রভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। অতি সামান্য কাল হইতে এখানে রেলওয়ে গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই জন্য একটী ডাকঘর এবং ছোট ছোট বালকদিগের জন্য একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালার শিক্ষক সারদা বাবু আমাকে নর্শীংগড় রাজ্য সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কাগজ পত্র দেখাইয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী বনাভ্যন্তরস্থিত কতকগুলি মনোহর স্থান দেখাইয়া পরমোপকৃত করিয়াছিলেন। নর্শীংগড়ে একটী অতি প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি আছে, পূর্ব্বে সেখানে নরবলি হইত, অতি অল্প দিন হইতে ইংরেজেরা এই কুপ্রথা

বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখানকার বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, বহু পূর্ব্বে এদেশে "রজক" (ধোবা) জাতীয় কোনও রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই রাজাদিগের শাসনকালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি দুর্দ্দান্ত লোক জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বদেশে-যাত্রা করিবার সময় ঘটনাক্রমে পথ ভুলিয়া এই বনময় প্রদেশে আসিয়া উপনীত হয়। ক্রমে তাহাদের সহিত রাজার যুদ্ধ ঘটে এবং ঐ যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইয়া বিজয়ী বীরদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হয়েন। নানা প্রকারের দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিয়া রজক রাজা তাঁহার বৈরীদিগের সন্তোষ উৎপাদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু বিজয়ীগণ উপহার দ্রব্যে সন্তুষ্ট না হইয়া, সন্ধিপত্রের নিয়মভঙ্গ পূর্ব্বক,রাজাকে পুনরায় আক্রমণ করে এবং তাহাকে সবংশে নিহত করিয়া তাহার রাজ্য করায়ত্ব করতঃ শাসন করিতে আরম্ভ করে। মৃত্যুকালে রজক রাজা অতি কাতর স্বরে একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নূতন রাজারা বলী রাজার বামন ভিক্ষার ন্যায় সে ভিক্ষাটী পরিপূরণ করিবার জন্য ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন। মৃতপ্রায় রজক রাজা বলিয়াছিলেন "আপনারা আমার বংশ লোপ করিয়াছেন, কিন্তু দেখিবেন, যেন আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত না হয়। আমি জাতিতে রজক, আপনারা কি জাতি জানি না; প্রার্থনা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমার রাজত্বের যিনি অধিকারী হইবেন, তিনি "ধোবা" শব্দটী যেন রাজোপাধির সঙ্গে ব্যবহার করেন।" জেতৃদল এই প্রার্থনা রক্ষা করিতে সম্মত হয়েন এবং সেই জন্য একাল পর্য্যন্ত এখানকার রাজাদের নামের সহিত "ধল" বা "ধবল" শব্দ যুক্ত থাকে। সাঁওতালেরা রজককে ধবল বা ধল বলিয়া থাকে; নীলগিরিগড়ের বর্ত্তমান রাজার নাম শ্রীযুক্ত শঙ্কর ধবল। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে রাজারাও বিশেষ প্রমাণ দিয়া থাকেন এবং এই ধবল শব্দ প্রয়োগ করিতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, বরং "প্রতিজ্ঞা রক্ষা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া এই উপাধির গৌরব করেন। বহু ক্রোশ অরণ্য লইয়াই রাজার রাজ্য এবং সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই তাঁহার প্রজা। অপরাপর জাতীয় প্রজার সংখ্যা অতি অল্প। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, বনের বৃক্ষ এবং পাহাড়ের শ্বাপদগণই তাঁহার প্রকৃত প্রজা; মুদ্রার প্রচলন এদেশে কোনও কালেই বিস্তৃত ভাবে ছিল না, এবং এখনও নাই। ইংরাজ শাসনের পর হইতে ক্রমে ক্রমে স্থানে স্থানে মুদ্রার প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ গহন বনময় প্রদেশে ইংরেজের অধিকার এখনও চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বৃটিশ জাতি এখানকার নামে মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সমগ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা এখানকার রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল। সম্প্রতি সে অধিকার আর নাই, কিন্তু তথাপি রাজা যাহা করেন, তাহার বিপরীতে তাঁহার প্রজারা বৃটিশ আদালতে গমন করে না। প্রজারা হস্তিদন্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অজগর, সর্পের চর্ম্ম, বংশ যষ্টি, নানা প্রকারের ঔষধের লতা ও বৃক্ষ, ধান্য, সর্ষপ, তিল এবং নানা প্রকারের ফল, মূল ইত্যাদি কর স্বরূপে রাজাকে দিয়া থাকে। পশু এবং পক্ষিমাংসও যথেষ্ট পরিণামে আনীত হয়। দ্রব্যাদির বিনিময়ে

দ্রব্যাদি খরিদ করা হইয়া থাকে, সুতরাং মুদ্রার অভাববোধ প্রায়ই বোধ হয় না। যাহাদিগকে পারিশ্রমিক, পুরস্কার বা বেতন দিবার আবশ্যক হয়, রাজা মহাশয় তাহাদিগকে ধান্য, সর্ষপ, মধু, পক্ষিপুচ্ছ প্রভৃতি দিয়া থাকেন। যেখানে ডাকঘর হইতে পত্রাদি অথবা টেলিগ্রাফ কার্য্যালয় হইতে তাড়িত সংবাদাদি বিলি করিবার কোনও উপায় নাই, কিম্বা গহনারণ্যের যে সকল স্থানে মনুষ্যের গমনাগমন নিতান্ত বিপদজনক বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল স্থানে রাজার নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত সাঁওতাল সর্দ্দারগণ ভিন্ন আর কেহই যাইতে পারে না। এই সকল কার্য্যে সাঁওতালেরা যেমন দক্ষ, অন্য লোকের পক্ষে সেরূপ দক্ষতা লাভ করা অসম্ভব হইতেও অসম্ভবতর। রাজা মহাশয়ের কতকগুলি কর্ম্মচারীর মুখে ধলভূমের পর্ব্বত ও অরণ্যাদির কৌতুকাবহ বিবরণ সমূহ শ্রবণ করিয়া ঐ সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন এবং ভ্রমণ করিবার জন্য আমি বলাং এবং হোলা নামক দুই জন পরিণত বয়স্ক দক্ষ সাঁওতালের সহিত নর্শাং-গড়ের বনে প্রবেশ করিলাম। সাঁওতালদের সঙ্গে তীর ধনু এবং কুঠার ছিল, আমার সঙ্গে একটী মাত্র যষ্ঠি, একটী অম্বরাল (ছত্র), দুই খানি চিত্র এবং তিন খানি ক্ষুদ্রাকার সংস্কৃত পুস্তক ছিল। তদ্ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে লই নাই। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্যূনাধিক সার্দ্ধেক ক্রোশ চলিয়া গিয়া আমরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে অল্প অল্প সূর্য্যালোক দেখা যাইতেছিল, এবারে একেবারে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। আমি কোথায় এবং আমার পথপ্রদর্শক কোথায়, তাহার কিছুই স্থির হওয়া দুষ্কর, এরূপ স্থলে উচ্চ কণ্ঠস্বর ব্যতীত পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। অমাবস্যার মহাতামসময়ী সর্ব্বরীর ন্যায় উর্দ্ধে, অধেঃ, পার্শ্বে এবং চারিদিকে কেবল গভীর ঘন অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পটুত্ব এবং সদাচার প্রদর্শনে তৎপরতা, এই দুইটী গুণ যেমন সাঁওতালের নিত্যধর্ম্ম, সত্যবাদিত্বও তাহাদের জীবনের অন্যতম প্রধান গুণ। সুদক্ষ সাঁওতালেরা সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিয়া গেলাম, কোথাও একটী বৃক্ষপত্র পর্য্যন্ত নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইলাম না, কিন্তু চারি দিক হইতে উড্ডীয়মান তির্য্যকের পক্ষ ও পুচ্ছধ্বনি, এবং নানা জাতীয় বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কাকলী লহরী শ্রুতিগোচর হইতেছিল; তদ্ব্যতীত অসংখ্য প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট প্রসূনপুঞ্জের মনোমোহিনী সুগন্ধি আসিয়া দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছিল। প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পরে ক্রমে ক্রমে আবার দিনমণির আলোক দেখিতে পাইলাম। সাঁওতালেরা এতক্ষণ আমার হাত ধরিয়া চলিতেছিল, এবারে হাত ছাড়িয়া দিয়া অল্প দূরে চলিতে লাগিল, আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় প্রাণ পাইলাম। আমরা যেস্থানে যাইতেছিলাম, তাহার নাম দল্‌মা পাহাড়, এই পাহাড়শ্রেণী সপ্তভূমের অধিকাংশ স্থল বেষ্টন করিয়া আছে। এই দল্‌মা পাহাড়ে কলিযুগে সত্যযুগের আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে স্বর্গের দর্শন! দল্‌মা পাহাড় যাহার দর্শন হয় নাই, তাহার ছোটনাগপুর

বা সপ্তভূম ভ্রমণ করা অনর্থক হইয়াছে, একথা আমরা স্বীকার করি। আমরা প্রথমে বাঁকাই শৈলে উপস্থিত হইলাম; ঐ শৈলে দাঁড়াইলে অথবা এই শৈলস্থিত বনের কোনও অত্যুচ্চ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিলে, পঙ্গপালের স্তায় হস্তীদল বিচরণ করিতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। কোনও স্থানে কিঞ্চিৎ শর্করা নিক্ষেপ করিয়া দিলে যেমন অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে রাশি রাশি পিপিলিকা-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, শৈলে মাতঙ্গের দল ঠিক সেইরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্বেত এবং ধূসর বর্ণের বিপুলবপু মাতঙ্গগণ শাবকদিগকে সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বহুক্রোশব্যাপী অরণ্যের সর্ব্বত্রই এইরূপ। মহাভীষণ অজাগর ভুজঙ্গ, বৃহদাকার শার্দ্দূল, নানা জাতীয় হরিণ, চিত্রিত ব্যাঘ্র (চিতা বাঘ), কাশ্মীর জাতীয় বন্ত বলদ, অসংখ্য প্রকারের বিহঙ্গ, অতীব বিপুলাকার মূষিক এবং নানা জাতীয় ফল, ফুল, মূল, পশু, পক্ষী, এবং ঔষধের গুল্ম ও লতা,এই বনের সর্ব্বত্র দৃশ্যমান হইয়া থাকে। শাল, শিশু, পলাশ এবং অর্জ্জুন, এই চারি প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; হরিতকী, বহেড়া, আমলা এবং ভল্লাতক (ভেলা) বৃক্ষের সংখ্যা কম নহে; কিন্তু দারুচিনি, এলাইচ, কর্পূর প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষ এখানে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বন হইতে মধু, মোম, ময়ুরপুচ্ছ, মৌয়াফুল, পার্ব্বতীয় মূষিক, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, মৃগশৃঙ্গ, অজাগর-চর্ম্ম প্রভৃতি যদি না আসিত, তাহা হইলে রাজাদের খরচা চলা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত। কারণ এই যে, এখানে টাকা দ্বারা কর আদায় করা হয় না। কিন্তু যে দুইটী মূল্যবান পদার্থ দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে, রাজাদের শিক্ষাহীনতার দোষে, বিশেষতঃ সুবন্দোবস্তের দোষে তাহা তাঁহাদের হস্তগত হয় না। এত অসংখ্য অসংখ্য হাতী থাকিতেও রাজাদিগকে হরিহরছত্রের মেলা হইতে হাতী খরিদ করিয়া আনিতে হয় এবং বহুযোজনব্যাপী অরণ্য থাকিতেও, কাষ্ঠ বিক্রয়ে রাজারা একটী পয়সাও লাভ করিতে পারেন না। সুবর্ণের খণি, তাম্র ও অভ্রের খণি, কয়লা ও রৌপ্যের খণি এবং লৌহের আকরগুলি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এতগুলি খনি থাকিতেও রাজাকে সময়ে সময়ে বাঙ্গালী বাবুদিগের নিকট হইতে সামান্ত সামান্ত ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা শৈল পার্শ্বে সুবর্ণরেখা পার হইয়া বেরুং নামে আর একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে আরোহণ করিলাম। ঐ পর্ব্বতের বিপুল কলেবরে বড় বড় গভীর গর্ত্ত দেখিয়া সাঁওতালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই পাহাড়ের এমন দুরাবস্থা কেন?" বলাৎ বলিল, "মহাশয়! পূর্ব্বকালে এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটী মন্দির এবং ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবীমূর্ত্তি ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে প্রতি মাসে নরবলী দিবার প্রথা ছিল। ছোটনাগপুরে ইংরেজদের আবির্ভাব হইলে, তাঁহারাও এই নরবলীর কথা শ্রবণ করেন এবং ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর সহিত বন্ধুতা স্থাপনপূর্ব্বক ঐ মন্দিরাভিমুখে সৈন্তদলসহ ইংরেজ যোদ্ধারা গমন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী

বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিল এবং সেই ব্যক্তিই বনের পথ এবং মন্দিরের স্থান দেখাইয়া দিয়াছিল। অতি গোপনে গোপনে ইংরেজেরা ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক ক্রমাগত দুই দিনব্যাপী পরিশ্রমের পরে তোপ ছুড়িতে আরম্ভ করেন। অবশেষে মন্দির বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং দেবীমূর্ত্তিও ভগ্ন হইয়া যায়। ঐ পাহাড়ের গর্ত্তগুলি সেই বড় বড় তোপের দাগ। এই বনে এবং অন্যান্য বনে এইরূপ স্থান অনেক দেখিতে পাইবেন। ইংরেজেরা যখন রাজার মন্দির চূর্ণ করিয়া গোপনে গোপনে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই সময়ে তাহাদিগকে পথের মধ্যে আক্রমণ করিয়া প্রত্যেক সিপাহী ও প্রত্যেক ইংরেজ সেনা ও কর্ম্মচারীকে সেই খানে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ সন্ন্যাসীও নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছিল। বন অতিক্রম করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের সম্বাদ দিবার জন্য একটী লোকও রক্ষা পায় নাই। বহুকাল পরে মেদিনীপুরে এই হত্যাকাণ্ডের সমাচার পৌঁছিয়াছিল।" আমরা আরও কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে একটী সুবৃহৎ সমাধি দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমাধির কথা জিজ্ঞাসা করায় সাঁওতালেরা বলিল, "অনেক দিন পূর্ব্বে এই গহন বনে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী তপস্বী বাস করিতেন। তেমন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ আমাদের দেশে আর কখনও কেহ আইসে নাই। এই বনে তাঁহার মত মহাপুরুষেরাই আসিতে ও থাকিতে পারে; গৃহীর পক্ষে এ অরণ্যে আসা বা থাকা অতি কঠিন ব্যাপার। ঐ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী সাঁওতালদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে এই স্থানে তাঁহার মৃতদেহের সমাধি করা হইয়াছিল। এই বৃক্ষতলে, বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় পঞ্চদশ বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।" এইরূপ নির্জ্জন, নিরাপদ, গহন বনে বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর অবস্থানের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, গৈরিক বসনধারী বাঙ্গালী সাধুদিগের অগম্য স্থান বুঝি ধরাতলে আর বাকী নাই!! বাস্তবিক, বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, পরমহংস প্রভৃতির সর্ব্বত্রই গতিবিধি দেখা যায়। ছেলে বেলায় সন্ন্যাসী বা সাধু বলিলে আমরা "কোনও হিন্দুস্থানী জীব আসিয়াছে" বলিয়া ভাবিতাম, এখন দেখিতেছি,আমাদের সংখ্যা হিন্দুস্থানীর সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। কুমারীকা অন্তরীপের দেবীমন্দিরে, অষ্ট্রেলিয়ার বৃশ্‌বেন্ নগরে, মক্কার কাবা সরিফের ময়দানে, এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া মানস-সরোবরের পথেও আমি বাঙ্গালী সাধু দেখিয়াছি। রুষ এবং তুরস্কের যুদ্ধকালে আমি কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে সুবিখ্যাত ওশ্‌মান পাশার নিকটে অতিথি ছিলাম,সেখানে গিয়া শুনিয়াছিলাম, আমার আসিবার পূর্ব্বে একটী বাঙ্গালী সাধু সেখানে বিদ্যামন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে কয়েক দিন অবস্থান পূর্ব্বক পদব্রজে ইউরোপে চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে ভাবিলাম, আমরা কি অপূর্ব্ব Ubiquitous জীব হইয়া পড়িয়াছি!! আমরা ইহজীবনে বহু দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু পর জীবনে কোন্ দেশ ভ্রমণ করিব, তাহা জানিলে কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারি। যাহা হউক, প্রায় সার্দ্ধ তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমি দলমা পাহাড়ের

নিকটবর্ত্তী হইলাম। একটী ক্ষুদ্র তটিনীর তটে এক স্থানে একটী প্রস্তরের পার্শ্বে কতকগুলি মৃগশৃঙ্গ, হস্তীদন্ত এবং নরকঙ্কাল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এগুলি এখানে কেন?" বলাং বলিল, "এই স্থানে প্রণাম করুন। ইহা বোঙ্গা বাবার ওস্তাদের স্থান।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বোঙ্গা বাবা কাহাকে বলে?" সাঁওতালেরা বলিল "তোমাদের ভগবান ঈশ্বর, আমাদের ভগবান বোঙ্গা।" আমি বলিলাম, "তোমাদের ভগবান কোথায়?" তাহারা বলিল, "মাটীর নীচে। দলমা পাহাড়ে পৌঁছিলে, বোঙ্গার স্থান দেখাইয়া দিব।" ইহার প্রায় সার্দ্ধেক ক্রোশ দূরে আমরা দলমা পাহাড়ে পৌঁছিলাম।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। প্রস্তাবান্তরে অন্যান্য বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। —ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আমার প্রত্যুত্তর।

ইতিপূর্ব্বে "নব্যভারতে" গীতাসমন্বয় ভাষ্যের আমরা যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, সেই সমালোচনায় এই ভাষ্যের কতিপয় স্থানের সিদ্ধান্তের সহিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তের যে বিরোধ ছিল, তাহারই কতিপয় স্থল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহোদয়কে কয়েটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি পণ্ডিত মহাশয় "নব্যভারতে" তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া, আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। তিনি যে আমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপাধ্যায় মহাশয় প্রগাঢ় পণ্ডিত, শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার, সেই জন্যই, তিনি যে শঙ্করের সিদ্ধান্তের বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার এই উত্তরে শঙ্করের সিদ্ধান্ত সেইরূপ অটলই রহিয়া যাইতেছে এবং আমাদের স্বীয় মত পরিবর্ত্তনেরও কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে না। উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে আমরা নিতান্তই অনিচ্ছুক, কিন্তু সত্যানুরোধে বলিতে হইতেছে যে, শঙ্করের যে যে স্থল সম্বন্ধে তিনি বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শঙ্করের সে সিদ্ধান্তগুলি, আমারা কিছু না বলিলেও, চিরকাল অচলবৎ দৃঢ় থাকিয়া যাইবে। যাঁহারাই শঙ্করকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের সহিত একমত হইবেন। * শঙ্করের অসাধারণ যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মহাত্মা ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য।

* "Sankara, the author of the great commentary on the Vedanta-Sutras, knows how to reason accurately and logically, and would be able to hold his own against *any* opponent, whether Indian or European" (Three lectures on Vedanta, P. 45).

যাহা হউক, পণ্ডিত উপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরগুলি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে বলিতে অগ্রসর হইতেছি। এস্থলে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি ; যাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের সেই সমন্বয় ভাষ্যের সমালোচনা পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, আমরা ভাষ্য হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছিলাম, যেগুলি শঙ্করের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা বিরোধী বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম।

তাহার মধ্যে প্রথমটী, জীবের পারলৌকিক-গতি সম্বন্ধে। উপাধ্যায় মহাশয় বৈদিক বচনের সহায়তায় ও উপনিষদুক্তির অনুরূপ অর্থ করিয়া গীতায় মীমাংসা করিয়াছেন যে, কোন জীবই আর ইহলোকে ফিরিয়া আইসে না। এই মীমাংসা হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী। কেবল তাহাই নহে ; শঙ্করাচার্য্য জীবের পারলৌকিক গতি বলিতে গিয়া,ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় অধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যে যে পারলৌকিক গতির বিস্তৃত বিবরণ ও জীবের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহার সহিত একান্ত বিরোধী মীমাংসা। আমরা সমালোচনায় বলিয়াছিলাম যে, "যিনি সমন্বয়-ভাষ্য লিখিতে যাইতেছেন, যাঁহার ভাষ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে যদি শঙ্করের সিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরোধী সিদ্ধান্ত থাকে, তবে সে ভাষ্যের আদর হইবে কি ?" পাঠক, শঙ্করের সিদ্ধান্ত দেখুন। দেখিয়া বলুন, আমরা এরূপ কথা বলিতে অধিকারী কিনা ? ছান্দোগ্য ভাষ্যের সেই স্থলটী বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

"(১) গৃহস্থানাং মধ্যে যে কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তপরাঃ স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মপরায়ণাঃ তে ধূমাদিনা পিতৃযানমার্গেন চন্দ্রংগচ্ছন্তি। তস্মাদত্রৈবলোকে তৎপুণ্যক্ষয়ে আকাশাদিং প্রতিপদ্য পুনরাবৃত্তির্ভবতি। (২) যে তু (a) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদঃ, (b) হিরণ্যগর্ভাদিসগুণব্রহ্মোপাসকাশ্চ গৃহস্থাঃ, যে চ (c) বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাঃ আরণ্যকাঃ, (d) উর্দ্ধরেতসঃ নৈষ্টিকব্রহ্মচারিণশ্চ—এতেষাং অর্চ্চিরাদিনা উত্তরমার্গেন দেবযানেন ব্রহ্মলোকগমনং। তস্মান্ন পুনরত্রলোকে আবৃত্তিঃ, অপিতু তত্রাপি অনুৎপন্নজ্ঞানানাং অত্রাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে ; উৎপন্ন জ্ঞানানান্ত ব্রহ্মণা সহ মুক্তিঃ। (৩) সদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেব প্রত্যয়বতান্ত ন কুত্রাপিগমনং, ব্রহ্মণ্যেব তেষাং নিত্যস্থিতিঃ। (৪) যে তু জ্ঞানকর্ম্মণোরনধিকৃতাঃ চন্দ্রমণ্ডল মনারুহ্যৈব ব্রীহীযবাদিভাবং মনুষ্যাদী ভাবংগতাঃ তেষাং দেহাদ্দেহান্তর প্রাপ্তির্ভবত্যত্রৈব লোকে"।

পাঠক উদ্ধৃত সংক্ষিপ্তসার হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, কেবল কর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ চন্দ্রলোকে যাইয়া, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ইহলোকে অর্থাৎ আমাদের এই মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আইসে এবং পাপপরায়ণ কুকর্ম্মী জীব চন্দ্রমণ্ডলে না যাইয়াই, এই স্থানেই মৃত্যুর পর এক দেহ হইতে অন্য দেহ ধারণ করে, শঙ্করের ইহাই সিদ্ধান্ত। কেবল উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থের মধ্যেও যাহারা সগুণব্রহ্মোপাসক এবং পরিব্রাজকের মধ্যে যাহারা তপঃশ্রদ্ধাপরায়ণ, কেবল ইহাদেরই পরলোকে কামাচার হয়, ইহারা এলোকে ফিরিয়া আইসে না। পাঠক ছান্দোগ্য ভাষ্যের ঐ স্থানটী মূল গ্রন্থ খুলিয়া দেখিবেন। পাঠক দেখিতেছেন, জীবমাত্রেই যে ইহলোকে ফিরিবে না, সাধারণ গৃহস্থ অর্থাৎ কেবল কর্ম্মী ও যজ্ঞশীল গৃহস্থগণও যে পরলোকেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমমুক্তি পাইবে, উপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত, শঙ্করাচার্য্যের নিতান্ত বিরোধী হইতেছে কি না ? একটু পরেই, শঙ্কর সেই চন্দ্রলোকগত গৃহস্থগণ,

কোন্ কোন্ স্থান ও বস্তু অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীতে অবতরণ করিবে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গীতায়, শঙ্করের এই সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার উচিত ছিল, হয় শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত প্রমাণ করা, না হয়, যদি সম্ভব হয়, তবে এ ভাষ্যের তাঁহার স্বীয়মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করা। নতুবা তাঁহার সিদ্ধান্তের ফলবত্তা লোকে স্বীকার করিবে কেন? উপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "অজ্ঞাত বিষয় আশ্রয় করিয়া সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা জ্ঞাত বিষয় দ্বারা সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত"। তিনি আরো বলেন যে, "এখান হইতে গিয়া এখানে আইসার প্রমাণ কাহারো জীবনে পাওয়া যায় না"। আমরা সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পারলৌকিক গতি সকলের পক্ষেই অজ্ঞাত; বিশেষতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত এ বিষয়ে কাহারও জীবন দ্বারা কি প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ প্রপাঠকের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, জীবের স্বপ্নাবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া, উপনিষদ্ অতি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে. জীব যে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেহ-গ্রহণ কালে যাহা যাহা করিয়াছিল বা দেখিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ দেহগ্রহণ করিয়া যাহা যাহা দেখিবে বা করিবে, এতদুভয়ের কোন কোন কার্য্য বা দৃশ্য পদার্থ, বর্ত্তমান-নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া থাকে; তাহারই নাম জীবের স্বপ্নাবস্থা। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বাবুর সিদ্ধান্ত, বৃহদারণ্যকের [illegible] নিতান্ত বিরোধী। যদি বলেন, বৃহদারণ্যকের যে সিদ্ধান্ত আমরা বলিলাম, সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী, এই পৃথিবীর জীবের স্বপ্নদর্শন তবে উপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, এই উপনিষদুক্তির কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। তারপর, আর একটী কথা আছে। উপনিষদ্ ও হিন্দুদর্শন প্রভৃতি প্রলয়াবস্থায়, প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি স্বীকার করেন। প্রলয়ে শক্তিরূপে সমবস্থিত পৃথিবীর এই জীব-নিবহ, যখন পরসৃষ্টির প্রারম্ভে, Law of continuity র নিয়ম প্রভাবে, পুনরাভূর্ত হইতে থাকিবে, তখন আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সেই প্রাদুর্ভবিষ্যমান্ জীব সকলের পরলোকেই স্থূল ভাবে আবির্ভাব (Evolution) হইবে, এবং এই পৃথিবীলোকে উহাদের স্থূল ভাবে আবির্ভাব হইবে না, ইহার প্রমাণ কি? পরলোকেই যদি পুনরাবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়, তবে এ লোকে স্বীকার করিব না কেন? ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, গৌর-গোবিন্দ বাবুকে এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইবে। পরলোকেই একলোক হইতে অন্যলোকে ভ্রমণ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই যে বৈদিকমত ও বৈদান্তিকের মতের ঐক্যসাধন হয় বলিয়া গৌরগোবিন্দ বাবু বলেন, আমরা তাঁহার একথাও স্বীকার করিতে পারিতেছি না। দেবযান ও পিতৃযান মার্গ অবলম্বন করিয়া একলোকে গতি হয় এবং সেই গতি হওয়ার পরে পুনরায় সেই লোক হইতে কতকগুলি জীবের এই পৃথিবীতে পুনরা-

মুক্তি হয় বলিলেও, সে ঐক্যের হানি হয় না। আমাদের বোধ হয়, ঋগ্বেদের পারলৌকিক বচনগুলির অর্থ এই যে, যত দিন যজ্ঞ-পরায়ণ সেই জীবগুলি ঘুরিয়া পুনরায় পৃথিবীতে না আসিতেছে, ঋগ্বেদ তত দিনের অর্থাৎ সেই interval টুকুর অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন মাত্র; নতুবা ঐ বচনগুলির দ্বারা কেবল পরলোকেই থাকিয়া যায়, এলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না, এরূপ অর্থ করিবার কোন আবশ্যকতা আমরা দেখি না। গৌরবাবুর সিদ্ধান্তে, জীবজন্মের "আকস্মিকতা" নিবারণ করিবার উপায় কি? "সংসার অসংখ্য জীবপূর্ণ"—ইহা বলিলেই ত আকস্মিকত্ব নিবারিত হইল না। জীবের কর্ম্মফলই জীব-জন্মের হেতু, ইহাই ত হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে, এই পৃথিবীতে জীবজন্মের নিয়ামক কে হইবে? তবে আর আকস্মিকত্ব খণ্ডিত হইল কৈ?

তার পর, আমাদের সমালোচনার দ্বিতীয় স্থল, গৃহস্থাশ্রমীর ধ্যানযোগে অধিকার আছে কিনা? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শঙ্কর সকল গৃহীর পক্ষেই ধ্যানযোগ নিষেধ করেন নাই। তিনি গৃহস্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ওরূপ কথা বলিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পরবর্ত্তী নাটকাদিতে আশ্রমের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পড়িয়া আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, পুরাকাল হইতেই গৃহস্থাশ্রম হইতে দুইটী প্রকাণ্ড স্রোত বহির্গত হইয়া, একটী অরণ্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল আর একটী স্রোত এই সংসারেই থাকিয়া গিয়াছিল। যে স্রোত অরণ্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার আবার দুইটী উপশাখা ছিল। একটী সংসার হইতে কিছু-দূরে অথচ তাহার সহিত সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত এবং অন্যটী সংসার হইতে বহুদূরে গিয়াছিল। শাস্ত্রোক্ত বানপ্রস্থাশ্রম প্রথম শাখার অন্তর্গত; শঙ্করোক্ত পরিব্রাজকাশ্রম দ্বিতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। ইহাই গৃহস্থাশ্রমের ঐতিহাসিক তত্ত্ব। এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা মনুকথিত গৃহস্থাশ্রমের শ্রেণী বাহির করিয়া, ভাষ্য সমালোচনায় দেখাইয়াছিলাম। আমরা যে কয়েকটীর স্রোত ও শাখার কথা বলিলাম, প্রত্যেকটীরই উত্তম, মধ্যম ও অধম, এইরূপ আবার বিভাগ ছিল। তবে প্রধানতঃ, সাংসারিক গৃহী সংসারের কার্য্যেই রত থাকিত, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন ইহাদের পক্ষে Secondary ক্রিয়ামাত্র ছিল। কিন্তু আরণ্যকেরা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনকেই মুখ্য লক্ষ্য করিয়া সাংসারিক কার্য্যকে Secondary ক্রিয়া মনে করিতেন, এইটুকু প্রভেদ মনে রাখিতে হইবে। বানপ্রস্থ, গৃহস্থাশ্রমই। রামায়ণ হইতে একটী মাত্র বর্ণনা পড়িলেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। রাজা দশরথের মৃত্যুর দিন, অন্ধমুনির পুত্রবধরূপ দুষ্কার্য্যের কথা তিনি কৌশল্যাকে বলিতেছিলেন। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্ধঋষিকে বানপ্রস্থাশ্রমী বলা হইয়াছে, অথচ তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া অরণ্যে বাস করিতেন; এমন কি, এই বানপ্রস্থাশ্রমী জ্ঞানী ঋষিও সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পুত্রশোকে মোহিত এবং পরের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ঋষি গৃহস্থ যে, বানপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন, রামায়ণ তাহা নিজেই বলিয়া দিতেছেন :—

"কদাচ্যজনতুল্যং কুর্ষ্ম ন স্মরে কথয়েঃ বদ্ধং। কলেপুত্রাস্তে রাজন্। সদাঃ শতসহস্রশঃ। কল্পিয়েন বধো রাজন্! বানপ্রস্থে বিশেষতঃ। জ্ঞানপূর্ব্বকৃতঃ-হানাজ্জ্যবরেদপি বজ্রিনং।"

অন্ধ ঋষি তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রকেও এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"সপ্তধাতু তবেন্মূর্দ্ধা মুনৌ তপসিতিষ্ঠতি। জ্ঞানা বিহনতঃ শব্দং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি"

(রামায়ণ অযোঃ কাঃ, ৬৪।২০—২৪)॥

আরণ্যকের মধ্যে আমরা যে দুইটী উপশাখার কথা বলিয়াছি, রামায়ণ তাহার অনুমোদন করিতেছেন। রাম ভরদ্বাজকে বলিলেন :—

"ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌরজানপদো জনঃ। সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমং। অনেন কারণেনাহ মিহ বাসং ন রোচয়ে: (রামায়ণ, অযো, কা, ৫৪ অঃ)।

লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী বলিয়া রাম সেই ভরদ্বাজাশ্রমে থাকিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ঋষি রামকে আরো বহুদূরবর্ত্তী চিত্রকূটস্থ খুব বিবিক্ত আশ্রমে বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। পাঠক মহাভারতের পরশুরামের আশ্রম মনে করুন্। পরশুরামের মাতার কামভাব, পিতার ক্রোধ ইত্যাদি ঠিক্ অজ্ঞানী সাধারণ গৃহস্থেরই অনুরূপ বর্ণিত আছে (মহাভারত, বনপর্ব্ব ১১৫ অঃ)। অরণ্য বলিলেই, একটা মনে বিভীষিকা উৎপন্ন হইবার কারণ নাই। ম্যাক্সমুলার এই অরণ্যবাস কিরূপ, ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা শুনুন ;—

"When we speak of forests (আশ্রম), we must not think of a *wilderness*. In India, the forest *near the villages* was like a happy *retreat*, cool and silent, with flowers and birds, with bowers and huts". (Three lectures on Vedanta, P. 24). আর এক স্থলে তিনি বুঝিয়াছেন :—"In the Third stage, the Brahman still keeps to his *dwelling* in the forest—*outside his village* and may be accompanied there by his wife, see his children. This stage represents a *mere retreat* from the world." (Life and Sayings of Ramkrishna).

উত্তরচরিতাদি নাটকের ঋষিদিগের বর্ণনা পড়িতেও আমরা পাঠককে অনুরোধ করি। শঙ্করাচার্য্য কেবল সাংসারিক, ভোগসুখনিরত, ইন্দ্রিয়-সেবাপরায়ণ গৃহস্থের পক্ষেই ধ্যানযোগের ব্যবস্থা করেন নাই। নতুবা আরণ্যক গৃহস্থদিগকেও উত্তমাধিকারী সাংসারিক গৃহীদিগকে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন নিষেধ করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য লোকেরই অভাব হইয়া পড়ে। গৃহস্থাশ্রমকে ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিলে, শঙ্করের সিদ্ধান্তদ্বয় পরস্পর বিরোধী, এ কথা বলার আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। এ কথা উপাধ্যায় মহাশয়ও অস্বীকার করিতে পারিবেন না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য্য "নিবৃত্তি ধর্ম্ম" শিখাইতে আসিয়াছিলেন, এ কথা খুব সত্য, কিন্তু তিনি যোগ্য গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, এ কথা ততদূর অশ্রদ্ধেয়। গীতা ও মনু এই ঐতিহাসিক অবস্থা দেখিয়াই, যোগ্যতম গৃহস্থের পক্ষেও, সেই "নিবৃত্তি ধর্ম্মের" উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শঙ্করও তাহাই করিয়াছেন। নতুবা গৃহী মাত্রকেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া উপদেশ দিলে, তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয় করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? এবং গৃহস্থাশ্রম মাত্রেতেই তিনি এমন কি দুর্নাই বস্তু দেখিয়াছিলেন যে, তাহারা "নিবৃত্তি ধর্ম্মানুশীলনে" যোগ্য নহে, এ কথা বলিয়া যাইবেন?

আমরা যে মীমাংসায় উপনীত হইলাম, এই চক্ষে দেখিলে, উপাধ্যায় মহাশয় যে

বলেন যে, "শঙ্কর বর্ণাশ্রমাদি অজ্ঞান বিজৃম্ভিত জানিয়াও, চতুর্থাশ্রমের সঙ্গে পরিব্রাজকের যোগ রাখিলেন কেন,"—এ কথারও মীমাংসা পাওয়া যায়। তিনি বুঝিতেন যে, পরিব্রাজকাশ্রম যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের নিতান্ত পরিপক্কাবস্থার আশ্রম, তেমনি বানপ্রস্থেও গৃহস্থাশ্রমের উন্নত শাখাতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হইতে পারিত এবং শেষাবস্থায়, সাধন পরিপক্ক হইলে, গৃহস্থও এই পরিব্রাজকের ন্যায় ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া যাইতে পারিত। শঙ্কর, গৃহস্থাশ্রমের ও বানপ্রস্থাশ্রমের যে শাখায় ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অনুশীলিত হইত, তাহার প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া পরিব্রাজকাশ্রমের তুল্য বলিয়াই মনে করিতেন। এই হেতুই শঙ্কর, গৃহী না হইয়াও (অর্থাৎ "সাংসারিক" গৃহী না হইয়াও) একেবারে পরিব্রাজক হইতে পারে এবং গৃহীও পরিব্রাজক হইতে পারে, এরূপ উভয় মতই খ্যাপন ও প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনকে জীবনের মুখ্যকার্য্য করিয়া লইয়া, তাহাতে দৃঢ়াভ্যস্ত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সে গৃহস্থাশ্রমে আর "অবিদ্যাবিজৃম্ভিত" রহিল না। ইহাই শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় না হইলে, তিনি এ কথা কদাপি বলিতেন না যে—"ব্রহ্মচারী গৃহস্থবানপ্রস্থানাং কেনচিৎ নিমিত্তেন সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার প্রতিবন্ধেপি, স্বাশ্রম ধর্ম্মেষমুষ্ঠীয়মানেষপি বেদনার্থো মানসকর্ম্মাদিত্যাগো ন বিদহ্যতে" অর্থাৎ গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা মনে মনে সম্ভব। "মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন"—এত বড় তত্ত্ব কথা যাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছিল, সেই জনক যে ক্ষত্রিয়-রাজোচিত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, এ কথা কি শঙ্কর জানিতেন না?

আমরা আশ্রম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলাম, এই বার আমরা শঙ্করের নিজের কথায় তাহা প্রমাণিত করিব। শঙ্করের "পরিব্রাজকাশ্রম" অন্যান্য আশ্রম হইতে ভিন্ন, গৌরগোবিন্দ বাবুর এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, পরিব্রাজকেরই যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, অন্য আশ্রমের নাই, এ কথা তিনি কোথায়ও বলেন নাই। বরং তিনি গৃহস্থাশ্রমেও যে ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলিত এবং শেষে পরিব্রাজকের ন্যায় উঁহাদের আচরণ জন্মিতে পারে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের এই আশ্রমের বিবরণটী বুঝা নিতান্ত আবশ্যক; আমরা এই অংশে সহৃদয় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শঙ্করাচার্য্যের "পরিব্রাজকাশ্রম" ব্রহ্মজ্ঞানের নিতান্ত শেষ ও চরমাবস্থা; তখন কেবলই "ব্রহ্মসংস্থিতি," "ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত," "স্বস্বামিভাব বিরহিত" ও "সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী" সাধক হইয়া যায়। এই অবস্থাটীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্যই, তিনি এই আশ্রমকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমেও ক্রমে ক্রমে এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মা সম্ভব, এ কথাও তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থ প্রভৃতি অন্য তিন আশ্রমেই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই, শঙ্কর কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের শেষাবস্থার মধ্যে পার্থক্য রাখিবার জন্যই, সামান্যতঃ পরিব্রাজকাশ্রমকেই ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রম বলিয়াছেন এই মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ২৩শ অধ্যায়ের

একটী শ্লোকের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, শঙ্কর এক স্থলে বলিতেছেন—

"যো হি অধিকৃতঃ কর্ম্মণি, তস্য তদকরণে প্রত্যবায়ঃ, ন নিবৃত্তাধিকারস্য গৃহস্থস্যেব ব্রহ্মচারীণো বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে"।

পাঠক এ স্থলে দেখিবেন, "গৃহস্থস্যেব" কথাটী রহিয়াছে। যে গৃহীর সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, শঙ্কর বলেন, সে গৃহী অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া করিলেও, বাস্তাবক তাহা ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

"পরিব্রাজকানাং ভিক্ষাচরণাদিবৎ উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনাং অগ্নিহোত্রাকর্ম্মানিবৃত্তিরিতিচেন্ন"।

এখানেও

"উৎপন্নৈকত্বপ্রত্যয়ানামপি গৃহস্থাদীনাং"—

এই উক্তি দ্বারা গৃহস্থেরও তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা শঙ্কর স্পষ্ট বলিলেন। তবে গৃহস্থাশ্রমাদি হইতে পরিব্রাজকাশ্রম পৃথক্ কেন? শঙ্কর বলেন—

"স্বস্বামিভেদবুদ্ধ্যনিবৃত্তেঃ; কর্ম্মার্থত্বাচ্চেতরাশ্রমানাং"।

অর্থাৎ পৃথক্ এই জন্য যে, অন্যান্যাশ্রমে কর্ম্ম করিবারও ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যাশ্রমে যতদিন স্বস্বামিভাব না যাইতেছে, ততদিন ভেদজ্ঞান অনিবার্য্য, এই টুকু দেখাইবার জন্যই পার্থক্য। একেবারে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে স্থিতি, ইহা সাধকের চরমাবস্থা, তখন কর্ম্ম একেবারে থাকে না।

"এতেন কর্ম্মছিদ্রে ব্রহ্মসংস্থাহসামর্থ্যং"।

অর্থাৎ বিন্দুমাত্রও কর্ম্ম থাকিলে তাহাকে পরিব্রাজকাশ্রমী না বলিয়া গৃহস্থাশ্রমী বলাই শঙ্করের অভিপ্রায়। এমন কি, শঙ্কর এক স্থলে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পরিব্রাজকাশ্রমেও উত্তম মধ্যম শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয়াধ্যায়ের দশম শ্লোকের ভাষ্যে [illegible] তেছেন যে—

"যে পরিব্রাজকাঃ অরণ্যরূপ ইত্যুপাসতে, [illegible] তেষাঞ্চ ইমংবিদ্ভিঃ সহ অর্চিরাদিনা গমনং"।

এইরূপ পরিব্রাজকের প্রতিও সগুণ ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থের গতি একইরূপ; কেবল অত্যুৎকৃষ্ট পরিব্রাজকের কোথাও গতি নাই। এই সকল অপেক্ষাও স্পষ্টতম উক্তি পাঠক শুনুন:—

"এতেন গৃহস্থস্যৈকত্ববিজ্ঞানে সতি পরিব্রাজ্যং অর্থসিদ্ধং"।

গৃহস্থের যখন ব্রহ্মজ্ঞান অত্যন্ত পরিপক্ক হয়, তখন তাহাকেও পরিব্রাজকাশ্রমোচিত সাধক বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও, কর্ম্মাদি করিয়াও, ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করা যাইতে পারে; এই ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপাক হইলেই, সেই সেই আশ্রমস্থ ব্যক্তিই শঙ্করোক্ত পরিব্রাজকাশ্রমের ন্যায় হইয়া পড়িল; অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মত্যাগ তখন হইল। যে আশ্রমের লোকই হউক, প্রকৃত জ্ঞান লাভই আসল কথা। গৃহস্থের যদি গোড়া হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার না থাকে, তবে উহার পরিপাক হইবে কি প্রকারে? শঙ্করোক্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থেরাই (ছাঃ, উঃ, ৫।৩।১০) মধ্যম সাধক (নিকৃষ্ট সাধক, কর্ম্মী গৃহস্থেরা)। ইহাদেরই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পরিপক্ক হইলে, ইহারাও পরিব্রাজকের মধ্যে পার্থক্য থাকে না; ইহাদেরই তখন "একত্ব বিজ্ঞান" জন্মে। শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় শঙ্করের এই সমস্ত উক্তির সম্বন্ধে কিরূপ বলেন, জানিতে উৎসুক রহিলাম।

পরিশেষে, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়াতে,

আমরা আমাদের শেষ কথা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া, একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত শঙ্করের মত ব্যক্ত করিতে গিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"Some philosophers had taught that the human self was a part (অংশ) of the Divine self, or a modification (বিকার) of it, or something created (সৃষ্ট) and altogether different from it. Every one of these opinions is shown by *Sankara* to be untenable. It cannot be a part of the Divine self, he says, for we cannot conceive parts in what is neither in space nor in time. If their existed parts of infinite Brahma, the Brahma would cease to be infinite, it would be limited and would assume a finite character, as towards its parts. Secondly the living soul cannot be a modification of the Divine self; for Brahma is eternal and unchangeable and as there is nothing outside of Brahma, there is nothing that could cause a change in it. Thirdly the living soul cannot be anything different from the Divine self, because Brahma, if it is anything, has to be All in All, so that there cannot be anything different from it."

ইহাই শঙ্করের প্রকৃত মত।

পরিশেষে এই প্রতিবাদের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপাধ্যায় মহোদয়ের নিকটে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রিয়া বা কঙ্কুরা।

আজ কাল রিয়া সম্বন্ধে নানা কথা নানাদিকে শুনিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে; ভারতে এ সম্বন্ধে যে কিছুই হইতেছে না, এমন নহে। অল্প কয়েক বৎসর হইল, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত ভাবে ইণ্ডিয়ান হাজবেণ্ড্‌ নামক একটী কোম্পানী গঠিত করিয়া প্রধানত রিয়া এবং অন্যান্য কৃষি উপযোগী শস্যাদি উৎপন্ন দ্বারা লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। টী, এন, মুখার্জ্জি প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে বিশেষ আন্দোলন করিতেছেন। অল্প কয়েক দিন হইল, অমৃত বাজার পত্রিকায় জনৈক মহাত্মা কঙ্কুরা চাষ আবাদে পারদর্শী একজন লোক পাইবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন আমাদের এই জলপাইগুড়ীতে মিঃ পিলিং-কোর্ডসাহেব তাঁহার যামারহাট নামক চা বাগানের সংলগ্ন ৫০ একর জমিতে এই কঙ্কুরা আবাদ করিয়াছেন, ও তাহার উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। যখন অনেকের মন এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন ইহার ভবিষ্যত যে ভাল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সাহসেই এতৎ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেছি। ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কৃষির উন্নতি হইলে কৃতার্থ মনে করিব।

রিয়া প্রধানত দুই জাতীয়,—এক জাতীয় সবুজ, অপর জাতীয় শাদা (১)। দেশ কাল মৃত্তিকা ভেদে ইহার তিন প্রকার নাম। চায়নাতে ইহার নাম চায়না গ্রাস। মালয়, সুমাত্রা, জাবা ইত্যাদি প্রদেশে ইহার নাম রেমী। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রদেশে ইহার

(১) (ক) Bœmeria Nivea often called the white leaved.
(খ) Boehmeria Nivea often called the green leaved.

নাম রিয়া। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মে বলিয়া ইহার আকৃতি প্রকৃতিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু মূলে এক জাতীয়। আসাম ইহার আদিস্থান বলিতে হইবে। এই স্থান হইতেই বোধ হয় ইহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আসাম প্রদেশ চা গাছের আদিস্থান। আসাম বলিলে লোয়ার আসাম কিম্বা পশ্চিম আসাম মনে করা উচিত নহে; পূর্ব্ব এবং উত্তর আসাম মনে করাই ঠিক। অনেকে বলেন, চায়ের আদি স্থান চীনদেশ, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, আসামের পূর্ব্বউত্তর বিভাগ হইতে অর্থাৎ নর্দ্দারণ সবট্রপীকেল জোন হইতে চায়নার টেম্পারেট জোনে নীত হওয়াতেই আসামের ইণ্ডিজিনাস্ জাতীয় চা গাছ ও চায়নার চা গাছ এত বিভিন্ন আকৃতির হইয়াছে। এইরূপ এই রিয়াও আসাম হইতে চীনে নীত হইয়া আকৃতিতে ভিন্ন হইয়াছে। আসাম ইত্যাদি প্রদেশের চা গাছ "বৃক্ষ" নামধেয় হইয়াও যেরূপে চীনে নীত হইয়া তথায় তাহা (Plant) "চারা গাছ" নামধেয় হইয়াছে, সেইরূপ আসামের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পত্র-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ রিয়াও চীন দেশে নীত হইয়া ক্ষুদ্র পত্র বিশিষ্ট চীনা ঘাসরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেশ, কাল, এবং মৃত্তিকা-ভেদে এইরূপ তারতম্য ঘটিয়াছে। বিশেষ এই আসাম প্রদেশ কিম্বা ইহার সমকক্ষ স্থানই রিয়া কৃষির উপযুক্ত স্থান। কারণ রিয়া আবাদের উপযুক্ত জমি ও আবহাওয়া উক্ত প্রদেশ সমুহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। বর্ম্মা, মালয়, সুমাত্রা, যাবা, বর্নিও ইত্যাদি স্থানেও ইহা জন্মিতে পারে। চায়না, এলজিরায়স্, ককেসস্, আমেরিকা, দক্ষিণ ও মধ্য ইয়োরোপ বিভাগেও ইহা জন্মান যাইতে পারে, কিন্তু আসাম এবং তদবস্থাপন্ন স্থানের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা এবং ঐ সকল স্থানের আবহাওয়া ও মৃত্তিকাদি সমান না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং আসাম এবং তদবস্থাপন্ন প্রদেশ সমূহের গাছ অপেক্ষা ঐ সকল প্রদেশের গাছ ভাল হইবে না, ইহা বলা যাইতে পারে। এখানে বলা উচিত যে, মৃত্তিকা উপযুক্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আবহাওয়া কথনই একরূপ হইতে পারিবে না। কাজেই অন্য প্রদেশে ইহার চাষে আসামের কিম্বা তদবস্থাপন্ন প্রদেশের ন্যায় সুফলের আশা করা উচিত নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সকল স্থানে ইহার কৃষির উন্নতি করিবার চেষ্টা না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার চাষের উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে।

আসাম, কোচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ী স্থান সকলে (Bochmeria Nivea) রিয়া বা কণ্ডকুরা নামে খ্যাত। পূর্ব্বে পাট যেরূপ আবশ্যকানুযায়ী অল্প পরিমাণ স্থানে আবাদ হইত, কণ্ডকুরাও, সেইরূপ, আবশ্যকানুযায়ী অল্প পরিমাণ স্থানে কোন কোন গৃহস্থ চাষ করিয়া থাকে। পাট ব্যবসার দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, এই প্রদেশে তাহার গ্রাহক বিস্তৃত হেতু যেরূপ তাহার আবাদ অনায়াসে বিস্তৃত হইয়াছে, সেইরূপে কণ্ডকুরার চাষও অনায়াসে বিস্তৃত হইতে পারে। এক্ষণে কণ্ডকুরার খরিদদার যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, তাহার আবাদও বিস্তৃত হইতেছে না। এদেশের ধীবরদের জাল প্রস্তুতের জন্য

যত কণ্ডুরা প্রয়োজন হয়, তাহা তাহারা অতি উচ্চ মূল্যে গৃহস্থদিগের যৎসামান্য ভূমিতে উৎপন্ন কণ্ডুরা হইতে প্রাপ্ত হয়। নর্দ্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ডোমার নামক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গোদা-গাড়ী হাটে এ প্রদেশের কণ্ডুরা ক্রয় বিক্রয় হয়। খরিদদারের মধ্যে ধীবর জাতীয় লোকই বেশী। আবশ্যকানুযায়ী তাহারা অতি উচ্চ মূল্যে অর্থাৎ প্রতি টাকায় এক সের হিসাবেও ইহা ক্রয় করিয়া থাকে। কণ্ডুরার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়া হেতু আবাদের বৃদ্ধি হইতেছে না, এবং আবাদ বৃদ্ধি না হওয়া হেতু তাহা উক্তরূপ উচ্চ মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। কণ্ডুরা ব্যবসায় উপযোগী দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইলে খরিদদার বৃদ্ধি হইবে। খরিদদার বৃদ্ধি হইলে আবাদ আপনা হইতে বিস্তৃত হইবে এবং তাহা হইলে মূল্য অবশ্যই হ্রাস হইবে।

এই সকল স্থানে ইহার চাষ বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং ইহা এই দেশের ইণ্ডিজিনাজ্ গাছ, তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। ইণ্ডি-জিনাজ জাতীয় চা বৃক্ষের ভূমি আসাম প্রভৃতি এবং তদবস্থাপন্ন স্থান যেরূপ উপ-যোগী, সেইরূপ উক্ত কণ্ডুরারও ঐরূপ স্থানই উপযোগী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে স্থানের ভূমি দো-আসলা এবং বার মাস সেঁত সেঁতে থাকে, অথচ বন্যার জলে প্লাবিত হয় না এবং যে স্থান এতদঞ্চলের ন্যায় উত্তাপ, শৈত্য ও বর্ষাতে সমাপন্নস্থাপন্ন সেই স্থানেই এই আসাম জাতীয় রিয়া বা কণ্ডুরার উত্তম আবাদ হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই কণ্ডুরাকে যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসায় দ্রব্যে পরিণত করিতে পারা না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার খরিদদার এবং আবা-দের বৃদ্ধি হইবে না। সুতরাং আমরা প্রথমে এস্থলে ইহা দ্বারা ব্যবসায় দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপায় সকল যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া তৎপরে খরিদদার সম্বন্ধে এবং সর্ব্বশেষে আবাদ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

রিয়া যে উপায়ে ব্যবসায় দ্রব্য মধ্যে এক্ষণে আনীত হইয়াছে, তদ্বিবরণ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে,এস্থলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব ইতি-হাস যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা বোধ হয় ন্যায়-সঙ্গত হইবে। আমরা সে সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পরে আলোচ্য বিষয় লিখিব।

জলপাইগুড়ীবাসীর পরিচিত অদরা বৃক্ষের ত্বক ও অন্যান্য লতিকাদির দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব গুণ সকল যেরূপ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সকলের নিকট পরিজ্ঞাত আছে, সেইরূপ এই রিয়া বা কণ্ডুরার ত্বকেরও দৃঢ়তা ও বৃষ্টি বা রৌদ্রের প্রতাপ-সহন-শীলতা-গুণও ভারতবাসী, আসামীয়, চীনবাসী, মালয়ান এবং ইজিপসিয়ান প্রভৃতি জাতি মধ্যে পরিজ্ঞাত ছিল এবং এখনও আছে। ইজিপ্তের পিরামিডস্থিত মামি সকলের এবং আসামের(Mound) স্তূপ স্থিত মৃত শব সকলের আবৃত বস্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা এবং উপরোক্ত স্থান সকলের ধীবরদিগের মৎস্য ধরিবার জাল ও সুতা পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্ব হইতেই লোকে ইহার গুণ ও ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিল। ন্যূনাধিক ৩০০ শত বৎসর হইল, ইহা ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী-গণের মন আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত

প্রভাবে ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর মধ্যেই অর্থাৎ গত ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইয়োরোপীয় নানা জাতি মধ্যে ইঁহার উন্নতিকল্পে বহুতর চেষ্টা হইতেছিল। এই সকল জাতির চেষ্টায় ও ইংরাজ জাতির অনুসন্ধিৎসু বৃত্তি এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাদের কৃতকার্য্যতা লাভের বাসনার ফলে ও অন্যান্য নানা কারণে এবং অবশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের যত্নে, এদেশের রিয়ার বা কঙ্কুরার যাবতীয় বিষয় অনুসন্ধান হইতে লাগিল। ইহাকে পরিশেষে বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করিবার উপায় উদ্ভাবন ও কল কারখানা প্রস্তুত করণোদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক (উপায় উদ্ভাবন ও কল প্রস্তুতকারীকে) ৫০০০্ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়ার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। অন্যান্য দেশে অর্থাৎ চীন, মালয়, সুমাত্রা, যাবা ও মিশর প্রভৃতি দেশেও তৎসম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধান হইতেছিল।

ইহার উন্নতি বিধান সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীগণের সকলের মত স্থির হইলে, ইয়োরোপীয় প্রায় অধিকাংশ প্রদেশেই ইহার শক্ত ও কঠিন (Gummed) ত্বক (Ribbon) হইতে রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও মসৃণ সুতা বা আঁশ (Fibre) বাহির করিয়া উলের, কাপাশের, এমন কি, রেশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তম উত্তম দৃঢ় বস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন জন্য সকলে দৃঢ়পরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রাপ্তির আশাও অনুসন্ধানকারীগণের দৃঢ়তার সহিত উক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই উদ্যমের ফলে বস্ত্র বয়নোপযোগী (Fillasse) সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করণোদ্দেশে নানাদেশে নানা প্রকারের উপায় ও কল প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন কি, জর্ম্মন ও ফরাসীদেশে রিয়ার আঁশ হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রবয়ন ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য পর্য্যন্তও প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু উক্ত বস্ত্রাদি কল হইতে বাজারে বাহির হইতে না হইতে দেখা গেল যে, যে উজ্জ্বলতা এবং স্থায়ীত্ব গুণের জন্য রিয়ার উন্নতি সাধন পক্ষে এত যত্ন ও চেষ্টা হইতেছিল, প্রস্তুতকারীদের দোষে তাহা নষ্ট হইয়া অতি জীর্ণ বস্ত্রাদির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। এই সময়ে চীন, মালয় ও ভারতবর্ষ হইতে যত (Rhea ribbon) রিয়ার ত্বক ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছিল, তাহা প্রায়ই উক্ত দুই প্রদেশে ব্যয়িত হইয়াছিল। উক্ত দুই প্রদেশের এতৎসম্বন্ধে আংশিক কৃতকার্য্যতা এবং ইংরাজ জাতিকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়াই বোধ হয় ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ত্বক হইতে বস্ত্রবয়নোপযোগী দৃঢ় অথচ সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুতকরণোপযোগী কলাদি প্রস্তুত জন্য পুনরায় ৫০,০০০্ টাকার পুরস্কার প্রচার করেন। কিন্তু তৎসময় কিম্বা তৎপরবর্ত্তী বহু বৎসর পর্য্যন্ত তদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন কিম্বা কল প্রস্তুত না হওয়া প্রযুক্ত উক্ত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পুরস্কারদ্বয়ের প্রত্যাহার করেন। যদিও ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত পুরস্কার প্রত্যাহার করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজগণ ইহার উন্নতিকল্পে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাহাদের এতৎ সম্বন্ধীয় অত্যধিক গবেষণা,

অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প, ভবিষ্যৎ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের কাছে অন্যান্য সকল ইউরোপীয় প্রদেশের চেষ্টা ও উদ্যম পরাজয় স্বীকার করিল। এবং পরিশেষে এই জাতির উপরেই উক্ত প্রশ্নের শেষ মীমাংসা বা উন্নতির পথ আরোপিত হইল। কিছুদিন পরে (Rhea Fibre Treatment Co. Ld.) নামক একটী কোম্পানী গঠিত হইল। উক্ত কোম্পানী মিঃ গোমেশের পদ্ধতি ও পরামর্শানুযায়ী ইংরাজগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কল কারখানা দ্বারা এক্ষণে প্রকৃষ্ট উপায়ে সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করিতে লাগিল (১) রিয়ার যাবতীয় গুণ রক্ষা করতঃ উত্তম উত্তম বস্ত্র এবং বাণিজ্যোপযোগী অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু উক্ত প্রকারে কল কারখানা দ্বারা বস্ত্র বয়নাদি করতঃ বৃহৎ ব্যবসা চালাইয়া লাভবান হইবার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থাৎ ১০,০০০ হাজার টন কঙ্কুরার ত্বক পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। যে উপায়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে উক্ত কোম্পানী এ পর্য্যন্ত বহুতর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এখনও সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে তৎকর্ত্তৃক বৎসর বৎসর এক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করতঃ প্রচারিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইতেছে, এবং সংবাদ পত্রাদিতে ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইতেছে ও সকলকে এই দিকে প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য কোম্পানী প্রয়াস পাইতেছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহাদের প্রয়াস কতক পরিমাণে সফলতাও প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ দেখা যাইতেছে যে, এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে মহাত্মাদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কে বলিবে যে, তাঁহারা ঐ কোম্পানীর চেষ্টার সহায়তা না করিতেছেন। এক্ষণে এই অধম ভারতীয় জাতি এ সম্বন্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া ইহার চাষ সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলেই উক্ত কোম্পানীর চেষ্টা সফল হইবে এবং এই অধম ভারতবাসীগণ যদিও এই সকল কল কারখানা এদেশে স্থাপন করিয়া তাহাদের অপেক্ষা বেশী লাভবান হইবার চেষ্টা না করুন, তথাপি পাট ইত্যাদির ন্যায় ইহারও চাষ দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে লাভবান হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং কৃষি ভিন্ন ইহার উন্নতির আর কি উপায় আছে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাটের চাষ যেরূপে কৃষকশ্রেণী মধ্যে বিস্তৃত করাইয়া লইতে হইয়াছে, রিয়ার চাষও সেই প্রণালীতে বিস্তৃত করাইতে হইবে। কোন কোম্পানী গঠিত করিয়া তদ্বারা পাটের চাষ করাইয়া যেমন লাভবান হওয়ার আশা করা যায় না, তদ্রূপ ইহারও আবাদ করতঃ লাভবান হইবার আশা করা সঙ্গত নয়।

বোম্বাই সহরে উক্ত Rhea Treatment Co. Ld. এর এজেণ্ট আছে। উক্ত কোম্পানীর দ্বারা সকল স্থানে এজেণ্ট নিযুক্ত করাইতে হইবে। পরে Provincial এজেণ্ট-

(১) The fineness of the fibre has been demonstrated, in his lecture before the Society of Arts by Dr. Forbes Watson, who showed that "the mean diameter of the ultimate fibres of Flax is about $\frac{1}{2060}$ inch,
of Jute „ „ $\frac{1}{1900}$ „
„ Hemp „ $\frac{1}{2100}$ „
„ Rhea of Assam $\frac{1}{2160}$ „
* * * He also asked :—"Now what is Rhea good for?' and he replied :—"It is difficult to say what it is not good for. It is the strongest fibre in nature."

গণ কর্ত্তৃক স্থানীয় সব এজেণ্ট নিযুক্ত করাইয়া তদ্বারাই ইহার খরিদ বিক্রয়ের সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। রিয়া চাষের নিয়ম প্রণালী সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করাইয়াই হউক(কারণ এণ্ডির ন্যায় ইহারও চাষ লোকে ভুলিয়া যাইতেছে)কিম্বা রিয়ার বীজ অর্থাৎ শিকড় বিতরণ কালে তৎকর্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াই হউক,ইহার চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সব এজেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত লোক দ্বারা হাটে হাটে তাহার ত্বক খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকদিগকে সুবিধা দেখাইয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে যখন সর্ব্বত্রই রিয়ার চাষ বিস্তৃত হইবে, তখন পাটের ন্যায় পাইকার, খরিদদার এবং ব্যবসাদার আপনা হইতেই আসিয়া জুটিবে। বাজারে রিয়ার আমদানি প্রচুর পরিমাণে হইলে,এক্ষণে যেমন একটী কি দুটী কোম্পানীতে কল ইত্যাদি দ্বারা সূতা ও তৎপর আবশ্যকীয় বস্ত্রাদ বয়ন করিতে সক্ষম হইতেছে, তখন তাহাদের দেখাদেখি কাপড়ের কলের ন্যায় বহু কোম্পানী কলের দ্বারা রিয়ারও উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি বয়ন কার্য্য করিবে। যে সময়ে অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে ভারতবাসীর এক সুযোগের দিন উপস্থিত হইবে। ভারতবাসী যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে তাহাদিগের দ্বারা উক্ত কার্য্যে অগ্রণী হওয়া সম্ভব নয়; পরে লাভালাভ দেখিয়া বস্ত্রাদির সাহায্যে ভারতেই (Rhea ribbon)রিয়াত্বক দ্বারা সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করণান্তর, রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল ও শক্ত বস্ত্রাদি বয়ন করিবার সুযোগ হইবে।

আসাম সিল্ক অর্থাৎ এণ্ডি কাপড়ের কথা সকলেই বিদিত আছেন। এণ্ডি বা রেড়ি এক প্রকার চারা গাছ। তুঁতের পাতা খাইয়া যেরূপ রেশম পোকা, কুলগাছ, শালগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া যেরূপ মুগা পোকা বর্দ্ধিত হয় এণ্ডি বা রেড়ির পাতা খাইয়া তদ্রূপ এণ্ডি পোকাও বর্দ্ধিত হইয়া গুটীকা প্রস্তুত করে। সেই গুটীকা হইতেই নানা প্রক্রিয়ার পর সূতা প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি অর্থাৎ এণ্ডি কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে, এণ্ডি পোকা এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে,প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পালিত হইত। এক্ষণে কলের কাপড়ের আবির্ভাবে এণ্ডিপোকা চাষের তিরোভাব হইতেছে। তদ্রূপ ধীবরদিগের কঙ্কুরা ক্রয় সম্বন্ধে আগ্রহ কমিয়া যাওয়াতে তাহার যে যৎসামান্য চাষ ছিল, তাহাও এণ্ডির চাষের ন্যায় প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বা হইতেছে। যদি শীঘ্র উক্ত দুইটী চাষের উন্নতিকল্পে যত্ন করা না যায়, তবে উক্ত চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যে অল্প পরিমাণ লোক এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাষ একেবারে লোপ পাইবে। পুনরায় এই প্রদেশে ইহার চাষ বিস্তার করিতে হইলে একেবারে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে; কাজেই যথেষ্ট সময় নষ্ট ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

কঙ্কুরা বা রিয়া দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইত না বটে, কিন্তু ধীবরদিগের জাল প্রস্তুত হইত। উক্ত জাতি মধ্যে কঙ্কুরা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু; কিন্তু পাটের চাষের সঙ্গে সোণের চাষ বিস্তার হওয়ায়, সোণের মূল্য অল্প বলিয়া এবং তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে

রিয়ার স্থান অধিকারে সক্ষম হওয়ায় গরিব ধীবর জাতি মূল্যবান রিয়া পরিত্যাগ করতঃ অল্প মূল্যে সোণ দ্বারা জাল প্রস্তুত করিতে লাগিল। ক্রমে এদেশীয় "সস্তার শেষে পস্তায়" প্রবাদের ফল স্বরূপ তাহাদের ব্যবসা তন্তুবায়দিগের ব্যবসায়ের ন্যায় হীন হইয়া গেল। আজকাল ইউরোপীয় ধনী ধীবরগণ মূল্যবান জাল দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য-ব্যবসায়ী-কোম্পানীকে লাভবান করিতেছে। আবার শুনিতে পাই যে, তাহাদের উৎকৃষ্ট জাল ও যন্ত্রাদি দ্বারা ভারত উপসাগরে মৎস্য ধরিয়া অপর এক কোম্পানীকে লাভবান করাইবার চেষ্টা হইতেছে। এদিকে ভারতীয় নির্ধন ধীবরগণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর সুতা দ্বারা জাল প্রস্তুত করিয়া ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি না করিয়া, নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম পাট দ্বারা জাল প্রস্তুত করতঃ হীন ব্যবসায়ী হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের হীনাবস্থার কারণ বোধ হয় রিয়ার মহার্হতা। এই মহার্হতা দূর হইলেই তাহাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ অনুমান হয়। যে উপায়ে ইহার আবাদ বৃদ্ধির সহিত মূল্য কমিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার কৃষি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

পাশ্চাত্য অনুসন্ধানকারীগণ, চা কিম্বা আকের চাষের ন্যায়, ইহার চাষ করিয়া লাভবান হইবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ইহার চাষ করিয়া বিঘা প্রতি কত পরিমাণ রিয়াত্বক পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহা কত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাহা দেখিয়াই অনেকে হয়ত বেশী পরিমাণ ভূমিতে রিয়ার চাষ করতঃ লাভবান হইবার চেষ্টা পাইয়াছেন বা পাইবেন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া তাহার চাষ করা হইয়াছে। বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ করিতে হইলে সারের অভাব নিশ্চয়ই হইবে। সুতরাং আশানুরূপ লাভ ঘটিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইলেই উক্ত উদ্যম নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ বাটীর নিকটস্থ অনতিগভীর ডোবা বা আবর্জ্জনাপূর্ণ নিম্নভূমিতে ইহারা চাষ করে। যখন আবর্জ্জনা পচিয়া উত্তম সাররূপে পরিণত হয়, তখন তাহা কর্ষিত করিয়া কণ্ডকুরার কলম রোপণ করে এবং তাহা উত্তমরূপে বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া দেয়। বেড়ার উচ্চতা প্রায় ৬।৭ ফিট হইয়া থাকে। এদেশে প্রবাদ আছে যে, কণ্ডকুরার গায়ে বাতাস লাগিলেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে, সুতরাং সুতা লম্বা হয় না। তজ্জন্য গাছের উচ্চতা ৬।৭ ফিট করণার্থ বেড়াও ততই উচ্চ করিয়া থাকে। বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, গাছ যে সময়ে উক্ত বেড়া ছাড়িয়া উঠিয়াছে, সেই সময়েই কণ্ডকুরা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। তাহাতেই উক্ত প্রবাদের সার্থকতা দেখা গিয়াছে। যদি বেশী পরিমাণ জমিতে কণ্ডকুরা আবাদ করিতে হয়, তবে বেড়ার উপকারিতা কোন কালেই আসিবে না। গাছ সহজেই শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে সুযোগ পাইবে, কাজেই ফলের আশা অতি কম হইবে।

কণ্ডকুরা আবাদের পক্ষে দোআঁশলা মাটীই উপযুক্ত অর্থাৎ বালি ও মৃত্তিকার

ভাগ সমান সমান হওয়া উচিত। উক্ত প্রকার মৃত্তিকা আসাম, কোচবিহার, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী ও কথঞ্চিত পরিমাণে দিনাজপুর, পূর্ণিয়া ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যাইতে পারে। যে স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও এটেলা মাটীর ন্যায়, তাহা আমাদের মতে কমক্ষুরা আমাদের উপযুক্ত নহে। তাহাতেও আবার এত সার দিতে হয় যে, অন্যায়তন মৃত্তিকায় কণ্ডক্ষুরা চাষ করা ব্যতীত উক্ত প্রকারে প্রচুর পরিমাণে সার প্রদান করতঃ বেশী পরিমাণ জমিতে তাহার চাষ করা অসম্ভব। সেই জন্যই বোধ হয়, ইণ্ডিয়ান হাসব্যাণ্ড্রি কোম্পানীর দ্বারা কণ্ডক্ষুরার চাষের উদ্যম বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, ইহার চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে, আমাদের বর্ণিত এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে, অন্য উপায়ে আবাদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা আপাততঃ বিফল হইবে, মনে করি। যে কোন উপায়েই হউক, ইহার চাষ বিস্তৃত হইয়া দেশের উপকার সাধিত হইলেই কৃতার্থ হইব।

শ্রীজগদিন্দ্র দেবরায়কত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

(শ্রীম—কথিত)।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম]।

মাষ্টার। দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্ব গুণ থেকে হয়। তমোগুণে সংহার, রজোগুণে সৃষ্টি, আর সত্ত্বগুণে পালন। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণের পার। তিন গুণের পার; প্রকৃতির পার।

"যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্ব রজোতমঃ তিন গুণই চোর।

একটা গল্প বলি শুন। একটী লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিন জন ডাকাতে এসে ধরলে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। তখন একজন চোর বল্লে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে। এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন চোর বল্লে, নাহে কেটে কি হবে? একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐ খানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বল্লে আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। তখন তার বন্ধনটী খুলে দিয়ে সেই চোরটী বল্লে, আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বল্লে, এই রাস্তা ধরে যাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটী চোরকে বল্লে মশাই আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসুন। চোর বল্লে না আমার ওখানে যাওয়ার যো নাই, পুলিশে টের পাবে।

"সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজোতমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে

লয়। তমোগুণ জীবকে বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজোতমঃ থেকে জীবকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম, ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ, তোমার নিজের "বাড়ী দেখ, ঐ দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত অনেক দূরে।

"ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানীতে গেলে আর জাহাজ ফেরে না।

"চারজন বন্ধু ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উচু প্রাচীর। তখন ভিতরে কি আছে, দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে একজন দেখতে উঠলো। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক্ হয়ে "হা হা হা হা" বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যে উঠে, সেই "হা হা হা হা" করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দিবে ?

জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, এঁরা ব্রহ্মদর্শন করে আর খবর দিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধি হলে আর 'আমি' থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আপনি যদি না পারিস্ মন, তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে' না।" মনের লয় হওয়া চাই, আবার "রামপ্রসাদে"র লয় অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই—তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলেন, শুকদেব ব্রহ্ম সমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন—লোক শিক্ষার জন্য। পরীক্ষিৎকে ভাগবত বলবেন, আরো কত লোক শিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' একটু রেখে দিয়েছিলেন।

[দল (সাম্প্রদায়িকতা) ও কেশবচন্দ্র সেন]

একজন ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি দল টল থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বল্লে, 'আরও বলুন।' আমি বল্লুম আর বল্লে দলটল থাকে না। তখন কেশব বল্লে, তবে আর থাক মশায়। (সকলের হাস্য।)

"তবু আমি কেশব সেনকে বল্লুম, 'আমি' 'আমার' এটা অজ্ঞান। 'আমি কর্ত্তা' আর আমার স্ত্রী পুত্র, বিষয়, মান সম্ভ্রম এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না।' তখন কেশব সেন বল্লে মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বল্লুম, কেশব, আমি তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছিনা, তুমি কাঁচা 'আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্ত্তা' 'আমার স্ত্রী পুত্র' 'আমি গুরু' এসব অভিমান' 'কাচা আমি'। এইটী ত্যাগ করিতে হয়। এইটী ত্যাগ করে, "পাকা আমি" হ'য়ে থাক

আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্ত্তা, তিনি কর্ত্তা।

[আদেশ ও ধর্ম্মপ্রচার]

একজন ভক্ত। "পাকা আমি'' কি দল ক'রতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কেশব সেনকে বল্লুম, আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, ও "আমি" "কাঁচা আমি"। মত প্রচারও কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর সাক্ষাৎ আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবত কথা বল্‌তে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেহ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোক শিক্ষা দেয়, তা হলে দোষ নাই। তাঁ'র আমি "কাঁচা আমি" নয়; "পাকা আমি"।

ব্যর্থ জীবন।

(বিষ্ণুপ্রিয়া)

১

শুনি যত পরাপর কাছে
মত্ত প্রভু হরিনাম নিয়া—
লোকমুখে শুনি আমি, আমার সে দেব-স্বামী,
হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়
হরিরে পাইয়া!

২

ইহা মম ভাগ্য পুণ্য কিবা
মর দেশে, রমণী-জীবনে?—
এখানে যাহারা পতি, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র মতি,
"সংসার-সঙ্গিনী জায়া"
তাই ভাবে মনে!

৩

তা'রা এই ধরার মানব
আমার প্রভুর মত নহে—
আদর, আনন্দ, প্রীতি, দেয় বুঝি নিতি নিতি,
কভু অভিমান করে—
কি জানি কি কহে?

৪

আমারই প্রাণের দেবতা
এসেছেন পাতকী তারিতে—
নাহি তাঁর বাড়ী ঘর, নাহি তাঁর পরাপর,
নাহি তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া
চরণে মরিতে!

৫

তাঁর যদি কেহ নাহি তবে
আমি কেন কাঁদি নিরজনে?—
বুঝেছি বুঝেছি আমি, দেবতা আমারি স্বামী,
তবু কেন পোড়ে প্রাণ
হেন হুতাশনে?

৬

প্রভু আছে দেবতার কাজে,
আমি হায়, কোন্ কাজে র'ব?—
মোর সে সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণারাম নারায়ণ,
তাঁরে ছাড়ি, কিসে তৃপ্ত
কিসে সুখী হ'ব?

৭

সেই যে রাঁধিয়া দেছি কত,
খাইতেন আনন্দ করিয়া—
আহা! সে মাহেন্দ্র ক্ষণে, কেন আজি পড়ে মনে,
কেন না মরিনু সেই
চরণে পড়িয়া!

৮

সেই তাঁর ভোজনের শেষে,
খাইলাম সে মহাপ্রসাদ—

সিন্ধু মথি দেব সবে, অমৃত তুলিলা যবে,
মোর সেই মিষ্ট অন্নে
তাহারি আস্বাদ!

৯

সেই ঘরে আসিলা একদা
ভিজা দেহ বরষার জলে,
কি বাজ বাজিল চিতে, সে দেহ কাঁপিছে শীতে!
মুছিনু বরাঙ্গ খানি
আমারি আঁচলে!

১০

সেই যে সুখের নিদ্রাবেশে,
ছিলা নাথ শয়নে শুইয়া—
ধরি সে যুগল পদ, (মরি! যুগ কোকনদ)
দিয়াছিনু সাবধানে
হাত বুলাইয়া!

১১

সেই সর্গ জীবন-কাব্যের
লেখা আছে সোণার অক্ষরে—
তাই জপি তাই স্মরি, তাহাই হিসাব করি,
গেল দিন, যায় দিন
যাবে দিন পরে।

১২

তিনি হরি-প্রেমের পাগল,
তাঁর প্রেমে আমি পাগলিনী—
আমি ত চিনি না হরি, চিনিব কেমন করি,
আমি চিনি প্রাণেশ্বরে,
মোর সব তিনি।

১৩

জানি না'ক হরি-সেবা-সুখ,
তাঁরে সেবি যা'হয় তা'জানি—
দূরে যায় পাপাসক্তি, প্রাণে জাগে প্রেমভক্তি,
বিমল স্মরণ হয়
ম্লান হৃদি-খানি!

১৪

যতই দেখেছি চন্দ্রানন—
পোড়া চোখে পলব পড়ে না—
দেখি নাই হরি-মুখ, বুঝি না সে কিবা সুখ,
সে বিধুবদন সম
কভু তা' হবে না!

১৫

আমি কি কাঁদিয়া মরি সাধে?—
প্রভু মোর শ্রীহরির দাস,
তাই ত্যজি ঘর বাড়ী, প্রিয় পরিজনে ছাড়ি,
সেবিয়া প্রাণের হরি,
পুরাইলা আশ!

১৬

বিষ্ণুপ্রিয়া যার চিরদাসী,
সে কেন দিল না পদে ঠাঁই?—
অভাগীর রত্নখনি, অতুল অমূল্য মণি,
সে পদ পূজিতে কেন
অধিকার নাই?

১৭

সতীর ধরম কিবা ভবে
না সেবিলে পতির চরণ?—
বঞ্চি সহধর্ম্মিণীরে, উদ্ধারিবে পাতকীরে,
হেন ভুল শিখাইল
গুরু সে কেমন?

১৮

তাঁর ত্যক্ত পাদুকা দু'খানি
রাখিয়াছি হৃদয়ের পরে—
দেখিয়া সোণার সীতা, রামের বুকের চিতা,
দ্বিগুণ জ্বলিত যথা
অযোধ্যা-নগরে!

১৯

থা'ক প্রভো! হরি-প্রেমে মজি,
আমি থাকি যাতনা লইয়া,
পতি সেবা-বঞ্চিতা যে রহিবে সে কোন্ কাজে,

কীটদষ্ট ফুল সম
যাউক ঝরিয়া !—
অথবা তোমারি দাসী, তব পদ-অভিলাষী,
বেঁচে র'ব তোমা লাগি—তোমারি হইয়ে,
এ ব্যর্থ জীবনে সেই সার্থকতা নিয়ে।
শ্রী[illegible]-রচয়িত্রী।

ব্রাহ্মসমাজের স্বচ্ছ গুরু।

হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত গুরুর কয়েকটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রকৃত গুরু শিষ্যের বিত্তাপহারক না হইয়া সন্তাপ-নাশক হইবেন। আর গুরু শিষ্যের চক্ষের চসমা স্বরূপ হইবেন। অর্থাৎ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ [illegible]দর্শন বা নিকট দর্শনের জন্ত চসমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, তদ্রূপ প্রকৃত গুরুর জীবন এরূপে গঠিত হইবে যে, তাঁহার মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে ঈশ্বর দর্শন হইবে। প্রকৃত গুরু পরিষ্কৃত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইবেন। ও তাঁহার মধ্য দিয়া অবলীলা ক্রমে লীলাময় হরির লীলা সন্দর্শন হইবে। কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, তবে গুরু ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইলেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহা নহে। চসমা ত কদাচ ক্ষীণ চক্ষুর আবরণ স্বরূপ হয় না। তাহা দৃষ্টির সহায়তা করিয়া অন্যান্য দৃশ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞান উজ্জ্বলতর করিয়া দেয়। তদ্রূপ প্রকৃত গুরু কখনই ঈশ্বর ও মনুষ্যের ব্যবধান স্বরূপ হন না। তিনি স্বীয় অলৌকিক পুণ্যপ্রভাবে জীবের ব্রহ্মদর্শনের সহায়তা করেন ও তাহাকে স্বর্গের পথ সুস্পষ্টতর ভাবে দেখাইয়া দেন। বর্ত্তমান ভারতের সৌভাগ্য ক্রমে জনসমাজের মধ্যে একজন ঈদৃশ গুরু বর্ত্তমান দেখিতেছি। ইনি ভারতের প্রাচীন গুরুবংশের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। যে গুরুবংশ প্রাচীন ভারতে অভ্যুদিত হইয়া বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ নিহিত মহান সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তব্ধ ও মোহিত করিয়াছেন, ইনি উত্তরাধিকারিতা সূত্রে তাঁহাদের অন্তর্ভূত। ইনি তাঁহাদিগের ন্যায় যোগ ও ধ্যান প্রভাবে সেই অতীন্দ্রিয় নিরাকার অবাংমানসগোচর পরব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলক বৎ উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং সিদ্ধযোগী হইয়াছেন ও ভারত-শ্মশানের গাঢ়তম অমানিশার অন্ধকারে ব্রহ্মাপূজার উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনিই ঋষিগণের চিরন্তন ধন "প্রাণস্য প্রাণম্" মহেশ্বরের মহাপূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রাণহীন দেশের প্রাণ সঞ্চারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইনি ভারতের সেই প্রাচীন গুরু-গোষ্ঠির অন্যতম প্রতিনিধি। এজন্ত ইহাঁর স্বদেশবাসীগণ একবাক্যে ভক্তির সহিত ইহাঁকে "মহর্ষি" নামে অভিহিত করিয়া দেশের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ব্যবধান, বা মধ্যবর্ত্তী নাই, আরাধনা ও ধ্যান যোগে সকলেই সেই "মহতোমহীয়ানের" সমীপস্থ হইতে পারে, কোন প্রতিভূর আবশ্যক হয় না, এই মহাশিক্ষা নিজের অমূল্য ও পবিত্র জীবন দ্বারা, এই মূর্ত্তিপূজা ও অবতার-প্রপীড়িত দেশে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশের

চির কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। ইনি ইচ্ছা করিলে রাজদ্বারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু মানাপমান ও পার্থিব গৌরব বামপদে ঠেলিয়া মহাপ্রভুর মহা আহ্বানে যে মহা-সত্য সাগরে চিরদিনের জন্য সন্তরণ বিস্মৃত হইয়া নিমগ্ন হইয়াছেন, এই প্রাচীনতম বয়স পর্য্যন্ত তাহাতেই চিরবিহার করিতে-ছেন। ইহাঁর ব্রহ্মগতপ্রাণ, পবিত্র জীবন বর্ত্তমান শতাব্দীর সংশয়বাদ ও নাস্তিক্য বুদ্ধির সুতীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। যে সমস্ত উজ্জ্বল ও মহান সত্য প্রচার করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সভ্যজগতের বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, অভিনিবেশ ও অপক্ষপাতিতা সহকারে ইহাঁর পবিত্র মুখোচ্চারিত "ব্যাখ্যান" পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, প্রায় সেই সমস্ত সত্যই ইহাঁ কর্ত্তৃক জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিংশ বর্ষ যাবৎ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে থাকিয়া দেখিলাম যে, তাহার উপর দিয়া কত প্রবল ঝটিকা, কত ঝঞ্জাবাত প্রবাহিত হইয়া গেল, কত অভি-নব মত ও কুসংস্কারের জঞ্জাল তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অসাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বজনীন ভাব বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইল; কত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মতভেদ এই ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শতধা বিভক্ত করিয়া তাহার কল্যাণ ও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিল, কিন্তু এই লোকগুরু কি মহান; কি উদার শিক্ষা দিয়া-ছেন! তিনি বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মতেরও তদ্রূপ বিভিন্নতা হইবে, তাহাতে যেন পর-স্পরের মধ্যে প্রীতির অভাব না হয়। কিন্তু "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনম্ তদুপাসনমেব" এই মহাসত্যের উপর যেন সকলের ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময়ে দেখিয়া স্তম্ভিত ও ব্যথিত হইয়াছি যে, মতভেদের জন্য ইঁহার দুই একজন প্রধান শিষ্য কি নিষ্ঠুর, কঠোর ও নির্ম্মম-ভাবে এই মহাপুরুষকে বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রে আক্রমণ করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত নিষ্ঠুর আক্রমণ ও তীব্র অপমান বিস্মৃত হইয়া দর্শনমাত্র প্রেমালিঙ্গনে তাঁহাদিগকে ক্রোড় দিয়াছেন। ইনি সমস্ত বিপ্লব ও চাঞ্চল্যের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় অটল, [illegible]কিম্বা বাত্যা-প্রপীড়িত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের আলোক-স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। সাধক-শ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের একটী বচন এই—

"চলতি চকী সব কোই দেখে,
কীল দেখে না কোই।
যো কীলকো পাকড়কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয় ওই।"

অর্থাৎ নিস্পেষন যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান চক্র সক-লেই দর্শন করে। কিন্তু মধ্যস্থিত "খিল" টী কেহই দর্শন করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি "খিল" আশ্রয় করিয়া স্থিতি করেন, তিনিই স্থির থাকিয়া যান। এই সংসার-চক্রের সেই খিল "পাকড়" করিয়া ইনি স্থিতি করিতেছেন, সুতরাং সেই অচ্যুতের অভয়-পদ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়াই নানা পরিবর্ত্তন, মত-চাঞ্চল্য ও পাপতাপের মধ্যে ইনি কোন প্রকারেই স্থান-বিচ্যুত হইতেছেন না। উপযুক্ত সময়ে যৎকালে এই গুরুর গুরু পরম গুরু তাঁহার স্নেহময় শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর গুরুবংশীয় অমরাত্মাগণের অঙ্গী-ভূত করিয়া লইবেন, তখন ইহাঁর অভাবে

আদি সমাজের বেদী শূন্য থাকিবে কিনা, এ প্রশ্ন আদৌ উঠিতে পারিবে না—যেহেতু জীব ব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী বা ব্যবধান নাই, বজ্রগম্ভীর স্বরে এই মহানসত্য স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করিয়া ইনি সকলের হৃদয়বেদী অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং পার্থিব উপাদান-নির্ম্মিত জড়বেদী শূন্য থাকিবার আর প্রয়োজন দৃষ্ট হইবে না। আমি এই বরণীয় লোক-গুরুর অলোকসামান্য পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ইহাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বসু।

বুয়র যুদ্ধ। (৩)

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র রাজ্য অথবা ট্রান্সভয়াল রাজ্য।

যে সকল বুয়র উত্তমাশা অন্তরীপস্থ উপনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে বসতি করার মানসে বহির্গত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ট্রির্চার্ডের দলের দুরবস্থার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যখন বুয়রগণ অন্তরীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হন, তৎকালে মাটাবলী অধিপতি মুশলীকটস্ ট্রান্সভয়াল প্রদেশ আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন; মাটাবলীগণ তৎকালে আফ্রিকার আদিমবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; মুশলীকটস্ অপর জাতীয় লোকদিগকে তাঁহার রক্ষিত কুক্কুরবৎ মনে করিতেন। বুয়রগণ দলে বলে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এই কথা যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, তখন বুয়রদিগকে বিনষ্ট অথবা তাঁহার রাজ্য হইতে তাড়িত করিবার নিমিত্ত তিনি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাটাবলী অধিপতির অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল না; তিনি অস্ত্রবলে ট্রান্সভয়াল নিবাসী স্বদেশীয় প্রজাদিগকে পরাজিত এবং হত করিয়া সেই দেশ নিজ রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন, ধরাকে শরার ন্যায় মনে করিয়া স্ফীত এবং গর্ব্বিত হইতেন, অন্য জাতীয় লোকদিগকে কুক্কুরবৎ মনে করিতেন; এত দম্ভ, এত অভিমান, এত নৃসংশতা, অশাসিত থাকিতে পারে না। ডেরংকপ্ নামক স্থানে ও তৎপর আরো দুই যুদ্ধে মাটাবলী যোদ্ধাগণ মুষ্টিমেয় বুয়রের নিকট পরাজিত হইল। চোরের ধন বাটপাড়ের হাতে পড়িল। মুশলীকটস্ তাঁহার সেনা সামন্ত সহ নিম্পপ নদ পার হইয়া নিজ রাজ্য মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

এই ভাবে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের সৃষ্টি হইল। দুরন্ত পরস্বাপহারী নরঘাতী অসভ্য মাটাবলী তাড়িত হইল বটে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীর অবস্থা তদ্দ্বারা কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল? সে এত দিন প্রতপ্ত কটাহোপরে ছট্ ফট্ করিতেছিল, এইক্ষণে প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে পতিত হইল।' বুয়রের অস্তিত্বের ইতিহাস আফ্রিকার সর্ব্বনাশের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আদিমবাসী ট্রান্স্ভয়াল প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইল; হতাবশেষ যাহারা রহিল, বুয়রগণের দাসত্ব-বৃত্তিই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়িল। এইরূপ বিনাশ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্রের উৎপত্তি,—অসংখ্য নররক্তে তাহার অভিষেক, অসংখ্য লোকের

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিনাশের ভস্মাবশেষ তাঁহার বিভূতি-সজ্জা।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বুয়রগণ স্বাধীন ভাবে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের দলবল ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গে আদিমবাসী হিট্টিদিগেরও সর্ব্বনাশ দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট, নাটাল অধিকার করার পর হইতে এই কাল পর্য্যন্ত, ট্রান্স্-ভয়াল-প্রদেশ-নিবাসী বুয়রগণের কোন প্রকার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ব্রিটিস্ প্রজা, ব্রিটিস্ রাজশক্তির অবমাননা করিয়া ব্রিটিস্ উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেপ গবর্ণমেণ্টের চক্ষে তদ্বারা তাঁহাদিগের দায়িত্বের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আফ্রিকার ব্রিটিস্ শক্তি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি; তাঁহার গ্রাস অতিক্রম করিয়া নিরাপদে বাস করা মুষ্টিমেয় বুয়রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। মুসলমানদিগের এক গল্পের কেতাবে লিখিত আছে যে, মহাপরাক্রান্ত হারুণলরসিদ গ্রীষ্মপ্রতপ্ত শরীরে সায়ংকালীয় আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহার শিরোপরে মেঘ ভাসিতেছে, প্রাণে বড়ই আশা মেঘ বর্ষিত হইবে, শরীর সুশীতল হইবে। মেঘ বাদসাহের আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না, সে তাহার বাহন পবনে ভর করিয়া স্থানান্তরে চলিল। পরাক্রান্ত বাদসাহ সক্রোধে মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আরে বিআকুব্! তুমি কোথা যাবে? যেখানে যাবে,সেইখানেই ত আমি"। মেঘ পরাক্রান্ত বাদসাহের এই সক্রোধ শাসন বাক্যে কর্ণপাত করিল। কিন্তু বুয়র দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা ত মেঘের অবস্থা নহে; তাঁহার পক্ষে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট অবনত মস্তক হওয়া আবশ্যক, নচেৎ বিস্তৃত আফ্রিকার কোন স্থানেও তিনি নিরাপদ নহেন।

এণ্ড্রিস্ প্রিটরিয়াস্ অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট পরিত্যাগ করিয়া ট্রান্স্ভয়ালবাসী বুয়রদিগের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। কেপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মস্তকের মূল্য ২০০০ পৌণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্ধারিত মূল্যের মস্তক স্কন্ধে করিয়া কেহই নিজকে নিরাপদ মনে করিতে পারেন না। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সন্ধির প্রার্থনা করিয়া, পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রস্তাব ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে স্যাণ্ডরিভার কনভেনসন্ নামক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি পত্রের অনুবাদ আমরা পরে সন্নিবেশিত করিব।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই মে তারিখে, গবর্ণর সার জর্জ ক্যাথকার্ট বাহাদুর ঘোষণা (Proclamation) দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইলেন যে, তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়াই যে এইরূপ সন্ধিপত্র অনুমোদন এবং তৎপরে মঞ্জুর করিতে পারিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য সুখের বিষয় নহে। ১৮৫২ খ্রীঃ ২৪ জুন তারিখে, এই সন্ধিপত্র মঞ্জুর হইল।

এই সন্ধিপত্রের সর্ত্তের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট ট্রান্স্ভয়াল-নিবাসী বুয়রদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বলিয়া এই সন্ধিপত্রে স্বীকার করিয়াছিলেন। হলাণ্ড, ফ্রান্স, জারমানি, বেলজিয়াম, এবং বিশেষতঃ আমেরিকাও বুয়রাধীন ট্রান্সভয়াল প্রদেশকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। আমেরিকা তখন ফিলিপাইন

জয় করেন নাই; পৃথিবীর সুদূর প্রান্তেও স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইলে, আনন্দফুল্ল নয়নে সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের সেক্রেটরী অব ষ্টেট, ১৮৭০খ্রীঃ অব্দের ১৯ নবেম্বর তারিখে, প্রেসিডেণ্ট প্রিটরিয়সের নিকট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিলেন; এবং এই স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহাও সর্ব্বদা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।*

এই সন্ধির পর বুয়রেরা আশা করিয়াছিলেন যে, সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৭ বৎসর পরে, হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইল। ফ্রিষ্টেটের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তদ্দেশস্থ খনি-যেরূপ ভাবে কেপ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানও ব্রিটিস গবর্ণ মেণ্ট দাবি করিলেন। বুয়রগণ বলিলেন যে, এই স্থান ট্রান্সভয়াল-প্রদেশ ভুক্ত। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দাবি যে, তাঁহারা দেশীয় রাজা ওয়াটর বুয়রের নিকট হইতে এই স্থানের সত্ব ক্রয় করিয়াছেন। ঐ স্থানে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দাবিই বলবৎ হইল। বুয়রের প্রাণ আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে জলিয়া উঠিল, সমস্ত পুরাতন ক্ষত আবার নূতনের ন্যায় স্মৃতি-সাহায্যে তীব্র যাতনা উপস্থিত করিল। বুয়র ইংরেজকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পক্ষান্তরে ইংরেজের চক্ষে, বুয়র, অসভ্য, নৃশংস, জ্ঞানশূন্য, কৃষক ব্যতীত আর কিছুই না। আদিমবাসীকে বুয়র নিহত করিয়া ক্ষান্ত নন, তাঁহার এই অমানুষী কার্য্যকে তিনি আবার বাইবেলোক্ত বচন দ্বারা সমর্থন করেন! নরহত্যার উদ্যোগে বহির্গত হইবার সময় হস্ত দ্বারা বাইবল স্পর্শ করেন, বন্দুক ধরিবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম স্মরণ করেন, এবং হত্যাকাণ্ড শেষ হইলে, বন্দুক হাত হইতে রাখিয়াই, তৎক্ষণাৎ সেই হস্তে বাইবল স্পর্শ করেন। এই দৃশ্য ইংরেজ মিসনারীগণ বড় বাঞ্ছনীয় দৃশ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তন্মধ্যে আফ্রিকা-প্রবাসী খ্যাত-নামা লিভিংষ্টোনের সঙ্গেও বুয়রদিগের বিশেষ মনান্তর ঘটিল।

সবল এবং দুর্ব্বলের মধ্যে মনোবাদ ঘটিলে, দুর্ব্বলের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, ট্রান্সভয়ালবাসী বুয়রের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। ১৮৭৭খ্রীঃ অব্দে ট্রান্সভয়াল প্রদেশস্থ সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল, এবং তাহা ব্রিটিস সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, বুয়রগণকে স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদান করা হইবে। তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকা কালে যেরূপ স্বাধীন ছিলেন, ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইয়াও তদ্রূপ স্বাধীনতার সহিত নিজদিগকে নিজেরা শাসন করিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা সহজসাধ্য নহে। বুয়র সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনতার উন্মুক্ত আকাশের প্রতি সর্ব্বদা নিরীক্ষণশীল, ইহাকে স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদান করিলে, প্রথম সুযো-

*"That this Government while heartily acknowledging the sovereignty of the Transvaal Republic, would be ready to take any step which might he deemed necessary for that purpose."

সেই ইংলণ্ডের পতাকা টানিয়া ফেলিয়া নিজদিগের স্বতন্ত্রতা পুনরোদ্ধার করিবে। এরূপ পদার্থকে স্বায়ত্ব শাসনাধিকার দেওয়া কি সহজ ব্যাপার! লর্ড বিকন্‌স্ফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট চলিয়া গেল, গ্লাডষ্টোন মহামতির হস্তে ব্রিটিস্‌সাম্রাজ্যের কর্ণদণ্ড। তিনি যখন পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের বিরোধী ছিলেন,তখন বুয়রের স্বতন্ত্রতা লোপ করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বুয়র আশা করিলেন, লর্ড বিকন্‌স্ফিল্ডের নিকট যাহা প্রাপ্ত হন নাই, গ্লাডষ্টোন্ তাহা দিবেন। বুয়রের সে আশা বিফল হইল।

মহামতি গ্লাডষ্টোন এই সময়ে প্রাচ্যদেশস্থ রাজনৈতিক ব্যাপারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, তিনি বুয়রের আকাঙ্ক্ষার গভীরতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বুঝিলেন না; ঘোষণা দ্বারা প্রকাশ করিলেন, ট্রান্সভয়াল প্রদেশ ব্রিটিস রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র করা অসম্ভব, তবে বুয়রদিগকে উদারভাবে স্বায়ত্ব শাসনাধিকার দেওয়া যাইবে। বুয়র ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। ট্রান্সভয়ালবাসী বুয়রগণ অস্ত্রধারণ করিলেন।

আফ্রিকাস্থ ব্রিটিস্ সৈন্যের অধিনায়ক মনে করিয়াছিলেন, বুয়র কৃষক বৈত নয়, শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য যত অল্প সংখ্যকই হউক না কেন, বুয়রকে পদদলিত করিতে আর কত সময়ের প্রয়োজন হইবে? কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইলেন যে, বুয়র কৃষক হইলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাঁহার শিক্ষানুসারে তাহার অস্ত্র-পরিচালনে দক্ষতাও অসাধারণ। বুয়রদিগের নিকট ব্রিটিস্ সৈন্য প্রথমতঃ দুই তিন যুদ্ধে পরাজিত হইল, তৎপর মজুবা পর্ব্বতের সন্নিকট যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সেনাপতি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র আলিঙ্গন করিলেন। তখন গ্লাডষ্টোন্ বুঝিতে পারিলেন, বুয়র স্বাধীনতার নিমিত্ত কত ব্যাকুল। ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ভিখারী আপনার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে ভিক্ষা করিলে, আপনার বিষয়ান্তরে ব্যাপ্ত মন তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ নাও করিতে পারে, কিন্তু সে যদি নিরাশ হইয়া আপনার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিতে উদ্যত হয়, তখন আপনার দৃষ্টি স্বভাবতঃই তাহার দিকে আকর্ষিত হইয়া থাকে। গ্লাডষ্টোন্ বুয়রের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু ব্রিটিস জাতির গৌরব রক্ষা করা চাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিস সৈন্য প্রেরিত হইল, লর্ড রবার্টস্ প্রেরিত হইলেন। লর্ড রবার্টস আফ্রিকায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সার ইভিলিন্ উড যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বুয়র দেখিলেন, তখন মস্তক অবনত করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, তাঁহারা সরলভাবে বলিলেন, যুদ্ধে তাঁহাদিগের জয়াশা নাই।

বুয়র এইরূপ ভাবে পরাভব স্বীকার করার পরেও, বুয়র জাতীয় কয়েক ব্যক্তির কণ্ঠদেশ ছেদন ব্যতীত যে, ব্রিটিস গৌরব আফ্রিকায় পুনরোজ্জ্বল হয় না, গ্লাডষ্টোন্ তাহা মনে করিলেন না। আফ্রিকায় ভীষণ দৃশ্য আর অভিনীত হইল না। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে সন্ধিপত্রে, ট্রান্সভয়াল প্রদেশকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। মহারাজ্ঞীর রাজকীয় শক্তির অধীনে (Subject to the Suzerainty of her Mejesty) স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদত্ত হইল।

এই রাজ্য ট্রান্সভয়াল ষ্টেট্ নামে এই সন্ধিপত্রে আখ্যাত হইল।

বুয়রগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন যে, সোণার পিত্তলের কলসের ন্যায়, কাঁটালের আমসত্বের ন্যায়, এই অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়, বাঙ্মনসাতীত গঠনের শাসনাধিকার, সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে পরিচালন করা অসাধ্য। তাঁহারা ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রাজশক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন।

লর্ড ডার্বির হস্তে এই সময়ে বুয়রদিগের অদৃষ্টলিপি। লর্ড ডার্বি আফ্রিকায় ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের অতি বিস্তারের অথবা আফ্রিকায় সমস্ত শক্তি ব্রিটিস্ পতাকার নিম্নে একত্রিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বুয়রকে সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন ও উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু রাজমন্ত্রী সকল সময় উন্মুক্তহস্তে কার্য্য করিতে পারেন না। মেকেঞ্জিপ্রমুখ ইংরেজগণ মহা গোলযোগ তুলিলেন যে, ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে যদি অবধারিত না থাকে, বুয়র রাজ্য অতি অল্প সময় মধ্যেই, ইংরেজাধিকৃত সমস্ত আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং লর্ড ডার্বি ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের বর্ত্তমান সীমানা অবধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে লর্ড ডার্বিকে উন্মুক্ত হস্তে কার্য্যে করার অধিকার দেওয়া হইল। এই অধিকারের ফল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি পত্র।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্রে ট্রান্স্ভয়াল দেশকে সাধারণ তন্ত্র রাজ্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল। রাজকীয় শক্তির অধীনতার কথা উল্লেখ করা হইল না। তথাপি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট এইটুকু কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিলেন যে, এই সাধারণ তন্ত্র রাজ্য অপর কোন রাজ্যের সহিত কোন সন্ধি করিতে হইলে তাহা মহারাজ্ঞীর অনুমোদন ব্যতীত করিতে পারিবেন না। যদি সন্ধিপত্রের নকল প্রেরিত হওয়ার পর ৬ মাস মধ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে কোন মত না জানান, তবে তাহাদিগে[illegible] আপ[illegible] নাই, মনে করিয়া কার্য্য করা যাইতে পারিবে। এতদরিক্ত আর কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের সন্ধির পর, হয় ত আর কোন গোলযোগ ঘটিত না; কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের বহু স্থানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইল। এই খনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বুয়রের অধঃপতনের বীজ রোপিত হইল। একজন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন, স্বর্ণ যতক্ষণ মানবচক্ষুর অন্তরালে খনির অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকে, ততক্ষণ মাত্র তাহা জগতের হিতকর। ট্রান্সভয়াল দেশ এই বাক্যের সত্যতা অতি তীব্ররূপে অনুভব করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

কবীর প্রকাশ।

১৩০০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগধামে পূর্ণকুম্ভের অধিবেশনে হরিদ্বারবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভোলানন্দ গিরি মহাশয় দশনামা সন্ন্যাসীদিগের নেতা ছিলেন। আমার রচিত "প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার

বিশেষ পরিচয় হয়। এই সময় তিনি কবীর সাহেবের কতকগুলি দোহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুরোধ করেন। তখন শরীর, মন সুস্থ ছিল, সুতরাং সাধুর আদেশ শিরোধার্য্য করিতে (ক্ষমতার অল্পতা সত্ত্বেও) অস্বীকৃত হই নাই। যে দোঁহাগুলির অনুবাদ করিতে হইবে, কিছুদিন পরে আমি সেগুলি একজন সুবিজ্ঞ কবীর পন্থীর নিকট ছাত্র হইয়া পাঠ করি এবং উহার অধিকাংশের পদ্যানুবাদ সম্পাদন করি। বিভিন্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় কবীরের যে সমস্ত দোহা প্রকাশিত ও অনুবাদিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতিশয় ভ্রমপূর্ণ। উহাতে অনেক স্থলে এমন সকল অসঙ্গত পাঠ ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে যে, পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমার ভয়, পাছে আমার প্রকাশিত "কবীর প্রকাশ"ও লোকের নিকট ঐরূপ পরিহাসের সামগ্রী হয়। এই জন্য আমি উহা একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম না। সাময়িক পত্রে দুই একটী করিয়া "অঙ্গ" প্রকাশিত করিব, ভাবিয়াছি। সুবিজ্ঞ সমালোচকগণ ইহার দোষ গুণের বিচার করিবেন এবং তদ্দৃষ্টে আমি আমার গ্রন্থ সংশোধিত করিতে পারিব, ইহাই ভরসা। যিনি যে ভাবে সমালোচনা করিবেন, তাহাতেই আমি উপকৃত হইব। কিছু দিন পূর্ব্বে, নব্য-ভারতে "প্রেমঅঙ্গ" নামে একটী "অঙ্গ" সানুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পরে আমি দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কোনও কার্য্য করিতে পারি নাই। আমার প্রিয়বন্ধু "গৃহলক্ষ্মী" ও "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রণেতা স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয় "গুরু-অঙ্গ" ও "সেবক অঙ্গ" এই দুইটী আগ্রহ সহকারে আমার নিকট হইতে লইয়া তাঁহার "বঙ্কিম চন্দ্র" প্রেসে মুদ্রিত করেন, কিন্তু দুরন্ত প্লেগ-রোগে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় উহা আমার হস্তগত হয় নাই। দুই ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি হইল, কিছুই জানিলাম না। যাহা হউক, আমি উহাও পুনরায় প্রকাশিত করিব ভাবিয়াছি। আমার প্রকাশিত "কবীর প্রকাশে" যে সমস্ত পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই আগ্রা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল স্বর্গীয় শালীগ্রাম সিং বাহাদুরের প্রকাশিত কোনও কোনও গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁহার নিকট বাধ্য আছি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাধুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াই আমি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, নতুবা সাহসী হইতাম না।

কাম-অঙ্গ।

১। চলো চলো সব্ কোই কহে পঁহুছে বিরলা কোয়।
এক কনক আওর কামিনী দুর্গম্ ঘাটি দোয়॥

চল চল সকলেই বলে
বিরল পঁহুছে কেহ খাঁটি,
কামিনী কাঞ্চন এই দুই
পথের দুর্গম দুটী ঘাটি।

২। জগ্‌মে ভকত কহাবই চুটক চুন্ নঁহি দেয়।
শিখ্ জরুকা হোকর্ নাম গুরুকা লেয়॥

এ জগতে ভক্ত নাম ধরে,
এক মুটো দিতে সর্ব্বনাশ,
কথায় গুরুর শিষ্য বলে,
কাজে কিন্তু রমণীর দাস।

৩। পর্ নারীকা রাচ্‌নে সিধা নরক্ যায়।
তিন্‌কো যম ছোঁড়ে নঁহি কোটীন্ করে উপায়॥

পরনারী প্রতি মতি যায়,

সোজা নরকেতে তার গতি,
করুক সে সহস্র উপায়,
যম তারে নাহি ছাড়ে রতি।

৪। নৈনৈ কাঁজলদে কর্ গাঢে বাঁধে কেশ।
হাঁথো মিহ্ঁদীলায়্ কর্ বাঘিন্ খায়া দেশ॥
কাঁজলে নয়ন সাজাইয়া,
নিবিড় করিয়া বাঁধে কেশ,
মেঁদি রঙ্ হাতে মাথাইয়া,
বাঘিনী খেয়েছে সব দেশ।

৫। নারীকি ঝাঁই পড়ত্ অঁধে হোত্ ভুজঙ্গ।
কবীর তিন্‌কো কোন্ গতি নিত্ নারীকে সঙ্গ্॥
ভুজঙ্গম অন্ধ হয়, যদি একবার
কামিনীর ছায়া পড়ে অঙ্গে, *
কবীর কহেন হায়, কিবা গতি তার
নিত্য যেই রমণীর সঙ্গে।

৬। পর্‌নারী পৌনী ছুরী মতিকোই কব প্রসঙ্গ্।
দশ্ মস্তক্ রাবণ গয়ে পর্‌নারীকে সঙ্গ্॥
পরের নারী ধারাল ছুরা
ছুঁয়োনা কখনো তারে,
দশস্কন্ধ কাটা গেল,
পরনারীর ধারে।

৭। পরনারীকে রাচ্‌নে ঔগুণহৈ গুণ নাহিঁ,
খার্ সমুন্দর মাচ্ছলী কেতী বহ্ বহ্ জাঁহি।
পরনারীর লালসা দোষ
গুণ কিছু নাহি তায়,
মহাসাগরের মৎস্য দেখ
কোথায় বয়ে যায়।

৮। নারী পরাই আপনি ভোগে নরক্ যায়্।
আগ্ আগ্ সব্ একহি হাত্ দিয়ে জর্ যায়॥
পরনারী দূর কথা, নারী আপনার,
(অবৈধ) ভোগেতে সেও নরকের দ্বার॥
আগুণে পড়িলে হাত পুড়িবে নিশ্চয়,
নিজের কি পরের আগুণ ভিন্ন নয়॥

* দেশ বিশেষে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীলোকের ছায়া সর্পের গায়ে পড়িলে সর্প অন্ধ হইয়া যায়।

৯। জহর পরায়া আপনার খায়ে সে মর্ যায়্।
আপনি রক্ষা না করে কহে কবীর সমুঝায়॥
নিজের বিষ আর পরের বিষে,
কার্য্যকালে তফাৎ কিসে?
আপন ব'লে রক্ষা নাই,
খেলেই মরতে হবে ভাই।

১০। কূপ্ পরায়া আপনা গিরে ডুব্‌জো যায়।
এছা ভেদ বিচার কর্ তুমতি গোতা খায়্॥
ডোব যদি নিজের কূপে,
রক্ষা নাইকো কোনরূপে,
মনে রেখে এ সব বিচার,
চল যদি ভাবনা কি আর?

১১। ছুরী পরাই আপনি মারে দরদ্ জো হোয়।
বহু বিধি কহুঁ ফুকার কর্ কর ছুয়ো মতিকোয়্॥
নিজের ছুরী পরের ছুরী
কাটলে পরে সমান ব্যথা,
ছুঁয়োনা ভাই কামিনীর কর
কবীর কহে ফুকারী কথা।

১২। কামী কবহুঁ ন গুরু ভজে মিটৈন সংশয় শূল্।
আওর গুনহ্ সব্ বখ্‌সিহৈঁ কামী ডাল ন মূল্॥
কামী কখনো ভজে না গুরু,
বিদ্ধ সংশয় শূলে।
সব পাপে ক্ষমা সহজে আছে,
কামী জনে না মূলে।

১৩। কাম্ ক্রোধ সূতক সদা সূতক লোভ্ সমায়্।
শীল সরোবর নাহিয়ে তব্ রহ সূতক যায়॥
কাম ক্রোধ লোভ তিনই অশৌচ
(ছুঁইলে অশুচি কায়),
শীল সায়রে নাইলে পরে
তবে অশৌচ যায়।

১৪। নারী পুরুখ সবহী শুনো ইয়াহ সদ্‌গুরুকা শাখ।
বিখ্ ফল ফলে অনেকহৈঁ মত্ কোই দেখো চাক্॥
নারী পুরুষ সবাই শুন,
সদ্‌গুরুর এই বাণী,
বিষের ফল অনেক ফলে,
চাক্‌লে যাবে প্রাণী।

১৫। যাহাকাম উঁহা নামনহিঁ যহানাম নহিঁকাম।
দোনো কবহুঁ নামিলে রবি রজনী ইক্ ঠাম।

যেখানেতে আছে কাম,
সেখানেতে নাই নাম,
যেখানেতে আছে নাম,
সেখানেতে কাম নাই,
রবি রাত্রি কখনই
মিলেনাকো এক ঠাঁই।

১৬। গায়্ রোয়্ ইস্খেলকে হরত্ সবন্‌কে প্রাণ।
কহে কবীর ইয়া ঘাত কো সমুঝে সন্ত্ সুজান্।

হেসে কেঁদে গেয়ে খেলে
হরে সবার প্রাণী,
কবীর কহে এমন ঘাতক
যে চিনে সে জ্ঞানী।

১৭। নারী নদী অঘাহ জল বুড় মুয়া সংসার।
এয়সা সাধু নামিলা জা সঙ্গ্ উতরু পার।

নারী নদী অগাধ অপার,
ডুবে মলো জগৎ সংসার
সঙ্গ ধ'রে পার হই
এমন সাধু মিলে কই।

১৮। এক কনক্ আওরকামিনী বিষফল কিয়ে উপায়।
দেখে হীতে বিখ্ চড়ে চাকৃতহী মর্ যায়।

এক কনক আর কামিনী
দুটীই বিষ ফল বটে,
দেখলেই তায় বিষ চড়ে যায়,
চাক্‌লে মরণ ঘটে।

১৯। এক কণিক্ অরু কামিনী তজিয়ে তজিয়ে দূর।
গুরুবিচ্ জঃরে অন্তরা যম দেখী মুখ ধূর।

কনক আর কামিনী দুই
দূরে রেখে কর ভজন,
যমের মুখে দিয়ে ধূলী
বুকে রাখ গুরুর চরণ।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত।

(ভূতত্ত্ব)

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, অতি পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতও সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। হিমালয়ের বিবিধ প্রকার গঠনস্তর ও তদ্গর্ভে নানাবিধ সামুদ্রিক জীবাদির চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মত সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বও মৌলিক ভাবে উহাঁদিগের মত সমর্থন করিতেছে। হিমালয় সমুদ্র হইতে উত্থান করিবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত সমুদ্র উহার পদতল ধৌত করিত, এমন কি, উহাঁরা ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষে মনুষ্য সমাগমের পরেও হিমাচলের ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র-তরঙ্গ উত্থিত হইত। কালে ভূমুৎপাতে উত্তর-বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আমাদের ন্যায় অবৈজ্ঞানিকেরাও সহজে বুঝিতে পারেন। উত্তর-বাঙ্গালার যে কোন স্থান খনন করিলেই গন্ধক-জরিত লৌহ Vitrified Iron যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়,সেই জন্য অনেক স্থানের মৃত্তিকা দেখিতে যেন ১নম্বর সুরকির মত লোহিত বর্ণ। এই লৌহে উৎকৃষ্ট অসি প্রস্তুত হইত, "লৌহার্ণব" গ্রন্থে লিখিত আছে, "বঙ্গদেশ-জাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ ভেদে পটু"। (১) গলিত লৌহ শীতল হইলে যেমন চাপড়া বাঁধে, অনেক স্থলে মৃত্তিকা খনন করিলে সেইরূপ আকারের লৌহ পাওয়া যায়; উহাকে Iron slag বলে। কুচবিহারের

(১) ভারত রহস্য ১৯৯ পৃঃ।

নিম্নে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ লৌহ আছে। এমন কি, যেখানে যেখানে গভীর কূপ খনিত হইয়াছে, প্রায়ই তাহার জল লৌহ-গন্ধ ও লৌহ আস্বাদে এমন পরিপূর্ণ যে, ব্যবহার করা দুষ্কর। কুচবিহারের নিম্নস্থ লৌহ এত উৎকৃষ্ট জাতীয় যে, ভারতের আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। পুরাকালে উক্ত লৌহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খড়্গ প্রস্তুত হইত। "কল্পদ্রুম" অভিধানের "খড়্গপরীক্ষা" গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে, "নাগার্জ্জুন বলেন, ব্রাহ্মণ জাতীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খড়্গ স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ (১) ও হিমালয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। (২) অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন দ্বীপ সকলের উপর হিমালয়জাত নদী সকল অবিশ্রান্ত কর্দ্দমরাশি সহ নুড়ীপ্রস্তর আনিয়া ঢালিতে ঢালিতে বহু সহস্র বৎসরে সমুদ্রকে হিমালয়ের নিম্ন হইতে অল্পে অল্পে তাড়িত করিয়া বর্ত্তমান স্থানে রাখিয়াছে।

যে স্থান হইতে গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া পরে মেঘনা নামে সাগরে পতিত হইয়াছে, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভাগীরথী নামে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, এই ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ অর্থাৎ গঙ্গার বদ্বীপ দক্ষিণ-বঙ্গ বা বাগড়ি নামে খ্যাত। (৩) যদিও এই জনপদের উল্লেখ প্রাচীন পুরাণাদিতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এমন কি, সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপ সিংহ-বাহুর পুত্র বিজয়ের সিংহলযাত্রার বর্ণনায় দক্ষিণ বাঙ্গালার কোন উল্লেখ নাই। তত্রাচ ইহাও যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতে যাহাকে "বঙ্গ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পদ্মার উত্তর, মালদহ জিলার পূর্ব্ব, দিনাজপুর ও কুচবিহারের দক্ষিণ, এবং পূর্ব্ব পার্ব্বত্য প্রদেশের পশ্চিমস্থ স্থান। রাজা বল্লাল সেন খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আপনার অধিকৃত স্থানকে এইরূপে বিভাগ করিয়াছিলেন :—করতোয়া নদীর পূর্ব্বস্থ স্থান বঙ্গ; এক্ষণে যাহাকে পশ্চিম-বাঙ্গালা বলা যায়, তাহাকে তিনি ত্রিকলিঙ্গ মহাপ্রদেশের উড্র অর্থাৎ উড়িষ্যার অন্তর্গত রাঢ় দেশ; এবং বদ্বীপকে বাগড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; (১) করতোয়ার পশ্চিমে বারেন্দ্র।

মহাভারতাদি পুরাণে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুকের উল্লেখ আছে। যদিও উহা এক্ষণে বঙ্গের মধ্যে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা দক্ষিণ-কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-বঙ্গ সম্বন্ধে কেবল "সমতট" বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, পুরাণাদির,

(১) পুরাকালে ভারতবর্ষ সপ্ত মহাদ্বীপ এবং একাদশ উপদ্বীপে বিভক্ত ছিল, যথা :— ৭ মহাদ্বীপ,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। ১১ উপদ্বীপ,—কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নগ, কুমারিকা, গভস্তিমান, রমণ্যান্, তাম্রপর্ণ, কশেরু ও ইন্দ্র।

(২) ভারত রহস্য ১৬৬ পৃঃ।

(৩) বকানন হামিল্টন বলেন, পূর্ব্বে ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার সমস্ত জলপ্রবাহ চলিয়া যাইত। যে সময় কৌশিকী নদী প্রবল বেগে আসিয়া পদ্মায় মিলিত হইয়াছে, তদবধি পদ্মার প্রবাহ, এবং উহা দ্বারাই গঙ্গার অধিকাংশ জল চলিয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা প্লিনীর সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রবাহ অধিক ছিল না, উহার অধিকাংশ জল সরস্বতী দিয়া বহিয়া যাইত, সেইজন্য সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার প্রধান বন্দর ছিল। তিনি বাঙ্গালা প্রদেশকে Ganges Regia অর্থাৎ গাঙ্গরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) প্লিনি নিম্ন-বঙ্গকে মধ্য-কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সময় দক্ষিণ বঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু জনপদে পরিণত না হইয়া সমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায় ছিল। রামায়ণে সাগর-সঙ্গম এবং ভীষ্মের সাগরতীর্থ দর্শনে ইহা বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে যে স্থান দক্ষিণ-বঙ্গের দক্ষিণ সীমা দেখা যাইতেছে, বোধ হয়, বহু সহস্র বৎসর ঐ স্থানই সীমা হইয়া আছে। এই সীমা গঙ্গাসাগর হইতে মেঘনার মহানা পর্য্যন্ত ১৮০ মাইল, দুর্লঙ্ঘ্য অসংখ্য স্বাভাবিক দুর্গের দ্বারা রক্ষিত। ঐ সকল দুর্গ আর কিছুই নহে, অসংখ্য সাগরাবর্ত্ত ও চোরা বালি, কোথাও সমতল, কোথাও পর্ব্বতাকারে প্রাচীরের ন্যায় স্থাপিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রতি বৎসর কত কর্দ্দম আনিয়া বঙ্গসাগরে ঢালিতেছে, তাহা আমরা বর্ষা-কালে এক কলস গঙ্গার জল তুলিয়া পরদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হই। এত মৃত্তিকা পাইয়াও দক্ষিণ বাঙ্গালা উন্নত ও সাগরেরদিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কারণ বঙ্গ সাগরের মধ্যস্থলের গভীরতা ১০৭১০ ফিট, আবার সুন্দর বনের ঠিক নিম্নে সাগর গর্ভে একটী গহ্বর আছে, তাহার উপর শত শত ঘূর্ণী দিবারাত্র ক্রীড়া করিতেছে। ইহার গভীরতা শুনিলে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, ১২ হাজার ফিট, দুই মাইলেরও অধিক। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কর্দ্দমরাশি ঢালিয়া দিয়াও এই গহ্বর-রাক্ষসদিগের উদর পূরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সুতরাং বাঙ্গালা আর অগ্রসর হইবে কি প্রকারে? অগ্রসরও যেমন হইতেছে না, তেমনি উন্নত হইতেও পারিতেছে না। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় নিম্ন বঙ্গ ডুবিয়া যাইত, তাহার কর্দ্দম রাশি বৎসর বৎসর জমিয়া এবং তৎসহ উদ্ভিজ্জ-সার মিশ্রিত হইয়া বহুকালে সমতট কিছু পরিমাণে উন্নত হইলে, স্থানে স্থানে গ্রাম নগরাদি নির্ম্মিত হইতে হইতে সম্মুখস্থ গহ্বরের আকর্ষণে আবার ধসিয়া গিয়া সমতট হইয়া যাইত, সুতরাং উন্নত হইতে পারে নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা বিবিধ প্রকারে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। নিম্নবঙ্গের অধিবাসীরাও মৃত্তিকার নিম্নে বৃক্ষাদির চিহ্ন পাইয়া উহা সহজে বুঝিতে পারেন। সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে অনেক সমৃদ্ধ জনপদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গত চৈত্র মাসের "নব্যভারতে" একটী প্রবন্ধের মর্ম্মে বুঝা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশম্ভর সুর নামক মিথিলাবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় জলমগ্ন ভুলুয়া নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অল্প মাত্র মৃত্তিকার নিম্নে প্রস্তরময়ী বরাহী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত উক্ত দেবী মূর্ত্তি তাঁহাদের পুরোহিত বংশের গৃহে পূজিত হইতেছেন। এই প্রস্তাবে জানা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ এমন বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল যে, বহুদূর হইতে প্রস্তর মূর্ত্তি আনাইয়া তাহার পূজা পর্য্যন্ত করিত। এক দিন অকস্মাৎ সমুদ্রগর্ভে সমস্ত অধিবাসী সহ জনপদ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। আবার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুলুয়া প্রভৃতি স্থান ভীষণ জলপ্লাবনে জনশূন্য হইয়াছিল, ইহা রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অব্যবহিত পরে বলিয়া অনুমান হয়। ঐ প্লাবনে গঙ্গাতীরের সবিশেষ ক্ষতির কথা শুনা যায় না।

ভারতলক্ষ্মীর সিংহাসন স্বরূপ কলিকাতা নগরী যেখানে থাকিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে জগৎকে চমকিত করিতেছে, সেস্থানও এই বদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত থাকায় কতবার যে ইহাকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে হইয়াছে,তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কলিকাতার যে কোন স্থান গভীররূপে খনন করা যায়, কোথাও মনুষ্যের বসবাসের চিহ্ন স্বরূপ দগ্ধ মৃত্তিকা বা ধাতু দ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল উদ্ভিজ্জসার ও নদীর স্তরই দেখা যায়। লালদীঘি, গোলদীঘি, মনোহর তলাও প্রভৃতি খননকালে ঐরূপ চিহ্নই পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণে যে পুষ্করিণী আছে, তাহা খননকালে যে সকল স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। প্রথম এক ফুট উপরের মৃত্তিকার নিম্নে তিন ফিট পরিষ্কার নদীর বালুকা, তৎপরে ছয় ফিট, কোন কোন স্থানে আট ফিট সরু বালুকাসহ উদ্ভিজ্জসার ও ঝিনুক গুগলি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নিম্নে ছয় ফিট, কোথাও আট ফিট নীলবর্ণের আঁটাল মৃত্তিকা, তৎপরে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ঐ মৃত্তিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়, (১) তাহার তলে বালিমাটীর সহিত সারি সারি সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি সকল বসিয়াছিল। এই গুঁড়িসহ মাটীর উচ্চতাও ছয় হইতে আট ফিট, তন্নিম্নে আবার ঐরূপ স্তর সকল বাহির হইয়াছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে লিখিত আছে, "চৌরঙ্গীর কোণের দীঘির নিম্নে বালুকা থাকায় গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণী শুকাইয়া যায়, সেই জন্য উহাকে অধিকতর গভীর করিতে গিয়া চারি ফিট নিম্নে সারি সারি পুরাতন বৃক্ষের মূল পাওয়া গিয়াছে, পরীক্ষায় সমস্ত সুন্দরী বৃক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইল।" কয়েক বৎসর হইল, দমদমার একটী পুষ্করিণী খননে গভীর স্থান হইতে ঐরূপ বৃক্ষ এবং একটী হরিণের শৃঙ্গ ও কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। ইহাও শুনা যায়, গার্ডেনরিচের নিকট একটী পুষ্করিণী খননে একখানি নৌকা বাহির হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালের নবমভাগে কলিকাতার নূতন দুর্গে একটী গভীর কূপ খননের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, সিয়ালদহের ন্যায় স্তরের পর স্তর পর পর বাহির হইয়া ১৫৯ ফিট নিম্নে হরিদ্রাবর্ণ সূত্র চিহ্ন বিশিষ্ট আঁটাল মৃত্তিকা এবং ১৮০ ফিট নিম্নে পিটকোলের সহিত ছাঁচি কুমড়ার বিচি ও ইক্ষুপত্র পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৬ ফিট নিম্নে লৌহ সংযুক্ত মৃত্তিকা দেখা গিয়াছিল। ৩৫০ ফিট নিম্নে একটী কুকুরের কঙ্কাল এবং ৩৭২ ফিটের পর একটী কচ্ছপের খোলা বাহির হইয়াছিল। খনও গঙ্গায় সেই জাতীয় কচ্ছপ প্রচুর বিচরণ করিতেছে। ৩৮০ ফিট নিম্নে যথেষ্ট পরিমাণে ঝিনুক ও গুগলির আবরণ উঠিয়াছিল, তাহার নিম্নস্তরে আবার উদ্ভিজ্জসার সহ মৃত্তিকা এবং গাছের গুঁড়ি দেখা দিল। ৩৯২ ফিট নিম্নে উদ্ভিজ্জ কয়লার সহিত ক্ষুদ্র

(১) এই মৃত্তিকাকে Pit-coal বলে, কলিকাতার দক্ষিণ আকড়ার নিকট এই মৃত্তিকা এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তথাকার কুম্ভকারেরা ইহার সাহায্যে আপনাদিগের পণ জ্বালাইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় কাষ্ঠখণ্ড উঠিল,৪০০ফিট নিম্নে একখানি চুণা পাথর এবং তৎপরে ৮১ ফিট সমুদ্র তীরের ক্ষুদ্র বালুকার সহিত পর্ব্বত নিসৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বাহির হয়, তন্মধ্যে চুণা পাথরের এবং স্বচ্ছ প্রস্তরের ও অভ্রের খণ্ড সকল যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এইরূপ ৪৮১ফিট খননের পর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই ৪৮১ ফিট উচ্চ হইতে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছিল,তাহা বলা যায় না; কারণ এই পরিমাণের মধ্যে বার বার উন্নতি ও অবনতির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কে বলিতে পারে যে, কোন্ দিন এই প্রাসাদ পূর্ণ নগরী সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য সহ আবার সাগর জলে নিমগ্ন হইবে না?

পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্র অপেক্ষা বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। ভাদ্র,আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই প্রায় প্রবল ঝড়ের আক্রমণ দেখা যায়; তৎসঙ্গে সমুদ্রের জল প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া আসিয়া দেশ ও নগরাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়। সময় সময় তৎসহ ভূমিকম্প হইয়া আরও বিপদ ঘটায়। ইতিহাসে একবার ঐরূপ দৈববিড়ম্বনার একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ১৭৩৯ খ্রীঃ বিলাতের Gentlemen's Magazine নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, "১৭৩৭ সালের ১১ অক্টোবর তারিখের রাত্রে গঙ্গার মুখে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া উত্তর মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহার সহিত অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হওয়ায় গঙ্গার উত্তর পার্শ্বের অপর্য্যাপ্ত ক্ষতি করিয়াছে। কলিকাতায় "Gal Gata" (১) দুইশত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, ইংলিস চর্চ্চের মহোচ্চ চূড়া না ভাঙ্গিয়া এককালে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদ্র জল ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া আসায় গঙ্গায় প্রায় ২০ হাজার জলযানের চিহ্ন এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে, ইংরাজদিগের ৯ খানি জাহাজ গঙ্গায় ছিল, তাহার ৮ খানি মালপত্র ও নাবিকদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে,ওলন্দাজদিগের চারিখানি জাহাজের মধ্যে কেবল একখানি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় দুই হাজার মোণি বোঝাই দেশীয় নৌকা বৃক্ষাদির উপর দিয়া ভাসাইয়া চারিক্রোশ দূরে লইয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতার পূর্ব্বে একটী লবণ হ্রদ আছে (বাদা) তাহা পূর্ব্বে অত্যন্ত গভীর ছিল। ঐ ভূমিকম্পে হঠাৎ উচ্চ হইয়া উঠিল। সহর ও পল্লীগ্রামের নানা স্থানের মাটি ফাটিয়া নর্দ্দামার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য পশু ও প্রায় তিন লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার পর পুষ্করিণী ও নর্দ্দামায় মৃতদেহ ও উদ্ভিদ সকল পচিয়া দেশে মহামারী উপস্থিত করিয়াছে।"

সে সময় কলিকাতা তিনটী গণ্ডগ্রাম হইতে সবে মাত্র সহরে পরিণত হইতে

(১) হস্তাক্ষরের পত্রে কলিকাতা "Calcutta" না লিখিয়া CalCata লেখা হইয়াছিল, তাহাতে আবার C দুইটী এমন ভাবে লেখা হইয়াছিল যে, বিদেশী প্রকাশকেরা C দুইটীকে G অনুমান করিয়া GalGata ছাপিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা বলেন, সে সময় কলিকাতার নামকারণ না হওয়ায়, এখানে অত্যন্ত মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য হেতু Galgathaর সহিত তুলনায় ইহার নাম Galgata করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই Calcutta নামের উৎপত্তি। কিন্তু তাঁহাদের এ অনুমান যে নিতান্ত কাল্পনিক, সময়ে আমরা বিশেষ বিশেষ প্রমাণসহ তাহা সপ্রমাণ করিব।

আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং কয়খানি বাটীই বা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই শত গৃহ ভূমিস্বাৎ হওয়া বড় সহজ কথা নহে। বলিতে গেলে সহরের সমস্ত পাকা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত পত্রিকার বিবরণ ভিন্ন উক্ত দুর্ব্বিপাকের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কেবল কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র বাগবাজারে চিৎপুর রোডের ধারে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে একটী মহোচ্চ নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া বর্ত্তমান অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষাও উচ্চ ছিল, লোকে উঁহাকে জোড়বাঙ্গলা নবরত্ন বলিত, ঐ ঝড়ে সেই নবরত্নটীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্নাবশেষ আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্মৃতিপথে উত্তমরূপ জাগরূক আছে। কুমারটুলির মিত্রবংশ বর্ণনকালে নবরত্নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইবে। ইংলিশ চর্চ্চের চূড়া "এককালে মাটির মধ্যে বসিয়া যাওয়া" ঠিক কথা নহে, চার্লস ওয়েষ্টন নামে একজন ধনবান অধিবাসী স্বচক্ষে ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, চূড়াটা মাটির উপর শুইয়া পড়িয়াছিল।

আসল কথা বলিতে অনেক অবান্তর বর্ণনা করিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব কথা না লিখিয়া থাকা যায় না। ফলকথা গঙ্গার বদ্বীপ অনেক বার বসিয়া গিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় আছে। গঙ্গার পূর্ব্বতীরের সহিত পশ্চিম তীরের তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এদিক বসিয়া যাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন এদিক স্বনৈ স্বনৈ সমুদ্রদিকে অগ্রসর হইতেছে। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিয়ানশিকিয়াং তাম্রলিপ্ত নগরকে সমুদ্রতটে দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সমুদ্র তথা হইতে ৬০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। হিসাব ধরিলে প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ৫ মাইল করিয়া ভূমি অগ্রসর হইতেছে। এই সময় মধ্যে তমলুক প্রায় ২০ ফিট উচ্চতা লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা সমুদ্র হইতে ১০০ ফুট এবং সাগরদ্বীপ হইতে ৮৬ ফিট উত্তর, ২২°২৩′ ২৫″২ লাটিটিউড উত্তর এবং ৮৮° ১৯′ ১৬″ ২ পূর্ব্ব লনজিটিউডে অবস্থিত।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

মহাত্মা মিষ্টার কটন।

উপরে যে মহাপুরুষের পুণ্যময় নাম অঙ্কিত, উনি লক্ষ লক্ষ নির্ব্বাক ও নির্ব্বাসিত মানুষ মানুষীর বাক-শক্তি। উনি নিরন্ন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। এই মহাত্মা, পদদলিত, প্রপীড়িত, প্রবঞ্চিত মনুষ্য সমাজের স্বতঃ-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, পিতা এবং পরিত্রাতা। দীন দরিদ্র, দুর্ব্বলের অযাচিত বন্ধু, এই মহামনা পুরুষসিংহ।

প্রবল প্রতাপান্বিতের সহিত—দুরন্ত দুর্দ্দান্তের সহিত, দীন হীনের এবং দরিদ্র, দুর্ব্বল ও দলিতের নিদারুণ জীবন-যুদ্ধ যুঝিয়া, আজ এই মহা-প্রাণ পুরুষ-প্রবর রক্তাক্ত কলেবর; স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগের দ্বারা, চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত, নিপীড়িত এবং নিন্দিত।

পদ-দলিত, প্রপীড়িত, প্রবঞ্চিতের প্রতি পদ দলকের ও প্রপীড়কের অপরিসীম স্বার্থ-

প্রণোদিত নিষ্ঠুর পীড়নের কথঞ্চিৎ প্রশমনার্থে, ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রম-কাতর, ক্ষুধাতুর নর নারীর,—পরিশ্রান্ত কঙ্কাল-সার বালক বালিকার—ক্লান্ত ক্রন্দনশীল অসংখ্য প্রাণীর অর্দ্ধমুষ্টি মাত্র অন্নের উপর আর অর্দ্ধ কণিকা অন্নস্থাপনের বিধানার্থে, তিনি সমরানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মনুষ্য হইয়া, মনুষ্যের প্রতি পশুবৎ আচরণকারী মনুষ্যের নির্ম্মম ব্যবহার হইতে, মনুষ্যকে ও মনুষ্যত্বকে এক বিন্দু উদ্ধার করিবার জন্যে, এই মহাত্মা, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দাস ব্যবসায়ী ও দাসদাসীর প্রাণান্তকর পরিশ্রমে পরিপুষ্ট, ধনকুবের বণিক প্রভুগণের ভীষণ হস্ত হইতে, অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত ও বিনা মূল্যে ক্রীতদাস এবং ক্রীত দাসীবর্গের অনির্ব্বচনীয় কৃচ্ছ্রলব্ধ ন্যায্য প্রাপ্য মজুরির কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য, ইনি একাকী. অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত এবং নির্ব্বাক, আসাম চা-বাগানের কুলী কুলিনীর,—রাজবিধির দণ্ড-বিধানের দ্বারা দাসত্বে বদ্ধ কুলী-কুলিনীর, সুদূর অরণ্যে, অবিশ্রান্ত শ্রমের মূল্য, প্রভুর কষাঘাত নিপীড়িত শ্রমের মূল্য যথাক্রমে মাসিক পাঁচটী ও চারিটী মাত্র করিয়া টাকায় আর একটী করিয়া টাকা যোগ করিয়া দিবার জন্য, এই সহৃদয় সাধু পুরুষ ভীষণ সংগ্রামে, একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয়ের বিদ্বেষ বক্ষে করিয়া, স্বজাতীয়ের জাত-ক্রোধ স্কন্ধে ধরিয়া, স্বদল হইতে বিচ্যুত হইয়া, স্বকীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, এই কর্ত্তব্যপরায়ণ, করুণ-হৃদয়, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, প্রাণপণে, নিরক্ষর নির্ব্বাক প্রাণীর জীবন-মরণের যুদ্ধ করিয়াছেন! সপ্ত নহে-সপ্ত শতরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, এই মনস্বী মহাবীর, ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাকের পক্ষ সমর্থন করিয়া, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইয়া, পরাক্রান্ত এবং চক্রী চা-করের চক্রান্ত চালিত, ঘোর স্বার্থপর ও অসীম অন্যায় পক্ষের সমর্থক বিক্রমশালী বহু বহু বক্তা ও বাচস্পতি বীরের সহিত, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, বিতর্ক যুদ্ধ যুঝিয়াছেন। স্বদেশীয়ের দ্বেষে, স্বজাতীয়ের ক্রোধাগ্নি বাণে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত, তথাচ বীর, সংগ্রামে, বিরত হয়েন নাই। তিনি শত্রুপক্ষকে সম্যক রূপে পরাস্ত করিলেন, নির্ব্বাক করিলেন, নিরস্ত্র করিলেন, তথাচ সম্যক রূপে জয় লাভ করিতে পারিলেন না। অভাগা কুলী ও অভাগিনী কুলিনীর অর্দ্ধাসন অনশন—অনন্ত ক্লেশ নিবারণ হইল না। হায়! হইবে কি আর! হইবার আশা কোথায়! নির্ম্মম পৃথিবীর নরকঙ্কালময় কার্য্যক্ষেত্রে কটন কয়জন জন্মেন? পরন্ত, কণ্টকাকীর্ণ রাজ-শাসনের সুদুর্লভ কর্ত্তৃত্ব সিংহাসনে কটন কয়জন বসেন! হায়! বসিয়া কয়দিন তিষ্ঠিতে পারেন!

মহাপ্রাণ কটন চা-কর-কুলী সংগ্রামে, জয়লাভ করিয়াও, জয়ের পূর্ণ ফল, প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারিলেন না! স্বকীয় সেনাপতি লর্ড কর্জ্জন, শেষ মুহূর্ত্তে, বিজয়ের বাঞ্ছিত শুভ মুহূর্ত্তে, সসৈন্যে শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিয়া, কুহকী চা-করের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন! চা-কর স্বার্থের স্বর্ণ মন্দিরে, কুলী-কুলিনীর মুখের অর্দ্ধমুষ্টি অন্ন ও আরও চারিবৎসরের করারে, বলী স্বরূপ—হায়! শোণিত-সিক্ত নৈবেদ্যের স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন!! কুলীর কেমনই কর্ম্মক্ষেত্র আর চা-চক্রের কি মোহময় কুহক, মমতা-

ধলদ্বী, স্বপক্ষের সেনাপতি সহৃদয় কর্জ্জন, তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ সাহসী সৈনিক কটনের প্রতি প্রায় বিরূপ হইয়াই দাঁড়াইলেন। শক্র শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি কয়েকটী উত্তপ্ত বাক্য-বাণও প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না! দুর্ব্বলের অবিচলিত বন্ধু বীর কটন ইহাতেও বিচলিত নহেন, ভীত নহেন; অচল অটল দণ্ডায়মান। সন্ধি-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন না। স্বমতের সূচাগ্র ভূমিও পরিত্যাগ করিলেন না। বিপক্ষ ও স্বপক্ষের বিপক্ষ পক্ষপাতী সেনাপতি এবং সৈন্য এবং স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, উচ্চাদপি উচ্চস্থ,—ঐশ্বর্য্য, গৌরব, আত্মোন্নতি, ক্ষমতা, —প্রভুত্ব প্রভু শক্তি, পেট্রিয়টিজম্, রাজশক্তি এবং সমাজ শক্তি কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অন্যায়ের সমগ্র সমবেত শক্তি, অবহেলে অতিক্রম করিয়া, স্বভাবের সুসন্তান, সত্য-নিষ্ঠায় ও ন্যায়-পরতার সাহসী সরল সৈনিক, সতেজে, সন্নীতি মূলক আত্মাভিমত উক্ত পুনরুক্ত করিয়া, দলিতের, দুর্ব্বলের পক্ষ পুনঃ পুনঃ সমর্থন করিয়া, কুনীতি কদাচার, অবিচার অত্যাচারকে বার বার ধিক্কার দিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন।

বিজয়ী বীর জয়ের ফল প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, প্রাতস্মরণীয় হইয়াছেন, ভারতবাসীর অন্তরে, ভারত ইতিহাসে, মনুষ্যত্বের ইতিহাসে, উজ্জ্বল অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বঙ্গভূমি—সমগ্র ভারতভূমি মহাত্মা কটনকে অভিবাদন করিতেছেন, সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন করিতেছেন, কোটী হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। চল্লিশ কোটী ভারত সন্তান ভক্তিভরে, এই মহাপুরুষকে বার বার নমস্কার কর। পুষ্পমালা, অগুরু চন্দনে ভূষিত কর। পাদ্য-অর্ঘ দিয়া, এই মহামতির উপযুক্ত সম্মান কর। অভাগা কুলি! তুমি কি দিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবে? হায়! তোমার কি আছে! রুদ্ধ হৃদয়ের গভীর গহ্বরে যদি কোনও কোমল পদার্থ থাকে, ঐ মহাপুরুষের সম্মুখে ধরিয়া দাও। অশ্রুমুখী অসংখ্য অসংখ্য কুলি-কামিনী, কুন্তল দাম দিয়া, তোমাদের পিতা পরিত্রাতার পাদুকার ধূলি ঝাড়িয়া দাও। সুদূর চা-ক্ষেত্র হইতে উদ্দেশে ইঁহার পাদপদ্ম চুম্বন কর।

সমগ্র ভারত, এক কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে, বল, "কটন তুমি ধন্য, কটন তুমি পুণ্যশ্লোক। তোমার আসন রাজ-সিংহাসনের অনেক উচ্চে। তোমার প্রতিষ্ঠা ও তোমার পদের তুলনায়, রাজ-প্রতিনিধির পদ, রাজপদও অতি তুচ্ছ। তুমি লোক-প্রতিনিধি, প্রপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি, প্রেমের প্রতিনিধি, ন্যায়ের প্রতিনিধি, সত্যের প্রতিনিধি, স্বর্গের প্রতিনিধি। ধন্য ধন্য ধন্য, কটন ধন্য তুমি। কোটী কণ্ঠে তোমার ধন্যবাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

চা-কর কৌন্সিলের অধিবেশন দিন হইতে এ পর্য্যন্ত, মহাত্মা কটন, শ্বেতকায় চা-কর ও তাহাদের চর, চরানুচরদিগের দ্বারা নানারূপে, নিগৃহীত হইতেছেন। তিনি ঐশ্বর্য্য স্ফীত ও স্বার্থোন্মত্ত এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অসীম বিরাগ ও বিষাক্ত বিদ্রূপ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার রাজপদের গৌরবে, রাজপ্রতিনিধিত্বের প্রভাবে ও সম্ভ্রমেও, অসভ্য বর্ব্বরোচিত আক্রমণ হইতে, তাঁহাকে রক্ষা করিতে

পারিতেছে না। নানা দিক হইতে তাঁহার উপর নিত্য নূতন নূতন লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাহা হউক। এই ক্ষণিক জলবুদ্বুদ সকল আপাততঃ যতই বিরক্তিকর,—যতই যাতনাদায়ক হউক, অচিরাৎ জলে মিশাইয়া, বিস্মৃতির বিপুল গহ্বরে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু, চা-কর কৌন্সিলে, মহামান্য কটনের অমোঘ উক্তি অমর হইয়া থাকিবে। পরাক্রান্তের পদদলিত দীন প্রাণী পরিপূর্ণ পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষায়, সেই সকল উক্তি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হওয়া উচিত.—অঙ্কিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।.

প্রেম ও পেট্রিয়টিজম্।

প্রেম একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি। পেট্রিয়টিজম্ তাহার যুবক পুত্র। এই যুবক, উত্তরাধিকার সত্বে, স্বভাবতই পৈতৃক স্বরূপ ও সদ্‌গুণ সম্পন্ন, কিন্তু একটু অতিরিক্ত মাত্রায় উদ্দাম, একদেশদর্শী এবং সত্য কথা বলিতে হইলে, এই যুবক সমূহ স্বার্থপর। স্বার্থপর সুতরাং সঙ্কীর্ণচেতা।

প্রেম প্রকাণ্ড ও বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতমে ব্যাপ্ত; সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুটী পর্য্যন্ত তাহার প্রভায় প্রভাবিত; সমষ্টিভাবে সংযুক্ত এবং ব্যষ্টিভাবে বদ্ধ। প্রেম সর্ব্বত্র সমান বিস্তীর্ণ, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বভৌতিক। প্রেম সুতীক্ষ্ণ প্রখর, অথচ প্রশান্ত, প্রগাঢ় এবং পরার্থপর।

পেট্রিয়টিজম্ ঠিক ইহা নহে। প্রেমের মত প্রকাণ্ডতা-প্রিয়, প্রশান্ত এবং পরার্থপর নহে। প্রেম সমষ্টি ও ব্যষ্টি; পেট্রিয়টিজম্ কেবল তাহার ব্যষ্টি অংশ মাত্র। প্রেম সার্ব্বজনিন স্বার্থে স্বচ্ছ;—পেট্রিয়টিজম্. আত্ম-স্বার্থে অন্ধ, উগ্র এবং অমিতাচারী। প্রেম করুণ কোমল, পেট্রিয়টিজম্, উদ্দাম চঞ্চল। প্রেম সর্ব্বদিক্ প্রসারী, পেট্রিয়টিজম্ এক পার্শ্বানুবর্ত্তী। প্রেম অনন্ত, পেট্রিয়টিজম্ সান্ত। প্রেম বিশ্বময়, পেট্রিয়টিজম্, এক অঞ্চলে আবদ্ধ। প্রেম সার্ব্বভৌমিক, পেট্রিয়টিজম্ স্বদেশের সীমাভ্যন্তরে পর্য্যবসিত। প্রেম সর্ব্বলোকে প্রীতি বিলায়, পেট্রিয়টিজম্ স্বদেশী ও স্বজাতি ভিন্ন অন্যকে বিষনয়নে দেখে। প্রেম পরার্থপর; পেট্রিয়টিজম্, পরবিদ্বেষী। প্রেম উদার, পেট্রিয়টিজম্ আত্ম-সর্ব্বস্ব। প্রেম মহা সাগর, পেট্রিয়টিজম্ কাণা নদী। প্রেম বিশ্বপ্রাণতা সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র ঘুরে, পেট্রিয়টিজম্ পরকে পদানত করিতে প্রবাসে যায়। পেট্রিয়টিজমের অপর নাম, স্বদেশ-হিতৈষিতা। স্বদেশ হিতৈষিতা প্রেমোদ্ভুত পৈতৃক সম্বন্ধে সুন্দর পদার্থ; কিন্তু বিশ্বপ্রবণতা ব্যতীত তাহা পবিত্র হয় না। নদী-স্রোত সমুদ্রে মিশিলেই তাহা সম্যকরূপে সার্থক। নতুবা নহে।

সঙ্কীর্ণতা ও অস্বাভাবিক. স্বার্থপরতা যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই সর্ব্বথা নিন্দনীয়। স্বদেশ-হিতৈষিতা অতীব প্রশংসনীয়; কিন্তু তথাচ সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাও নিন্দনীয় হইয়া উঠে। পরন্তু, স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বদেশের জন্য বেদনা-বোধ যদি প্রশংসনীয় মানবধর্ম্ম হয়, বিশ্ব-হিতৈষিতা

এবং বিশ্ব-সংসারের প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই অধিকতর প্রশংসনীয় মানবধর্ম্ম ; কেন না, এক দিকে স্বদেশ যেমন তাহার অন্তর্ভূত, অপর দিকে বিদেশও তাহার বহির্ভূত নহে ;—তাহা স্বদেশকেই বক্ষে ধারণ করিয়া কেবল তাহারই উন্নতি কামনায় বিদেশকে পদদলিত করে না। পরপ্রেম বর্জ্জিত পেট্রিয়টিজম্ তাহা করে।

"উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম" ইহা অস্মদ্দেশেরই একটী নীতি কথা। কে অস্বীকার করিবেন, ইহা জগৎ-হিতৈষিতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতার একটী প্রকৃষ্ট প্রবচন বা প্রতিশ্রুতি ; একটী অতি বিশিষ্ট অঙ্গীকার বা আদেশ নহে ? বিশ্ব-প্রেমিকতার এই প্রবচন যে দেশে প্রচলিত, সেই দেশেরই স্বদেশ-ভক্তি ব্যঞ্জক উক্তি আবার 'জননী-জন্মভূমি· স্বর্গ,—স্বর্গাদপি গরিয়সী। কিন্তু এই দুই মহা বাক্যের এক অপরের বিরোধী নহে ; উভয়ই সম সূত্রে সংলগ্ন, সুমধুর সম্বন্ধে সামাঞ্জস্যীভূত।

এদেশীয়দিগের স্বদেশানুরাগবৃত্তি কথনও ছিল না। যাঁহারা কল্পনা ও ঘোষণা করেন, তাঁহারা ভ্রম কল্পনা ও ভ্রমের ঘোষণা করেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রাচীন আর্য্যত্বের আস্ফালন করিয়া অন্তঃসার শূন্য আত্মগৌরবের আড়ম্বর করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা আদৌ সে শ্রেণীর লোক নহি। কিন্তু, যাহা সত্য ও প্রকৃত তাহা, স্বদেশেরই হউক আর বিদেশেরই হউক, অবশ্যই ঘোষণীয় ও অনুসরণীয়। যে দেশে মাতৃভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী বলিয়া বিবেচিত, সে দেশীয় লোকদিগের কোনও কালে স্বদেশানুরাগ বৃত্তি ছিল না অথবা সে বৃত্তির অনুশীলন হয় নাই, ইহা বলা কেবল অন্যায় নহে, অর্ব্বাচিনতাও বটে। তবে ইহা হইতে পারে যে, এদেশীয়দিগের স্বদেশানুরাগ, পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমের অনুরূপ ছিল না। কারণ তাহা বিশ্ব-প্রেমিকতায় অনুপ্রাণিত ছিল। এখনি উল্লেখ করিয়াছি,—"উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম" এদেশীয়দিগেরই উক্তি। এদেশীয় স্বভাব হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়া নীতি কথায় পরিণত হইয়াছিল—হইয়াই আছে ; যদিও এখন তাহার সার্থকতা নাই।

আক্ষেপ যে, পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমের পেষণে,—(হাঁ পেষণেই বটে, কেন না পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমেই, ভাল মন্দ যে দিকেই হউক, এ দেশীয়েরা এখন পরাধীন) উপরোক্ত প্রাচীন নৈতিক উক্তি অধুনা অত্যন্ত উপেক্ষিত। পুরাতনের প্রচণ্ড পক্ষপাতী আমাদের অত্যন্ত অর্থোডক্সেরাও উহাকে অসীম অশ্রদ্ধা করেন। তা, পুরাতন, নূতন কিসেই বা তাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে ? আন্তরিকতা পদার্থটী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিয়া কৃত্রিমতার কীর্ত্তি-স্তম্ভ সংস্থাপন করাই, বোধ হয় তাঁহাদের সঙ্কল্প।

ফলতঃ এ দেশের ইদানীন্তন স্বদেশ-হিতৈষিতার অতি ক্ষীণ প্রবাহ কতক স্থলে কৃত্রিম এবং কোন কোনও স্থলে অকৃত্রিম ও কিয়ৎ পরিমাণে আভ্যন্তরিণ হইলেও, উহা সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমেরই অঙ্গহীন অনুকৃতি, অনুকল্প বা অভিনয় মাত্র, অপক্ষপাত বিচার করিলে, ইহা অগত্যাই স্বীকার করিতে হয়। ইয়ুরোপের অনুকরণ একেবারেই মন্দ এমন বলি না ; তবে কিনা ইয়ুরোপীয় পেশা বা পোষাকের মত ইয়ুরোপীয় পেট্রিয়টিজমটাও যেন আমরা গ্রহণ

করিয়াছি। সুতরাং স্বদেশের স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে ইয়ুরোপীয়বৎ আচরণ করিতে পারি বা না পারি, সগণ সাম্প্রদায়িতার সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ হইয়া "বসুধৈব কুটুম্বকম্" কথাটী অগ্রাহ্য করিয়া থাকি;—কথাটী কেহ কহিলে উপহাসই করি! ইহা, এই সাংসারিক সংকীর্ণতা ইদানীং শিক্ষিতদিগের মধ্যেও একটী প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখি তাই, আমরা আবশ্যক বোধেই অদ্য এ বিষয়েরই একটু আলোচনা করিলাম।

আমাদের আদর্শ, সকলেরই আদর্শ ও ইষ্টমন্ত্র হওয়া উচিত বসুধৈব কুটুম্বকম্; অতএব প্রাচ্য, ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর সকল জাতিরই আমরা পক্ষপাতী। কিন্তু অন্ধ পক্ষপাতী কাহারও নহি। পাশ্চাত্য জাতির প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজম্ আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষনীয় থাকিলেও আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজম্ অতীব একদেশদর্শী, ঘোর স্বার্থপর এবং সংকীর্ণ। উহা স্বদেশকে স্বর্গোপম করিয়া পরদেশকে নরকে পরিণত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। উহার এক অংশ উচ্চ, অপর অংশ অত্যন্ত নীচ। উচ্চতা অনুকরণীয়, নীচতা নিন্দনীয়। কিন্তু, সন্নীতির এমনি মাহাত্ম্য, এমনি পরাক্রম যে, তাঁহার সমীপে নীচতারও আপাদমস্তক শিহরে। নীচতাও উলঙ্গ ভাবে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। নীচতাও নিরতিশয় নীচ কার্য্য করিবার সময়, সন্নীতির পৃষ্ঠবস্ত্র ও পলিসি অবলম্বন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমেও পরের দেশ লুণ্ঠন ও পরদেশীর স্বাধীনতা হরণ ও শোণিত শোষণ করিতে যাইয়া বলে, পরদেশের ও পরদেশীর পরিত্রাণের জন্য তাহা করিতেছে!! ইহাতেই বুঝিতে হইবে, সন্নীতির শক্তি কত, শাসন কত।

একের দ্বারা অপরের পরিত্রাণ একেবারেই অসম্ভাবিত নহে জানি; প্রত্যুত একের দ্বারা অপরের পার্থিব বা পারমার্থিক পরিত্রাণ পথ প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতে পারে, ইহাও মানি। পরন্তু পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমে পর-পরিত্রাণ-বীজ একেবারেই নাই, এমনও বলি না। অন্ততঃ এঙ্গলো-স্যাক্সন-পেট্রিয়টিজমের ভারত সাম্রাজ্য গ্রহণ গঠন ও শাসন সে বীজ বিবর্জ্জিত নহে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু, পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজম্ কি প্রকৃত প্রস্তাবে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া পরের দেশে আত্মপতাকা উড়াইয়া থাকেন? কেমনে বলিব তাহাই বটে? তাহা যদি হইত, তবে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন? শ্বেত চর্ম্মের এত সম্ভ্রম সমাদর ও কৃষ্ণকায়ের এত আপমান অমর্য্যাদা কেন? মানুষে মানুষে মনুষ্যত্ব ঘটিত এই অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য কেন? এককে উদরান্নে বঞ্চিত করিয়া অপরে বিলাস-ভোগ করে কেন? ইহা কি পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমের উদার পরার্থপরতার পরিচয়, না, অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার কুৎসিৎ নিদর্শন, বর্ণ ঘটিত ও বৃত্ত ঘটিত তাহার প্রকৃতির এই বিকৃতি, এই ব্যভিচার?

স্বার্থপরতার স্বাভাবিক আবশ্যকতা অস্বীকার করি না। কিন্তু আত্মরক্ষারও সীমা অতিক্রম করিয়া অপরের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারে আঘাত ও আক্রমণ করিবা মাত্রই তাহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত

হইয়া কেবল পাশব নহে, পৈশাচিক প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজমের পাশবও পৈশাচিক অংশ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়; তাহারই আমরা প্রতিবাদ করিব; তাহাই পরিত্যাগ করিতে চাই। অতএব, এ সম্বন্ধে স্বদেশ-হিতৈষিতা বিশ্বপ্রেমিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নহিলে তাহার পবিত্রতা পঙ্কিল হইয়া পড়িবে।

কর্ত্তব্যপালনার্থে সকলেই মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কার্য্য করে সত্য; তদতিরিক্ত প্রায়ই করিতে পারে না অথবা অতি অল্পই করিতে পারে। আদর্শানুরূপ উচ্চতায় উত্থিত হওয়া কদাচিৎ সম্ভবে। তথাচ আদর্শ উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

তার্কিক বলিতে পারেন, একথাটা আর কিছুই নহে, কেবল একটা ভাবুকতা, একটা সেণ্টিমেণ্টালিটী মাত্র। কিন্তু, তিনিও ত জানেন যে, ভাবেই এই ভবসংসার চলিতেছে; সেণ্টিমেণ্টেই এই জগৎ সংসার শাসন ও পালন করে। "Sentiment rules the world." সেণ্টিমেণ্ট বিনা সংসারের সবই শুষ্ক; সবই ছাই ভস্ম অসার ভূষি মাত্র। সেণ্টিমেণ্ট বাদ দিয়া মানব জীবনের জমা খরচ কাটিলে অবশিষ্ট কি থাকে? মানুষের অস্তিত্ব একটা অর্থশূন্য অতি অস্বাভাবিক পদার্থে পরিণত হয় না কি? তাহাতে পশুত্বের পাশব ধর্ম্ম পূরাপুরি থাকে না।

পেট্রিয়টিজমও কি সেণ্টিমেণ্ট বর্জ্জিত? এবং পেট্রিয়টিজমেরও যাহা পরবর্ত্তী এবং নিম্নস্থানীয়, অর্থাৎ পরিবার প্রীতি এবং স্বজনানুরাগ, তাহাও কোন্ সেণ্টিমেণ্ট বিহীন? ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি, ইহারা সকলেই ত নিজে নিজে একটী সেণ্টিমেণ্ট বা সদ্ভাব। অতএব ইহা এক গ্রাম উপরে উত্থিত হইলেই সেণ্টিমেণ্টালিটী বা ভাবুকতা বাক্যের বাষ্পে বিলীন হইবে, অথবা কেবল কবিত্বের কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া কার্য্যকারিত্ব হারাইবে, তাহার তাৎপর্য্য কি? কিন্তু এমন যেন কেহ বুঝেন না যে, পেট্রিয়টিজমের নিন্দা করিতেছি।

পেট্রিয়টিজম্ পরম সুন্দর পদার্থ; অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয় প্রকৃত পেট্রিয়টিজমের নিশ্চয়ই নিন্দা করি না; তাহার প্রভূত প্রশংসাই করি। একথা বলাই বাহুল্য। স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতি ভক্তি আমাদের আস্তত্বের মধ্যবিন্দু। স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা আমাদের সর্ব্ব কার্য্যের প্রণোদক। তবে বলি কেবল এই যে, প্রকৃত এবং পবিত্র পেট্রিয়টিজম্ সার্ব্বভৌমিক প্রেমেরই অন্তর্গত; কদাচ তাহার বহির্ভূত নহে। কিন্তু যেস্থলে পেট্রিয়টিজম্ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া পরপীড়ন করে; সর্ব্বদিক প্রসারী প্রেমকে পদদলিত করিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, সেস্থলে তাহা এক কথায়, পৈশাচিক।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কালশক্তি বা কালী। *

কালের যে কি অপরূপ মহিমা, তাহা কে পরিস্ফুট ভাবে সম্যক রূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন? কালশক্তি বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণ আত্মচিন্তা প্রসূত কত মতই প্রকাশ

* এই বিষয়টী "মহাকাল ও মহাকালী" নামে অতি সংক্ষেপে একবার তত্ত্ব মঞ্জরীতে প্রকাশিত হয়, এবার দার্শনিকদের মতের সহিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

করিয়াছেন, কিন্তু কেহই "ইদমিত্থং" বলিতে সাহসী হন নাই, সুতরাং আমি একটী কীটাণু হইয়া কালশক্তি বুঝাইতে পারিব, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে আর্য্য ঋষিগণের মুখোচ্ছিষ্ট—যাহা সকলেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিব, ইহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও কালশক্তির রহস্য প্রণিধান পথে উপস্থিত করা যায় কি না?

আমি কেবল এতদ্বিষয় একটুকু চিন্তার সৌকর্য্যার্থ প্রবীণ পাঠকবর্গকে কতক উপাদান সংগ্রহ মাত্র করিয়া দিতেছি, ইহার সাধুতা ও অসাধুতার বিচারের ভার পাঠকগণেরই সরল প্রবৃত্তি ও নিরপেক্ষ বিচারের উপর ন্যস্ত হইল।

"কালশক্তি বা কালী" বুঝিতে হইলে, প্রথমে "কাল" কি পদার্থ? তাহার স্বরূপ কি? অগ্রে তাহা বুঝিতে হইবে, সে জন্য এখন কালের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

সকলেই জানেন—যিনি অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, তিনিই মহাকাল, কাল পরম মহান্, পরম নিত্য, পরম নিরবচ্ছিন্ন, পরম সূক্ষ্ম; পরম স্থূল, অতি ব্যবহিত, অতি সন্নিকৃষ্ট, এমন দেশ নাই, যে দেশে কাল নাই, কাল সকলের বিনাশক, নিজে অনিশ্বর, কাল সকলের আদি, নিজে অনাদি, কাল সকলের প্রভু, কালের প্রভু কেহ নাই, কাল অতীন্দ্রিয়; কেবল স্পন্দনাদি ক্রিয়া দ্বারা অনুমেয়।

একটী কথার কথা—যদি অকস্মাৎ যুগপৎ সূর্য্য না উদিত হয়, যদি চন্দ্র বিলুপ্ত হয়, নক্ষত্রমালা অন্তর্হিত হইয়া যায়, গ্রহচক্র পড়িয়া যায়, যদি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা না থাকে, যদি সমীরণ না প্রবাহিত হয়, পক্ষী না উড়ে, প্রাণিমণ্ডলীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, মানবগণ না হাঁসে, না কাঁদে, না ঘুমায়, না খায়, না চলে, না কথা কহে, না দেখে, না চক্ষুর পলক ফেলে, অধিক আর কত কহিব? যদি এককালে এই জগৎ অন্ধীভূত হইয়া পড়ে, তবে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, যাম, পক্ষ, মাস, ঋতু, আয়ন ও বৎসর কিরূপে ব্যবহৃত হইত? কিছুই হইত না।

এজন্য বলিতে হইবে যে, একমাত্র ক্রিয়ার দ্বারাই সেই অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল কলাকাষ্ঠা ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়াই লোকের ব্যবহারে আসিতেছে, যেই ঘটিকা-যন্ত্রের গোলকটী দুলিতে আরম্ভ করিল, অমনি এক সেকেণ্ড, ক্রমে এক মিনিট, ও ঘণ্টা প্রভৃতি কাল নির্ণীত হইতে লাগিল।

যখনি সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবর্ত্তন (বা পৃথিবীর আবর্ত্তন) (১) হইতে লাগিল, তখনি অনুপল, বিপল, পল, দণ্ড ও মুহূর্ত্তাদি কাল কল্পনার পথে আসিয়া দিবা রাত্রি, সংবৎসর, ও যুগ যুগান্তর রূপে পরিণত হইতে লাগিল, যদি ঘড়ীর দুলের দোলন বন্ধ হইয়া যায়, যদি সূর্য্য না চলেন, তবে ছোট ছোট কাল গুলি ব্যবহার করিবার উপায় থাকে না, তখন অনবচ্ছিন্ন অবিভক্ত অনাদি অনন্ত এক মহান্ অখণ্ড কালই দাঁড়ায়।

কালসম্বন্ধে নৈয়ায়িকের মত।

ন্যায়মতে কাল নববিধ দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম দ্রব্য, যথা—ভাষা পরিচ্ছেদ——

"ক্ষিত্যপ্‌ তেজোমরুৎ ব্যোম কাল-দিগ্‌ দেহিনো মনো দ্রব্যাণি"

(১) "ভপঞ্জর স্থিরো ভূরে বা বৃত্ত্যাবৃত্য প্রতিদিবসীয় মুদয়াস্তময়ং সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাং" আর্য্যভট্ট ১।

উক্ত কালেতে পাঁচটী গুণ আছে— সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। অখণ্ড মহান্ কালে একত্ব সংখ্যা আছে, আর খণ্ড কাল—ভূত ভবিষৎ ও বর্ত্তমানে ত্রিত্ব সংখ্যা, এক মাসাত্মক কালে ত্রিংশত্ব সংখ্যা, এরূপে বর্ষাদি যুগ পর্য্যন্ত কালে সেই সেই সংখ্যা আছে।

কালে পরিমাণ আছে—যেমন—একদণ্ড পরিমিত কাল, দুই দণ্ড পরিমিত কাল, এবং অখণ্ড কালের পরিমাণ—পরম মহৎ ইত্যাদি।

কালে পৃথক্‌ত্ব আছে, যেমন কাল ক্ষিতি, জল ও তেজ প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

কালের সংযোগ আছে,—যেমন ক্ষিতি, জল, তেজ, পবন ও মনের সহিত কাল সংযোগ সম্বন্ধে সংবদ্ধ।

কাল ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত, এবং কলা কাষ্ঠাদি রূপে নানা প্রকারেই ঋষিরা কালের বিভাগ উপপন্ন করিয়াছেন।

এসকল কথা ভাষা পরিচ্ছেদে বিশদরূপে ব্যক্ত আছে যথা—

"সংখ্যাদি পঞ্চকং কালদিশোঃ" ॥ ৩৩ ॥
"কাল খাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ" ।
ইত্যাদি।

কাল সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই জনক, কাল সমস্ত জগতের আধার, এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যবহারের কারণ ও কাল, যথা—

"জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়োমতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃস্যাত্ উপাধিতঃ।" ৪৫

যে ব্যক্তিতে যে ব্যক্তি অপেক্ষায় বহুতর সূর্য্য সম্বন্ধ থাকে, সেই সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তিতে যদপেক্ষায় অল্প সংখ্যক সূর্য্যের সম্বন্ধ থাকে সেই ব্যক্তি তদপেক্ষায় কনিষ্ঠ যথা—

"পরত্বং সূর্য্যসম্বন্ধ ভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ।
অপরত্বং তদল্পত্ব বুদ্ধিতঃস্যাদিতীরিতং।" ১২২

ন্যায়মতে খণ্ডকাল ও মহাকাল ভেদে কাল দুই প্রকার, অবচ্ছিন্ন অহোরাত্রাদি কালকে খণ্ডকাল কহে, আর যে কাল বিভু-সর্ব্বমূর্ত্ত সংযোগী মহা প্রলয়েও যে বিনষ্ট হয় না, তাহাকে মহাকাল কহে। অহোরাত্রাদি ব্যবহারের কারণ খণ্ডকাল, কেন না, সূর্য্যের পরিস্পন্দ দ্বারাই আমরা দিবা রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি, উক্ত খণ্ডকালের যেমন পাঁচটী গুণ, মহাকালেরও সেই পাঁচটী গুণই বিদ্যমান আছে।

কোন কোন নৈয়ায়িক জন্য বস্তু সমগ্র-কেই খণ্ডকাল বলেন। অপরাপর নৈয়ায়িক ক্রিয়া মাত্রকেই কাল বলেন। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক—

"দিকালয়োরীশ্বরানতিরেকাৎ গগনমপিতথা।"

ইহার দ্বারা কালকেই ঈশ্বর কহেন।

সাংখ্যাচার্য্য কপিল বলেন,—

"দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ।" ২।১২॥

নিত্য দিক্ ও নিত্য মহান্ কাল, আকাশেরই পরিণাম বিশেষ, আর খণ্ডকাল সেই সেই কর্ম্মরূপ উপাধি সম্বন্ধে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সূত্রস্থ আদি শব্দের দ্বারা উপাধি গৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্ব কথিত মহাকালই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কার্য্য সমাধা করিতেছেন, এ হেতুতেই ইনি "ঈশ্বর"

দেখা যায়—কৃষকগণ ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া একই দিনে একই সময়ে দুই প্রকারের ধান্য মিশ্রিত করিয়া চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বপন করে, তন্মধ্যে কোনও ধান্য শ্রাবণ বা ভাদ্র

মাসে জন্মে, কোনও ধান্য বা অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে জন্মে ও পাকে।

যদিও দ্বিবিধ ধান্যের একই কর্ষণ একই বর্ষণ একদাই বপন হইয়া থাকুক, কিন্তু তথাপি দুই জনেই আপন আপন সময়েই জন্মিবে,আশু ধান্য অগ্রহায়ণ মাসের প্রতীক্ষা করিবে না, আর পৌষধান্য আশু ধান্যের উদ্গম দেখিয়া লাফাইয়া উঠিবে না, সে আপন কালের প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া থাকিবে, ইহাতেই জানা যাইতেছে উক্ত দ্বিবিধ ধান্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কালই কারণ, কালই উহাদিগকে যথা সময়ে জন্মাইতেছে।

এরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই যথাকালেই জন্মিয়া থাকে, অসময়ে জন্মে না, সুতরাং উহাদের সৃষ্টির কারণ কাল ইহা সিদ্ধ হইল।

কাল সৃষ্টজগতের স্থিতির কারণ,—যেমন জননী জঠরে উৎপন্ন শিশু পিতা মাতা বা অপর বন্ধুর সহায়তা না পাইয়াও রক্ষিত হইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে, সেই অবস্থায় দশমাসাত্মক কালই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। অনন্তর জননের পর মৃত্যুর পূর্ব্বসময় যাবৎ কালই বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থায় উপনীত করিয়া রক্ষা করিয়া থাকে। এরূপ পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদিতেও বুঝিবে।

কাল সৃষ্টজগতের প্রলয়ের কারণ,—যেমন যৌবনাবস্থার পর হইতেই কাল আমাদিগের প্রলয় সাধন করিতে বসিল। আজ একটী দাঁত পড়িয়া গেল, এই একটু মৃত্যু হইল, কাল আর একটী দাঁত পড়িল, এই আবার আর একটুকু মৃত্যু হইল, ক্রমে চুল পাকিল, বা উঠিয়া গেল, কান্তি গেল, শরীর কুঁজ হইয়া পড়িল, দৃষ্টি গেল, শ্রুতি গেল, স্মৃতি গেল, বল গেল, ক্ষুধা গেল, ভাল মন্দ বিচার শক্তি গেল, সংস্কার গেল, সংজ্ঞা গেল,শেষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাও গেল; আর সংপূর্ণ মৃত্যু হইল, এ সকল ত কালই করিল।

দেখা যাইতেছে,একখানা তেতালা বাড়ী খুব দৃঢ় ছিল, সেই বাড়ী খানার উপাদান চুণ, শুরকি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছিল, গাথুনী খুব পাকা ছিল, কিন্তু হাজার বা দুই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবুও কিছুই হয় নাই, আবার চারি হাজার বৎসর পরে দেখিবে, উহা ভগ্ন ইষ্টকস্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেই দৃঢ়ভিত্তির বাড়ীটাকে কে অমন করিল? কে জীর্ণ করিল? কে তাহার দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিল? কে তাকে প্রলীন করিল? অগত্যা বলিতে হইবে, কালই তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, অতএব কালই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ইহা সিদ্ধ হইল।

এ জগতে যে কিছু হইতেছে, তৎসমস্তই কালের দ্বারা সংসাধিত দেখিতেছি। আমি কালে জন্মিয়াছি; কালে বর্দ্ধিত হইলাম, লেখা পড়া শিখিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, এখন অর্থার্জ্জন করিতেছি,আর ভাবিয়া দেখিতেছি,তাহার অন্তরে ওতপ্রোত ভাবে কাল জড়িত—অনুস্যূত রহিয়াছে, কাল ছাড়িয়া কিছুই করিতে পারি না, সময়ে আহার, সময়ে বিহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে নিদ্রা, সকলেই কালেই হইতেছে।

এখন কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—প্রদর্শিত হইতেছে।

"নাহো ন রাত্রি র্ণ নভো ন ভূমি
র্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ।
শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥ ১॥"

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোহস্যদ্বিজ! বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্না স্ততস্ত্বেতে সর্গ স্থিত্যন্ত সংযমাঃ। ২।
গুণ সাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে।
কাল স্বরূপং রূপন্তদ্বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ত্ততে। ৩।"

(বিষ্ণু পুরাণ ১।২।৩২৩।).

অর্থ—তখন দিন ছিল না, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক কিংবা অন্য কিছুই ছিল না, কেবল জ্ঞানের অগম্য প্রকৃতিযুক্ত এক ব্রহ্মপুরুষ কালই ছিলেন ॥ ১ ॥

হে দ্বিজ! মৈত্রেয়! সেই ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন কালের আদি বা অন্ত নাই, সেই মহাকাল হইতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ॥২॥

হে মৈত্রেয়! সেই প্রলয়ের সময় প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক্ রূপে অবস্থিত ছিলেন, সেই পুরুষ অন্য কেহ নহে, পরন্তু ঈশ্বর স্বরূপ কালই ॥৩॥

"পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ!
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম্।"

(বিষ্ণু পুরাণ ১।২।১৪)

অর্থ—হে দ্বিজ! পুরুষ, প্রকৃতি, আকাশাদি ও কাল, পরব্রহ্মেরই রূপ জানিবে।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি সংহারকারকাঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ।"

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর ও বিষ্ণু সংহিতা ২০।২৭)

অর্থ—এই জগতে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ, তাঁহারও কালকর্ত্তৃক লয় প্রাপ্ত হইবে, অতএব কালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

"অহমেব কালো নাহং কালস্য"

(কালমাধবধৃত তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অর্থ—ঈশ্বর কহিয়াছেন—আমিই কাল, কালের আমি নহি।

"কালো ভূমি মসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্ব্বিপশ্যতি। ১।
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতঃ।
কালেন সর্ব্বানন্দন্ত্যাগতেন ইমাঃ প্রজাঃ। ২।
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতং।
কালো হ সর্ব্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৩॥
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং।
কালো হ ব্রহ্মা ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনং। ৪।
কালঃপ্রজা অসৃজত কালোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত। ৫।"

(অথর্ব্ববেদ ১৯।৫৩।৫৪)

অর্থ—কাল ভূমি সৃষ্টি করিয়াছে, কালেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন, কালেই প্রাণী জন্মিতেছে, এবং কালানুসারেই চক্ষু দেখিতে সমর্থ, অকালে—রাত্রে দেখিতে পায় না ॥১॥

কালেই মন প্রাণ সমাহিত হয়, এবং সময় সমুপস্থিত হইলেই প্রজাবর্গ শস্যাদি দর্শনে আনন্দিত হয় ॥২॥

কালে তপস্যা সিদ্ধি হয়, কালে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারা যায়, কালে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব কালই সকলের ঈশ্বর, কাল প্রজাপতিরও পিতা ॥৩॥

কালের নিয়োগেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, কালেতেই জগৎ অবস্থিত, ব্রহ্ম স্বরূপ কালই চতুরানন ব্রহ্মাকে পোষণ করিতেছেন, কালই প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন ॥৪॥

কাল প্রজাপতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ব্রহ্মা কশ্যপ ও বেদ, কাল হইতেই উৎপন্ন ॥৫॥

"অনাদি নিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ১।
কালঃ কলয়তে লোকং কালঃ কলয়তে জগৎ।
কালঃ কলয়তে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে। ২।
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে দেবর্ষিসিদ্ধ কিন্নরাঃ।
কালো হি ভগবান্ দেবঃ স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ। ৩।
সর্গপালন সংহর্ত্তা স কালঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
কালেন কল্যতে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥
যেন মৃত্যু বশং যাতি কৃতং যেন লয়ং ব্রজেৎ।
সংহর্ত্তা সোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ কালঃস্যাৎ কলনা পরঃ ॥৫ ॥

"কালঃসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালে দেবা বিনশ্যন্তি কালে চাসুরপন্নগাঃ।
নরেন্দ্রাঃ সর্ব্বজীবাশ্চ কালে সর্ব্বং বিনশ্যতি। ৬।
(হারীত সংহিতা ১ম স্থানে, ৪ অধ্যায়)

অর্থ—কালের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কালই ভগবান্ রুদ্র সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, সকল প্রাণীকে সঙ্কলন, উৎপাদন, পালন ও সংহরণ করেন বলিয়া তাহার নাম "কাল" ॥১॥

কালই জগতের স্রষ্টা, কালই সৃষ্ট জগতের পালক, আবার কালই পালিত জগতের বিনাশক, সেজন্য তাহার নাম "কাল" ॥২॥

এজগতে কি দেব, কি ঋষি, কি পশু পক্ষি প্রভৃতি সকলই কালের বশবর্ত্তী, অতএব কালই সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমেশ্বর ॥৩॥

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কাল সকলের উপরই সমান বিরাজিত, তিনি বিশ্বকে সংকলন করেন বলিয়াই "কাল"নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে কাল দ্বারা লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কালেই লোক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার কালই সংহর্ত্তা, অতএব তিনি অনবরত কলনাই করিতেছেন ॥৫॥

কাল নিজে জাগিয়া নিদ্রিত লোককে রক্ষা করিতেছে, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, দেবগণ, অসুরগণ, পন্নগগণ ও রাজগণ এবং অপরাপর সকল জীবই কালে নষ্ট হইতেছে ॥৬॥

এবং কাল মাধব ধৃত কূর্ম্ম পুরাণে কাল ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"অনাদি রেষ ভগবান্ কালোঽনন্তোঽজরঃ পরঃ।
সর্ব্বগঞ্চ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বান্মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মাণো বহবো রুদ্রা অন্যে নারায়ণাদয়ঃ।
একো হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মনারায়ণেশানাং ত্রয়াণাং প্রাকৃতো লয়ঃ।
প্রোচ্যতে কালযোগেন পুনরেবচ সম্ভবঃ ॥ ৩ ॥
পরংব্রহ্ম চ ভূতানি বাসুদেবোঽপি শঙ্করঃ।
কালেনৈব চ সৃজ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ কালাত্মকং বিশ্বং স এব পরমেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥"

অর্থ—ভগবান্ কাল অনাদি, অনন্ত, অজেয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বতন্ত্র ও সকলের আত্মা, এহেতুতেই কাল পরমেশ্বর, কালক্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ হন। আবার কালক্রমেই প্রলীন হন, এক মাত্র কালরূপ ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেব রূপে ব্যপদিষ্ট হন। কালই পরব্রহ্ম, তিনি সমস্ত প্রাণী ও বিষ্ণু শিবকে উৎপাদন করেন, এবং যথাকালে আবার গ্রাস করেন, অতএব কালস্বরূপই বিশ্ব, কালই পরমেশ্বর। ১-৫।

এবং কাল মাধব ধৃত বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরেও কাল, ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"অনাদি নিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
কর্ষণাৎ সর্ব্বভূতানাং সতু সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বভূতসমিত্বাচ্চ স রুদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
অনাদি নিধনত্বেন স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ।'

অর্থ—কালের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কাল রুদ্র—সর্ব্বপ্রাণীকে মৃত্যুর দিগে আকর্ষণ করিতেছে, সকলকে কলন—সংহরণ করে বলিয়াই তাহাকে "কাল" কহে। সর্ব্বভূতকে আকর্ষণ করে বলিয়া কালের নাম সঙ্কর্ষণ, কাল সর্ব্বভূতকে দমন করে বলিয়া তাহাকে রুদ্র কহে, জন্ম মৃত্যু নাই বিধায় কালই পরমেশ্বর।

কাল দুই প্রকার নিত্য কাল ও অনিত্য কাল, নিত্য কালই পরমেশ্বর, তিনি বাক্য মনের অগোচর হইলেও ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দেহ ধারণ করেন, আর এই বিবিধ দেহাকারে পরিণত কালই অনিত্য কাল।

একথা কাল মাধবীয়গ্রন্থে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে, যথা—

"নিত্যো জগচ্চ কালো যো ভয়ো রাদ্যঃ পরেশ্বরঃ।
সোঽহমাং মনস গম্যোঽপি দেহী ভক্তানুকম্পয়া॥" ইতি।

গীতায় উক্ত আছে—

"অহমেবা ক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতো মুখঃ॥" ১০।৩২।

অর্থ—আমি—ঈশ্বরই অবিনশ্বর কাল, আমিই সর্ব্বতোভাবে জগৎ পালন করিতেছি।

কাল সম্বন্ধে বেদব্যাসের মত যথা—
(শান্তি, রাজ, ২৫।৫—১২)

"ন কর্ম্মণা লভ্যতে চেজ্যয়া বা,
নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ।
পর্য্যায় যোগাদ্বিহিতং বিধাত্রা,
কালেন সর্ব্বং লভতে মনুষ্যঃ॥ ১॥
ন বুদ্ধি-শাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং,
প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈর কালে।
মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্,
কালো হি কার্য্যং প্রতি নির্ব্বিশেষঃ॥ ২॥
নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি,
শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি।
তান্যেব কালেন সমাহিতানি,
সিধ্যন্তি বর্দ্ধন্তি চ ভূতিকালে॥ ৩॥
কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ,
কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি।
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ,
কালেন পুষ্যন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ॥ ৪॥
কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ,
কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণ বিম্বঃ।
না কালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং,
না কালবেগাঃ সরিতো বহন্তি॥ ৫॥
না কালমত্তাঃ খগ-পন্নগাশ্চ,
মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে।
না কালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভাঃ,
নায়ান্ত্যকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ॥ ৬॥
না কালতো ম্রিয়তে জায়তে বা,
না কালতো ব্যাহরতে চ বালঃ:
না কালতো যৌবনমভ্যুপৈতি,
না কালতো রোহতি বীজমুপ্তং॥ ৭॥
না কালতো ভানুরুপৈতি যোগং,
না কালতোঽস্তং গিরি মভ্যুপৈতি।
না কালতো বর্দ্ধতে হীয়তে চ,
চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্ম্মিমালী॥ ৮॥

অর্থ—ব্যাস কহিলেন-হে যুধিষ্ঠির! এমন কোনও কর্ম্ম নাই বা যজ্ঞ নাই, যাহাতে পতিপুত্রহীনা বীরপত্নীগণ এখন পতিপুত্র লাভ করিতে পারে, এমন কোনও পুরুষই নাই যে, ইহাদিগের মৃতপতি পুনর্ব্বার আনিয়া দিতে পারে। পরন্তু ঈশ্বররূপী কাল দ্বারাই মনুষ্য বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে॥১॥

মানব অসময়ে নিজ নিজ বুদ্ধিবলে বা শাস্ত্র বলে প্রার্থনীয় পুত্রবিত্তাদি লাভ করিতে পারে না, আবার ইহাও দেখা যায় যে, মূর্খ লোকও কোন সময়ে অভিপ্রেত বস্তু লাভ করিয়া থাকে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কালই কার্য্যমাত্রের প্রতি অসাধারণ কারণ॥ ২॥

যে কালে যাহা হইবার নহে, সেইকালে শিল্পবিদ্যা, মন্ত্র এবং ঔষধ ফল প্রদান করে না, আবার সে সকলেই উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে ফল প্রদানে সমর্থ হয়॥ ৩॥

যথাকালে সমীরণ ঝঞ্ঝারূপে প্রবাহিত হয়, যথাকালে বৃষ্টির উপযোগী জল মেঘকে আশ্রয় করে, যথাকালে সলিলে, কমল ও উৎপলে বিরাজিত হয়, যথাকালে কাননস্থ তরুনিকর, পরিপুষ্ট হয়॥ ৪॥

যথাকালে রজনী, কৃষ্ণবর্ণা ও শুভ্রবর্ণা হয়, যথাকালে চন্দ্রমা, সংপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অসময়ে বৃক্ষের পুষ্প বা ফল জন্মে না, অসময়ে নদীর বেগ বৃদ্ধি হয় না॥ ৫॥

অসময়ে বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি মৃগকুল, মদমত্ত হয় না, অসময়ে কামিনীগণ গর্ভগ্রহণ করে না, অসময়ে শিশির, গ্রীষ্ম বা বর্ষা উপস্থিত হয় না॥ ৬॥

প্রাণী অকালে মরে না বা জন্মে না, অসময়ে বালকের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, অসময়ে যৌবনোদ্গম হয় না, অসময়ে উপ্ত-বীজের অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয় না॥ ৭॥

অসময়ে সূর্য্য উদিত বা অস্ত হয় না, অসময়ে চন্দ্র বা তরঙ্গমালাকুলিত সমুদ্র প্রবৃদ্ধ বা ক্ষীণ হয় না॥ ৮॥

"কালঃ সর্ব্বং সমাদত্তে, কালঃ সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
কালেন বিহিতং সর্ব্বং, মা কৃথাঃ শক্র! পৌরুষং॥"

অর্থ—বলিরাজ ইন্দ্রকে বলিয়াছেন—হে শক্র! কালই সকল গ্রাস করিতেছে, আবার কালই সকল প্রদান করিতেছে, সুতরাং যাহা কিছু আমার বিপদ্ দেখিতেছ উহা কালকৃত, অতএব এজন্য তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না॥

"এবং নৈব নচেৎ কালো মামাক্রম্য স্থিতো ভবেৎ।
পাতয়েয়মহং ত্বাদ্য সবজ্রমপি মুষ্টিনা॥"

অর্থ—হে শক্র! তুমি জান, আমায় যদি এইরূপে কাল আক্রমণ না করিত, তবে 'থাকুক না তোমার হাতে বজ্র,' এখনই তোমাকে এক মুষ্টি প্রহারে পাতিত করিতাম॥

"ন তু বিক্রম কালোঽয়ং, শান্তিকালোঽয়মাগতঃ
কালঃ স্থাপয়তে সর্ব্বং, কালঃ পচতি বৈ তথা॥"
(মহাভারত শান্তি, মোক্ষ ২২৪।২৫, ৩৮।৩৯)

"কালেনাহং ত্বামজয়ং কালেনাহং জিতস্ত্বয়া।
গন্তা গতিমতাং কালঃ কালঃ কলয়তি প্রজাঃ॥"
(শান্তি, মোক্ষ, ২২৭।৩৫)

অর্থ—হে ইন্দ্র! আমি একদিন কালের বলে তোমাকে পরাজয় করিয়াছিলাম, আবার অদ্য কালের বলে তুমি আমায় পরাজয় করিলে, পরিবর্ত্তনশীল জগতের সম্বন্ধে কাল চলিয়া যাইবে, বসিয়া থাকিবে না, আহা কালেই সকলকে কবলিত করিতেছে।

"বহূনীন্দ্র সহস্রাণি, দৈবতানি যুগে যুগে।
অভ্যতীতানি কালেন, কালো হি দুরতিক্রমঃ॥"
(ঐ ২২৭।৪১)

অর্থ—হে ইন্দ্র! তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্র, ও সহস্র সহস্র দেবতাকে যুগে যুগে কাল অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারিল না॥

উক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কালই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, কালই ঈশ্বর এক নিষ্ক্রিয় নিত্য অব্যয় নিরঞ্জন কূটস্থ ও বিভু।

এই পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড দণ্ডায়মান সময়াত্মক মহাকালেরই অধিষ্ঠাতৃদেব মহাকাল শিব। যে যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব, তাঁহাকে সেই নামেই অভিহিত করা হয়। যেমন—জলময়ী গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা মকরবাহিনীর নাম "গঙ্গা"। হিমালয় পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃদেব পার্ব্বতীর পিতার নাম "হিমালয়"। মণ্ডলাকার দৃশ্যমান সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেব চতুর্ভুজ সপ্তাশ্ব বাহন অদিতি পুত্রের নাম "সূর্য্য"। এই প্রকার মহাকালের অধিষ্ঠাতৃদেব "মহাকাল" ইহারই নামান্তর শিব, মহাদেব, রুদ্র, ইত্যাদি।

মৃত্যুর পরে লোক যমালয়ে যায়, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই "যমের" কতিপয় নাম এই—কাল, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত, ছায়াসুত, অন্তক, শমন, যম। এই নাম কয়টীর ব্যুৎপত্তি বিচারে কি অর্থ উপপন্ন হয়? তাহাই এখন বিচার্য্য—এই সকল নাম কালেও প্রযুক্ত হইতে পারে যথা—

কাল—যিনি প্রাণীগণকে কলন—সংকলন সংহরণ করেন, সেজন্য তাহার নাম "কাল"। "দণ্ডধর"—অসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ অবশ্যই কালেই করিতে হয়, কালই

অসৎ কর্ম্মের দণ্ডপ্রদান করেন, সেজন্য কালের নাম "দণ্ডধর"। "শ্রাদ্ধদেব"—শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে কাল বিশেষরূপে বিরাজিত বলিয়াই কালের নাম "শ্রাদ্ধদেব। কেন না—

"পূর্ব্বাহ্ণে দৈবিকং কার্য্য, মপরাহ্ণে তু পৈত্রিকং।
একোদ্দিষ্টন্তু মধ্যাহ্নে, প্রাতর্বৃদ্ধি নিমিত্তকং।।"
(শ্রাদ্ধতত্ব)

এই বচন দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, অপরাহ্ণ প্রভৃতি কালই শ্রাদ্ধের মুখ্য কাল, সেই জন্যই কালের নাম "শ্রাদ্ধদেব"। "বৈবস্বত"—বিবস্বান্—সূর্য্য, বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বত, কাল সূর্য্যপুত্র, যেহেতু সূর্য্য হইতেই মুহূর্ত্তাদি কালের উৎপত্তি, আবার কালকে ছায়া সুত বলিয়াও শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছে,—যে হেতু জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে পাদচ্ছায়ার পরিমাণ করিয়া মুহূর্ত্তাদি কাল নির্ণয় করা যায়। "অন্তক"—প্রাণিগণের অন্ত-বিনাশ করে বলিয়াই কালের নাম "অন্তক"। "শমন"—প্রাণিগণকে প্রশমন-ইহলোক হইতে অপহরণ করে বলিয়াই কালের নাম "শমন"। "যম"—প্রাণিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযত করেন বলিয়াই কালের নাম "যম" হইয়াছে।

কালী।

কালের সৃষ্টি, স্থিতি এবং অপরাপর শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই কালের সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় শক্তি বা ক্ষমতাই "কালী"।

শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এ হেতু কালীকেও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যায়। এই কালশক্তি কালীই পরা প্রকৃতি, ইনিই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-রূপা প্রলয়াবস্থা। মনু বলিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতং, অপ্রজ্ঞাত মলক্ষিতং।
অপ্রতর্ক্য মসং বেদ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (১)

অর্থ—সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকার, প্রজ্ঞার অবিষয়, তাহার লক্ষণ করা যায় না, সে অন্ধকার তর্কে বুঝান যায় না, যেন সমস্তই প্রসুপ্ত নিস্তব্ধ।

এই কাল শক্তিতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই অনির্ব্বচনীয় অন্ধকারময়ী প্রলয়াবস্থাই "কালী" ইনিই সাংখ্য মতে স্বরূপা প্রকৃতি, এই প্রকৃতি হইতেই আদি সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যে অভাব—কিছু না হইতে জগতের উৎপত্তি বলেন, সাংখ্য দর্শন মতে সেই বৌদ্ধের অভাবই প্রলয়াবস্থা—স্বরূপপ্রকৃতি—"কালী" সৃষ্টিকর্ত্রী বুঝা যায়।

সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা, তাঁহার সৃষ্টি শক্তি "ব্রাহ্মী" পালন শক্তিসম্পন্ন নারায়ণ, তাঁহার পালনী শক্তি "নারায়ণী" প্রলয় শক্তি সম্পন্ন রুদ্র মহাকাল, যেই মহাকালের হৃদয়োপরি কালী বিরাজিতা, সেই মহাকাল বা কালের প্রলয়শক্তি "কালী"।

এই কালীই নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ও ঐন্দ্রী, নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

সেই প্রলয়াবস্থা তমোময়ী কালী মহামেঘপ্রভা, যে চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি, আলোক প্রদান করিতেছে, উহারা তিনটী কালীর ত্রিনয়ন, চারিদিকই কালশক্তির করায়ত্ত, তাই কালী চতুর্ভুজা, কাল শক্তির অভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। তাই কালী জগদ্ব্যাপিনী, যিনি জগদ্ব্যাপিনী, তাঁহাকে কিসে আবরণ করা যায়? তাই কালী দিগম্বরী, কালশক্তি কালী ব্রহ্মময়ী, তিনি কাহার নিকট লজ্জাবোধ করিবেন? তিনি

জগজ্জননী, অনন্তকোটী প্রাণী তাঁহারই শিশু সন্তান, শিশু সন্তানের নিকট আবার মায়ের লজ্জা কি? কাল শক্তি কালী কালে কালে নিরন্তর ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত প্রসব করিতেছেন, তাঁহার বসন পরিধানের সময় কখন? তাই মা দিগম্বরী।

কালী শবারূঢ়া, শব-নিষ্ক্রিয়—মহাকাল মহাদেব,এই নিষ্ক্রিয় মহান্ কালের হৃদয়ে—মধ্যে কালী অবস্থিতা, যে যাহার শক্তি, সে তাহার মধ্যেই থাকে, প্রদীপের দাহিকা শক্তি প্রদীপের মধ্যেই বিরাজিত, তাই কাল শক্তি কালী মহাকালের হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছেন,সমস্ত বস্তুই জড়—শব—নিষ্ক্রিয়, পরন্তু সেই সেই বস্তুর শক্তিই ক্রিয়া করিতে থাকে, চুম্বক লৌহ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাহার আকর্ষণী শক্তিই অন্য লৌহকে আকর্ষণ করে। কালীও কালের অন্তর্নিহিতা থাকিয়াই জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করিতেছেন, তাই কালী শবারূঢ়া।

'মহাপ্রলয়ে এই কাল শক্তির করাল কবলে প্রাণিবর্গ প্রবিষ্ট হয়, করাল দংষ্ট্রাগ্রে কেহ বিচূর্ণিত হয়, কেহবা দশনান্তরালে লাগিয়া থাকে, কাল শক্তির প্রভাবেই প্রাণিগণ মরিয়া যায়, তাহাদের শীর্ষ সমূহ ইতস্তত গড়াগড়ি যায়, তাই কালী শবমুণ্ডমালিনী।

মানব মরিলে, তাহাকে আর বন্ধুবান্ধব গ্রহণ করিল না, পূতি দুর্গন্ধে আর কেহ অগ্রসর হইল না, এমন কি গর্ভধারিণীও তাহাকে পরিত্যাগ করিল, আর তাহার আশ্রয় কোথাও মিলিল না, তখন জগজ্জননী শ্মশানবাসিনী কালীই তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তাই কালী শ্মশানালয় বাসিনী, অস্থিমালাধারিণী, ও অলচ্ছিতামধ্যগতা। কালশক্তি সমধিক ভাবে বৈরাগ্যহেতু শ্মশানেই বিকাশ পায়, তাই কালী শ্মশানবাসিনী।

কালী মহামেঘপ্রভা, কিন্তু মায়ের কালরূপে দশদিক্ আলোকিত, কালী সৌন্দর্য্যের খনি, তাঁহার রূপে—শক্তিতে মহাকালও বিমুগ্ধ, অন্যের কথা আর কি কহিব? এ হেতু সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বিবসনা কালীকে সম্মুখে রাখিয়া মাতৃ বুদ্ধিতে মনকে সুস্থির ও অবিকৃত করিয়া যদি সাধকগণ চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করে, তবে অন্য কামিনীতে চিত্তের বিকৃতি কখনও জন্মিবে না, এইরূপে ক্রমে অভ্যাসবশে মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইবে,—ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ও সাধকের ধ্যানপথে উপস্থিত হইবে, তখন সাধকের অপবর্গ মার্গ অর্গলচ্যুত হইবে, ইহাই কালী উপাসকের অসাধারণ উপকার, সন্দেহ নাই।

যে সকল সাধক সূক্ষ্ম অন্তঃকরণদ্বারা কালীর চরণ-কমল স্পর্শ করিতে পারে, তাহাদের আর ভববন্ধন থাকে না, তাহারা মুক্ত হইয়া যায়, ইহা দেখাইবার জন্যই কালী মুক্তকেশী।

জগতে যাহারা বাম—বিপরীত—প্রতিকূল আচরণ করিবে, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য কালী বামপাণিতে কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন। সুধু ভয় প্রদর্শনই করিতেছেন, তাহা নহে, অপর বামহস্তে একটী ছিন্ন মুণ্ড ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যাহারা নিয়মের বিপরীত—বাম আচরণ করে, তাহারাই অসুর, কালশক্তি আমি তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া থাকি।

আর জগতে যাহারা দক্ষিণ—দাক্ষিণ্য—সরলতা—উদারতা ব্যবহার করে, "মা! করুণাময়ি! রক্ষা কর মা! প্রণত অধমে

দয়া কর" এই বলিয়া যাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করে, কালশক্তি কালী তাহাদিগকে বলিতেছেন "বাছা ভয় নাই, এই যে আমি অভয়দায়িনী। বাছা! কি প্রার্থনা কর? এই যে আমি বরদায়িনী, তাই কালী দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন।

শক্তি আর শক্তিমান্ অভিন্ন, অতএব কাল ব্রহ্ম, কালশক্তি, কালী ব্রহ্ম, সেই কাল শক্তি "কালী"ই জগজ্জননী, কালী হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন, কালী হইতে বিষ্ণু জন্মিয়াছেন, কালী হইতে রুদ্র জন্মিয়াছেন। যাহা হইবে, যাহা হইতেছে, তাহা সকলই "কালী" ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত কালী, অহঙ্কার কালী, বুদ্ধি, কালী, একাদশ ইন্দ্রিয় কালী, পঞ্চতন্মাত্র কালী, প্রকৃতি কালী, কালী চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, যাহা দেখিতেছি, তাহা কালী, শুনিতেছি কালী, ঘ্রাণ করিতেছি কালী, স্পর্শ করিতেছি কালী, ভোজন করিতেছি কালী, কালী ছাড়া সৎ অসৎ কোন বস্তুই নাই, অতএব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই আদ্যা প্রকৃতি কালশক্তি "কালী" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা (সিদ্ধান্তভূষণঃ)।

কৌলীন্য ও সমাজ। (১)

প্রাচীন আর্য্যধামে কুলীন-সমাজ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া সমাজের আদর্শস্থানীয় হইতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই গুণ সকল কি প্রকার অসাধারণ ছিল, তাহা আমরা এক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রদর্শন করিব। সেইরূপ গুণসম্পন্ন হইতে হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই ত্রিবিধ দ্বিজগণকে বহুকাল ধরিয়া রাজ-কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইত। ইউরোপে যেমন কৌলীন্য লাভের একমাত্র পন্থা নানাবিধ উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মে বিনিয়োগ এবং সেই কর্ম্মোপলক্ষে নানা দেশ-ভ্রমণ দ্বারা বহুদেশীয় লোকের সহিত আহার-ব্যবহার করিয়া অনেক অসাধারণ গুণের অধিকারী হইতে হয়—উৎসাহ, নিরালস্য, কার্য্যনিষ্ঠা, চতুরতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা, বিনয়, উদারতা, গাম্ভীর্য্য, সদাশয়তা প্রভৃতি গুণাবলি লাভ করিতে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা পাঠে প্রতীত হয়, যে প্রাচীন আর্য্য সমাজেও তদ্রূপই রাজকার্য্য দ্বারা সমাজ সেবা করিয়া কৌলীন্য লাভ করিতে হইত।* কোমল শয্যায় শুইয়া কেহ বড় হইতে পারে না।

মনু বলিয়াছেনঃ—

"রাজা ত্রিবেদবেত্তা দ্বিজাতিদিগের নিকট হইতে ঋগ্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন; পরম্পরাগত অর্থশাস্ত্র (যদ্দ্বারা আয়-ব্যয় স্থিতির পথ বুঝা যায়) যাঁহারা অবগত আছেন, উহা তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন। তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা [illegible] ও নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষা করিবেন। কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জনের উপায়, কৃষক, বণিক প্রভৃতির নিকট অভ্যাস করিবেন।" †

* যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। ১অ ৩০৮—৩১০।

† মনু-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়স্থ ৪৩ শ্লোকের শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ দেখ। ক্ষত্রিয়রাজ যে রণবিৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ লাভ করিতেন, তাহা তাঁহার জাতীয় শিক্ষা হওয়াতে আশৈশব সেই শিক্ষাধীন থাকিতেই

তবেই দেখা যাইতেছে, যে বেদে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-দ্বিজ ব্যুৎপন্ন হইতেন, তাঁহার নিকট সেই সেই বেদ শিক্ষা করিয়া রাজা ত্রিবেদের জ্ঞান লাভ করিতেন। ব্রহ্ম-বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা করিতেন, অর্থ-শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট, সম্ভবতঃ মসি-জীবী ক্ষত্রিয়ের নিকট—আয়, ব্যয় ও স্থিতি-পথ বুঝাইয়া লইতেন, এবং কৃষি-বাণিজ্য পশু-পালনাদি বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য-কৃষক ও বণিকগণের নিকট অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিতেন। দ্বিজত্রয়ই নিজ নিজ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা বলে, এমত কি, বৈশ্য-কৃষক ও বণিক পর্য্যন্ত রাজগুরু-পদে অধিষ্ঠিত হই-তেন। পূর্ব্বকালে, সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির আসন স্বয়ং রাজা গ্রহণ করিতেন। কোন কারণ বশতঃ যদ্যপি তৎপদ গ্রহণে তিনি অক্ষম হইতেন, তবে সেই পদে নানা গুণ-ভূষিত, উপযুক্ত দ্বিজগণ নিযুক্ত হইতে পারি-তেন। মনু একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেনঃ—

"জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥"

মনু। ৮অ। ২০।

মুনি কাত্যায়নের মতানুসারে কল্লুক-ভট্ট ইহার এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া-ছেনঃ—

"রাজা স্বয়ং বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হইলে বিদ্যাদিগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, উক্তগুণশালী ব্রাহ্মণাভাবে বিদ্যা-দিগুণান্বিত ক্ষত্রিয়কে নিয়োগ, তাদৃশ ক্ষত্রিয়ের অপ্রাপ্তিতে তদ্রূপ বৈশ্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন, সর্ব্বগুণান্বিত শূদ্রকে ঐ কার্য্যে কদাচ নিয়োগ না করিয়া সেখানে অহং ব্রাহ্মণ এই মাত্র বলিয়া, পরিচয় দেয়, সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন নহে, কেবল সামান্য রূপে বিচার করিতে পারেএমত ব্রাহ্মণকেও নিযুক্ত করিবেন।"*

সে আসনে শূদ্রকে অধিষ্ঠিত করিলে সে পদের মর্য্যাদা থাকে কই? তাহা হইলে রাজার প্রধান কর্ত্তব্য যে প্রজারঞ্জন করা, সে কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কারণ, সে পদে একজন শূদ্রকে উপবিষ্ট দেখিলে, শূদ্র ভিন্ন অপর সর্ব্ব জাতীয় প্রজাই রুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। তাই মনু উক্ত ব্যবস্থার পরেই বলিয়াছেন, শূদ্রকে সে আসনে নিযুক্ত করিলে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটে, রাজার রাষ্ট্র অধর্ম্মে অবসন্ন হয়। সে যাহা হউক, যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রাজকার্য্যের উচ্চাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহারাই যে উত্তরোত্তর সেই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, ক্রমে রাজসচিব সভায় স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন, একথা রাজসচিব-সভার সংগঠন দেখিলেই অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেই সভা সাত আট জন সদস্যের কম পূর্ণ হইত না।* এই সাতআট জনের সকলকেই যে একান্ত পক্ষে ব্রাহ্মণ হইতে হইত, মনু সংহিতা পাঠে এমত প্রতীত হয় না। কারণ মনু বলিয়াছেনঃ—

"সচিবগণের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-সচিবের সহিত রাজা সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়—এই ষড়্‌বিধ বিষয়ের বিশেষ মন্ত্রণা করিবেন। এতদ্ব্যতীত অর্থাদি বিষয়ের পরামর্শ জন্য শুদ্ধ-স্বভাব, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, কার্য্য-কুশল, ন্যায্যরূপে ধনোপার্জ্জনে সক্ষম, ধর্ম্মাদি পরীক্ষায় সুপরীক্ষিত অন্যান্য কর্ম্মসচিবও গ্রহণ করিবেন।" †

ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত এই অপরাপর সচিব-গণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ভিন্ন আর কে হইতে পারে? দ্বিজাতি ব্যতীত যখন আর কাহা-রই সেই সভায় প্রবেশ লাভ করিবার অধি-

---

হইত; এজন্য সে কথা বলা বাহুল্য হয় বলিয়া এস্থলে সে শিক্ষা বিষয়ের উল্লেখ নাই।

* শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত।

* মনুসংহিতা। ৭ অ। ৫৪।

† ঐ। ৭ অ। ৫৮। ৬০।

কার ছিল না, এবং সেই সভা যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রণ-বিদ্যাবিৎ শূরশ্রেষ্ঠ, অর্থনীতিজ্ঞ এবং বার্ত্তা শাস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সদস্যগণ দ্বারা পূর্ণ করা হইত, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তদ্রূপ গুণসম্পন্ন হইয়া কৌলীন্য মর্য্যাদায় ভূষিত হইতেন, তাঁহারাই সেই সভায় শপথগ্রাহী হইয়া অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। মনু সংহিতা পাঠে আরও প্রতীত হয় যে, রাজার প্রধান কর্ম্ম-কারক বা সম্পাদকগণ (Secretaries) এবং যাঁহারা দৌতকার্য্যে বৃত হইতেন (Political agents, Residents, ambassadors &c.) তাঁহাদিগকে সৎকুলোদ্ভব কুলীন হইতে হইত।* সুতরাং প্রাচীন আর্য্যসমাজে রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে কুলীনগণই নিযুক্ত হইতেন। এই রাজকার্য্যের পদই কৌলীন্য লাভের সোপান স্বরূপ ছিল। কারণ, একেবারে কিছু কেহ উচ্চ পদারূঢ় হইতে পারিতেন না। তবে ব্রাহ্মণই যে রাজ্যের সকল ক্ষমতা ও পদ অধিকার করিয়া থাকিতেন, এ কথা নিতান্ত অমূলক। যোগ্যতা অনুসারে দ্বিজত্রয়েরই নিজ নিজ অধিকারে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। জ্ঞানে ও ধর্ম্মে যাঁহার উচ্চাধিকার সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বলীয়ান, কর্ম্মদক্ষতায় যাঁহার বিশেষ অধিকার, সেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-দ্বিজ কর্ম্মবলে বলবান ছিলেন। দ্বিজাতিত্রয়ই বিদ্যা ও গুণবলে যেমন যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন, তদনুরূপ রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া সমাজসেবা করিতেন। রাজসচিবত্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের উচ্চাধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা সমাজতরির কর্ণধার-স্বরূপ ছিলেন। সমাজ-শিরে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই সমাজকে নিয়মিত, শাসিত ও সর্ব্বথা বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া আনাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। তাঁহারাই সমাজের মহাবল ও গৌরব স্বরূপ ছিলেন। যেমন প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের মহাবল ও সমাজ-নিয়ামক তত্তদ্দেশীয় সম্রান্তগণ ছিলেন, এক্ষণে যেমন ইউরোপীয় রাজ্যে সম্রান্তগণ সমাজের মহাশক্তি ও সমাজকে গড়িয়া আনিতেছেন, প্রাচীন আর্য্য সমাজেও সম্রান্তগণ ঠিক সেই কার্য্য করিয়া সমাজের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রবলে ও কার্য্য কুশলতায় সমাজ সংগঠিত, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিত। অন্যদিকে আবার, এই কুলীন-সমাজ রাজশক্তি দ্বারা সংগঠিত, নিয়মিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইত। যতদিন আর্য্যসমাজে রাজশক্তি বলবতী ছিল, ততদিন কৌলীন্যেরও অভ্যুদয় এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কুলীন সমাজের সংস্কার এবং নব নব কুলীনের সৃষ্টি হইতে পারিত। হায়! আজি সেই রাজশক্তি-বিরহে কৌলীন্যের কি দুর্দ্দশা ও অধোগতি! সেই অধোগতির সহিত সমাজেরও অধোগতির পরিসীমা নাই।

সামাজিক রাজকার্য্যের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদ্বারা কেমন কৌলীন্যের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিলাম। পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে, হিন্দু জাতিভেদ যেরূপ সামাজিক শিক্ষা-প্রণালী, সেই শিক্ষা-প্রণালীর পরমোৎকৃষ্ট ফল এই কৌলীন্য। জাতিভেদের ফল বটে, কিন্তু তাহা কুলক্রমাগত হইয়া আবার নিজেই এক প্রকার শিক্ষা-প্রণালী—যদ্দ্বারা কুলীনের সন্তান-সন্ততিগণ কুলধর্ম্মে সুশিক্ষিত হইয়া

* মনুসংহিতা। ৭ অ, ৬২।৬৩। কল্লুকের টীকা দ্রষ্টব্য।

আসিত। জাতিভেদ প্রতি জাতি মধ্যে যে রূপ পারিবারিক শিক্ষাবিধান করিত, কৌলীন্য কুলক্রমাগত হইয়া তদ্রূপ পারিবারিক শিক্ষা দান করিত। সেই শিক্ষা প্রভাবে প্রাচীন আর্য্যসমাজে কুল ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত হইত। এই শিক্ষানীতিকে সমাজ মধ্যে সুরক্ষা করিবার নিমিত্ত সমাজনীতিজ্ঞেরা আর এক মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মহাশক্তি সংসর্গ। সংসর্গ সর্ব্ববিধ শিক্ষা-প্রণালীর একদা সহায় ও পরিপন্থী। সৎসংসর্গগুণে যেমন শিক্ষা আশু ফলবতী হয়, কুসংসর্গ দোষে তেমনি তাহা দূষিতা হইয়া মহা অকল্যাণের কারণ হয়। সংসর্গগুণে মানুষ ঋষিতুল্য পবিত্র হয়, দেবতা হয়, আবার সংসর্গ-দোষে সেই মানুষ পশুতুল্য হইয়া পড়ে। এজন্য সংসর্গগুণ গ্রহণ করা এবং সংসর্গ দোষ পরিহার করা সর্ব্ব শিক্ষা-নীতির প্রধান ধর্ম্ম। একথা পরিবার মণ্ডলে এবং বিদ্যালয়ে যে রূপ খাটে, সমাজের বৃহৎ শিক্ষালয়েও সেই রূপ ঘটে। তাই সমাজের বৃহৎ শিক্ষামন্দিরে কৌলীন্য শুদ্ধ আর্য্যধামে নহে, সর্ব্ব দেশেই সামাজিক সংসর্গগুণ গ্রহণ এবং সংসর্গদোষ পরিহার করিয়াছে। পরিহার করিয়া সর্ব্বসমাজেই কৌলীন্য এক মহা সামাজিক শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। সেই শিক্ষানীতিই ক্রমশঃ অধোগামিনী হইয়া সমাজের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই শিক্ষা-নীতির প্রভাব আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিব। সমাজের সহিত সংস্পর্শ হেতু সংসর্গের যে গুণ দোষ সম্ভূত হয়, তাহা দ্বিবিধ—অন্নসংস্পর্শ ও বৈবাহিক সংস্পর্শ। সমাজের বাহ্য দেশের সহিত মিশাই অন্নসংস্পর্শ এবং রক্তমাংসের সহিত মিশাই বৈবাহিক সংস্পর্শ। প্রথমে অন্নসংস্পর্শ গৃহীত হইতেছে।

যে কুলীনগণ ধন মানে, কুলে শীলে সমাজের সর্ব্বোচ্চদেশে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের সহিত নিম্নশ্রেণীস্থ জনগনের বিস্তর প্রভেদ। এই কুলীনগণের নীচেই তাঁহাদের "বংশজ" গণ। প্রাচীন আর্য্যসমাজেও দেখা যায়; কুলীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া করণ-কারণ দোষে সেই কুল হইতে যাহারা পতিত হইত, তাহাদিগকে বংশজ বলিত। এই দেখুন, মনুর টীকাকার মেধাতিথি বংশজ শব্দ কিরূপ হীন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন:—

"কুলং বংশঃ তত্র প্রখ্যাতমহিম্না পূর্ব্বজেন ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্তিতো ভবতি *।"

মেধাতিথি কুলধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন, যাঁহারা প্রখ্যাত-মহিম, তাঁহারা যে ধর্ম্ম পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই কুলধর্ম্ম। তৎপরে বলিতেছেন:—

"যোহস্মদ্বংশজঃ কুতশ্চন ধনং লভেত স নাদত্ত্ব। ব্রাহ্মণেভ্যোহন্যত্র বিনিযুঞ্জীতেত্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ।" *

"যাঁহারা আমাদের "বংশজ" যে কোন প্রকারে তাঁহারা ধনলাভ করুন না কেন, সেই ধনের কিয়দংশ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া নিজ প্রয়োজনে বাকী ধন বিনিয়োগ করা প্রভৃতি সেই কুলধর্ম্মের আকার।"

এস্থলে দেখা যাইতেছে, প্রখ্যাতমহিম্নগণের সহিত তুলনায় বংশজগণ হীন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা প্রখ্যাত মহিম নহে, কেবল বংশজ শব্দে উল্লেখযোগ্য। যখন এই বংশজগণ অসৎ-প্রতিগ্রাহী হইয়া যে কোন উপায়ে ধন লাভ করিতে পারে, তখন তাহারা নিশ্চয় স্বধর্ম্মচ্যুত, ধনলোভী ও হীন কার্য্যেই নিযুক্ত, এই

* মনুসংহিতা। ৮ অ, ৩, শ্লোকের টীকা দেখ

রূপ হীন অর্থই বুঝাইতেছে। আর এক কথা এই, সমাজে কুলীনের থাক থাকিলেই তাঁহাদের বংশজ বা ভঙ্গের থাক অবশ্যম্ভাবী হইয়া আইসে।

ইউরোপীয় সমাজে রাজার নীচেই সম্ভ্রান্তগণ। এই সম্ভ্রান্তগণের মধ্যেও ইতর-বিশেষ আছে, সকলই যে সমান উচ্চ, এমত নহে। তাহাদিগের ও মধ্যে কুলীন মৌলিক * আছে। থাকিলেও সম্ভ্রান্ত সমুদায়কে এক জাতীয় বলিতে হইবে। কারণ, তাহাদিগের বৈবাহিক সংস্পর্শ, পান, ভোজন ও একাসনে বসাদাঁড়া সেই সম্ভ্রান্ত জাতি মধ্যেই আবদ্ধ, তদ্বহির্ভূত হয় না। বিলাতী সাহিত্যে সম্ভ্রান্তগণের এক একটি প্রকাশ্য ভোজ বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই ভোজে কেবল সম্ভ্রান্তগণই আহূত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। নীচ কুলোদ্ভব জনগণের সহিত একাসনে বসা ও আহার-ব্যবহার করা ঘোর অপমানের বিষয়! তবে মৈত্রী ভোজের কথা ধর্ত্তব্য নহে। এই দেখুন একজন ইংরাজী লেখক কি বলিতেছেন :—

"A commoner is contemptuously looked down upon by a peer in the same manner as a dog is despised by us. A peer keeps himself aloof from a commner as if his touch would pollute him, He feels beneath his dignity to talk to him, a shame to mix with him and a disgrace to keep his company. It is a great sacrifice for a peer to eat with a commoner, He will never do so in society, though he may do so privately."

মৈত্রীভোজ আমাদের শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে; মিত্রতা-নিবন্ধন সকলই হইতে পারে। সম্ভ্রান্তগণ মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত, নীচ বংশীয় ধনাঢ্য বণিক-শ্রেণী এবং অস্ত্র-ধারী সৈনিক শ্রেণীস্থ জনগণের মধ্যেও সেই প্রকার আহার-ব্যবহার এবং পান-ভোজনের নিয়ম। তবে আর জাতিভেদ কাহাকে বলে? কৌলীন্যের ধর্ম্মই এই যে, যে সমাজে জাতিভেদ-প্রথা প্রকাশ্যরূপে প্রচলিত নহে, সে সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে তাহা জাতিভেদ সৃষ্টি করে। সমাজ মধ্যে আহার-ব্যবহারের পার্থক্য হেতু জাতিভেদ প্রকাশ্য ভাবেই হউক, কিম্বা অপ্রকাশ্য ভাবে হউক একবার প্রবিষ্ট হইলে তাহার প্রভাব সমাজস্থ সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয়। তুমি যদি আমার সঙ্গে কোনরূপ নীচতা হেতু আহার-ব্যবহার না কর, তবে আমিই বা কোন্ মুখে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব? আর আমারি উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ যদি আমার সহিত পৃথগন্ন হয়েন, তবে আমিই বা কেন আমার নীচ-শ্রেণীস্থ জনগণের সহিত একান্ন হইব? এই রূপে সমাজস্থ সর্ব্বশ্রেণীর জনগণ মধ্যে পৃথগন্ন হইয়া জাতিভেদ ঘটিতে থাকে। তাহার মূল কৌলীন্য। কৌলীন্য হইতেই পৃথগন্ন ক্রমশঃ নীচশ্রেণী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। যাহা ইউরোপে ঘটিয়াছে, ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘটিবার যথেষ্ট কারণও আছে। যাহারা ব্যবসা ও বৃত্তিতে, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিতে, জ্ঞান ও বিবেচনায়, আচার ও ব্যবহারে, কাজে ও কর্ম্মে, ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানে এক নহে, তাহাদিগের সহিত মিল হইবে কেন? এক বিষয়ে মিল না হইলে, সর্ব্ব বিষয়েই পৃথক্ হইয়া যায়। নীচের সহিত উচ্চের, ভদ্রের সহিত অভদ্রের, মহাজনের সহিত ইতরের, ধনবানের সহিত দরিদ্রের পার্থক্যের প্রধান কারণ এই। এরূপ উচ্চ

* বংশজ ও ভঙ্গ শব্দদ্বয় ব্রাহ্মণ জাতিতে প্রযুক্ত এবং মৌলিক শব্দ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

নীচের সহিত কোন অংশে মিল হইবার যো নাই। যে স্থলে অন্নস্পর্শ-হেতু মিলন হয়, সে স্থলে পরস্পর সংসর্গ ঘটে। সেই সংসর্গহেতু ঘনিষ্টতা জন্মে। কারণ, আহার-ব্যবহারে যেমন ঘনিষ্টতা জন্মে, এমন আর কিছুতেই হয় না। কথায় বলে, এক পান-কীর ইয়ার। ইয়ার্কি অন্য রকমে থাকিলেও যদি পানকে না মিশে, তবে কোন না কোন কারণ বশতঃ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু পানকে মিশিলে সে ইয়ার্কি ক্রমে জমাট বাঁধিতে থাকে। ফল এই হয় যে, ইয়ার দ্বয়ের দোষ পরস্পর সংক্রামিত হয়। ঘনিষ্ঠতার দরুণ কেহ কাহারও দোষ দেখিতে পায় না। যদি পায়, ঢাকিয়া লয়। শেষে সেই দোষের প্রতি পক্ষপাতিতা জন্মে। পক্ষপাতিতা জন্মিলে তাহা নিজ শরীরে সংক্রামিত হয়। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে অন্নপাপের গুরুত্ব এতই ঘোষিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা পাপ মলিনতা জন্মে এবং প্রবৃত্তি ও রুচি কলুষিত হইয়া যায়, তাহাকে পাপ বলিব না ত কি? এই অন্নপাপহেতু সমাজ নীতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নীচের সহিত উচ্চের অন্নস্পর্শ রহিত হইয়া গিয়াছে।

তবে ব্রাহ্মণ জাতীয় পংক্তিপাবন জনগণ নীচ জাতির শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রিত হইবার বিধি কেন? কারণ, মনু বলিয়াছেন, তাঁহাদের সংসর্গে দুষ্ট লোকও ক্রমে অদুষ্ট হইয়া আইসে। মনূক্তি এই:—

"পুনাতি পংক্তিং বংশ্যাংশ্চসপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোঽপিসোঽর্হতি॥"

৩অ১০৫।

কল্লুক-সম্মত অর্থ এই:—

"তিনি পংক্তি পবিত্র করেন অর্থাৎ তৎসন্নিহিত দুষ্ট লোক ও অদুষ্ট হয়; তিনি ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও পুত্রাদি অধঃ সপ্ত পুরুষ পবিত্র করেন এবং নিজে এরূপ পবিত্র পাত্র হন যে, আসমুদ্র পৃথিবী একক তাঁহাকে দান করিতে পারা যায়।"

এইরূপ পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ কাহারা?

"সমুদায় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন, এবং দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ কহে। যজুর্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রত স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ ব্রতার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টি বেদাঙ্গে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত এবং জ্যেষ্ঠ সাম অর্থাৎ সামবেদের আরণ্যক যিনি গান করিয়া থাকেন—এই ছয় জন সকলেই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। বেদার্থ-বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহু দানশীল, শতায়ু বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ—ইহঁারা সকলেই পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।"

মনু। ৩অ—১৮৫-১৮৭।

এই পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের লক্ষণ যেরূপ বিবৃত হইল, বলা বাহুল্য, তাঁহারাই মহাকুলীন। সেই সদ্বংশ-সম্ভূত, মহাপণ্ডিত, সদাচারী, বেদব্রতধারী, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ যেস্থলে দানাদি এবং আহারাদি সম্পর্কে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেন, সে স্থল পবিত্র হইয়া যাইত। তাঁহাদের সংসর্গে দুষ্টজনগণও শিষ্টাচারী হইতে শিখিত। শুদ্ধ দান ধ্যান এবং পান ভোজনের সম্বন্ধে যাঁহাদের সদাসর্ব্বদা সংসর্গ এত প্রার্থনীয়, বৈবাহিক সূত্রে তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্টতর সংস্পর্শ তদপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় না হইবে কেন? তাই উদ্বাহ-সম্বন্ধে তাঁহারা যে কুলে সর্ব্বক্ষণ পদার্পণ করেন, এবং আহার-ব্যবহারে সর্ব্বদা যে কুলের সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, সে কুল নিশ্চয় পবিত্র হইয়া যায়। সে কুলে তদাচরিত সাধু ব্যবহারের ও সদাচারের দৃষ্টান্ত-প্রভাব প্রবেশলাভ করিতে থাকে। তাঁহাদিগের শিক্ষা এত উচ্চ,

চরিত্র এত পবিত্র, জ্ঞান এত উন্নত, এবং আচারাদি এত বিশুদ্ধ যে, তাঁহাদিগের সংসর্গে সকলেই পরিপূত হইতে পারেন। যাঁহারা নিজে সবল ও শক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের চরিত্র একবার সংগঠিত হইয়াছে, অন্যের কুসংসর্গ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না, বরং কুজনকে তাঁহারা সংসর্গগুণে সুজনে পরিণত করিতে পারেন। শূদ্র জাতির পক্ষে সৎ ব্রাহ্মণ-সেবা এই জন্য বিধানত হইয়াছে। তাহাই শূদ্রের তপস্যা বলিয়া গণ্য। তপস্যা কি জন্য? তাঁহাদিগের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া অহরহ তাহাদিগের সংসর্গগুণে শূদ্রও সাধু হইয়া উঠেন। গুরুগৃহে বাসকালীন শিষ্য গুরু-অন্নে প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহবাস হেতু জ্ঞানে ও ভক্তিতে বৃদ্ধ হইতে থাকেন। অন্ন সংসর্গহেতু ঘনিষ্টতার বৃদ্ধি এবং ঘনিষ্টতাহেতু গুরুর বিশুদ্ধ ভাব শিষ্যে সংক্রামিত হয়। তথাপি ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন:—

"অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।
এতেষ্বেব দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ॥"
অত্রিসংহিতা। ৮ শ্লোক।

"অকুলীন, অসদ্বৃত্ত, জড়, শূদ্র এবং খলস্বভাব দ্বিজ—এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রশিক্ষা দিবেন না।"

দিলে কোন ফলই দর্শে না, কেবল পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। কোন কোন স্থলে বরং বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কারণ সকল শিক্ষার অধিকারী সকলে নহে। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ও কৌলীন্য দ্বারা এই অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অধিকার ভেদ আছে বলিয়া আর্য্য সমাজে প্রতি জাতির নিমিত্ত স্বতন্ত্র বৃত্তি-শিক্ষা বিধানিত হইয়াছে। প্রতি জাতীয় জনগণ সেই শিক্ষা অন্ন-জল-পানের সহিত আশৈশব গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। সে শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা নহে, অন্ন-জল-পানের সহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সে শিক্ষা গৃহীত হয়। কিন্তু যে শিক্ষা অন্ন-জল-পানের সহিত গৃহীত না হয়, সে শিক্ষা তত ফলবতী হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্ষণকার ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করুন।

আজিকালি হিন্দু সমাজে সর্ব্বসাধারণকে ইংরাজী রাজকার্য্যের নিমিত্ত তৈয়ারি করিবার জন্য সকলকেই ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যেমন ঘোটককে আমরা শিক্ষা দিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লই, ইংরাজগণ তদ্রূপ তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী করাইবার জন্য আমাদিগকে ইংরাজী বিদ্যা দান করিতে আদৌ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী যেরূপ হউক না কেন, এদেশে তাঁহারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্ব্বসাধারণকে Mass Education দিতেছেন। সে শিক্ষা দ্বারা লোক-চরিত্র সংগঠিত হয় না, তাহার উদ্দেশ্য ও তাহা নহে। লোককে ভাল রূপে ইংরাজি লিখিতে পড়িতে এবং নানাবিধ রাজ-কার্য্যোপযোগী জ্ঞান লাভে সমর্থ করিতে পারাই সেই শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান অভিপ্রায় বলিয়া প্রতীত হয়। এই অভিপ্রায় তদ্দ্বারা বিলক্ষণ সিদ্ধ হইতেছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে এক্ষণে সর্ব্বজাতীয় লোক একত্র ইংরাজী শিক্ষালাভ করিতেছে। তাঁতী, জেলে, কামার, কুমার, ছুঁতার, ধোবা, নাপিত, চাষা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় তরুণ বয়স্কগণ একত্র বসিয়া

কয়েক ঘণ্টাকাল মাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা যে কিছুই সংসর্গদোষ ঘটে না, এমত কথা আমরা বলিতে চাহি না। অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণের ছেলে সংসর্গদোষে অধঃপাতে গিয়াছে ও যাই তেছে। লাভের মধ্যে দুই দশজন নীচ জাতীয় লোকের উচ্চপদ-প্রাপ্তি। প্রতি বৎসরের পরীক্ষা ফল দেখ, কয়জন নীচ জাতীয় ছেলে উত্তীর্ণ হইয়াছে? পরীক্ষা ফলের তালিকায় দেখা যায়—প্রায় চৌদ্দ আনাই কায়স্থ ব্রাহ্মণের ছাত্র দ্বারা সেই তালিকা পরিপূর্ণ; অন্যজাতীয় ছাত্র দুই আনা মাত্র বা তদপেক্ষাও ন্যূন সংখ্যক। সেই জন্যই বলি, এতদ্দ্বারা নীচ জাতির সামান্য লাভ কিন্তু সংসর্গ দোষে উচ্চ জাতীয় বালকগণের সমূহ ক্ষতি। তথাপি যদি হিন্দুসমাজে জাতিভেদ এবং কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে এতদপেক্ষা ক্ষতির অংশ অনেক গুণ বেশি হইত। জাতিভেদ এবং কৌলীন্য প্রচলিত থাকাতে কেহ কাহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাদিগের একত্র সহবাস। বাড়ী গিয়া অন্নপান ভোজনে, এবং শয়নে স্বপনে যে, যে জাতীয় ছাত্র, সে তজ্জাতীয় আচার ব্যবহারের গৃহশিক্ষা পাইয়া যে জোলা সেই জোলা, যে তাঁতী সেই তাঁতী, যে ধোবা সেই ধোবা, যে নাপিত সেই নাপিত, যে কায়স্থ সেই কায়স্থ, যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণই থাকিয়া যায়। গৃহ-শিক্ষা অন্নপান ভোজনের সহিত গৃহীত হয়, নীরবে ও নিঃশব্দে দৃষ্টান্তের সহিত গৃহীত হয়। সুতরাং এই গৃহ-শিক্ষার ফল, ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ফলকে কিয়ৎ পরিমাণে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। কাজেই ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালী ততদূর অনিষ্টসাধন করিতে পারিতেছে না। তরুণ বয়সে ও যৌবনে যতদিন বুদ্ধির পরিণতি না ঘটে, ততদিন কিছু রুচি-বিকার জন্মে বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধির পরিণতির সহিত সুবিজ্ঞতার ফলে আবার সব ঠিক হইয়া যায়। সুতরাং হিন্দু জাতিভেদ ও অন্নপার্থক্য হিন্দুসমাজনীতির রক্ষা-পক্ষে প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরাজী মাস-এডুকেশনের শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা হিন্দুসমাজের যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহার একটী অনিষ্ট মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে কিরূপ সংসর্গ দোষ ঘটে, তাহাই এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজে অপরাপর অনিষ্টাপাতও হইতেছে, তজ্জন্য অনেকেই নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া যৎসামান্য জীবিকার্জ্জন জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। তদ্রূপ জীবিকার্জ্জন স্বকীয় ব্যবসা বৃত্তিতে থাকিলেও অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারিত। ফল এই হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা বিলাতী ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, এ সকল অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য নহে। তদ্দ্বারা এই মাত্র প্রতীত হয় যে, জাতিভেদ প্রথা অবহেলা করিলে হিন্দুসমাজের কত অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। সেই প্রথাকে পরিশুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তাহার দৃঢ়বন্ধনী স্বরূপ অন্নপাপ পরিহার্য্য হইয়াছে।

এই অন্নপাপ যে শুধু হিন্দুসমাজে পরিহার্য্য হইয়াছে, এমত নহে, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইউরোপীয় প্রভৃতি অপর দেশীয় সমাজেও অন্নপাপ পরিহার্য্য হই-

য়াছে। "বর্ণভেদ ও জাত্যান্তর পরিণাম" নামক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজ মাত্রেই নানা উচ্চনীচ থাকে, আপনা-আপনি বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক এক থাককে এক এক চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্র মধ্যে অন্নপাপ পরিহার্য্য দেখা যায়। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, অন্নপাপ পরিহার করা সর্ব্ব মনুষ্যসমাজে এক প্রধান সামাজিক নীতি। ঐ নীতি দ্বারা সর্ব্ব সমাজেরই ইষ্টসাধন হয় বলিয়া সর্ব্ব সমাজেই তাহা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। তাহা যে প্রতি সমাজের এক প্রধান নীতি, এমত নহে, মনুষ্য-সমাজ মাত্রেরই তাহা স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মনুষ্যের স্বভাব হেতু তাহা প্রতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। হিন্দুসমাজ প্রতি স্বাভাবিক সমাজনীতিকে রাজনীতি দ্বারা চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল মাত্র। শুধু স্বাভাবিক হইলে হইত না, যাহা স্বাভাবিক অথচ সমাজের ইষ্টকর, তাহাই সমাজনীতি, সেই নীতি ধর্ম্ম-ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিপালনীয় এবং রাজনীতি দ্বারা সুরক্ষণীয়। অন্নপাপ পরিহার এইরূপ সমাজনীতি।' সেই নীতি জাতিভেদের শিক্ষা প্রণালীকে সংসর্গ-দোষ হইতে রক্ষা করে, এবং তাহা কৌলীন্যেরও রক্ষা-কবচ। এজন্য হিন্দুসমাজে বিবাহের পর "পাকস্পর্শ" প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা পরীক্ষিত হয় যে, যে ঘর হইতে কন্যা গৃহীত হইয়াছে, সে ঘরের অন্নচলন আছে কি না? অন্নচলন থাকিলেই তাহা পরিশুদ্ধ বংশ এবং করণ-কারণ যোগ্য ঘর। কৌলীন্য রক্ষার জন্য এ নিয়ম অতীব শুভকর। যে ঘরের অন্নচলন আছে, সে ঘরের কন্যা গ্রহণে কিরূপ সামাজিক ইষ্টসাধন হয়, সে কথা "বৈবাহিক সংস্পর্শ" প্রস্তাবে আলোচ্য। আমরা পর বারে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

দর্শন শাস্ত্রের প্রমাণ।(৩)

পূর্ব্বোক্ত বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, কেবল বহিঃপ্রবাহ স্বীকার করিলে আত্মার অস্তিত্ব অর্থাৎ জড়াতিরিক্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় হয় না। জগৎকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারা কেবল এই বহিঃপ্রবাহ মাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল জড়বাদ। সেইরূপ যাঁহারা কেবল অন্তঃপ্রবাহ স্বীকার করেন, আত্মাকে বা "আমি"কে কেন্দ্র করিয়া জগৎতত্ত্ব আলোচনা করেন, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা মায়াবাদী, বিজ্ঞানবাদী বা স্বপ্নবাদী হইয়া পড়েন। জগতের অস্তিত্ব, দেশ কালের অস্তিত্ব তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। কাজেই এই উভয় দিক্ হইতেই শেষে 'অজ্ঞেয়তাবাদ' আসিয়া পড়ে। (১)

(১) এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া রিড্ প্রমুখ স্কচ্ দার্শনিকগণ উভয় প্রবাহবাদ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের কথা পরে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা বিশ্বাসবাদী। ইঁহারা বলেন, যখন আত্মা ও জগৎ উভয়ের অস্তিত্বই আমাদের অনুভবসিদ্ধ, আমরা উভয়কেই যখন বিশ্বাস করিতে বাধ্য—তখন যে দার্শনিক মতে তাহার একটীকে অথবা উভয়কে উড়াইয়া দেয়—সে মত কখন

অন্যদিকে কেবল অন্তঃপ্রবাহ স্বীকার করিয়া এই জগতের অস্তিত্ব আদৌ সিদ্ধ হয় না। তবে নিতান্ত বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, আমাদের জ্ঞান অন্তঃপ্রবাহ হেতু অবশেষে বিষয়াকারা হইয়া যে বিষয় উপলব্ধি করে, সেই বিষয়ও বাস্তবিক এই আকারের অনুরূপ। অর্থাৎ বিষয় আমাদের যেরূপ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, বিষয়ও সেইরূপ। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান জন্মে। অন্তঃকরণশক্তি পরিচ্ছিন্ন, আর ইন্দ্রিয়ের শক্তিও পরিমিত। ইন্দ্রিয় কেবল পাঁচ প্রকার গুণ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চক্ষু কেবল রূপ ও বর্ণ গ্রহণ করে; কর্ণ কেবল শব্দ গ্রহণ করে; এইরূপ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক একে একে কেবল গন্ধ রস ও স্পর্শ গ্রহণ করিতে পারে। অতএব আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, বাহ্যবিষয়ও এইরূপাদি পাঁচরূপ গুণযুক্ত। যদি বাহ্যবস্তুতে অন্য কোন গুণ থাকে, সেরূপ গুণ গ্রহণের ইন্দ্রিয় অভাবে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা পদার্থের রূপ ও বর্ণ দেখিতে পাই, সুতরাং পদার্থ সকলও এই রূপ ও বর্ণ গুণ যুক্ত। রস তরল পদার্থের গুণ সুতরাং তারল্য গুণযুক্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায়। গন্ধ কঠিন অণুর গুণ, অর্থাৎ গন্ধের সহিত নাসিকায় কঠিন অণু গ্রহণের শক্তির সম্বন্ধ অনুভূত হয়; এজন্য কঠিন পৃথিবী পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পাঁচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ধর্ম্ম যুক্ত বা এই ধর্ম্মের আধার ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম (কঠিন, তরল, আগ্নেয়, বায়ব ও আকাশ বা ইথর)-সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। (২)

সত্য নহে। ইঁহারা সেই জন্য উভয় প্রবাহ স্বীকার করেন। ইঁহারা বলেন, আমাদের অন্তঃকরণে কতকগুলি সহজাত সংস্কার আছে। যখন অন্তঃপ্রবাহ আরম্ভ হয়, তখন আমরা সেই সংস্কারগুলি সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাই, ও সেখানে বিষয় হইতে বাহ্যপ্রবাহ গ্রহণ করি। দেশকাল, কার্য্যকারণ সূত্র, আমিজ্ঞান, অনন্তের জ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি আমাদের সহজ সংস্কার আছে, তাহা বাহ্য প্রবাহ হইতে উৎপন্ন হয় না। বাহ্যপ্রবাহের সহিত তাহার সম্মিলন হয় এই মাত্র।

ফরাসি পণ্ডিত কুঁজে এই মত আরও বিস্তারিত করিয়া বুঝাইয়াছেন। অধুনা হ্যামিল্‌টন্ প্রভৃতি ইহার পোষকতা করেন।

---

(২) এই সম্বন্ধে এইস্থলে দুই একজন ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

ফিস্কে বলিয়াছেন—"We admit that matter does not exist as matter, save in relation to our intelligence; since what we mean by matter is a congeneries of qualities which have been severally proved to be mere names for divers ways in which our consciousness is affected by an unknown external agency. Take away these qualities and we freely admit with the idealist, that the matter is gone; for by matter we mean with the idealist, the phenomenal thing which is seen, tasted and felt. * * * We freely admit that what we mean by a tree is mearly a congeneris of qualities that are visual and tactual, and perhaps oderous, sapid, and sonorous."
Fiske's Cosmic Philosophy, Vol 1. p. 80.

হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন—"From the Psychological point of view, however, matter in all its properties is the unknown cause of the sensations it produces in us."

পণ্ডিত সপেনহরও বলিয়াছেন—"The five outer senses accomodate themselves to the four elements *i. e.* states of aggregation together with that of imponderability. Thus the sense of what is firm is touch, of what is fluid—taste; of what is in the the form of vapour or volatile—smell; of what is permanently elastic—hearing; of what is imponderable—sight."

এ সম্বন্ধে আরো বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ই এই পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত মন ও বুদ্ধির বা অন্তঃকরণেরও এই বাহ্য পদার্থের বা জগতের অন্যরূপ গুণ গ্রহণ করিবার স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ শক্তি আছে। এই শক্তি অন্তঃকরণের বেদনা স্পর্শ সংজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চস্কন্ধ হেতু আবরণ জনিত নহে। সুতরাং এই শক্তির গ্রহণীয় পদার্থের গুণও আছে, ইহা বলিতে পারা যায়। মনে কর, পদার্থের আকৃতি, বিস্তৃতি বা পরিমাণ ধারণা—তাহার রূপ হইতে ঠিক উৎপন্ন নহে। উহা রূপের সহিত আমরা গ্রহণ করি এই মাত্র। চক্ষুতে বাহ্য পদার্থের যে রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব বা ছায়া হইতে পদার্থ কত দূরে স্থিত ও কত দূর বিস্তৃত, তাহা জানা যায় না। সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির দ্বারা লাভ করিতে হয়। অতি শিশুকালে আমাদের সেই জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া কিরূপে তাহা লাভ করি, তাহা মনে থাকে না। কাজেই উহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয়। একথা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, বস্তুর পরিমাণজ্ঞান পরে সিদ্ধ হইলেও, তাহার স্থানব্যাপকতা গুণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। সেইরূপ কার্য্যকারণ সূত্রে বস্তুর পরিবর্ত্তন বা কালব্যাপকতা গুণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে আমরা যেমন পঞ্চভূতাত্মক বস্তুর ধারণা করিতে পারি, সেইরূপ বুদ্ধির উক্ত স্বতঃসিদ্ধ শক্তি হইতে আমরা সেই বস্তুর কালব্যাপকতা ও স্থানব্যাপকতা গুণ এবং দেশ কালের* অস্তিত্ব ও ক্রিয়ার অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

এই স্থানে আরও এক কথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় জড়। সুতরাং যাহা হইতে বা যে উপাদানে জগৎ উৎপন্ন, সেই উপাদানেই ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণ উৎপন্ন। ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, যখন আমাদের গ্রাহ্য রূপে বাহ্যজগৎ পাঁচভূতাত্মক, অর্থাৎ যখন কেবল বাহ্যপদার্থের রূপাদি পাঁচ গুণ মাত্র আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি, অন্য কোন গুণ পারি না; তখন বিষয়ের গ্রাহক রূপে আমাদের এই শক্তি পরিমিত তাহার কারণ এই যে, বাহ্য কোন পদার্থই এই পাঁচ গুণ ব্যতীত অন্য কোন গুণ যুক্ত নহে। থাকিলে তাহার গ্রহণোপযুক্ত ইন্দ্রিয়ও আমাদের থাকিত। কোন কোন বেদান্তবাদীদের মতে পঞ্চভূতের সত্তাংশ হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়াছে (৩)।

* মায়াবাদী বার্কলির মত এই:—"If by matter you understand that which is seen, felt, tasted and touched, then I say matter exists, then I am as firm a believer of its existence as any one can be."

(৩) আধুনিক জড়বাদীদিগেরও এইরূপ মত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"In lowest organisms we have a kind of tactual sense, diffused over the entire body; then through the impression from without and their corresponding adjustments special portions of the surface, become more responsive to the stimuli than others. The sences are nascent......the action of light in the first instance appears to be a mere disturbance of the chemical processes in animal organisms.......By degrees the action becomes localised in a few pigment cells, more sensitive to light than the surrounding tissues. The eye is here incipient......and through the operation of infinite adjustments at length reaches at the perfection that is displayed in the hawk and eagle. So of the other senses."

Tyndall's Inaugural address. p. 47-48.

বাহ্যপ্রবাহ স্বীকার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আন্তর প্রবাহ ধরিলেও এ সম্বন্ধে এই অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা আমরা বাহ্যজগতে যে রূপ গ্রহণ করিতে পারি বা তাহাতে আমাদের যেরূপ সামর্থ্য আছে, বাহ্যজগতও সেইরূপ (৪)।

প্রায় এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বাহ্য জগতের উপাদান বা প্রকৃত সত্তা যে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। আমাদের অন্তঃকরণশক্তি চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ইহার জ্ঞানশক্তি বা প্রকাশশক্তি আছে। সেইরূপ ইহার ক্রিয়া শক্তি আছে। আর নিদ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, মূঢ়তা প্রকৃতি গুণ যুক্ত একরূপ আবরণ শক্তিও আছে। তাহার দ্বারা এই জ্ঞান বা প্রকাশশক্তি ও কার্য্য শক্তি অভিভূত হয়। এই জ্ঞানশক্তিকে সত্ত্ব শক্তি, ক্রিয়াশক্তিকে রজঃ শক্তি ও আবরণ শক্তিকে তমঃ শক্তি বলে। যখন অন্তঃকরণ জড় উপাদানে গঠিত, তখন জড় মাত্রেই এই তিন শক্তি যুক্ত ও বাহ্যজগতও এই তিন শক্তিময়, ইহা অনুমান করা যায়। সাংখ্যদর্শনে এইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। এইরূপ যুক্তি বলে জগৎ সত্তা সম্বন্ধে আরও এক অনুমান করা যায়। রাগ, দ্বেষ হইতে আমাদের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। কার্য্যশক্তি এই রাগ দ্বেষ চালিত। আমরা, অনুরাগ বশে বা সুখলাভ হইবে, এই ধারণায় বস্তু গ্রহণে প্রবৃত্ত হই, আর বিরাগ বা দ্বেষ বশতঃ তাহা ত্যাগ করি। অতএব রাগ, দ্বেষ বা তাহা হইতে জাত আকর্ষণ ও ত্যাগ চেষ্টা আমাদের কার্য্যের মূল। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বাহ্যজগতে যে কিছু ক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, তাহাও এই অনুরাগ বিরাগজনিত আকর্ষণ ও বিক্ষেপ মূলক। এই জন্য কোন কোন দার্শনিক পরমাণুর অথবা ভূতগণের এই রাগ দ্বেষ হেতু জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেমন আমরা বাসনা চালিত—যেমন বাসনা-বীজ হইতেই আমাদের অন্তঃকরণ সৃষ্ট ও পরিচালিত, সেইরূপ বাহ্যজগতের প্রত্যেক পদার্থই এইরূপ বাসনা-চালিত। নানা রূপ জড় ও জৈব শক্তি এই বাসনারই রূপান্তর মাত্র। বাসনাই জগতের মূল সত্তা—ইহাই জগৎবীজ। পণ্ডিত সপেনহর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণেরও প্রায় এইরূপ মত, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল অন্তঃপ্রবাহ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহা হইতে অথবা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির শক্তি ও সংস্কার হইতে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা সহজে সম্ভব হয় না। অন্তঃপ্রবাহ হইতে আন্তর জগতের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাহার ঠিক অনুরূপ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও চলে, না করিলেও চলে (৫)। অর্থাৎ ইহা হইতে বহির্জগৎ আছে

(৪) দার্শনিক ফিক্তে বলিয়াছেন,—

"Possibilities of things are limited by the possibilities of thought, this sort of idealism cannot be overturned."

পণ্ডিত লুইস্ (G. H. Lewis) বলিয়াছেন,—

"What we call the material process is simply the objective aspect of the subjective process."

জর্ম্মাণ পণ্ডিত হেগেল বলিয়াছেন,—

"Possibilities of thought are not only coextensive but identical with the possibilities of things."

(৫) ইংরাজিতে Relative motion বা আপেক্ষিক

বা নাই, উভয়ই সিদ্ধান্ত করা যায়, অথবা সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর যদি একান্তই বহির্জ্জগৎ সিদ্ধান্ত করিতে হয়—তবে আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তিতে কল্পিত এই বৃত্তির বিষয়াকার বা জগদাকার প্রাপ্ত অবস্থার অনুরূপ বাহ্যজগতই আমরা ধারণা করিতে পারি। তদতিরিক্ত জগৎ ধারণার ক্ষমতা আমাদের নাই (৬)। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের সকলের অন্তঃকরণ বৃত্তি সমান নহে—সকলের বৃত্তি সমান রূপ মলিন নহে, সুতরাং বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকলের জ্ঞান সমান নহে। প্রত্যেকে তাহার নিজ জ্ঞান-কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া জ্ঞান পরিধি যতদূর বিস্তার করিতে পারে, বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে তাহার ততদূর জ্ঞান সম্ভব হয়। (৭)

এখন কথা হইতেছে। যদি আন্তর কল্পিত

গতি বলিয়া একটী কথা আছে। এই আপেক্ষিক গতি হইতে নৌকাযাত্রী তীরস্থ অচল বৃক্ষ সকল সচল মনে করে। বহু দূরস্থ সচল নক্ষত্র অচল মনে হয়। স্থির সূর্য্যকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ মনে হয়। অনেক আপাতদৃষ্ট এই আপেক্ষিক গতি-জনিত ভ্রম দূর করিতে বহুকাল লাগে, অথবা, আদৌ তাহা দূর হয় না। সূর্য্যের গতি সম্বন্ধে ভ্রম আজিও আমাদের দূর হয় নাই, হইতেও পারে না। সুতরাং সত্য সত্যই যদি বাহ্যজগত দিককাল স্থিত হইয়াও আমাদের অন্তঃকরণের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব না থাকে, তবে এই আপেক্ষিক গতি নিয়মানুসারে উহা আমাদের বাহিরে স্থিত বলিয়া যে বোধ আছে, তাহা দূর হইবে না। এ মায়া সেই জন্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত। অঙ্ক শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, এই আপেক্ষিক গতি ধরিয়া যে গণনা করা যায়, তাহাতে ভুল হয় না। সূর্য্য স্থির বা গতিহীন, নিরয়ন বা সায়ন যাহাই ধরা হউক, তাহা হইতে জ্যোতিষ গণনায় ভ্রম হয় না। সুতরাং বাহ্য জগতের অস্তিত্ব কেবল অন্তরেই থাকুক বা বাহিরেই থাকুক, তাহা আপেক্ষিক। ব্যবহারিক ভাবে উভয়েরই ফল সমান। আমাদের শরীরও বাহ্য জগতের অন্তর্গত। সুতরাং সে সম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

(৬) দার্শনিক মিল বলিয়াছেন যে,—Permanent possibilities of sensation হইতেই জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায়।

মিল অন্যত্র বলিয়াছেন,—"The true nature and meaning of the externality is that our sensation occur in groups held together by permanent law, which come and go independently of our volition or mental process."

ফিস্কে বলিয়াছেন,—"The active antecedent of every primary feeling exists, and that is the only thinkable hypothesis."

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন,—"Not a step can be taken towards the truth that our states of consciousness are the only things we know, without tacitly or avowedly postulating an unknown something beyond consciousness."

কোন কোন আর্য্য পণ্ডিত ঠিক মিল সাহেবের অনুরূপ এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করেন, যথা—

"প্রমাণান্তর সামান্য স্থির বস্তুধিয়াং গতে,
প্রমাণান্তর সদ্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কস্যচিৎ।"

কেহ কেহ বলেন, সহোপলব্ধি নিয়মে বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কুসুমাঞ্জলিতে আছে—

"সাক্ষাৎকারিনি নিত্যযোগিনি পরদ্বারানপেক্ষস্থিতৌ,
ভূতার্থানুভবে নিবিষ্ট নিখিল প্রস্তাবি বস্তুক্রম।"

অর্থাৎ "যাহা সকলের প্রত্যক্ষ, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা স্বয়ং সিদ্ধ, তাহা যথার্থ অনুভবে, যিনি (শিব) নিখিল প্রস্তাবি বস্তুক্রম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।"

(সর্ব্ব দর্শনোদ্ধৃত বাক্য)

সুতরাং কেবল যুক্তির দ্বারা জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিবার উপায় সর্ব্বত্রই একরূপ। কিন্তু এ উপায় সমিচীন নহে।

(৭) একভাবে আমরা ইহা হইতে বলিতে পারি যে, এই জন্য আমরা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর—অর্থাৎ সমস্ত বাহ্যজগৎ আমাদের অন্তরেই রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানময় ব্যতীত আর কাহারও এই কথা বলিবার অধিকার নাই। মায়াবদ্ধ জীব আমরা মুখ ব্যাদান করিয়া জ্ঞানের উদরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে পারি না।

নগতাতিরিক্ত জগৎ আমরা না পাই, তবে বাহ্যজগৎ আছে, ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সাংখ্য দর্শন-বলেন :--(৮)

"অবাধাৎ অদুষ্টকারণজন্যত্বচ্চ নাবস্তুত্বম্। (১।৭৯)। এবং "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ (১।৭৮)।

এইরূপ বেদান্ত সূত্রে আছে, "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এবং "নাভাব উপলব্ধেশ্চ।"

কি জড়বাদী, কি বিজ্ঞানবাদী সকলেই এইরূপ যুক্তি হইতে জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু কেবল বাহ্য প্রবাহ বা আন্তর প্রবাহ মাত্র স্বীকার করিলে জগৎ বা আত্মার অস্তিত্ব অকাট্য রূপে সিদ্ধ হয় না। এই জন্য অনেক দার্শনিক বাহ্য প্রবাহ বা আন্তর প্রবাহ উভয়রূপ প্রবাহই স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইহারা বলেন যে, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি যখন উত্তেজিত হয়, তখন সেই জ্ঞান চেষ্টা অন্তঃকরণ বৃত্তি পথে বহির্মুখী হয়। সেই রূপ বাহ্য বিষয় হইতেও একরূপ শক্তি ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় সমীপে নীত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই শক্তি ক্রিয়া স্নায়ুপথে মন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের আশ্রয় মস্তিষ্কে গমন করে। সেই স্থানে এই প্রবাহ অন্তঃকরণের জ্ঞান প্রবাহ সহিত সম্মিলিত হয়। এই উভয় প্রবাহ সম্মিলনেই আমাদের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। বাহ্য জগতে যে শক্তি তরঙ্গের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই শক্তি তরঙ্গই ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করে। সেই আঘাত হইতেই আমাদের জ্ঞান নাড়ী কম্পিত হয়। সেই কম্পন হইতে একরূপ শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের মস্তিকে বা সহস্রারে গিয়া সেই মস্তিক অধিষ্ঠিত চৈতন্যের সমীপবর্ত্তী হয়। এদিকে চৈতন্যের সন্নিকর্ষ হেতু জ্ঞান চেষ্টা অন্তঃকরণে স্ফুরিত হয়—তবে সেই চেষ্টা জনিত অন্তঃকরণ বৃত্তির ক্রিয়ার সহিত মস্তিকস্থ জ্ঞান স্নায়ুর পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সংস্পর্শ হয়। ইহাই উভয় প্রবাহের সম্মিলন। ইহা হইতেই যুগপৎ-অহং ও-ইদং-আকার জ্ঞানের উদয় হয়। এস্থলে আর বলিবার প্রয়োজন নাই যে, অন্তঃকরণ বৃত্তির পূর্ব্বোক্ত মলিনতা জন্য এই উভয় প্রবাহই কতক পরিমাণে রুদ্ধ হয় ও সেই জন্য প্রকৃত জ্ঞান সহজে এরূপে উৎপন্ন হয় না।

আরও এক ভাবে এই উভয় প্রবাহ কল্পনা করা যাইতে পারে। আমরা বলিতে পারি যে, অন্তঃকরণ হইতে প্রথমে জ্ঞান-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমে ইন্দ্রিয়পথে বাহিরে আসিয়া বাহ্য বিষয়ে পতিত হয়। এই রূপ জ্ঞান বিষয়াকার হইয়া সেস্থানে অর্থাৎ সেই বিষয় হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহাই বহিঃপ্রবাহ রূপে আবার

(৮) এস্থলে বিলাতী পণ্ডিত ডেভিস্ সাহেবের মতও পুনরুল্লেখ করা কর্ত্তব্য, তিনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন——

There is no idealism in the system of Kapil. Both consciousness and all existing external forms have a real objective being independent of the soul. In one respect he coincides with the view of Kant, for both agree that we have no knowledge of the external world, except as by the action of our faculties, it is represented to the soul and take as granted the objective reality of our sense perceptions. In one respect there seems to be in the Hindu theory a germ of the system of Hegel, in which subject and object are made one by an absolute synthesis for the substratum of thought and consciousness and of the external world is the same in kind.

Hindu Philosophy, P. 20.

ডেভিস সাহেব বুঝেন নাই যে, এ বিষয়ে হিন্দু দর্শনের বিশেষতঃ বেদান্তের মীমাংসা কাণ্ট ও হেগেল অপেক্ষা আরও পরিষ্কার ও পরিস্ফুট।

ইন্দ্রিয়পথে অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। এইরূপ অন্যদিকেও আমরা বলিতে পারি যে, বাহ্য বিষয় হইতে প্রথমে শক্তি প্রবাহ উৎপন্ন হয়। তাহা ইন্দ্রিয় পথে অন্তঃকরণে বা অন্তঃকরণাধার মস্তিষ্কে নীত হয়। সেখানে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাই পুনর্ব্বার বহির্মুখী হয় ও বাহ্য বিষয়ে গিয়া তাহা জ্ঞানাকারে পরিণত হয়, আবার এই উভয় প্রবাহ স্বীকার করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, প্রথম যে শক্তিতরঙ্গ বিষয় বা বাহ্য বস্তু হইতে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়পথে গিয়া অন্তঃকরণে আঘাত করে, তাহা কেবল অন্তঃকরণকেই উত্তেজিত করে, তাহার জ্ঞান প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি করে, ইহাতে যদি অন্তঃকরণ উত্তেজিত হয়, তবেই প্রকৃত অন্তঃপ্রবাহ আরম্ভ হয়। তবেই অন্তঃকরণ হইতে এই প্রবাহ বহির্মুখী হইয়া বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। যোগশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বলিতে গেলে,এই বলিতে হয় যে, প্রথমে জগদাধার শক্তি তাঁহারই স্বরূপ আমাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করেন বা জৈব শক্তিতে কার্য্যাভিমুখ করেন। সেই শক্তি সহস্রারে, মস্তকে, কলের ঘরে আপনি সংবাদ দেন। তখন চৈতন্য জাগরিত হয় অথবা জ্ঞান যুক্ত বৃত্তি হয়।

যাহা হউক, যতদূর বলা হইল, তাহা হইতে এই বুঝা যাইবে যে, বাহ্য ও আন্তর, এই উভয় প্রবাহ স্বীকার করিলে বাহ্য ও আন্তর পদার্থ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য বা আত্মা, এ উভয়ই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এবং জ্ঞানে এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বা ঘাত প্রতিঘাত হয়, ইহাও মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞাতা বা আত্মময় অহং এর সহিত অনাত্ম জড়ের সম্বন্ধ হয়, এবং তাহাই জ্ঞানের কারণ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সেই রূপ ইচ্ছাময় অহং এর সহিত জড় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে, ইহা অনুমিত হয়। আমি যখন হাত তুলিব মনে করি, তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী না হইলে আমি সেই হাত উঠাইতে পারি। এস্থলেও জড় ও চৈতন্যের সহিত বা আত্ম এবং অনাত্মার সহিত কি এক অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হয়। জড় ও চৈতন্য উভয়েই বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। একের বিস্তৃতি আকৃতি আছে। অপর বিস্তৃতি ও আকৃতি হীন। আত্মা এক, অনাত্ম বস্তু বহু। আত্মা নিত্য জড় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। অতএব এই জড় ও চৈতন্য পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত পদার্থ দ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব? জড় কিরূপে চৈতন্যগ্রাহ্য হয়, আবার চৈতন্য বা কিরূপে জড় বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়! সুতরাং উভয় প্রবাহবাদ মানিতে গেলে এই বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে ইহার মীমাংসা হইতে পারে। ইহার প্রথম মীমাংসা এই যে, জড় ও জীবাত্মার অতিরিক্ত আর এক সত্তা আছেন। তাঁহাকে ব্রহ্ম পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলিতে পারা যায়। তাঁহারই কৃপায় বা অনুগ্রহে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী আত্মচৈতন্যের ও জড়ের সংযোগ হয়। অর্থাৎ এই ভগবৎ সংযোগই আমাদের জ্ঞানের কারণ। এই সিদ্ধান্ত হইতে সুতরাং আমার পরমাত্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। কেন না, এই পরমেশ্বর কারণ না ধরিয়া লইলে জড় ও চৈতন্যের সংযোগ

আমরা কোনরূপে কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের জ্ঞানোৎপত্তির কোনরূপ কারণই ধরিয়া লইতে পারি না। আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে দেঃ কার্ডে, জিউলিক্স্ ও লিব্‌নিট্‌স্ অনেক পরিমাণে এই মতাবলম্বী (১)। আমাদের দেশে এ মত প্রচলিত হইয়াছিল।

এই মত আরও এক প্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মজ্ঞানে এই জগৎ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। তিনি চিন্ময় বা চৈতন্য স্বরূপ। এই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে বাহ্যজগৎ নিত্য প্রতিভাত। আমাদের চৈতন্য তাঁহারই অংশ বিম্ব বা প্রতিবিম্ব মাত্র। কাজেই আমরা আত্মময় হইয়াও অনাত্ম জগৎ বা বাহ্য বস্তু জ্ঞানে ধারণা করিতেপারি।

ইহা ব্যতীত যে দ্বিতীয় প্রকার মীমাংসার কথা বলিয়াছি, সেই মীমাংসা অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে জড় ও চৈতন্য, আত্মা ও অনাত্ম বস্তু উভয়ই বাস্তবিক একই পদার্থ—ইহাই ব্রহ্ম। এই একেরই ব্যবহারিক ভাবে দুইরূপে অভিব্যক্তি হয়। এক জগৎ রূপ আর এক জীবাত্মা রূপ। ভগবদ্গীতা হইতে আমরা এই কথা আরও একটু বিশদ করিয়া বুঝাইব। ব্রহ্মের বা পরমপুরুষের দুইরূপ প্রকৃতি বা বিকাশ নিত্য। এই দুইরূপ প্রকৃতির একের নাম পরা প্রকৃতি। অন্যের নাম অপরা প্রকৃতি।

---

(১) পণ্ডিত মোক্ষমূলার প্রণীত কান্ট দর্শনের (Critique of pure Reason) অনুবাদ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আছে—

"Philosophers attempt to gulf the bridge (an impassable gulf) between the spiritual world and the material world... .. This difficulty to bridge the gulf has been always felt by philosophy. Matter cannot create consciousness (and *vice versa.*) So that the attempt to illiminate one of them (either in Idealism or in materialism) has always proved difficult—unless a dodge is adopted."

Des Cartes bridged the gulf between spirit and matter by the conception of the unity of God—so that the miracle, the bridging is caused by divine power ;—that is by divine power, cooperation of the external substance with spiritual consciousness is effected. (So that according to him mechanical motion of our sense organs produce the idea of external objects, and will of the soul moves the body in a determined way.

Geulinx introduced what is called *occasionalism.* He held that the mutual influence between mental and physical processes is incomprehensible, unless God is believed to call up the idea in the mind, on the occasion of bodily processes ; or on the occasion of the acts of the will, God is believed to cause corresponding bodily movement......So that by God the gulf between the world and the conception of it is directly bridged.

Leibnitz introduced the doctrine of *pre established harmony.* According to him every monad (*e. g.* man) is a living mirror, (a microcosm) which reflects the entire universe (macrocosm) under its own point of view. There is a natural relation between the monads,—this harmony has its reason in the wisdom of the supreme director.......There is between body and soul no reciprocity of action—but simple correspondence : they would be like two watches wound up it the same hour, which corresponds exactly—but whose interior movements are perfectly distinct (Vide Cousin's History of philosophy.)

লিবনিট্‌স্ আরও বলিয়াছেন—Intelligence derives knowledge from the senses. But intelligence is original faculty and engenders notions which added to those that spring from the simultaneous exercise of the sensibility complete and constitute the entire domain of human knowledge.

উল্লিখিত দার্শনিকগণ উভয় প্রবাহবাদী। পূর্ব্বে আরিষ্টটেল, ডাইও নিসিয়স্ প্রভৃতি এই উভয় প্রবাহবাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকগণ এই উভয় প্রবাহবাদী। আধুনিক ইউরোপে স্কচ্ দার্শনিকগণ এই মত প্রচারিত করেন—তাহা পূর্ব্বে টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

আরিষ্টটেল বলিয়াছেন—"Reason has the potentiality to form general notions : direct experience is the material of abstract thought."

ডাওনিসিয়স্ বলিয়াছেন—"Two ideas flow, the first descends from God to the world and the second from the world to God, by thinking away."

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। (৭।৪-৫)

ব্রহ্মের এই দুইরূপ নিত্য বলিয়া বলা হইয়াছে যে,—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। (১৩.৪৯)

অন্যত্র আছে,

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ (১৫।৭)

আরও একস্থানে আছে।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিতদ্বিদঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। (১০।১-২)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাস্তবিক অহং ইদং, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, জড় চৈতন্য সকলই এক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মী হইলেও একই সদ্বস্তুর ভিন্নরূপ অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং জড় ও চৈতন্যের বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য। জীবাত্মা ব্রহ্মের চৈতন্য রূপ, আর জগৎ তাঁহার সৎরূপ। ক্ষেত্র বা শরীর এই উভয়ের সংযোগে জগৎ, সুতরাং এই রূপে আমরা বলিতে পারি যে, একই প্রবাহ প্রথমে ব্রহ্ম-কেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া অন্তঃকরণ পথে জীবচৈতন্যরূপে বহির্ম্মুখী হয়— আর জগৎরূপে বিষয়াকার হইয়া তাহাই অন্তঃকরণ পথে চৈতন্যমুখী হয়। এই উভয়ের সংযোগেই বোধ বা উপলব্ধি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর এই সংযোগ জীবাত্মায় নিত্য বলিয়া জীবাত্মাকে নিত্যবোধ বা নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই জন্য হস্তামলকে আছে, "আত্মা "নিত্য বোধ স্বরূপং" ও" স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহং আত্মা।"

যাহা হউক, এই জ্ঞানপ্রবাহ অন্তঃকরণ পথ দিয়া গতায়াত করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অন্তঃকরণ স্বচ্ছ নহে। কাজেই বাহ্য বিষয় বা জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এ উভয়ের স্বরূপ ও একত্ব আমরা জ্ঞানবলে উপলব্ধি করিতে পারি না। যদি এমন কোন উপায় থাকে যে, তাহার দ্বারা অন্তঃকরণকে স্বচ্ছ করিতে পারা যায়, তবেই জ্ঞেয় জগত মধ্যে কেবল ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে, আর জ্ঞাতা ও আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন আমাদের জ্ঞান ব্যবহারিক, বা ভ্রান্তিপূর্ণ, সীমাবদ্ধ —আবৃত। অন্তঃকরণ স্বচ্ছ না হইলে অন্তঃকরণের সমগ্র সংস্কার রাশি একেবারে নষ্ট হইয়া না যাইলে, কখন আমাদের পারমার্থিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আমরা এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীর ১—৩ শ্লোক হইতে আরও বলিতে পারি যে, অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত জীব চৈতন্য—নিত্য অপরিচ্ছন্ন চৈতন্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া আছে। তাহা নিত্যই বিষয়ের দিকে মুখ করিয়া আছে। এইজন্য বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ হইয়া আছে। এইজন্যই ব্রহ্ম তাহার নিকট, রাত্রে সূর্য্য যেমন অপ্রকাশিত, সেইরূপ অপ্রকাশিত। কেবল সেই ব্রহ্মজ্যোতি প্রতিবিম্বে প্রকাশিত বিষয়ই তাহার নিকট দিবসের ন্যায় প্রকাশযুক্ত। তবে যদি কোনরূপে জীব চৈতন্য মুখ ফিরাইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে ও বিষয় রাত্রে জগতের ন্যায় অপ্রকাশিত হইয়া যাইবে। এই মুখ ফিরান যতদিন সম্ভব না হয়, ততদিন ব্রহ্ম দর্শন বা মুক্তি হয় না। প্লেটো যেমন বলিয়াছেন, অন্ধকার গুহাভিমুখে সম্বন্ধ দৃষ্টি গুহায় আবদ্ধ জীব পশ্চাৎ ফিরিতে পারে না, কেবল পশ্চাতের বস্তু

আলোকিত হইলে গুহামধ্যে তাহার ছায়া মাত্র দেখিতে পায়; আমাদের বদ্ধ বিষয়াভিমুখ জ্ঞানের অবস্থা সেইরূপ। এই জন্য ভগবদ্গীতায় আছে—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ।২।৬৯

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বার-ভুঞা।

কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়।

ডাক্তার ওয়াইজ বারভূঞা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছেন, * তৎপাঠে মাত্র পাঁচটী ভৌমিকের বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কন্দর্পনারায়ণ একজন ভূঞা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। †

"আকবরনামা" গ্রন্থে কন্দর্প স্থলে দর্পনারায়ণ উল্লেখ করা হইয়াছে। "আইন-ই-আকবরি" গ্রন্থে কন্দর্পের পিতামহ পরমানন্দ (প্রেমানন্দ) রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এই পরমানন্দ রায় হইতে চন্দ্রদ্বীপে বসু রাজবংশের রাজত্ব প্রথম আরম্ভ হয়।

ওয়াইজের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, কর্ণাট প্রদেশ হইতে আগত হইয়া মহাত্মা নিমুরায়, আকবর বাদসাহের রাজত্বের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে, বিক্রমপুরান্তর্গত আগাফুলবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। খ্যাতনামা চাঁদরায় ও কেদার রায় ঐ রায়ের বংশে উদ্ভূত হন। এই রায় উপাধির রাজগণ "দে" বংশীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ‡

১৫০৬ খ্রীঃ অব্দে খ্যাতনামা আকবর সাহ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎপূর্ব্বের একশত বৎসর গণনা করিলে ১৪০০ খ্রীঃ অব্দ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে পাঠান রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন; তৎপর রাজা গণেশ অভ্যুদিত হইয়া পাঠানদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। সম্ভবতঃ নিমুরায় এই কায়স্থ বংশীয় রাজা গণেশের অধীনে কোন কার্য্য গ্রহণ করিয়া কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন করেন; পরে রাজকার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়া বিক্রমপুরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ স্থাপয়িতা দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুরবাসী ও "দে বংশীয়" বলিয়া পরিচিত। প্রবাদানুসারে তাঁহার পরিচয় যদিও ৬০৬ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৮ খ্রীঃ অব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ সময়ে বকতিয়ার খিলিজী সেনরাজগণকে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপ অধিকার করে। সেনরাজগণ তৎকালে পুরুষোত্তম অথবা বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। তৎপর সেনবংশধরেরা প্রায় আরও শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ দনুজকে যাঁহারা সেনবংশীয় বলিতে চাহেন, সন হিসাবে তাঁহারা কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

সেনবংশীয় দনুজ মাধব ও এই দনুজ

---

* এসিয়াটীক সোসাইটীর জারনেল ৪৩ সংখ্যা।

† ফজলগাজী, কেদার রায়, লক্ষ্মণ মাণিক্য, কন্দর্পরায়, ঈশা খাঁ।

‡ এসিয়াটীক সোসাইটীর জারনেল ৪৩ সংখ্যা ২০২ পৃষ্ঠা।

মর্দ্দন দে যে পৃথক ব্যক্তি, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দনুজ রায়ের পরবর্ত্তী পুরুষে হয় বল্লাল বা পোড়া রাজা * বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তৎবিবরণ ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী প্রকরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাসের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যমত দেখা যায়। বিশেষতঃ এই দনুজা মাধার রাজত্ব সময়ে, সম্রাট বুগবন, মুঘিসুদ্দীন তুগলকের দমনার্থ আগমন করিলে পর, দনুজ সম্রাটের সাহায্য করিয়াছিলেন; দনুজ তৎসময় বিক্রমপুরেই রাজত্ব করিতেন। তৎপরবর্ত্তী ২য় বল্লালও বিক্রমপুর অথবা সোণার গাঁ থাকিয়া বাও আদম নামা মুসলমান সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় ঐ দনুজকে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন মতেও সঙ্গত বোধ হয় না।

আমাদের বিবেচনায় বিক্রমপুরের ও বাকলার দে বংশীয় রাজগণ একই মহাত্মার বংশোদ্ভূত ছিলেন। কর্ণাট প্রদেশ হইতেই তাঁহারা বঙ্গে আগমন করেন এবং বংশ বিস্তৃতির সহিত পরে নানাস্থানে রাজ্যবিস্তার করেন। ৬০৬ বঙ্গাব্দে দনুজ মর্দ্দন অথবা বিশ্বেশ্বর সুরের অভ্যুদয় সম্পূর্ণ অলীক।

এখন দনুজ মর্দ্দন কিরূপে বাকলা দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হন, তৎবৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, কাত্যায়নী দেবীর উপাসক ছিলেন; চন্দ্রশেখর বিবাহ সময়ে জানিতে পারিলেন, তাঁহার নব পরিণীতা বনিতা ও উপাস্য দেবী একই নামে অভিহিতা। তখন তৎমস্তক ঘূর্ণিত হইয়া গেল, ভাবিতে লাগিলেন, এখন কিরূপে ইষ্টদেবীর নাম গ্রহণ সময়ে তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করা যাইবে। এই চিন্তায় বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ, যে সময়ে চন্দ্রশেখর এক তরি আরোহণ করিয়া অকূল সাগরজলে ভাসিতেছিলেন, তৎকালে দেখিতে পান, এক ধীবর বালিকা ঐ অসীম জলরাশি মধ্যে এক মাত্র ক্ষুদ্র নৌকারোহণে, মৎস্য ধৃত করিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে যারপরনাই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে এবং কোন্ সাহসে একাকিনী এই অকূল পারাবারে অবস্থান করিতেছ? তদুত্তরে ঐ ললনা বলিল, আমি মদীয় প্রিয় ভক্তের অপেক্ষায় এই সলিল মধ্যে অবস্থান করিতেছি, তাহার ভ্রম নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য, তাহার স্ত্রীর নামের সহিত আমার নামের ঐক্যতা প্রযুক্ত, সে কিরূপে আমাকে মাতৃভাবে সম্বোধন করিবে, এই চিন্তাযুক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সে যদি বুঝিত, জগতস্থ যাবতীয় নর নারী ও অন্যান্য বস্তু নিচয় আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমার অংশ সম্ভূত, তাহা হইলে কখনও গৃহ বা স্ত্রী পরিত্যাগ করিত না। বালিকার উপদেশ পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবী আবির্ভূতা হইয়া ভক্তের সন্দিগ্ধতা দূরীভূত করিতেছেন। তখন ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ আমার ভ্রম এতদিনে বিলয় প্রাপ্ত হইল; এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়? দেবী বলিলেন, যাও বৎস, এখন তুমি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণীতা বণিতা

* শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, ৬১।৬২ পৃষ্ঠা।

সহ সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

দেবী আরও বলিলেন, এই যে অকূল সলিলরাশি বিদ্যমান দেখিতেছ, উহা অতি সত্বরে বিলীন হইয়া যাইবে এবং এই স্থান দ্বীপে পরিণত হইবে। কিছুদিন পরে তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া কিঞ্চিৎ জলে অবগাহনান্তে অন্বেষণ করিও, তবেই আমার প্রতিকৃতি কাত্যায়নী ও মদনগোপাল বিগ্রহ-দ্বয় প্রাপ্ত হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিয়া এই স্থানে সংস্থাপন করাইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় এই প্রদেশের রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি সংসারাসক্ত নও, অতএব রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? প্রবাদ শুনা যায়, দেবীর আদেশ মত চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উহা আপনার প্রিয় শিষ্য বিক্রম-পুর-নিবাসী দনুজ মর্দ্দন দেকে সমর্পণ করেন। দনুজ দেবী-নির্দ্দিষ্ট চড়াতে ঐ কাত্যায়নী দেবী ও মদনগোপাল সংস্থাপন করিয়া স্থানের নাম গুরুদেবের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাখিয়াছিলেন। এই হইতেই দনুজ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন; এই মহাপুরুষই চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

প্রবন্ধান্তরে বলা হইয়াছে যে, সমতট বঙ্গের পূর্ব্ব ও দক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলি, যাহা অধুনা দৃষ্ট হয়, অধিকাংশ সমুদ্র জলে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে চড়া পড়িয়া উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপবৎ ভূখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্ম পুত্র এবং গঙ্গা এই উভয় নদ নদী কর্ত্তৃক উচ্চ ভূভাগ হইতে পঙ্কিল প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি বিধৌত হইয়া স্রোত বেগে যেস্থানে আসিয়া কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তথায়ই এইরূপ দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান সোন্ধা বা সুগন্ধা নদীর জল নিঃসরণের সহিত উদ্ভূত হয়। প্রবাদ আছে, মহাদেব যখন সতীর মৃত্যু জনিত শোকে কাতর, হইয়া ঐ মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া পর্য্যটন করিতে-ছিলেন, তৎ সময় বিষ্ণু তদীয় চক্র দ্বারা ঐ শব ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই কারণে সতীর দেহ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে পতিত হয়। ঐ স্থানগুলি পীঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত, সোন্ধারকূলে এইরূপে দেবীর নাসিকা পতিত হওয়ায় উহার নাম সুগন্ধা। পরে ঐ নদী ক্রমে মজিয়া যাওয়ায় বিস্তৃত ভূভাগের সৃষ্টি হয়, পূর্ব্বে সোন্ধার কূল বলিয়া একটা পরগণার পরিচয় ছিল, পরিণামে উহা সিলেমাবাদ ও হাবেলী সিলে-মাবাদ পরগণাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপ সম্ভবতঃ এই সুগন্ধার মধ্যে নিমগ্ন ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া কোন পরগণার পরিচয় পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরি ও আকবরনামাতে উহার নাম, বাকলা বা ইসলামপুর। এজন্য বোধ হয় যে, বাকলা নামের বহু কাল পরে চন্দ্রদ্বীপ নামের পরিচয় হইয়াছে। আইন-ই-আকবরিতে বাকলা সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা উল্লেখ করা গেল।

"সরকার বাকলা- মহালের সংখ্যা চারি, রাজস্ব ৭১৩-৬৪৫ দাম, ইসলামপুর (বাকলা) ৪৩৪৭৯৬০, শ্রীরামপুর ২৫০০০০০, সাজাদপুর ৯৭৭২৪৫। আদিলপুর (ইদিলপুর) ১৫৫৩৪৪০ এই সরকারে ৩২০ অশ্বারোহী, ১৫০০০ হাজার পদাতি সরবরাহ করিত।" পৃথক

পৃথক জমিদারেরা এই সকল পরগণাগুলি ভোগ শাসন করিতেন মাত্র, বাকলা সরকারে অন্যান্য সরকারের মত এক একজন কালেক্টর ও ফৌজদার অবস্থান করিতেন। বাখরগঞ্জের জেলাতে যতগুলি পরগণার পরিচয় পাওয়া যায়, উহার অধিকাংশ পূর্ব্বে বাকলা পরগণার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল *, পরে পৃথক পরগণাগুলি ঐ বাকলা হইতে বাহির হইয়াছে। সাধারণতঃ আরিয়াল খাঁ নদীর দক্ষিণ, বলেশ্বরের পূর্ব্ব, মেঘনার পশ্চিম ও সমুদ্রের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগ বাকলা বলিয়া পরিচিত ছিল। অদ্যাপি বাখরগঞ্জের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আপনাদিগকে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাকলার রাজা পরমানন্দ রায়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমানন্দ বসু বংশীয় ছিলেন; মাতামহের সিংহাসন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। পরমানন্দকে রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করায় বোধ হয়, পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুহ শ্বশুরের রাজ্য প্রথম প্রাপ্ত হন, কিন্তু উহা সম্ভবপর বোধ হয় না। দে বংশীয় শেষ রাজার পরেই পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হন।

দে বংশীয় রাজাদের বংশাবলী।

দনুজমর্দ্দন
|
রামনাথ
|
জানকীবল্লভ
|
রামবল্লভ
|
শ্রীবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
কন্যা কমলা
|
পরমানন্দ বসু

মিঃ বিভারেজ রাজবংশের তালিকা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন *, কোন কোন মতে শ্রীবল্লভের পুত্র জয়দেব দেব, তৎকন্যা কমলা। বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থমতে—

দনুজমর্দ্দন
|
রমাবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
জয়দেব দেব
|
কমলা

এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মতামত এবং বসু রাজবংশের বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমশঃ

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

* বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সলিমেনাবাদ (সেলিমাবাদ) সরকার খালিফেতাবাদের ও সাবাজপুর সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ দেখ।

সাহিত্য-সংবাদ।

শিয়ালের কাঁঠাল চুরির গল্প অনেকে শুনিয়াছেন। একটা শিয়াল গাছে চড়িয়া কাঁঠাল পাড়িয়া দেয়। আর একটী কাঁঠালটী মাথায় লইয়া এক হাতে ধরিয়া অবশিষ্ট তিন হাত পায় চলিয়া যায়। গল্পটী অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু শৃগালের এমন কার্য্য কখন দেখি নাই। কেহ চক্ষে

দেখিয়া থাকিলে, কি দেখিয়াছেন, বর্ণনা করিলে বাধিত হইব।

শিয়ালের কাঁঠাল চুরির ন্যায় ইঁদুরের ডিম ও তেল চুরি প্রসিদ্ধ। ইঁদুরে ডিম চুরি করিয়া লইয়া যায়; একটী ডিমও ভাঙ্গে না। হাতে করিয়া লয়, গড়াইয়া লয়,—না মাথায় বহিয়া লয়?

কপোত কপোতীর সতীত্ব চির প্রসিদ্ধ। কিন্তু একথাটী কি সত্য? গৃহপালিত কুক্কুটদিগের মধ্যে সতীত্ব দেখা যায় না। হংসদিগের মধ্যে বোধ হয় সতীত্ব আছে। বিরহে বিধবা হংসীকে আত্মহত্যা করিতেও দেখা গিয়াছে। গৃহপালিত পারাবতের মধ্যে অসতীত্ব আমি কখন দেখি নাই। কিন্তু গৃহবাসী চটকদিগের মধ্যে সতীত্ব নাই বলিয়া বোধ হয়, তবে যেরূপ সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই বলিয়া কথাটী নিঃসংশয়ে বলিতে পারিতেছি না। বসন্তে তরুশাখে যে কোলাহল হয়, সে কি কেবল কুমার ও কুমারীদিগের প্রণয় বিবাদ ও প্রণয় আলাপ, অথবা বৃদ্ধাদিগের মধ্যেও অক্ষম স্বামীকে ছাড়পত্র দিয়া নিকা করিবার নিয়ম আছে। পক্ষী বৃদ্ধাদিগের মধ্যেও কি লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় নার মত কোন প্রবাদ প্রচলিত আছে? কুমারী কন্যা নির্ব্বিবাদে মনোমত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পারে, সে জন্য কি বৃদ্ধা মাতৃগণের মধ্যে বিবাদ হয়? এত গোলমাল কিসের? এ কথাটা লইয়া গোলড্‌স্মিথ ও আডিসনের মধ্যে একবার বিবাদ হইয়াছিল। কোন বিজ্ঞানবিৎ একথাটার মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

বাবু যোগেশচন্দ্র রায় "প্রবাসীতে" লিখিয়াছেন,—উড়িয়াকে ওড়িয়া এবং উড়িশ্যাকে ওড়িশা বলা উচিত, কারণ দেশীয় লোকে এইরূপেই ঐ দুটী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং শব্দ দুটী ওড্র শব্দ জাত, সুতরাং ঐ রূপেই ব্যবহার হওয়া উচিত। যোগেশ বাবু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। অবশ্য কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন। দুঃখের বিষয় যে, প্রমাণগুলি তিনি উল্লেখ করেন নাই। যে দুটী প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। অনেক দিন হইতে উড়িয়া ও উড়িশ্যা শব্দ চলিয়া আসিয়াছে—সাহিত্যে শব্দ দুটী স্থান পাইয়াছে—আবশ্যক হইলে চিরপ্রচলিত ব্যবহার পরিবর্ত্তন করা যায়। কিন্তু আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার ভার যোগেশ বাবুর উপর। আশা করি, তিনি স্বকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন। দেশীয় লোকে যে প্রকারে শব্দ উচ্চারণ করে, বিদেশীয়কে সে শব্দ সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইলে ঢাকা না বলিয়া "ডাহা" বলিতে হইবে। ধাতুর সহিত মিলাইয়া বলিতে হইলে মুরসিদাবাদ মুরশুদাবাদ হয়, "বাকরগঞ্জো" বকরগঞ্জ হয়। ইংরাজেরা পারিস ও মার্শেল বলেন, কিন্তু ফরাসী উচ্চারণ বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের লোকে একই শব্দ ভিন্ন রূপে উচ্চারণ করে। উড়িশ্যার লোকে যে প্রকারে উচ্চারণ করে, আমরা তাহা পারি না। আবার আমরা "কৃপা" বলি, উড়িশ্যার লোকে "কুরপা" বলে। বিহারে ঢর উচ্চারণ ঠিক হয় না। শব্দযন্ত্রের ব্যাবৃতি অনুসারে উচ্চারণ ভিন্ন হইবেই। তাহার পর আলস্য (Law of phonitic decay) স্বদেশীয় ভাষার উচ্চারণ ভিন্ন করিতে বাধ্য করে। "ওড়িয়া" এত

গুছাইয়া সকল সময় বলা চলে না। ক্রমে "ওড়িয়া" কমিয়া আসিয়া "ওড়ে" হইয়া যাইবে। এবং হ্রস্ব গুণ বৃদ্ধির নিয়মে "ওড়ে" "উড়ে" হইয়া পড়িবে। এইরূপে যে "উড়িয়া" শব্দ উৎপন্ন হয় নাই, কে বলিবে? উড়িয়ারা আমাদিগকে "বাঙ্গালী" না বলিয়া "বঙ্গালী" বলে, তাহাতে আমরা তাহাদের কোন দোষ দেই না বা "বঙ্গালী" বলিলে অন্যায় করা, কি অপমান করা হয় বলিয়া কখন মনে করি না। "ওড়িয়া" না বলিয়া "উড়িয়া" বলিলে আমাদের কেন দোষ হইবে, বুঝি না। আলস্য-পরতন্ত্রতা উড়িয়া বলিতে বাধ্য করে এবং ব্যবহারে ইহা ষড়গড় হইয়া গিয়াছে।

"উড়িশ্যা" শব্দের গঠন লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারথীগণ যে হ্রদে হাবুডুবু খাইয়াছেন, আমার সেখানে অগ্রসর হইবার সাহস নাই। ইংরাজের মতে লিখিতে হইলে "ওড়িশ্শা" লিখিতে হয়। ওড়িশ্শা পূর্ব্বোক্ত ভাষা-তত্ত্বের নিয়মানুসারে উড়িশ্শা হইতে পারে। আবার মহারাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ প্রত্যয় "চা" প্রয়োগ করিয়া ওড্র শব্দ হইতে ওড়চা শব্দ গঠিত হইয়া থাকিলে কালক্রমে ওড়শা ও ওড়িশা এবং উড়িশা শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিতে পারে। যখন শা প্রত্যয়ের মূলতত্ত্ব লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন আর একটী সম্বন্ধবাচক ইয় বা ইয়া বা যা দিয়া উড়িশ্যা গঠিত হইয়াছিল। এতদিন পূর্ব্বে এ শব্দটী গঠিত হইয়াছিল যে, অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ প্রয়োগের পন্থা নাই। ব্যবহার-সিদ্ধ বলিয়া উড়িশ্যা শব্দ প্রয়োগে কোন দোষ হয় না। যদি পরিবর্ত্তন করিতে হয় "ওড্রস্য" শব্দ হইতে "ওড়স্য" করিতে হইবে। ওড়স্য আলস্য স্বভাবে ওড়স্যা হইবে। ওড়স্যা হইতে উড়িস্যা বড় দূর নহে।

যাহা হউক, এ গুলি আমার কল্পনা মাত্র। যোগেশ বাবু কি প্রমাণ বলে ওড়িয়া ও ওড়িশা শব্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জানিতে পারিলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

উত্তর পশ্চিমে বরকে নৌশা বা নূতন রাজা বলে। বিবাহ করিতে বরের আগমন উপলক্ষে একটী কাটীতে আর একটী কাটী বাঁধিয়া দ্বিতীয় কাটীর উপরে উর্দ্ধশির করিয়া আর চারি পাঁচটী কাটী বাঁধে। ইহাকে তোরণ বলে। বিবাহ মণ্ডপের দ্বার পার্শ্বে এই তোরণ রাখিয়া দেয়। বর আসিয়া লাটীর দ্বারা এই তোরণকে চূর্ণ করিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করে। জোর করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

শিরসা প্রদেশে বাগারী জাট জাতির মধ্যে স্ত্রীকে তাহার পিতার জাতীয় নামে ডাকিতে হয়। পিতা গোদর জাতীয় সুতরাং স্ত্রীকে গোদরী বলিতে হইবে। শ্বশুরকে এখানকার মুসলমানেরা চাচা বলে, ব্রাহ্মণে পণ্ডিতজী কি মিশ্রজী বলে, কায়স্থেরা রায় সাহেব বলে, বণিয়ারা লালা সাহেব কি শাহজী। মেও জাতি শ্বশুরকে ডোকরা (বুড়া) বলে। কোন বৃদ্ধাকে ডোকরী বলিলে সে গালি দেয়, কিন্তু বুড়িয়া বলিয়া সম্বোধন করিলে আহ্লাদে আশীর্ব্বাদ করে।

শিষ্যকে চেলা বলে। এই চেলা শব্দটী কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, দেখা যাউক। চেরা, চোরা, চেট, চেটক, চেরুয়া, চেড়, চেত, চেড়ক।

পশ্চিমে মুসলমান রমণী প্রসবান্তে চার৹

পায়ে (খাটিয়ায়) শোয় না। মাটীতে মাদুর কি টাট বিছাইয়া তাহার উপর সাত দিন শুইয়া থাকে। দুধ হইবার জন্য ঘিএ রুটী ভিজাইয়া চিনি দিয়া খায়। আর কিছু খায় না। কেহ কেহ যতদিন সন্তানকে দুধ খাইতে দেয়, ততদিন এইরূপ আহার করিয়া থাকে।

ভূত ভাগাইবার জন্য পঞ্জাবে বরেরা হাতে একটী লৌহ অস্ত্র লইয়া বিবাহ করিতে যায়। কন্যার দ্বারে একখানি চালুনী ঝুলান থাকে। অর্থ এই যে চালুনীতে যত ছিদ্র আছে, আমাদের মেয়ের তত দোষ আছে। এত দোষ জানিয়া মেয়ে লইতে হয় লও। প্রেমানুরাগ জানাইবার জন্য বর হাতের অস্ত্র দিয়া চালুনীটা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করে। উচ্চবর্ণের মধ্যেও এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বিবাহের কতক গুলি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। নাম্বুরী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহদিনে বর পুঁথী পাঁজি বগলে করিয়া এক ছালা চাউল কাঁধে করিয়া এমনিভাবে চলে, যেন ব্রাহ্মণ-সন্তান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে কাশী যাইতেছে। কন্যার পিতা তাহাকে বসাইয়া বুঝাইয়া কন্যা গ্রহণে সম্মত করে। হোম করিয়া, পূজা করিয়া বর কন্যার গলায় "তালি" পরাইয়া দেয়। তাহার পর উভয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে বর কন্যার পা ধরিয়া সাতবার শিলের উপর পা-দুটী বসাইয়া দেয়। ইহা বিবাহের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তাহার পর আবার পূজা করা হইলে মালা বদল হয়। তাহার পর পাঁচ বা নয় রকমের বীজ একত্র করিয়া একটী মাটীর পাত্রে বপন করা হয়। দম্পতি চারি দিন সেই বীজে জল সেচন করে। পঞ্চম দিনে অঙ্কুর গুলি তুলিয়া লইয়া পুকুরে বা নদীতে ফেলিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় রাত্রে স্ত্রী স্বামীকে বাহিরে লইয়া ধ্রুবতারা দেখাইয়া বলে, সে ঐ তারার মত সতী হইবে।

দক্ষিণ কাণাড়ায় বাঁটজাতি জমিদার বংশ। তাহাদের বিবাহের একটী প্রথার নাম "ধরে"। একটী জলপূর্ণ রূপার ঘটীর উপর একটী নারিকেল বসাইয়া তাহার উপর সুপারির ফুল দিয়া তাহার উপর বর-কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত হয়। আত্মীয় কুটুম্ব সকলে সে ঘটীটী স্পর্শ করিয়া থাকে, ঘটীটী তিনবার উপরে তুলিতে হয়। তাহার পরে সকলে দম্পতিকে দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা আশীর্ব্বাদ করিলে বিবাহ সমাধা হয়।

গোপালক হেগেডী জাতির মধ্যে বিবাহের দ্বিতীয় দিনে বর কন্যার একখানি অলঙ্কার চুরি করিয়া পলায়ন করে। আর একজন লোককে চোর বলিয়া ধরা হয়। সে চোর নহে প্রমাণ হইলে সকলে স্বীকার করে কে চুরি করিয়াছে, জানা গেল না। তখন বর আসিয়া কন্যার কাছে উপস্থিত হয়।

হোলিয়া নামক কানাড়ার আর একটী জাতির মধ্যে বিবাহের প্রথা এইরূপ। বর পক্ষ চাউল, পান ও সুপারী লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সারা রাত বাড়ীর বাহিরে বসিয়া থাকে। কন্যার বোনা একটী চেটাইর উপর বর বসিয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে পানেভরা এক-খানি কুলা মাঝে রাখিয়া কন্যা বরের সম্মুখে আসিয়া বসে। উপস্থিত লোকে উভয়ের মাথার উপর চাউল ছড়াইয়া দেয়। চারি দিন পর্য্যন্ত বর বা কন্যা একজনকে অনবরত

সে চেটাইটী দখল করিয়া থাকিতে হয়। পঞ্চম দিনে পুকুর বা নদীতে সেই চেটাই খানি লইয়া যাইয়া তাহার দ্বারা মাছ ধরে এবং মাছ গুলিকে চুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর ভোজ হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

নীলগিরির বাভাগা জাতির মধ্যে সন্তান সম্ভাবনা না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ নহে। সন্তান সম্ভাবনা হইলে বর কন্যাকে "তালি" পরাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

গোদাবরী তটে কোইস জাতি বাস করে। বর দরিদ্র হইলে কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া পলায়, ইচ্ছা করিলে অন্যের স্ত্রী লইয়াও পলাইতে পারে। কন্যা মাথাটী ঝুঁকাইয়া দেয়, বর তাহার মাথার উপর আপন মাথা ঝুঁকাইয়া দেয়। আত্মীয় স্বজন বরের মাথায় জল ঢালিয়া দেয়। বরের মাথার জল কন্যার মাথায় পড়িলে বিবাহ সিদ্ধ হয়।

কর্ণুলের চেঞ্চু জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা এইরূপ। বর কন্যাকে চুরি করিয়া পলায়ন করে। পর দিন কন্যার বাড়ীতে ফিরিয়া আসে, কখন কখন বা মাটীতে তীর ধনুক পুতিয়া বর কন্যা উহা প্রদক্ষিণ করে। আত্মীয় স্বজনে চাউল ছড়াইয়া দেয়।

ত্রিচিনপল্লীর কল্যাণ জাতির মধ্যে খুড়তুত ভগিনী শ্রেষ্ঠ পাত্রী, অভাবে পিশি বা ভাইঝি। কন্যা পলিত কেশ বা গলিত-দন্ত হইলেও যুবক তাহাকে ঐরূপ সম্বন্ধ স্থলে বিবাহ করিতে বাধ্য। বরের ভগিনী কন্যার বাড়ীতে যাইয়া একখানা কাপড় ও একুশটা পয়সা দিয়া কয়েকটা বালাঞ্চা কন্যার গলায় বাঁধিয়া দিয়া আসে। কন্যাকে একটা মুরগী ও চারিটী চাউল যৌতুক দিতে বর বাধ্য। তাহার পর একটা ভোজ হইলেই বিবাহ হয়।

ত্রিন বল্লীর মারবন জাতির মধ্যে বর-কন্যার সম্মতির কোন আবশ্যক হয় না। বরপক্ষীয় কেহ কন্যার গলায় "তালি" বাঁধিয়া আসিলে ও ঠাকুরের সম্মুখে একটা নারিকেল ভাঙ্গিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

গঞ্জামে উড়িয়াদিগের মধ্যে যৌবন সঞ্চারের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিতে হয়। সময়ে পাত্র না পাইলে একটা তীরের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাখিতে হয়।

মলবরের পানীয়ান জাতির কেহ কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলে ছয় মাস ধরিয়া নিত্য এক বোঝা কাঠ কন্যার বাড়ীতে দিয়া আসিতে হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

দাতা বিপিন বিহারী।

জন্ম—ফরিদপুরের অধীন জগদিয়া, ২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১২৫৮।

মৃত্যু—দার্জ্জিলিং, ৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩০৮। পিতার নাম রামনারায়ণ পাল। বয়স ৫০ বৎসর ৪ চারি মাস ২ দিন।

১২৮৭ সালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া একদিন দক্ষিণের দিকে যাইতেছিলাম, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মোড় অতীত হইলে দেখিলাম, পূর্ব্ব ফুটপাথে দাঁড়াইয়া এক-জন লোক আকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে-ছেন। আমি চিনিতাম না, সে লোক কে? আমাকে কেন দেখেন, তাহাও বুঝিলাম না। ঐ বৎসরই আর একদিন ১০৮ কলেজ ষ্ট্রীটের বাসার সম্মুখস্থ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছি, ঐ লোক আমাকে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে কতকদূর যাইয়া যখন বুঝিলেন, আমি রাস্তার উপরে আছি, তখন তিনি দাঁড়াইলেন এবং উত্তর-মুখী হইয়া ক্রমাগত এই অযোগ্য আমাকে তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কেন, সে ইতিহাস কে লিখিবে?

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই সেই

লোকের সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি অমন করিয়া কি দেখিতেছিলেন ?" তিনি বলিয়াছিলেন "একটী সামান্য যুবকের দ্বারা সমাজ তোলপড় হইল কিরূপে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে দেখিতেছিলাম। দেখিয়া মজিয়াছি, আমি আপনার হইয়াছি।" এইরূপে আমার বন্ধুর তালিকায় আর একটী লোক জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনিই বাবু বিপিনবিহারী রায়।

আলাপের পরও আমি বুঝি নাই— এক মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াছি। এবৎসর, কয়েক দিন পূর্ব্বে, তাঁহার জামাতার কলিকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; বন্দোবস্তের পর হঠাৎ উঠিয়া আমার পদধূলি লওয়ার চেষ্টা করিলেন, আমি ছুটিয়া পলাইলাম এবং তিরস্কার করিলাম। সে দিন ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন, কিন্তু তারই ৩।৪ দিন পর, কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আমি অসতর্ক ভাবে তাঁহার ধারে বসিয়াছিলাম। কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি তিরস্কার করিলাম এবং জোর করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে রাখিলাম। তখনও বুঝি নাই, ইহা তাঁহার জীবনের শেষ বিদায়ের চিহ্ন; বুঝি নাই, এই মহাপুরুষ অতি অল্প দিন মধ্যেই স্বর্গে গমন করিবেন। হায়, কি সর্ব্বনাশই হইয়া গিয়াছে ! কত দরিদ্রের ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে !!

হঠাৎ এবার তাঁহার পূর্ব্বের পীড়া বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় অনেক নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রের বিবাহ দিতে ২৪শে শ্রাবণ মহেশগঞ্জ গেলেন, আসিয়াই এক প্রকার জ্ঞান হারা হইলেন। নিষেধ সত্ত্বেও দারজিলিং যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইলেন। যাওয়ার সময় কাছে ডাকিয়া কত কথা বলিলেন। তখনও বুঝি নাই, শেষ বিদায়ের আয়োজন ! হায়, এখন সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,-এবং হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতেছি, জাগিয়া জাগিয়া কি স্বপ্নই দেখিলাম !!

বিপিন বাবুকে বাস্তবিক প্রায় কেহই চিনিত না। এখনই কি কেহ ঠিক চিনিয়াছে ? তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের কেহই বুঝিবা সম্যকরূপে চেনে নাই। সমাজের বা দেশের লোকও সম্যক রূপে বুঝে নাই। যখন বুঝিবে, তখন সকলের মাথায় বজ্রপাত হইবে এবং সকলে এক বাক্যে বলিবে, হায়, কি অমূল্য রত্ন অবহেলায় দারজিলিং-শৈল-গুহায় ৪ঠা আশ্বিন নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে ;—এমন লোকের শ্মশানেও স্মারক স্তম্ভের সম্ভাবনা রহিল না !!

লোকে জানে, মাণিকদহের জমীদার বিপিন বাবু। লোকে জানে, তাঁহার মতির স্থিরতা ছিল না। লোকে জানে, তিনি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। লোকে জানে, পরিবার পরিজনের উপর তাঁহার কোন আধিপত্য ছিল না। থাকিলে তাঁহার স্বর্গারোহণের পরই নানা গোলযোগের কথা শুনা যাইত না ! এই সকল কথা সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার কালে হইবে। বিপিন বাবু মাণিকদহে জন্মেন নাই, মাণিকদহে মরেনও নাই। মাণিকদহ তাঁহার পতন এবং উত্থানের ইতিহাসের লীলাস্থল। সে এক উপাদেয় কাহিনী।

মাণিকদহের জমীদার ৺মহিমচন্দ্র রায়ের দোর্দণ্ড প্রতাপে সকলে কম্পিত হইত। হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার পর ঘাতকের অস্ত্রে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। মৃত্যুর পর হঠাৎ যে উইল বাহির হইল, তাহাতে পোষ্যপুত্র রাখার কথা লেখা ছিল। কে কিরূপে উইল করিল, মহাসমস্যায় সে কথা আবৃত। উচ্চ আইন আদালতে আজও তাহা অমীমাংসিত। এই উইল বলে বিপিনবিহারী দরিদ্রের ঘর হইতে ৫ বৎসর বয়সে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিলেন। আসিলেন, বড় হইলেন, ফরিদপুর জেলা-স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলেন, পরে নানা ঘটনায় অত্যাচারিত হইলেন, বিষ প্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত আয়োজন হইল, কিন্তু কাহারও ইচ্ছায়, তবুও তিনি রহিলেন।

রহিলেন, বিষয় পাইলেন, দুইবার বিবাহ করিলেন, এবং বলিতে লজ্জা হয়, শেষে পাপে ডুবিলেন। এ দেশের ঐশ্বর্য্যবান লোকের পরিণাম কি? বিলাতের ন্যায় বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ বা পণ্ডিতের অভ্যুদয় নহে; অবসর এবং সুবিধার সদ্ব্যবহার অতি অল্প লোকে এদেশে করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যবান লোকের বন্ধুর অভাব কোথায়? দলে দলে বন্ধু জুটিল;—বিপিন বাবু পাপের ঘোরতর নরকে ডুবিলেন। যখন সাধু হইয়াছেন, তখন একদিন তিনি একটী ছোট শিশুকে বলিতেছিলেন—"আমাকে চিনিস্?" শিশু উত্তর করিল, "তোমাকে চিনব না কেন, তুমি সেবার মদ খাইয়া নেংটা হইয়া নেচেছিলে, তোমাকে চিনব না কেন?" এই উত্তর শুনিয়া বিপিন বাবু বলিয়াছিলেন, "ঠিক চিনিয়াছ, খুব শিক্ষা দিয়াছ।" এই ত তাঁহার পরিচয়। এমন জঘন্য কাজ ছিল না, যাহা বিপিন বাবু এক সময়ে করেন নাই। মাণিকদহ, বুঝিবা, সেই দৃষ্টান্তে আজও পাপে টলটল করিতেছে। ব্যভিচার যে আবার দোষের, সাধারণত সে দেশের অধিকাংশ লোকই তাহা মনে করে না। উচ্চ শ্রেণীর লোক যখন কুদৃষ্টান্ত দেখায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তখন আর কি অন্যের উপদেশ শুনে? বিপিন বাবুও পরে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাপে নিমগ্ন মাণিকদহকে আর তুলিয়া যাইতে পারেন নাই। শেষ জীবনে তিনি যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটাইয়াছিলেন। কতবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "মাণিকদহ এবং হাকিমপুরের কিছুতেই উদ্ধার হইবে না।" পাপের ভীষণ পরিণাম না ভাবিয়া যখন বিপিন বাবু প্রমত্ত, তখন সাধু "শ্যামাকান্ত" মাণিকদহের পণ্ডিত। গোপনে শ্যামাকান্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে মাণিকদহে ধাত্রী পাঠানের প্রয়োজন হইলে আমরা কোন ব্রাহ্মিকা ধাত্রীকে ঠিক করিয়া দিয়াছিলাম। তিনিও গোপনে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। এই সূত্রে বিপিন বাবুর মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি খারাপ লোক বলিয়াই গোপনে উপাসনা হয়, এই চিন্তা মনে উদিত হইল। ইহার পরই তাঁহার কলিকাতায় আগমন এবং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ। তৎপরের ঘটনা প্রহেলিকাময়। তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হইল। সকল প্রকার পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন দিলেন। কুটুম্ব মহলে দারুণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহার ছোট পত্নীর পিতা প্রথমতঃ, ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রজাবিদ্রোহ হইবে, ভয় দেখাইলেন, আমরা বিপিন বাবুকে বলিলাম, "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তিন বৎসর বিনা বেতনে খাটিয়া প্রজা বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া দিব। তৎপর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তিনি হাকিমপুর পরগণার মালিক, বিপিন বাবু পত্তনীদার) কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন, তাঁহার শ্বশুর বাবু কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ নানারূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে প্রতিগ্রহণের আয়োজন করিলেন। সব ঠিক হইল, বিপিন বাবুও সম্মতি দিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য প্রকার, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এক দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল, আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আজ হইতে আমার সকল সংশয় গেল, নবজীবন লাভ হইল, ধর্ম্মজীবন দৃঢ় হইল।" জগাই মাধাইর উদ্ধারের কাহিনী যদি জগতের ইতিহাসে যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ভক্ত, বিশ্বাসী, সাধু বিপিন বিহারীর নামও তাহার ধারে লিখিয়া রাখার যোগ্য। বিপিন বাবু মদ ছাড়িলেন, তামাক ছাড়িলেন, কুসঙ্গ ছাড়িলেন, ব্যভিচার, বিলাসিতা, অহঙ্কার সমস্ত চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন। সংসারী বিপিনবিহারী দাতা রূপ ধারণ করিলেন। ক্রমে নানা সাধু ভক্তের সংসর্গে ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন। জাতিভেদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন, মুসলমান ভৃত্য ও পাচক রাখিলেন। তারপরের কাহিনী কে না

'জানে? নানা সৎকার্য্যের সূত্রপাত হইল, প্রতি কাছারীতে স্কুল স্থাপিত হইল ও ডাক্তার প্রেরিত হইল, কত পুকুর ও কূপ খনিত হইল, কত দরিদ্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ফরিদপুরে জলের ফিল্টার স্থাপিত হইল। বাজে আদায় ও নজর তুলিয়া দেওয়া হইল, প্রজা-হিত-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল, দান-ভাণ্ডার অবারিত-দ্বার হইল। তিনি গোপনে চলিতেন, গোপনে বেড়াইতেন, কিন্তু তবুও ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিপিন বাবুকে ব্রাহ্ম করার মূল কারণ বলিয়া তাঁহার শ্বশুর এক সময়ে আমাদের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত কথা সবিশেষ অবগত হওয়ার পর শেষে তিনিও আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিপিন বাবু অনেক সময়ে বলিতেন—"আমি গরিবের ছেলে, সব টাকা দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব, কিছুই রাখিয়া যাইব না।" আমরা তাঁহাকে অর্থ সম্বন্ধে সংযমের পথে লইয়া যাইবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়াছে। এক সময়ে অনেক টাকা জমাইয়াও দিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে তিনি কিছুই রাখেন নাই। মহাপুরুষের মহাবাক্যই প্রতিপালিত হইয়াছে। বন্ধুরা চটিবে, বা স্ত্রী চটিবেন, বা কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিবে, এইজন্য হাট বাজারে যাইয়া অনেক সময় হাওলাত করিয়া গোপনে দান করিয়া আসিতেন। তাঁহার সম্পত্তির সর্ব্বপ্রকার আয় ধরিয়া সমষ্টি করিলে ২০ হইতে ৩০ হাজারের অধিক কোন বৎসরই আয় হইত না, কিন্তু ইহার মধ্যে এক চতুর্থাংশ প্রায় দান করিতেন। অনেক সময় নিজের হাতে বজেট করিয়া দানের ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছি; যখন টাকায় কুলায় না শুনিতেন, তখন নিজের খরচ কমাইবার কথা বলিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা আর কোথাও দেখি নাই।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করার পর, ধনী-ব্রাহ্ম-জীবন-সুলভ বিলাসিতার দিকে কিছু যে তাঁহার ঝোঁক না পড়িয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু কঠোর ভর্ৎসনায় তাহা সংযত হইয়াছিল। একবার পত্নীদের জন্য অনেক টাকার পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল, ভর্ৎসনার পর লোকসান দিয়াও তাহা ফেরত দিয়াছিলেন। মদ্যপান ছাড়িয়া শেষে চা-পান তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। আরো তাঁহার কোন কোন দোষ যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, ফুলেও কণ্টক থাকে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? ভাঙ্গা জনসাধারণ সভা প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে যাইয়া দেখি, রূপার চাপরাশ ধারণ করিয়া, তরবারি হস্তে সজ্জিত আরদালিগণ চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে, তিরস্কার করার পর আর কখনও সেরূপ করেন নাই। গাড়াতে বেড়ানের জন্য অনেকবার ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন, নিতান্ত অসমর্থ না হইলে প্রায়ই গাড়ীতে উঠিতেন না। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর উপর আজীবন চটা ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের সহিত কোনরূপে পরিচিত হইতে চাহিতেন না। সদা লজ্জায় এমন ম্রিয়মাণ থাকিতেন যে, নূতন লোকের সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিতেও পারিতেন না। বেশী লোকের সহিত এই জন্য তাহার বন্ধুত্ব হয় নাই। কলিকাতার রাস্তা দিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া কেহ কখনও মনে করিতে পারে নাই যে, তিনি একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। নীরবে, বিনা আড়ম্বরে কেবল পরের উপকার করিয়া যাইবেন, ইহাই জীবনের সংকল্প ছিল। যখন অবসর পাইতেন, তখনই দান করিতেন। সময়, অসময় ছিল না, সব সময়ে বিচার করিয়াও দান করিতে পারিতেন না। এ জন্য লোকেরা তাঁহার অশেষ নিন্দাও করিত, কিন্তু তিনি সে দিকে কর্ণপাত করিতেন না। অম্লান চিত্তে, অকাতরে প্রসন্নতায় উৎফুল্ল হইয়া দান করিতেন।

বিপিন বাবুর জীবনের তিনটী বিশেষত্ব আমরা সর্ব্বসময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—প্রথম,

দয়া; দ্বিতীয়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দুঃখ বিপদে অবিচলিত ভাব, তৃতীয় —পরিশ্রমশীলতা। যতদিন জ্ঞান ও শক্তি ছিল, জীবনের সে পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এরূপ পরিশ্রমী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি। মকর্দ্দমায় হারিয়াছেন, বা পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে, বা নদীতে জমীদারী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কোন অবস্থায় তাঁহাকে বিচলিত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। অনেক সময় বলিতেন—কিছুতেই আমার অধিকার নাই, বিষয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারাই দরিদ্রের সেবা করিব।

আজকাল লোকেরা বলিতেছে, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই, এবং তিনি শেষ জীবনে উইল করিয়া দরিদ্র রক্ষা করিবার উপায় করিয়া যান নাই, এ কিরূপ ঘটনা? তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মাবধি হাবা, (Idiot) বাকী ৩টী পুত্র, কন্যা, জামাতা, ও ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্য তিনি এত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে সাধারণত লোকেরা তাহা করে না। দুটী পুত্র বালক, মধ্যমপুত্রের শিক্ষার ফল ভাল কি মন্দ হইয়াছে, কিছু পরেই জানা যাইবে।

তিনি বলিতেন—"দয়া জীবিত কালের জন্য। যতদিন আছি, দেখিয়া শুনিয়া দান করিয়া কৃতার্থ হই, পরে কি হইবে, কে জানে?"

উইল * করিলে তাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকিত, কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইত, খোসামুদে লোকেরা বর্ত্তমান কর্ত্তাদের যশই ঘোষণা করিত, তাঁহার নাম কেহ লইত না। পুত্রেরা তাঁহার ন্যায় দাতা হইলেও তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইবে। তাঁহার বিশেষত্ব সুরক্ষিত হইবে, ইহাই যেন বিধাতার ইচ্ছা, তজ্জন্য সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও অন্য প্রকার বিধান হয় নাই। বিদ্যাসাগরের পর নারায়ণচন্দ্র, স্বর্ণময়ীর পর মণীন্দ্রচন্দ্র, তারক প্রামাণিকের পর তাঁহার বংশধর ঠিক তাঁহাদের দয়াব্রতে অনুপ্রাণিত হইলে, ঐ সকল মহাজনের নাম জগতে থাকিত কি? রামমোহন বা কেশব চন্দ্রের ধর্ম্মভাব তাঁহাদের বংশধরেরা পাইলে তাঁহাদের বিশেষত্ব জগতে ঘোষিত হইত কি? আলোর ধারে অন্ধকার না থাকিলে আলোর মর্য্যাদা লোকে বুঝিত না। অসুর গৃহে প্রহ্লাদের জন্ম না হইলে ভক্ত প্রহ্লাদের এত আদর হইত না। চিরকাল চিরদিন দেখা গিয়াছে—যিনি যে ব্রত পালনের জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তিরোধানের পর সেই ব্রত পালনের জন্য অন্য লোকের আর অভ্যুদয় হয় নাই। বিপিন বিহারীর কীর্ত্তিরাশি বিলুপ্ত হইলেই তাঁহার অক্ষয় যশঃরাশি বুঝিবা এই জগতে আরো উজ্জ্বল হইবে। লোকেরা চিরকাল বলিবে—"সেই যুগে, সেই দিনে এমন ছিল, এখন সব গিয়াছে।" এই জন্যই বুঝিবা বিধাতার এইরূপ বিধান হইয়াছে।

মাণিকদহের জমিদারীর পরিণাম কি, কেহ জানে না; কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, বিধাতা দরিদ্রের সেবার জন্য দারিদ্রসন্তানকে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের ভার দিয়া মাণিকদহে কয়েক বৎসর যে লীলা খেলিলেন, তাহা চিরকাল স্মরণের বিষয়। বিপিন বাবুর অতি ভালবাসার মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের পরিণাম কি, কেহই জানে না, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে মাণিকদহে যে লীলা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর। আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহাতে পাপীর উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, একথা নিশ্চয়ই বলিব। ব্রহ্মকৃপা এবং ব্রাহ্মসমাজের জয়।

আমরা তাঁহার হতভাগ্য বন্ধুবর্গ, তাঁহার শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সকল কীর্ত্তি বিলোপের আয়োজন করিতেছি, ঝগড়া বিবাদের ইন্ধন জ্বালিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহার শ্রাদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিতেছি! নরকধামে যাহা হইবার তাহা হউক, দুঃখ

* ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় বার বিবাহ করার সময় দুর্ব্বলতার চিহ্ন স্বরূপ নূতন স্ত্রীর নামে যে উইল করিয়াছিলেন এবং যাহার কথা উল্লেখ করিয়া নিজেও লজ্জিত হইতেন, তাহা এখন বাহির করিয়া কেহ কেহ উল্লাস করিতেছেন। বিপিন বাবুর নবজীবন লাভের পূর্ব্বের সে উইলকে আমরা কলঙ্কময় বলিয়া মনে করি।

নাই; দাতা বিপিন বিহারী বিশ্বাস ও ভক্তি বলে নিত্য দেববেশে আমাদের মধ্যে বিহার করুন, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা। প্রার্থনা এই, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি মানব প্রাণে এখন আশার সঞ্চার করুক, যাহাতে, দেশকালের অতীত অবিনশ্বর নিত্যধামের দিকে মানব মনের স্থিতি এবং গতি হয়। বিধাতা যে স্বপ্ন দেখাইলেন, প্রার্থনা এই, নিত্য ঘরে ঘরে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাহা বিরাজিত থাকুক।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রেয়সী।

তার চম্পকরূপে যৌবন আসি
করেছে মাধুরী বিথার,
তার কম্র হৃদয়ে উদ্দাম প্রেম
সতত করিছে বিহার;
তার নয়ন যুগলে, হরষে তরষে
বরষে আশার কাহিনী,
তার নির্ম্মল প্রাণে, পিরীতি বসিয়া,
আলাপে মধুর রাগিণী।
প্রেমরাগ তার রূপের লহরী
রোধিয়া রেখেছে শরীরে
বিশ্ব নতুবা যাইত ভাসিয়া
উজ্জ্বল রূপ মদিরে;
গতিটী তাহার, স্বভাব মৃদুল
মুখর নূপুর চরণে,
যৌবন গাথা ঘোষে অবিরল
মধুর ললিত রণনে।
ভাষা দিয়া তার, মাণিক ঝরিয়া
বরষে বীণার কাকলি
বিশ্ব মাঝারে দেবী স্বরূপিনী
আমায় প্রেয়সী কেবলি!
সে যে বন্দী করিয়ে, রেখেছে আমায়
তাহার গুণের কারায়,
আমি চাহি না স্বরগ, চাহি না গোলক,
ভাল যে বেসেছি ধরায়
সাঁজের বেলায়, বকুল তলায়,
দুজনে গাথিয়ে মালিকা,
দুই জনে বসি, এক মনে শুনি
গাহিছে মুখর শারিকা;
আমরা দুজনে, শান্তি সলিলে
সতত থাকি যে রসিয়া,
প্রভাত প্রদোষ, সন্ধ্যা নিশীথে
প্রকৃতি দাঁড়ায় হাসিয়া।
দুইটী প্রাণের এমন মিলনে
বিরহের ভয় নাহিরে।
তাইতে আমরা দোঁহাকুঁহু ছাড়া
আর কিছু নাহি চাহিরে।
চাঁদেতে যেমন দেখি শোভারাশি
তেমতি শোভন আঁধারে,
সব আছে বলি, সুখের রোদনে
কেঁদে ভাসি প্রেম পাথারে।
এবে রোদনে নাহিক একটু বেদন
বেদনে নাহিক যাতনা,
যত দুখ ছিল, সুখে পরিণত
গভীর হরষে বেদনা।
অপার প্রেম অমেয় ভক্তি
বসেছে হৃদয় জুড়িয়া,
তৃপ্তি হীনতা, বাসনা পিয়াসা
গিয়াছে অনলে পুড়িয়া।
"সুন্দর যিনি" সুন্দরতর
করেছে দোঁহারে রচনা
তাই, তৃপ্তি হীনতা বাসনা পিয়াসা
গভীর নিরয়ে মগনা।
ওরে আমার প্রেয়সী, গুণেতে শ্রেয়সী
আদর সুধার খনিয়া,
আর নিখিল হৃদয় করিতে শীতল
খিদির স্নিগ্ধ মণিয়া।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

পূজার বাতাস।

(১)

গেল—বাসন্তী সুধীর মলয়-সমীর,
নিখিল পাপিয়া-মোহন-তান;
আসিয়া আসিয়া
গেলরে চলিয়া
আষাঢ়ের জল শীতলি প্রাণ।

(২)

ফুটি ঝরিল সুষমা পাঁপড়ি-মালিকা,
গেলরে শুকিয়ে ফুলের (ই) মউ ;
ডাকিয়া ডাকিয়া
পড়িল থামিয়া
"কথা কও," "কথা কওনারে বউ !"

(৩)

গেল সব চলি' এল পূজার বাতাস
সুধীর ধারায়—
কেতকী মন্দার যূঁথী বনমালা হৃদে গাথি,
ভুরপুর গন্ধে তায় সুবাস লোটায় ;
লুটি ফুলবন নিয়ে হাস,
এল ছুটে পূজার বাতাস !

(৪)

সুবিমল স্নিগ্ধ রশ্মিশারদ চন্দ্রিকা,
হাসি অনুপম—
ঢালিছে সুধার স্রোত— চরাচর পরিপ্লুত
মরতে স্বর্গের চিত্র—কিবা মনোরম।
প্রাণে প্রাণে হাসিছে উল্লাস ;
এল ছুটে পূজার বাতাস !

(৫)

এল ছুটে পূজার বাতাস মাখি গায়
উদ্যম উৎসাহ,—
স্নেহ-ভক্তি-পবিত্রতা, সাম্য-মৈত্রী-সরলতা,
উথলিছে উৎস-ধারা প্রেমের প্রবাহ ;
থেমে গেল দুঃখ হা হুতাশ ;
এল ছুটে পূজার বাতাস !

(৬)

নাই স্বার্থ, নাই দ্বেষ, নাইরে বিচ্ছেদ,
হাসিভরা মন ;
বুকভরা নববলে, মাতিছে মানব-দলে,
তাধিয়া তাধিয়া নাচে—প্রিয় আলাপন ;
পরাপর নাই তাপ রাশ ;
এল ছুটে পূজার বাতাস !

(৭)

পূজার বাতাস—
কি জিনিষে গড়া তুমি—কিবা উপাদানে ?
গঠিল কি তোমা পরমেশ ?
না জানি কি স্বরগের জ্যোতির বিধানে
গঠিত ও শরীর বিশেষ—
বীণা বাঁশীতান দিয়ে,
সুষমার হাসি নিয়ে,
বসন্তে নন্দনকুঞ্জে শ্রীশ একাধার
গঠিল বুঝিবা তোমা—সুখের আগার !

(৮)

পূজার বাতাস—
তুমি কি ?—কটাক্ষ কার ?
অথবা সুহাস-ধার,
আস লো নীরবে ভেদি' মুকুতা দশন ?
হাসির কণায় ভাসা
"প্রেম প্রীতি-ভালবাসা"
আছে যাঁর, কিবা জানি সে হাসি কেমন !
সুখশান্তি আশা ফুটে
আছে যাঁর মুখপুটে,
চরণ সরোজে তাঁর কি রতন রাশ !
যাওগো এবার ফিরি'
এস সে সরোজ চিরি'
এক ফোটা মধু নিয়ে আবার বাতাস।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

রাজা রামমোহন রায়।

রাগিণী থাম্বাজ—তাল একতালা।

("মিলে সবে ভারত সন্তান" গানের সুর)

ধন্য পিতা দয়াময়, ধন্য হে তব তনয়,
বিধানের অগ্রদূত রাজা রামমোহন !
ধন্য করুণা তোমার, করিলে পাপী উদ্ধার,
শুনায়ে বঙ্গে আবার প্রাচীন সে সমাচার,
এক ব্রহ্ম নিরাকার।
পতিত বঙ্গের ঘরে পাঠাইলে দয়া করে
একি জ্যোতি, একি জ্ঞান, উদার হৃদয় ?
কোথা গেল শত্রু-দল, নির্যাতন, বুদ্ধিবল ?
দিগ্বিজয়ী মহাবীর তোমারি তনয়।
ধন্য করুণা তোমার ! করিলে পাপী উদ্ধার
শুনায়ে বঙ্গে আবার প্রাচীন সে সমাচার,
এক ব্রহ্ম নিরাকার।
কে জানিত শাস্ত্র-ভাণ্ডার হবে অবারিত-দ্বার
সবার সম অধিকার, নাই জাতি-বিচার ?
সে আলোক সম্মুখে পলায় কত নত মুখে,
অজ্ঞানতা অধীনতা ভ্রম কুসংস্কার !
কে জানিত এ আকাশে, কলুষিত এ বাতাসে
ব্রহ্মের বিজয় নিশান উড়িবে আবার ?
ধন্য আজি আর্য্য-ধাম ধন্য পিতামহ নাম !
ব্রহ্ম নামে, ব্রহ্ম জ্ঞানে পাপীর উদ্ধার !

ধন্য করুণা তোমার! করিলে পাপী উদ্ধার,
শুনায়ে বঙ্গে আবার প্রাচীন সে সমাচার,
এক ব্রহ্ম নিরাকার।
আজ দীনা বঙ্গ-ভাষা, নব শিক্ষা, নব আশা,
রাজ-নীতি, ধর্ম্ম নীতি তাঁর পানে চায়;
নীরব শ্মশান ফুটে, সতীর আশীস উঠে,
অশ্রু জলে নারীদলে স্মরে আজ তাঁয়;
ক্ষুদ্র তাঁর মেষ-দল, ছিন্ন ভিন্ন, হীনবল,
কাতরে মিনতি করে পিতা গো তোমায়;
সে বিশ্বাস, সে জ্ঞান, উদার সে বীর প্রাণ,
সঞ্চারি সবার প্রাণে জাগাও সবায়।
ধন্য করুণা তোমার, করিলে পাপী উদ্ধার,
শুনায়ে বঙ্গে আবার প্রাচীন সে সমাচার
এক ব্রহ্ম নিরাকার।

২৭ সেপ্টেম্বর। শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২০। হামিদা।—উপন্যাস, মূল্য ॥০, শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত। এখানি এক ক্ষুদ্র উপন্যাস। কিন্তু ইংরাজীতে ও ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালাতে যে ক্ষুদ্র গল্প বা নভলেট্ লেখা হইয়া থাকে, এ উপন্যাস গ্রন্থ তাহা অপেক্ষা আকারে বড়। দীনেন্দ্র বাবু ক্ষুদ্র গল্প লেখায় একরূপ সিদ্ধহস্ত। তাঁহার লিপি-কৌশল সুন্দর।

এই গল্পাংশ সে দিনের আফ্রিদিযুদ্ধ বা 'চিত্রল অভিযান' অবলম্বনে রচিত। ইহাতে আফ্রিদি জাতির বীরত্ব, স্বদেশ-মমতা, আফ্রিদি পতির একনিষ্ঠতা বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী। এই আফ্রিদি পতির কন্যা হামিদাই এ গ্রন্থের নায়িকা। ইংরাজের পক্ষে আফ্রিদির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ প্রবৃত্ত নেহাল সিংহ নামক এক রাজপুত বীর ইহার নায়ক। ইংরাজ পক্ষের কয়েকজন দেশীয় সৈন্য কর্ত্তৃক বিপন্ন বীর রমণী হামিদা ও তাহার সঙ্গী আবদুলকে নেহাল সিংহ উদ্ধার করিয়া তাহাদের অধিকার মধ্যে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিতে যান। তখন তিনি আবদুলের কৌশলে বন্দী হন। আবদুল, হামিদার প্রণয়প্রার্থী ছিল। সে অনেক কৌশলে আফ্রিদিপতিকে উত্তেজিত করিয়া নেহালকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। হামিদার বিশেষ চেষ্টায় নেহাল সিংহের উদ্ধার হয়। হামিদা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ইংরাজ অধিকার মধ্যে নিরাপদ স্থানে পঁহুছাইয়া দিতে আসেন। তখন নেহাল সিংহ হামিদার প্রতি আসক্তি জানাইয়া তাহাকে স্বদেশে লইয়া আসিতে চাহেন। হামিদা নেহাল সিংহের প্রেমে মুগ্ধা হইলেও তাহাতে সম্মত হইল না। যে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিল না। বরং দেশের শত্রুকে রক্ষা করিয়া সে স্বদেশ-দ্রোহিতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তথায় সহসা আহুত আবদুলের নিক্ষিপ্ত শর হইতে নেহালকে রক্ষা করিবার জন্য সে শর নিজবুকে গ্রহণ করিয়া, আবদুলকে তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিয়া পরে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিল।

গল্প এই মাত্র। কিন্তু বলিয়াছিত, ইহার রচনা-কৌশল বড় সুন্দর—বড় মনোজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতে দীনেন্দ্র বাবু রীতিমত নভেল লিখিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন, ও নিজের শক্তির সদ্ব্যবহার করিবেন।

২১। সচিত্র কোমল পাঠ।—মূল্য /০, ডিরেক্টর সাহেবের অনুমোদিত, তৃতীয় সংস্করণ, সিটী বুক সোসাইটী।

শিশুপাঠ্য এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার, চিত্রগুলি সুন্দর। পাঠগুলি উপদেশ পূর্ণ। এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ। *

এখন একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন আর বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব নাই। অপ্রাচুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু অভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গনারী ডবল অনার, ডবল এম্ এ পাইয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের আর কথা কি? বঙ্গনারী গণিতে অনার, দর্শনে এম্-এ পাইয়াছেন। উদ্ভিদ্বিদ্যায় এম্-এ, চিকিৎসা বিদ্যায় এম্-বি পাইয়াছেন। যে বিদ্যা এক ইংরেজীতে সঙ্কীর্ণা ছিল, সে এখন বিচিত্রবাগ্বিলাসিনী হইয়াছে। বঙ্গনারী লাটিনে, ফরাসিতে অনার পাইয়াছেন। আজ এ দেশে হাজারে একজনেও যার খবর রাখে না, বঙ্গনারী সেই ইরাণের কাব্যকানন লুণ্ঠন করিয়া "পারস্য-পুলক" পাইয়াছেন। আনন্দের উপর আনন্দ এই, বঙ্গনারী সংস্কৃতে বিদুষী হইয়াছেন। শুধু কি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য? দারুণ চীৎকারে যিনি কলাবৎ ছিলেন, আজ তিনি মৃদঙ্গযোগে বিশুদ্ধ ধ্রুপদ গাইতে শিখিয়াছেন। বিলাতী সঙ্গীতে বাঙ্গালী নারী বিলাতে বাহবা পাইয়াছেন। সে কাল আর নাই। যে বীটন কলেজ একদিন কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া একটী ছাত্রী জুটাইতে পারে নাই, অকর্ম্মণ্য বলিয়া আজ তারে বঙ্গনারী জবাব দিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে এখন একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কি? এ কালে এ প্রশ্ন শুনিলে শিক্ষিতেরা অনেকেই হাসিবেন। যাঁহারা হাসিবেন না, তাঁহারা সংক্ষেপে বলিবেন—শিক্ষার প্রয়োজন পুরুষেও যা, স্ত্রীতেও তাই। পরম প্রয়োজন একই বটে, কিন্তু অবান্তর প্রয়োজনে কি কোনও প্রভেদ নাই?

সাম্যবাদী বলেন, না—প্রভেদ নাই। তিন পুরুষের উদারনীতি মাথায় করিয়াও ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেন, প্রভেদ আছে। স্ত্রী পুরুষে নিয়তির প্রভেদ আছে বলিয়াই, প্রভেদ আছে। "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থং চ মানবাঃ"—মনুর স্মৃতি ক্ষিতীন্দ্রনাথও ভুলেন নাই। এ একটা মোটা কথা সত্য, কিন্তু কথাটায় আর একটা কথার ইঙ্গিত আছে।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ—তাহাতে এমত বুঝায় না যে, নারী একপ্রকার breeding animal মাত্র। এমনও বুঝায় না যে, প্রজা প্রসব করিলেই নারীজন্মের পরমার্থ সিদ্ধ হয়। তা হইলে আর, মনু এত করিয়া স্ত্রীধর্ম্ম না বুঝাইলেও পারিতেন। যার কথা—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" সে চৌয়াড় ছিল না। মনু নারীকে তির্য্যক্স্ত্রীর সমান করেন নাই। তির্য্যক স্ত্রী কেবল প্রসূতিই হয়, নারী প্রসূতি হইয়া মাতা হয়েন। তির্য্যক্স্ত্রীর অপত্য স্নেহ নাই, এরূপ বলিতেছি না; কিন্তু এ মাতৃত্ব নাই। যে জাতীয় অপত্য স্নেহ পশুপক্ষীতে দেখিতে পাই, মাতৃত্বের তাহা এক কলা

* আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। কলিকাতা, এল্গিন্ প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা।

মাত্র। পশুপক্ষীতে তা আবার মাসে বৎসরেই মুছিয়া যায়, মায়ের সে এক কলাও অবিনাশিনী। শুধু তাই নয়। মাতৃশক্তি ভাবঘনা হইয়াও বুদ্ধ্যুজ্জ্বলা, ত্রিকালনয়না, শিবাশিবাবেকিনী, শিবৈক-প্রবণা, ছিন্নমস্তা, অক্ষয্য হৃদয়ধারা, অপত্যে আরক্ত হইলেও অখিলালিঙ্গিনী। পরিবার বন্ধনে মধ্যগ্রন্থি হইয়া মাতৃশক্তি সমাজ ধারণ করিতেছে। সকল স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতে পারিনা, কিন্তু পশু পক্ষীতে এ সকল নাই। পুরুষেও নাই। মাতৃত্ব নারীরই নিজস্ব। নারীপ্রকৃতি তারই উদ্দেশে প্রস্ফুটিত হয়। পদ্ম যেমন শতদলে আপনার বীজকোশ ঢাকিয়া রাখে, নারী হৃদয়ের শত সুগন্ধি ভাবেও তেমনই ঐ মাতৃভাবই আচ্ছন্ন থাকে। ফল পাকিলে ফুলের, মাতৃত্বের বিকাশে নারীর নিয়তি পূর্ণ হয়। প্রজাপ্রসূতি হইবে বলিয়াই নারীর হৃদয়ে মাতৃত্বের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয় বটে। কিন্তু অঙ্কুরণে সে বীজে সর্ব্বথা প্রজাপ্রসবের অপেক্ষা করে না। হয়ত ইহা অভিব্যক্তিধারার ফল। সন্তান হইলে মাতৃভাব গাঢ়ত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু সন্তানহীনায়ও তার অভাব নাই। কত যে নিঃসন্তান নারী মায়েরই মত পরের সন্তানকে মানুষ করিয়া থাকেন, তার কি সংখ্যা আছে? নারীর নিয়তিই সেই। সপ্রাজা হউক, অপ্রাজাঃ হউক, নারীকে মাতা হইতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কি, এখন বুঝিতে পারি। নারীকে এই মাতৃধর্ম্মের অধিকারিণী হইতে হইবে। শিক্ষা ছাড়া সমাগধিকার হয় না, অতএব নারীকে শিক্ষিতা করিতে হইবে। শিক্ষার অর্থই তো উচ্চশিক্ষা। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—দেখিয়াছি, মাতৃত্বে তিনই বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষায় সে তিনকে উজ্জ্বল কর। বিশেষতঃ নারীর কর্ম্মবুদ্ধি বলিষ্ঠা কর, যেন জ্ঞান ভাবের উৎকট মোহে তার স্বধর্ম্ম পীড়িত না হয়। গার্হস্থ্যই মানুষের প্রথম কর্ম্মভূমি। গার্হপত্যায় জাগৃহি—নারীকে সে বৈবাহিকী শ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেও। মৃত মহাত্মা হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর দেখাইয়া গিয়াছেন, রমণীর এ উচ্চশিক্ষা স্কুল কলেজ ছাড়াও হইতে পারে—পতিগৃহে বিবাহের পরেও হইতে পারে। হিন্দুসমাজ সে দিকে একটু নজর দিলে পারিতেন, কেননা, তাহাতে সনাতন ধর্ম্মও খাড়া থাকে। সর্ব্বোপরি যে বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা, মানুষ বলিয়াই যাহাতে তার প্রয়োজন আছে, নারীকে সেই অধ্যাত্ম বিদ্যায় অভিষিক্তা কর। ইহাকেই শিক্ষার পরম প্রয়োজন বলিয়াছিলাম। কিন্তু অবান্তর প্রয়োজনটা ভুলিও না। নারী যে নারী, তাহা ভুলিও না। অনন্ত বিদ্যায় নারী বিদুষী হউক, কিন্তু বিদ্যা যেন মাতৃত্বকে ছাড়িয়া যায় না। লক্ষণালক্ষণ দেখিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন, "নব্য-সম্প্রদায়ের পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া গুরুতর অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারে।" অভিযোগটার তদারক হওয়া ভাল।

আর একটা কথা বলিতে বাকী আছে। অনপত্যা নারীও মাতৃধর্ম্মে ভূষিতা হইতে পারে, অনূঢ়া কি পারে না? না বলিতে পারি না। কুমারী ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের নাম আজিও সমস্ত মাতৃমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আছে। মাতৃত্ব যদি নারীর স্বভাবসিদ্ধই হয়, তবে অনূঢ়ায়ই বা তার বিকাশ

হইতে বাধা কি? এক বাধা আছে। পরিণীতার সে বাধা নাই, অথবা সে বাধা যে সর্ব্বত্রই অবশ্যম্ভাবিনী, ঘৃণাক্ষরেও এমত বলিতেছি না। কিন্তু তবু সে বাধাটা আছে। ব্রহ্মচর্য্য, তার উপর আবার চির-ব্রহ্মচর্য্য—সে এক অসিধারাব্রত। পদে পদে তাহাতে মানুষ স্খলিতপদ হয়। সেরূপ বাধা পাইলে মাতৃত্বের ভ্রংশ ঘটে। মাতৃমূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি। ব্যভিচারিণীর মাতৃত্ব নাই।

এই বাধা লক্ষ্য করিয়াও নরনারীর বিবাহবিধি প্রণীত হইয়াছিল। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে নরনারী পরস্পর আকৃষ্ট হয়, বিবাহ সে প্রবৃত্তিকে একানিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মোন্মুখী করে। অথচ সে প্রবৃত্তির যাহা জাগতিক প্রয়োজন বলিয়া অনুমান হয়, সেই সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষাও ইহাতে চরিতার্থ হইতে পারে। তাই বিবাহ ধর্ম্মের সহায়। যে বাধার ইঙ্গিত করিয়াছি,তা দূরে রাখিতে হইলে এ সাহায্যের আবশ্যকতা আছে। তাই নারীর বিবাহই প্রশস্ত। ইহাতে প্রত্যবায়ের ভয় নাই, প্রত্যুত ধর্ম্মের উপকার আছে। প্রাকারতুল্য হইয়া বিবাহ-বন্ধন নারীর চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকে।

রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র অজেয় নহে। যে বাধা অনূঢ়ার পথে, পরিণীতার পথেও সে বাধা আছে। কিন্তু সকলে তাহা দেখে না, অথবা দেখিতে চাহে না। মনুস্মৃতিতে একটা অর্থবাদ আছে, মাতা পুত্রেরও নির্জ্জনে একত্র থাকিতে নাই। মনে আছে, এই নব্যভারতেরই এক প্রসিদ্ধ লেখক তাহাতে বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে, এ সম্বন্ধে দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। অনেকে বেশ সাহসী,তাঁহারা "বিকার হেতৌ সতি" বলিয়া কুমারসম্ভব কোট্ করেন। অথবা তাঁহারা স্বতঃশুদ্ধচিত্ত—কিরূপে যে মানুষে পাপস্পর্শ হইতে পারে, বুঝেন না, বুঝাইতে চাহিলে কাণে আঙ্গুল দেন। অথবা তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পাপ-সম্ভাবনা অত খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখাইতে নাই, পাছে তাহাতে অচিন্তিত-পূর্ব্ব পাপেরও চিন্তা আসে। যেন, কথায় কথায় হোশ্ইয়ার করিতে করিতে সাধুরও বা একটু চুরি করিতে ইচ্ছা হয়। অথবা তাঁহারা ভণ্ড—ইহাতে উহাতে পাপ সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াও, ইহাতে উহাতে পাপ সম্ভাবনা নাই বলা আবশ্যক বোধ করেন্। কেন না, সেরূপ পাপ সম্ভাবনা স্বীকার করিলে পাছে লোকে ভাবে, এ কেল্লাও বুঝি ফতে হয়। তাহাতে prestige থাকে না।

আর এক দল আছেন—তাঁহারা বড় ভীরু, বড় সজাগ, বড় সাবধান। দোষজ্ঞ, তাই বড় সাবধান। যত সাবধান হয়েন, কিছুতেই বেশী সাবধান হইলাম ভাবেন না। হিন্দুশাস্ত্রকারগুলি এই দলের। সকল শাস্ত্র ভরিয়াই উঠ, জাগো, এই যায়, ঐ যায়—এমনই একটা কোজাগর ধ্বনি শুনিতে পাই। ঐ অর্থবাদটায়ও সেই ধ্বনি। যে জাগ্রত, তারে স্পর্শ করে না; যে তন্দ্রিত, তার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথও এই ভীরুর দলে—মনুরই শিষ্য। মনু জানিতেন, বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বানকেও বিচলিত করে। স্বাতন্ত্র্যে এই অধঃপাতের কিছু সুবিধা হয়। কেন না, ভয়টুকু উড়িয়া যায়, আর যে লজ্জা মানুষের চিন্ময়ী তিরস্কারিণী, সে লজ্জাও পাতলা হয়। কিন্তু এখনও যেমন, তখনও তেমনই পুরুষই সমা-

জের নিয়ন্তা ছিল। নিয়ন্তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ চলে না। তাই মনু পুরুষের স্বাতন্ত্র্য রোধ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিধি নিয়মের শত নিগড়ে বদ্ধ করিয়া তবে পুরুষকে সে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন। নারী সম্বন্ধে সে কথা খাটে নাই, তাই নারীর স্বাতন্ত্র্য * নিষেধ করিয়াছিলেন। মাতৃত্বের পথে বহু বিঘ্ন দেখিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথও বুঝিয়াছেন, নারীর অবরোধ চাই।

এই কথাটা বুঝানই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এখন কথাটা বুঝিতে পারি। পাপ সম্ভাবনা দূরে রাখাই ভাল। সব দূর করিতে পারি না বলিয়া যতটা পারি, ততটাও করিব না, এ বড় পণ্ডিতের কথা নহে। অবরোধেরও অর্থ, যতদূর পারি এই পাপ-সম্ভাবনার পরিহার। যথেচ্ছ বিচরণ বা যথেচ্ছ পুরুষ-সংসর্গ নারীর ধর্ম্ম-ভ্রংশসম্ভাবী। অবরোধে সে সম্ভাবনার লাঘব হয়, তাই নারীর অবরোধই প্রশস্ত। এ ব্যবস্থায় সাম্যবাদীরও ক্ষোভের কারণ নাই। কেন না, নারীর অবরোধে পুরুষেরও অবরোধ ঘটে। বিবাহ-বন্ধনকে নারী চরিত্রের প্রাকার বলিয়াছিলাম। অবরোধকে তার পরিখা বলিতে পারি।

অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহা স্ত্রীপুরুষের বৈষম্যগ্রাহিণী হইয়া স্ত্রী জাতিকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করে। বৈষম্য তো আছেই বটে। কিন্তু সে বৈষম্য পুরুষের মনগড়া নহে। সে বৈষম্য লোপ করা অধর্ম্ম। তবে তার ইয়ত্তা কি, দেখাইয়াছি। স্ত্রী পুরুষে তার অধিক বৈষম্য নাই। সেরূপ বৈষম্য স্থাপন করা অধর্ম্ম। জ্ঞান বিজ্ঞানে নর নারীর তুল্য অধিকার—কোনও তারতম্য নাই, তাও দেখাইয়াছি। তবে যে বিষয় যার স্বধর্ম্ম পালনে পরিপন্থী হয়, তাহাতে তার অধিকার আছে বলিতে পারি না। সাম্যবাদীর কথিত ন্যায্য অধিকার পার্লেমেণ্টে বা কৌন্সিলে বসিবার অধিকার, বা এমনই কোনও অধিকার হইবে। সে অধিকার নারীর আপন অধিকার হইতে মহীয়ান্ নয়। মাতৃত্ব প্রজার যত কাছে পৌছে, অতি মহতী রাজনীতিও তত কাছে যায় না। নাইটিঙ্গেলের মাতৃত্বে যাহা করিয়াছিল, দশটা আদর্শ war officeও তাহা পারিত না। অথচ এ রাজনৈতিক অধিকার বহুবা চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া, জন্মাইয়া, অন্তর্ম্মুখীকে বহির্ম্মুখী করিয়া, নারীকে নারীর নিয়তি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। নারীর কর্ম্মক্ষেত্রে একটা আগন্তুক বিশালতা দিয়া, তার স্বধর্ম্ম শোষণ করিতে পারে। একটা চির জনদ্বন্দ্বিকটাহে পরিখণ্ডিত করিয়া মাতৃত্বের আদ্য রসটুকু বিশীর্ণ করিতে পারে। অধিকন্তু, যে কারণে অবরোধ আবশ্যক বলিয়াছি, সে কারণ এখানেও বিদ্যমান আছে। রাজনৈতিক অধিকার নারীর প্রেয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রেয়ঃ নহে। তাহাতে এমন বলিতে পার না যে, সমাজ চিন্তামাত্রই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে; বা একেবারে হাতে-কলমে পলিটিক্স্ না হইলে আর সেরূপ চিন্তার ফলোপধায়িতা নাই। অবরোধে তার ব্যাঘাত হয় না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন, পতি-পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিয়া অবরোধেও নারী মহাসভার মন্ত্রণা শাসন করিতে পারেন।

তবে যে অবরোধ নারীকে রাক্ষসীর

* বোধ করি বলা বাহুল্য, স্বাতন্ত্র্যের অর্থ Free will নহে।

মত দেখে, আজিও যাহা হিন্দুসমাজের অর্দ্ধেক জুড়িয়া আছে, সে এক অনার্য্য অধর্ম্ম্য অবরোধ—হয়ত মুসলমানের কাছে ধার করিয়া লইয়াছিলাম। পার তো কেহ হিন্দুসমাজের এ কলঙ্কটা মুছিয়া ফেল। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"—স্ত্রী আর শ্রীতে প্রভেদ নাই—আবার সে দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠা কর। অবরোধ পুরুষের জয়ধ্বজা নহে, সে কথটা ভুলিও না। অবরোধ নারীর একটা বহিঃসহায়মাত্র, তাও ভুলিও না। শুধু প্রাকারে, শুধু পরিখায়, দুর্গ দুর্গ হয় না। মনুও তা জানিতেন। জানিয়াই বলিয়াছিলেন, "ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলেই নারী রক্ষিতা হয় না; যে আপনারে আপনি রক্ষা করিতে পারে; সেই নারীই সুরক্ষিতা।" নারীকে সেই আত্মরক্ষার যোগ্য কর।

আবার মনু, আমার অবরোধ! পূরা না হউক, কোমল হউক—অবরোধ তো বটে! গ্রন্থটা যত্যই বড় (Revolutionary)। গ্রন্থকারও কিছু সৃষ্টিছাড়া—কমলাকান্ত বলিত, "যুগভ্রষ্ট"। সকল সমাজে, বিশেষতঃ রাডিকাল্ সমাজে, এ গ্রন্থের ভূয়ঃ প্রচার হউক। অতীতে এমন ভক্তিমান্, অথচ বর্ত্তমানে এত চক্ষুষ্মান্—এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ বহুদিন পাঠ করি নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

কাশ্মীর-কেশরী কেশব।

যে সময়ে ইউরোপে মহাবলী পোপের অন্যায় আস্পর্দ্ধার প্রতিরোধী হইয়া মহামতি মার্টিন লুথার খ্রীষ্টীয় সমাজকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, যে সময়ে স্পেন রাজ্যে তদ্দেশীয় অধার্ম্মিক রাজা এবং অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রজা পীড়ন নিরারণ জন্য বীরবর ডিগুজা গেব্রিল প্রাচীন রাজনৈতিক বিধিমালার সংস্কার প্রার্থী হইয়া রাজবিদ্রোহের হোমাগ্নিতে অতি সাবধানে এবং ধীরে ধীরে উৎসাহ-বায়ু প্রয়োগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গ দেশে পূত-সলিলা ভাগীরথীর তটে, নবদ্বীপ নগরে, কিশোর বয়স্ক শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহার তরুণ শিষ্য সমূহের হৃদয়-ক্ষেত্রে ভবিষ্য ভক্তি-তরুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সমূহ অল্পে অল্পে রোপণ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। ভাগীরথীর তটে বসিয়া যে মনোমোহিনী আশায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শাস্ত্রজ্ঞান, হরিভক্তি, সদাচার প্রভৃতির আলোচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই আশায় এবং ঠিক সেই সময়ে ভারতের আর এক প্রান্তে—সুদূর কাশ্মীর রাজ্যে, ঝেলম নদ তটে—আর একজন মহাপুরুষ অতি গম্ভীর ভাবে ভারতের ভাবী অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই মহাপুরুষের নাম কেশব মিশ্র। এই কেশব মিশ্র কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ হরিভক্তিতে মহাপুরুষ বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন; কেবল ত্রৈগ্রন্থিক জ্ঞানে কেশব মিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কেবল ত্রৈগ্রন্থিক জ্ঞানে নহে, ক্রিয়াজ সাধন জ্ঞানে এবং কৈবল্য ভক্তি তত্ত্বেও অপৌরুষেয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পশ্চিম প্রদেশে কেশবের এবং পূর্ব্ব প্রদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত ও কার্ত্তিত হইতেছিল। পরিণামে কেশব মিশ্র শাস্ত্রের

আচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য দেব ভক্তির আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরে শ্রীনগর এবং বঙ্গে নবদ্বীপ, সে সময়ে শিক্ষার লীলা ভূমি বলিয়া সম্মানিত ছিল। জয়পুর, মিথিলা, পুণা, কাশী, মাদুরা, কম্বাকনম, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে তৎকালে পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীনগর এবং নবদ্বীপ জ্ঞানোপার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কাশ্মীরের এবং নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। এই প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানে বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রাচীন কথা আমরা জানিতে সমর্থ হইব, এরূপ ভরসা করা যায়। প্রথমে কাশ্মীরের কথা বলিবার ইচ্ছা করি।

কাশ্মীর শব্দ সংস্কৃত নহে, যাঁহারা সংস্কৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। পারস্য "কশিদন্" ধাতু হইতে কশ্ শব্দের উৎপত্তি, কশিদন্ অর্থে আকর্ষণ, to draw, to attract বুঝায়; মীর অর্থে মহৎ the great; এই যৌগিক শব্দটীর প্রকৃত উচ্চারণ কশ্‌মীর—কাশ্মীর নহে। সমগ্র শব্দটীর অর্থ মহৎ আকর্ষণ the great attraction; এইরূপ নামকরণ হইবার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কাশ্মীরের নির্ম্মল জল, প্রাণশীতলকর বায়ু, বিহঙ্গ, বিমান-বিহারী বিবিধ বিহঙ্গ, নানা জাতীয় সুন্দর বন্য জন্তু, সুগন্ধিপূর্ণ তৃণ, মনোমোহন দুর্ব্বাদল, অরণ্য ও পর্ব্বতের অতুলনীয় শোভা, সহস্র সহস্র প্রকারের প্রসূন পুঞ্জ, নির্ঝরিণীর জল হিল্লোল, নরনারীর অপূর্ব্ব আকৃতি—বিশেষতঃ নারী জাতির দেবোপম রূপ, আহার্য্য দ্রব্যের প্রচুরতা ও সুলভতা, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং শিল্প ও সংগীত বিদ্যার ভূয়ো প্রচার দর্শন করতঃ মুসলমানেরা বিমুগ্ধ হইয়া এই স্থানের কশ্‌মীর (The great attraction) অর্থাৎ "মহা চিত্তাকর্ষণ" নাম দিয়াছিল। এই কাশ্মীর মুসলমান রাজ্যের এবং মুসলমান জাতিদিগের প্রধান প্রধান স্থান সমূহের সমীপবর্ত্তী বলিয়া আসিরিয়া, মেশোপটেমিয়া, জুডিয়া, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, কুর্দ্দিস্থান, আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতিস্থানের সওদাগরেরা এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত। নানা দেশ হইতে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বণিক, ভ্রমণকারী, পীড়িত নরনারী প্রভৃতি এখানে যাতায়াত করায় কাশ্মীরের প্রধান নগর তখন অপূর্ব্ব সম্ভ্রম ও অপূর্ব্ব গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানে যতদূর সদ্ভাব হইতে পারে, কাশ্মীরে সেরূপ সদ্ভাব ছিল, এই জন্য মুসলমানের হাতে কাশ্মীর কখনই অপমানিত বা অত্যাচারিত হয় নাই; কাশ্মীরে মুসলমান কখনও বৈরীভাব দেখায় নাই; এইরূপ শান্তি ছিল বলিয়া হিন্দুরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে বহু সংখ্যক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা দিতেন এবং আলোচনা করিতেন। বহু সংখ্যক পণ্ডিত, বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী এবং বহু সংখ্যক টোল বর্ত্তমান ছিল বলিয়া সেকালে কাশ্মীর 'বিদ্যাময় দেশ' নামে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এক্ষণে নবদ্বীপের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহি-

ত্যের আলোচনায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "শিক্ষা-নগর" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে পড়া যায়, তৎকালে নবদ্বীপে ভাগীরথী নদীতে প্রায় অষ্ট সহস্র স্নানের ঘাট ছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোকে ঐ সকল ঘাটে স্নান করিত। হণ্টার, থরন্টন্, উইক্লিফ্ প্রভৃতি বলেন, সে সময়ে নবদ্বীপের লোক সংখ্যা সাত লক্ষের ন্যূন ছিল না। নবদ্বীপ বঙ্গের রাজধানী ছিল না, বণিকের এখানে বাস বা বিপণি ছিল না, কোনও প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় জন্য নবদ্বীপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, কিন্তু কেবল কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতির শিক্ষা ও আলোচনার জন্য প্রাচীন নগর লক্ষ লক্ষ লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। লেখা পড়ার চর্চ্চা ভিন্ন এখানে আর কোনও কথাটী ছিল না। (১)। চাকুরী করা, কৃষিকর্ম্ম করা, বাণিজ্য বা ব্যবসা করা, নবদ্বীপের লোকেরা অতি নীচ কর্ম্ম বলিয়া ভাবিত; বিদ্যোপার্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ব ব্যঞ্জক এবং মোক্ষ লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ উপায় বলিয়া তাহারা বিবেচনা করিত। বিদ্বানের সহিত কুমারী কন্যার বিবাহ হয়, ইহাই মাতার প্রার্থনা ছিল; ধনবান পাত্রকে কেহ প্রার্থনা করিত না, কিন্তু বিদ্বান পাত্রের হস্তে অবিবাহিত কন্যাকে সমর্পণ করা পরম সৌভাগ্য বলিয়া লোকে বিবেচনা করিত। রাজমন্ত্রী কিম্বা বাদসা স্বয়ং আসিলেও নবদ্বীপবাসীর নমস্কার প্রাপ্ত হইতেন না, কিন্তু সুপণ্ডিতের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলেই লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিত। সমগ্র নগরে অসংখ্য টোল ছিল, অসংখ্যাসংখ্য পণ্ডিত এবং অসংখ্যাসংখ্য বিদ্যার্থীপুঞ্জে সহরটী সততই গুল্‌জার থাকিত। পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, মন্দিরে, টোলে, হাটে, বাজারে, মজ্‌লিষে, দরবারে, সভায়, গলিতে, গৃহস্থের গৃহে, অতিথিশালায়, সর্ব্বত্রই একই কথা—কেবল গ্রন্থ লইয়াই আলোচনা, কেবল গ্রন্থ লইয়াই তর্ক এবং বিতর্ক। একজন সুলেখক লিখিয়াছেন,

"In short, the whole energies of the city were directed towards the creation of learned men."

বৃন্দাবন ঠাকুর লিখিয়াছেন ;—

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রতিদিন গড়ে সপ্ত সহস্র ছাত্র ভাগীরথীর ঈশান কোণস্থিত তিনটী টোলে ব্যাকরণ পড়িত, এরূপ অসংখ্য টোল ছিল।"

আর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রতিদিন সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী টোলে ভর্ত্তি হইত এবং সহস্র যুবা লেখাপড়া শেষ করিয়া প্রশংসা সহকারে টোল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। বহু সংখ্যক নগর হইতে বহু সংখ্যক বালক ও যুবকেরা বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নবদ্বীপে আসিত, তাহার কারণ এই যে, নবদ্বীপে না আসিলে এবং নবদ্বীপে শেষ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ না হইলে লেখাপড়া সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইত না।" (২)

(১) "Nuddea was a very large and populous city ; it was, in fact, the most famous city of learned men. The one absorbing idea of all the respectable citizens was the acquisition of knowledge. The old and the young, men and women, among the higher classes, were constantly engaged in intellectual pursuits."——Lord Gouranga By S. K. Ghosh, Intro. Page IX.

(২) "The intense devotion to learning by the majority of the citizens of Nuddea gave a peculiar character to the town, distinguishing it from any other city in the world. Students thronged everywhere. They filled the market place, the streets, the bathing ghats and the strand. They assembled in thousands at every convenient spot to hold literary discus-

নবদ্বীপের সংস্কৃত টোল (কলেজ) সমূহে কোনও ছাত্রকে বেতন দিতে হইত না। বিদ্যার্থীগণ পুস্তক, আহার, বস্ত্র এবং আবাস স্থান প্রাপ্ত হইত। কোন কোন বিদ্যার্থী কিছু কিছু বৃত্তিও পাইত। ছাত্রেরা নবদ্বীপের তখন the only object of interest ছিল, ইহারা তখন বঙ্গদেশের the observed of all observers ছিল। এই Factotum বিদ্যার্থীদিগের দাপটে ভাগীরথী কাঁপিয়া উঠিত, নবদ্বীপের বাজার ত্রাহি মধুসূদন করিত। কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ সকল বিষয়েই শিক্ষার চূড়ান্ত বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র পাঠের অভাব অত্যন্ত অধিক হওয়ায় টোলগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে নাই। মিথিলায় তখন ন্যায়ের চর্চ্চা ছিল, বাঙ্গালী বিদ্যার্থীগণ মিথিলায় গিয়া গৌতমবুদ্ধের "ন্যায়" পড়িয়া ও শিখিয়া আসিত। মিথিলাবাসীরা বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সকল বিষয়ে অসাধারণ ধীশক্তি বিশেষতঃ ন্যায়-শাস্ত্রে সুন্দর বোধশক্তি দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল "আমরা বাঙ্গালীকে ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক পড়াইব কিন্তু তাহাদিগকে পুস্তকের কাপি লইয়া যাইতে দিব না, কারণ তাহা হইলে তাহারা স্বদেশে গিয়া ন্যায়ের টোল খুলিবে এবং মিথিলার টোলগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের রামভদ্র নামে মহা পণ্ডিত এক সভা করিয়া এই অভাব অপনোদন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। অবশেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করতঃ তাহার আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়াছিলেন, তিনি ঝটিতি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া গ্রন্থাকারে মুখস্থ শাস্ত্র খানিকে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ শাস্ত্র পড়াইবার জন্য নবদ্বীপে সর্ব্ব প্রথম ন্যায়ের টোল প্রতিষ্ঠা করেন। "This almost superhuman feat immortalised his name." মিথিলার ন্যায় টোলাপেক্ষা সার্ব্বভৌমের ন্যায়-টোল অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি ন্যায়শাস্ত্রকে আরও বিস্তৃত, আরও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এবং আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রণীত "চিন্তামণি" জগতে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভবানন্দ, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি তাঁহার অনেক মেধাবী শিষ্য ছিল; রঘুনাথের "দিধিতি" এবং কৃষ্ণানন্দের স্মৃতি শাস্ত্র ২৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাই বঙ্গদেশের উত্তরাধিকারী আইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। একজন সুলেখক লিখিয়াছেন :—

> "সার্ব্বভৌমের কলেজে তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিত। এই সকল বিদ্যার্থী পরিণামে জগতে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি সমূহ ধরাধামে অবিনশ্বর ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।"

নবদ্বীপের সেই ভক্তির অবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের

---

sions. When the students walked in the street they talked on literary subjects. Literary tournaments were hold everyday at every ghat of the city. And so earnest were the combatants, that sometimes these tournaments ended in free fights, and the defeated parties had to swim across to the other bank of the river to save themselves. Each student held a book in his left hand,—that being his distinguishing badge to mark him out from others. It was his ornament, his friend, and his strength, which secured for him respectful attention everywhere. * * * Thousands of students everyday came into Nuddea from all parts of Hindoosthan, some to begin and some to finis their education, and thousands left everyday after having obtained their diplomas."
Gouranga, Intro, XI.

শিষ্য ছিলেন এবং সর্ব্বভৌমের টোলেই তিনি শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ক্রমে শ্রীচৈতন্য দেব নানা শাস্ত্রে ও নানা বিষয়ে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মহা পণ্ডিত এবং মহা বিবেকী ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেবোপম তপ্ত কাঞ্চনবৎ দেহ, পদ্মপলাশ-লোচন, শালপ্রাংশুবাহু, বিশাল বক্ষঃ, নির্ম্মল স্বভাব, অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রগাঢ় হরিভক্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া লোকে তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের মনোমোহন স্বর যে শুনিত, সেই বিমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তিনি পথ দিয়া চলিয়া গেলে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা "স্বর্গের সুগন্ধি আঘ্রাণ করিলাম" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিত। তখনকার বৃদ্ধেরা বলিতেন, "লেখা পড়া শিখিয়া, মহা পণ্ডিতেরা ঘোরতর তার্কিক হয় এবং শুষ্ক তর্ক করিতে করিতেই তাহাদের জীবন কাটিয়া যায়, হরিভক্তি কিম্বা অটল বিশ্বাস অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান কাহারাও মধ্যে দেখিতে পাই না, কেবল নিমাই (অর্থাৎ চৈতন্য) পণ্ডিতেই এই সকল গুণ দেখিতে পাইতেছি।" ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের নাম ও যশঃ দিকদিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল। ভারতের সর্ব্বত্র চৈতন্য পণ্ডিতের নামে লোকে বিদ্যা, জ্ঞান, শিক্ষা ও ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। সকলেই স্থির করিল, গৌরাঙ্গ মিশ্র মানব নহেন, ইনি জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎ দেবতা।

এ দিকে কাশ্মীরীকুলাবতংস কেশব মিশ্র ভারতের আর এক প্রান্তে মহাপণ্ডিত ও মহাবলী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তিনি কয়েকবার ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিব্রজন করিয়া বড় বড় দিগ্গজ পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে কাশ্মীর-কেশরী, দিগ্বিজয়ী, মহাবলী, অজেয়, ত্রিদিবের পণ্ডিত, সরস্বতীর বরপুত্র প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত করিত। রাজা ও সর্দ্দারগণ তাঁহার সম্মুখে শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইতেন, পণ্ডিতেরা ভয়ে মুখ তুলিতে পারিত না, এবং সাধারণ লোকে তাঁহাকে দৈববলসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বিদ্যাদেবী সরস্বতী তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া তাঁহাকে পরিচালনা করেন, লোকের এই বিশ্বাস বড়ই বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, তখন রেল, ডাক বা তার না থাকিলেও, এক দেশের সংবাদ অন্য দেশে প্রেরণ করিবার জন্য সুচারু বন্দোবস্তের অভাব ছিল না। পূর্ব্ব হইতেই নিমাই পণ্ডিতের নাম ও ক্ষমতা কেশব মিশ্রের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল ; কেশব মিশ্রের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা বঙ্গদেশেও কম প্রচারিত হয় নাই। দেখিতে দেখিতে কেশব মিশ্র আবার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন, এবারে নিমাই পণ্ডিতকে পরাস্ত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভাগীরথী তটে পণ্ডিত কেশবের সম্প্রদায় স্বল্পকাল মধ্যে মহাসমারোহে উপস্থিত হইল। তাঁহার দিগ্বিজয়ের অভ্রভেদী ধ্বজা নদী তটে উড়িল, দমামা ঘোষিত হইল, তুরীভেরী নিনাদিত হইল এবং নগরের সর্ব্বস্থানে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইয়া গেল। কেশবের হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, শিষ্য, বিদ্যার্থী, সেবক, সহযোগী পণ্ডিত প্রভৃতিতে সহর গুল্‌জার হইয়া উঠিল। কেশব মিশ্র বলিলেন, "আমি অজেয়, আমাকে কেহ এ

পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারে নাই। নদীয়ায় আমাকে কোনও পণ্ডিত যদি তর্কে পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিব, যদি নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা আমার নিকট পরাস্ত হয়, তাহা হইলে আমি নদীয়ার গুরু বলিয়া পূজ্য হইব।" এই ভয়ঙ্কর ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইলে পর চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেশব পণ্ডিতের লোকেরা বলিয়া উঠিল "আমাদের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র। মাতা সরস্বতী সদতই ইঁহার সঙ্গে থাকেন, আমাদের পণ্ডিতকে বিদ্যায় হারাইয়া দেয় এমন লোক পৃথিবীতে নাই।" লোকে এইরূপ জনরব পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, এখন কথায় সাধারণের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। পণ্ডিত-সমাজ সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রভু গৌরাঙ্গ দেব এ সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং কেশব মিশ্র শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু প্রজ্বলিত হুতাশনের নিকটে পতঙ্গ কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? কাশ্মীর-কেশরী কেশব পরাজিত হইল, তাহার মুখ দেখাইবার আর উপায় রহিল না। (১) সেই প্রবীণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব মিশ্র, তরুণ-বয়স্ক শ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। এক্ষণে কেশব, চৈতন্যের শিষ্য!! কেশব বলিলেন, "বাঙ্গালীর অভ্যাস ও বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ধন্য বটে। আমি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালীর মত ধীশক্তি কাহারও দেখিনাই।"—

পাঠক মহাশয়! কাশ্মীর-কেশরী কেশবের শ্রীমুখ হইতে যে কয়েকটী পংক্তি নিঃসৃত হইয়াছিল, উপরে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এই কয়েকটী কথাই এই প্রবন্ধের সার—ইহাই ইহার Keynote, যে মহা দিগ্গজ,—মহা ধুরন্ধর,—মহা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র রাজপুতনা, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহিসুর, মালাবার, মধ্য প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া "অজেয়" "অপৌরুষেয়" প্রভৃতি উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ব্যক্তি একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের নিকটে পরাজিত হইয়া গেলেন। যাঁহারা চৈতন্যদেবকে ভগবান বা অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই ঘটনা পাঠ করিয়া বলিতে পারেন "ভগবান বা অবতারের নিকটে একজন মানব দেহধারী পণ্ডিত পরাস্ত হইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কি?" চৈতন্য দেব মনুষ্য ছিলেন কি অপৌরুষেয় ছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার মীমাংসা করিতে বসি নাই, কিন্তু কেশব মিশ্রের সারগর্ভ উক্তিতে যে কয়েকটী গুরুতর কথা আছে, তাহারাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে নানা কারণে "বাঙ্গালী" এক অপূর্ব্ব মহাশক্তি বলিয়া গণ্য। কেবল শারীরিক শক্তি ভিন্ন প্রায় আর সকল বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি, রাজপুত, মাদ্রাজী, মালাবারী, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের সকল জাতিকেই পরাস্ত করিয়াছে; অন্যদিকে ইউরোপ ও আমেরিকার জ্ঞান বিজ্ঞান-প্লাবিত প্রাজ্ঞ সমাজকেও বাঙ্গালী চমকিত করিয়া মহাগৌরবাস্পদ হইয়া উঠি-

(১) এই মহা বিচারের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে পাঠক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

রাছে। আমি মুসলমান শাসনের সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের কথা তুলিব না এবং তুলিতেছি না; বৃটীশশাসনের অভ্যুদয়ের পর হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ফর্দ্দ আমি দিতেছি। বক্তৃতা বিভাগে, রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরব; প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ভাষাবিদ্‌গণের মধ্যে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্বামী পূরাণ পুরী, স্বামী সোমানন্দ ভারতী, রাজা রামমোহন রায়, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম সম্ভ্রমের সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম, আসিয়া খণ্ডে অদ্বিতীয়। বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, গণিতে আনন্দমোহন বসু ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্ব্বিসে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজনৈতিক আন্দোলনে সুরেন্দ্র,লালমোহন প্রভৃতি, লেখক-বিভাগে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি, এবং সাধারণ হিতকরকার্য্যে বিদ্যাসাগর,মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি পৃথিবীর সভ্য ও প্রাজ্ঞ সমাজে সম্মানিত হইবার যোগ্য। ইহাদের সমতুল্য ব্যক্তি ভারতে এখনও জন্মে নাই। বাঙ্গালীর ভাষা এক্ষণে আরব্যোপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক অশ্বের দ্রুতগতি সহকারে উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্তমার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। আরব্য ও য়িহুদী ভাষা ভিন্ন সমগ্র আসিয়া ও আফ্রিকার আর কোন ভাষাই বাঙ্গালার সমতুল্য হয় না। বাঙ্গালীর বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, নব্যভারত এবং ভারতীর সহিত তুলনীয় হইতে পারে, এমন মাসিক বা সাময়িক পত্র আসিয়া বা আফ্রিকায় আর কোথায় মিলে? বাস্তবিক অনেক গুণে, অনেক সামর্থ্যে বাঙ্গালী এক্ষণে গুণশালী এবং মহাবলী, কিন্তু অনেক গুণে গুণী হইয়াও বাঙ্গালীর "গুণ হয়ে হলো দোষ বিদ্যায় বিদ্যায়"। চিরকাল সকলের অবস্থা সমান থাকে না; উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়া বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ ও বাঙ্গালী জাতি যেন ক্রমে ক্রমে অবনতির আবর্জ্জনাপূর্ণ গহ্বরে আসিয়া অধঃপতিত হইতেছে। যে সকল গুণে বাঙ্গালী বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীর একটা জিনিষ এখনও খুব ভাল আছে, সেই জিনিসটা রক্ষা করিতে পারিলে অন্যান্য লুপ্ত জিনিষের ক্রমে ক্রমে উদ্ধার হইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। সেই ভাল জিনিষটার নাম "Brain" মস্তিষ্ক; বাঙ্গালীর মস্তিষ্কটা খুব ভাল, ইহা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই উর্ব্বর মস্তিকে অনেক ভাল জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু Culture এর আবশ্যক, এখন চাই Culture. এই টুকু বিশেষ দরকার। শরীরের প্রধান স্থান মস্তিষ্ক,মস্তিষ্ক খারাপ হইলে মানুষ পাগল হয়, মস্তিষ্ক ভাল থাকিলে মানুষের দ্বারা বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কখনও যুদ্ধে গমন করেন নাই, অস্ত্র শস্ত্র অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু কেবল (Brain) মস্তিষ্কের জোরে পৃথিবীকে করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মস্তিষ্ক ও জিহ্বার শক্তি এখনকার বাঙ্গালীর মহাশক্তি। এই দুই শক্তিতে বাঙ্গালী অজেয় বলিয়া ভারতের অন্যান্য জাতি

বাঙ্গালীর নিম্ন শ্রেণীতে গণ্য, এই দুই শক্তির জন্যই আজিকালি ইউরোপ ও আমেরিকা বিস্মিত নয়নে বাঙ্গালা দেশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই, দুই শক্তির প্রাবল্য থাকিলেও কার্য্যকরী শক্তি বাঙ্গালী জাতি মধ্যে খুব কমিয়া আসিতেছে; যাহাতে এই কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি হইলে ভগবান সহায় হয়েন, দেবতারা উৎসাহ দেন, জননী জন্মভূমি সুপুত্রের সেবাগ্রহণ করিয়া পুত্রকে অতুল বলে বলীয়ান করে এবং স্বজাতি সেই দেশসেবকের সখারূপে বর্ত্তমান থাকেন। যখন প্রকৃতরূপে কার্য্যকরী শক্তি জন্মে, তখনই প্রকৃতরূপে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং তখনই এক অনুপম গুপ্ত বলে সেই মহাবলী জাতির মহাপুরুষেরা যোগসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিদিগের শক্তির ন্যায় কত শত পৃথ্বিবিজয়ী, জগৎকেশরী এবং পরাক্রমী কেশব মিশ্রকে কটাক্ষ মধ্যে পরাজিত ও করতলগত করিয়া তুলে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আমার প্রত্যুত্তর। (২)

(গত বারের শেষ)।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গীতা ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তের যে কয়েকটী বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, পূর্ব্ববারে আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। পূর্ব্বের প্রবন্ধটী দীর্ঘ হইয়া পড়াতে, গৃহস্থাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা শঙ্করের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে দেখাইয়াছিলাম। এ বিষয়টী অতীব গুরুতর। শঙ্করের উপরে এতদ্দেশে ও ইউরোপে যে যে বিষয়ে অবিচার করা হইয়াছে, এ বিষয়টী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। শঙ্করের মায়াবাদের কলঙ্ক, উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে, অতি বিস্ময়কর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও চমৎকার যুক্তি বলে, উত্তমরূপে ক্ষালন করিয়া, শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য হিন্দু মাত্রই উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি, গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করের উপরে অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আমরা, এই প্রস্তাবে, এ বিষয়ে শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইব। শঙ্করের নিজের কথায় আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইব।

অনেকে বলেন "শঙ্কর যখন ব্রহ্মজ্ঞানে বিন্দুমাত্র কর্ম্মেরও প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, ইহাই শঙ্করের অভিপ্রায়। শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।" আমরা এ কথা স্বীকার করি না। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণবাদের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়া, এক দিকে, লোকে উহাকে সর্ব্বশূন্যবাদে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল এবং যে সময়ে, অপর দিকে, বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল,—যখন প্রাণশূন্য যজ্ঞীয় ধূমের জালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, মহাত্মা

শঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা ও পতনোন্মুখতা, অপর দিকে কর্ম্মপ্রধান বৈদিকধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব, এ দুই এর সন্ধি-সময়ে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিলেন" (পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ)। তিনি দেখিলেন, লোকে ব্রহ্মজ্ঞান ত একেবারে ভুলিয়া গেল; কেবলই প্রাণশূন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, কাম্যকর্ম্মে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে;—এই মহানিষ্ট নিবারণের জন্য, তিনি তাঁহার সমস্ত ভাষ্যে, এই বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের ভেদ দেখাইয়া, যাহাতে লোকে ব্রহ্মজ্ঞানেরই অনুষ্ঠান করে,—সেই নিবৃত্তি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে,—তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কাম্যকর্ম্মই যত অনিষ্টের মূল; কেন না, তাহার অনুষ্ঠানে কামনা থাকায় লোকে ব্রহ্মজ্ঞান ভুলিয়া, তাহাতেই মত্ত হইয়া পড়ে। নিত্যকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতু, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কারণ; তাহা কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই।

"ব্রহ্মবিদ্যায়াং কাম্যৈকদেশবর্জ্জিতং কৃৎস্নং কর্ম্মকাণ্ডং তাদর্থ্যেন বিনিযুজ্যতে।" (বৃহঃ উপঃ—শঙ্কর ভাষ্য)।

কাম্যকর্ম্ম ছাড়া, আর সমুদয় উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মে ব্রহ্মবিত্মার্থীর প্রয়োজন আছে, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।

"ন হি কর্ম্মকাণ্ডেন পর আত্মা প্রকাশ্যতে; আত্মনোঽন্যবিষয়া বিলক্ষণা এষণা" (বৃহঃ উপঃ ভাষ্য, ৪।৫)।

কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য না থাকায়, কেবল কামনার দিকে লক্ষ্য থাকায়, সে সকল কর্ম্মে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না। ব্রহ্ম চাপা পড়েন। এই জন্যই "ন প্রকাশ্যতে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।০ আবার দেখুন:—

"যদা বেদানুবচনশব্দেন নিত্যঃ স্বাধ্যায়ঃ বিধীয়তে, তদা উপনিষদপি গৃহীতৈবেতি বেদানুবচন শব্দার্থৈকদেশো ন পরিত্যক্তো ভবতি। কথং নিত্যস্বাধ্যায়াদিভিঃ কর্ম্মভিঃ আত্মানং বিবিদিষন্তি?—নৈষ দোষঃ; কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিহেতুত্বাৎ। কর্ম্মণা সংস্কৃতা হি বিশুদ্ধাত্মানঃ শক্নুবন্ত্যাত্মানং বেদিতুং" (বৃহঃ উপঃ ভাষ্য)।

পাঠক দেখুন, শঙ্কর অতি স্পষ্ট কথায় কি বলিতেছেন। কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগই বিহিত। কিন্তু উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম চিত্তের সংস্কার করিয়া থাকে বলিয়া, উহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়; অতএব তাহার অনুষ্ঠান বিধেয়। কেন না, সে সকল কর্ম্মে ব্রহ্মই লক্ষ্য থাকেন। আবার শুনুন, শঙ্কর বলিতেছেন:——

"কর্ম্মাণি সংস্কারার্থানি আচক্ষতে; জ্ঞানযজ্ঞাঃ সংস্কারার্থাঃ। দানেন,—দানমপি পাপক্ষয় হেতুত্বাৎ ধর্ম্মবৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ। তপঃ শব্দেন সর্ব্বমপি নিত্যং কর্ম্ম উপলক্ষ্যতে। এবং কাম্যবর্জ্জিতং আত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেন মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং কর্ম্মকাণ্ডেন সহ অস্য একবাক্যতাবগতিঃ। এবং যথোক্তেন আত্মানং বিদিত্বা মুনির্ভবতি" (শঙ্কর ভাষ্য,—বৃহঃ উপঃ)।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, তবে কেন শঙ্কর সন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গস্বরূপে বর্ণনা করিয়া, এক পরিব্রাজকাশ্রমকেই মোক্ষের আশ্রম বলিয়াছেন? অনেকেই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে গোল করিয়া, শঙ্করের উপরে নিতান্ত অবিচার করিয়াছেন। আমরা এই অংশে সহৃদয় পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই রহস্য টুকু বুঝিলে, শঙ্করকে

আর দোষ দিবার অবসর থাকে না। এই টুকু বুঝিলে, শঙ্কর যে গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান নিষেধ করিয়াছেন,—এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না।

যেখানেই শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যা ও মুক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি একেবারে সম্পূর্ণ চরমাবস্থার ব্রহ্মজ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

"সর্ব্বক্রিয়া-কার কোপমর্দ্দ স্বরূপায়াং বিদ্যায়াং"।

এ বিদ্যা লব্ধ হইলে, আর ক্রিয়া ও কারক ও ক্রিয়ার ফল, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—ইহাদের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না।

বন্ধন-নাশ এবহি মোক্ষো, ন কার্য্যভূতঃ।

যখন সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন, যখন সর্ব্বকর্ম্ম ধ্বংশ হয়, সেই অবস্থার নামই মুক্তি।

"ন হি ব্রহ্ম কত্রাদ্যায় প্রত্যয়োপমর্দ্দে, ব্রাহ্মণেনেদং কর্ত্তব্যং, ক্ষত্রিয়েনেদং কর্ত্তব্যং, বিষয়াভাবাৎ আত্মানং লভতে বিধিঃ, যস্যৈব পুরুষস্য উপমর্দ্দিতঃ, তস্য তৎ প্রত্যয়সন্ন্যাসাৎ তৎকার্য্যানাং কর্ম্মণাং অর্থ প্রাপ্তশ্চ সন্ন্যাসঃ"।

যখন ভেদ জ্ঞান চলিয়া গিয়াছে, যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ জন্মিয়াছে, তখন আবার কর্ম্ম কিসের? এ অবস্থায় কাম্য বা নিত্য কোনও রূপ কর্ম্মের প্রবেশ লাভ অসম্ভব। তখন আশ্রমাদিই বা কোথায়?

"সাধন নিরপেক্ষৈব পুরুষার্থ সাধনং, বর্ণাশ্রমাদি প্রত্যয়ো পমর্দ্দাচ্চ" (বৃহঃ উপঃ ভাষ্য ৪।৪।১)

কাম্য কর্ম্মমাত্রেই, কোন না কোন কামনালাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়; কামনার দিকেই তাহাতে লক্ষ্য থাকে।

"পুত্রাদি সাধনানি নাত্মপ্রাপ্তি সাধনত্বেন বিশেষিতত্বাৎ" (৪।৪।১)।

সম্পূর্ণরূপে এই সকাম কর্ম্ম নিষেধ করাই শঙ্করের একান্ত লক্ষ্য ছিল। বৈদিক কাম্যকর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা একান্ত পৃথক্;—ইহা তিনি বার বার বলিয়াছেন।

মনুষ্যলোক পিতৃলোক দেবলোক সাধনত্বেন হি পুত্রাদি সাধনানি শ্রুতানি, ন আত্মপ্রাপ্তি সাধনত্বেন। ন চ ব্রহ্মবিদো বিহিতানি, কাম্যত্বশ্রবণাৎ। ব্রহ্মবিদশ্চ আত্মকামত্বাৎ, আত্মকামস্য কামনানুপপত্তেঃ"।

ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ মননাদি ও অভ্যাস বৈরাগ্যাদির আচরণ করিতে তিনি বিধি দিয়া গিয়াছেন। কামনাশূন্য হইয়া, যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে কেবল ব্রহ্মই একমাত্র লক্ষ্য হন এবং যে অনুষ্ঠান কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেরই পোষক, এরূপ কর্ম্ম করিতে তিনি কোথাও নিষেধ করেন নাই।

"অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাংপ্রতি উপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাৎ শ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং" (তৈত্তিরীয় ভাষ্য, শিক্ষাবল্লী)।

"সর্ব্বৈ র্হি যজ্ঞদানতপোভিঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ আত্মজ্ঞানং উৎপাদ্যং" (ঐতরেয় ভাষ্য, ১)।

"মানসানাঞ্চ ধ্যানজ্ঞান বৈরাগ্যাদীনাং সন্নিপত্য উপকারকং" (বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৬।৪।১৫)।

"ব্রহ্মবিদ্যায়াং কাম্যৈকদেশ বর্জ্জিতংকৃৎস্নং কর্ম্মজাতং বিনিযুজ্যতে' (বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৬।৪।২২)।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, শ্রবণ মননাদি ও অভ্যাস বৈরাগ্যাদির অনুষ্ঠান, মানসিক ধ্যান ও উপাসনা,এমন কি কামনাবর্জ্জিত যজ্ঞদানাদির অনুষ্ঠান করা, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে শঙ্কর স্পষ্ট বলিতেছেন। সুতরাং গৃহী ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে অধিকারী নহে, একথা আদৌ টিকিতেছে না। এরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা দিবার হেতু এই যে, এ সকল কর্ম্মে বৈদিক কর্ম্মের ন্যায়,কামনার গন্ধমাত্রও থাকেনা; এগুলি চিত্তশুদ্ধির সহায়, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ।

"এতানি কর্ম্মাণি সংস্কারার্থানি" (বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ৬।৪।২২)।

"সংস্কার দ্বারেণ আত্মজ্ঞানসাধনত্বমপিকর্ম্মণাং" (ibid, ৬।৪।১৫)।

শঙ্করাচার্য্যের এই ভিন্নতাটুকু বুঝিতে

না পারিয়া, অনেকে মনে করেন যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মপথে অগ্রসর ব্যক্তিরও, যেন কর্ম্মত্যাগ বিধেয়। কিন্তু ইহা শঙ্কর কোথাও বলেন নাই।

"আত্মতত্ত্বস্য সর্ব্বস্য আত্মব্যতিরেকেন কারকং ক্রিয়াফলংবা অস্তি। তস্মাৎ পরমার্থাত্মৈকত্ব প্রত্যয়ে ক্রিয়াকারকফলপ্রত্যয়ানুপপত্তিরতো বিরোধাৎ ব্রহ্মবিদঃ ক্রিয়ানাং তৎসাধনানাঞ্চ অত্যন্তং নিবৃত্তিঃ" (বৃহদারণ্যকভাষ্য, ৪।৪।১৪)।

পাঠক দেখুন, শঙ্করের এই উক্তি চরম-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কি না? যাহার সম্পূর্ণ-রূপে একত্ব-প্রত্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহার আবার কর্ম্ম কিসের? তাহার পক্ষে, নিত্য-কর্ম্মেরও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে-ছেন, তাঁহারও কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই, একথা কে বলিল? যেথানেই শঙ্কর "সন্ন্যাস"কে আত্মজ্ঞানের অঙ্গ বলিয়াছেন, ("ব্রহ্ম-বিদ্যায়া অঙ্গত্বেন সন্ন্যাসো বিধিৎসিতঃ", বৃহঃভাষ্য, ৪।৪।১), সেই স্থলে আত্মজ্ঞানকে তিনি চরমাত্ম-জ্ঞান, অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিপক্ক, ভেদজ্ঞানরহিত, ও ঘোরতর অদ্বৈত জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া-ছেন। শঙ্করের "জ্ঞান" অর্থ, সমুদয় অজ্ঞা-নের একেবারে ধ্বংস, সুতরাং সে অবস্থায় সর্ব্বত্র আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে, তখন সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় ("ন বিপরীত প্রত্যয়ো বিদ্যাবত উৎপদ্যতে")। এরূপ জ্ঞান হইবা মাত্রই "মোক্ষ" প্রাপ্তি ঘটে।

"অবিদ্যাপগমমাত্রত্বাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য"।

"বিদ্যাকালানন্তরিতত্বাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য" (বৃহঃ ভাষ্য, ৩।৪।১)।

"আত্মবিষয়ং জ্ঞানং যৎকালং, তৎকালএব অজ্ঞা-ননিবৃত্তিরোভাবঃ" (ibid)।

এরূপ চরমজ্ঞান লব্ধ হইলে; আর কোনও কর্ম্ম থাকে না। এই জন্যই তিনি "জ্ঞান" ও "মোক্ষ"—এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের প্রবেশ নাই, এই কথা বলিয়াছেন। এরূপ "জ্ঞান" ও "কর্ম্ম", সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ, ইহা দেখানই শঙ্করের অভিপ্রায়।

"ব্রহ্মৈকত্ববিদ্যায়াং কর্ম্মাধিকারবিরোধস্য উক্তত্বাৎ" (ibid, ৪।৫।১)।

এইরূপ জ্ঞানে কাম্যকর্ম্মের ত কথাই নাই, উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মেরও স্থান নাই। কেন না, তখন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি, উপাসনার নিষেধ করিয়াছেন:—

"তদুপাসনং অস্মিন্‌পক্ষে ন বিধাতব্যং" (ibid, ৩।৪।৬—৭)।

নতুবা ব্রহ্মসাধকের পক্ষে তিনি উপা-সনার নিষেধ করেন নাই।

পাঠক একটা স্থল দেখুন। শঙ্কর এক স্থলে বলিতেছেন:—

"মোক্ষঃ "অসংস্কার্য্যঃ" অসাধনদ্রব্যাত্মকত্বাৎ (*i. e.* নিত্যশুদ্ধত্বাৎ নিগুর্ণত্বাচ্চ মোক্ষস্য—আ গিরি)—শঙ্কর ভাষ্য, বৃহঃ উপঃ, ৫।৩।১"।

এস্থলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই এখানে সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম সম্ভাবনা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু শঙ্কর আবার অন্য এক স্থলে কি বলিতেছেন, দেখুন:—

"জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ "সংস্কারার্থাঃ"। সংস্কৃতস্যচ বিশুদ্ধ সত্বস্য জ্ঞানোৎপত্তি প্রতিবন্ধেন ভবিষ্যতি। এবং কাম্য বর্জ্জিতং নিত্যং কর্ম্মজাতং সর্ব্বং আত্মজ্ঞানোৎ-পত্তিদ্বারেণ মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে (বৃহঃ ভাষ্য, ৬।৪।২০—২২)।

অর্থাৎ উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম মোক্ষের সাধন। পাঠক দেখুন, পূর্ব্বে শঙ্কর বলি-লেন যে, "মোক্ষের" কোন প্রকার সাধন নাই, মোক্ষে কোন কর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। আবার এস্থলে তিনি বলিলেন

যে, মোক্ষের সাধন আছে;—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষের সাধন। পূর্ব্বে বলিলেন, মোক্ষ "অসংস্কার্য্য"; ইহার সংস্কার করা যায় না। আবার এস্থলে বলিতেছেন, নিত্যকর্ম্ম দ্বারা মোক্ষের সংস্কার করা যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতেছে, যে ব্রহ্মপথের পথিক, সে যেন মোটেই কার্য্য কর্ম্ম না করে। সে যেন কেবল, তপস্যা, ধ্যান, উপাসনা ও শ্রবণমননাদি নিত্যকার্য্য করে। কেননা, ইহাতে পাপক্ষয় হইবে ("পাপক্ষয় হেতুত্বাৎ, ধর্ম্মবৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ")। ইহা দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইতে হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান পরিপক্ক হইতে থাকিবে। "উপায়ভূতানি হি কর্ম্মানি বিদ্যাং প্রতি। কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিত দুরিত প্রতিবন্ধক্ষয়াৎ বিদ্যা উৎপদ্যতে" (তৈত্তিরীয় ভাষ্য, শিক্ষাবল্লী)। এরূপ সাধনে গৃহীরও অধিকার আছেঃ—

"অবিশিষ্টো হি অধিকার স্ত্রয়ানাং বর্ণানাং" (বৃহঃ ভাষ্য, ৬।৪।১৯)।

এইরূপে যখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, যখন সর্ব্বত্র আত্ম-প্রত্যয় জন্মিবে, যখন সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন আর কোন ক্রিয়ার আবশ্যকতা থাকিবে না। এরূপ জ্ঞানে নিত্য কর্ম্মেরও স্থান নাই। এজ্ঞান জন্মিবামাত্র মুক্তি হইবে। সুতরাং এরূপ মুক্তি নিত্য কর্ম্মের দ্বারা হইতে পারে না। কেবল একান্ত জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি সম্ভব। পাঠক আর একটী স্থলও দেখুনঃ—

"যেষাং নিত্যানি সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানিত্যাদি। সংস্কৃতস্য তস্য ইহ বা জন্মান্তরে বা আত্মদর্শনং উৎপদ্যতে (৪।৩।১)।"

"নিত্যৈঃ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ শ্রবণাদিবশাদৈক্যজ্ঞানং মুক্তিফলং উদেতি" (আনন্দগিরি টীকা)। কিন্তু শঙ্কর এইরূপ স্পষ্ট বলিয়াও, এই স্থলেই আবার বলিতেছেন যে, নিত্য কর্ম্মেও এ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, চরমব্রহ্মজ্ঞানে নিত্যকর্ম্মেরও যাইবার সাধ্য নাই। ইহা জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত হইলেও চরমব্রহ্মজ্ঞান হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকে।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাবস্থা,—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শঙ্কর এই সাধনাবস্থা ও মোক্ষাবস্থা, এই উভয়ের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। এই বিভাগ ভুলিয়া, অনেকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনেও, শঙ্কর উপাসনাদি নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। শঙ্কর-কথিত এই সাধনাবস্থাটী, যে মুহূর্ত্তে মোক্ষলাভ ঘটে, সেই চরম-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বুঝিতে হইবে। অতএব মোক্ষলাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উপাসনাদির আবশ্যকতা রহিয়া যাইতেছে। এ রহস্য ভুলিলে চলিবে না। শঙ্করের প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

শঙ্করের পরিব্রাজকাশ্রম সেই চরমজ্ঞানের আশ্রম। গৃহীরও যখন সাধন করিতে করিতে সেই চরমজ্ঞান জন্মিবে, তখন তাহারও কোন কর্ম্ম থাকিবে না। সেই গৃহী ও পরিব্রাজকাশ্রমী উভয়ই তখন তুল্য।

"হিংসারাগদ্বেষাদি বাহুল্যাৎ বহুক্লিষ্ট কর্ম্মবিমিশ্রিতাইতরে আশ্রমাদয়ঃ, ইত্যতঃ পারিব্রাজ্যং মুমুক্ষূনাং প্রশংসন্তি"।

"সন্ন্যাসো জ্ঞানংপ্রতি প্রত্যাসন্ন উচ্যতে, কামপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ"। (বৃহঃ উপঃ, ৬।৪।১৪)।

কি জানি গৃহী যদি কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত

হয়, এই আশঙ্কাতেই শঙ্কর পরিব্রাজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন, নতুবা গৃহীর ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, এরূপ উদ্দেশ্য সে প্রশংসার হইতে পারে না। ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট। তথায় শঙ্কর বলিতেছেন যে, যখন গৃহীর চরম-ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল, তখনও যদি তাহার কখন কামাদি উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তাহার গৃহ পরিত্যাগই উচিত। তখন পরিব্রাজকাশ্রম অবলম্বনই তাহার উচিত। কিন্তু ইহাও তিনি চরমজ্ঞান জন্মিবার পরে বলিয়াছেন। এই স্থলে শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ যে মনে করেন যে, তখনও গৃহীর নিত্যকর্ম্ম থাকিবে, ইহা সত্য নহে। সে অবস্থায় গৃহীর নিত্যকর্ম্মও নাই।

বোধ হয় আমরা এতদূরে, আশ্রম-সম্বন্ধে শঙ্করের প্রকৃত অভিপ্রায় নির্ণীত করিতে সক্ষম হইয়াছি। কেবল উপাধ্যায় মহাশয় নহেন, অনেক ইউরোপীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও, এ অংশে শঙ্করের প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া, আমরা ইহা এত বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলাম। মোক্ষোৎপত্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে সাধনাবস্থা এবং সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে উপাসনাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে এবং গৃহীরও যে তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার,—এই বিষয়গুলি, শঙ্করোক্তি হইতে আমরা বোধ হয় প্রমাণ করিতে পারিয়াছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহাত্মা Max-muller, আচার্য্য শঙ্করের এই অভিপ্রায় অনেকটা বুঝিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"Another question which has been hotly contested is whether *Moksha* (মোক্ষ) can be the result of knowledge only or whether it requires a fulfilment of moral *virtues* also. Though as far as I understand Sankara, knowledge alone in the end can lead to মোক্ষ, virtue is certainly *presupposed.* * * * It would not be difficult no doubt to produce passages which declare that a sinful man can not obtain মোক্ষ, but that is very different from saying that মোক্ষ can be attained by *mere abstaining* from sin. Good works, even ceremonial works, if performed from pure motives and without any hope for reward, form an excellent preparation for reaching that highest knowledge which it is the final aim of Vedanta to impart" (Six systems of Indian Philosophy.)

আমরা পরিশেষে আর একটীমাত্র কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। গীতার যে শ্লোক লইয়া, পণ্ডিত উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে, সে শ্লোকের ব্যাখ্যায়, শঙ্কর যে গৃহীর ধ্যানযোগে অধিকার নাই বলিয়াছেন,—আমাদের বোধ হয়, সে কথা বলা সঙ্গতই হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকটীকে, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলির সহিত একত্রে পাঠ করিতে হইবে। গীতা এস্থলে, যোগ-সাধককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ১। আরুরুক্ষু (৩য় শ্লোক)। ২। যোগারূঢ় (৩য় শ্লোক)। ৩। যুক্ত (৮ম শ্লোক)। ৬ষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত "যোগারূঢ়ের" অবস্থা এবং ৮ম হইতে ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত "যুক্তের" অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই তিন অবস্থায়, আমাদের বোধ হয়, নিকৃষ্ট, মধ্যম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধকের অবস্থা যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই তৃতীয় বা যুক্ত অবস্থাটী গৃহীর উপযোগী নহে। সুখে ও দুঃখে, মানে ও অপমানে যখন সমজ্ঞান জন্মিয়াছে, যখন বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ও কূটস্থ দৃষ্টি জন্মিয়াছে, তখন ত সাধকের

"চরমাবস্থা"। সে অবস্থা মোক্ষাবস্থা;— ইহা শঙ্কর-কথিত পরিব্রাজকাশ্রমোচিত অবস্থা মাত্র। এ অবস্থায় পড়িলে, গৃহী আর গৃহী থাকে না; তখন তাহার সর্ব্ব-কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। এই টুকু লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয়, শঙ্কর ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন।

প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। পরিশেষে, আমরা এই প্রতিবাদের কোনও স্থলে যদি অজ্ঞাতভাবে, উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কোন অসম্ভ্রম-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমরা সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই দেশ উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে বহু ভাবে ও বহু বিষয়ে ঋণী,—ইহা আমরা জানি বলিয়াই, তাঁহার সহিত বাক্-বিতণ্ডা করিতে আমরা নিতান্তই কুণ্ঠিত।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত।* (২)

(কালীঘাট।)

কলিকাতার পুরাবৃত্ত লিখিতে হইলে কালীঘাটের কথাই সর্ব্বাগ্রে লেখা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা করিয়াছি, ইহা ভিন্ন আর কোন কথা যদি কেহ জানেন, আমাদিগকে লিখিলে সাদরে প্রকাশিত হইবে। ভারত-বর্ষের লোক যখন সভ্যতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া পোতারোহণে পৃথিবীর সকল স্থান ভ্রমণ করিতেন, তখন শক্তি পূজা এদেশের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, বর্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নানা দেশে ভারতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি আবিষ্কার করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। অগ্নি উপা-সনার পরেই শিবোপাসনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পূজার প্রবর্ত্তন। মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতের কালে শিব ও শক্তিই সাধারণ লোকের উপাস্য ছিলেন। ক্রমে পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের আবি-র্ভাবে এই পূজার প্রাবল্যই বিশেষ রূপে লক্ষিত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে মহর্ষি নারদকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একজন পরাক্রান্ত প্রচারক বা প্রবর্ত্তক বলা যায়। তৎপরে অনেক ঋষি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈব ধর্ম্ম যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক ঋষি কর্ত্তৃক অধিকতর পরাক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অচৈ-লক্য সন্ন্যাসীরা চিরদিন শৈব ধর্ম্ম প্রচারক। শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা ভারতের নানা স্থানের রাজা-দিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তৎদেশে শিব ও শক্তি উপা-

* "নব্যভারতের" গত সংখ্যায় ৩২১ পৃষ্ঠায় "ভূতত্ব" প্রস্তাবের শেষে ১০০ ফিট ও ৮৬ ফিটের স্থানে ১০০ মাইল ও ৮৬ মাইল হইবে।

কলিকাতার পুরাতন কোন কথা, পুরাতন বংশাবলী, পুরাতন লোকদিগের জীবনচরিত ও গল্প যিনি পাঠাইবেন, সাদরে গৃহীত হইবে। যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে সমস্ত ভ্রম থাকিবে, যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইবেন, আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত হইব।

সনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান ও ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ অচৈলক্য সন্ন্যাসীদিগের কীর্ত্তি, তাহা উড়িষ্যার ইতিহাসে দেখা যাইতেছে। পুরাকালে অধিকাংশ ঋষি আপনাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবে রাজাদিগকে এতদূর মুগ্ধ করিতেন যে,তাঁহারাই রাজাদের গুরু পুরোহিত ও প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া সমগ্র রাজ্যে আপনার আচরিত ধর্ম্ম অতি সহজে প্রবর্ত্তন করিতেন।

বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে সাধারণ ভাবে বুঝা যায় যে, বৈদিককালে আর্য্যেরা প্রকৃতি মধ্যে স্রষ্টার অনন্ত শক্তি দর্শন করিয়া নানা নামে তাঁহার স্তব ও আরাধনা করিয়া অগ্নি মধ্যে তাঁহার আহুতি প্রদান করিতেন। উপনিষদের সময় ঋষিরা পূর্ব্বোক্ত আহুতি অপেক্ষা ধ্যান যোগে অন্তর মধ্যে স্রষ্টাকে সম্ভোগ করাই সমুচিত বিবেচনা করিতেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ভাবপ্রধান, তাঁহারা কেবল অন্তরে সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া সংসারে তাঁহার অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া নানা রূপকচ্ছন্দে তাহা বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই স্থানে ভাবের ভিন্নতাহেতু সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব বলিয়া অনুমান হয় (১)। ভগবানের অনন্ত করুণায় সকলেই বিশ্বাসী থাকিয়া কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু, কেহ শিব অর্থাৎ মঙ্গল, আবার কেহ কেহ নিতান্ত আপনার জন না করিয়া থাকিতে না পারিয়া "মা" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা গানে প্রাণ জুড়াইতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ভক্তদিগের হৃদয় কেবল ভাবে সন্তুষ্ট রহিল না, তাঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে ইষ্টদেবের ভাবময় মূর্ত্তি আকৃতিতে আনয়ন করিয়া নিজে যাহাতে সন্তুষ্ট হন,তদ্রূপ পুষ্প চন্দন ভোগ নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিয়া আত্মবৎ সেবায় আপনার ভাব চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইহাই পৌরাণিক অবস্থা। পুরাণ গুলির মধ্যে অধিকাংশ এবং প্রধানগুলি বৈষ্ণব, (১) আচারীরা প্রায়ই সংসারত্যাগী হইতেন। শৈব বা শাক্ত পুরাণের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহার প্রচার অধিক এবং সাধারণ সংসারীদিগের আচরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি বৈষ্ণব প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, বাঙ্গালায় কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহাও শেষাবস্থায়। পুরাণের পর ঘন ঘন উপপুরাণের (২) আবির্ভাব হইতে লাগিল, ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের রচিত অতি অল্প, শৈব ও শাক্তেরাই অধিকাংশ উপপুরাণের প্রণেতা। তৎপরে তান্ত্রিক কাল,তন্ত্র সকল বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত,

(১) যদিও আর্য্যজাতি প্রধানত সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু একণে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) অষ্টাদশ পুরাণ যথা:—অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ (শৈব), বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ।

(২) উপপুরাণ যথা:—আদিত্য, কল্কি, কাপিল, কালিকা, দুর্ব্বাসা, দেবী, নন্দী, নারদ, নৃসিংহ, বশিষ্ঠ, বৃহদ্ধর্ম্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য,ভৃগু, মহেশ্বর, মানব, মুদ্গল, শাম্ব, শিব, সনৎকুমার। এই কয়েক খানি প্রধান, তদ্ভিন্ন আরও উপপুরাণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

কেবল শিব ও তাঁহার শক্তির উপাসনাদি প্রচার করাই তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। (১)

মহারাজ আদিশূর শাক্ত ছিলেন, তাঁহার সময়েই কাশী হইতে আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের তলদেশ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ বৌদ্ধধর্ম্ম শূন্য হইয়া শিব ও শক্তির নামে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালার সমস্ত রাজবংশই বলুন আর পরবর্ত্তী বার-ভুঁইয়াদিগের কথাই বলুন, সকলেই শাক্ত ছিলেন। রাজা যে ধর্ম্মাবলম্বী, প্রজা তৎ বিপরীত হইলে তাহার আর সে সময় রক্ষা থাকিত না। যদি কেহ ভিন্ন মতাবলম্বী থাকিত, তাহাকে লোকসমাজে রাজধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া অতি সংগোপনে আপন ধর্ম্ম সাধন করিতে হইত। অনেক বৌদ্ধ মন্দির শিব মন্দিরে ও শক্তি মন্দিরে পরিণত হইল। জলপাইগুড়ীর জল্পেশ্বর মন্দির, কুচবিহারের বাণেশ্বর মন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরীর এবং তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের গঠন দেখিলে বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সে সময় বৌদ্ধদিগের ন্যায় গঠন ভিন্ন অন্য প্রকারের গঠন প্রণালী প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিব এবং শক্তি দেবীই বাঙ্গালীদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমে দক্ষিণ বঙ্গ বা বগড়ীতে লোকালয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা যোত্রমান গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় ব্রত বিধায় সর্ব্বত্রই উহা প্রতিষ্ঠিত হইল। ধনবান ভক্তেরা দশমহাবিদ্যার যিনি যে ভাবের উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরেই অধিকাংশ দেবী মন্দির ও শিব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কত শত মন্দির যে এই দুই নদী তীরে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোন তত্ত্ব পাইবার উপায় নাই। চৈতন্যদেব ষোড়াশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরুষোত্তম গমন কালে পথে কতকগুলি প্রধান প্রধান শিব ও শক্তির নমোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার উল্লিখিত কোন দেব দেবীর মন্দির নদী তীরে দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীর কূল-ভঙ্গে সে সমস্ত অদৃশ্য হইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী প্রাচীন কালী মন্দির এখন দেখা যায়। ১মটী চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী। এই দেবী যে কোন্ কালে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিম্বদন্তিতে শুনা যায়, ইনি চিতে নামক দস্যু দলপতির দ্বারা স্থাপিত, তাঁহারা ইঁহার পূজা করিয়া সম্মতি-সূচক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে জলে স্থলে লুণ্ঠন করিতে যাইত। মন্দিরটী প্রথমে একেবারে গঙ্গার তীরে ছিল, এক্ষণে নদী হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে এখানে নিবিড় বন ছিল, অনেক নরবলী এই দেবীর সম্মুখে হইয়া গিয়াছে।

(১) 'তন্ত্র শাস্ত্রের সংখ্যা নাই, প্রায়ই আবিষ্কৃত হইতেছে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েক খানি প্রচলিত তন্ত্রের নামোল্লেখ করা গেল, যথা:—আচার নির্ণয়, কালী-বিলাস, কামাখ্যা, কুলাবতী, কুলার্ণব, গুপ্তসাধন, চূড়ামণি, নিত্যা, নিরুত্তর, পিচ্ছিলা, বিশ্বসার, বৃহদামল, মহানির্ব্বাণ, মহানীল, মহালিঙ্গরচন, মেরু, যোগিনী, শ্যামারহস্য, সারদা, বরাহী, ডামর, কাত্যায়নী তদ্ভিন্ন রাধা ও বিবর্ত্ত বিলাস নামে দুই খানি বৈষ্ণব-তন্ত্রও বিলক্ষণ প্রচলিত।

দ্বিতীয়টী কালীঘাটের কালী, যাহা আমাদের এই প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয়। কোন পুরাণে কালীঘাটের উল্লেখ নাই,উপপুরাণের মধ্যে কেবল এক মাত্র ভবিষ্য উপপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ ৯৮ শ্লোকে লিখিত আছে, "তাম্র লিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে। গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধনী তটে।" (১)

কোন প্রাচীন তন্ত্রেও কালীঘাটের উল্লেখ নাই, কেবল মহানীল তন্ত্রে "কালীঘাটে গুহ্যকালী" বলিয়া লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় বাবু গৌরদাস বসাক বলিয়াছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে কালীঘাটের গুহ্যকালীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন। আচারনির্ণয় তন্ত্র, মহালিঙ্গ রচন তন্ত্র, চূড়ামণি তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি আধুনিক তন্ত্রেই কালীঘাটের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। (২) পীঠমালায় একান্ন পীঠের স্থান নির্ণয়ে কালীঘাটের কালী ও নকুলেশ্বর শিবের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু "দেবী" অর্থাৎ "দেবী ভাগবত" উপপুরাণে ১০৮ পীঠের মধ্যেও কালীঘাটের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে চণ্ডীকাব্যে গঙ্গাতীরের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কালীঘাটের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় (১) কিন্তু বাবু অক্ষয়-

(১) ইহাতে কালীঘাটের প্রাচীনত্ব প্রমাণ অপেক্ষা ভবিষ্য উপপুরাণেরই আধুনিকতা সপ্রমাণ হইতেছে, কারণ গোবিন্দপুর ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। গোবিন্দপুর আলোচনাস্থলে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

(২) তন্ত্রচূড়ামণিতে, কেবল কালীঘাটের কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়,এমন নহে, নলহাটীর কালী, বেহালার বেহুলাদেবী এবং রাজা প্রতিপাদিত্যের স্থাপিত যশোরেশ্বরী কালীর পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। তাহাতেই বুঝা যায়, তন্ত্রচূড়ামণি প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। পরে হইলে যশোরেশ্বরীর উল্লেখ থাকিত না, কারণ তিনি মানসিংহের পুরাতন রাজধানী অম্বরে বিরাজ করিতেছেন। "বঙ্গীয় সমাজ" লেখক বাবু সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৬০ পৃঃ লিখিয়াছেন, "প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।" আমাদের অনুমান হয়, পরে দ্বিতীয় মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

(১) বটতলার মুকুন্দরামের চণ্ডীতে লিখিত আছে:—

ত্বরায় বহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, উপরোক্ত কয়েক ছত্র প্রকৃত মুকুন্দরামের লিখিত কি না। প্রথমত সে সময় কলিকাতার এখনকারমত অবস্থা ছিল না যে, তাহার নাম অবশ্য লিখিতব্য, বরং সুতানুটী ও গোবিন্দপুর সে সময় কলিকাতা অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বেতড় ও বালুঘাটা গঙ্গাতীরে কোথায় পাইলেন, জানিনা, বেতড় হাবড়ার অন্তঃপাতী একটী গণ্ডগ্রাম, গঙ্গাতীর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিম, বালুঘাটা কলিকাতার পূর্ব্বে, গঙ্গার সহিত তাহারও কোন সংশ্রব নাই। যদি বলা যায়, মুকুন্দরাম্ নিজে এসব না দেখিয়া লোক মুখে স্থানগুলির নাম শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব, কারণ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নাম কেবল তৌজিভুক্ত ছিল, তাহাও কলিকাতা নহে "কলকত্তা।" ইহাতে অনুমান হয়, কলিকাতা রাজধানী হইবার পর কোন লিপিকর মুকুন্দরামে ঐ কয় ছত্র সংযোগ করিয়া থাকিবেন, অথচ লিপিকরও এই সকল স্থান নিজে দেখেন নাই। বাবু অক্ষয় সরকারের লিপি সেই জন্য প্রামাণিক বলিয়া অনুমান হয়।

কুমার সরকারের সঙ্কলিত উক্ত গ্রন্থে কালীঘাটের কোন কথা নাই। অক্ষয় বাবু ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রামাণিক লিপি দৃষ্টেই সঙ্কলন করিয়াছিলন। যশোহর-পতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঘোর শাক্ত ছিলেন, নিজে যশোহর নগরে যশোরেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে শক্তি মন্দিরাদি ছিল, সকল মন্দিরেই পূজা উপহারাদি প্রদান করিতেন। কিন্তু কালীঘাটের কালীর কোন উল্লেখ তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার এই অংশ যে তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে, কারণ বেহুলায় তাঁহার গমনাগমন ছিল, কলিকাতার সম্মুখবর্ত্তী সালিখায় তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "কালীক্ষেত্র-দীপিকা" প্রণেতা বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এই ভুবনেশ্বরই কালীর বর্ত্তমান সেবায়ৎ বংশের আদিপুরুষ ছিলেন, বসন্ত রায় কালীর প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বসন্ত রায়ের স হিত প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি বিরোধ হেতু জ্ঞাতির গুরুর দেবস্থানে না যাওয়া সম্ভব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহ বাদসাহের পক্ষ হইতে যখন বাঙ্গালা য় বিদ্রোহী দমনে আগমন করেন, তখন তিনি এক-প্রকার সমস্ত বঙ্গদেশ তন্ন তন্ন রূপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কালীঘাটের সন্ধান পান নাই। আবুলফজল আইন আকবরীতে লিখিয়াছেন, ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল বঙ্গদেশ জরিপে যে খাজানা বন্দোবস্ত করেন, তন্মধ্যে সপ্ত গ্রামের অধীন কলকত্তা, বার্ব্বাকপুর ও বাঁকুয়া, এই তিনটী সংলগ্ন পরগনা হইতে নবলক্ষ ছত্রিশ হাজার দুই শত পনের দাম অর্থাৎ ২৩৪০৫ টাকা খাজানা স্থির করিয়াছিলেন। তখন কালীর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি উহার কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু চৌরঙ্গীর জঙ্গলের কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে আনিয়াছিলেন।

দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব ত্রিশূলোপরি তাঁহার দেহ স্থাপন করিয়া শোকে উন্মত্তের ন্যায় উক্ত দেহ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র যোগে সেই দেহ ৫১ অংশে, কোন কোন মতে ১০৮ অংশে ছেদন করেন। যে যে স্থানে সতীঅংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান মহাপীঠ অর্থাৎ মহাপুণ্য ক্ষেত্র হইল, মহাদেব প্রত্যেক পীঠস্থানে উপস্থিত থাকিয়া পীঠরক্ষক হইলেন। গঙ্গা তীরে তাঁহার দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পতিত হওয়ায় এখানে কালী মূর্ত্তি ও নকুলেশ্বর নামে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। ইহাই কালীঘাট সম্বন্ধে মূল কথা। কালীর প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকগুলি কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, আমরা যতগুলি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

১ম, পান পোস্তার দক্ষিণ যে স্থানকে পুরাতন পোস্তা বলে, পূর্ব্বে সেই স্থানে কালীর মন্দির ছিল, কোন সময় মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় তীর্থ লুপ্ত হয়। গঙ্গার তীরে মন্দিরের সম্মুখ ভাগে সুবিস্তীর্ণ পোস্তা গাঁথা ছিল, চিরদিন তীর্থ যাত্রীদিগের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের সুবিধার জন্য সেই পোস্তায় একটী হাট বসিত, মন্দির পড়িয়া গেলেও তাহার পোস্তা (১) বর্ত্তমান

(১) আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড

থাকায় হাট বসিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইত না, কিন্তু কালীঘাটের নাম লুপ্ত হইয়া কালে উহা পোস্তার হাট বলিয়া পরিচিত হইল। বহুকাল পরে এক দল কাপালিক সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা উপরোক্ত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করিয়া ইষ্টকরাশির ভিতর হইতে চারিটী ছিদ্র সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি এক খানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়া, উহাই কালী-ঘাটের কালী বলিয়া সাদরে তাহা লইয়া গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহা-দের তন্ত্র মত পূজায় নরবলীরও আবশ্যক হয়, সুতরাং লোকালয়ের নিকট উহা নিতান্ত অসুবিধাজনক। এক্ষণে যেখানে কালীঘাট, সেই স্থানে ভীষণ জঙ্গল ছিল। তথায় তৃণ কাষ্ঠাদিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা পূজা করিতেন। বাহিরের অতি অল্প লোকেই কালীর সন্ধান প্রাপ্ত হইত। কালে উহা লোক সমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

২য়, ভবানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রয় করিতেন, এক দিন তিনি শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য গঙ্গা তীর দিয়া যাইতে-ছিলেন, একটী সধবা ব্রাহ্মণী আসিয়া শাঁখা পরিতে চাহিলেন, ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান কালীকুণ্ড তীরে তাঁহাকে শাঁখা পরাইয়া কৌড়ী চাহিলে, স্নান করিয়া আসি, বলিয়া স্ত্রীলোকটী কুণ্ডে নিমগ্ন হইলেন। স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি হ্রদে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময় জলমধ্য হইতে ব্রাহ্মণী হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করি-লেন। সেই সময় আকাশ-বাণী হইল যে, আমি কালী, তুমি এই হ্রদতীরে আমার পূজা প্রকট কর, তোমার ঘরে অমুক স্থানে একটী কৌটায় আমি আছি, গৃহে গিয়া দর্শন কর। ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে গৃহে গিয়া কথিত স্থানে একটী কৌটা পাইলেন, তাহা খুলিবা মাত্র শত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বাহির হওয়ায় ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন, পরক্ষণে দেখিলেন, একটী পদাঙ্গুলী মাত্র। উহা মস্তকে করিয়া তিনি কুণ্ড তীরে আসিয়া মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন, তাহা স্থাপিত করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। উহা হইতে কালীঘাটের প্রকাশ।

৩য়, এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা তীরে সন্ধ্যাবন্দ-নাদি করিয়া ফিরিবার সময় বনমধ্যে একটী অপূর্ব্ব আলোক দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া কালীকুণ্ডতীরে কালীর মুখের প্রস্তর খণ্ড ও একটী প্রস্তরের পদাঙ্গুলী দেখিতে পান, পরক্ষণে কালীর প্রত্যাদেশ শুনিয়া বুঝি-লেন, ঐ অঙ্গুলী সুদর্শন-ছেদিত সতীদেহ এবং ঐ প্রস্তর ফলক ব্রহ্মার নির্ম্মিত কালীর মুখ-মণ্ডল। ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক উভয় খণ্ড একত্র রাখিয়া পূজা করিতেন, বনমধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা তিনি নকুলেশ্বরের শিবলিঙ্গও প্রাপ্ত হইলেন। উহা হইতে কালীঘাট।

৪র্থ, নবদ্বীপপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সরকারে ১২লক্ষ (১) টাকা খাজানার দায়ে ঋণী হওয়ায় মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ রাজার গুণগরিমা

কর্জ্জন বাহাদুর যে প্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্ব-প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে আমরা সাহসী হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুরাতন পোস্তার স্থানে স্থানে বোরিং যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করাইলে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

(১) কেহ কেহ ৫২ লক্ষ লিখিয়াছেন। বাবু কালীময় ঘটক লিখিয়াছেন, রাজার পিতার আমলের ১০ এবং তাঁহার নিকট হইতে ১০ এই ২০ লক্ষ টাকার দায়ে তিনি আবদ্ধ হন।

জানিতেন, অন্যান্য ঋণীদিগের ন্যায় তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ না রাখিয়া আপনার সভায় রাখিতেন এবং অবকাশকালে তাঁহার নিকট হিন্দু আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্ম ও পুরাণ ইতিহাসাদি শ্রবণ করিতেন। এক দিন নবাব নৌকাবিহারে যাত্রা করেন, রাজাকেও সঙ্গে লন, রাজা তাঁহাকে নিজ জমিদারী দেখাইবার উদ্দেশে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়া নৌকা হইতে নামাইয়া পদচারে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই দেখুন আমার জমিদারী, এই সকল ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বনশুকর প্রভৃতি আমার প্রজা। তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে এই কালী মূর্ত্তি ও তাঁহার উপাসককে দেখিতে পান। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলেন, ইহাই সতী দেবীর অংশপীঠ, ইহার নামানুসারে স্থানের নাম। ব্রাহ্মণ নিতান্ত নির্লোভী, কিছু মাত্র কাহারও সাহায্য-প্রার্থী নহেন, কিন্তু রাজা নবাবকে অনুরোধ করিয়া কালীর জন্ত কিছু দেবোত্তর মঞ্জুর করিতে বলেন। নবাব ব্রাহ্মণের নির্ভীকতা ও একাকী বিজন বনে নিষ্ঠার সহিত নিজ পারমার্থিক সাধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, তিনি রাজার অনুরোধ মাত্র উক্ত প্রদেশ কালীর দেব সেবার জন্ত প্রদান করিলেন এবং রাজাকেও তাঁহার সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

৫ম, লক্ষীকান্ত মজুমদারের প্রপৌত্র কেশবচন্দ্র মজুমদার যখন ১৭২০ খৃঃ পূর্ব্ববাস নিমতা হইতে উঠিয়া বেহলায় বসতি করেন, তখন তিনি প্রত্যহ গঙ্গাতীরে আসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন, কালী তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দ্বারা কালীকুণ্ডের তীরে আপনার মুখ মণ্ডল দেখান, কেশব মজুমদার তদ্দৃষ্টে ঐস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কালীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন।

৬ষ্ঠ, আত্মারাম নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে কালীকুণ্ডতীরে সতী অংশের স্থিতি জানিয়া ঐস্থানে আসিয়া মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, এবং পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৭ম, বরিসার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায় কেশব রায়ের পুত্র একদিন সন্ধ্যাকালে কালীঘাটের নিম্ন দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন, তখন ঐ স্থান ভীষণ জঙ্গল ছিল, ব্যাঘ্র ভল্লুক ভিন্ন কোন মনুর্ষ্যের বাস ছিল না। সন্তোষ রায় বন মধ্যে দেবারতির শব্দ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, নৌকা হইতে সদলে উঠিয়া গিয়া দেখেন, একজন ব্রাহ্মণ একটী কুটীর মধ্যে কালীদেবীর আরতী করিতেছেন। (১)

৮ম, বাবু গৌরদাস বসাক বলেন, দশনামী শৈব সন্ন্যাসী চৌরঙ্গী গিরী সশিষ্য গঙ্গাসাগর যাইতেছিলেন, গঙ্গা তীরে কালীর প্রস্তর খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া উক্ত স্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পরে জঙ্গল গিরী নামক তাঁহার এক শিষ্যের হস্তে কালী পূজার ভার দিয়া আপনি চলিয়া যান। প্রস্তরফলক প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তি যে, চৌরঙ্গী দেখিলেন, বনমধ্যে এক স্থানে একটী গাভী দাঁড়াইয়া আপনি মৃত্তিকার উপর অজস্র দুগ্ধধারা দান করিতেছে। প্রায় অধিকাংশ দেবাবিষ্কারের এই এক প্রবাদ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখিয়া

(১) ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিম্বদন্তি কালীক্ষেত্র-দীপিকা নামক পুস্তক হইতে সার সংগ্রহ।

সেই স্থান খনন করিতেই উক্ত প্রস্তর ফলক দেখিতে পান।

উপরোক্ত আটটী জনশ্রুতির মধ্যে ছয়টী আবিষ্কার সম্বন্ধে, অপর দুইটী আবিষ্কারের পর বড় লোকের আশ্রয় সম্বন্ধে। প্রথমে এই ছয়টী মত আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ৫ম মতে কেশব রায় চৌধুরীর আবিষ্কারের কথা এককালে অপ্রামাণিক, কারণ তিনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের পর কালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়টী ভবানী দাস চক্রবর্ত্তীর সমগ্র পরিচয় কালীক্ষেত্র-দীপিকায় পাওয়া যাইতেছে, ইহাঁর পিতার নাম পৃথ্বীধর চক্রবর্ত্তী, নিবাস খড়ান গ্রাম। ইনি নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে কালীঘাটের কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলে পুরোহিত ভুবনেশ্বরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহারই নিকট বাস করিতে থাকেন। সম্ভবত ইহাঁর নামানুসারে ভবানীপুরের নাম হইয়া থাকিবে। মানসিংহের বাঙ্গালা জয়ের অনতিপূর্ব্বে এই ঘটনা হওয়ায় আমরা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানী দাসের আগমন ধরিয়া লইলাম। ইহাঁর শ্বশুর ভুবনেশ্বর রাজা বসন্ত রায়ের গুরু এবং বসন্ত রায় কালীর প্রথম মন্দির নির্ম্মাতা হইলেও রাজা প্রতাপাদিত্য বা মানসিংহ কেন কালীর তত্ত্ব লন নাই, একথার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তখন কালীঘাটের নিতান্ত শৈশবাবস্থা, অমন অবস্থায় কালী গঙ্গাতীরে শত শত ছিল, যখন ধনীদিগের আশ্রয়ে আসিয়া আপনার প্রতিপত্তি দেখাইতে সক্ষম হইল, তখন লোকে ইহাঁকে শক্তি পীঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতে কালীর শ্রীবৃদ্ধি, তাহার সন্দেহ নাই। অপর চারিটীর বিবর আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ১ম জনশ্রুতিতে দেখা যাইতেছে, পোস্তার নিকট হইতে কোন সন্ন্যাসী মুখমণ্ডল তুলিয়া লইয়া গভীর বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ৩য়টী প্রথমটীকে কোন অংশে খণ্ডন করে নাই, বিশদ ভাবে বর্ণন করিয়াছে মাত্র। ষষ্ঠটীও ঐরূপ, কেবল ইহাতে ব্রাহ্মণের আত্মারাম বলিয়া নাম পাওয়া যাইতেছে। এই কয়টীর সহিত অষ্টম অর্থাৎ বাবু গৌরদাস বসাকের কথা মিলাইতেও অধিক প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। চৌরঙ্গী গিরিকে যদি ইহার আবিষ্কারক বলা যায়, তাহা হইলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। একজন জ্যোতি দর্শন করিয়াছিলেন, একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আর একজন গাভীকে নিজ হইতে দুগ্ধ দান করিতে দেখিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা একই কথা। কারণ দেবাবিষ্কারের এইরূপ কোন না কোন পন্থাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করা সন্ন্যাসীদিগের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন প্রভৃতি লুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী কালীতীর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কি আছে? ইংরাজদিগের আগমন হইতে কলিকাতার দক্ষিণস্থ জঙ্গলের চৌরঙ্গী নাম (১) শ্রুত হওয়া

(১) কলিকাতার, অর্থাৎ বর্ত্তমান লালদিঘির দক্ষিণ হইতে বহুদূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটী জঙ্গল বহু কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে উহার কোন নাম ছিল না। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসীর কালীপ্রতিষ্ঠা ও

যাইতেছে, অথচ এই নামের কোন কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। "হট প্রদীপ" গ্রন্থে চৌরঙ্গী গিরির উল্লেখ আছে, উইলসন সাহেব তাঁহার Religious sects নামক গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;" আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গী ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য, ভক্ত কবিরের সমকালবর্ত্তী। এই কবির সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, ১৫২৬ পর্য্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল। ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে সেটবসাকেরা গোবিন্দপুর স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালীঘাটের স্থাপনও ইহার সমকালীন বলিয়া জানা যাইতেছে। এই কাল চৈতন্য দেবের উড়িষ্যা যাত্রার অব্যবহিত পরে, সেই জন্য তাঁহার জীবনচরিতে কালীঘাটের কোন উল্লেখ নাই। তিনি বৈষ্ণব বলিয়া শক্তি প্রতিমার প্রতি কোথাও অভক্তির পরিচয় দেন নাই, বরং গম্য পথের নিকটবর্ত্তী যে কোন দেব দেবীর মন্দির দেখিয়াছেন অসাম্প্রদায়িক ভাবে সেখানে প্রণামাদি করিতেন। "মাগি লব কৃষ্ণভক্তি সকলের ঠাঁই।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার উদারতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

মহানীল তন্ত্র ইহাকে গুহ্যকালী বলিয়াছেন, গৌরদাস বাবুর মতে ১৫ শতাব্দীর লোকেরা কালীঘাটে গুহ্যকালীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, এবং কালী আবিষ্কার সম্বন্ধে যতগুলি মত প্রচলিত, সমস্ত গুলিতে কালীর মুখমণ্ডল প্রাপ্তির কথা প্রচলিত আছে, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান কালীর আবিষ্কার হইলেও প্রাচীন কালে এই কালীর মন্দির নিকটস্থ কোন স্থানে নিশ্চয় ছিল। পোস্তার নিকট থাকাই সম্ভব, কারণ ঐ স্থানটী কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, আদি গঙ্গার মুখ হইতে ৩১ ফুট উচ্চ। ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময় দৈব উৎপাতে ঝটিকা বা ভূমিকম্পের সহিত জলপ্লাবনে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ভুলুয়ার নিকট বিশম্ভর শূর মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তরের বরাহী মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত বরাহী মূর্ত্তি ও কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি এক সময়ের উপদ্রবেই অদৃশ্য হইয়া থাকিবে।

বরিষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ কেশব রায় ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমতা হইতে নবাব মুর্শেদকুলি খাঁর আদেশে দক্ষিণ বাঙ্গালার খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া বরিষায় বাস করেন, তখন উহা মুরাগাছা পরগণা ছিল। কেশব রাম রায় চৌধুরী নাবালক থাকায় জন্য রুক্মিণীকান্ত খাঁকে ব্যবহর্ত্তা উপাধি দিয়া কেশবের ব্যবহর্ত্তা অর্থাৎ ম্যানেজার নিয়োগ করেন, রুক্মিণী রাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ। কেশব রাম তখন ঐ অঞ্চলের প্রকৃত জমীদার হন, এবং পাইকান পরগণা পর্য্যন্ত খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান তখনও নদীয়া জেলার মধ্যেই ছিল, সেই জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আলিবর্দ্দী খাঁকে আপনার জমীদারীর অবস্থা দেখাইবার জন্য

তাহাদের উহার মধ্যে বাসের জন্য উহার নাম চৌরঙ্গী হওয়া ভিন্ন আর কোন প্রমাণিত নাম পাওয়া যায় না। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব পুত্র মিরণ কোম্পানীকে যে কলিকাতা পরগণার সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে আর কতক অংশ পাইকান পরগণার মধ্যে বলিয়া লিখিত ছিল।

চৌরঙ্গীর জঙ্গলে লইয়া গিয়াছিলেন। কালীর অধিকারীদিগের উপাধি হালদার, ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ ভবানী দাস চক্রবর্ত্তী, তাঁহার দুই পুত্র যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ও রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যাদবচন্দ্রের প্রপৌত্র জয়দেব হালদার, আর রামচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোকুল হালদার। গোকুল হালদার সম্পর্কে জয়দেব হালদারের ভ্রাতুস্পুত্র সমসাময়িক। দীপিকার বংশতালিকার ইহঁারাই প্রথম হালদার উপাধিলব্ধ দেখা যাইতেছে। ১৬০০ খ্রীঃ ভবানী দাস যখন বিবাহিত হইয়াছিলেন, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ষষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। ঐ সময় নবাব আলীবর্দ্দীর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সহ কালীঘাটে আসিয়া দেবোত্তর দান, ও অধিকারীদ্বয়কে হালদার উপাধিতে ভূষিত করা সম্ভব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তদবধি কালীর প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে কালীর পূজা দিবার জন্য রাজধানী হইতে কালীঘাটে আগমন করিতেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে জগৎসেঠের গৃহে যে চক্রান্ত সভা হয়, রাজা সেই সভায় বক্তৃতা কালীন বলিয়াছিলেন, "আমি কালীঘাটে পূজা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া থাকি, আসিবার সময় কলিকাতার কোম্পানির বড় সাহেবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি। উপরে ৪র্থ কিম্বদন্তিতে আলীবর্দ্দীর দেবোত্তর দান আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রীঃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন কালীঘাট প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র না থাকিলে, হলয়েল সাহেব ১৭৫২ সালের রিপোর্টে কালীঘাটের কথা উল্লেখ করিতেন না। মহারাজা বসন্ত রায় আপনার গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে ১৬ শতাব্দীতে কালীঘাটের ছয় শত বিঘা ভূমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ উক্ত প্রদেশ সে সময় যশোহর-পতিদিগেরই করায়ত্ত ছিল। সেই জন্যই কোন বর্ত্তমান দপ্তরে উক্ত দেবোত্তরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সাবর্ণচৌধুরী কেশব রায়ের পুত্র সন্তোষ রায় কালীর বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এই সময় কলিকাতার কোন ধনাঢ্য পরিবারে একটী সামাজিক ক্রিয়া লইয়া দলাদলী হয়, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই—মুন্সী নবকৃষ্ণ মহারাজ ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়ায়, সে কালের পুরাতন ধনবানদিগের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুশূল হন। চূড়ামণি দত্ত নামক এক বাবু রাজার প্রতিবাসী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে খ্রেষ্টীট হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ষ্ট্রীট বর্ত্তমান আছে। (পূর্ব্বে উহা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ছিল।) মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে নীলমণি সরকারের লেন যেখানে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে পড়িয়াছে, ঠিক তাহার সম্মুখে চূড়ামণি দত্তের দক্ষিণ মুখী দরজা ছিল, কটক নহে, বৃহৎ চৌকাট ওয়ালা প্রকাণ্ড দরজা। গৃহ মধ্যে সুপ্রশস্ত চাঁদনী ওয়ালা উঠান এবং তাহার চারিদিকে দ্বিতল গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা বালাখানা ষ্ট্রীট, উত্তর সীমা প্রায়ই সমস্ত রাজা নবকৃষ্ণের জমী। এই গৃহ আজিও অতি সুন্দর ভাবে আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। গৃহের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ উদ্যান ও পুষ্করণী ছিল, পরে সেখানে বাগদী প্রজা বসিয়াছিল,

"আমরা বাল্য কালে তথা হইতে ছাগদুগ্ধ ও ধাত্রী ডাকিয়া আনিতাম। এখন পুরাতন বাটীর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের একটী ক্ষুদ্র কুটরী পূর্ব্বের কারুকার্য্য করা কড়িকাষ্ট সহ নীচু ছাদ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বদাই চূড়ামণি দত্তের সহিত রাজার বিবাদ বিসম্বাদ চলিত, উভয়ে উভয়কে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেন। অবান্তর দু-একটী সেকেলে গল্প যাহা বাল্যকালে বৃদ্ধকর্ত্তাদিগের নিকট শুনিতাম, তাহা বলিলে বোধ হয় পাঠকদিগের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইবে না। একদিন এক ব্রাহ্মণ একটী ছোট পাথরবাটি লইয়া রাজা নব কৃষ্ণের বাটীতে গিয়া গোপীমোহন বাবুকে বলেন, আমার ছেলের কাণ পাকিয়াছে, একটু পচা আতর যদি দেন, তাহার কাণে দিব। রাজকুমার সরল ব্রাহ্মণের আতর লইতে পাথর বাটি আনা দেখিয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, ঠাকুর, চূড়ামণি বাবুর কাছেই সে আতর আছে, কিন্তু তিনি যে রকম মেজাজের লোক আপনি অত ছোট বাটি লইয়া গেলে বিরক্ত হইতে পারেন, একটা বড় কলসী লইয়া যাইবেন। ব্রাহ্মণ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাই করিলেন। তখন চূড়ামণি বাবু তৈল মাখিতেছিলেন, ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কালী প্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন আগে গন্ধী (আতরওয়ালা) ডাকাইয়া ব্রাহ্মণকে এক কলস আতর দাও, পরে স্নান করিব। ব্রাহ্মণের সম্মুখেই আড়াই হাজার টাকার আতর কিনিয়া তাহার কলসী ভরিয়া দিয়া বলা হইল, দেখ ঠাকুর, গুপী ছেলে মানুষ, তুমি নবকে গিয়া এই আতর দেখাইয়া আবার আমার নিকট লইয়া আইস। (চূড়ামণি বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজাকে নব বলিয়া ডাকিতেন) ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সমস্ত রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া আতরটুকু নিজ গৃহে রাখিলেন এবং তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য অনর্থক এই পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা হইল। একবার রাজবাটীতে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে চূড়ামণি দত্তের কন্যা নিমন্ত্রণ রাখিতে যান, তাঁহার অঙ্গুরীতে একখানি বৃহৎ বহু মূল্য নীলকান্তমণি ছিল, কন্যা নিমন্ত্রণ সভায় পদার্পণ মাত্র উপরিস্থ লোহিত বর্ণের সামিয়ানা ময়ূরপংখী রং ধারণ করিল এবং চারিদিকে এক আশ্চর্য্য বর্ণের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজা ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় বাটীস্থ মহিলারা দত্ত কন্যাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া উক্ত নীলাযুক্ত অঙ্গুরী দেখান, রাজা প্রস্তরের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কন্যা গৃহে আসিয়া পিতাকে উক্ত ঘটনা বলিলে তিনি আনুষ্ঠানিক উপহারের সহিত উক্ত অঙ্গুরীটীও রাজবাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নবেম্বর রাত্রে আপনার গৃহের খট্টোপরি নিদ্রাবস্থায় সকলের অলক্ষিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সে সময় এ প্রকার মৃত্যুকে লোকে অপঘাত মৃত্যুর সমান মনে করিত। সজ্ঞানে গঙ্গায় অন্ততঃ তিন রাত্রি বাসের পর নাভি দেশ পর্য্যন্ত গঙ্গা জলে ডুবাইয়া গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম নাম জপ করিতে করিতে গঙ্গাজল পান করিয়া যে মৃত্যু তাহাই হিন্দুরা বাসনা করিতেন। সুতরাং রাজার মৃত্যুতে সাধারণ লোকে কাণাঘুষা করিতে থাকে। চূড়ামণি দত্তের পীড়া সংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্র তিনি বহু সংখ্যক চুলী আনা-

ইয়া আপনি একখানি রৌপ্যের চতুর্দ্দোলে বসিয়া গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। যাত্রাটী বিবাহ যাত্রীর মত হইল, অসংখ্য লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগর কীর্ত্তন, চতুর্দ্দোলটী নূতন রকমে সাজান, নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসী মালার ঝালর চারিদিকে তুলসী গাছ, মধ্যে চূড়ামণি দত্ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার, মস্তকের উপর শালগ্রামশীলা, সর্ব্বাঙ্গ হরি নামের ছাপে চিত্রিত, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী এবং গলে ও হস্তে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা "চূড়া যায় জম জিনিতে" বাজাইতে লাগিল, কীর্ত্তনীয়ারা গাইতে লাগিল :—

"আয়রে আয় নগরবাসী দেখ্‌বি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া জম জিনিতে যায়॥
জম জিনিতে যায় রে চূড়া জম জিনিতে যায়।
জপ্‌ তপ কর কিন্তু মরিতে জানিলে হয়।"

রাজবাটীর সম্মুখে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া নানা অঙ্গ ভঙ্গির সহিত এই গান গাহিয়া চূড়ামণি দত্ত অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকে চূড়ামণি বাবু কর্ত্তৃক এই ব্যাপারে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করিয়া সত্য সত্য জম জিনিতে গমন করিলেন। চূড়ামণি নিজে জম জিনিলেন বটে, এদিকে কিন্তু তাঁহার পুত্র বাবু কালী প্রসাদ এক মহা বিপদে পড়িলেন। চারি দিকে জনরব উঠিল, কালীপ্রসাদ বাবু এক মোগল বাইওয়ালীর গৃহে রাত্রি যাপন করেন। সুতরাং তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইবে না। কায়স্থদিগের জন্য কালী প্রসাদ তত উদ্বিগ্ন হন নাই, কারণ সে সময় কলিকাতায় কায়স্থদিগের অনেকগুলি দল ছিল, রাজাদিগের দল ভিন্ন অন্য সকল দল নিশ্চয় উপস্থিত থাকিবে আশ্বাস পাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের জন্য বড় চিন্তা হইল। কলিকাতা ও নিকটস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ রাজবাটীর বৃত্তিভোগী ও অনুগত, (১) ইহারা উপস্থিত না থাকিলে এবং দান গ্রহণ না করিলে কিরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারে? এই বিপদে আক্রান্ত হইয়া কালীপ্রসাদ বাবু মহামতি রামদুলাল সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। সরকার মহাশয় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আমার এবং আপনার বাক্সে একটী পয়সা থাকা পর্য্যন্ত যাহাতে আপনার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধক্রিয়া রীতিমত সম্পন্ন হয়, তাহা আমি করিব। রামদুলাল বা ' বরিষার সাবর্ণ চৌধুরী বৃদ্ধ সন্তোষ রায় মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যাচারের কথা জানাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়াছিলেন। সন্তোষ রায় কুলশীল, ধনমানে ও প্রতিপত্তিতে সে সময় দক্ষিণ বঙ্গে একমাত্র সমাজপতি ব্রাহ্মণ। অসংখ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা কেশবরাম রায়ের এবং তাঁহার নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণের অভাব নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে আপনি অসংখ্য ব্রাহ্মণ লইয়া শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধে কালীপ্রসাদ বাবু উপরোক্ত ব্রাহ্মণদিগের বিদায়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান

(১) কুমারটুলীর বাবু অভয়চরণ মিত্রের মাতৃশ্রাদ্ধেও এইরূপ উৎপাত হইয়াছিল, তাহা কুমারটুলীর মিত্রবংশ বর্ণনা কালে লিখিত হইবে।

করেন। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদিগকে বলেন, লোকে বলিবে, আমরা টাকার লোভে পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে সভাস্থ হইয়াছিলাম, এ অপবাদ রাখা অপেক্ষা এই টাকা কালীদেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে আপত্য না করায়, তাহাই হইল। বর্ত্তমান মন্দির সেই মন্দির, অন্যান্য অনেক ধনীলোক ইহার নিকটস্থ অন্যান্য মন্দির এবং আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কালীক্ষেত্র-দীপিকা বলেন,—প্রধান মন্দিরটী আটকাঠা ভূমির উপর ৬০ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান, ইহার ভিতরের পরিসর ৫০ হস্ত, নির্ম্মিত হইতে ৭।৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং সে কালের অর্থাৎ শত বৎসর পূর্ব্বের বাজারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর করেক বৎসর পরে ১৮০৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। একটী ইষ্টক স্তম্ভে চারিটী হকে চারিটী সোণার হাত এবং উপরে মুখের প্রস্তর খানি বসান আছে। জনশ্রুতি যে সতীর পদাঙ্গুলী প্রস্তরবৎ হইয়া ঐ স্তম্ভ মধ্যে আছে, স্নানযাত্রার সময় হালদার বংশীয় সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যিনি, কেবল তিনি উহা বাহির করিয়া গঙ্গা জলে অভিষেক করাইয়া থাকেন। এখন যে প্রকার কালী মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায়, পূর্ব্বের কোন কালীমূর্ত্তিই তদ্রূপ ছিল না। তমলুকের বর্গভীমা, চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী, কালীঘাটের কালী, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী, সকলই কিম্ভূতকিমাকার। যশোরেশ্বরীরও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল না। অনুমান হয়, কালীঘাটের কালীর অনুকরণেই উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথমে চৌরঙ্গী গিরির তৎপরে জঙ্গল গিরির নাম পাওয়া যাইতেছে, ইহাঁরা সম সাময়িক। তাহার পর একেবারে ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী হইতে ধারাবাহিক অধিকারীদিগের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সময় ধরিলে ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বে আর কয়েকজন অধিকারী থাকা সম্ভব। কারণ চৌরঙ্গী ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে আর ভুবনেশ্বরকে উক্ত শতাব্দীর সম্পূর্ণ শেষ ভাগে দেখিতেছি। তিন বা চারি পুরুষে বংশাবলী ধরা হয় বটে, কিন্তু গুরু শিষ্য বংশ সে হিসাবে ধরা যাইতে পারে না, পাঁচ ছয় পুরুষের কম গুরু শিষ্যের বংশ হইতে পারে না। অনুমান হয়, জঙ্গল গিরি ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে আরও দুই তিন জন সেবক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় যে আত্মারাম ব্রহ্মচারীর নামে আবিষ্কারের জনশ্রুতি আছে, তিনিই ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারী থাকিবেন। ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জামাতা ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণব, বোধ হয় শ্যাম রায় নামক কৃষ্ণবিগ্রহ তিনিই কালীর সহিত রাখিয়া মন্দিরে পূজা করিতেন। দীপিকা বলেন, ১৭২৩ সালে নবাবের কোন কর্ম্মচারী কালীকৃষ্ণ এক মন্দিরে দেখিয়া দুঃখিত হন এবং শ্যামরায়ের স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিকারীরা সর্ব্ব প্রথমে আপনাদিগের পারিবারিক পূজা করেন, কিন্তু ইহাঁরা বৈষ্ণব বংশ বলিয়া আপনাদিগের নিত্য পূজায় বলিদান করেন না, কেবল মহাষ্টমী দিবসের পূজায় একটী মাত্র ছাগ বলি দিয়া থাকেন। প্রত্যহ যে অসংখ্য ছাগ মহিষ বলি হয়, তাহা অপরাপর যাত্রীদিগের প্রদত্ত।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

বুয়র যুদ্ধ। (৪)

পীড়ার পূর্ব্বরূপ।

"শুনিয়াছি, লক্ষ্মীদেবী নাকি বিষ্ণু ঠাকুরের বহুকষ্টের সাগরসেঁচা ধন। তাঁহার এই ধন যদি তিনি বৈকুণ্ঠের অন্তঃপুরের "হেরেমে" খোজার পাহারায় রাখিতেন, এবং জগতের শাসন এবং পালন কার্য্যে তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী না করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, জগচ্চিত্র অনেক কালিমা-কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইত। এই পেঁচক-বাহিনী, অমঙ্গল-চিহ্ন-সঙ্গিনী, সুবর্ণকান্তি দেবী, কোন্ কালে, কোন্ ব্যক্তি, কোন্ জাতি, কোন্ মহাদেশকে স্থায়ী ভাবে উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিয়াছেন? কোন্ দেশে ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি, অলসতা, ভোগস্পৃহা, পর-নির্যাতন-স্পৃহা, অহঙ্কার, পর-কষ্টে-উপেক্ষা, এবং সর্ব্বোপরি, আরো ধনাগমের বাসনা, আরো ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, আগমন করে নাই? দেবী যেখানেই আসুন না কেন, পেঁচকটী ছাড়িয়া কোথাও আসিতে পারেন না। ঐ সর্ব্বামঙ্গলের চিহ্ন তাঁহার চির সহচরী।

বিষ্ণু ঠাকুরের এই ভুল আদি সমালোচনা করিয়া কোন ফল নাই; যত দিন পৃথিবী আছে, ততদিন মানুষকে এই ভুলের জন্য ভোগ ভুগিতেই হইবে। বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদের বিধান হিন্দুর স্বর্গ বৈকুণ্ঠধামে জারি হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম; আর যদি জারি হয়, তথাপি বিষ্ণু ঠাকুর সেই আইনের সহায়তা কখনই গ্রহণ করিবেন না; গ্রহণ করিলেও, কোন উকিল বা কৌন্সিলী তাঁহার ব্রিফ হাতে তুলিয়া লইবেন না। দিন দিনই জগতের সুসভ্যজাতি এই সুবর্ণকান্তি দেবীর পাদপ্রান্তে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন। কোন কোন বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী জাতি, লক্ষ্মী দেবী কর্ত্তৃক আদৃত হইলেও সপত্নী "বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে" নির্ম্মল জ্যোতি, জ্ঞানপ্রসূ মহাদেবীকে উচ্চাসনে বসাইয়া পূজা করেন, এবং তাঁহারই কৃপাবলে লক্ষ্মীর অনুচর অমঙ্গল রাশির করাল আলিঙ্গন হইতে রক্ষা পান। বুয়র জাতি ধনাগমে ধনী হইলেন। লক্ষ্মীর আদরে লালিত সন্তান, নিজের অভাব বুঝিলেন না, পরের অসুবিধা বুঝিলেন না, সর্ব্বগ্রাসী সৌভাগ্যোন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল। এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের মূল, এই আকাঙ্ক্ষার প্রসাদেই তাঁহারা নিজকে চিনিতে পারেন নাই, এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদিগের সাংঘাতিক রোগের পূর্ব্বরূপ।

লক্ষ্মী দেবীর যাদুবিদ্যা-বিশারদ স্পর্শ-বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার অরণ্যময় সবুজ কান্তিসর্ব্বস্ব উপত্যকা, অধিত্যকা, হাস্যময় উদ্যানপূর্ণ গৃহবাটিকায় সজ্জিত হইল; কৃষকদিগের স্থাপিত, কৃষক কর্ত্তৃক শাসিত প্রজাতন্ত্র কয়েক দিন পূর্ব্বের দরিদ্র দেশ, বিপুল ধনসম্পত্তি-পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অমঙ্গলের বহুবিধ কারণও সমদ্ভূত হইল। লোকারাধ্যা সুবর্ণকান্তি দেবীর বেদী যে সর্ব্বদা আদর্শ চরিত্রের লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে না, আফ্রিকার স্বর্ণখনি আবি-

ষ্কার হওয়ার অতি অল্পকাল মধ্যেই, বুয়রেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন। স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পরই সহস্র-জিহ্ব জনপ্রবাদ দেশে বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিখণ্ডের স্বর্ণোৎপাদিকা শক্তির বহুবিধ কথা প্রচার করিল। কেহ শুনিলেন, অনেক স্থানে সুবর্ণ খনি;—কেহ শুনিলেন, প্রায় সকল স্থানেই সুবর্ণ খনি বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ এ কথাও শুনিলেন, যে দক্ষিণ আফ্রিকার মৃত্তিকাই সুবর্ণময়। শেষোক্ত প্রকারের জনশ্রুতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এরূপ কথা বিশ্বাস করিবার লোকও জগতে অতি বিরল নহে। যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিচিত, অভাবের শিশু, ধর্ম্ম এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক তুলারূপে পরিত্যক্ত,—মানব সমাজের আবর্জ্জনা রাশি, তাহারা একথা বিশ্বাস করিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে অনেকে দল বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে জোহানস্‌বার্গ নগরই এই মিশ্র-সম্মিলনের আদর্শ ক্ষেত্র। পরিচিত-নামা দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী অলিভ্ স্রিণার জোহানস্‌বার্গের অবস্থা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

"যাঁহারা ক্লোন্‌ডাইক এবং পশ্চিম আমেরিকার খনিজীবীদিগের আবাসভূমি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট জোহানস্‌বার্গের অবস্থা বর্ণন করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। মানব সমাজের বহুপ্রকৃতির, বহুবর্ণের লোকই এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়;—যেস্থলে সুবর্ণ আবিষ্কৃত হয়, সেই স্থানেই এইরূপ লোকসমাগম হইয়া থাকে। শূকরপুচ্ছবৎ-বিউনী-ভূষিত চীনবাসী, ভারতবাসী কুলি, সবলকায় কাফ্রি এবং শঙ্কর জাতি, সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণ এবং রঞ্জিতকায় লোক এইস্থানে। এবং ইহাদিগের সংখ্যা শ্বেতকায় লোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। সমাগত শ্বেতকায়গণও কম বৈচিত্র্যময় নহে। রাজপথে প্রথম বহির্গত হইলে, মনে এই আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়, যেন দক্ষিণ আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্ব্বজাতির মিলন-কেন্দ্র কোন নগরে সমাগত হইয়াছি। যে স্থানে হরিদ্রাভ রাজার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের লোক একত্রিত, এইরূপ যে কোন স্থানেই এই দৃশ্য সম্ভবপর। রুসিয়া-নিবাসী জু এবং পোল, স্বদেশে যে অত্যাচার হইতে মুক্তি পায় না, সেই অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনীত। কর্ণিস, নর্দাম্বার্ল্যাণ্ড-নিবাসী খনিক; পৃথিবীর সমস্ত দেশীয় শ্রমজীবী; ফরাসী, জর্ম্মাণ, এবং ইংরেজ ব্যবসায়ী; ষ্টক এক্সচেঞ্জে ইয়ুরোপের সমস্ত জাতীয় লোক, বিশেষতঃ য়িহুদীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকা হইতে সমাগত লোকের সংখ্যা তত বেশী নহে, কিন্তু যে কয়েকটী, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই খনিজোপজীবী-নিবাসে বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান সংখ্যাভুক্ত। খনিক যন্ত্রাদির ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য ইহাদিগের হস্তে। আমাদিগের আইন-ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বজাতি-সম্ভূত; বিদেশাগত ব্যক্তিগণ ব্যতীত এই শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী ইংরেজ এবং ওলন্দাজও দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিনের মধ্যে এক ব্যক্তিকে সমস্ত শ্রেণী লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়। আপনার ভৃত্য হয় ত কাফ্রি, ধোপা, অর্দ্ধ কাফ্রি, মাংসবিক্রেতা হাবসি য়িহুদী, রুটীপ্রস্তুত-

কারক ইংরেজ, পাদুকা-নির্ম্মাতা জার্ম্মান্; ভারতবর্ষীয় কুলির নিকট হইতে সাক সবুজি, রাস্তার মোড়ে চীনবাসীর নিকট হইতে কয়লা, আপনাকে ক্রয় করিতে হয়। রুসিয়ার জু আপনার মুদি, জনৈক আমেরিকান্ আপনার প্রিয়তম বন্ধু। এই চিত্র প্রকৃত চিত্র, কল্পনার সাহায্যে রঞ্জিত বিবরণী নহে। চিকাগো হইতে পরিচিতনামা বেশ্যা, এবং আমাদিগের বর্ত্তমান অসমদর্শী সভ্যতার নীতি অনুসারে যাহারা সামাজিক অণু হইতে স্বতন্ত্র, সেই দুঃখময় ভগ্নী-সমিতি, যাহারা জোহান্সবার্গে ইয়ুরোপীয় স্ত্রীলোক (Continental women) নামে খ্যাত, তাহারাও শত শত পরিমাণে পারিস্ এবং ইয়ুরোপের অন্যান্য স্থান হইতে আগত হইয়াছে। জুয়োখেলা, অন্যান্য খনিক নিবাসের ন্যায়, এখানেও বিশেষ ভাবে প্রচলিত; কেবল পুরুষ নহে, স্ত্রীলোকেরাও জুয়োর টেবলে টাকা দিয়া থাকে। এবং হঠাৎ কোন অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই আমাদিগের অন্তরাত্মাকে আহার করে।"

উপরের লিখিত উপকরণে গঠিত, দক্ষিণ আফ্রিকায় সৌভাগ্যান্বেষী মহাপুরুষেরাই উইটল্যাণ্ডার নামে খ্যাত। ইঁহাদিগের প্রতি অসমদর্শিতা, অত্যাচার এবং অবিচারাপরাধে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট বুয়র জাতিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, এবং তাঁহারই আশু দৃষ্টিগত ফল এই যুদ্ধ।

উইটল্যাণ্ডার (বিদেশ হইতে আগত) দিগের গঠনোপকরণ পাঠক মহাশয়ের নিকট বর্ণিত হইল। এইক্ষণে তাহাদিগের এবং ট্রান্‌স্‌ভয়াল নিবাসী বুয়র এবং অন্যান্য জাতির লোক সংখ্যার পরিমাণ কত, তাহা পাঠক মহাশয়ের নিকট না বলিলে, সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাও আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি। এই সংখ্যার নিমিত্ত রিভিউ অব্ রিভিউ নামক বিলাতী পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদক মহামতি ষ্টেডের নিকট আমরা ঋণী।

প্রজাতন্ত্র বুয়র রাজ্যের মোট অধিবাসী সংখ্যা অনুমান ১০,০০,০০০, তন্মধ্যে শ্বেতকায় বিশিষ্টের সংখ্যা ২৫০,০০০ আড়াই লক্ষের বেশী নহে। ইহার মধ্যে বুয়রের সংখ্যা যে কত, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ক্রুগার বলিতেন, তাঁহার বারারদিগের সংখ্যা ৩০,০০০ ত্রিশ সহস্রের বেশী হইবে না। মহামতি ষ্টেড ইহাদিগের সংখ্যা ৮০,০০০ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বিগত যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিলে বুয়রদিগের ৮০,০০০ হাজার অপেক্ষা বেশী বোধ হইলেও লক্ষাধিক অনুমিত হয় না।

এই এক লক্ষ লোকের সহিত অপর দেড় লক্ষ লোকের মনোবাদ। এই লক্ষ লোক প্রভু এবং শাসক, অপর দেড় লক্ষ শাসিত, এই এক লক্ষ রাজা অপর দেড় লক্ষ প্রজা। এই অধিকাংশের প্রতি অসমদর্শিতা এবং অত্যাচারই যুদ্ধের আশুদৃষ্টিগত কারণ।

পাঠক মহাশয় হয়ত বলিবেন, ভারতবর্ষে দশ লক্ষ লোক অন্নকষ্টে মরিয়া মাটী হইল; উন্নত এবং গর্ব্বিত পদস্থ রাজপ্রতিনিধি দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করিলেন; তথাপি ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে কপর্দ্দক বাহির হইল না। আর এই দেড় লক্ষ লোকের প্রতি কাল্পনিক অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত একটী স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা নাশ, রাজকোষের ক্রোড় ক্রোড় টাকা এবং উভয় জাতির সহস্র সহস্র প্রাণ বিনষ্ট হইল!

আমরা এই জন্য বলিয়াছি যে, এটী কেবল আশুদৃষ্টিগত কারণ, গূঢ় কারণ অন্তর্নিহিত। সমস্ত কর্ম্মেরই গূঢ় কারণ অন্তর্নিহিত থাকে, এক্ষেত্রেও সেই সাধারণ বিধির ব্যভিচার হইতে পারে না। যাহা হউক, উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের প্রতি কি কি অত্যাচার জন্য বুয়র জাতি অভিযুক্ত, আমরা এইক্ষণে তাহাই সমালোচনা করিব। কিন্তু এই সমালোচনার পূর্ব্বে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের শাসন-প্রণালী কি ছিল, তাহা অগ্রে পাঠক মহাশয়ের সম্মুখে রাখা আবশ্যক, নচেৎ অনেক কথারই অর্থ বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের শাসন প্রণালী।

ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যে পার্লামেণ্টের হস্তে সর্ব্বপ্রকার বিধান বিধিবদ্ধ করার অধিকার ছিল। এই পার্লামেণ্ট দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে একটী চেম্বার বলা হইত; প্রত্যেক চেম্বারে ১৮ জন সদস্য, ভিন্ন ভিন্ন জেলা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি, দ্বিতীয় চেম্বারে পাস হইলেও, প্রথম চেম্বার কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত, রাজ্যের বিধান বলিয়া পরিগণিত হইত না। উভয় চেম্বারের সদস্যবর্গকেই নিম্নলিখিতরূপ লোক মধ্য হইতে মনোনয়ন করিতে হইত।

(ক) উভয় চেম্বারেরই প্রত্যেক সভ্য ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া আবশ্যক।

(খ) প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কেহ সদস্য হইতে পারিতেন না।

(গ) যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি আছে, তিনিই মাত্র সদস্য হইতে পারিতেন।

(ঘ) যিনি কখনও কোন ফৌজদারী অভিযোগে দণ্ডিত হন নাই, কেবল তিনিই মাত্র সদস্য হইতে পারিতেন।

(ঙ) প্রথম চেম্বারের সদস্য, প্রথম শ্রেণীর বারারদিগের মধ্য হইতে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক, এবং দ্বিতীয় চেম্বারের সদস্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর বারারদিগের মধ্য হইতে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর বারারদিগের কর্ত্তৃক একযোগে, চারি বৎসরের নিমিত্ত মনোনীত হইতেন।

(চ) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মের পূর্ব্ব হইতে যে সকল শ্বেতকায় পুরুষ উক্ত রাজ্য মধ্যে বাস করিতেছিলেন, অথবা যাঁহারা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মালাবত যুদ্ধে, ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌সন্ কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণ কালে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সোয়াজিলেণ্ডের যুদ্ধে এবং উক্ত রাজ্যের সহিত আদিমবাসীদিগের অন্যান্য যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের ষোড়শ বৎসর বয়স্ক ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক পুত্রগণ প্রথমশ্রেণীর বারার বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

(ছ) বিদেশাগত কোন ব্যক্তি সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যের বসিন্দাশ্রেণী ভুক্ত (Naturalised) হইলে তিনি এবং তাঁহার ষোড়শ বৎসর কিম্বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর বারার বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

(জ) দুই বৎসর বসবাসের পর, ফিল্ড কর্ণেটের রেজেষ্টারীতে দুই পাউণ্ড ফিস্ দিয়া, নাম রেজেষ্টারী করিলে এবং প্রজাস্বরূপে বশ্যতা স্বীকারের শপথ বাক্য উচ্চারণ করিলে, বসিন্দাশ্রেণী ভুক্ত হওয়া যাইত।

(ঝ) কোন ব্যক্তি উক্ত প্রকার বসিন্দা শ্রেণী ভুক্ত হওয়ার দ্বাদশ বৎসর পর, প্রথম চেম্বার তাঁহাকে, তন্মর্ম্মে বিশেষ রিজোলিউসনের দ্বারা, প্রথম শ্রেণীর বারার শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে পারিতেন।

(ঞ) বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের সন্তানগণ সাধারণ-তন্ত্র রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও কোন রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না; কিন্তু ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় উক্ত প্রকারে নাম রেজেষ্টারী করিলে, ১৮ বৎসর বয়সের সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর বারার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এবং প্রথম চেম্বার ইচ্ছা করিলে, তন্মর্ম্মে রিজোলিউসন দ্বারা, উক্ত প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর বারারকে প্রথম শ্রেণীর বারারের মধ্যে ভুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় চেম্বারের সদস্য হইবার নিমিত্ত উপযোগী হইবার দশ বৎসর পরে, অথবা চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঐ প্রকার প্রথম শ্রেণী ভুক্ত হইবার অধিকার কাহারও ছিল না।

(ট) প্রেসিডেণ্ট্ এবং কমেণ্ডেণ্ট্ জেনারল্ কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর বারারদিগকর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন।

(ঠ) ডিষ্ট্রীক্ট কমেণ্ডেণ্ট্ এবং ফিল্ড কর্ণেট্ উভয় শ্রেণীর বারার একত্র হইয়া মনোনয়ন করিতেন।

উইট্ল্যাণ্ডারদিগের অভিযোগ।

ইতিপূর্ব্বলিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, বুয়র রাজ্যের রাজনৈতিক কোন কার্য্যে বিদেশীয় লোকের কোন অধিকারই ছিল না। তিনি পুরুষানুক্রমে ট্রান্স্ভায়াল রাজ্যের বসিন্দা হইতে পারেন, কিন্তু বুয়রের অনুগ্রহ ব্যতীত প্রথম চেম্বারের সদস্য হওয়ার অধিকার তাঁহার কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। এবং সেই অনুগ্রহ পাওয়াও তত সম্ভবপর ছিল না। কাজেই উইট্ল্যাণ্ডার মনে করিতেন যে, বুয়র গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ অন্যায় করিতেছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়ই তাঁহার চিরদিনের হইবার সম্ভাবনা; তাঁহার শ্রমজাত ফলে সাধারণ তন্ত্র রাজ্য ধনী এবং গৌরবান্বিত, তাঁহার প্রদত্ত টেক্সে রাজ্যের রাজকোষের কলেবর বর্দ্ধিত; অথচ সেই রাজ্যের কোন কার্য্যে তাঁহার একটী কথা বলিবার অধিকার নাই! এ কি অন্যায় নয়? পৃথিবীতে এরূপ অনেক স্থান আছে বটে, যে স্থানে দেশের অধিবাসীরাও তাহাদিগের দেশীয় শাসন সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকারী নহে। উইট্ল্যাণ্ডার যদি এইরূপ কোন দেশের লোক হইতেন, তবে তাঁহার প্রাণে এই অসমদর্শিতা অত্যাচার বোধ হইত না; কিন্তু শ্বেতকায় উইট্ল্যাণ্ডারগণ মধ্যে অনেকেই স্বাধীন রাজ্যের লোক, স্বাধীনতার ক্রোড়ে পালিত, তাঁহারা এইরূপ অসমতা সহজে সহ্য করিতে পারিবেন কেন? কাজেই তাঁহারা এই অসমদর্শী বিধানকে অত্যন্ত অত্যাচারী বিধান বলিয়া স্থির করিলেন।

আমরা ভারতবাসী, আমরা এ কথার অর্থ ভাল রূপে বুঝিতে পারি না! আমাদিগের দেশে প্রজার রাজনৈতিক স্বাধীনতা কোন কালেই ছিল না। আমরা, নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে, গৃহে পরিবারবর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, পৈত্রিক ধন-সম্পত্তি এবং নিজের শ্রমার্জ্জিত অর্থভোগ করিতে পারিলেই

নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করি। চিরকালই ভারতবর্ষীয় লোক এইরূপ মনে করিয়াছে। কোন জাতি, সেই জাতীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হইলে, সে শাসন যতই স্বেচ্ছাচারী এবং অনিয়মিত হউক না কেন, আমরা সেই জাতিকেই স্বাধীন জাতি বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষে এই প্রকার স্বাধীনতা কোন কোন আর্য্য বংশ দীর্ঘকাল উপভোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নৈতিক বিভাগে এবং কার্য্যকরী বিভাগে প্রজা কখনও কোন অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এই শ্রেণীর স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে; যেখানে প্রজার স্বরই রাষ্ট্রীয় সমস্ত বিভাগে প্রবল, সেই দেশের লোক এই শ্রেণীর স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে না; এবং সেই স্বাধীনতার রস যাহারা আস্বাদন করিয়াছে, তাহারা জীবনের সঙ্গে তাহার বিনিময় করিলেও, অধিক মূল্য দেওয়া হইল বলিয়া মনে করে না। আফ্রিকায় যাঁহারা ভিন্ন দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই শ্রেণীর লোকই অনেক ছিলেন।

বুয়রদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ব্যতীত আরও অনেক অভিযোগ ছিল। বুয়র বিচারালয়ে বিদেশীয় ব্যক্তি সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না; বুয়র পুলিস উৎকোচগ্রাহী এবং স্বেচ্ছাচারী, তাহাদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেও কোন ফল পাওয়া যাইত না; খনিকগণ ডিনামাইট দিয়া খনির প্রস্তর ভগ্ন করেন, এই ডিনামাইট গবর্ণমেণ্টের একচেটে, এবং গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর তাহা অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন; জীবনধারণে নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ হইতেও বুয়র গবর্ণমেণ্ট অনেক শুল্ক আদায় করিতেন; রেলওয়ে লাইন গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ছিল, রেলওয়ে দ্বারা প্রেরিত দ্রব্যাদির নিমিত্ত অত্যন্ত বেশী ভাড়া দিতে হইত; খনিকদিগের খনিজাত স্বর্ণ অপহৃত হইত, তাহা নিবারণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত ছিল না; মদের শুল্ক হইতে বুয়র গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লাভ করিতেন, সুতরাং খনিকদিগের অধীনে যে সমস্ত শ্রমজীবীগণ কার্য্য করিত, মদ তাহাদিগের পক্ষে যাহাতে অল্পায়াসপ্রাপ্য হয়, এইরূপই কার্য্যত বন্দোবস্ত ছিল; আদিমবাসীদিগের কার্য্যাদি ও ব্যবসায় সম্বন্ধে "পাশ্ ল" নামক একটী বিধান প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিধান রীতিমত কার্য্যে পরিণত হইত না। এই কয়েকটী প্রকাণ্ড অভিযোগ; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুলি কষ্টের কারণ, তাঁহাদিগের বিশেষতঃ ইংরেজনিবাসীর, প্রাণকে সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট করিত। ইংরেজ সম্মান ও সম্ভ্রম-প্রত্যাশী, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইয়া থাকেন; বুয়র কৃষক তাঁহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না; কথায় কথায় ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের পরাভব কাহিনী তাহার স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া দেয়; বুয়ররাজ্যে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ওলন্দাজ রাজকর্ম্মচারীর আসনে আসীন, কিন্তু কোন আসনেই একটী ইংরেজকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরেজের অনুগ্রহে বুয়র স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন; ইংরেজের অস্ত্রবলে ভীত হইয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন; সেই ইংরেজের প্রতি এইরূপ ব্যবহার! ইংরেজের প্রাণে ইহা বড়ই বাজিল। অফ্রিকা নিবাসী সমস্ত শ্বেতকায়ের তুল্যাধিকার স্থাপনের নিমিত্ত ইংরেজ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে

সভা সমিতি স্থাপন এবং বহুল প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আশা করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় নৈতিক সভায় তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বী লোকদিগকে, তাঁহাদিগের চেষ্টায়, সদস্য করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তথাপি বুয়ররাজ্য তাহাদিগের অর্থাগমের ক্ষেত্র, বুয়র যতই অন্যায় করুন না কেন, বুয়রের ভূমি কৃপণ নহে; সুতরাং কোন প্রকারে উভয় জাতি এক প্রকারে দিন কাটাইতেছিলেন। বিশেষতঃ কাজের লোক এবং ব্যবসায়ীর হাতে, নিজ কার্য্যবাহুল্য যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যান্য আবান্তরিক বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি ততটা তীক্ষ্নরূপে ধাবিত হয় না। এবং কার্য্য ক্ষতি-আশঙ্কায় নিতান্ত কষ্টকর অবস্থাকেও উপেক্ষা করা হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া গেল। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের মরসুম বড়ই মন্দ। খনিকদিগের কার্য্য কর্ম্ম প্রায় বন্ধ। দুশ্চিন্তা দুর্ব্বুদ্ধি অলস মনের চির-সহচর। এই সময়ে খনিকগণ তীব্রভাবে অনুভব করিলেন যে, তাঁহারা বড়ই অত্যাচারিত; তাঁহাদিগের ন্যায় দুরবস্থ জীব জগতে আর নাই; এত অসম্ভ্রম, এত অপমান সহ্য করিয়া ধনে বা জীবনে লাভ কি? এই সমুদয় অত্যাচার এবং অসুবিধা যেরূপে দূর হয় তাহা করিতে হইবেই হইবে। "শাপাদপি শরাদপি" কার্য্যসাধন করিতেই হইবে। জোহান্স্‌বার্গ নগরে এই আন্দোলন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বুয়রগণ জোহান্সবার্গ নিবাসী ইংরেজদিগকে অতি অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহার অপরিহার্য্য ফল স্বরূপ পুলিসের অত্যাচার আরও বর্দ্ধিত হইল।

দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট হইলে, ঠিক উহার বিপরীত উপায়ে এই অসন্তুষ্টির অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু বুয়র গবর্ণমেণ্ট, যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহাতে অসন্তুষ্টি আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল।

এই প্রজ্জলিত অগ্নি আর একটী ঘটনা দ্বারা বিশেষরূপে ব্যঞ্জিত হইল। কেপকলনীর গবর্ণর সার হেনরি লক নাকি জোহানস্‌বার্গ নিবাসী জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তোমাদিগের কি পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র আছে? সাহায্য প্রাপ্তির বিলম্ব হইলে ছয় দিন পর্য্যন্ত তোমরা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ কি না? ইত্যাদি।" এইরূপ সময়ে, ইংরাজরাজ প্রতিনিধির মুখ নিঃসৃত এইরূপ প্রশ্নের কথা প্রচারিত হইলে অসন্তুষ্ট উইটল্যাণ্ডারগণ যে সমধিক পরিমাণে সাহসী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাঁহারা স্থির করিলেন যে, বল দ্বারা তাঁহারা ক্রুগারকে পদচ্যুত করিবেন এবং তাঁহাদিগের মনোগত গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিবেন।

এই সময়ে খ্যাতনামা সিসিল্ রোডস্ দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষরূপে পদস্থ। তিনি কেপ গবর্ণমেণ্টেরও বিশ্বাসী এবং বুয়রের ও হিতৈষী; কেপকলনী-নিবাসী বুয়রগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন; এবং উভয় জাতীয় অণুর একত্র সংমিশ্রণের নিমিত্ত যাঁহারা অগ্রণী, তিনি তাহাদিগের মুখপাত্র বলিয়া সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। জোহান্স্‌বার্গ নিবাসী অসন্তুষ্ট উইটল্যাণ্ডারগণ মনে করিলেন, এই ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার আর কোন বাধা থাকিবেনা।

তাঁহারা বারম্বার রোডস্ মহোদয়কে তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি যে আসনে আসীন, তথা হইতে তিনি তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিলে, তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তাহা হইলে বুয়র আর তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সুতরাং প্রথমতঃ এই অসন্তুষ্ট দলের কথায় তিনি কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে, জোহান্সবার্গ নিবাসী উইটল্যাণ্ডারগণ তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি যদি তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন না করেন, তবে ট্রান্সভয়াল রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিবেন, এবং ক্রুগারকে পদচ্যুত করিয়া এরূপ এক সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত করিবেন, যাহা গ্রেট ব্রিটেনের আরো বিরোধী হইবে।

তৎকালে সিসিল রোডস অথবা অপর কোন ইংরেজ বুয়রের সামরিক বলের বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন না। উইট্ল্যাণ্ডারদিগের মধ্যে অন্যূন ৩০,০০০ সহস্র ইংরেজ এবং আমেরিকা নিবাসী; তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত অস্ত্রধারণ করিলে অশিক্ষিত বুয়র কৃষকের কি আর সাধ্য হইবে যে, আত্মরক্ষা করিতে পারে? দশ সহস্র ইংরেজ সৈন্য কি পঞ্চাশ সহস্র শত্রুসৈন্যকে কখনও পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই? ইংরেজ ভুবনবিজয়ী, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সিসিল্ রোডসের মনে এই রূপ হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী ষ্টেড্ সাহেব বলেন যে, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লব অপরিহার্য্য, এবং এই বিপ্লবকারী দলের পক্ষ সমর্থন করা আবশ্যক। কারণ, যখন সেই অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তখন এই বিপ্লবকারীগণ কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ না থাকিলে, ব্রিটিস প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ এবং নূতন প্রজাতন্ত্র রাজ্য অন্যান্য উপনিবেশের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা অতি দূরস্থিত। কলনিয়াল সেক্রেটারীকে সমস্ত অবস্থা, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত মেঃ রোডস ইংলণ্ডে তাঁহার বিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। ষ্টেড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, উইট্ল্যাণ্ডারদিগকে অর্থ এবং অস্ত্রও প্রদান করা হইয়াছিল।

উইটল্যাণ্ডারগণ উল্লিখিত রূপে সজ্জিত হওয়ার পর, ডাক্তার জেম্সন্ একদল অস্ত্রধারী সৈন্য সহ ইংরেজ রাজের প্রান্তদেশে প্রেরিত হইলেন। বুয়ররাজ্য উইটল্যাণ্ডার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার পর, সেখানে শান্তিস্থাপন করিবার নিমিত্ত আফ্রিকার হাইকমিশনর যেরূপ আদেশ করেন, তাহা যেন অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ডাক্তার জেম্সন্ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, উইট্ল্যাণ্ডার যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই রহিলেন। যাঁহারা জগতের কোন সত্য এবং মানব জাতির কোন সাধারণ স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারা জীবন মরণ নিরপেক্ষ হইয়া ব্রত উদ্যাপিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উইট্ল্যাণ্ডারগণ তদ্রূপ কোন ব্রতে ব্রতী হন নাই; তাঁহারা নিজেরা দুস্থ, অপদস্থ, অপমানিত এবং অত্যাচারিত; এই সমুদয় অসুবিধা দূর

করিবার নিমিত্ত সম্বরবদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত ব্যস্ত, সুতরাং সমাবস্থ, সকলে একোদ্দেশ্যে একত্রিত। ইহাদিগের চালক শক্তির মূলে স্বার্থ। এই রূপ অবস্থায়, অগ্রণী হইয়া ঘণ্টা বান্ধিবার লোক অতি বিরল। লাভ লোকসান পাশাপাশি খতিয়ান করিলে, লোকসানের দিকের অঙ্কই বড় দেখা যায়। সুতরাং স্বার্থ-প্রণোদিত প্রাণ এরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ পদচারণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

ডাক্তার জেম্‌সন্ অল্পবয়স্ক লোক, তিনি অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, তিনি হয় ত মনে করিলেন, বিদ্রোহের পর শান্তি স্থাপন, আর বিদ্রোহ ঘটাইয়া তৎপরে শান্তি বিধান, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি কম। তাঁহাকে অগ্রসর দেখিলে ভীত বিদ্রোহী দল সাহসী হইবে এবং অনতিবিলম্বে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

জেম্‌সন্ সাহেব জানিতেন না যে, বুয়র তাঁহার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ ভাবে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছেন; তাঁহার দৃষ্টান্তে বিদ্রোহী দল সাহসী হইবার পূর্ব্বেই যে তিনি স্বয়ং একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইবেন, একথা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি ডুরণকপ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, বুয়রগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন এবং বন্দী করিলেন। বিদ্রোহীদলের কয়েকটী প্রধান অধিনেতাও গ্রেপ্তার হইয়া উচ্চতম দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, কিন্তু বুয়রগণ পরে তাহাদিগের মৃত্যু দণ্ডের পরিবর্ত্তে গুরুতর অর্থদণ্ড করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন। জেম্‌সন্ এবং তাঁহার সহযোগী ব্রিটিস্ সেনা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিচারার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন। ডাক্তার জেম্‌সন্ নামমাত্র দণ্ডিত হইলেন।

ব্রিটিস্ পার্লেমেণ্টে নীরব থাকিবার পদার্থ নহে; এই গোলযোগ সংঘটনের প্রকৃত কারণ কি ? তাহার তথ্যানুসন্ধান জন্য পার্লেমেণ্টারি-কমিশন বসিল। বুয়র গবর্ণমেণ্ট এই কমিসনের কার্য্যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলেন যে, বুয়রের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বক্তব্য এবং শ্রোতব্য, তাহা কমিশন অতি স্থির ভাবে শুনিলেন ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে ত্রুটী করিলেন না; তাপর যখন প্রমাণস্থলে এরূপ অনেক দলিল বাহির হইয়া পড়িল, যদ্বারা ব্রিটিস্ মন্ত্রী-সভাকে সমস্ত গোলযোগের মূলাধার বলিয়া সাব্যস্ত না করিয়া আর উপায়ান্তর নাই, তখন কমিশন সেই সমস্ত দলিল সাধারণের গোচর করিতে অস্বীকার করিলেন।

এই কমিশন ন্যায়ই করুন আর অন্যায়ই করুন, এই ঘটনায় ব্রিটিস্ সভতার প্রতি বুয়র সবিশেষ সন্দিহান হইলেন। ভবিষ্যতে তাঁহারা যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন, তদ্রূপ উপায়বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বিধান বিধিবদ্ধ হইল, তন্মধ্যে একটী এইরূপ বিধানও বিধিবদ্ধ হইল যে, তাহার বলে, ট্রান্স্‌ভয়াল প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট সেই রাজ্যের স্থাপিত শাসন-প্রণালী বিরোধী কিম্বা শান্তিভঙ্গকারী বিদেশীয়কে রাজ্য হইতে যখন ইচ্ছা বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবেন। জোহান্সবার্গের সন্নিকটে দুর্গ নির্ম্মিত হইল; দূরঘাতী বহু কামান তাহার তোরণোপরে জোহান্সবার্গ

অভিমুখে স্থাপিত হইল; ফরাসী ও জর্ম্মাণ সৈনিক বিভাগের লোক বুয়র যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং রাজ্যরক্ষার উপযোগী সৈনিক বিভাগের শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন; তদনুরূপ বারুদ গুলি ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রিটরিয়া নগরীর দুর্গাদি দ্বারা বলবিধান করিতেও বুয়রগণ কোন প্রকার শৈথিল্য দেখাইলেন না। উইটল্যাণ্ডারগণের অবস্থা আরো শোচনীয় হইল। ক্রুগারের ক্ষমতা আবার সমুজ্জল ভাবে প্রকাশিত হইল; ট্রান্সভয়াল রাজ্যবাসী বুয়রগণ তাঁহাকে অদ্বিতীয় এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া স্থির করিলেন।

উইটল্যাণ্ডারগণের মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশ আরো মেঘে কালিমান্বিত হইল। তবে এত অন্ধকারের মধ্যেও সামান্য একটুকু আশার জ্যোতি ছিল;—বুয়র কমাণ্ডাণ্ট-জেনেরল জুবার্ট এবং তাঁহার মতাবলম্বী পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির কতিপয় বুয়র মনে করিতেন যে, ক্রুগার যে প্রণালীতে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা হইতে উইটল্যাণ্ডারদিগকে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাহা কখনই ফলপ্রদ এবং সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাদিগের মতে, যে কোন দেশে বিদেশাগত কোন ব্যক্তি আবাস স্থাপন করিলে, এবং সেই দেশবাসীর ন্যায় দেশীয় সমস্ত কার্য্যভারের অংশ গ্রহণ করিলে, তাহাকে সকলের সহিত তুল্যাধিকার প্রদান করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বুয়রদিগের মধ্যে জুবার্টের মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কত কম ছিল; কিন্তু এই দলের বল, দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছিল, হয়ত কালবিলম্বে বৃদ্ধ ক্রুগার সমাধিস্থ হইলে এই দলই প্রবল হইতেন। কিন্তু নিয়তির গতি অবিতর্কিত, মানুষ যাহা ভাবে, তাহা প্রায় ঘটে না, যাহা ভাবে না, তাহাই প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন কবি তাহার অক্ষয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন :—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি।
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহঽভ্যুপৈতি ॥"

উইটল্যাণ্ডারগণ এই অনিশ্চিত আশার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু জেমসন সাহেব কর্তৃক ট্রান্সভয়াল রাজ্য আক্রমণ উপলক্ষে ইংলণ্ডের একদল পদস্থ লোক, সংবাদপত্র এবং বিদেশীয় অন্যান্য সুসভ্য জাতি যেরূপ তীব্রভাবে তাহাদিগের প্রতি তিরস্কার বাক্য বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে তদ্রূপ চেষ্টা যে আর কখনও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি দ্বারা সমর্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, একথা তাঁহারা বেশ বুঝিলেন। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বাবধারিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পথাবলম্বন করিলেন।

উপায়ান্তর।

পরস্বাপহারী দস্যুর ন্যায়, মৈত্রী-সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ প্রতিবেশী বুয়রের রাজ্যে আক্রমণ করিলে, সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে; কিন্তু অস্ত্রবলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলদ্বারা অর্থাৎ পদস্থ ব্যক্তিদিগকে, ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণকে, উইটল্যাণ্ডারদিগের দুঃখ বুঝাইয়া, সাধারণের সহানুভূতি দ্বারা বলীয়ান হইয়া, নৈতিক বিধানে আক্রমণ করিলে, সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী এবং পক্ষান্তরে নিন্দার ভয়ও কম। সুতরাং উইটল্যাণ্ডারগণ এই পথই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার অদৃষ্ট চক্রে কয়েকটী প্রধান গ্রহ বিরাজমান :—ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভার কলনিয়ান সেক্রেটরী মেঃ চেম্বারলেইন, দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ উপনিবেশের গবর্ণর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনর সার্ আল্‌ফ্রেড্ মিলিনার; দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ মূলধনীদিগের মুখপাত্র মেঃ সিসিল্ রোডস্, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের প্রিসিডেণ্ট মিঃ ষ্টীন, বুয়র-কমাণ্ডণ্ট-জেনারেল জুবার্ট এবং ট্রান্সভয়াল প্রদেশস্থ সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট-ক্রুগার। উইটল্যাণ্ডারদিগের গণনায় ক্রুগার অতি কুগ্রহ, সমস্ত শুভগ্রহের বল একত্রিত না হইলে এই কুগ্রহ-ফলের শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত বল একত্রিত করার উপায় কি? উইটল্যাণ্ডারের দুঃখ-কাহিনী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করানই প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া অবধারিত হইল; তাহার ফলও ফলিল; ইংলণ্ডে, কেপকলনীতে এবং বুয়রদিগের মধ্যেও অনেকে উইটল্যাণ্ডারদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। চেম্বারলেন্ সাহেব অতি মিষ্ট স্বরে ক্রুগারকে বলিলেন, "উইটল্যাণ্ডারদিগের প্রতি আপনার দৃষ্টি করা উচিত", ক্রুগার তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। সেই সময়, কর্ণপাত করিবার সময়ও নহে। তখন তাঁহার প্রাণে জেমসন্ রেডের এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত অভিনয়ের জলন্ত চিত্র মূর্ত্তিমান; বুয়র স্বাধীনতা-বিনাশ প্রধান প্রয়াসী উইটল্যাণ্ডারের দুঃখকাহিনী কি আর তখন তাঁহার শুনিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু বুয়র-সেনাপতি-জুবার্ট-প্রমুখ সদাশয় বুয়ার অতি উচ্চ হৃদয়ের লোক; জেমসন্ কর্ত্তৃক বুয়র রাজ্য, আক্রান্ত হওয়া সত্বেও, দেশবাসী উইটল্যাণ্ডারদিগের ন্যায্যাধিকার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের [illegible] বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ সম্পূর্ণ এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ কতকাংশ কাল জেমসন্ রেড্ এবং তাহার পরিশিষ্ট সমালোচনায় অতিবাহিত হইল। ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ শেষে উইটল্যাণ্ডারগণ এই উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ, ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে, বুয়র-গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ কমিশন নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিশনের কয়েকটী নির্দ্ধারণ, এবং তৎসঙ্গে বুয়র-গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন, তাহা, আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

দ্বিতীয় উপায়—ইংলণ্ডের লোকদিগকে, বিশেষতঃ মন্ত্রী-সভাকে, বুঝাইয়া দেওয়া যে, ইংলণ্ডের রাজশক্তি আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেরূপ উদার এবং উদাসীন ভাবে অবস্থিত,তাহাতে গ্রেট ব্রিটেনের প্রাধান্য দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। বুয়রদিগের কয়েকটী কার্য্যে এই উপায়টীও ফলবতী হইল। চেম্বারলেন্ সাহেব পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত করিলেন, এবং বুয়র গবর্ণমেণ্ট যে গ্রেটব্রিটেনের রাজকীয় শক্তির অধীন, এই কথা বাক্যে ও কার্য্যে প্রমাণ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। চেম্বারলেন্ মহোদয়ের পূর্ব্ব মত কি ছিল, তাহার পরে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা আমরা যথাস্থলে আলোচনা করিব।

তৃতীয় উপায়—আফ্রিকা-নিবাসী সর্ব্ব-জাতির একত্র সমন্বয় যাহাদিগের প্রাণের আদর্শ, সেই সকল সদাশয় ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, রাজনৈতিক সংমিশ্রণ ব্যতীত এই সমন্বয় সম্ভবপর নহে; এবং

সহা মধ্যস্থতার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের বিধানানুবর্ত্তী বুয়র-গবর্ণমেণ্টের অধীনে এইরূপ সমন্বয় সম্পূর্ণ অসম্ভব। ট্রান্সভাল রাজ্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপায়ও আশাতীত সফল হইল। এই উপায় যে সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইবে, তাহা তদুদ্ভাবনকারী কেহ কখনও মনে করেন নাই। এবিষয়ে বুয়রদিগের কৃতকার্য্য তাঁহাদিগের যথেষ্ট সহাবতা করিল। মূর্খ নহেন, তবে তাঁহারা এরূপ অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিলেন কেন? তাহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, 'ভগবান যাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি হইতে অগ্রেই বঞ্চিত করিয়া থাকেন।' এই বিষয়টীও আমরা অতঃপর যথাস্থানে আলোচনা করিব। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

সমাজ-সংস্কার—হিন্দু ও ব্রাহ্ম।

হিন্দু বলেন, ব্রাহ্ম হিন্দু নহে, অথচ ব্রাহ্মেরা সমাজ সংস্কার করুক, আর আমরা তাহাদিগকে মনের সুখে গালি দেই। দেশের উপকার হয়, ক্ষতি নাই, বরং মৌন থাকিব, আমাদের উপার্জ্জনেরও ক্ষতি হইবে না, বা শরীরেও ধূলা লাগিবে না, ইহাতে দেশ উদ্ধার হয় ভাল; আর যদি অপকার হয়, তবে পাষণ্ড ভণ্ড প্রভৃতি শুকারাদি ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্ম ভাবিতেছেন, আমরা সমাজের বাহিরে, আমাদের নিজের যাহা সংস্কার আবশ্যক,তাহাই করি, অন্য দিকে চাহিবার অবকাশ, কোথা।

এ দিকে যে প্রকাণ্ড হিন্দু-সমাজ-সমুদ্র কাণ্ডারি বিহীন তরণীর ন্যায় চারিদিকে মহা বিভ্রাটের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার দিকে কে চাহিবে? কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ লইয়াই সমাজ নহে। এ তিনটী জাতি সজীব, সুতরাং যদি কোন গোলযোগ হয়, তবে আপনারা চেষ্টা করিয়াও কখনও কখনও সমাজ সংস্কার করিতে পারে। আর এ তিন বর্ণ হিন্দু-সমাজ-বৃক্ষের পুষ্প মাত্র, বা সাগর-বক্ষের ফেনা মাত্র, উৎসন্ন হইলেও প্রকৃত হিন্দু জাতির বিলোপ হয় না।

প্রকৃত জাতি কুটীর-নিবাসী, শাকান্নভোজী। ঐ যে ভারতের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ও অন্ন দান করিবার জন্য,যাঁহাদের মস্তকের স্বেদ পদে পতিত হইতেছে, সেই নবশাখ জাতির অবস্থা কেহ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? উত্তর-বঙ্গে এই সমস্ত জাতির বর্ত্তমান অবস্থা আমি লিখিতেছি, ভরসা করি, এ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ কোন দক্ষিণ-বঙ্গ-নিবাসী মহাত্মা বাকী অংশ পূরণ করিবেন।

আমি একটী গ্রামে সে দিন গিয়াছিলাম, এবং জাতি সমূহের তালিকা লইয়াছিলাম। উক্ত গ্রামে কুরী, তিলি, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা ও ব্রাহ্মণের বাস। ব্রাহ্মণের জন্য চিন্তা নাই, কারণ আপনার কার্য্যগুণেও বংশ মর্য্যাদা ও জাতীয় গৌরবের জন্য তাঁহারা শীঘ্রই পৃথিবীর ভার লঘু করিবেন। তাঁহারা ১০ বৎসরের মধ্যে সংখ্যায় অর্দ্ধেক হইয়াছেন, ও তাঁহাদের মধ্যে ৫৫ বৎসরের ও ৪০ বৎসরের ও ৩৫ বৎসরের এক্ষণে ৩টী অবিবাহিত রহিয়াছেন। আর যে কয়েকটী বালক দেখিলাম, তাহাদেরও বিবাহ হইবে না।

কুরী-জাতি এখানে জমিদার, ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের লোক সংখ্যা ৩৫ হইবে

তন্মধ্যে ১৫ জনই বিধবা রমণী। তাহাদের বিবাহ করিতে হইলে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। আর রক্ত সম্বন্ধ মধ্যে বিবাহ করিতে হইলে তাঁহাদের ৫ ঘরের মধ্যেই করিতে পারেন। তাহাদের জেলায় আরও কুরী আছেন, কিন্তু তাঁহারা ছোট ঘর, বা বড় ঘর, সুতরাং তাহাদের সহিত ক্রিয়া-কর্ম্ম হয় না। এবং চেষ্টাও কেহ করে না।

তৎপরে তিলি। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন বিবাহ করিতে না পারিয়া সংপ্রতি বৈরাগী হইয়াছেন। একজন ৩৫ বৎসর বয়স্ক যুবা ৬০০৲ টাকা পণ ও ১০০ টাকা ঘটককে ঘুষ দিয়া বিবাহ স্থির করিয়াছেন, মূল ভবিতব্য। এই প্রকারে এই বংশ প্রায় উৎসন্ন হইয়াছে।

গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, ইহাদের কথাও তাই, তবে এই বলিতে পারি যে, যে কয়েকটী বৈষ্ণবী লইয়া গোয়ালা ও তিলিগণ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম পবিত্র করিয়াছেন, তাহারা সকলেই কৈবর্ত্ত জাতীয়।

মনুষ্যের এই দেখিলাম, কিন্তু ভগবানের বিধান দেখিয়া অবাক হইলাম, আহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। গ্রামে পুরুষও ৬৭, স্ত্রীলোকও ৬৭। পাষণ্ড মানব নিজ দোষে মরিবে, তাহার দোষ, ভগবানের কোন অনিয়মই নাই।

এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখিয়াও মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, কতকগুলি সমাজ সংস্কার না হইলে উত্তর-বঙ্গে হিন্দু নিবাস আর ১০০ বৎসর মাত্র।

১। বিধবা বিবাহ। আমি নব্য বা প্রাচীন নবশাখ জাতীয় সকলের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, কেহই বিধবা বিবাহের বিরোধী নহে। তবে তাহারা বৈরাগী হইবে কেন? দেখিয়াছি, একটী তিলি জাতীয় কন্যা অনেক দিন সমাজে বিধবা অবস্থায় ছিল, তাহার পুরুষ অভিভাবকদিগকে বলিয়াছিল, হয় আমার কোন উপায় কর, না হয় আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিব। হায় পাষণ্ডেরা কেবল আশা দিল, কিছুই করিল না, অভাগিনী পরে জাতি, মান, কুল বিসর্জ্জন দিল, হয় বৈষ্ণব, না হয় মুসলমান কুলে মস্তক রাখিল।

অবিবাহিত পুরুষেরা বলে যে, পাইলে ত আমরা বিধবা বিবাহ করি, কিন্তু এই গোঁপখেজুরে জাতির মধ্যে কেই বা তাহার উদ্যোগ করে, আর কেই বা তজ্জন্য গায়ে ধূলি মাখিতে যায়? হা বিদ্যাসাগর, সত্যই তুমি এই অধম বাঙ্গালীকে চিনিয়াছিলে!

২। অসবর্ণ বিবাহ, বা স্বজাতীয় মেল-ভঙ্গ। এ সময়ে যদি গন্ধবণিক, তিলি, তাঁতি, কুরী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি বণিক ও শিল্পিগণের, (যাহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণাদিবর্ণ জলাদি গ্রহণ করেন, ও মর্য্যাদায় কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন কি অধিক নহেন) ভিতরে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত হয়, তবে এই সকল বংশের অসীম উন্নতি হইতে পারে। তদপেক্ষাও সহজ মেল ভঙ্গ। তাহাদের মধ্যে কেহ ছোট ঘর ও কেহ বড় ঘর, কেহ বা রামপটী, কেহ শ্যামপটী, এই সকল যদি একত্রিত করা যাইত, তাহা হইলেও অশেষ উপকার হইতে পারে, কিন্তু সমাজদেহ আছে, মাথা কোথায়? কাজেই ঘরে বসিয়া কসিয়া জাতি সকল উৎসন্ন হইল, হায়, কেহ একটী নিঃশ্বাসও ছাড়িল না।

৩। জাত্যন্তর গ্রহণ। পূর্ব্বে বগুড়া

জেলার রেসমী কাপড়ের ব্যবসায় চলিত, এক্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়াছে, কেন না তাঁতিকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। সকলেই যে নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৈরাগী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে, আর * * * * কিন্তু সম্মানিত আত্ম-সম্ভ্রম-বিশিষ্ট কেহ বৈরাগী হইতে চাহে না। একেবারে সমাজের পদধূলিবৎ নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইতে কাহার ইচ্ছা হয়? মুসলমান হওয়ার দিকেও তাহাদের বড় অনিচ্ছা, কারণ যাহা কিছু সদাচার, নিষ্ঠা, এক্ষণে তাহা নবশাখ জাতি মধ্যেই আছে। মোরগ খান না, এমন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ দুর্ল্লভ, কিন্তু মাংস খায়, নবশাখ মধ্যে এমন লোক অতি অল্প। সুতরাং একেবারে ম্লেচ্ছাচারী হইতে তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক! এ সময়ে যদি ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ এই সমস্ত জাতির মধ্যে গমন করিয়া পবিত্র উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, নিরামিষ ভোজন, ব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তন, বৈরাগ্য-ব্রত-গ্রহণ, জীবে দয়া প্রভৃতি উক্ত জাতিদিগের স্বাভাবিক সংস্কারে বাধা না দিয়া যদি ধীরে ধীরে তাহাদিগের পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত না করিয়া ব্রহ্মধর্ম্মের মূল সংস্কার গুলি প্রচার করেন; অতি ম্লেচ্ছ ভাব না আনয়ন করিয়া যদি সুসঙ্গত ও তাহাদের সংস্কারের অতি বিরোধী নয়, এরূপ বিবাহাদি তন্মধ্যে প্রচার করেন, তবে বোধ হয়, নবশাখ জাতি সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বিবাহ নারীগণের চতুর্দ্দশ বর্ষের উপরেই দিতে হইবে। অধিক যৌবন বিবাহ নহে। আর বিলাত ফেরত ভিন্ন বিবাহ করিব না, ৩ পাশ ভিন্ন পাণী প্রদান করিব না, এ আদর্শ উঠিয়া যাওয়া উচিত, কারণ এই সমস্ত জাতির লোকেরা অধিকাংশ বণিক মহাজন ও ধনবান। ইহাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আহারের ক্লেশ হইবে না। এ বিষয়ে আমি ব্রাহ্ম-প্রধানগণের কৃপার ভিখারী। ভরসা করি, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস।

কীর্ত্তিমান্।

আদরে তার ছেয়ে গেছে,
দশটা দিক
কাব্য-বনে তেঁই বটে আজ,
দ্বিতীয় পিক।
প্রতিভা তার সোজা নহে
সর্ব্বতোমুখী,
সে বুক্ বকমে কর্ত্তে পারে
সজ্জনে সুখী।
বোঝেনা যে সেও বলে সে
লেখক ভারী,
ভাগ্য ভাল, প্রয়াগ তীর্থে
বসত তারি।
আপনি ভানু মাথায় দেছে
সোণার তাজ,
তাইতে বিজয়! ভাগ্যধর
রাজার রাজ!!
আমরা কজন কেবল আছি
স্তাবক সেজে,
নিন্দা তাহার কল্লে কেহ
উঠ্‌ব বেজে!

যুক্তি বলে তর্ক করে,
হারিয়ে দিয়ে,
ক্ষুধার আগুন জ্বালিয়ে দিব,
আবাস গিয়ে।
Real beauty আমরা ছাড়া,
বুঝবে কেবা ?

কচ্ছি আমরা যত্ন ক'রে
বাণীর সেবা।
পাঠক বর্গে যা শিখাচ্ছি,
শিখছে তাই,
আমরা জানি, আমরা ছাড়া
আদৃমি নাই

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বার-ভূঞা।

কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়।

কোন কোন মতে দনুজমর্দ্দন দে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাকলা সমাজ সংস্থাপন করেন, বিক্রমপুরের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন সামাজিকগণ নানাস্থানে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। যাহারা গঙ্গাতীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা রাঢীয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়, ভিন্ন স্থানবাসীরা তখনও কোন অবিধা-যুক্ত সমাজে সংযোজিত হয় নাই। দনুজ প্রথমতঃ এই সমাজ-সুশৃঙ্খলা কার্য্যে মনোযোগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সম্মাননীয় কায়স্থ সম্প্রদায় আনয়ন করিয়া বাক্লাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি মূলকরণ কায়স্থগণ বাক্লার যে স্থানে প্রথম অবস্থান করেন, তাহার নাম হয় "পঞ্চকরণ।" এই স্থানটী আজিও চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত থাকিয়া শ্রেষ্ঠ পঞ্চকরণ কায়স্থের আদি স্থানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ঘটকগণের কুলজী গ্রন্থে প্রকাশ, দনুজমর্দ্দন বাক্লা সমাজ সংস্থাপন করিয়া কায়স্থ কুলীনগণের ৫।৬।৭ পর্য্যায় লইয়া সমাজ সমীকরণ বা সংস্কার করেন; পরে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ মধ্যে বাক্লা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করে, এই সময়ে কায়স্থের ঘটকেরা চন্দ্রদ্বীপের শ্রেষ্ঠতা-সূচক শ্লোকাবলী রচনা করেন। যথা—

"চন্দ্রদ্বীপং শিরঃস্থানং যত্রকুলীন মণ্ডলং,

কিন্তু এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজ কায়স্থগণের শ্রেষ্ঠ সমাজ হইলেও ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যগণের কোন সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইল না, কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য এই ভাটী প্রদেশে বাস করিতে ইচ্ছা করে নাই; পরে ক্রমে ক্রমে বিক্রমপুর ও যশোহর হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বৈদ্য উঠিয়া আসিয়া প্রদেশে বাস করিতে থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দনুজের সমকালে নিমু রায় দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বিক্রমপুর রাজ্য সংস্থাপন করেন। আমাদের বিশ্বাস দনুজ ও নিমুরায় একই বংশীয় ছিলেন, পূর্ব্ব বঙ্গের বিশৃঙ্খলতা সময়ে তাহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বিক্রমপুর চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইঁহাদেরই এক শাখা ভূষণা প্রদেশেও রাজ্য সংস্থাপন করেন।

দেববংশের রাজ্য লোপ হইলে পরমানন্দ বসু বাক্লার রাজাসনে আসীন হন, তাহার রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ বঙ্গে জলপ্লাবন হইয়া যেরূপ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার স্থূল

মর্ম্ম আমরা আইন-ই-আকবরী হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত; এখানকার দুর্গ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে নির্ম্মিত। এখানে সমুদ্র জল শুক্ল প্রতিপদের দিন হইতে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে; তাহার পর হইতে চান্দ্র মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কমিতে থাকে। বর্ত্তমান পাদশাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে, একদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে সমুদ্রের জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, অল্প ক্ষণের মধ্যে এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। সওদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চভূমি পাইল, সেইস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমাগত ৫ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল, সমুদ্রও উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল; ঘর বাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্রোতের বেগে, প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবলমাত্র দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী জীবন বিসর্জ্জন করিল।"

১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে এই প্রবল বন্যাতে প্রায় দুই লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়, তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কালকবলিত হইয়া জনহীনতার মাত্রা বর্দ্ধিত করে। "মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে বিশেষতঃ পরিশেষে মগদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।" সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটী প্রথমটীর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বাকলা এক সময়ে যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, মিঃ র‍্যালফ্ ফিস্ সাহেবের লিখিত বিবরণী পাঠেও তাহা অবগত হওয়া যায়। সাহেব লিখিয়াছেন, ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে এক বৃহৎ নগরী বাকলা নামে অভিহিত হইত।

উদ্ধৃত বিবরণী পাঠে আরও অবগত হওয়া যায়, পরমানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা এই জলপ্লাবনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এখন দেখা উচিত, এই রাজা কে? পরমানন্দকে রাজপুত্র বলায় স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহার পিতাই রাজা ছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মতে জামাতা কখনও কন্যা বা দৌহিত্র বর্ত্তমানে রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে না, পরমানন্দ যদিও ঐ দুর্ঘটনা সময়ে শিশু ছিলেন, তথাপি সম্ভবতঃ তাহার মাতার নামেই রাজ্য চলিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় তাহাই ঠিক। কারণ পরমানন্দের পিতা বলভদ্র বসুর কোন সুনাম বা কীর্ত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু তাহার মাতা কমলার কীর্ত্তির কিছু কিছু নিদর্শন আজিও বাখরগঞ্জের জিলাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কমলা, রাজধানী কচুয়ার নিকট কালাইয়া নদীর অনতিদূরে এক বৃহৎ দির্ঘীকা খনন করান, এইরূপ বৃহৎ জলাশয় সচরাচর দেখা যায় না, উহার কতক ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া অদ্যাপি কমলার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের কথা জনগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রবাদ এই যে, জলাশয় খননে প্রায় নয়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, উহার পরিসর ৩ দ্রোণ, ১৩ কাণি স্থান ব্যাপী ছিল। এই সকল কারণে আরও বোধ হয় যে, সে বংশের রাজ্য অবসানের পর কতককাল রাজ্যভার পরমানন্দের মাতার হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং সে বংশীয় শেষ রাজা জলপ্লাবনে প্রাণপরিত্যাগ করেন।

রাজা পরমানন্দ রায় কায়স্থগণের ১১।১২।১৩ পর্য্যায় লইয়া বঙ্গজকায়স্থের

সমাজ নবীকরণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কারণ যতদিন পর্য্যন্ত সে রাজগণ সমাজ-পতি পদে বরিত ছিলেন, তত সময় সমুদয় কুলীনগণ তাহাদের অধীনতায় অবস্থান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরে যখন কুলীন বংশ হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া সমাজ-পতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, তখন অনেক কুলীনের পক্ষেই উহা অপ্রিয়কর বলিয়া বোধ হইয়া উঠিল। সমকক্ষ লোকের অধীনতা বড়ই মর্ম্মবেদনার কারণ বলিয়া কেহ কেহ তখনই সেই সমাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এতদ্বিষয় আমরা যশোহরাধি-পতি প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সহ পরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক থাকিলাম। যাহা হউক, বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে ঘটকেরা চন্দ্র-দ্বীপের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মতে চন্দ্রদ্বীপ সমাজ শিরোস্থান যশোহর সমাজ বাহুস্বরূপ, বিক্রমেব সমাজ উরুদ্বয়, ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ পদদ্বয় এবং তদেতর সমাজ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত।

পরমানন্দ রায়ের পুত্র জগদানন্দ রায়। বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নদীগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।* এই জন্য তৎপুত্র কন্দর্পনারায়ণ নদীপ্রধান প্রদেশে বসতি করা বিপজ্জনক মনে করিয়া কচুয়া হইতে রাজধানী তুলিয়া মাধবপাশা সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা জগদানন্দ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার ঐকান্তিক ভক্তিবশে

* শ্রীযুক্ত খোষালচন্দ্র রায় প্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, ২৪ পৃষ্ঠা।

গঙ্গা বা পদ্মা জলবৃদ্ধি করিয়া রাজপুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, রাজা গঙ্গাজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।* যেরূপেই হউক, জগদানন্দের মৃত্যু যে জলে পতিত হইয়া হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসুরাজবংশ মধ্যে কন্দর্পনারায়ণ খ্যাত-নামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ছিলেন, এই সময়ে বঙ্গের ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে দ্বাদশ জন দলবদ্ধ হইয়া বাদশাহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার প্রয়াস পান। কন্দর্পনারায়ণও ঐ দ্বাদশ জনের অন্যতম ছিলেন, কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশে উজ্জ্বল-কীর্ত্তি-স্বরূপ ছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে সন্দীপের যুদ্ধে তাহার কম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, হোসেনপুরের যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণ যবন সৈন্যদিগকে মথিত করিয়াছিলেন। "ভাত-গাঁর শাসনকর্ত্তা মিরজানজাদ খাঁন মোগল বাদসাহের পক্ষ অবলম্বন করিলে পাঠান কোতোল খাঁ তাহাকে আক্রমণ করে। † তখন মিরজানজাদ দক্ষিণ বঙ্গের ছলীমাবাদে (সেলিমাবাদে) পলাইয়া যায়, তথায়ও আপ-নাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া কন্দর্পরায়ের ও যশোহরাধীপের এবং পর্টুগিজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন।" আকবর নামা গ্রন্থে এই স্থানেই কন্দর্পনারায়ণকে দর্পনারা-য়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, বারভূঞা দল সংগঠনের অতি অল্প কাল পরেই কন্দর্পের মৃত্যু হয়, তদভ্যন্তরে তাহার পুত্র রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, প্রণীত বঙ্গীয় সমাজ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

† আমরা এই অংশটুকু এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত মূল আকবর নামা পার্শীগ্রন্থ হইতে, একাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবী দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লইয়াছি। বিস্তারিত অনুবাদ বারান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। সমাজ সমন্বয় সময়ে ভুলুয়া-রাজ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রাপেক্ষা যশোহরাধিপতি প্রতাপ আদিত্যের অধিক সম্মান করিয়াছিলেন, বিশেষত উভয়ের মধ্যে ভুলুয়া ও চন্দ্রদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী মেঘনা নদের কতকগুলি দ্বীপ লইয়া বড়ই মনান্তর জন্মিয়াছিল, প্রবাদ এই বিবাদ নিবন্ধন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, কিন্তু এ কথাটী যে সত্য নয়, তাহা আমরা লক্ষ্মণমাণিক্য প্রকরণে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি, অতএব এইস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। *

রামচন্দ্র যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই বিবাহের আমোদ উৎসব ব্যাপার পরে ভয়ানক বিষাদে পরিণত হয়। প্রবাদ, বিবাহ দিবসে রামচন্দ্রের এক অনুচর রামাই ভাড় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া বিবাহ রাত্রিতে রাজ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করে; পরে রাণীর সহিত হাস্য কৌতুকে প্রবৃত্ত হইলে, পুরুষ বলিয়া ধৃত হয়; প্রতাপাদিত্য উহা অবগত হইয়া পরিচারকের পরিবর্ত্তে তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হন; এমন কি, তিনি পরে এরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন যে, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া জামাতৃবধের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। এই সমাচার প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্যের কর্ণগোচর হইলে পর তাহারা বিষম প্রমাদ গণিয়া রামচন্দ্রের প্রাণ রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীবেশে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দেন, পরিণামে এই ব্যাপারে এই ঘটিল; সেনাপতি রামমোহনের * প্রচুর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে রামচন্দ্র স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন এবং নব পরিণীতা বনিতাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এদিকে প্রতাপাদিত্যের কন্যা ইন্দুমতি বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া ক্রমে কৃশা ও মলিনা হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজমহিষী রাজাকে অনেক বুঝাইয়া কন্যাকে জামাতৃ সদনে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাহাকে কোন মতে গ্রহণ করিলেন না। ইন্দুমতির ধাত্রী তাহাকে এই অবস্থায় পুনরায় পিত্রালয়ে যাইতে বলেন। কিন্তু রাজতনয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে পতির রাজ্য মধ্যে যে কোন স্থানে রাখিয়া যাও, আমি আর পিত্রালয়ে গমন করিব না। এই সকল কথা ক্রমে রামচন্দ্রের জননীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি অনেক বলিয়া পুত্রকে বধূগ্রহণে সম্মত করাইলেন; তখন ইন্দুমতি শ্বশ্রূরনির্দ্দেশ ক্রমে চন্দ্রদ্বীপের রাজপুরীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন।

রাজবধূ ইন্দুমতি চন্দ্রদ্বীপের যেস্থানে প্রথম নৌকা হইতে অবতরণ করেন, তাহার সম্মানার্থে সেস্থানে একটী বাজার সংস্থাপিত হয়। এখনও ঐ বাজার বধূমাতা বৌঠাকুরাণীর হাট নামে প্রসিদ্ধ আছে।†

* ১৩০৭ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারত দেখ।

* বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত উজিরপুরের প্রাচীন জমিদার বংশ এই রামমোহনের বংশ।

† বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই "বউঠাকুরাণীর হাট" অবলম্বন করিয়া, একখানা উৎকৃষ্ট উপান্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। কোন কোন মতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার নাম বিন্দুমতি; তাহারা আরও লিখিয়া-

রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের ঘোরতর সমর সংঘটন হয়, রামচন্দ্র মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এইজন্য শ্বশুরের কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন নাই। বোধ হয়, যশোহরাধিপের প্রতি বিরাগ বশতঃই তিনি এইরূপ অযশস্কর কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ, তৎপুত্র প্রতাপনারায়ণ (১) তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ (২)। এই প্রেমনারায়ণের সহিত বসুরাজবংশের রাজ্যের অবসান হয়, তৎপর দৌহিত্রসূত্রে মিত্রবংশ চন্দ্রদ্বীপের জমীদারী প্রাপ্ত হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশবিবরণ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থাদি ইংরেজ ও বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকগণের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, অতএব আমরা অতি সংক্ষেপে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশবিবরণ পরিসমাপ্ত করিলাম। চন্দ্রদ্বীপের পরবর্ত্তী রাজবংশের সহিত আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই; যদি সময় ও সুবিধা ঘটে, তবে পরিশিষ্ট ভাগে আমরা এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সমাধি মন্দিরে। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।)

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান। যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাহিতেছে। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা সমস্ত বর্ণিত হইতেছে। ঠাকুর মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহ মধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহ মধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একটী করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যান গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাট বিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণীঘাটের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ পূর্ব্ব পশ্চিমে যাইতেছে।

ছেন, রামচন্দ্র আর বিন্দুকে গ্রহণ করেন না। বিন্দু পরে কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন।

(১) কোন কোন মতে প্রতাপনারায়ণের পূর্ব্বে বাসুদেবনারায়ণ নামে এক রাজার নাম উল্লেখ দেখা যায়।

(২) প্রেমনারায়ণের সভায় ধ্রুবানন্দ মিশ্র এক খানা কায়স্থকুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ রহিয়াছে। উদ্যানগৃহের পূর্ব্বধারে পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্ব ধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যান-গৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যানপথ, সেই পথের দক্ষিণ-পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারাণ্ডায়ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন-গৃহ মধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমা চরণ ও মণি মল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্ম-ভক্তও উপস্থিত। তন্মধ্যে প্রতাপও আছেন।

* * * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে আঁখর দিতেছেন। "সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়"। ঠাকুরের রাধাভাব হইয়াছে। কথা গুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক হইলেন, দেহ স্পন্দহীন, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণস্বর। বলিতেছেন, "সখি তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে; তুইতো আমাকে কৃষ্ণ-প্রেম শিখা-য়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি যমুনার জল আনতে আমি আর যাব না। কদম্বতলে আমি প্রিয়তমকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতে-ছেন, 'আহা' আহা'।

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছে, প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ। কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "কিট্ন, কিট্ন" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এইবারে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তাহারা খোল করতালি সঙ্গে গাইতে লাগিল "রাধে গোবিন্দ জয়"। ঠাকুর আঁখর দিতেছেন।

ধনি দাঁড়ালোরে।
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালোরে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালোরে।
তমাল বেড়ে বেড়ে, ধনি দাঁড়ালোরে।

ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত। ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে, "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(অন্তরঙ্গ সঙ্গে।)

সরলতা ও ঈশ্বর লাভ।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপ-বেশন করিলেন। এমন সময়ে একটী অল্প

বালক ভক্ত সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিতলোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস!"

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, এ ছোকরাটী বড় সরল। সরলতা পূর্ব্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারি এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"এইসী ভক্তি কর ঘট ভিতর
ছোড় কপট্ চতুরায়ী
সেবা, বন্দী আউর্ অধীনতা
সহজে মিলি রঘুরাই।"

"দেখছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোক বলে, "আহা কি স্বভাব ঠিক যেন নন্দঘোষ।"

ঠাকুরের ভক্তেরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন!

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সরল ছোকরা ভক্তের প্রতি)। দেখ্ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কি না, তাই পড়েছে। আফিসে হিসাব পত্র করতে হয়, আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্ব্বদা ভাবতে হয়।"

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি কর্‌ছিস্, তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস্, মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী স্বরূপা। যদি মাগ্‌ছেলের জন্য চাকরি কত্তিস্, তা হলে আমি বলতুম "ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!"

(বেণি পালিতের প্রতি) [illegible] ছোকরাটী ভারি সরল। তবে আজ [illegible] একটু মিথ্যা কথা কয় এই [illegible] সে দিন বলে গেল যে আসবে, আর এলো না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী প্রেম)

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু চার জন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল, চেয়ার্ কয়েক খানা জড় করা ছিল, ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক বসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ হয়ে গেল!

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ! গৌরাঙ্গের ঐরকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা,সেই প্রেমের যদি এক বিন্দু কারুর হয়! গোপীদের কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই। তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাক, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর, ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর; তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হ'ল। তখন তিনি যে কমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

"যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ভক্ত সঙ্গে—হরিকথাপ্রসঙ্গে]

ঠাকুর হল্ ঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে, এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন। ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া।

বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালক স্বভাব। বলিতে লাগিলেন, "কৈ গো! এখনও যে দেয় না! (সকলের হাস্য) সুরেন্দ্র কোথায়?

এক জন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, রাম বাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখেছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে!

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেইখানে এই রকমই হয়ে থাকে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) সুরেন্দ্র কোথায়? আহা সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা—কারুকে ভয় ক'রে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্ত-হস্ত। কেও যদি তার কাছে সাহায্যের জন্য যায়, ত শুধু হাতে ফেরে না।

[ভগবান দাস বাবাজী]

(মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ভগবান দাসের কাছে গিয়েছিলে, কি রকম দেখলে!

মাষ্টার। আজ্ঞা, কাল্নায় গেছিলাম। ভগবান দাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়ে ছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগলো। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান। আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি! সেই বাড়ীতে নামব্রহ্ম ঠাকুরের পূজা হয়।

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি অনেক দিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বলছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হয়ে গেল? (এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁগো তুমি অনেক দিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাষ্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশিপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধা ভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণ সন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! (সকলের হাস্য)।

"এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আসতে পারে, এযে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য) তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) আচ্ছা লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরিই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান, কি না তাঁকে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে যায়গার নীচে সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

"হৃদে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লুম, 'দেখ্ হৃদে ওদের যদি তুই খাওয়াস্, তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লুম।'"

(মহিমার প্রতি) আচ্ছা আমি শুনেচি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে।]

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, আপনি একবার যাও, দেখ ওরা সব কি করছে; আর না হয় একটু পরিবেশন করলে! মহিমাচরণ "হুঁ হুঁ" করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে আবার হল্ ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ... সেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা ২টার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন, ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়, আমি পাহাড়ে গিয়ে ছিলুম (অর্থাৎ দারজিলিংয়ে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীরত তত ভাল হয়নি! তোমার কি অসুখ হয়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞা তাঁর (কেশবের) যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হয়েছে।

কেশবের কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্য-কাল থেকেই দেখা গিছিল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ কর্ত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে পড়তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। তাঁর ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হতো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তাঁর জীব-নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার]

একটী মহারাষ্ট্র দেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটী মহারাষ্ট্র দেশের

মেয়ে খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েছেন। মহাশয় কি তার নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম, তাতে বোধ হচ্ছে যে, তার লোক-মান্য হবার ইচ্ছে।

(ভক্তদের প্রতি) "এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কচ্ছি' এটী অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি করছ' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা।

"আমি আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা' (আমি) 'হাম্ মা' (আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাইকেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয়নি। চামড়ায় ঢাক্ তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভুঁড়ি গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত্ তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় তুঁহুঁ তুঁহুঁ বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। 'তুঁহুঁ তুঁহু বলে তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।"

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন করে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না করলে অহঙ্কার যায় না। যদি কারু অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কেমন করে জানা যায় যে ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করেছে, তার চারটী লক্ষণ হয় (১) বালকবৎ (২) পিশাচবৎ (৩) জড়-বৎ (৪) উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটো—বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি আমি করে, কিন্তু কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না'।

"আর্‌সিতে মুখ দেখা যায়, কিন্তু সে মুখ কাকেও গালাগাল দিতে জানে না; কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"পরশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়ে যায়।

লোহার তলোয়ার্ সোণার তলোয়ার্ হয়ে যায়। তলোয়ারের আকার থাকে কিন্তু কারুর অনিষ্ট করে না। সোণার তলোয়ারে মায়া কাটা চলে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[বিলাত প্রসঙ্গে।]

বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখলে, সব বল ?

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারি পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগা গোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব যায়গায় আছে। তবে কি জান, কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা কি, না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না।. যেমন পূজা জপ তপ করছো, কিন্তু স্বর্গের বা পৃথিবীর সুখের জন্য নয় ; দান করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় ; কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।"

"এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। তারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি, অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা করলুম, মনে করলুম যে অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েছে, জানতে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁর।

একজন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাদের উপায় কি ? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা—"হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।"

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, হে ঈশ্বর, আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যে টুকু কর্ম্ম রেখেছো, সে টুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।"

"কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম্ম।

"ভক্তিলাভ করলে বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। বিষয়কর্ম্ম আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায় ?

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্মতো আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।

[জীবনের উদ্দেশ্য কি, কর্ম্ম না ঈশ্বর লাভ ?]

"শম্ভু বল্লে, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যে যা টাকা আছে, সে গুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করা, রাস্তা ঘাট করা, কূয়ো করা এই সবে। আমি বল্লুম, এ সব কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হক,এটী যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেনসরী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন। এসে বল্লেন, তুমি বর লও, তাহলে তুমি কি বলবে, 'আমায় কতক গুলো হাঁসপাতাল ডিসপেন্‌সারী করে দাও, না বলবে 'হে ভগবান্' তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই।

"হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সরী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বেশ বোধ হয়, তিনিই কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি। তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁস-পাতাল, ডিস্‌পেন্‌সরি হতে পারে।

[এগিয়ে পড়]

"তাই বলছি, কর্ম্ম আদিকাণ্ড। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্‌তে কর্‌তে আরও এগিয়ে পড়্‌লে শেষে জান্‌তে পারবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

"একটা গল্প বলি শুন। একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছলো। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো। ব্রহ্মচারী বল্লেন, "ওহে, এগিয়ে পড়"। কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগলো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন ?

এই রকমে কিছু দিন যায়। একদিন সে বোসে আছে, এমন সময়ে সেই ব্রহ্মচারীর কথা গুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বল্লে,আজ আমি আরও এগিয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ী গাড়ী চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো; আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হ'ল। এই রকমে কিছুদিন যায়, আবার একদিন মনে পড়লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন, 'এগিয়ে যাও'। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি। এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতে লাগলো। এত টাকা হলো যে আণ্ডিল হয়ে গেল।

আবার কিছুদিন যায়, একদিন বসে বসে ভাবছে, ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপার খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নাই, তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন! এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে সোণার খনি' তখন সে ভাবলে ওহ! তাই ব্রহ্মচারী বলে-ছিল 'এগিয়ে পড়'।

"আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে

মাণিক রাশীকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হলো।"

"তাই বলছি যে যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আর ভাল জিনিস পাবে। একটু জপ তপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে, মনে কোরোনা, যা হবার তা হয়ে গেছে। "কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, তাহলে কর্ম্ম নিষ্কাম করতে পারবে। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম বড় কঠিন। তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর "হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও; আর কর্ম্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু কর্ম্ম রাখবে, সেটুকু কর্ম্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি।

"আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্ত্তা হবে।"

(ক্রমশঃ)

তিব্বতের পথ।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে বোধ হয় ফ্রায়ার ওডরিকই (Friar Odaric) প্রথম তিব্বত-যাত্রী। ইনি ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিম চীন দিয়া তিব্বতে আগমন করতঃ কিয়ৎ-কাল লাসা নগরীতে অবস্থান করিয়া ভারত-বর্ষে আইসেন। ইনি তিব্বতের বিবরণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভৌগোলিকের পক্ষে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ইহার তিন শত বৎসর পরে আর এক-জন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী তিব্বত পরিদর্শন করেন। ইঁহার নাম জেস্যুট য়্যাণ্টোনিও য়্যাণ্ড্রাডা (Jesuit Antonio Andrada). ইনি ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন ও আগ্রা হইতে গঙ্গা ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তথা হইতে তিব্বতের পশ্চিমাংশ দিয়া সম্ভবতঃ কিরিয়া (Kiria) প্রদেশে গমন করেন। সেখান হইতে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর পাদ-দেশ দিয়া কোকনর অথবা তঙ্গত (Tangat) গমন করেন। অবশেষে চীন দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে Father Grueber ও Father Dorville তিব্বত গমন করেন। যে অত্যুচ্চ গিরিসঙ্কট ন্যচুকা (Nya Chu'ka) এবং রিটিং গম্বার (Reting Gamba) মধ্য দিয়া লাসা নগরীতে গমন করিয়াছে, ইঁহারা কন্সু (Kansu) দেশের ছিনিং (Hsining) প্রদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন। লাসা নগরীতে দুই মাস অবস্থান করিবার পর ইঁহারা কুটিলা (Kutila) দিয়া নেপালে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভ্রমণ-বিবরণ হইতে তিব্বত সংক্রান্ত অতি আবশ্যকীয় অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, ইঁহারা তিব্বতের অধিবাসী ও তাহাদের আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুন্দর রূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে Jesuit Father Desideri ও Jesuit Father Freyre সিকিম দিয়া লাসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে Capuchin Francisco della Penna ও দ্বাদশ জন সঙ্গী তিব্বতের রাজ-ধানীতে আগমন ও তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার

করিতে আরম্ভ করেন ; এই প্রচার কার্য্য ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুসাধিত হইয়াছিল। ইঁহাদের লিখিত অধিকাংশ বিবরণই এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। কেবলমাত্র ইঁহাদের অন্যতম সঙ্গী Orazio della Penna র কয়েকখানি পত্র ইটালী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি ভৌগোলিকের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

হলন্দ দেশীয় স্তামুয়েল ভন্ ডি পুট্টি (Samual van de Putti) ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে লাসা নগরে গমন ও ছিনিং-বর্ত্ম (Hsining) অবলম্বন করিয়া পিকিং পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও তথা হইতে লাসা দিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাটেভিয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন সময়ে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ্জবগ্‌ল তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতে পারে কি না, জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার ভ্রমণ-বিবরণ Mr C. R. Markhan কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন সামুয়েল টার্ণার (Captain Samual Turner)তিব্বতে গমন করেন ও সিগাসি (Shigatsi) নগরে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণও অতি প্রয়োজনীয়।

এস্থলে ব্রায়ান হজ্‌সন, (Brian H. Hodgson) ডাক্তার ক্যাম্বেল, ডাক্তার হুকার, আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম, মাননীয় সার য়্যাস্‌লি ইডেন, (Sir Ashly Eden K. C. S. I. E.) Hon'ble Colman Macaulay, উইল্‌সন প্রভৃতির নাম করিবার আবশ্যক নাই—কেন না, ইঁহাদের কেহই তিব্বতে গমন করেন নাই ; সিকিম অথবা নেপাল সীমান্ত হইতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইংরেজ যাত্রী টমাস্ ম্যানিং (Thomas Manning) ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত পরিদর্শন করেন। তিনি পরিজং (Paridjong) ও গ্যান্‌সিজং (Gyantse djong) এর নিকটস্থিত বর্ত্ম দিয়া তিব্বতে গমন করেন ও সেই পথ দিয়াই আবার পরবর্ত্তী বৎসরে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (Mr Marhkam যাহা প্রকাশ করিয়াছেন) তত মূল্যবান না হইলেও তাহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারা যায়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Lazarist খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের Huc ও Gabet নামক দুইজন খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক অর্দস্(Ordos), অলসন্(Alashan, কোকোনর হ্রদ (Kokohor) ও সাইদাম পর্ব্বতমালা (Ts'aidam) অতিক্রম করেন এবং ন্যচুকা (Nyachuka) দিয়া যে পার্ব্বত্য পথ লাসা অভিমুখে গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করতঃ উক্ত রাজধানীতে উপস্থিত হন। কয়েক মাস এখানে অবস্থান করিবার পর, তাঁহারা তিব্বত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন ও উক্ত গবর্ণমেণ্টের প্রহরিপরিবৃত হইয়া চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Col. Pr[illegible] তিব্বতে প্রবেশ করেন ও কোকোনর [illegible] চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমুদয় আবিষ্কার [illegible] পথে Huc ও Gabet [illegible] সেই পথ অবলম্বন করিয়া [illegible] নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই স্থান [illegible]

প্রকৃত তিব্বতের আরম্ভ। কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে এই স্থান তিব্বত কিম্বা চীনরাজের অধিকার-ভুক্ত নহে। এইখানে আসিয়া ইঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইবারে তিনি কোবি (Kobi) মরুভূমির দক্ষিণ ও তেংরিনর হ্রদের উত্তর স্থিত আমড়ো সহিত তিব্বতের উত্তরাংশ আবিষ্কার করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী দ্বিতীয়বার তিব্বতে আগমন করেন। সাইদাম (Ts'aidam) জনপদের মধ্যে দিয়া আসিয়া তিনি লাসা নগরাভিমুখী গিরিসঙ্কট অবলম্বন করেন এবং ন্যচুকা (Nya—Ch' uk' a) পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এইখানে তাঁহার গমন পথ রুদ্ধ হইল। তিব্বত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। এইবারে তিনি কোকোনর হ্রদের দক্ষিণস্থিত এক বৃহৎ দেশ আবিষ্কার করেন। এই দেশই তিব্বতীয় কাম্বা ও গোলক নামক লুণ্ঠনব্যবসায়ী অসভ্য জাতির বাসস্থান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ভ্রমণকারী শেষবার মধ্য এসিয়ায় আগমন করেন ও সাইদাম জনপদের দক্ষিণাংশে ত্রেচু নদীর উত্তরে এক প্রদেশ আবিষ্কার করেন। এই স্থানে তিনি কয়েকটী কৃষি-ব্যবসায়ী জাতি দেখিতে পান।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা দেশীয় দূত উইলিয়ম উডভিল রকহিল (William Wodville Rockhill) এই পথ অবলম্বন করিয়া তিব্বতে আগমন করেন এবং ত্রেচু নদীর যে স্থান হইতে Prjevalsky বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাও অতিক্রম করেন। তিব্বতের পূর্ব্বাংশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি চীনে ফিরিয়া যান ও তাসিন্লু (Ta'chien lu) নগরে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। সুচুয়ান (Ssu—ch' uan) দেশের তাসিনলুই চীনের সীমান্ত জনপদ। এই নগরটী মধ্যে তিব্বত ও পশ্চিম চীনের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এই খানেই লাসাভিমুখী প্রধান পার্ব্বত্যপথের আরম্ভ। এই পথ দিয়াই সমস্ত বণিক ও যাত্রিদল লাসা গমনাগমন করে। আবিষ্কারকগণ কতবার এই পথ দিয়া তিব্বত যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সকলেরই চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ এইটীই তিব্বতগমনের প্রবেশপথ স্থির করিয়া লাসা যাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

ছিনিং (Hsi-ning) হইতে সাইদাম (Tsaidam) দিয়া যে গিরিবর্ম্ম গিয়াছে, সেইটীই চীন হইতে লাসা যাইবার প্রাচীনতর ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুঙ্গন (Dzungan) বিদ্রোহের পর হইতে চীন গবর্ণমেণ্ট এই পথ আবদ্ধ রাখিয়াছেন। লাসা ও তাসিলম্পুর অধিবাসীগণ কতবার এই পথ দিয়া যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে, কিন্তু চীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিবারেই তাহাদের সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কুপার (T. T. Cooper) নামক একজন ইংরেজ তাসিন্লু (Ta chien lu) দিয়া তিব্বতে প্রবেশ ও তিব্বতের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করেন। তিনি বাতাং (Bat' ang) পর্য্যন্ত আসিতে না আসিতেই তিব্বত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার গমনপথ রুদ্ধ হয়। সুতরাং তিনি তথা হইতে দক্ষিণ দিকস্থিত কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া

যান। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন উইলিয়ম গিলও তাসিনলু হইতে বাতাং (Ba' tang) পর্য্যন্ত আগমন করেন ও কুপারের ন্যায় ইনিও ভগ্নমনোরথ হইয়া অবশেষে যুনান (Yun-nan)দিয়া ব্রহ্মদেশে আগমন করেন।

হাঙ্গেরিয়া দেশীয় Count Bela Szechenje তাঁহার অনুচরগণের সহ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লাসা যাইতে চেষ্টা করিয়া ইঁহাদেরই মত বিফলপ্রযত্ন হন। ফরাসী মিশনরিগণ প্রথমতঃ তিব্বতের প্রান্ত প্রদেশে বাস করিতে করিতে অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গা নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এক সময়ে তাঁহারা চাম ডো (Ch'amdo) ও গর্টক (Gart'ok) পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। এই স্থানে তিব্বত গবর্ণমেণ্ট কিছু দিনের জন্য তাঁহাদের বাসস্থান নির্ম্মাণেরও অনুমতি দিয়াছিলেন। এখনও ইঁহারা বাতাং ও তাহার দক্ষিণ দিকস্থিত প্রদেশ সমূহে অবস্থান করিয়া অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই ভোগ করিতেছেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলকক্স (Wilcox) ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার গ্রিফিথস্ (Dr Griffiths) ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিক্ (L' Abbe Krick), ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কুপার (T. T. Cooper) এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিষ্টার নীডাম্ (Mr Needham) তিব্বতের দক্ষিণ সীমা অর্থাৎ ভারতবর্ষ দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। লাসা হইতে যে উচ্চ গিরিবর্ত্ম তাসিলম্পু পর্য্যন্ত গিয়াছে এক দিকে সেই বর্ত্ম ও অপর দিকে আসাম সীমান্ত, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয় এখনও সকলের অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। তিব্বতের মধ্যে এই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা রহস্য পরিপূর্ণ, সুতরাং আবিষ্কর্ত্তৃগণের মনোযোগের বিষয়।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভ্রমণকারী Banvalot তিরগত্ মঙ্গোলীয়গণের গমনপথ অনুসরণ করিয়া লবনর হইতে তেঙ্গরিনর হ্রদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই খানে স্থানীয় অধিবাসী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি লাসা ও তাসিনলু বর্ত্মের সমান্তরাল আর একটী পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বদিকে গারতক্ পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি তাসিলম্পু দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। লবনর হ্রদের তীরদেশ হইতে তেঙ্গরিনর ও তেঙ্গরিনর হইতে গারতক্ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, ইনিই এই সমুদয়ের আবিষ্কর্ত্তা।

১৮৯০ ও ৯১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্যের কাপ্তেন হেন্‌রি বাওয়ার (Captain Henry Bower of the 17th Bengal Cavalry) তিব্বতের পশ্চিম সীমা হইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত অনেক প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। ইনি তেঙ্গরিনর হ্রদের উত্তর হইতে চাং তাং (Chang tang) নামক সমুদয় মরুময় স্থান পরিদর্শন করেন। পূর্ব্ব বৎসর Banvalot ইহারই কিয়দংশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইনিও বাওয়ার ও Banvalot এর ন্যায় তেঙ্গরিনর হ্রদের নিকট হইতে প্রতিগমনে বাধ্য হইয়া চীনে ফিরিয়া যান।

যে পথ দিয়া Banvalot ও Bower তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই পথ দিয়া আমেরিকা দেশীয় দূত William Woodville Rockhill ১৮৯১ ও ৯২ খ্রীষ্টাব্দে

দ্বিতীয় বার তিব্বতে গমন করেন। লাসা নগরী সকল বিদেশীয়েরই অনধিগম্য ভাবিয়া ইনি লাসা যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া লাসার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ সমুদয় আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিব্বতীয়গণের বিরুদ্ধাচারে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের জরিপ বিভাগ হইতে অনূ্যন ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত নয়ান সিং (সি, আই, ই) ও পণ্ডিত কিষেন সিং তিব্বতে প্রেরিত হন। ইঁহারা নেপাল ও সিকিমের উত্তর, কাশ্মীরের পূর্ব্ব ভূটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিব্বতের দক্ষিণাংশের জরিপ কার্য্য সুন্দর রূপে সমাধা করেন। এই দুই জন ভ্রমণকারী তিব্বতের দক্ষিণ হইতে উত্তর ও পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। নয়ান সিং হিমালয়ের উত্তর লাডাকের (Ladak) পূর্ব্ব এবং সন (Tsain) জনপদের পশ্চিম স্থিত মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বত সহিত প্রায় সমগ্র প্রদেশ আবিষ্কার করেন। এই কৈলাস পর্ব্বতের তুষারদ্বীপ (Glaciers) গলিত হইয়া সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, সাংপো, শতদ্রু প্রভৃতি নদী এবং নাংসো বা তেঙ্রিনর হ্রদের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। খাম ও বাথং সহিত চীন সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিব্বতের পূর্ব্বাংশ প্রথমতঃ পণ্ডিত কিষেন সিং ও তৎপরে আমেরিকা দেশীয় দূত Hon'ble Rockhill কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

১৮৭৯ ও ৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমি তিব্বত ও চীনে গমন করিয়াছিলাম। শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মাননীয় ক্রফট্ মহোদয় আমার ভ্রমণ-বিবরণ ও তদনুবর্ত্তিক তিব্বতের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা মুদ্রিত করতঃ গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত Report এর কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া আমি লণ্ডন রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর জর্ণালে উহা প্রকাশিত করিয়াছি।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি তাসিলংপু ও লাসার রাজদরবারে এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির নিকট কয়েক খানি পত্র লিখিয়া আমার স্কুলের তিব্বতীয় ভাষার শিক্ষক লামা উগ্যেন গ্যাসো (Ugyen Gya-tsho) দ্বারা ঐ গুলি তিব্বতে প্রেরণ করি। এদিকে আমি দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী কমিশনর Major Herbert Lewin মহাশয়ের নিকট তিব্বত গমনের অনুমতি প্রার্থনা করি। মেজর মহাশয় আমার উপর সদয় হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, তিব্বতীয় ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি গবর্ণমেণ্টের সীমার বাহিরে যাইতে দিতে পারেন না। তিনি আরও উপদেশ দিয়াছিলেন, তিব্বতীয়গণ বৃটিশ-শাসনের বিদ্বেষী, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়-প্রজাকে তিব্বতে যাইতে দিতে কখনই সম্মত হইবেন না। এমন কি, ষ্টেট সেক্রেটারীকে জানাইলেও আমি তিব্বত গমনের অনুমতি পাইব না। লামা অবশ্যই তিব্বত হইতে সুসংবাদ আনিবে, এই বিশ্বাসে আমি ফটোগ্রাফ শিক্ষার যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন মাস পরেই লামা তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনুমতি পত্রে (Pass port) দেখিলাম, আমি তিব্বতে যাইতে পারিব ও আমাকে তত্রত্য প্রধান বিহারে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই আমি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ক্রফট্ সাহেবের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিব্বত হইতে অনুমতি পত্র পাইয়াছি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও তদানীন্তন ছোটলাট Hon'ble Sir Ashly Eden মহাশয়ের সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহার সম্মতি ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আনাইয়া দেন। যাহা যাহা সঙ্গে লইবার প্রয়োজন, সমস্তই ক্রফ্ট্ সাহেব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে আমার পাথেয় ব্যয় দেওয়া হইয়াছিল। সিকিমের রাজা ও লামাগণের মধ্যে নেওয়ার (Newer) প্রদেশের অধিকার লইয়া বাদানুবাদ হওয়ায় আমি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাননীয় ছোটলাট মহোদয়ের সহিত সিকিম গমন করিয়াছিলাম। নবেম্বর মাসে সিকিম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের Surveyor General এর আফিসে পার্ব্বত্য প্রদেশে কিরূপে ঠিক জরিপ করিতে পারা যায়, তাহা শিক্ষা করি। লামা উগ্যেন গাসো আমার তিব্বত গমনের সঙ্গী হয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া আমরা সিকিমের জরি পর্ব্বতমালায় এক গোপালকের গৃহে রাত্রিবাস করি, তৎপরে কাষ্ঠসেতু দ্বারা রাথং নদী উত্তীর্ণ হইয়া অনন্ত কুসুম কুঞ্জের ভিতর দিয়া নেপাল সীমান্তে যম্পুং ও কাংলা নাইখাম রাস্তাদ্বয়ের মিলন স্থানে উপনীত হই। চুরুং নদীর তীরভূমি দিয়া অগ্রসর হইয়া ১৪৮০০ ফিট উচ্চ টেম্যাবলা পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। এইস্থানে যাইয়া শুনিলাম, নেপালরাজ-সেনাপতি সিংবিরার তিব্বত গমন-পথ প্রতিরোধের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে এই পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম। রাথং নদীর উৎপত্তি স্থান চুকর পং জং নামক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমরা কাংলা পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হই। এই স্থানের প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণ চতুর্দ্দিকস্থ তুষাররাশির উপর প্রতিফলিত হওয়ায় চক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সমুদয় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া ও চক্ষে নীল চসমা পরিয়াও এই প্রখরতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাই নাই। নানাবিধ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইতে নেপাল ও সিকিমের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়াছিলাম।

নানাবিধ পর্ব্বতময় ভূমি ও প্রস্রবণ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে আমরা গান্সর নামক পল্লীতে উপনীত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করি। লামা উগ্যেন, গাসো পল্লীবাসীদের নিকট আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া আমাকে নেপালী-পাবুলামা নামে অভিহিত করিয়াছিল। কাষ্ঠ-সেতু দ্বারা কাংচান নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কাম্বাচেন নামক এক পল্লীতে উপনীত হই। এই স্থানে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, যংমার সীমান্ত প্রদেশের রক্ষক "বল্লাং গোপা"র নিকট হইতে এক বার্ত্তাবহ পত্র লইয়া আসিয়াছে। তাহাতে পল্লীবাসীগণের উপর আদেশ হইয়াছে যে, কোন পথিকই যেন চতংলা বা জংসংলা বর্ত্ম দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে না পারে। তিব্বত গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, এমন কি, কাংলা চেন্‌মো পথ, যাহা দ্বারা সর্ব্ব সাধা-

রূপে গমন করিয়া থাকে, সেটী দিয়াও যেন কেহ তিব্বতে প্রবেশ করিতে না পারে। কেন না, তিব্বতে পশ্বাদির সংক্রামক রোগ উপস্থিত। পল্লীর প্রধান লামা আমাদের উপর সদয় হইয়া, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইতে না হইতে, অতি প্রত্যুষে একজন অনুচরের সহ আমাদিগকে তথা হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। আমরা সত্বরে সেই বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলাম। তৎপরে আমরা তাম্বুর নদী হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত একটী শাখাস্রোতস্বতীর তীরদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নকালে রামথং নামক পল্লীর এক চমরী মৃগশালায় আমরা মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়া কোথাও বাসস্থান পাইলাম না। অবশেষে এক শৃগালের গর্ত্তের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলাম। শৃগালটী আমাদিগকে দেখিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিল। আমরা কম্বল বিস্তার করিয়া অতি কষ্টে তথায় রজনী অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে তথা হইতে বাহির হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য, চতুর্দ্দিকে কেবল অনন্ত তুষার স্তূপ। তাহাদের উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে চতুর্দ্দিক এমনই চাকচিক্যময় হইয়া উঠিল যে, আমাদের সবুজবর্ণ প্রতিচক্ষু থাকা সত্ত্বেও যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। লামা উগ্যেন গাসোর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার স্থূলোদর আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া তুষাররাশির উপর পড়িয়া গেল। বস্তুতঃ যেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলে শরীরের রক্ত তুষারে পরিণত হয়, তথায় এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করা অসম্ভব। আমাদের পরিচালক ফুরচুংকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলে, সে আমাকে ও পরে লামাকে পৃষ্ঠে করিয়া অতি পিচ্ছিল তুষারের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল গমন করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইল। এইরূপ আসন্ন মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া সে একটুকুও গর্ব্বিত হইল না ; বরং ইহা যেন তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, এমন একটী গহ্বর মিলিল না, যথায় সেই রাত্রের জন্য আমরা অবস্থান করিতে পারি। অধিক দূর যাইতে নিতান্ত অশক্ত, একটুও জল নাই, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, মধ্যে মধ্যে তুষারময় অতি শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় আমাদের শরীরে যেন সহস্র সহস্র সূচিকাবিদ্ধ হইতে লাগিল। অথচ তুষারময় ভূমিতে উপবেশন করিতে গেলেই প্রোথিত হইয়া যাইতে হয়। সুতরাং ক্রমে যেন আমরা মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইতেছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এক মাইল যাইতে না যাইতেই চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। স্থানে স্থানে অত্যুজ্জ্বল অতি স্বচ্ছ তুষার খণ্ড নক্ষত্রের ন্যায় মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় এক অতি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তূপের সন্নিধানে উপনীত হইলাম। এই পাহাড়টী এক খণ্ড তুষার-শৈলের সম্মুখে অবস্থিত। আমাদের পরিচালক বলিল, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ইহা এরূপ অবস্থায় থাকিবে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গলিত তুষার রাশির সহিত ভাসিয়া যাইবে। যদি অতি প্রত্যুষে এখান হইতে বাহির হওয়া যায়, তাহা হইলে আর

বিপদের সম্ভাবনা নাই। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সে রাত্রির জন্য আমরা সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে কম্বল বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম।

২৮শে জুন, অতি প্রত্যূষে তথা হইতে বাহির হইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা অতি মনোরম, অতি ভয়ানক! মহাসমুদ্রের মহা তরঙ্গমালার ন্যায় তুষারকণাসমূহ স্তরে স্তরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি পর্ব্বতাদি শ্বেত স্বচ্ছ তুষার স্তরে সমাবৃত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় তুষার শৈল অনন্ত কাচখণ্ডের ন্যায় ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠায়, তাহা চক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রায় ২১ হাজার ফিট উচ্চে বাতাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যাহা বহিতেছিল, তাহার সহিত তুষারকণা বিমিশ্রিত থাকায় তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ হইয়া আসিতেছিল। আমরা প্রত্যেক দুই তিন হাত অগ্রসর হই, আর সর্পদষ্টের ন্যায় অবশাঙ্গ হইয়া পড়িয়া যাই। এইরূপ কিয়দ্দূর গিয়া আবার বরফ রাশির উপর পড়িয়া গেলাম। দুই তিনি মিনিটের মধ্যে চতুর্দ্দিকস্থ তুষার রাশিতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলিল। উগ্যেন গাসো যদিবা একটু একটু যাইতে পারিতেছিল, আমি আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

এইরূপে আমরা একবিংশতি সহস্র ফিট উচ্চ সেই জংসংলা গিরিসঙ্কটে তুষার রাশির মধ্যে জীবন-সংগ্রামে বৃথা জয়ী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমাদের পরিচালক অথবা চিরদিনের বন্ধু সেই পার্ব্বত্য বীর ফুরচুং না থাকিলে সেই দিন তুষার রাশিতেই আমাদের চিরসমাধি হইত। ফুরচুং আমাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

পর দিন সন্ধ্যাকালে "গ্যামি খোখো" নামক একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে গুরখা সৈন্যের সহ যুদ্ধের পর চীন সেনাপতি "সুংকো" একটী সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করতঃ জংসংলা গিরিবর্ত্ম বন্ধ করিয়া মনুষ্য যাতায়াত রহিত করিবার সংকল্প করেন।

গ্যামি খোখো উত্তীর্ণ হইয়া আমরা জেমী নদীর তীর দেশ দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গেলে আমাদের পরিচালক ফুরচুং বলিল, আমরা এ পথে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি, সম্মুখস্থিত গিরিবর্ত্মের রক্ষক ডক্‌পা জাতি, তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত। Pass part দ্বারাও কোন ফল হইবে না জানিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। একটু ঘুরিয়া গেলে আর এ বিপদে পড়িতে হইত না। দক্ষিণে ডক্‌পা জাতির অধিবাস ও উত্তরে চর্ক্তেন নিয়োলায় তিব্বতীয়গণের বাস, ইহার মধ্যস্থিত বর্ত্ম সর্ব্ববিধ ভ্রমণকারীর অনধিগম্য। উপায়ান্তর অভাবে আমরা একটী পর্ব্বত-গহ্বরে লুক্কায়িত রহিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনও বা ঝরণার তীর দিয়া কখনও বা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গমন করতঃ আমরা এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

ইহার পর ৭।৮ দিন কোন দিন বা অনাহারে, কোন দিন বা স্বল্পাহারে; কোন দিন বা চা মাত্র পান করিয়া, কোন রাত্রি পর্ব্বত গুহায়, কোন রাত্রি বিস্তীর্ণ ময়দানে;

কোন রাত্রি কৃষকের গোশালায় নিশি যাপন করিয়া অবশেষে আমরা খেকং, খানা ডংকিচু, বরুনংপো, ক্যাগোলা, চুতো ফুরপা প্রভৃতি পল্লী অতিক্রম করিয়া আমাদের চিরদিনের অভিপ্সিত তাসিলংপু বিহারে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বুদ্ধিষ্ট টেক্‌স্‌ট সোসাইটীর জর্নালে আমার তিব্বত গমনের সংক্ষিপ্ত ডায়েরী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে একটী মানচিত্র দ্বারা আমার গমনপথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

তিব্বত যাত্রিগণের ভ্রমণ-বিবরণ পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে, অন্যান্য দেশের ন্যায় তিব্বত সহজগম্য নহে। চীনের ভিতর দিয়া তিব্বতে আগমন করা যেমন সহজ, ভারতবর্ষ দিয়া যাওয়া তেমন সুগম নহে। অন্যদিকে তিব্বত যাইতে চাহিলে আমি যে পথ দিয়া গিয়াছিলাম, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। কিন্তু নেপালীয় পুলিশ থানা, টৈসাবুা ও তিব্বতীয় পুলিশ থানা, জংসংলা গিরিসংকট সর্ব্বদা প্রহরী পরিবৃত থাকায় এ পথ দিয়া কেহ যাইতে পারে না। কাশ্মীর হইতে নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বত গমনে অনেক বিলম্ব হয়। বিশেষতঃ নেপাল গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সকলকে যাইতে দেন না এবং নেপালের সীমান্ত প্রদেশে তিব্বতীয় প্রত্যন্ত দুর্গরক্ষকদের নিষেধাজ্ঞায় এ পথেও গমন এক প্রকার অসাধ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

মাণিক।

১

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁগা বড় মামী,
আর ক'বছর পরে বড় হব আমি?
বড় হ'লে, দেখো তুমি, আমি ও মহিম—
দুজনে ঘুরাব শুধু সোণার লাটিম।

২

ইচ্ছা হয় পাঠশালে যাব বা যাব না,
করিতে পাবে না 'শ্যামা' পিছনে তাড়না।
বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল—
মারিতে পাবে না দাদা ঘাড় ধ'রে কীল।

৩

দেখো তুমি, বড় হ'লে শুধু খাব মুড়ি,
দিনরাত ছাদে ব'সে উড়াইব ঘুড়ি।
হাত ভাঙি, পা ভাঙি, ছাদ হ'তে পড়ি—
ডাকিতে পাবে না বাবা অত রাগ করি।

৪

ভাত খাই, নাই খাই, তা ব'লে যে মা
জোড় ক'রে ঘাড় ধ'রে খাওয়াতে পাবে না।
ঘুমাব না—লাফাইব, ছিঁড়িব কাপড়,
মা কিন্তু পারিবে না মারিতে চাপড়।

৫

কাদা মাখি, ঢিল ছুড়ি, করি মারামারি—
বলিতে পাবে না কেউ আমাদের বাড়ী।
এগুলে বাবার কাছে—আমার হুকুমে
রামদিন পাঁড়ে দিবে ঠুকিয়া তুড়ুমে।

৬

পিসিমা, মেনিরে চোখে দেখিতেই পেলে,
চেচাতে পাবে না অত—'খেলে খেলে খেলে'
বাবার সোণার সেই বড় চেন দিয়ে
মেনিরে ঠাকুর-ঘরে রাখিব বাঁধিয়ে।

৭

বোসেদের বানরটা ধরা যদি যায়—
লুকায়ে রাখিব বড়-বৈঠক-খানায়।
কাছারিতে গেলে বাবা, বেতে দমাদম—
লাফাতে শিখাব তারে কতই রকম।

৮

সার্কাসের ঘোড়া ছুটো, বড় হ'লে কিনে,
উঠানে ছুটাব খালি, চড়ি বিনা জিনে।
বসিব, দাঁড়াব, শোব, লাফাব আবার—
প'ড়ে গেলে, দেখো কিন্তু ভাঙিবে না হাড়।

৯

প্রতি রাত্রে যাত্রা দিব, হনুমান বেড়ে
নাচিবে, খিচুবে, যাবে ছেলেদের তেড়ে।
বেশ,আমি চিঠি দিব, তা হ'লে তো যাবে?
তা ব'লে বানান-ভুল ধরিতে না পাবে।

১০

প্রতিদিন যাবে তুমি, যাহা ইচ্ছা নিবে।
তোমার ও কাকাতুটা আজ, মামী, দিবে?
ঠোঁটে ওর বড় ধার?—কেন ভয় পাও?
ছুরি দিয়ে ঠোঁট ছুটো কেটে নও দাও।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

শাস্ত্র ও পুরাণ।

ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণের জ্ঞান অসীম, তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থও অসংখ্য। বারিধি-সৈকতের বালুকারাশি যেরূপ গণিয়া শেষ করা যায় না, নভোমণ্ডলের নক্ষত্র-রাশির যেমন সংখ্যা হয় না, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থও তদ্রূপ। আজি কালি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে, প্রতি বৎসর, শত শত অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের প্রচার হইতেছে, কত প্রাচীন শাস্ত্রকারের নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু অদ্যাপি যে তাঁহাদের সমস্ত গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে,তাহা বলিতে পারা যায় না। ষড়-দর্শনের কত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত; পুরাণ তন্ত্রাদির অত্যল্প সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এখনও মানবদৃষ্টির অতীত পথে পতিত রহিয়াছে, কেহ তাহাদের সন্ধানই পায় নাই। চার্ব্বাকদর্শন নামে যে দর্শন আছে, তাহার এক খানিও এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ; বৌদ্ধ-গ্রন্থের ছুই দশ খানি মাত্র প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ (আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মত মানিয়া লইলেও) চারি সহস্র বৎসরের সভ্য ও শিক্ষিত জাতি। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে যে সকল মনস্বী মহাত্মা, এই কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া, আপনাদিগের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত মহামূল্য রত্ন ইহলোকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয় চিন্তা করিতে হইলেও মন অবসন্ন হইয়া আইসে—ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হওয়া যায় না। কোন্ বিষয়ের কথা বলিব? বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, উপপুরাণ যাহারই বিষয় চিন্তা কবি, কিছুরই অন্ত পাওয়া যায় না। বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ সাধারণের অনায়াসলভ্য হইয়াছে, তাহার সকল গুলি দেখিয়া উঠাও এক জনের জীবনে কুলায় না। তথাপি আজ কালের শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে—মানুষ্য ক্রমেই অল্পায়ু, অল্পশ্রমী হইয়া আসিতেছিল বলিয়া, শাস্ত্রগ্রন্থ সকল জনসাধারণের আয়ত্তাধীন করিবার জন্য, আমাদের শাস্ত্রকারগণ, ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। অধুনা আমরা যে অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারত দেখিতে পাই, তাহাই অতি বড় বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকি; তাহারই আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিবার সময় করিতে পারি না; সময় করিলেও ধৈর্য্য

থাকে না; একারণ অনেকের অদৃষ্টে সমগ্র মহাভারত পাঠ করা ঘটিয়া উঠে না। আমরা জীবিকার জন্য সদা সর্ব্বদা লালায়িত, পুত্র কলত্রাদি লইয়া সদত বিব্রত; বিলাস-ব্যসনের আনুরক্তিহীনই বা কিরূপে বলিতে পারি? এই সকলের উপর, মানব জীবনের সার, পরলোকের একমাত্র সহায়, ধর্ম্ম উপার্জ্জনে একবারে নিরস্ত। সময় হয় তো সুবিধা ঘটে না, সুবিধা ঘটে তো প্রবৃত্তি জন্মে না, প্রবৃত্তি জন্মে তো সৎকার্য্যে বহুবিধ বাধা উপস্থিত হয়। ধর্ম্মালোচনা, বা তৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভে আমাদিগকে চিরজীবন বঞ্চিত থাকিতে হয়। এখন যদি কেহ সমস্ত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, গুরুদত্ত একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর বীজ-মন্ত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও আমাদের শাস্ত্রার্থ জ্ঞান লাভে সন্দেহ আছে। কেন না, আমরা যে বীজমন্ত্রের কথা বলিলাম, তাহাই বা কয়জনকে জপ করিতে দেখি? ফলে, যাঁহাদের চেষ্টা যত্ন আছে, শাস্ত্রালোচনার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে সকলই স্বল্পায়াসসাধ্য হইতে পারে; তাঁহাদিগের জন্যই, শাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ সংক্ষিপ্ত করিবার রীতি, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাঁহাদিগের জন্যই বলিতেছি। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাস্তবিকই আমাদের শাস্ত্রালোচনার সময়, সুযোগ ও মতি অতি অল্প! অর্থোপার্জ্জনে নিবৃত্ত হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিজনবর্গের অশন বসন ক্লেশ উপস্থিত হয়; জল বায়ুর প্রাধান্যে ও অন্যান্য কারণে আমাদিগকে অল্পায়ু হইতে হইতেছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের দেশের অনেকেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর দার-পরিগ্রহ করিতেন; এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জনের অনেকটা সুবিধা পাইতেন; তাই আমরা যে অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারতকে অতি বিস্তৃত মনে করিয়া হস্তে লইতেও সাহস পাই না, সেই মহাভারত তাঁহাদের অনেকে কণ্ঠস্থ করিতেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এই মহাভারত শতপর্ব্বে বর্ণিত ছিল। মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বলের অবনতি প্রযুক্ত যে প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ সকল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও অনেক আছে।

মহাভারত।

মহাভারত, সমস্ত পুরাণের শ্রেষ্ঠ। ইহাতে নাই, এরূপ বিষয়ই নাই। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, যাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাই ইহাতে পাইবে। তদতিরিক্ত প্রাচীন রাজবংশগুলির বিষয়ও ইহাতে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বেদ, উপনিষৎ, যখন মনুষ্য-বুদ্ধির আয়ত্ত হওয়া সুকঠিন বলিয়া বোধ হইল, তখনই পুরাণাদি শাস্ত্রের সাহায্যে বেদ বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

পুরাণের মধ্যে মহাভারতই শ্রেষ্ঠ। আমাদের মধ্যে একটা চিরায়ত কিম্বদন্তী আছে, "যা' নাই ভারতে 'তা' নাই ভারতে।" এই কিম্বদন্তী সর্ব্বতঃ সফল। অথচ শাস্ত্রকারেরা নিরস্ত নহেন; মহাভারতের পরেও অনেক পুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থেও সেই সকল রাজবংশের বিবরণ, সেই রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ। তবে কথা এই যে,

বর্ণনার প্রকার ভেদ আছে। আজি কালিও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, একই দেশের ইতিহাস লিখিয়াছেন, একই রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির কথা কহিতেছেন, কিন্তু বর্ণনার প্রকার ভেদে নূতনত্ব আছে বলিয়া, পাঠকগণেরও প্রীতিকর হইয়া থাকে। সেই সকল বর্ণনায় যদি একত্র সমাবেশ হয়, তাহা হইলে কি পাঠকগণের বহু গ্রন্থ একত্র পাঠের কৌতূহল পরিতৃপ্তি জন্মে না? অধুনা যেমন পাঠক সম্প্রদায়ের সময় ও সুবিধার অভাব, যদি কেহ মিল ইলিয়ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইতিহাস' প্রণেতৃগণের বর্ণিত বিবরণ গুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে সকলে আগ্রহ সহকারে সেই সংগ্রহ-গ্রন্থ গ্রহণ ও পাঠ করেন; তেম্নি যদি মহাভারতের যাবতীয় উপাখ্যান ভাগের সঙ্গে যাবতীয় পুরাণের বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত উপাখ্যান ভাগ, একত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়—যদি মহাভারতের বর্ণিত রাজনৈতিকী বর্ণনার সহিত অন্যান্য পুরাণে ও উপপুরাণ বর্ণিত রাজনীতির, মহাভারতের সমাজনীতির সহিত অন্যান্য পুরাণ-বর্ণিত সমাজনীতির একত্র সমাবেশ করিয়া পৃথক পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কি মহাভারতের সহিত সমস্ত পুরাণ উপপুরাণ গুলির জ্ঞান একত্র এককালে পাঠ করিবার সুবিধা হয় না? বোধ হয়, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, তাহা হয়।

পুরাণ উপপুরাণ গুলির বাজে কথা বাদ দিয়া, যদি ঐরূপে সার-সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় পাঠকগণও, একত্র এক সঙ্গে, সমস্ত পুরাণ উপপুরাণাদি পাঠের ফলভোগী হইতে পারেন।

অভাবের সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তির অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যেখানে অভাব, তাহার পশ্চাতেই এই মহীয়সী শক্তির আবির্ভাব দেখা যায়! অভাব অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই তৎপ্রতিকারের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই চিন্তা হইতেই উক্ত শক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। এই মহৎ অভাব অনেকেরই অনুভূত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় চিন্তা সকলের দ্বারা হয় না—হইবারও নহে।

প্রচলিত মহাভারতে (এবং অন্যান্য পুরাণেও) আমরা দেখিতে পাই যে, পুরাণ-বক্তা, শ্রোতার প্রার্থনা মতে প্রসঙ্গাধীন এক একটী রাজবংশের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে পাঠকের ধারাবাহিক উপাখ্যান পাঠে বাধা উপস্থিত হয়। যাহা পাঠ করিবার জন্য কৌতূহল জন্মে, তাহাতে যদি মধ্যে মধ্যে অন্য কথা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

নিম্নলিখিত প্রকারে যদি সমগ্র মহাভারত খানি পুনর্লিখিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতে পারে।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উত্তর পুরুষগণের নাম, একটীর পর একটী, ইতিহাসের ন্যায় নৃপতি অনুক্রমে সাজাইয়া, যদি মহাভারত খানি পুনর্লিখিত হয় এবং প্রতি পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত টীকায় সেই সকল নৃপতিগণের সমসাময়িক ঘটনা (অন্যান্য পুরাণে যেখানে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা) লিপিবদ্ধ করা যায়,

তাহা হইলে, একখানি পুরাণ পাঠে সংক্ষিপ্ত ভাবে সকল পুরাণ ও উপপুরাণের সার-মর্ম্ম, পাঠকগণ অবগত হইতে পারেন এবং পূর্ব্বকথিত অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতে পারে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাউক। মনে করুন, অগ্রে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপত্তি নির্ব্বাচন—জগতের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, পঞ্চীকরণ, পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা, সৃষ্টি-বর্ণনা, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরের উৎপত্তি ও তাঁহাদিগের কার্য্যভার গ্রহণ, (টীকায়) ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণের ভিন্ন ভিন্ন মত ও তাহার সমন্বয়, ব্রহ্মা হইতে অগ্নির উৎপত্তি ও (টীকায়) তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের সার-সংগ্রহ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন মিলিতাগ্নির সংখ্যা পর্য্যায় ও নাম এবং (টীকায়) কোন্ কোন্ ক্রিয়ায় অগ্নির কোন্ কোন্ নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অজিত তুষিত সাধ্য ও আদিত্যগণের সৃষ্টি, অবিদ্যা সৃজন, মানস পুত্র সৃজন, ব্রহ্মার (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি) নয় প্রকার সৃষ্টি, স্থাবর ও তির্য্যকযোনি সৃষ্টি, উর্দ্ধচারী সৃষ্টি, অর্ব্বাক স্রোত, প্রাকৃত সৃষ্টি (মহতত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বৈকারিক দেব সকল এবং মন, পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা), বৈকৃত সৃষ্টি, তির্য্যক ও উর্দ্ধস্রোত, অনুগ্রহ সৃষ্টি ও কৌমার সর্গ, একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি, সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার শম্ভু শঙ্খ পরমেষ্ঠী প্রচেতস্ ধর্ম্ম অধর্ম্ম ধাতা বিধাতা স্বায়ম্ভু নারদ বশিষ্ঠ প্রভৃতির উৎপত্তি ও বংশ বিস্তার, সপ্তর্ষি ও প্রজাপতিগণের কথা, দেব ও দানবগণের উৎপত্তি, যক্ষ রক্ষ ও নাগাদি সকলের উৎপত্তি ও বংশবিবৃতি, নৃপতিগণের বংশধরগণের (চন্দ্র হইতে জনমেজয় পর্য্যন্ত) ধারাবাহিক বংশ-তালিকা, তাঁহাদিগের ইতিহাস ও (টীকায়) অন্যান্য পুরাণোক্ত সমসাময়িক ঘটনাবলী, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ উপপুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া যদি একখানি প্রকাণ্ড (বিংশ শতাব্দীর) মহাভারত সঙ্কলিত হয়, তাহা হইলে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের সমাদর বর্দ্ধিত এবং বঙ্গীয় পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে, এরূপ ভাবে বংশ-তালিকা প্রস্তুত করা ও সেই সময়ের ইতিহাস, সমসাময়িক ঘটনাবলী, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও প্রচলিত উপাখ্যানাবলী একত্র সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করা যে কি ভয়ানক গুরুতর কার্য্য, তাহা, যাঁহারা পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রসিদ্ধ নৃপতিগণের বংশ-তালিকা প্রস্তুত করাই কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা একবার মনে ভাবিয়া দেখুন। শুধু তালিকা নহে, তদন্তর্গত বংশ ও ব্যক্তিগত উপাখ্যান সংগ্রহ! তাহা হইলেওতো হইত—তদতিরিক্ত এক একটী উপাখ্যানের স্থলে, তিনি চারি পাঁচ বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী উপাখ্যানের একত্র সমাবেশ! এরূপ করিবার কারণ—কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণিত, কিন্তু পুরাণান্তরে হয়তো তাহা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের উপাখ্যান ভাগ সংগ্রহে পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তি, ও তদ্দ্বারা তত্তৎ উপাখ্যানের অন্তর্গত বিষয়

বর্ণনা শিল্প, চরিত্র চিত্রন ইত্যাদি স্পষ্টরূপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। এরূপ না করিলে, উপাখ্যান পাঠে পরিতৃপ্তি জন্মে না। একটী উপাখ্যান কোন এক পুরাণে একরূপ পাঠ করিয়া যদি তাহার পর অবগত হওয়া যায় যে, পুরণান্তরে অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলে, যতক্ষণ মতান্তর জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ মনের পিপাসা কিছুতেই মিটিবার নহে।

পুরাণ মাত্রেই, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, জীবজন্তু, মনুষ্য, দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষঃ নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদির উৎপত্তি ও বংশ বিস্তার এবং রাজবংশের বিবরণ বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অবগত থাকিয়াও কৌতূহল নিবৃত্তির সহজ উপায় ঘটিয়া উঠে না; তজ্জন্য সমগ্র পুরাণগুলি ক্রয় করিতে হয়; এক একটী করিয়া উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে বাছিয়া লইয়া তবে পাঠ করিতে হয়; পাঠ করিয়া, বিভিন্ন বর্ণনার সার গ্রহণ করা, কত আয়াস ও ব্যয় সাধ্য! সকলের পক্ষে, তাহা সহজে ঘটিয়া উঠিবার নহে। যাহাতে সেই সকল অভাব অনুভব করিতে না হয়, এরূপ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইলে, তবে একার্য্য সিদ্ধ হয়।

মহাভারতীয় আলোচনা।

প্রচলিত অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারত লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, এখনও অনেকে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে করিবেন।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একার্য্যে অগ্রণী। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী লেখক বর্ত্তমান যুগে বিরল। তাঁহার প্রমাণ—অকাট্য, যুক্তি—অভূতপূর্ব্ব।

৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কৃষ্ণচরিত্র" রচনা কালে, মহাভারত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি প্রথমে সেই কথাই বলিব।

বঙ্কিম বাবুর মতে, অন্যান্য পুরাণাদির যে কয়খানিতে কৃষ্ণ-বৃত্তান্ত আছে, মহাভারত তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; মহাভারত প্রকৃত ইতিহাস, কিন্তু ইহাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত রচনা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু পাণ্ডবদিগের কথা রূপক বা প্রক্ষিপ্ত নহে। প্রচলিত মহাভারত এক ব্যক্তির রচনা নহে। মহাভারতে তিনটী স্তর আছে, যথাঃ—প্রথম স্তর, একটী আদিম কঙ্কাল—তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত ভিন্ন আর কিছু ছিল না; দ্বিতীয় স্তরে প্রাচীন কিম্বদন্তী (অর্থাৎ পুরাণ) সংগৃহীত ও সম্প্রসারিত, অনেক স্থলে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, কিন্তু তাহা সমুদায় এক ব্যক্তির রচনা এবং যদি ব্যাস নাম দিতে হয়, তবে এই দ্বিতীয় স্তরের রচনাকারীকেই ব্যাসদেব বলিতে পারা যায়; তৃতীয় স্তরে, বহুলোকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগ-পর্ব্বে প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, তৃতীয় স্তর সঞ্চার কালে রচিত।

বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপ্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায়, বঙ্কিম বাবুর কথার প্রতিবাদ (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বা অপর কাহারও রচিত নহে, ইহাই প্রমাণ) করিবার জন্য, মহাভারত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসদেবেরই রচিত;

ইহা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে। দার্শনিকতা, গীতার প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নহে; যুদ্ধারম্ভে গীতা-সংবাদ সম্ভব, অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ, দু'চারিটী কথায়, অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে ভাবের কথা বলিয়াছিলেন, ব্যাসদেব সেই গুলি সাজাইয়া লিখিয়াছিলেন। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে বটে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত রচনার সঙ্গে প্রক্ষেপকদিগের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং "বেনামী" নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়োল্লিখিত ১০৮ম হইতে ২৪৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈশম্পায়নোক্ত (অথবা ব্যাসদেব রচিত) ভারত-সংহিতার কথা বর্ণিত। পৌষ্য; পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্ব, বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত না হইলেও, উহা ব্যাসদেবেরই রচনা। ব্যাসশিষ্যগণ কর্ত্তৃক পর্ব্ব-সংগ্রহ রচিত হইবার পরে, ব্যাসদেব মহাভারতের শ্লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সেই জন্য পর্ব্বসংগ্রহোল্লিখিত শ্লোক সংখ্যার সহিত, প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা মিলে না। ব্যাসদেব, সমগ্র মহাভারত, ক্রমে ক্রমে (তিন চারি স্তরে) গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত শ্লোক-চতুষ্টয়ী ভারত-সংহিতা —সর্ব্ব প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ— চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট ভারত-সংহিতা; ইহার সূচীপত্র, অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১০৮ম শ্লোক হইতে ২৪৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত। তৃতীয় সংস্করণ—লক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট "ভারত"; পর্ব্বসংগ্রহ ইহার সূচীপত্র স্বরূপ। ইহার পরেও ব্যাসদেব মহাভারতের আর একটী সংস্করণ করিয়াছিলেন—তাহাই চতুর্থ সংস্করণ। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত রচনা থাকা সম্ভবপর নহে; আর যদিও তাহা থাকে, তাহাও নিতান্ত অল্প সংখ্যক হইবে; বাহার হাজার শ্লোক হইতে পারে না। চতুর্থ সংস্করণের মহাভারতই সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "সমীরণ" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন—মহাভারত ঐতিহাসিক মহাকাব্য। ইহা লক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট; তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে কুরুপাণ্ডবীয় ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ঐতিহাসিক মহাকাব্যের রচয়িতা।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু "কাব্যচিন্তা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—মহাভারত 'অয়' শাস্ত্রের অন্তর্গত। 'জয়' শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ধরিয়া তাহার কাব্যাংশ রচিত। ইহাকে ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য বলা যায়। পঞ্চমবেদরূপে মহাভারত সাধারণ্যে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার ঐতিহাসিক দেহাবরণ মধ্যে যে বেদার্থের আধ্যাত্মিকতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ঋষিগণ যে গ্রন্থকে 'ইতিহাস' বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন, স্বয়ং ব্যাসদেব যাহাকে 'কাব্য' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, পূর্ণ বাবু তাহাকে "ইতিহাস ও লোকচরিত্র নহে" এ কথা বলিতে পারেন না; সুতরাং স্বীকার করিয়াছেন, মহাভারত একাধারে ইতিহাস ও কাব্য। এই কাব্যনিবিষ্ট আখ্যায়িকার পাত্র ও পাত্রীগণ প্রকৃত ঐতিহাসিক লোক নহেন, তাঁহারা কেবল কাব্য-রচিত চরিত্র মাত্র; কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রৌপদী, কাহারই জন্ম, প্রাকৃত জন্ম নহে। তাঁহাদের অলৌকিক জন্ম বিবরণ দিয়া, ব্যাস, তাঁহাদিগকে কাব্যের কল্পিত চরিত্র রূপে

দেখাইয়াছেন ; উঁহারা সকলেই কাব্যের পাত্র ও কাল্পনিক সৃষ্টি।

পূর্ণ বাবুর মত, বঙ্কিম বাবুর মতের বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রধানতঃ, অণুক্রমণিকাধ্যায় ও পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ণ বাবু প্রধানতঃ অণুক্রমণিকাধ্যায় হইতেই নিজ মত সমর্থনের উপযোগী-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

আমি, প্রথমে অণুক্রমণিকাধ্যায়ের আলোচনা করিব। কেহ যেন মনে না করেন যে, পূর্ণ বাবুর মতের প্রতিবাদ করাই এ প্রবন্ধ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, পূর্ণ বাবুর সহিত আমার মতের মিল না হইলেও, তাঁহার "কাব্যচিন্তা" পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছি। বঙ্কিম-চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের মত খণ্ডন করা, পূর্ণ বাবুর মত লেখকের দ্বারাই সম্ভব। আমি, হয়তো, বুঝিতে পারি নাই—তাই বঙ্কিম বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ বাবুর মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। কুরু-পাণ্ডব কেহই ছিল না, ভারত যুদ্ধ হয় নাই, এ সমস্তই কবির কল্পনা মাত্র, এরূপ ধারণা হওয়া সুকঠিন। আমি, অধিকাংশ স্থলে, যশস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি।

মহাভারত সম্বন্ধে, অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। আমি, তাহার সকলগুলি পাঠ করিয়াছি, বলিতে পারি না ; তবে যাহা আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি।

মহাভারত।

(অনুক্রমণিকা।)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ।

"নারায়ণ, সর্ব্ব নরোত্তম নর (১), এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক।"

মহাভারতের অপর নামও 'জয়'। যথা—'জয়োনামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।' (ম,ভা,৬২ অধ্যায়)। এই নিমিত্তই, বোধ হয়, প্রত্যেক পর্ব্বের প্রারম্ভে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥' এইরূপ মঙ্গলাচরণ লিখিত আছে।

'জয়' যে কেবল মহাভারতেরই নাম, তাহা নহে। যে শাস্ত্রে বা যে পুরাণে, পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত, যাহাতে মুক্তি লাভের উপায় কথিত, যাহা সাধন-পথ-প্রদর্শক, তাহারই নাম—'জয়'। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের

---

(১) নারায়ণ, সর্ব্বনরোত্তম নর।—"পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুর অবতার ঋষি বিশেষ। বিষ্ণু, ধর্ম্মের ঔরসে, দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে, নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন।"

কালিকা-পুরাণে, নর নারায়ণের উৎপত্তি, প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে ; মহাদেব সরভরূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগ প্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি দুই খণ্ড করেন ; তাহার নরভাগ দ্বারা নর, ও সিংহ ভাগ দ্বারা নারায়ণ, এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন।

(২) জয়। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয় ; অর্থাৎ জীব জন্ম মৃত্যু-পরম্পরারূপ সংসার-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়।

যারা কোন্ কোন্ শাস্ত্র 'জয়' নামে অভিহিত, তাহা জানা যাইবে—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ।
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
সংসার জয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ।"

—ভবিষ্য-পুরাণ।

অর্থাৎ "অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, পঞ্চম-বেদ-মহাভারত এবং শিবধর্ম্ম ও বিষ্ণুধর্ম্ম ইহাদের নাম 'জয়'। প্রাচীন ঋষিগণ এই সংসার বিজয়ের পন্থার জন্য লোলুপ হইতেন। সেই পন্থা, বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য, মহাভারত রচিত হইয়াছিল।

জ্ঞানগর্ভ বাক্য ও নীতিসার প্রচার কামনায় মহাভারত রচিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। 'যাহার দ্বারা সংসার জয় হয়, যাহা পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের হেতু, সেই গ্রন্থের নাম 'জয়'। যথা—

"চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োস্ত্রিয়াম্।"

আর একটি কথা আছে—"যাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞানের ভরণ হইয়াছে, তাহারই নাম মহাভারত। যিনি এই মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট সেই পাঠ ও শ্রবণ ফলস্বরূপ, মহাভারতকে এক বৃহৎ ইতিহাস বলিয়াই প্রতীতি হয়,—যে ইতিহাস মধ্যে সমুদায় প্রাচীন আর্য্য-সমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।" (কাব্যচিন্তা, ৪৫।৪৬ পৃষ্ঠা)।

প্রচলিত অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারত কে সঙ্কলন করিয়াছেন?

বর্ত্তমান-প্রচলিত অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারত অনেকের গৃহে আছে; কিন্তু তাহাই প্রকৃত পক্ষে ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সেই আদিম 'ভারত-সংহিতা' বা আদি-মহাভারত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার কারণ আছে।

এই লক্ষ-শ্লোকাত্মক-মহাভারত আমরা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রচলিত অষ্টাদশ-পর্ব্ব-মহাভারতেই তাহা লিখিত আছে।

"কুলপতি শৌনক (১) নৈমিষারণ্যে (২) দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে, এক দিবস, ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ, দিবসের কার্য্যকলাপে একত্র সমাগত ও সুখোপবিষ্ট হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময় সূতকুলোদ্ভূত (৩) লোমহর্ষণ তনয় (৪) পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ (৫) বিনীত

(১) কুলপতি।—"আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানমুনি।"

(২) নৈমিষারণ্য।—"ভগবান গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে 'আমি এই অরণ্যে এক নিমিষে দুর্জ্জয় দানব-সৈন্য ধ্বংস করিলাম, এই নিমিত্ত ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক।'"

(৩) সূতকুলোদ্ভূত।—ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ-সঙ্কীর্ণ জাতি। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায়।) ক্ষত্রিয় নৃপতি যযাতির ঔরসে ব্রাহ্মণ তনয়া দেবযানীর গর্ভে, যদু ও তুর্ব্বসু নামে যে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। [যদু ও তুর্ব্বসু পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেও অন্য কারণে; 'ব্রাহ্মণীর ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি' বলিয়া নহে; কারণ, তাহা হইলে, দানবরাজ বৃষপর্ব্বাদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার দুই পুত্র দ্রুহ্য ও অনু, মহারাজ যযাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেন না। কথিত আছে, যযাতির ঐ সকল পুত্রগণ, পিতার বিষম ব্যাধি জরা গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, ত্যাজ্যপুত্র হইয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু, পিতাকে নিজ যৌবন দান করিয়া, তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।]

(৪) লোমহর্ষণ তনয়।—"লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্ব-প্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণ-বক্তা। লোমহর্ষণ সর্ব্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ী নাম—প্রকৃত নাম নহে; যে হেতু, কল্কিপুরাণে সূতপুত্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে। তাঁহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হয়।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬; কল্কিপুরাণ ২৭ অধ্যায়, ও কূর্ম্মপুরাণ দেখুন।)

(৫) পুরাণবিৎ সৌতি বা পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ।—উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাসনে আসীন হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছিলেন; এমন সময়ে, বলদেব, তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও সৎকার করিলেন; কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোত্থানাদি করিলেন না। বলদেব, তদ্দর্শনে, তাঁহাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কুশাগ্র প্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। পরে ঋষিদিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন—'ইহার আর পুনর্জীবন হইবেক না; ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ

আঁরে তথায় উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ, উগ্রশ্রবাকে দর্শন মাত্র, অদ্ভুত-কথা-শ্রবণ-বাসনা-পরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক, সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথি সৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে, সমুদায় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর, তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সূতনন্দন। তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এতকাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল?"

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবাঃ সৌতির উপস্থিতি, ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা ও আসন প্রদান ইত্যাদি, কোন্ স্থান হইতে তিনি আগমন করিতেছেন' এবং 'কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ করিয়াছেন' প্রভৃতি প্রশ্ন ও উগ্রশ্রবাঃ সৌতির সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দান, অপর কোন লেখক (ভূমিকা স্বরূপে) রচনা করিয়াছেন। ইহা বেদব্যাস, বৈশম্পায়ন বা সৌতি কর্ত্তৃক লিখিত বা তাঁহাদিগের কাহারই উক্তি নহে।

মহাভারতে, প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না, আলোচনা প্রসঙ্গে, ক্ষিতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—গীতা প্রক্ষিপ্ত কি না দেখিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে, মহাভারতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না? মহাভারতের প্রারম্ভ আলোচনা করিলেই আমরা দেখিব যে, ইহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। তাহার অর্থ এই যে, মহাভারতে এমন কতকগুলি অংশ ও শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা অন্য কর্ত্তৃক রচিত হউক অথবা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হউক, অন্ততঃ মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রথমতঃ রচিত হয় নাই; কিন্তু মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত উল্লেখের সঙ্গে প্রক্ষেপকদিগেরও নামোল্লেখ করা হইয়াছে। যে স্থলে যে ঋষির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই স্থলে সেই ঋষির নামও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যেখানে সৌতির নিজের কথা চলিতেছে, সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে "সৌতিরুবাচ" অর্থাৎ 'সৌতি বলিলেন।' যেখান হইতে বৈশম্পায়নী ভারত-সংহিতার আরম্ভ হইয়াছে, সেখানেও স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "বৈশম্পায়ন উবাচ" অর্থাৎ 'বৈশম্পায়ন বলিলেন।'

কিন্তু নৈমিষারণ্যে উগ্রশ্রবাঃ সৌতির উপস্থিতি, ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা ও আসন প্রদান ইত্যাদি, কে বলিতেছেন, তাহার প্রমাণ নাই। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের প্রারম্ভ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ইহা বেদব্যাস বৈশম্পায়ন বা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি, এ তিন জনের মধ্যে কাহারই উক্তি বা রচনা নহে? এই অংশ দেখিলে, স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রচলিত মহাভারতের সঙ্কলয়িতা অপর একজন লোক।

তার পর—

"এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া যথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে" এই উত্তর করিলেন—

সৌতিরুবাচ—

"জনমেজয়স্য রাজর্ষেঃ সর্পসত্রে মহাত্মনঃ।
সমীপে পার্থিবেন্দ্রস্য সম্যক্‌পারীক্ষিতস্য চ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তাঃ সুপুণ্যা বিবিধাঃ কথাঃ ॥১০॥
কথিতাশ্চাপি বিধিবদ্‌যা বৈশম্পায়নেন বৈ।
শ্রুত্বাহং তা বিচিত্রার্থা মহাভারতসংশ্রিতাঃ ॥১১॥

অর্থাৎ

"হে মহর্ষিগণ! প্রথমতঃ মহানুভব রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র (১) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তথায়, বৈশম্পায়ন মুখে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত (২) আপনাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন।' তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ-বক্তা হইলেন।

(১) এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, জনমেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিতের সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়ায়, সর্পকুলের ধ্বংসের জন্য ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গল্পটী মহাভারতে আমরা যেরূপ ভাবে প্রাপ্ত হই, তাহা আজি কালের দিনে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। মহারাজ জনমেজয় নাগকুল ধ্বংসের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনার্য্য বংশ নাশ করিবার জন্য ঘোরতর সমরের আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাই অনেকের ধারণা। নাগ অর্থে সর্প নহে; ইহা কল্পিত কল্পনা। সর্পসত্রের ঠিক পূর্ব্বে, জনমেজয়ের তক্ষশীলা প্রদেশ জয় করিতে যাওয়া, তাহার প্রমাণ।

(২) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।—মহর্ষি বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; পরে, বেদ বিভাগ করিয়া—ব্যাস,

মহাভারতীয় পরম পবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম।"

বুঝিলাম, সৌতি, মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বৈশম্পায়ন মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছিলেন; সৌতি তথায় উপস্থিত থাকিয়া সেই সকল পুরাণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

যাহা হউক, তার পর আবার উগ্রশ্রবাঃ কি বলিতেছেন শুনুন :—

"অনন্তর, তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও অনেক আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক, বহু ব্রাহ্মণ সমাকীর্ণ সমন্তপঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমন্তপঞ্চকে পূর্ব্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উভয় পক্ষীয় নরপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এই পরম পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগের ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ। আপনারা স্নান আহ্নিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূত হইয়া সুস্থ মনে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; আজ্ঞা করুন, ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র পৌরাণিক কথা, অথবা মহানুভাব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস, কি বর্ণনা করিব?"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন-প্রোক্ত ব্যাস-রচিত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিয়া, সৌতি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, শেষে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। এসময় তাঁহার নিকট কোন পুঁথি ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। তার পর, তিনি, নৈমিষারণ্যে আসিয়া "মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন" এরূপ কথা থাকিলেও, আমরা মনে করিতে পারিতাম যে, তীর্থভ্রমণের পর, তিনি ব্যাস-রচিত মহাভারতের পুঁথি বা তাহার অনুলিপি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তৎপরিবর্ত্তে আমরা পাইতেছি যে, সৌতি, ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কি শুনিতে চাহেন? 'পৌরাণিক কথা' বা 'মহানুভব নরপতিগণের ইতিহাস' বা 'ঋষিগণের ইতিহাস' এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে সৌতিকে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ যাহা ফরমাইস্ করিবেন, তিনি তাহাই বর্ণন করিবেন সুতরাং এখানেও প্রমাণ হইতেছে যে, সৌতি ঋষিগণের প্রশ্নে যাহা যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,—কোন পুস্তক দেখিয়া বলেন নাই বা কোন পুঁথি পাঠ করেন নাই। অতএব, সৌতি, যে মহাভারতীয় কথা, ঋষিগণের প্রশ্নানুসারে, বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত "ভারত সংহিতা" অধ্যয়নের এবং সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন কথিত "মহাভারত" কীর্ত্তন ও বেদব্যাস ও অন্যান্য মুণিগণ কথিত পৌরাণিক-কাহিনী বর্ণন শ্রবণের ফল হইতে পারে। কিন্তু বেদব্যাস-রচিত আদিম ভারত-সংহিতা প্রাচীন কাল হইতে বংশ-পরম্পরাগত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে কিনা, সে বিষয় ঘোর সন্দেহ বর্ত্তমান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, অন্বয়, শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা ও বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সমেত। ফরিদপুর হইতে শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩ ভাগে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম খণ্ড ১৲, ২য় খণ্ড ২৲, ৩য় খণ্ড ২৲ মোট ৫৲; গ্রন্থ খানি ১০৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুবাদ প্রচারের জন্য পূর্ব্বে এদেশের গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কৃতবিদ্যগণের তেমন যত্ন ও আগ্রহ ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্র, নবীন চন্দ্র এবং রমেশ চন্দ্রের জীবন সার্থক যে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরও এই কাজের জন্য অবসর খুজিতেন এবং বলিতে কি, নগণ্য, ঘৃণিত এবং উপহসিত বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রভূত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেন। তাঁহাদের আদর্শে, পরবর্ত্তী কালে, আরো

বেদব্যাস ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ; আর যমুনার দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত দ্বৈপায়ন।

অনেক কৃতবিদ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এই কাজে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার কাহারও পশ্চাৎবর্ত্তী নহেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এজন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার প্রধান পরিচয় এই গ্রন্থ। ধন্য জাতীয় ভাষা, ধন্য জাতীয় শাস্ত্র, এবং ধন্য বাবু কালীপ্রসন্নের স্বার্থত্যাগ। তিনি জানেন, এই কাজের পুরস্কার এই বঙ্গে নাই, তবুও তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি প্রতি খণ্ডের উপক্রমনিকায় গীতা-ধর্ম্মের যে বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, সূক্ষ্ম ধর্ম্ম চিন্তা এবং বিজ্ঞতার পরিচয়ে মোহিত হইতে হয়। গীতার অনেক সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার ব্যাখ্যাতেও তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে সম্যক রূপে আদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

২৩। মাতৃদেবী। ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত লিখিত, ঢাকা আশুতোষ যন্ত্র। বিনামূল্যে বিতরিত। আমরা এই গ্রন্থের একখণ্ড উপহার পাইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছি। পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। এদেশে অনেক পোষ্যপুত্র আছে, যাঁহারা আপনাদের জীবন ইতিহাসের কথা ভাবিতে এবং বলিতে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হন। কেহ যদি সত্যের অনুরোধে সে কথা প্রকাশ করে, তবে ক্রোধে তাঁহারা উন্মত্ত হন; এবং বিবিধ প্রকারে লেখকের নিন্দা প্রচারে ও অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিবার জন্য যেন ভক্ত কালীনারায়ণ উৎসর্গে লিখিয়াছেন,—

"মা বলিতে আমার গর্ভধারিণী মা যশোদাদেবী এবং আমার চারিবর্ষ বয়সাবিধি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র ভাবে আমার দেহ, মন, শক্তি লইয়া খেলা করিয়াছেন যে মা ভাগীরথী দেবী, এই দুই মাই আমার সর্ব্বস্ব।"

গর্ভধারিণীর প্রতি অচলা ভক্তি আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু পালয়িত্রী মাতার প্রতি এরূপ নিষ্কাম ভক্তির পরিচয় আমরা আর কোথাও পাই নাই। এই পুস্তক এবং বিশেষত এই পুস্তকের উপসংহার পাঠ করিবার সময় কতবার ভাবিয়াছি, "কালী নারায়ণ কি মানুষ, না দেবতা? এরূপ ভক্তির উদয় কি মানুষে সম্ভবে?" ভক্ত কালীনারায়ণের অনেক মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এই "মাতৃদেবী" পাঠ করিয়া যে মহত্ত্বের পরিচয় পাইলাম, তাহা এই বঙ্গে বড়ই দুর্লভ জিনিস। পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত। কবিতার প্রাণ তেমন লালিত্য বা কবিত্ব মাধুর্য্য, অলঙ্কার ও শিল্পনৈপুণ্য এ পুস্তকে না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাতে কালীনারায়ণের মহৎ হৃদয়ের যে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা মোহিত হইয়াছি। এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে কি কালীনারায়ণ কখনও ঈশ্বরভক্ত হইতে পারিতেন? মাতা এবং বিধাতা, এ দুয়ে কি কোন পার্থক্য আছে? ধন্য ভক্ত কালীনারায়ণ।

২৪। ভাব-সঙ্গীত। ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত, বিনা মূল্যে বিতরিত। মাতৃদেবীতে কালীনারায়ণের যে মাতৃভক্তি দেখিলাম, এই ভাবসঙ্গীতে সেই কালীনারায়ণের অচলা ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাইলাম। যাঁহার পুত্র দেশবিখ্যাত কমিশনার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং অন্যতর পুত্র সিবিল সার্জ্জন ছিলেন, জামাতাগণ একস্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, প্রফেসর, ডাক্তার, পুত্রের জামাতাগণ সিবিলিয়ান, তিনি বলিতেছেন;—

"কাজ কি তোর গৃহবাসে, তুই কর্‌লি না ঘর এই বয়সে, (ভাল) আর জনে ঠাঁই না দিলে নাই, আপন মাথা রাখবে কিসে বড় ভুকানে (মোরা)।"

"কেবল কি টাকার গণায় দিন্ যদালি দিনের গণা গণলি নারে, এদিন ত রবে নারে দেখনারে কিসে কি হয় দুদিন পরে। (মোরা)"

"কত দিন ভবের খেলা, চক্ষু মেলা থাকবে রে মন এ সংসারে, এবে দুই নয়ন তারা, কাজল পরা বুজে যাবে দুদিন পরে। (মোরা)"

"নামে প্রেম উথলে যখন মনে, বুড় নাচে ছেলের

সনে, সমান ভাবে গ'পে আনে, এক পয়সা আর লাখ রে (তখন)।"

এ সংসারে প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; এই সময়ে ভক্ত কালী নারায়ণের অহেতুকী ভক্তিরস পান করিয়া আমরা আত্মহারা হইয়াছি। ভক্তের এই গানটীর সরসতায় না মজিয়াছে, এমন শ্রোতা দেখি নাই—

"বলরে বলরে বলরে ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং, পাইলে ব্রহ্ম কৃপার বিন্দু হইবে শীতলং। ইত্যাদি।

এই দুইখানি পুস্তকের জন্য ভক্ত কালী নারায়ণ বাবুর নিকট, ঢাকা লক্ষ্মীবাজার লিখিলেই, বোধ হয়, সানন্দে তিনি সকলকে প্রদান করিবেন।

২৫। অমরাগড়ী ব্রহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।—আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। সাধু ফকিরদাস রায়ের পুণ্যকাহিনী পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও ভক্তির অশ্রুপাত হয়। কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির একত্র সম্মিলন হইলে কিরূপ ভক্তির উৎস প্রবাহিত হয়, অমরাগড়ী সমাজের ইতিহাস তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যিনি এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

২৬। তুকারাম রচিত।—শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি-এ প্রণীত, মূল্য ৷৷৴০। সিটী-বুক-সোসাইটী। বাঙ্গালা ভাষায় যেমন রাম-প্রসাদের সঙ্গীত, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তেমনি তুকারামের পদাবলী। তুকারাম বাঙ্গালার রামপ্রসাদ। তুকারামের জীবনের পবিত্র কথা সরল বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিয়া যোগীন্দ্র নাথের জীবন ধন্য হইয়াছে। যে অমৃতময় লেখনী হইতে মাইকেল ও অহল্যা-বাইর জীবন-চরিত প্রসূত হইয়াছে, সেই লেখনী হইতেই এই জীবন-চরিত বাহির হইয়াছে। যেমন ভাষা, তেমন গাথা, তেমন বর্ণনা শক্তি, তেমন ভক্তের প্রতি অনুরাগ— এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। পুস্তকখানি গদ্যে লিখিত। যাঁহারা ভাল গৃহশিক্ষার পুস্তকের জন্য অন্বেষণ করেন, তাঁহারা অতি আদরে এ পুস্তক ক্রয় করিবেন; আশা করি।

একবার তুকারাম সংকীর্ত্তন ও কথকতা করিবার জন্য লোহগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন; শিবাজী সেকথা শুনিয়া, তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়নের জন্য সম্ভ্রমসূচক পত্র, অশ্ব ও একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুকারাম চারিটী অভঙ্গ পত্রের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই সাধুর ধর্ম্ম-জীবনের আভাস পাওয়া যায়। যোগীন্দ্র-নাথ উহার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কত সুন্দর, দেখুন—

কানন-নিবাসী আমি, উদাসীন বেশে,
বাসনা-বিহীন হয়ে ভ্রমি দেশে দেশে।
বস্ত্র বিনা ধূলিময়, অতি কদাকার,
ক্ষীণ দেহ, করি নিত্য ফল মূলাহার।
শুষ্ক কর পদ, সদা বিকট মূরতি,
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি।
বন্ধু ভাবে এই আমি করি নিবেদন,
মোরে দেখিবার কথা তুলো না রাজন।
যাব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল।
সদয় তোমারে সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি,
তাই লিখিতেছি হেন সবিনয় বাণী।
তা না হলে বিঠ্ঠলের সেবক যেজন,
কৃপার ভিখারী সেত নহে কদাচন।
রক্ষক, পোষক মোর প্রভু ভগবান,
কেবা আছে এজগতে তাঁহার সমান'।
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি, ছিল যত অভিলাষ।
ত্যজিয়া বিষয়-তৃষ্ণা সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম।
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্ঠলের তরে।
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ,
তোমারেও তাঁর মাঝে করি দরশন।
ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্ঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া?
সাধু গুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার।
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁর প্রতি ভক্তি তবে কিসে রবে হায়।
তুকা বলে, শুন ওগো বুদ্ধির সাগর।
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর।
মুক্ত আছে ভিক্ষা পথ, হবে ক্ষুধা নাশ

লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস।
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ।
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ু মাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে।
সম্মান-প্রয়াসী জন রাজ গৃহে যায়।
কিন্তু বল, শান্তি কভু মিলে কি সেথায়?
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মিলে কখন।
বেশ, ভূষা, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে,
মৃত্যু সম বিভীষণ বোধ হয় মনে।
হয় ত এসব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরক্ত আমার প্রতি হবে তব মন।
কিন্তু আমি জানি ভাল অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি।
গরীয়ান সেই জন, সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিনগত যার;
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সেত নীচের সমান।
তুকা বলে, ধনি জন, তোমাদের মান,
নশ্বর, আমরা কি চির-ভাগ্যবান।"

ধনী লোকদের অহঙ্কারের হুঙ্কারে সদা কম্পিত পৃথিবীতে এইরূপ ধার্ম্মিক লোকের জীবনী শান্তি-পাদপের ন্যায় সুস্নিগ্ধ। তুকারামের এই পুণ্যকাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক।

২৭। বীরকেশরী নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত, মূল্য ১॥০, দ্বিতীয় সংস্করণ।

অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায়, ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট কিরূপ আদৃত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিলাত হইতে আনীত নেপোলিয়নের একখানি প্রামাণিক প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যত্ন এবং পরিশ্রমের কোন ত্রুটী করেন নাই। আমরা প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলাম; সুতরাং আর অধিক কথা লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যাঁহারা প্রথম সংস্করণ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও, এই দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আরো আনন্দিত হইবেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই পুস্তকের দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

২৮। সম্রাট আকবর। জীবনী।

ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান চিত্র। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত, মূল্য ১॥০। ইহা বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ। আমরা সাদরে পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া মোহিত হইলাম। মহাত্মা আকবরের জীবনী পাঠ করিতে করিতে সময়ে সময়ে মনে হয়, আকবর কি মানুষ, না দেবতা ছিলেন? মনে হয়, এরূপ দেবোপম চরিত্রধারী ব্যক্তি এ দেশে কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে প্রাণ আবিষ্ট হয়। পাঠক, এইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, বঙ্কিম চন্দ্রের সম্রাট আকবর একবার পাঠ করুন।

গ্রন্থকার বলেন,—

"অধুনিক সময়ে আকবরের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন অনুদার ও অদূরদর্শী হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল আত্মকলহ করিতেছিল, আর জন্মভূমিকে রসাতলের অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে সমাধি প্রদানার্থ বহন করিতেছিল, তখন আকবর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জন্মভূমির দুঃখ দুর্গতি নিবারণ করিয়াছিলেন, জগতে তাহাকে অতুলনীয় করিতে সমুদয় শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিবাদ-পরায়ণ বিশাল ভরতবর্ষকে একছত্রের সুশীতল শান্তির ছায়ায় আনয়ন করিয়া তাহাকে এক জাতি, একধর্ম্ম ও একভাষায় সঞ্জীবিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমানের চির সম্মিলন দ্বারা এক প্রবল ও শক্তিশালী রাজনৈতিক জাতি সংগঠনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের সিংহাসনের জন্য হিন্দু-মুসলমান-শোণিতময় সম্রাটশ্রেণী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এক-দেশদর্শী মুসলমান সম্রাজ্য, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাময় মনোহর হিন্দু-মুসলমানের এক অভিনব সম্মিলিত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, হতভাগিণী ভারতভূমিকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া মহাগৌরবে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি স্বার্থবিরহিত, অতি উদার স্নেহপরায়ণ, স্বদেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, রাজনীতিবিদু, ন্যায়বান ও সহৃদয় সম্রাট ছিলেন।"

এ হেন মহৎ ব্যক্তির কলঙ্ক ঘোষণা।

করিতে কি কেহ কখনও সচেষ্ট হয় নাই? চাঁদের আলোকে পেচকের চির ঘৃণা, পরশ্রী-কাতর ব্যক্তিগণ কখনও কোন মহতের মহত্ব দেখিতে পায় না। পুণ্যশ্লোক আকবরের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেও কত নিন্দুক কত ভাবে চেষ্টা করিয়াছে। বঙ্কিম বাবু বিজ্ঞতা, সুচিন্তা ও গবেষণার অত্যুজ্জ্বল প্রভা দ্বারা সে সকল কলঙ্ক-কালিমাকে নিষ্প্রভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; দেখাইয়াছেন, সে সকল কেবল নিন্দুকের বাচালতার কণ্ডুয়ন মাত্র। আকবরের চরিত্রকে এরূপ উজ্জ্বল ভাবে এ দেশের আর কোন ব্যক্তি চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বঙ্কিম বাবুকে ৪৩ খানি গ্রন্থের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে হইয়াছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং প্রভূত পরিশ্রমের ফল এত দিনে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা সাদরে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হউক এবং ভারত-ভূমির প্রকৃত হিতৈষী শ্রেণীতে তাঁহার নাম অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকুক।

যে ব্যক্তি প্রকৃত হিতৈষণার সিংহাসনে উত্থিত, ভাষা ও ভাব তাঁহার নিত্য সহচরী। হিতৈষণার প্রেরণায় এই পুস্তকে কি সুন্দর ভাষাই রচিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে অনেক সময় মনে হইয়াছে, এ কি উপন্যাস পড়িতেছি। এত বড় গ্রন্থ পড়িতে কখনও অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় না। সদা উত্তেজনা, অনুরাগ, ভাব-বিহ্বলতায় পূর্ণ হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ সরস এবং সরল, মধুর এবং সুন্দর গ্রন্থ যিনি লিখিতে পারেন, তাঁহার জীবন ধন্য।

২৯। মাতৃমঙ্গল।—প্রেমানন্দ-বিরচিত; মূল্য ৷৷৵০।

মাতৃমঙ্গলের একটী কবিতা "ওমা এত নাম তুই কোথা পেলি?" নব্যভারতের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় (১৩০৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া "সঞ্জীবনী" অকথ্য ভাষায় প্রেমানন্দকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এই কথা স্মরণ করিয়া প্রেমানন্দ অবশ্যই সঞ্জীবনীকে ক্ষমা করিয়াছেন। এই রূপ নানা নাম গ্রহণ করিয়া অনেক লোক প্রতারণা করিয়াছেন বলিয়া সঞ্জীবনী ভয়ে আকুল। সংসারে কত লোক কত নামে পরিচিত, সকল লোকই ধার্ম্মিক নন্, পরন্তু কত নামের কত লোক কত জঘন্য কাজ করিয়াছে; তবে কি আর কোন ব্যক্তি কোন নাম গ্রহণ করিবে না? হায়, হায়, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ নানা পত্রিকায় সঞ্জীবনীর মাসিক পত্র সমালোচনায় তীব্র প্রতিবাদে আশ্রিত-বন্ধু প্রতিষ্ঠায় যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি সত্য? যাহার ভাষা জ্ঞান নাই, সে যদি ভাষার দোষ ধরে, যাহার কবিত্ব বোধ নাই, সে যদি কবিতার নিন্দা করে, যাহার পবিত্রতা ও ধর্ম্মের ধারণা নাই, সে যদি ধর্ম্ম কথার কুৎসা প্রচার করে, যাহার কোন প্রকৃত কথা জানা নাই, সে যদি কোন কথার প্রতিবাদ করে, তবে সহ্য করা বাস্তবিকই কষ্টকর হইয়া উঠে। সঞ্জীবনীর ঐ তীব্র মন্তব্য পাঠ করিয়া কত বন্ধু আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার যদি আমাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকে, তবে তাহা থাকুক, কিন্তু সে জন্য অন্যের লেখার উপর তীব্র বাণ নিক্ষেপ করা কি তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উচিত? হায়, তিনি সময়ে সময়ে যে সকল কদর্য্য লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহা ক্ষমার অযোগ্য, সময়ে সময়ে তিনি যে অনুদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেন না। মাতৃমঙ্গলের যে নমুনা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন ধার্ম্মিক সম্পাদকের তীব্র উক্তি করা উচিত ছিল না। আমরা, অন্যান্য মহাজনের সহিত এক বাক্যে বলিতে পারি, মাতৃমঙ্গলের ন্যায় ধর্ম্মভাবপূর্ণ কাব্য এ দেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।

মাতৃমঙ্গলের গ্রন্থকার নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। নিরাকারকে সাকার করিয়া, মাতৃরূপের বিভিন্ন স্তর এমন সুন্দর ভাবে কোন সাধক, বুঝিবা আজ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট

করিতে পারেন নাই। পড়িতে পড়িতে ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতে হয়—অলক্ষিত ভাবে ভক্তি রসে প্রাণ মন আপ্লুত হয়।

সাধনার মার্গে বিচরণ করিতে করিতে যে সকল সত্য পাওয়া যায়, তাহা দেবদত্ত ধন, তাহা অনুপ্রাণনের ফল, তাহা বিধাতার প্রত্যক্ষ বাণী। এ জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ যে বিধাতার আদেশের ফল, কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। বিধাতার প্রত্যক্ষ আদেশকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন, তাঁহারা আর যাহা হন হউন, কিন্তু তাঁহারা যে ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্বে পৌঁছিতে অক্ষম, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীত, সাধক তুকারামের অভঙ্গ যাঁহাদের হৃদয়কে সরস করিয়াছে, এই মাতৃমঙ্গল তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হইবে না, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি।

দুই একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা, কিন্তু কোন্ স্থান বাদ দিয়া কোন্ স্থান তুলিব, ঠিক পাই না। সকল কবিতাই মিষ্ট, সকল গুলিই সরস, সকল গুলিতেই নূতন নূতন ভাব। ভক্তিপিপাসু পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে উপেক্ষা না করেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য ১ম কবিতাটী এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

তুমি প্রেমরূপে আনন্দময়ী।
(ওমা) প্রেম-নয়নে যে দিন তোমারে
আনন্দময় রূপ দেখেছে,
(ওমা) সে দিন থেকেই ছেলে নিজের
"প্রেমানন্দ" নাম রেখেছে।
(ওমা) অনন্ত রূপ তুমি ধর,
(বিরাট) বিশ্বরূপে বিরাজ কর,
(কেবল) প্রেমরূপেতেই ধরা পড়,
(তোমার) অন্তরূপে চাওয়া মিছে।
(তুমি) মহাশক্তি মহেশ্বরী,
(ওমা) তাতেই ভীমা ভয়ঙ্করী,
(আবার) পরাৎপর, তাই তুমি পর,
(কেবা) পরকে ভয়ে মা ডেকেছে?
(তুমি) জ্ঞানরূপে অনন্ত, অপার।
(যার) কূল নাই, তার দেখবে কি আর?
(তুমি) প্রেমরূপে আনন্দময়ী,
(তাই) প্রাণময়ী মা জীবের কাছে।
(ওমা) যে পেয়েছে প্রেমানন্দ,
গিয়েছে তার সকল সন্দ,
(ওগো) তোমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ,
(কেমন) এ জগতে সেই জেনেছে।
(ওমা) প্রেমরূপেতে বিশ্বসৃষ্টি,
(এযে) অহেতুকী কৃপাবৃষ্টি,
(ওগো) তুমি থাক্‌লেই প্রেম থাকে মা,
(যেমন) অরুণ, কিরণ, মিশে আছে।
(ওমা) সসাগরা বসুন্ধরা,
(আর) রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
(তোমার) প্রেম-রূপেতেই চিত্র করা,
(সব) প্রেমানন্দে ভরে আছে।
(কিবা) অরুণ-কিরণ-রেখা,
(কিবা) ইন্দ্রধনু, শিখী-পাখা,
(এসব) তোমার প্রেমানন্দ-মাখা,
প্রেম-তুলিতেই লেখা রয়েছে।
(দেখি) জীব-জগতে যত রঙ্গ,
(সে সব) তুমি প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ,
(যত) বিহঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ,
(তারা) প্রেমের খেলাই খেলিতেছে।
(জীবের) জীবনাশা, চিন্তা, স্মৃতি,
(আর) স্নেহ, প্রীতি, নিষ্ঠা, নীতি,
(এসব) তোমারি প্রেম রূপের জ্যোতিঃ
(ধরায়) প্রতিফলিত হয়েছে।
(যেমন) জলের বুদ্বুদ্ জলে ভাসে,
(তোমার) প্রেমের খেলা ইতিহাসে,
(তুমিই) গড়েছ ভেঙ্গেছ, শেষে
তোমার প্রেমেই সব মিশেছে।
(ওগো) প্রাণের কাছে দেহ যেমন,
প্রেমের কাছে রূপও তেমন,
(ওমা) রূপে প্রেমে হলে মিলন,
আনন্দ তায় লেগেই আছে।
(তুমি) দিলে বিশ্বে অনন্ত রূপ,
(আর) আপনি হলে প্রাণস্বরূপ,
(তোমার) প্রেমের মিলন কি অপরূপ,
(ওমা) যে দেখেছে, সেই মজেছে।
(আমি) থাকি যখন নিজ স্বভাবে,
(ওমা) মগ্ন হয়ে তোমার ভাবে,
(দেখি) বিশ্বময় অপূর্ব্ব দৃশ্য,—
(কেবল) প্রেমানন্দের ঢেউ উঠেছে।
(যখন) বিবোধ হয় মা তোমার সনে,
(আর) প্রেম থাকেনা আমার প্রাণে,
(তখন) চাই জগতে যাহার পানে,
(দেখি) দগ্ধ মূর্ত্তি ধরে আছে।
(তুমি) অনন্ত প্রেমের পয়োধি,
(নিজে) প্রেমরূপে করেছ বিধি,
(পাবে) প্রেমামৃত নিরবধি,
(ওমা) যে জন যাবে তোমার কাছে।
(ওমা) প্রেমানন্দ তোমার ছেলে,
(তারে) স্থান দিও ঐ চরণতলে,
(তারে) ডুবিয়ে রেখো প্রেম-সলিলে,
(যেন) নামটী মা তার হয়না মিছে।

যবনিকান্তরালে।

বর্ত্তমান সময়ে মানবমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা অত্যন্ত প্রবল। পরকাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন রূপ বিশ্বাস না থাকাই যে ইহার অন্যতম কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পরকাল সম্বন্ধে চাক্ষুষ কোন রূপ প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্ম্মিকগণের উক্তি এবং শাস্ত্রের বাক্যে প্রত্যয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাঁহারা যোগবলে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন এবং শিষ্যমণ্ডলী সেই সকল অমূল্য উপদেশাবলী লিখিয়া রাখিয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাই আমাদিগের শাস্ত্র এবং তন্নিহিত উপদেশরাজি আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে মানিতে বাধ্য।

বর্ত্তমান যুগে শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং তদ্ধেতু ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হওয়ায় লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষ সকল বিষয়ের প্রমাণ চায়। প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ পাইতে হইলে যোগ সাধনের প্রয়োজন। আমরা সাধন ভজন করিতে পারিব না। ততদূর কষ্ট করিয়া আমরা পরকালে বিশ্বাস জন্মাইতে অক্ষম, সুতরাং চিরকালই পরকাল সম্বন্ধে কুয়াসা-বেষ্টিত বিশ্বাসে যাপন করিতে হইবে। যখন সাধন ভজন করিতে অক্ষম, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণের উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতে কেন চেষ্টা করি না? ইহা অতি সহজসাধ্য।

পূজ্যপাদ সাধকপ্রবর ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যোগবলে পরকাল দর্শন করিতে সক্ষম ছিলেন, ইহা বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। যোগমার্গে অগ্রসর হইলেই এই শক্তিটী জন্মে। তাঁহারা নখদর্পণের ন্যায় ভূত, ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল বলিতে সক্ষম। পরকালস্থ মুক্তাত্মাদিগের অনুকম্পারই ইহার কারণ। আমরা কূপমণ্ডূক। বিশ্বাস করিতে পারি না। যোগীদিগকে ভণ্ড বলিতেও দ্বিধা করি না।

দিনে দিনে সহস্র সহস্র লোক মহাপ্রস্থান করিতেছে আমরা দেখি, ভাবি, ইহারা এই ছিল, কোথায় গেল? কোন্ অজানিত দেশে গমন করিল? এই যে যুবক যাহার প্রতাপে মেদিনী কম্পিত হইত, আজ সে কোথায়? প্রিয়তম ভার্য্যা, যাহার একটু অদর্শনে মুহূর্ত্তকে যুগ বলিয়া মনে হইত, সে আজ কোথায়? প্রিয়তম পুত্র, যাহার মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, যাহার সামান্য পীড়া হইলে, কি করিলে সে সুস্থ হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতাম না, আজ কোন্ স্থানে, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহা নির্দ্দেশ করিবে? আবার কি ইহাদের সহিত মিলন হইবে? আবার কি সুখের ঘর বাঁধিয়া গৃহস্থালী পাতিতে হইবে? যখন কিছুরই বিনাশ নাই, যখন সামান্য একটু শব্দেরও বিনাশ হয় না, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, ইহাদের বিনাশ হইয়াছে, যাহা গিয়াছে,তাহা গিয়াছে—তাহার অস্তিত্ব কোথায়?

মহাভারত, গীতা প্রভৃতি হইতে মানব

জীবনান্তের অবস্থা বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু সে আমাদের দেশের কথা। আমাদের মুনি ঋষিগণের উক্তি; তাহাতে ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকের তৃপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং ইংরেজ কবি এবং গ্রন্থকারদিগের পরকাল সম্বন্ধে উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে অন্ধ কবি অমর মিলটনের কথা শুনুন,—

"Millions of spiritual beings walk the earth.
Both when we wake and when we sleep."

দিবা রজনী সহস্র সহস্র মুক্তাত্মা বিচরণ করে।

আমেরিকার মনস্বী কবিকুল-চূড়ামণি Longfellow—এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"There is no death, what seems so is transition;
This life of mortal breath.
Is but a suburb of the life Elysion:—
Whose portals we call death."

মৃত্যু নাই, যাহাকে মৃত্যু বলি, কেবল অবস্থান্তর।
স্বর্গীয় সুখ শান্তি পূর্ণ জীবনের দ্বার—মৃত্যু॥

Rev. John Kebb লিখিয়াছেন:—

"For in truth,
Man's spirit knows not death, but sets aside
The interlinear boundaries of the flesh,
And in its thoughts, which are its proper-self,
Holds intercourse with those which are unseen,
As if they were still with us."

মানবাত্মা মৃত্যু জানে না, মাংস পেশীময় শরীর অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য মুক্তাত্মাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং তাঁহাদের সহিত বিহার করে।

এডেম্ কলার্কের উক্তি।

"I believe that there is superenatural and spiritual world in which human spirits, both good and bad, live in a state of consciousness and I believe that, any of these spirits may (according to the order of God in the laws of their place of residence) have intercourse with this world and become visible to men."

একটী ভৌতিক জগৎ আছে। সে স্থানে সৎ এবং অসৎ মানবাত্মা সজ্ঞানে বাস করে। এই মানবাত্মা ভগবানের ইচ্ছায় কিম্বা সেই স্থানের নিয়মানুসারে পৃথিবীতে আগমন করিয়া মানুষের প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে।

ডাক্তার কমিঙের কথা:—

"This is certain. Angels descend and minister to the comfort of the suffering—those angels return from their ministery to the choirs of the happy; and can we suppose they will be silent on what they have seen and to whom they have ministered below."

স্বর্গীয় দূতগণ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাপিত-সন্তপ্ত মানবকে শান্তি দান করিয়া থাকেন। এই সকল স্বর্গীয় দূত তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে সুখী মণ্ডলী মধ্যে প্রত্যাগত হন্ এবং এই মর্ত্ত্যধামে যাঁহাদিগকে শান্তিদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে নিঃসন্দেহ কথোপকথন করিয়া থাকেন।

Willam Ellery Channing:—

"Although we are accustomed to think of Heaven as distant, of this we have no proof. Heaven is the union, the society of spiritual higher beings. May not these fill the universe? A new sense, a new eye might show the spiritual world compassing us on every side."

আমরা স্বর্গ বহু দূরে কল্পনা করিয়া থাকি। ইহার কোন প্রমাণ নাই। মুক্তাত্মাগণের সম্মিলনই স্বর্গ। একটী নূতন ইন্দ্রিয়, একটী নব চক্ষু লাভ করিলে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ভৌতিক জগৎ পরিদৃশ্যমান হইবে। এই নূতন চক্ষু যোগবলে লাভ হইয়া থাকে এবং যোগীরা ইহাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেন।

Longfellow's footsteps of Angels;—

"Then the forms of the departed enter
at the open door ;
The beloved, the true hearted come to
visit me once more.'

তৎপর মুক্ত দ্বার দিয়া মুক্তাত্মাগণ প্রবেশ করেন, আর একবার প্রিয়জনগণ আমাকে দেখিতে আগমন করেন।

Lord Lytton's there is no death ;—

"And every near us, though unseen the
dear immortal spirits tread,
For all the boundless universe is life—
there are no dead."

অদৃশ্যভাবে প্রিয় অমর মুক্তাত্মাগণ সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে বিচরণ করেন। অসীম বিশ্ব জীবন পূর্ণ, মৃত্যু কোথায়ও নাই।"

রিভিউ অব্ রিভিউজের সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেবের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তিনি মহাশয় লোক। দরিদ্রের দুঃখে সহৃদয়তার পরিচয় দিতে তিনি কোন দিনই কুণ্ঠিত নন্। বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আপনারা শুনিয়াছেন। তিনি কিরূপ লোক, তাহার পরিচয় তাঁহার এই অভিমতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

"Julia letters" মহামতি ষ্টেড্ সম্পাদিত। এই পুস্তিকা নিম্নলিখিত কারণে লিখিত হয়।

এলেন ও জুলিয়া দুই সখী। সখীদ্বয় যুবতী, সর্ব্বদা একত্রে আহার, বিহার, ভ্রমণ এবং বিশ্রাম আলাপে দিন কাটাইতেন। একে অন্যকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না। সময় সময় এইরূপ আলাপ হইত যে, যিনি অগ্রে শমন কর্ত্তৃক আহূত হইবেন, তিনি মরণান্তে সম্ভবপর হইলে, অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।

কিছু দিন অন্তে জুলিয়া মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন, এলেন জুলিয়া বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই শান্তি পান না। জুলিয়ার বিরহ তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত করিল।

এক রজনীতে এলেন সুষুপ্তির ক্রোড়ে গভীর নিদ্রায় মগ্না আছেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, কুঠরী আলোক পূর্ণ, শয্যার পার্শ্বে জুলিয়া হাস্য পূর্ণ বদনে দণ্ডায়মান। মুখে স্বর্গীয় আলোক শান্তি এবং আনন্দের আভা। জুলিয়া সচরাচর যে বেশ পরিহিত থাকিতেন, বেশ ভূষা সেইরূপ। এলেন ভীতা হইলেন। জুলিয়া অঙ্গীকার রক্ষা করিলেন। এলেনের মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইল না। জুলিয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইল।

ইহার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এলেন্ ইংলণ্ডে আগমন করিলেন। জুলিয়া পুনরায় আর এক দিন তাঁহার সখীকে দেখা দিলেন। ষ্টেড্ সাহেব এবং এলেন্ এই দিন একই ভবনে বাস করিতেছিলেন। মিঃ ষ্টেড্ জুলিয়াকে চিনিতেন। কথায় কথায় এলেন মিঃ ষ্টেড্‌কে জুলিয়া-ঘটিত বৃত্তান্ত বলিলেন। ষ্টেড্ সাহেব ভৌতিক তত্ত্ব কিছু কিছু অবগত ছিলেন। এলেনকে বলিলেন, "তোমার সখী যদি কোন সংবাদ দিতে তোমাকে বাসনা করিয়া থাকেন, আমার দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারিবেন।"

ষ্টেড্ সাহেব জুলিয়া কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া—যে সকল চিঠী পত্র এবং পরকাল তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই জুলিয়া লেটারস্ "Julia letters।"

জুলিয়া মৃত্যুর দিবসের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন :—

• অকস্মাৎ আমার দেহপিঞ্জর হইতে আত্মা মুক্ত হইল। আমি আমার দেহের নিকট দণ্ডায়মান রহিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে কুঠরীতে যে সকল জিনিষ পত্র ছিল, সকলই স্বস্থানে রহিয়াছে। মৃত্যুর সময় আমার কোন রূপ কষ্ট হয় নাই। তৎকালে আমি কেবল্ শান্তি এবং নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়াছিলাম।

এইরূপ অবস্থায় আছি, মিসেস্ H গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। বদন অতিশয় বিমর্ষ। হঠাৎ স্বর্গীয় আলোকে গৃহ পূর্ণ হইল। একটী স্বর্গীয় দূত গৃহে প্রবেশ করিলেন। দূত বলিলেন, "নব জীবনের নিয়মাদি শিক্ষা দিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি। স্বর্গীয় দূতের সহিত আমি চলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে মুক্তাত্মারা বিহার করিতেছেন। ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছেন। কত ব্যস্ত, আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি আমাকে আমার পূর্ব্বগামী বন্ধুদিগের নিকট লইয়া গেলেন। এখানে জুলিয়ার কথা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"The spirit friends had their life much as it was here ; they lived and loved, and if they had not to work for their daily bread, they had plenty to do."

জুলিয়া বলিয়াছেন, মনই মানবের সব। মন পরিষ্কার কর। সরলতা মানবের অলঙ্কার। প্রেম ও কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপরতা মানবের ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সকলকেই প্রেমের চক্ষে দেখ, তাহা হইলেই তোমার কাজ হইল।

"There is much love on earth, were it no so, it would be hell.........The whole secret of the saving of the world lies in that, you must have more love, more love, more love."

পৃথিবীতে প্রেম না থাকিলে ইহা নরক তুল্য হইত। পৃথিবী এখনও কেবল প্রেমের উপর চলিতেছে।

"This is true love and wherever you find it you find a spark of God. That is why mothers are so much nearer God than any one else. They love more—that is they are more like God—it is they who keep the earth from becoming a vast hill."

মাতৃ-স্নেহই নিঃস্বার্থ প্রেম। এ প্রেম যেখানে, সেই স্থানেই ভগবানের জ্যোতি। সেই জন্য ভগবানের নিম্নেই জননীর আসন। জননীগণ ঈশ্বর তুল্য, তাঁহারাই পৃথিবীকে মহান নরকে পরিণত হইতে দেন নাই।

অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কাজ সাধন এবং আত্মবৎ সর্ব্বভূতে প্রেম প্রদর্শন মানবের ধর্ম্ম। ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক এই মহান পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিলে মুক্তি হস্তামলকবৎ হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারত হইতে কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির কত বল, কত তেজ, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কোন যুবা সন্ন্যাসী এক বনে গমন করিয়া অনেক দিন ধরিয়া ধ্যান, ভজন, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনার পর এক দিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, বৃক্ষের উপরে এক কাক ও বক যুদ্ধ করিতেছে ; ইহাতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। "কি তোরা আমার মস্তকে শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিলি ?" ইহা বলিয়া যেমন ক্রোধে তাহাদের দিকে

তাকাইলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে যোগাগ্নি নির্গত হইয়া পক্ষী দুইটীকে ভস্মসাৎ করিল। তখন তিনি ভাবিলেন, আমার যোগাভ্যাস হইয়াছে। আমি ইচ্ছা মাত্রেই সকলকে ভস্ম করিতে সক্ষম। এক দিবস ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন; একটী দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "মা! অতিথি দণ্ডায়মান, কিছু ভিক্ষা দিয়া আমাকে বিদায় করুন্"। ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "বৎস একটু অপেক্ষা কর।" যোগী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ওরে পাপিষ্ঠা,তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা, তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস্? এখনও তুই আমার শক্তির পরিচয় পাইস্ নাই!" আবার ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, "বৎস, এত অহঙ্কার করিও না। এ কাক্কে ভস্ম করা নয়"। সন্ন্যাসী বিস্মিত হইলেন, অনেকক্ষণ পরে একটী কামিনী আগমন করিলেন। যোগী তাঁহার চরণে পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "মা তুমি কিরূপে ইহা জ্ঞাত হইলে?" তিনি বলিলেন, "বাবা! আমি সামান্যা নারী। যখন তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, তখন আমার স্বামীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলাম। তিনি পীড়িত। রমণীর পতি-সেবাই এক মাত্র ধর্ম্ম। আমি সারা জীবন কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যখন অবিবাহিতা ছিলাম, তখন দুহিতার কর্ত্তব্য যাহা, তাহা করিয়াছি; এখন বিবাহিতা হইয়াও আমার কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্ত্তব্য করিয়াই আমার দিব্য চক্ষু খুলিয়াছে। তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব এবং অরণ্যের ব্যাপার সকলই জানিয়াছি। ইহা অপেক্ষা কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানিতে বাসনা থাকিলে অমুক নগরে এক ব্যাধ আছে, তথায় গমন কর। তিনি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে তুমি বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।" সন্ন্যাসী ভাবিলেন, অমুক নগরে ব্যাধের নিকট কেন যাইব?

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতে ইহার চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। ব্যাধের নগরে যাত্রা করিলেন। বাজারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, একজন স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া ছুরিকা লইয়া পশুবধ করিতেছে। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে? এত দেখিতেছি, এক পিশাচের অবতার!

ইতিমধ্যে ঐ ব্যাধ সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! অমুক মহিলাটী কি আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন? আমার কার্য্য সমাধা পর্য্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই আসনে উপবেশন করুন।" সন্ন্যাসী একখানি আসন লইয়া বসিলেন। সেই ব্যাধ আপনার কাজ করিতে লাগিল। কেনা বেচা শেষ হইলে আপনার টাকা কড়ি সকল লইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, "আসুন্ মহাশয়, আমার আলয়ে আসুন্।" তখন সেই সন্ন্যাসী ব্যাধের ভবনে উপনীত হইলেন। ব্যাধ সন্ন্যাসীকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে গমন করিল। তথায় পিতা মাতার হাত পা ধুয়াইয়া দিল। তাঁহাদের আহার করাইল এবং যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন্, সকল করিল। তৎপর সন্ন্যাসীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া, একটী আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনার আমি কি করিতে পারি?" তখন ব্যাধকে

সন্ন্যাসী মানবাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, তাহা ব্যাধ-গীতা নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধ-গীতা বেদান্তদর্শনের চরম সীমা। সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনার এরূপ উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এরূপ ব্যাধ-দেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিৎ কর্ম্ম করিতেছেন কেন? তখন ব্যাধ উত্তর করিলেন, "বৎস, কোন কর্ম্মই অসৎ নহে। কোন কর্ম্মই অপবিত্র নহে। আমি অনাসক্ত হইয়া বাল্যকাল হইতে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

এই ত গেল কর্ত্তব্যপরায়ণতার ফল। প্রেম কিরূপে করিতে হইবে! মানবের কথা আছেই। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। কত লোক রাস্তায় অনাহারে পড়িয়া মরে, কয় জন তাহা দেখিয়া থাকেন, দেখিয়াই বা কয় জন দুঃখ বিমোচনের যত্ন করেন?

অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণসহ বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক নকুল আসিয়া সভা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। নকুলের এক দিক স্বর্ণবর্ণ, অপর দিক নকুলের শরীরের স্বাভাবিক রং। নকুল আসিয়া যজ্ঞপ্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে, নকুল বলিল, মহারাজ, কোন এক গ্রামে এক বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র, ভার্য্যা ও পুত্রবধূ ছিল। ব্রাহ্মণ দরিদ্র, ভিক্ষা ব্যতীত দিনপাত হইবার উপায় ছিল না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, ভিক্ষা আর মিলে না। এই দরিদ্র পরিবার ২।৩ দিবস উপবাসী। ব্রাহ্মণ কি করিবেন, ভিক্ষায় বাহির হইলেন। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এ গ্রাম, সে গ্রাম ভ্রমণ করিয়া সামান্য কিছু ছাতু সংগ্রহ করিলেন। ছাতু লইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সামান্য ছাতু, একজনের উদর পূর্ত্তি হয় না, আহার করিবেন চারিজনে। ব্রাহ্মণ, ছাতু চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম অংশ তাঁহার ভার্য্যাকে দিলেন, দ্বিতীয় অংশ পুত্রকে দান করিলেন। তৃতীয় অংশ পুত্রবধূ, চতুর্থাংশ নিজের জন্য রাখিলেন। যেমন আহার করিতে যাইবেন, একটী ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতিথি বিমুখ হইয়া যাইবে ইহাও কি হয়? ব্রাহ্মণ আপনার অংশের ছাতু দিতে যাইতেছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন, কি কর, আমার ভাগ অতিথিকে দাও। পুত্র ও পুত্রবধূ ঐরূপ জিদ্ করিতে লাগিলেন। একজনের অংশ প্রদত্ত হইল, অতিথির তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি না হইয়া বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্ষুধানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আর এক অংশও দেওয়া হইল। ক্রমে ক্রমে চারি অংশই অতিথি উদরসাৎ করিলেন। তখন কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল। তিনি গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। নিশাবসান হইতে না হইতে এই দরিদ্র পরিবারের সকলই কালকবলে পতিত হইলেন। সেই দিবস আমি তথায় উপস্থিত হইয়া যে দুই এক কণা ছাতু ধূলায় পতিত হইয়াছিল, তাহাতে গড়াগড়ি দিয়াছিলাম, আমার অর্দ্ধ অঙ্গ সুবর্ণ হইল। তদবধি আমি যে যে স্থানে পুণ্যকার্য্য সূচিত হয়, তথায় গমন করিয়া গড়াগড়ি দেই, কিন্তু অপর অঙ্গ কোথায়ও হিরণ্ময় হইল না।

আমরা কি এই বিপ্রের স্বদেশীয় এবং একই আর্য্যবংশাবতংশ বলিয়া শ্লাঘা করি না?

বর্ত্তমান যুগ সন্দেহের যুগ বলিলে বোধ হয় ঠিক ব্যাখ্যা হইত। সংশয়াত্মা ব্যক্তির পরিণাম সম্বন্ধে গীতার উক্তি শ্রবণ করুন।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।"

জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। সকল বিষয়েই সন্দেহ, সকল বস্তুতেই অবিশ্বাস। কেহ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে, সে বস্তু হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ভগবানে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যিনি ভগবানকে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার সকল বিষয়েই সম্ভবপর মনে করা উচিত। ভগবানের ইচ্ছায় কি না হইতে পারে। তিনি সূঁচের ছিদ্রে হস্তী চাপাইবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

পরকাল আছে। যবনিকান্তরালে এক মহান্ আনন্দময় শান্তি নিকেতন আছে, সে স্থানের বর্ণনা করিতে মানবের জ্ঞান হারি মানে। মানব ভাষায় সে স্থানের বর্ণনা-যোগ্য কথা মিলে না। এই দেহ ধ্বংস হইলে সেই স্থানে, যদি সুকৃতি থাকে, স্থান মিলিবে। তখন ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতায় পুত্রে, স্বামী সহধর্ম্মিণীতে মিলন হইবে, আর বিচ্ছেদ হইবে না। আনন্দের ধারা তথায় চির-প্রবহমান, তথায় শোক নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; তথায় কামনা নাই, তথায় মিলন আছে, বিচ্ছেদ নাই। এ মর্ত্ত্য-ধামে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন, তাঁহারাই কেবল দেহান্তে সেই স্থানের অধিকারী। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন, নিজের কর্ত্তব্য কাজে তৎপরতা ভগবানের প্রিয় কার্য্য। একমন এক চিত্তে ইহা সমাধান কর এবং যখন স্খলিত-পদ হইবে, তখন সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক, তিনি দয়া করিয়া হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে উত্থিত করিবেন।

"Arise this moment from the deadly sleep of sin and say. "Now is the time of action, now is the day of battle,—now the season of amendment, the accepted time, the day of Salvation."

Imitation of Christ.

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণ। (৪)

পূর্ব্বে আমরা যে ব্রহ্মাশ্রিত অহং ইদং রূপ জ্ঞানপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যে জ্ঞানপ্রবাহ জীবজ্ঞানে আংশিক প্রতিফলিত বলিয়াছি, তাহাকে আমরা ব্রহ্মপ্রবাহ অথবা চৈতন্যপ্রবাহ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দার্শনিকগণ জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম এই তিনের কোন একটীকে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্বালোচনা করেন। সেইরূপ ইহাদের কোন একটীকে কেন্দ্র ধরিয়া তাহা হইতে জ্ঞান বা প্রমাণ প্রবাহ আরম্ভের কথা বলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎ কেন্দ্র হইতে বাহ্যপ্রবাহ, জীব বা অহং কেন্দ্র হইতে অন্তঃপ্রবাহ। আর ব্রহ্ম কেন্দ্র ধরিলে এই উভয় প্রবাহ সামঞ্জস্য হয়, —উভয়েরই মীমাংসা হয় (১)। ব্রহ্ম কেন্দ্র

(১) এই ব্রহ্ম বা চৈতন্য প্রবাহ বাদ বেদান্ত দর্শন সম্মত। এই মত ক্রমে ইউরোপে এ দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

না ধরিয়া, যাঁহারা উভয় প্রবাহ স্বীকার করিতে যান, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিচারে দাঁড়ায় না। শঙ্করাচার্য্য হস্তামলকের "নিত্য বোধ স্বরূপ" আত্মার তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া এই বিচার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর মীমাংসা বুঝি আর কোন দেশে কোন দার্শনিকই করিতে পারেন নাই। আমরা শঙ্করাচার্য্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলিব।

আত্মা নিত্যবোধস্বরূপ। কিন্তু বোধের নিত্যতা কিরূপে হয়? বোধ বা উপলব্ধি

যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত কতক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে ইলিএটিক্স্ সম্প্রদায়, হিরাক্লিটস্, প্লেটো ও নবপ্লেটো সম্প্রদায় প্রধানতঃ এই মতানুবর্ত্তী। মধ্য যুগে ইউরোপে ইরিজিনা এই মত প্রবর্ত্তন করেন। আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে মেলব্রান্স, স্পাইনোজা, বার্কলি ও কতক পরিমাণে ক্যাণ্ট, ফিক্টে, হেগেল, সেলিং ইহাঁরা এই মতবাদী। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পারমেনাইডিস্ (ইলিয়েটিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত) বলেন,—
Being and Thought are one and the same. Only being is, and non-being is not at all.

হিরাক্লিতাস্ বলেন,—"Our soul thinks by receiving into itself Divine Logos. All truth resides in the Logos, by which we become thinkers ourselves. We approach and understand nature through the paths of our sense."

এনেক্সগোরস্ বলিয়াছেন,—The world-forming intelligence (*nous*) is spontaneously operative, unmixed with anything, the ground of all motion but itself unmoved, everywhere actively present.

প্লেটোর মত এইরূপ,—"There are two sources of knowledge, external sensation with inner instinctive opinion.... . True knowledge comes only from the pure, and wholly inner activity of the mind, freed from the body, and all sensuous troublings and disturbances. The soul in this state perceives things in their purity as they are in their eternal essence.'

লুক্রিসিয়াস্ বলিয়াছেন,—Reason beholds its own image in the mirror of objective existence.

নবপ্লেটো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্লোটিনাস্ অবিকল বেদান্তবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই:—
Knowledge of the true, is not won by proof......not so, that objects remain outside of him who knows, but so that all difference between the knowing and the known disappears ; it is a vision of reason into its own self......Nay even this vision of reason within which subject and object are still opposed .....must itself be transcended. The supreme decree of congnition is the vision of the supreme, the single principle of things, in which all separation between it and the soul ceases... ..He has attained to this veritabe unity with God ..... This mystical absorbtion into divinity or the One, this trance or swooning into the absolute, is what gives a peculiar character to Neoplatonism as opposed to the Greek philosophical system proper. (Schopenehaur)

মেলব্রান্স বলেন,—"Deity is the absolute intellectual substance, the thinking principle bears and comprehends all ideas within itself and beholds and knows all things as they are. The human soul attains through this medium to the knowledge of things. We see everything in God."

বার্কলি বলেন,—" Consciousness creates everything out of itself as in a dream. Deity is the true author of all mental processes... ..Will of God is the cause of the phenomena."

স্পাইনোজার মত এই, তিনি—"introduced the idea of absolute knowledge not subject to the limitations of the law of causation in time, space and number. The limitations are mere affectious. He introducd the a *priori* element of knowledge."

ফিক্টে প্রথমে অহং হইতে ইদং সিদ্ধান্ত করেন— তিনি প্রথম অন্তঃপ্রবাহবাদী ছিলেন। পরে absolute Ego বা 'God' ধারণা করিয়া তাহা হইতে উভয় প্রবাহ সিদ্ধ করেন। সেলিং অবশেষে এইরূপ মতাবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রকৃত মায়াবাদী হেগেলের মতে,—"All things are resolved into thought......Thought is not one external form of the absolute beside others ; it is the absolute itself in its concrete unity of self: it is the idea come-back to itself, the idea that knows itself to

অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানই বুঝায়। কিন্তু জ্ঞান বিষয় সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত, কেবল জ্ঞানপ্রবাহ হইতে বাহ্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া বিরোধী অন্য জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। এই প্রকার উৎপত্তি বিনাশশীল বলিয়া জ্ঞান অনিত্য। কিন্তু আত্মা নিত্য। আমাদের আত্মা সম্বন্ধে এরূপ উৎপত্তি বিনাশ কেহ কখন ধারণা করিতে পারে না। অতএব আত্মা ও জ্ঞান বা বোধ উভয়ে নিত্য ও অনিত্য এই বিরুদ্ধধর্ম্মী বলিয়া আত্মাকে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলা যায় না। সুতরাং বোধের অর্থ জ্ঞান নহে—চৈতন্য। চৈতন্য জ্ঞান নহে। জ্ঞান চৈতন্যের জ্ঞেয়—চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞেয় ভাবে জ্ঞান জড়। যাহার স্বপ্রকাশ শক্তি নাই, চৈতন্য সম্বন্ধে তাহাই জড়। কেন না, চৈতন্যের জ্ঞেয় হইয়াই কেবল তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞান অনিত্য হইলেও চৈতন্যের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না।

যাহা হউক, ইহাতেও ঠিক মীমাংসা হইল না। গোলযোগ এক পদ সরাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। চৈতন্য যে জ্ঞানে জ্ঞেয় রূপে স্থিত জগৎ প্রকাশ করে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু এই প্রকাশ কিরূপে সম্পন্ন হয়? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, জড়জ্ঞানে আত্মচৈতন্য প্রকাশ হয়, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানকে ও জ্ঞানস্থ জ্ঞেয় জগৎকেও প্রকাশ করে। এইরূপ সূর্য্য আলোকরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াই জগৎ প্রকাশ করে। এখন কথা হইতেছে, এই চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম, না আত্মার স্বভাব বা স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্য কূট তর্ক করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মা ও চৈতন্য উভয়কে অভিন্ন সত্তা না ধরিলে আর অন্য কোনরূপেই আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করা যায় না। আর এই অভিন্ন ভাব, ধর্ম্ম ধর্ম্মী সম্বন্ধে কখন সিদ্ধ হয় না। কেননা, শুক্লত্ব শুক্লের ধর্ম্ম নহে, উষ্ণতা অগ্নির ধর্ম্ম নহে, উহা তাহাদের স্বভাব। এইরূপে শঙ্করাচার্য্য এই শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে আত্মা নিত্য, চৈতন্যস্বভাব। সে যাহা হউক, এস্থলে আর শঙ্করাচার্য্যের এই সকল কূট তর্ক অধিক বিস্তারিত করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

যাহা হউক, এ সকল কথা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান ও চৈতন্য এক নহে। চৈতন্য দ্রষ্টা বা প্রকাশক। ইহা অন্তঃকরণকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ তিনরূপ ধর্ম্ম যুক্ত। এই তিনরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহাও এক অর্থে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও অনুভূতি অন্তঃকরণের এই তিন ধর্ম্ম। এই জন্য চৈতন্য আশ্রয়ে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব উদয় হইতে পারে। চৈতন্য ইহাদের সাক্ষী বা প্রকাশক মাত্র।

be the truth of nature, and the power in it." The phenomena or shadow of the noumena is as necessary as the shadow of light.

আমরা বেদান্ত-সম্মত ব্রহ্ম বা চৈতন্যপ্রবাহ হইতে প্রকৃত জ্ঞান উৎপত্তি-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য অনেক দার্শনিকের মত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। আধুনিক প্রধান দার্শনিকগণ যে ক্রমে বেদান্তদর্শনসিদ্ধ তত্ত্বে উপনীত হইতে আরম্ভ করিতেছেন, তাহা ইহা হইতেও একরূপ বুঝা যাইবে।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত, আর মানুষ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই জীব বা জীবধর্ম্ম যুক্ত। কিন্তু সকলেরই এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব সমানরূপে প্রস্ফুটিত হয় না। আবার সকল মানুষের জ্ঞানও সমান নহে। জীব মাত্রেই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। তবে তৃণাদিতে তাহা অব্যক্ত বা লুপ্ত, পশুতে তাহা সামান্যরূপে পরিস্ফুট, মানুষেই কেবল তাহা সমধিক পরিস্ফুট। মানুষের মধ্যেও কাহার জ্ঞান কর্ম্মবৃত্তির দ্বারা আবরিত, কাহার জ্ঞান সুখদুঃখানুভূতির আধিক্য হেতু আবরিত। জ্ঞানও সকল সময় প্রকাশিত থাকে না। সুষুপ্তিতে আদৌ তাহার প্রকাশ হয় না। স্বপ্নে শৈশবে বাতুলাবস্থায় তাহা আংশিকরূপে পশু জ্ঞানের ন্যায় কেবল সংস্কার মূলে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই জ্ঞান নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই জ্ঞান চৈতন্য নহে। চৈতন্য কেবল জ্ঞাতা ভাবেই অহং ইদং রূপ ধারণা করে। কেবল ইচ্ছা বা বাসনায় অধিষ্ঠিত অবস্থায়, চৈতন্যের এই জ্ঞাতা ভাব থাকে না—তাহাতে অহং ইদং ভাব বা জ্ঞান স্ফূর্ত্ত হয় না। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখন বাসনা অনিদ্রিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্য সম্পাদন করে। প্রাণশক্তি বা জৈব শক্তি কখন নিদ্রিত হয় না, তাহা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত থাকে। সুতরাং যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে চৈতন্য নাই; এ কথা বলা যায় না। সেখানে চৈতন্যের অভিব্যক্তি নাই, কেবল এই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। নিদ্রার অবস্থায় ও অজ্ঞান অবস্থায় চৈতন্যের কার্য্য আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। কেবল সংস্কার বা জড় শক্তির দ্বারা বা অন্ধ ইচ্ছা বৃত্তির দ্বারা তাহা বুঝিতে চেষ্টা [illegible] বৃথা। (১)

(১) জ্ঞান ও চৈতন্য এক নহে। চৈতন্যের বিকাশ দুই রূপে—জ্ঞানে ও অজ্ঞানে। অজ্ঞান—আমাদের বাসনা, আমাদের অন্ধ প্রবৃত্তি। জ্ঞান অন্তঃকরণের শেষ অভিব্যক্তি। প্রবৃত্তি বা বাসনাই জীবকে বদ্ধ করে, জীবের জীবত্ব দেয়। এই জন্য জগতে সর্ব্বত্রই এই বাসনা শক্তির ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই। আমাদের মধ্যেও এই বাসনা বা ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কাজেই আমরা আমাদিগকে এই বাসনাস্বভাব বলিয়া এক ভাবে মনে করিতে পারি। আমাদের বাসনা জ্ঞানবিহীন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চৈতন্য বিহীন নহে। বাসনা প্রবল হইলে জ্ঞান আবরিত হয়। জ্ঞান প্রবল হইলে আমাদের প্রবৃত্তি বা বাসনা অভিভূত হয়। আমরা সাধারণতঃ জ্ঞানেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি বুঝিতে পারি। জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত তাহার অজ্ঞান আবরণ মুক্ত হইতে থাকে। পূর্ণ জ্ঞানে ইচ্ছা বৃত্তি ও ভোক্তৃত্ব ভাব লোপ হয়, বাসনা সংস্কার সকলই দূর হয়। সুতরাং তখন পূর্ণ চৈতন্য প্রকাশিত হয়। চৈতন্য জ্ঞানের প্রকাশক, কেবল সাক্ষী। কেবল জ্ঞানবৃত্তি হেতু ইহা দ্রষ্টা। বাসনা বৃত্তির কার্য্য সম্বন্ধে চৈতন্য দ্রষ্টা হয় না। এই জন্য বাসনাকে অন্ধ বলা যায়।

উপরিউক্ত যুক্তি হইতে বুঝা যাইবে যে, জীবকে কেবল বাসনাস্বভাব বলা যায় না। একদিক্ হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আত্মা ও অন্তঃকরণ এক—এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, আত্মাকে বাসনাস্বভাব বা ভোগস্বভাব ইহার কিছুই বলা যায় না। অন্তঃকরণ ও আত্মা পৃথক্ এইরূপ ধরিলেই বলা যায় যে, আত্মা কেবল চৈতন্যস্বভাব, আর অন্তঃকরণ জ্ঞান ইচ্ছা ও ভোগ স্বভাব। চৈতন্যের বা আত্মার অধিষ্ঠান জন্যই অন্তঃকরণেই এই স্বভাব কার্য্যকরী হয়। নতুবা তাহা জড়—মৃতের শরীরের ন্যায় জড়। অন্তঃকরণেই এই স্বভাব, বাসনা ও কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও, সেই বাসনা ও কর্ম্ম নিয়মিত না হইলে, অথবা চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু তাহা কার্য্যক্ষম না হইলে, অন্তঃকরণবৃত্তির কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না।

চৈতন্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলে, চৈতন্য হইতে জ্ঞান প্রবাহ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে যে অন্তঃপ্রবাহের কথা বলা হইয়াছিল, তাহা অন্তঃকরণ হইতেই আরম্ভ হইয়া বিষয়াভিমুখে আইসে ইহাই বুঝান হইয়াছিল। তাহা হইতে যে শেষে মায়াবাদে আসিয়া পড়িতে হয়, তাহা বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু এই অন্তঃকরণ কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া তাহার উপরে গিয়া চৈতন্য কেন্দ্র ধরিয়া এই অন্তঃপ্রবাহ বুঝিলে কোন গোলযোগ থাকে না।

শক্তিবাদী পণ্ডিতগণ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর, হার্টম্যান্ প্রভৃতি আপন অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহারা অন্তঃকরণ মধ্যে অন্ধ বাসনা বা শক্তির ক্রিয়া মাত্র দেখিতে পাইয়াছেন, জ্ঞানবৃত্তি এই বাসনার একরূপ অভিব্যক্তি, ইহাও অনুভব করিয়াছেন। কাজেই ইহাঁরা আত্মাকে বাসনাস্বভাব বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্যই ইহাঁরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আত্মা চৈতন্যস্বভাব বা চৈতন্য ধর্ম্মযুক্ত নহে। পণ্ডিত Schopenheaur তাঁহার কৃত World as Will and Idea এবং Hartmann তৎকৃত Philosopy of the Unconscious নামক পুস্তকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একরূপে বলিতে পারা যায় যে, সাংখ্যদর্শনও এই জন্য ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে জীবত্বের মূল বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে মহর্ষি কপিলও এই প্রকৃতির অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও ভোক্তা আত্মা স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, উক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে Self-Consciousness বলিয়াছেন, তাহা চৈতন্য নহে। তাহাই জ্ঞাতা বা প্রমাতৃ চৈতন্য। ইহা চৈতন্যের একরূপ অভিব্যক্তি মাত্র। Unconscious Will ভাবে চৈতন্যের যে আরও একরূপ অভিব্যক্তি হইতে পারে, চৈতন্য যে এই জ্ঞান ও শক্তি বা অজ্ঞানের সমবায়, বা তাহার অতীত, তাহা এ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

এই জ্ঞান-মূল চৈতন্যই দ্রষ্টারূপে আমাদের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত। আর অন্য দিকে এই চৈতন্য ভোক্তা ও কর্ত্তারূপে (Unconscious will ভাবে) অধিষ্ঠিত। পূর্ণ দ্রষ্টা চৈতন্য স্বয়ং পরমেশ্বর, আর অপূর্ণ জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তারূপে অজ্ঞান বাসনা জড়িত অন্ধ জীব। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে, আমাদের অন্তরে দুই জন অধিষ্ঠিত। এক পূর্ণ চৈতন্য রূপে দ্রষ্টা পরমেশ্বর, তিনি ফল ভোগ করেন না। আর এক বাসনাবদ্ধ অন্ধ ফলভোক্তা জীব। এই জন্য উপনিষদে আছে—

কোন কোন দার্শনিক জ্ঞান ও চৈতন্যের আর একরূপে অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, ইহা চৈতন্যের ধর্ম্ম। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাতা নাই।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" (মুণ্ডক উপঃ ৩।১) এবং "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।" (কঠ উপঃ ৩।১)।

এই ফল ভোক্তা অন্ধ জীব চৈতন্য বা ব্রহ্ম চালিত। "স এব সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।" ইনিই সকলের হৃদ্দেশে থাকিয়া সকলকে পরিচালিত করেন। (গীতা ১৭।৬১)।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে ভগবদ্গীতায় এই তত্ত্বের আরও একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ঘন। সুতরাং চৈতন্য আনন্দ ও সৎভাব বা শক্তিরূপে অভিব্যক্তি তাঁহার স্বভাব। জীব ও ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মস্বভাব, সুতরাং জীব সচ্চিদানন্দময়। জীবাত্মার এই সৎশক্তি তাহার কার্য্য শক্তি, চিৎশক্তি তাহার চৈতন্য ও ভোক্তৃত্ব বা ভোগেচ্ছা তাহার আনন্দ। জীবমাত্রেই এই সকল শক্তি পরিছিন্ন। কোন জীবে বা ক্ষেত্রে এই তিনরূপ আত্মস্বভাব পূর্ণ বিকশিত হয় না, সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হয় না। তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদ্ চৈতন্য স্বভাব নহে, কেবল কার্য্যস্বভাব। চৈতন্য ও আনন্দ তাহাতে কূটস্থ অনভিব্যক্ত। নিম্নতর জীবে কার্য্য স্বভাব ও অনুভূতি স্বভাব উভয়ই আছে। কেবল মানুষ হইলে তবে জ্ঞানস্বভাবের বা চৈতন্যস্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। যাহা হউক, সে তত্ত্ব এস্থলে আলোচনীয় নহে।

জীব ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া ইহারও অন্তঃকরণে এই অনন্ত জ্ঞানের বিম্ব বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এবং তাহা হইতেই জীব জ্ঞান লাভ করে। অন্তঃকরণ মলিন দর্পণের ন্যায় মলাবৃত থাকিলে তাহাতে জ্ঞান উপযুক্ত রূপে প্রতিফলিত হয় না। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। (২) কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলে এই মত শঙ্করাচার্য্যেরই অনুরূপ, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ যাঁহারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে আমাদের জ্ঞানপ্রবাহ কল্পনা করেন, আমাদের চৈতন্যের অভিব্যক্তি সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তই অনেকটা শঙ্করাচার্য্যের এই চৈতন্যবাদের অনুরূপ। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন যে "সসাক্ষিক সত্ত্ববৃত্তিই অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ববৃত্তিই জ্ঞান নামে অভিহিত।" তিনি আবার বলিয়াছেন, জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। ইহা অপরিচ্ছিন্ন হইলে সর্ব্ব প্রকাশক হয়।" এই সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য।" এই জ্ঞানই চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞান নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবে বিভক্ত হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ই জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞেয় বিষয় তাঁহার মায়া নামক জগৎবীজ। সুতরাং বলিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ। তাঁহাতেই ও তাঁহা হইতেই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটী ভাব উদয় হইয়াছে। সেই ভাব জীবে উপহিত বলিয়া জীব ও এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটী ভাব আত্মচৈতন্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তি কালে বা যেই কালে জ্ঞান ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই কালে ধারণা করে। ব্রহ্ম হইতে বাহ্য প্রবাহ হেতু জ্ঞেয় পদার্থ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়, আর আন্তর প্রবাহ হেতু জ্ঞাতা সেখানে প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণে এই দুই প্রবাহের সম্মিলনে এই উভয় প্রতিবিম্ব সংযোগেই জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব একত্রিত হয়,—আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

আমাদের অন্তঃকরণেই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব একীভূত হয়। জ্ঞাতা এই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আসিতে গিয়া মলাযুক্ত হয়, অজ্ঞানাবৃত হয়। এই জন্য এই আন্তর প্রবাহ বা অন্তঃকরণ পথে জ্ঞান প্রবাহ দুইটী ধারায় বিভক্ত হয়। একটী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা অতীতে অর্জ্জিত স্মৃতি বা সংস্কার ও বাসনাজাত প্রবৃত্তির প্রবাহ। আর একটী—জ্ঞানের দেশকাল নিমিত্ত সীমাবদ্ধ থাকা হেতু তাহার মূল অজ্ঞান বা মায়া প্রবাহ। এই জন্য এই আন্তর প্রবাহ কালে জ্ঞাতা জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবাহে যে বাহ্য জগৎ প্রতিভাসিত হয়, তাহাকেই ইন্দ্রিয় পথে আগত বাহ্য প্রবাহে প্রতিফলিত বা তাহার সহিত একীভূত করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞেয় জগৎ উপলব্ধি করে। অন্তঃকরণ পথে আসিতে জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত হয় বলিয়া এই ব্যবহারিক জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, নহে। কিন্তু বাহ্য প্রবাহ ব্রহ্মশক্তিজাত বলিয়া তাহা অসত্যও নহে। তাহার কতক সত্য কতক অসত্য, তাহা সদসত্তাত্মক। যাহা হউক, সে তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নহে।

(২) ফরাসি দার্শনিক কুঁজের এই মত স্পাইনোজার এই মত। প্রাচীন উনানী দার্শনিকের মধ্যে কেহ কেহ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক বৈদান্তিক পণ্ডিত এইরূপ মতাবলম্বী।

আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে অন্তঃকরণকে দর্পণ স্বরূপ মনে করিতে পারি। ইহার দুই দিকে দুই প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এক প্রতিবিম্ব আর এক প্রতিবিম্বের আধার। এই উভয় প্রতিবিম্বের যোগেই জ্ঞান ক্রিয়া জন্মে। শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বাহ্যপ্রবাহ ও আন্তর-প্রবাহ—এ উভয় প্রবাহের সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। বোধ হয়, অন্য কোন দার্শনিকই এইরূপ পরিষ্কার করিয়া এ তত্ত্ব বুঝান নাই। বেদান্ত দর্শনেই কেবল ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানোৎপত্তি বা জ্ঞানপ্রবাহ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। আধুনিক জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিতগণও কতক পরিমাণে এই-রূপ জ্ঞানপ্রবাহ সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্যাণ্ট ইহাদের অগ্রণী। ইহাদের কথা এস্থলে আলোচনার আবশ্যক নাই।

যাহা হউক, বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানপ্রবাহ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা এস্থলে আবশ্যক। বেদান্ত মতে চৈতন্যস্বভাব আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। ইহারই প্রতিবিম্ব জীবের অন্তঃকরণে পতিত হয়। এস্থলে প্রতিবিম্বের অর্থ ছায়া নহে। অশরীরী পদার্থের প্রতি-বিম্ব শারীর পদার্থের অনুরূপ নহে। এই প্রতিবিম্ব শক্তিপ্রবাহ মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া উহা বুঝান যাইতে পারে। যদি কোন ধাতুময় তার দিয়া তড়িতপ্রবাহ পরিচালিত হয়, তবে তৎসন্নিকটস্থ অন্য তারেও তাহার প্রতিবিম্ব (induction) উৎপন্ন হয়। যদি এক সুরে বাঁধা দুইটী তারের মধ্যে একটীতে আঘাত করা যায়, তবে তৎসন্নিকটস্থ অন্য তারেও তাহার প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। ইহাই শক্তি প্রতিবিম্ব। ইহা জড় প্রতিবিম্বের অনুরূপ নহে। সেইরূপ চৈতন্য প্রতিবিম্বও জড় বা শক্তি প্রতি-বিম্বের ঠিক অনুরূপ নহে। যাহা হউক, যেমন ব্রহ্মচৈতন্য একদিক দিয়া জীবে প্রতিবিম্বিত, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তা শক্তিরূপে জগতে প্রকাশিত। ব্রহ্ম হইতে দুইরূপ প্রবাহ কল্পনা করা যায়। এক শক্তিপ্রবাহ আর এক চৈতন্য প্রবাহ। এই শক্তিপ্রবাহ তেজঃরূপে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ মণ্ডলে ঘনী-ভূত। সেইজন্য এই তেজঃ স্বপ্রকাশ স্বরূপ। আদিত্য প্রকাশিত হইয়া জগৎ প্রকাশ করেন। বাহ্য বস্তু সকল তাঁহারই তেজে রূপবান হইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকা-শিত হয়। অন্য দিকে সেই ব্রহ্মশক্তির আকাশরূপ বিকাশ হইলে, তাহার শব্দশক্তি প্রবাহ শব্দরূপে আমাদের কর্ণে প্রকাশিত হয়। এইরূপে ব্রহ্মই শক্তিরূপে স্বপ্রকাশিত। সেই শক্তি প্রবাহ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপে এই ব্রহ্মশক্তিজাত অন্তঃ-করণেই ব্রহ্মের বাহ্য শক্তিপ্রবাহ ও আত্মার চৈতন্য প্রবাহ পরস্পর প্রতিবিম্বিত হয়।

এই শক্তি প্রবাহ ঈশ্বরের জ্ঞেয় কাল্পনিক জগৎকে সৎরূপে পরিণত করে। ব্রহ্ম জ্ঞানে ও জীবজ্ঞানে যে প্রভেদ, তাহা সংক্ষেপে এইরূপে ইঙ্গিত করিতে পারা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয় তাহা নিত্য, ব্রহ্মের মায়া শক্তি বলে তাহা সৎরূপে পরিণত হয়। জীবের মায়া শক্তি নাই। জীব তাহার কাল্পনিক বিষয়কে সৎরূপে পরিণত করিতে পারে না। তাহা কল্পনা বা স্বপ্নরূপে কি ভোজবাজী রূপে রহিয়া যায়। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহাই সৎরূপে, জগৎরূপে পরিণত হয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞান, আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়, এজন্য, সেই জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, আমাদের জ্ঞানে

তাহাই আংশিকরূপে অজ্ঞানজড়িত হইয়া জ্ঞেয় হয়। তাহা ব্রহ্মশক্তি বলে সৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকটও সৎরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মে thought বা Idea এবং Being এক। জীবে তাহা সম্ভব নহে। ব্রহ্ম তাঁহার মায়াশক্তি বলে জ্ঞেয় জগতের যখন যেরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করেন, তাহাই জ্ঞাতারূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া লয়েন। এ কথা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সে যাহা হউক, এক্ষণে বাহ্য ও আন্তর প্রবাহের সম্মিলনে কিরূপ জ্ঞানপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বাহ্য-পদার্থে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া যদি সেই পদার্থের প্রতিকৃতি রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ যুক্ত কাচের উপর পতিত হয়, তবে সেই কাচে সেই বাহ্য পদার্থের আতপ-ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু তখন সেই ছবি প্রকাশিত হয় না। অন্য রাসায়নিক পদার্থ সংযোগে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। সেইরূপ আমাদের মস্তিষ্কের অন্ধকার গৃহে ইন্দ্রিয়পথে সৌরতেজাদি দ্বারা বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব নীত হইয়া অন্তঃকরণে প্রতি-ফলিত হয়। অথবা সেই সৌরতেজাদিই বাহ্য পদার্থরূপে সজ্ঘাত হইয়া এইরূপে প্রতি-ফলিত হয়। অন্তঃকরণ ইহাই গ্রহণ করে। কিন্তু অন্তঃকরণ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল তাহাতে যখন চৈতন্য প্রতি-বিম্ব পতিত হয়, তখনই সেই বাহ্য ছবি প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত অন্তঃকরণের যে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা তাহা বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, সেই ক্রিয়াও এই চৈতন্য অধিষ্ঠান হেতু উৎপন্ন হয়।

এইরূপে আদিত্য তেজরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকট জগৎ প্রকাশ করিয়া আমাদের বুদ্ধি বা জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত করেন। এই জন্য হস্তামলকে বলা হইয়াছে—

> "বিবস্বৎ প্রভাতং যথা রূপমক্ষং
> প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেবং বিবস্বন্
> তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ
> স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা।"

আর এই জন্য গায়ত্রীমন্ত্রে গীত হই-য়াছে যে, সবিতা দেব "ধীয়োয়োনঃ প্রচো-দয়াৎ।" শঙ্করাচার্য্য ঐ হস্তামলকের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "চক্ষুই বল আর সূর্য্যই বল, তিনি (আত্মা) সমুদায়ের প্রকাশক ও অধিষ্ঠাতা। শ্রুতিও এতদভিপ্রায়ে সূর্য্যকে বুদ্ধিপ্রেরক বলিয়াছেন।" (পণ্ডিত শ্রীকালী-বর বেদান্তবাগীশ-প্রণীত হস্তামলকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আর এই জন্যই হস্তামলকে সূর্য্যের প্রকাশের সহিত আত্মচৈতন্যের নানারূপে নানা জীবে বিকাশের তুলনা করা হইয়াছে।

আমরা আমাদের অন্তঃকরণ ক্রিয়ার আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের মস্তিষ্ককে রুদ্ধ গৃহের সহিত তুলনা করিতে পারি। আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, এই গৃহ-তাড়িত বার্ত্তার প্রধান কার্য্যালয়। বাহির হইতে নানা দিক্ দিয়া জ্ঞাননাড়ীরূপ তাড়িত তার আসিয়া এই গৃহে শেষ হই-য়াছে। সেখানে নানা প্রকার তাড়িত বার্ত্তাগ্রাহী যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহির হইতে তাড়িত তারপথে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিবলে, নানা প্রকার সংবাদ আসিয়া এই সকল যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যদি কোন কার্য্যালয়ে কেহ না অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই বার্ত্তা গ্রহণ করেন, তবে সকলই বৃথা। এই বার্ত্তাগ্রাহী ব্যক্তিই আমাদের আত্ম-

চৈতন্য। তিনিই রুদ্ধগৃহে বসিয়া সংবাদ লইতেছেন সংবাদ দিতেছেন। তিনি সেই সংবাদ সকল আপনার উপযোগী করিয়া আপনার শক্তি অনুসারে কল্পনা অনুসারে সাজাইয়া আপনার উপযোগী করিয়া লইতেছেন। কখন বা স্নায়ুপথে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে তদনুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, আবার অন্য দিকে এই শক্তি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এইরূপ নানাবিধ বাহ্যান্তর প্রবাহ হইতে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (১)

যাহা হউক, বেদান্ত সম্মত এই চৈতন্য প্রবাহ বুঝিবার জন্য আরও দুই এক স্থান হইতে এ তত্ত্ব উদ্ধৃত করিব। বেদান্তশাস্ত্রে আছে "যেমন প্রদীপ প্রভা সূর্য্য প্রকাশকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা কেবল বাহ্য অজ্ঞানের নাশ করিতে পারে। এবং ঘটাদির অজ্ঞান নাশ করিয়া তাহাদের প্রকাশিত করে।" শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যিনি দ্রষ্টার দ্রষ্টা, জ্ঞাতার জ্ঞাতা, তাহাকে জানা যায় না, তিনি জ্ঞানবৃত্তির অবিষয়।" শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনভাষ্যের অন্যত্র বলিয়াছেন "আমিজ্ঞান মনোবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। তাহা মুখ্য আত্মা নহে। আত্মা অহংবৃত্তির অবভাসক। 'অহং' আত্মার অবভাসিকা নহে। মুখ্য আত্মা অহং বৃত্তির অতীত।" (১৬৪) ইহা হইতে বুঝা যাইবে, কেবল অহং বা জীবজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তদর্শনে জ্ঞানপ্রবাহ কল্পিত হয় নাই। বেদান্ত দর্শনে কেবল চৈতন্য-প্রবাহই স্বীকৃত। আমরা বৈদান্তিক পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এই তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়া দেখাইব।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, বিষয় জ্ঞান লাভ কালে দ্রষ্টা বৃত্তিসারূপ্য লাভ করে।' (বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র, ১।৪) বিজ্ঞানভিক্ষু যোগসারে এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বুদ্ধিবৃত্তি প্রদীপের শিখার ন্যায়। এই শিখার অগ্রভাগে চিত্ত স্থির করিলে যোগে একাগ্রতা লাভ হয়। এই অগ্রভাগ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যার্থে বা বাহ্য বিষয়ে সংযুক্ত সেই

(১) আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যপ্রবাহকে প্রতিলোম ও আন্তর প্রবাহকে অনুলোম প্রবাহ বলা যাইতে পারে।

প্রতিলোম প্রবাহে বাহ্যজগতের বহুত্ব হইতে ক্রমে জ্ঞান একত্বের দিকে নীত হয়। সেইরূপ অনুলোম প্রবাহে একত্ব হইতে বহুত্বে গতি হয়। প্রতিলোম প্রবাহ অনুসারে কার্য্য হইতে কারণের সিদ্ধান্ত হয়, ব্যক্তিত্ব হইতে জাতিত্ব ধারণা হয়, বিশেষ হইতে সামান্যের ধারণা হয়। ইহা হইতেও একরূপে সিদ্ধ জ্ঞান ও ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়—ইহা এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ স্বীকার করেন।

সেইরূপ অনুলোম প্রবাহ অনুসারে কারণ হইতে কার্য্যের অনুসন্ধান হয়—জাতিত্ব হইতে ব্যক্তিত্বের ধারণা ও সামান্য হইতে বিশেষের ধারণা হয়। আমরা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দুই ভিন্ন প্রবাহ অবলম্বন হেতু দর্শনশাস্ত্রের গতি বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। বাহ্যজগৎ কেন্দ্র ধরিয়া প্রতিলোম প্রবাহ অবলম্বন না করিলে পদার্থ বিজ্ঞান আদৌ লাভ করা যায় না। অনুলোম যুক্তিতে বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের জড় ও শক্তির নিত্যতাবাদ (Conservaionn of matter and force) আমাদের দেশে সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কেবল অনুলোম যুক্তিবলে আবিষ্কার হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ তাহা প্রতিলোম যুক্তিবলে আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিষয়াকারে পরিণত হয়। গলিত তাম্র যে পাত্রে ঢালা যায় তাহা যেমন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, বুদ্ধিও সেইরূপ বিষয়াকার ধারণ করে। এই বুদ্ধি বিভক্ত বা বর্দ্ধিত (‘ভাগগুণযুক্ত’—সাংখ্যসূত্র ৫।১০৭) না হইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ জন্য অগ্রসর হয়। এই সময় বুদ্ধির অংশ অগ্রসর হয় না, সমগ্র বুদ্ধিই অগ্রসর হয়। ইহা বুদ্ধির ক্রিয়া, বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে। কেন না ক্রিয়া দ্রব্যের ধর্ম্ম নহে। সেই বৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া যাহা প্রজ্জ্বলিত বা দীপ্তিযুক্ত করে, সেই বিষয়েই প্রমাণ ফলে প্রমাজ্ঞান হয়। ইহাই দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য।”

ইহা ব্যতীত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে (প্রথম অধ্যায়ের ৮৭-৯৯ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য) বিজ্ঞানভিক্ষু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“প্রমাণের ফলই প্রমা। ইহা (জ্ঞান) আত্মার ধর্ম্ম হইলে বুদ্ধি বৃত্তিই প্রমাণ হইতে পারে। আর উহা বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলে বলিতে হইবে যে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষই প্রমাণ। (অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্ত মতে অন্তঃপ্রবাহই প্রমাণ, আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত মতে বহিঃ প্রবাহই প্রমাণ বা প্রমাজ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে।) পুরুষ কেবল এই প্রমাণের সাক্ষী মাত্র। প্রমাণ বৃত্তি উভয়কেই (বা উভয় প্রবাহকেই) প্রমা বলিলে উভয়ই অভেদ হয়।

“পাতঞ্জল যোগসূত্রভাষ্যে ব্যাস ‘আত্মনিষ্ঠ বোধকেই প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের বোধ নিত্য, উহা প্রমাণ ফল নহে, এইরূপ বলা যায় না। এস্থলে বোধ অর্থে জ্ঞানশক্তি, বোধ চৈতন্য নহে)।

“ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা অর্থ সন্নিকর্ষ অথবা লিঙ্গ জ্ঞান হেতু আদিতে যে বুদ্ধির অর্থাকার বৃত্তি জন্মে, তাহাতে যে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ বুদ্ধি হয়, তাহা ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বুদ্ধির আশ্রিত। চক্ষুতে পিত্তাদি দোষ জন্য, পিত্তাকার বৃত্তির উদয় হয়। অর্থের (বিষয়ের) উপরাগ বিশিষ্ট সেই বৃত্তি পুরুষেতে আরূঢ় হইয়া প্রকাশ পায়। ....সরোবরে তটস্থ বৃক্ষের প্রতিবিম্বের ন্যায় দর্পণস্বরূপ পুরুষে (আত্মায়) সমস্ত বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ব্যাস যোগভাষ্যে বলিয়াছেন, পুরুষই প্রতিবিম্বের আশ্রয়। পুরুষ কূটস্থ, অসঙ্গ, তাহার স্বতঃসিদ্ধ অর্থাকারতা নাই। পুরুষেতে স্বস্ব বুদ্ধি বৃত্তিরই প্রতিবিম্ব পতিত হয়। প্রতিবিম্ব বুদ্ধিরই পরিণাম বিশেষ।’ কেহ কেহ বলেন, চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি প্রকাশ করে। এবং সেই বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বই চৈতন্যের বিষয়। ইহা (মায়াবাদ) সঙ্গত নহে।

“বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্য ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিষয় হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিবিম্ব হইতে পারে। অর্থাৎ বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্ব ও চৈতন্যে বুদ্ধি প্রতিবিম্ব প্রসঙ্গ হয়। বাহ্য বিষয়ের অর্থাকারতা প্রযুক্ত সেই অর্থাকারতাই বিষয়।...... বিষয়তা অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ....প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে সত্তার নিরূপণ অসাধ্য। ......অতএব চৈতন্য ও অচৈতন্য এ উভয়ের পরস্পর বিষয়তা রূপই পরস্পরের প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ....প্রমাণকর্ত্তা চেতন ও শুদ্ধ; সেই প্রমাণ-কর্ত্তার যে বৃত্তি সেই প্রমাণ; এবং সেই প্রমার যে অর্থাকার বৃত্তি, তাহাই চেতনে প্রতিবিম্বিত। প্রতিবিম্ব বৃত্তির যে বিষয়, তাহাই অনুমেয়। সেই অনুমেয় যে দর্শন, তাহাকে সাক্ষীত্ব বলা যায়। যিনি বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই চেতন।

যোগবার্ত্তিকে আছে—

‘প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব চ।
প্রমাণাকারা বৃত্তিনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্।’

ভগবদ্গীতায় আছে—

‘যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।’

“প্রমাজ্ঞান পুরুষ সিদ্ধ। যে বিজ্ঞান কোন পদার্থের সম্বন্ধ হেতু সেই পদার্থের আকার ধারণ করে, সেই বিজ্ঞান, অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোন পদার্থ নিকটবর্ত্তী হইলে বুদ্ধি বৃত্তি সেই পদার্থের আকার ধারণ করে। এই বুদ্ধি বৃত্তিকেই প্রমাণ বলা যায়।

সাংখ্য দর্শনে আছে—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্।

(১।৯৯)।

"এই অন্তঃকরণ উপলক্ষিত পুরুষ (আত্মাই) জীব। সংকল্পাদি যাহা যে অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতৃত্ব তাহাই মুখ্য। ………অন্তঃকরণ ঘটাদির ন্যায় অচেতন হইলেও তাহা তপ্ত লৌহের ন্যায় চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলিত। অন্তঃকরণ সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। চৈতন্যের প্রতিবিম্বই অন্তঃকরণের উজ্জ্বলন; চৈতন্য অন্তঃকরণে সংক্রান্ত হয় না। সংযোগ স্বীকার করিলেও তাহা বুদ্ধি ও আত্মার পরস্পরের প্রতিবিম্বনের হেতু বলিয়া অভিহিত। বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বকেই চিৎশক্তি চৈতন্যাধ্যাস বা চিদাবেশ বলে।

"যোগভাষ্যে বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিৎ শক্তির পরিণাম নাই। উহা কোন বিষয়ে সংক্রান্ত হয় না। অথচ পরিণামী বিষয়ে সংক্রান্তের ন্যায় তাহার বৃত্তি পতিত হয়; এই চিৎশক্তি সেই বুদ্ধি বৃত্তির অনুকারী মাত্র। কেহ বলেন, বুদ্ধিগত চিচ্ছায় দ্বারা বুদ্ধির সর্ব্বার্থ জ্ঞাতৃত্ব। ইহা সঙ্গত নহে। আমাদিগের মতে, জ্ঞাতৃত্ব রূপে পুরুষের সিদ্ধির অনন্তর সেই পুরুষের জ্ঞেয়ত্ব হয়।"

উপরি উদ্ধৃত বিজ্ঞানভিক্ষুর মত হইতে চৈতন্য হইতে অন্তঃপ্রবাহ কাহাকে বলে, তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। বাহ্য প্রবাহবাদীগণ বিষয় হইতে প্রমাণ প্রবাহ আরম্ভ কল্পনা করেন। অন্তঃপ্রবাহবাদীগণ কেবল জীবজ্ঞান বা বুদ্ধি হইতে প্রমাণ প্রবাহ কল্পনা করেন। উভয় প্রবাহ-বাদীগণও এই বিষয় হইতে বাহ্যপ্রবাহ ও জ্ঞান বা বুদ্ধি হইতে অন্তঃপ্রবাহ এবং অন্তঃকরণে এই উভয়ের সম্মিলন হইতে প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ এই উভয় প্রবাহের সংযোগ কিরূপে হয়, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া, এই সংযোগের কারণ ঈশ্বর, অথবা এই উভয় প্রবাহের ঈশনিয়ন্তৃত্ব কল্পনা করেন। অবশেষে ইহা হইতেই চৈতন্যপ্রবাহবাদে উপনীত হওয়া যায়। এক অর্থ ধরিলে, এই চৈতন্য বা ব্রহ্মপ্রবাহবাদ অন্তঃপ্রবাহ বাদেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ অন্তঃপ্রবাহ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ, ইহাই পূর্ব্বে অন্তঃপ্রবাহবাদে সিদ্ধান্ত হইত। অথবা 'আমি' জ্ঞান বা জ্ঞাতারূপ কেন্দ্র হইতে তাহা বিস্তারিত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইত। ব্রহ্মপ্রবাহবাদে এই কেন্দ্র সরাইয়া আরও ঊর্দ্ধে লইয়া যাওয়া হয়, এই মাত্র। জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, সসীম। কিন্তু মূল জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন, অসীম, চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বা তাহা হইতে জীবান্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া জীব জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। এই জন্য এই অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য কেন্দ্র হইতে জ্ঞানপ্রবাহ সিদ্ধান্তকেই চৈতন্য বা ব্রহ্ম প্রবাহবাদ বলা যায়। তাহার পর এই ব্রহ্ম কেন্দ্র ধরিলে তাহা হইতে জ্ঞাতার মধ্যে দিয়া অন্তঃপ্রবাহ ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে দিয়া বহিঃপ্রবাহ, উভয় প্রবাহই সিদ্ধ করা হয়। উভয়ের অর্থাৎ বাহ্য বিষয় ও আন্তর বিষয়ী এ উভয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ তাহা হইতে সিদ্ধ করা যায়। ইহাই দর্শন শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। ইহার পর আর দার্শনিক যাইতে পারে না। তাহার প্রমাণ যুক্তি কল্পনা অনুমান—কিছুতেই আর ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। সকল দর্শনের মধ্যে কেবল বেদান্তদর্শনই এই শেষ সীমায় যাইতে পারিয়াছিল, এই জন্য বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য। আজ কাল কোন কোন জর্ম্মান দার্শনিক এতদূর আসিতে প্রায় সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় বৈদান্তিক। ইঁহারাই আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমরা যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যেমন প্রথমে বাহ্যকেন্দ্র ধরিয়া তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হয়, তেমনি বাহ্য প্রবাহ হইতে জ্ঞানের (অর্থাৎ প্রমা-জ্ঞানের) উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করা হয়। যখন 'আমি' কেন্দ্র হইতে দর্শনালোচনা আরম্ভ হয়, তখন অন্তঃপ্রবাহ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি-সিদ্ধান্ত হয়। শেষে যখন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হয়, তখনই কেবল প্রকৃত আন্তর প্রবাহের অর্থ বুঝা যায়, তখনই সেই বাহ্য আন্তর উভয় প্রবাহই প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয়, তখনই প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।

দর্শন শাস্ত্র প্রথম বাহ্যজগত লইয়া বাহ্য প্রবাহ ধরিয়া তত্ত্বালোচনা করিতে আরম্ভ করে। দর্শন তাহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। তাহা হইতে আপন সত্ত্বা এমন কি জগৎ সত্ত্বাও খুঁজিয়া পায় না। তখন কাজেই আন্তর জগৎ হইতে অন্তঃপ্রবাহ (জীবজ্ঞান হইতে) ধরিয়া তত্ত্বালোচনা করিতে দর্শনশাস্ত্র বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা হইতেও সেরূপ ফল হয়। ইহা দ্বারা বাহ্য জগৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়াবাদ আসিয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে। ইহা হইতে কি জগৎ কি আত্মা কি ব্রহ্ম কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। একটা ঘোর অন্ধকার আসিয়া জ্ঞানকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে। অজ্ঞেয়তার রাজ্য বড়ই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন দর্শন শাস্ত্র আবার হতাশ হইয়া অন্য জ্ঞানকেন্দ্র অনুসন্ধান করে। ধর্ম্ম শব্দ প্রমাণ বা আপ্ত প্রমাণ তখন তাহার সম্মুখে ব্রহ্মকে আনিয়া—আত্ম চৈতন্যকে আনিয়া উপস্থিত করে। দর্শন শাস্ত্রে তখন অগত্যা সেই কেন্দ্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেই কেন্দ্র ধরিয়া অনুলোম যুক্তি বলে তখন দর্শন শাস্ত্র অন্তঃপ্রবাহ বহিঃ-প্রবাহ আলোচনা করে। তখন সকল গোল-যোগ দূর হয়, সকল সন্দেহ নিবারিত হয়। তখন একটা শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। তখন জীব ও জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব তত্ত্ব অতি পরিষ্কার রূপে প্রতিষ্ঠাত হয়। তখন জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সকল অন্ধকার ঘুচাইয়া দেয়।

এই অবস্থায় জ্ঞান একরূপ মুক্ত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পড়ে। দর্শন শাস্ত্র তাহার রাজ্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়। কিন্তু তাহার পারে যে রাজ্য আছে, তাহা জ্ঞানাতীতের রাজ্য। জ্ঞান যাঁহার জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যাঁহা হইতে উদ্ভূত, সেই জ্ঞানাতীত চৈতন্যের রাজ্য। জ্ঞান স্বয়ং প্রমাণ সেতু দিয়া জ্ঞান পার হইয়া সেই রাজ্য যাইতে পারে না। সেই পূর্ণ একত্বের রাজ্যে অহং ইদং নাই, জ্ঞাতা জ্ঞেয় নাই, তৎ ত্বং নাই, চেতন অচেতন নাই, জীব ব্রহ্ম ভেদ নাই, ব্রহ্ম জগৎ ভেদ নাই, সেখানে সকল ভেদ শেষ হয়, সকল বন্ধন দূর হয়। সেখানে সদসৎ নাই, পাপ পুণ্য নাই, সত্ত্বা অসত্ত্বা নাই, ইঁহা 'নানা' বা 'নেতি' 'নেতির' রাজ্য, তাহা বাক্য মন জ্ঞানের অগোচর রাজ্য, দর্শনের অতীত রাজ্য, তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম রাজ্য। তাহা জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের অতীত নিত্যজ্ঞান বা চৈতন্যের রাজ্য। সেখানে বাহ্যা-ভ্যন্তর নাই, সুতরাং জ্ঞাতা জ্ঞেয় নাই সক-লই অভেদ। এই রাজ্যে প্রবেশ করার নামই মুক্তি। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে এই মুক্তি হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অদ্বৈতজ্ঞান হইলে প্রমাণাদি, প্রমাণাদির বিষয়" অর্থাৎ প্রমেয় আদি, এবং প্রমাতা—এ সকল কিছুই থাকে

না, "ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষয়ও লুপ্ত হয়"। (১৫১ পৃঃ) এই জন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "যখন ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?"

কিন্তু এ রাজ্যে দর্শনের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যিনি দ্রষ্টার দ্রষ্টা, জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাঁহাকে জানা যায় না। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান বৃত্তির অবিষয়। (১১পৃঃ) এজন্য ইহা দর্শন শাস্ত্রের অতীত রাজ্য। সে রাজ্যও আমাদের জ্ঞান রাজ্য মধ্যে অনন্ত ব্যবধান রহিয়াছে। কেবল জ্ঞান-তরির আশ্রয়ে, কেবল তর্ক যুক্তি দ্বারা, কেবল প্রমাণ-জনিত প্রমা জ্ঞান দ্বারা, দর্শন শাস্ত্রের সহায়ে সেই অনন্ত ব্যবধান সাগর পার হওয়া যায় না। জ্ঞান বা দর্শন কেবল ইঙ্গিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দুর্ভেদ্য কুহেলিকার মধ্যে দিয়া সেই জ্ঞানাতীতের রাজ্য সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দর্শন সেই রাজ্যে যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারে না।*

এই জন্য কেবল শুষ্ক প্রমাণ বা জ্ঞান-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন দার্শনিকই মূল-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। মূলতত্ত্ব ব্রহ্ম। সেই অদ্বৈততত্ত্ব কিরূপ, তাহা দার্শনিক বলিয়া দিতে পারে না। দর্শন প্রমাণ অবলম্বনে নিজ রাজ্যের শেষ সীমায় গিয়া সেই তত্ত্বের আভাস পায়, তাহাতে প্রবেশের পথ পায় না। কেবল প্রমাণ বলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাব অতিক্রম করা যায় না—করিতে গেলে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অন্ধকারে পড়িতে হয়। তবে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, সে রাজ্যে যাইবার পথ আছে। সে পথ কি, তাহা পরে আভাস দিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রমাণ-তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

সপ্তভূম।

(অবশিষ্টাংশ।)

সপ্তভূমের সম্যক বর্ণনা করা সুকঠিন; মাসিক পত্রের প্রবন্ধে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিকের ন্যায় ক্রমান্বয়ে সকল কথার বিবরণ দিতে গেলে লেখক এবং পাঠক উভয়েই ক্লান্ত হয়েন। দলমা পাহাড়ে গিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি। সপ্তভূমের দলমা পাহাড়ের এই ভয়ঙ্কর স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা জানিবার বিষয়, সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ পদার্থের নাম "খেড়া।" খেড়া চেতন পদার্থ এবং জীব বিশেষ; মনুষ্য মাত্রই প্রাণী, কিন্তু প্রাণী মাত্রেই মনুষ্য না হইলেও খেড়া মনুষ্য জাতীয় জীব। খেড়ারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ;

---

* If however positive knowledge cannot be attained of that which philosophy only expresses negatively as denial of the will, there should be nothing for it but to refer to that state which all those who have attained the complete denial of the will have experienced, and which have been variously denoted by the name of ecstasy, rapture, illumination, union with God and so forth,—a state however which cannot properly be called knowledge, because it has not the form of subject and object and is moreover only attainable in our own experience, and cannot be further communicated.

In philosophy we must be satisfied with negative knowledge.

Schopenheaur's World as Will and Idea, Vol. I. Page. 71.

আপাদমস্তক উলঙ্গ; ত্রিবাঙ্কুর, আসাম, হিংগলাজ প্রভৃতি প্রদেশে অর্দ্ধোলঙ্গা স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই পাহাড়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক এতদুভয়েই বস্ত্র ব্যবহার করে না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুতেই ইহারা উলঙ্গ; সমস্ত জীবনেই উলঙ্গ। বস্ত্র-পরিহিত লোক দেখিলে ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও আতঙ্কিত হইয়া পলায়ন করে। অনাবৃত বলিয়া স্ত্রীলোক বা পুরুষের লজ্জা জ্ঞান নাই; অপর কোন বিষয়েও লজ্জা জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ চুল রাখিতে বড় ভালবাসে, যাহার চুল যত বড় হয়, সে তত সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিতা হয়। শুষ্ক বৃক্ষ পত্র ইহাদের শয্যা, পত্র সমূহকে এমত সুন্দর কৌশল সহকারে গ্রথিত ও সংযোজিত করা হয় যে, ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহা শয্যার মত বিস্তৃত করিতে পারে, আবার গুটাইয়া রাখিতে পারে। পুরুষেরা মাথার চুল রাখিতে ভালবাসে না; দলপতি ও গুরু বা পুরোহিত ভিন্ন পুরুষের মধ্যে মাথায় প্রায়ই অনেকে চুল রাখে না। মাথার চুল কাটিবার জন্য ক্ষৌরকার বা কাঁচি প্রভৃতির প্রয়োজন নাই; এই পাহাড়ে একপ্রকার লতা জন্মে, তাহার পাতা জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া মাথায় লেপিয়া রাখিলে অল্প সময় মধ্যে সমস্ত মাথাটী কেশ-বিহীন হইয়া পড়ে। ঐ লতার অনুসন্ধান জন্য আমার সাঁওতাল-পথপ্রদর্শকদিগকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের সুবিধা হয় নাই। খেড়েদিগের গুরু ঐ লতা আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের যে ব্যক্তি দলপতি বা গুরু, কেবল তাহারই লম্বা চুল দেখিলাম, সে কথা পরে বলিব। খেড়েদিগের বর্ণ শাদা; ইংরেজ পুরুষ শরীরের কাপড় খুলিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে যেরূপ শ্বেত দেখি, খেড়ের দেহের শ্বেতবর্ণ সেরূপ নহে; ইংরেজের শাদা বর্ণে তমোগুণের পরিচয় পাই, খেড়ের দৈহিক শ্বেত বর্ণে স্বত্বঃ গুণের আধিক্য। অগ্নিদগ্ধ নিষ্কলঙ্ক রজতের ন্যায় খেড়ের বর্ণ শুভ্র এবং পবিত্র। খেড়েদিগের সকলেই বড় বড় গুহায় বাস করে। মাটীর ভিতরেই ইহাদের বাস। যখন ইহারা শিকারোদ্দেশে কিম্বা বনের ভিতর অথবা অপর কোন স্থানে গমন করে, তখন ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে খুব গভীর গহ্বরের ভিতর রাখিয়া যায়। ঐ গহ্বরের উপরে পাথর চাপা থাকে। সেই পাথরের মধ্যস্থিত এক ছিদ্র দিয়া এক দড়ি বাঁধা হইয়া থাকে, সেই দড়িটী নিকটস্থ কোন বৃক্ষের শাখা বা অপর কোন পদার্থে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহাতে শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি আসিয়া ছেলেদিগের প্রাণ নাশ করিতে পারেনা। গুহার আর একটী ছিদ্র দিয়া বায়ুর প্রবেশ ও নিঃসরণ হয়। ছেলেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এই বনে ও পর্ব্বতে দলে দলে অসংখ্য হস্তি ও হস্তিনী বাস ও বিচরণ করে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কখনও কোন শিশু বা বালকের অপহত্যা হয় নাই। মাতঙ্গীগণ ছেলেদিগকে খুব ভালবাসে, ছেলেদিগকে প্রতিপালন করে, একথাও শুনিয়াছি। সর্ব্বত্রই নানা জাতীয় বিষাক্ত সর্প বিশেষতঃ অজগর সর্পের প্রচুরতা, কিন্তু খেড়ের সম্মুখে সর্প নামক জীব রজ্জু ভিন্ন আর কিছু নহে। সর্প ইহাদের সম্পূর্ণ বশীভূত; কদাচ কাহাকে বিষধর দংশন করিলেও সে মৃত হয় না,

ইহাদের নিকটে সর্পদংশনের অব্যর্থ মহৌষধি আছে, তাহা যমজ লতা বিশেষ। খেড়েদিগের নিকটে বড় বড় অজগর সর্পের বড় বড় চর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়; কোন চর্ম্ম এত বড় যে, দুই জন বিপুলবপুর পুরুষ অনায়াসে তাহাতে শয়ন করিতে পারে। ইহাদের গুরুর আসন ও শয্যা সর্পচর্ম্ম। আমার সহিত ইহাদের দলপতি বা গুরুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল; প্রবৃদ্ধ গুরুর মাথার শাদা চুল প্রায় জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; শুভ্র শ্মশ্রু বক্ষস্থলকে স্পর্শ করিয়াছে, গোঁপ অতি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ শাদা। বৃদ্ধ বয়সেও ইহার বর্ণ অতি সুন্দর! ইঁহাকে দেখিলে প্রাচীন বৈদিক মহর্ষি বলিয়াই বোধ হয়। ইনি গুহার মধ্যে বাস করেন; শুনিলাম, বৎসরের মধ্যে কেবল একদিন মাত্র ঐ গুহার বাহিরে আসেন। গুহার ভিতরে বড় ঝরণা দেখিয়াছি। গুরুজি আমাকে কয়েকটী দ্রব্যও উপহার দিয়াছিলেন। খেড়েদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদিগের বিবাহ-ক্রিয়া সভ্য ও শিক্ষিত হিন্দুর বিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। ইহাদের সমাজে পূর্ব্বরাগ (Courtship) প্রচলিত নাই। ইহারা এই প্রথার খুব বিরোধী। পূর্ব্বরাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বুঝিলাম, ইহারা এরূপ বিবাহকে ভাল বিবেচনা করে না। খেড়ের স্ত্রী ব্যভিচার বা অসতীত্ব আদৌ জানে না। খেড়েদিগের মধ্যে পূর্ব্বরাগ বা বিবাহের স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহাদের সমাজ এতদিন বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। বাস্তবিক, প্রকৃতির নিয়মানুসারে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, লতা সমূহ ক্রমাগত সরল বা বক্রভাবে অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বপ্রথমে যে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সেই আশ্রয়ের উত্তমত্ব বা অধমত্বের অথবা গুণ বা দোষের বিচার করিয়া সেই আশ্রয়কেই অবলম্বন করে এবং তাহা কণ্টক-সমাকুল দুর্গন্ধোৎপাদক "উপাস" বা বর্ব্বূল বৃক্ষ হইলেও তাহাকেই বেষ্টন করিয়া স্থির হয়। যৌবনোন্মুখাবস্থায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের "প্রেম" ঠিক লতার ন্যায়, যাহাকে প্রথমে "চক্ষে" দেখে, তাহাতেই মিশিয়া যায়; বয়স, বংশ-মর্য্যাদা, গুণ, চরিত্র, শিক্ষা প্রভৃতির সন্ধান লইবার অবসর থাকে না; অধমত্বের দিকেও অন্ধ হইয়া যায় এবং দিক্‌বিদিক জ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে। অনেকে লজ্জার মাথা খাইয়া কুলে শীলে জলাঞ্জলি দেয়, ইহা বিদেশীয় কোর্টসিপ প্রথার অনুকরণ ও অনুসরণের ফল। সুবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত মাতা পিতা বা অভিভাবকেরা "নির্ব্বাচন" করিয়া দিলে, নির্ব্বাচন প্রায়ই ভাল হয়। বিদেশী লোক দেখিলে খেড়েরা অবশ্য প্রথমে ভীত এবং কখনও কখনও লজ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই লজ্জার ইংরাজি প্রতিশব্দ Ashamed নহে, ইহা Shy নামে খ্যাত, হিন্দি ভাষায় ইহা "শরম্" নহে বরং "লাজ" বলিয়াই অভিহিত হইতে পারে। আলাপ পরিচয় হইয়া গেলে, ইহারা প্রাণের বন্ধুর মত ব্যবহার করে, কিন্তু প্রথমে সহজে সখ্যতা স্থাপন করে না। মিলিয়া মিশিয়া গেলে ইহারা খুব সখ্যতা করে; ইহাদের সখ্যতার অণুমাত্রও কপটতা বা দ্বৈধ ভাব নাই।

"কালুর পিরিতি, বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ।"

এই ভাবের ব্যবহার বা এই ভাবের বন্ধুত্ব

ইহারা জানে না। ইহাদের ভাষার কোন কোন শব্দ সংস্কৃতের সহিত দূর সম্পর্কে সম্পর্কভূত হইলেও এই ভাষা অতিশয় কর্কশ। আরব্য ও হিব্রু ভাষার উচ্চারণের সহিত কতকটা মিলিতে পারে। খেড়েদিগের ধর্ম্ম কি, তাহা সহজে বুঝা যায় না; বাহ্যিক ব্যবহারে জড়োপাসক বলিয়াই বোধ হয়। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির দিকে দাঁড়াইয়া সময়ে সময়ে মস্তক অবনত করে; কখনও কখনও তাহাদের ভাষায় স্তোত্রের আবৃত্তি করে, উচ্চারণ ঠিক যেন বৈদিক সংস্কৃতের সহিত কিয়দংশে মিলে! ইহাদের নির্ম্মল চরিত্র নিষ্কলঙ্ক দেহের উপযোগী; মূর্ত্তি যেমন ঋষির ন্যায়, চরিত্রও তেমনি ঋষির মত। সরলতা, সততা, শান্তি, প্রীতি ও মৃদুমধুর হাস্য ইহাদের সহচর; খেড়ায় খেড়ায় কখনও বিবাদ হইয়াছে, একথা শুনা যায় নাই। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই নির্ম্মল ঝরণা। ইহারা সন্ধ্যা হইতে দিন গণনা করে; এক শত দিনে একমাস হয় অর্থাৎ একটা ঋতু একটা মাস, সেই হিসাবে চারি মাসে এক বৎসর হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ইহারা সম্বাদ রাখে; গ্রহণের দিনে উৎসব হয়। এই পাহাড়ের সর্ব্বত্রই খেড়ের বাস. কিন্তু লোকসংখ্যা ঠিক কত, তাহা জানি না। দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কাষ্ঠও খুব প্রচুর। ইহাদের মৃত দেহের সমাধি হয়। দুগ্ধ, ফল, মূল, কন্দ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। মাংসও ইহারা খুব খায়, কিন্তু মৃত পশুর মাংস খায় না; তীর ধনু, যষ্টি, কুঠার প্রভৃতির দ্বারা শিকার করিয়া যে পশুকে ধরে বা মারে, তাহারই মাংস খাইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য খাইতে খুব ভালবাসে, কিন্তু মৎস্য সহজে পাওয়া যায় না। খেড়েরা গোমাংস বা নরমাংস বা মহিষ মাংস ভক্ষণ করে না। স্ত্রীলোকগণের মাথায় লম্বা চুল থাকে; দেহের প্রতি বিশেষ যত্ন না থাকিলেও ইহারা খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং ইহাদের মাথার চুল অতীব চিক্কণ ও অতীব সুন্দর। এমন রূপবতী স্ত্রীলোক খুব কমই দেখা যায়; বালিকাগুলি যেন সত্যসত্যই বনফুল। ইহাদের সকল স্ত্রীলোকই সুন্দরী, কিন্তু এক একটী স্ত্রীলোক এমনই রূপবতী যে, য়িহুদি বা আর্ম্মেণীয় রমণীও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে লজ্জায় অবনত, মস্তক হইতে পারে। স্ত্রীলোক বা পুরুষ কেহই বনের বাহিরে আইসে না। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও সাধ্বী, সরলা এবং সত্যবাদিনী। পুরুষেরা পরিচয় করিয়া দিলে আগন্তুক ব্যক্তিকে স্ত্রীলোকেরা ভ্রাতৃবৎ প্রেমে আলিঙ্গন করে। দুই চারি দিবস থাকিলে ইহাদের দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, সৌজন্যতা প্রভৃতি দেখিয়া সত্যসত্যই বলিতে ইচ্ছা হয়, ইহারাই যেন বাস্তবিক

"প্রেমের প্রতিমা,
স্নেহের সাগর,
করুণা-নির্ঝর,
দয়ার নদী।
হতো মরুময়
সব চরাচর
না থাকিতে তুমি
জগতে যদি।"

স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েই খুব পরিশ্রমী। ইহারা মাংসাশী হইলেও নিরামিষাশীকে বড় ভালবাসে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরামিষাশী আছে। বনজাত মৌয়া প্রভৃতি ফুল বা ফল হইতে ইহারা মদ্য প্রস্তুত করে এবং সেই মদ্য খুব পান করে। সাঁওতালেরা সর্পমাংস, গোমাংস, শুকর মাংস, মহিষ মাংস

প্রভৃতি আহার করিয়াও হিন্দুর নিকটে বেদ পুরাণ, রাম বা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিলে শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। খেড়েরা গো-মাংস, শুকর মাংস প্রভৃতি না খাইয়াও এবং ফল মূলপ্রিয় হইয়াও হিন্দুর ধর্ম্মের কথা শুনিতে আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করে না। ইহাতে একটা হাসির কথা মনে পড়িল। সুপ্রসিদ্ধ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যখন মেদিনীপুর জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া বলিতেন, "বড় হাস্যের বিষয় এই যে, আমরা (আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা) প্রায় সকলই খাই, সকলই করি, কিন্তু বেদ বেদান্ত ঋষি মুনি মানিয়া থাকি এবং বিবাহের সময়ে জাতি-ভেদ প্রথাও অনেকাংশে মান্য করি, কিন্তু কেশব বাবু (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা) স্বহস্তে পাক করে, নিরামিষ খায় অথচ বেদ বেদান্ত এবং জাতিভেদের ঘোর-তর বিপক্ষ !!

ছোটনাগপুরে শুনিয়াছিলাম, পূর্ণিমার রাত্রে খেড়েদিগের উৎসব হয়। যাহাতে পূর্ণিমায় ইহাদের উৎসব দেখিতে পাই, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াই দলমা পাহাড়ে পৌঁছিয়াছিলাম। ঐ রাত্রে খেড়া পুরুষ ও খেড়া স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্য গীত করিয়াছিল। গানের ভাষা ও অর্থ বুঝি নাই, আমার সাঁওতাল-দ্বিভাষীগণও (Interpreters) ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। গানের ভাষা কর্কশ, কণ্ঠস্বর খুব কোমল বা মধুর নহে। ভীল বা সাঁওতালদিগের ন্যায় ইহারা মাদোল ব্যবহার করে না, স্ত্রীলোকেরা দুইটা অনতিবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড (কাটি) হাতে লইয়া ঠকঠক করিয়া বাজাইতে থাকে এবং পুরুষেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য ও গীত করে। পুরুষের গানের সুর শুনিলে সেকালের তর্জ্জা-ওয়ালাদের গানের সুর মনে পড়ে।

"ওরে খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং
কার্ হাঁড়িতে ভাত খেয়েছিস্
ভেঙ্গে দিয়েছে ঠ্যাং
খোঁড়া ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং ॥"

স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত কোমল এবং অপেক্ষাকৃত মধুর। ইহাদের গান শুনিলে, চব্বিশ পরগণার পল্লীগ্রামের সেকালের যাদিগানীদিগের ঝুমুরের গান-স্মরণ হয়।

দলমা পাহাড়ে দ্বিতীয় কৌতুকাবহ পদা-র্থের নাম "দেবধান"; ইহা চেতন পদার্থ নহে, ইহা অচেতন। ইহা একপ্রকার ধান্যবৃক্ষ, ধান গাছ নহে; এত বড় ধান্যবৃক্ষ পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও জন্মে না, কিন্তু দলমা পাহাড় ভিন্ন আর কোথাও এই বৃক্ষ দেখি নাই। অনেকে বলেন, প্রাচীন কালে পর্ব্বতজাত এই ধান্য দেবতা ও ঋষিদের দ্বারাই ব্যবহৃত হইত। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রা গাহিয়াছিল—

"যদি আরশুলা বিহঙ্গ হয়, তবে ধানগাছ তরু।
যদি জোনাকী সূর্য্য হয়, তবে বেশ্যা হবে গুরু।"

দুঃখের বিষয়, "মজার কবি ময়রা ভোলা" জীবিত নাই। যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এই বনের ভিতরে এই পাহাড়ে তাহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া এবং এই দেবধান দেখাইয়া দিয়া বলিতাম, "ধানগাছ তরু কিনা দেখ দেখি ?" বাস্তবিক, এমন আশ্চর্য্য ধান্যতরু আর কখনও দেখি নাই। গাছের মূর্ত্তি ঠিক ইক্ষুবৃক্ষের ন্যায়, কিন্তু উচ্চতায় বড় বড় নারিকেল বৃক্ষের মত। ইহা আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে;

আসামের "বোকা" ধানের মত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে।* গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিলেও ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে না; খর্জ্জুর বৃক্ষের সর্ব্বপ্রথমে যখন ফুল হয়, তখন তাহা দেখিতে যেমন, দেবধান ও প্রায় তদ্রূপ। খেড়ারা এই ধানের প্রশংসা করে না এবং ইহা প্রিয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করে না।

দলমা পাহাড়ের তৃতীয় কৌতুকাবহ পদার্থের নাম "উষ্ণ-প্রস্রবণ।" পাহাড়ের যে বৃহতী গুহায় খেড়াদিগের গুরুর আশ্রম, তাহারই প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে (পাহাড়ের অপর অংশে) এক খুব বড় উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহা এত উচ্চ এবং উহার জল এত প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয় যে, উহাকে দেখিলে রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের জলপ্রপাতকে স্মরণ হয়। এই প্রস্রবণের জল খুব গরম, হস্ত দ্বারা সহজে ইহা স্পর্শ করা যায় না এবং শীতল না হইলে ইহা পান করা যায় না। এই জলে গন্ধকের গন্ধ আছে, পান করিবার সময় কিঞ্চিৎ কষায় বলিয়া বোধ হয়। সকল ঋতুতেই দিবারাত্রি বিকট শব্দ সহ এই প্রস্রবণের উষ্ণ জল নিঃসৃত হইয়া নীচে দিয়া বহিয়া যাইতেছে। জলে চাউল, বেগুণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলে তাহা অতি অল্প সময়ে সুসিদ্ধ হইয়া যায়। প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ঐ উষ্ণ জল একত্রিত হইয়া এক প্রকাণ্ড উষ্ণকুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকে বলে, এই জল ব্যবহার করিলে অম্লশূল, অজীর্ণ, পুরাতন জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ আরাম হইয়া থাকে।

দলমা পাহাড়ে আরও অনেক পদার্থ দেখিবার আছে; প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে, এই জন্য এই স্থানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

* আসামের বোকা ধানের বিবরণ এই প্রবন্ধে দিলাম না। এবারে "সপ্তভূম" প্রবন্ধের সমাপ্তি হইল, ইহার পরে "কামাখ্যা শৈলে" নামক এক অধিকতর কৌতুকাবহ ও অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইবে। ঐ প্রবন্ধের রচনা শেষ হইয়াছে। উহাতে বোকা ধানের বিবরণ দেখিবেন। লেখক।

সাহিত্য ও সমাজ।

জাতীয় ভাষাই জাতি বিশেষের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতির, এমন কি, জাতীয় জীবনের রুদ্ধপ্রাসাদের একমাত্র দ্বার স্বরূপ। হিন্দু বল, মুসলমান বল—ইংরাজ বল, ফরাসী বল—সকল জাতির জীবনেই উন্নতির এক একটী সময় লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদিগের জাতীয় ভাষার ইতিহাসেই সেই উন্নতির চিহ্ন অভিব্যক্ত—পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান। তাহাদিগের জাতিগত ধর্ম্মচিন্তা ও সূক্ষ্মতত্ত্ব চিন্তা, তাহাদিগের শাসনপ্রণালী ও বিধিনিয়ম, তাহাদিগের রীতি নীতি ও সামাজিক জীবন—এই সমস্তই সেই জাতীয় ভাষায় বর্ণিত। তাই ভাষাই জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রবেশ পথ। "বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাব দলিত হয়।……যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ নষ্ট করেন, তাহাতেই দৃষ্ট হইবে, বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুশাস্ত্রের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। 'রাজা দশরথের দুই পুত্র এবং এক কন্যা—পুত্র রাম

ও লক্ষণ এবং কন্যা সীতা (!!)। রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করেন (!!)। ইহা শুধু রামায়ণের বিকৃতি নহে, ইহা দ্বারা সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছিল, তাহারও আভাস পাওয়া যায়।" * তাই বলিতে-ছিলাম, সমাজ ও সাহিত্যে বড় নিকট সম্বন্ধ। একটীকে বুঝিলেই আর একটী বুঝিবার পথও অনেকটা সহজ হইয়া আইসে।

সমসাময়িক দুইটী জাতি শাসন-প্রণালী বা সামাজিক নিয়মের সামান্য মাত্র ভেদে, প্রত্যক্ষ ভাবে পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও যদি তাহাদিগের ভাষার সাহায্য থাকে,তাহা হইতেই তাহারা অতিশয় নিকট আত্মীয়। † ধর্ম্মের সাদৃশ্যেও তাহাদিগের এত নৈকট্য হইতে পাবে না। তাই বলিয়া মাতৃভাষা এক হইলেই যে কোন জাতি বিশেষের সকল ব্যক্তিই ঠিক একই রকম হইবে, ইহা বলা যায় না।

আপন আপন জাতীয় শব্দভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধামত বা ইচ্ছামত রত্ন বাছিয়া লইয়া থাকে এবং তাহার দৈনন্দিন জীবনে সেই সকল রত্নের অবাধ স্বাধীন ব্যবহারে প্রবৃত্ত। ইহাই তাহার আপনার কথিত ভাষা।

"লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও, সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়।......যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার......প্রভেদ বাড়িল, তখন কথিত পালি ভাষা, কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া, লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ বেশী হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল।" *. শুধু বাঙ্গালা বা সংস্কৃত বলিয়া নহে, প্রায় সকল দেশেরই লিখিত ও কথিত ভাষার ভিতর অনেক প্রভেদ। তবে বাঙ্গালায়, লিখিত ও কথিত ভাষার ভিতর যত প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত দৃষ্ট হয় না।

সে যাহা হউক,যেখানে লজ্জার বাধা নাই, অনুশাসন বা ভয়ের বাধা নাই, সেই খানেই আমরা প্রাণ খুলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা যে কার্য্যটী ভালবাসি, যে কথাটী ভালবাসি, যে নামটী ভালবাসি, — বাধাবন্ধনবিহীন হইলেই আমরা নিঃসঙ্কোচে সেই কার্য্য বা সেই কথা বা সেই নাম ভাষার দ্বারায় প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহা হইতেই বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, মনুষ্য বিশেষ, বা সম্প্রদায় বিশেষ বা জাতি বিশেষের ভাষায় (কথিত এবং লিখিত) অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলেই তাহার বা তাহাদের হৃদয়ের দ্বারও মুক্ত হইয়া যায়—আমরা তাহাদিগের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি। তাই বেন জন্‌সন্ বলিয়াছেন, ভাষাই মনুষ্যের চরিত্র-প্রদর্শক। †

অনেক স্থলে এমন দেখা যায় যে, শাসিতের জাতীয় ভাষার অনুশীলন এবং

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—প্রথমভাগ।

† "To speak the same language constitutes a closer union than to have drunk the same milk ;" Max Muller.

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—প্রথমভাগ।

† Langnuage most shows a man
No glass renders a man's form and likeness so true as his speech.

পরীক্ষা করিলেই শাসকের অত্যাচার বা সদ্ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি কোন রাজা কোন জাতি বিশেষের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া অত্যাচার করিয়া তাহার নির্ম্মলা পবিত্রা ভাষার নিষ্কলঙ্ক গাত্রে প্রবঞ্চনার, নীচতার এবং শঠতার কলঙ্ক-কালিমা-রঞ্জিত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যান—তাহা হইলে সেই পীড়িত, লাঞ্ছিত জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে—তাহার উন্নতির দিনে, বীরত্বের দিনে এবং গৌরবের দিনে পর্য্যন্ত ভাষার ইতিহাস হইতে রাজপ্রদত্ত সেই কলঙ্কচিহ্ন উঠিয়া যায় না। ইতালীর ভাষাই ইহার জলন্ত প্রমাণ। ল্যাণ্ডর (Landor) সাহেব বলেন যে,কোন একটী সাহসী, বীর্য্য-সম্পন্ন, সদাশয়, সমুন্নত এবং সত্যপ্রিয় জাতি—বিষপ্রয়োগে নরহত্যাকে একটী ঘোরতর পাপ বলিয়া আখ্যাত না করিয়া, কখনই ইতালীর মত বলিবে না যে, ইহা কেবল মৃত্যুর পথ সহজ করা মাত্র "(Ajutare la morte)।" পূর্ব্বোক্তরূপ কোন জাতিই একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎদ্বার সংযুক্ত গৃহ দেখিলেই তাহারা রাজপ্রাসাদ বা "Unpalazzo" বলিবে না, অথবা সুসজ্জিত শুভ্র পরিচ্ছদ-ধারী যে কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই তাহাকে একজন মহামান্য সচ্চরিত্র ব্যক্তি "(Un Uomo de garbo)" বলিবে না।

যেখানেই ভাষার ইতিহাসে আড়ম্বর-পূর্ণ ওজস্বী শব্দ, সেই খানেই উন্নত উদ্দেশ্য, উচ্চ চিন্তা, মহৎ প্রতিজ্ঞা এবং পবিত্র আদর্শ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বাহ্যজগতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জ্ঞানী হওয়া শিক্ষা-সাপেক্ষ, তেমনি নৈতিক উন্নতিও শিক্ষা-সাপেক্ষ। আবার সেই উন্নত শিক্ষা দান করিবার জন্য এবং গ্রহণ করিবার জন্য ভাবের উপযুক্ত ভাষার আবশ্যক। যে-খানেই তাহার অভাব, সেই খানেই জাতীয় অবনতির চিহ্ন লক্ষিত হয়। চরিত্রোন্নতি মানসিক বৃত্তিগুলির উন্নতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু মনে কর যে, জাতি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, বিবেক কাহাকে বলে, সত্য কাহাকে বলে,তাহা জানে না—যে জাতির ভাষার ইতিহাসে প্রেম, দয়া, শান্তি, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রকাশ করিবার উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব নাই—যে জাতির ভাষায় পাপ, মহাপাপ, নরক, মিথ্যা কথা, শঠতা, ধর্ম্মে অবিশ্বাস প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা নাই—সে জাতির দর্শনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ, সে ইতিহাস নীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের জন্ম হয় নাই—কারণ উক্ত সূক্ষ্ম বিষয় সকল ধারণ করিবার এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সে জাতির নাই।

কোন একটী সৎ বা অসৎগুণের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলেই আমরা তাহার একটী কাল্পনিক নামকরণ করিয়া তাহাকে জীবিত করিয়া থাকি। তাহা না করিলে তুলনা করা চলে না। কিন্তু তুলনাই চরম সিদ্ধান্তের প্রধান মন্ত্র—মূল সূত্র—একমাত্র উপায়। ন্যায় শাস্ত্রের সহিত ভাষার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং ন্যায় শাস্ত্রের সম্যক্ বিকাশের জন্য ভাষাও পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক †। দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, অর্থনীতি

† "Language, or speech, originally contrived for the communication of meaning, thought, and emotion or feelings, has become a great and indispensable instrument in the discovery of the laws of things or the natural conjunctions and united events established in the world.........But it is found that we cannot advance far in tracing out the actual conjunctions of nature, nor in deducing con-

বল, সমাজনীতি বল সর্ব্বত্রই ন্যায় শাস্ত্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তর্ক এবং মীমাংসা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত এবং সূত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য ভাষা আবশ্যক।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, ভাবের উপযুক্ত ভাষা চাই—ভাষা খাটো হইলে ভাবও খাটো হইবে। সাধারণ কথা কহিতে কহিতেও ভাবের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উচ্চতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাব গম্ভীর হইলে ভাষাও তেমনি হয়। তাই বলিতেছিলাম, ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং উচ্চ ভাষা উভয়ই একসূত্রে গ্রথিত। আবার যে সমাজের অন্তরে উচ্চ ভাব সমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে, সে সমাজও উচ্চ।

যতই দিন যায়, যতই সমাজ পুরাতন হয়—ততই সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, সমাজ উন্নত হয়, সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হয়। সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কারণ সর্ব্ব সময়েই সমাজের সুখ দুঃখ চিন্তা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার একমাত্র উপায় সেই সমাজের আপনার ভাষা। সুতরাং ভাষার উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে বয়স দেখা প্রয়োজন। একটী সমাজ যতই বৃদ্ধি হয়, তাহার চিন্তা ততই গম্ভীর, ততই জ্ঞানপূর্ণ, ততই শিক্ষাপূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং কোন একটী ভাষা যতই পুরাতন হইবে—তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বিভূতি ততই অধিক হইবে—সেই ভাষা ততই সুন্দরী হইবে। যৌবনাবস্থাতেও ভাষা দীনা ও কুশ্রী—বার্দ্ধক্যেই সে সম্পূর্ণ শরীরা তন্বী।

গ্যাল্টন সাহেবের "Tropical South Africa" নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, একজন দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী 'ডামারা' (Dammara) সংখ্যায় তিন পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারে—তাহার অধিক পারে না। টাস্‌মেনিয়গণ "লম্বা" বুঝাইতে হইলে বলে, "লম্বা পদ বিশিষ্ট," "গোলাকার" বুঝাইতে হইলে বলে, "চন্দ্রের মত"। এই রূপে বাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া তাহারা কিছুই বুঝাইতে পারে না—তাহাদিগের শব্দের ভাণ্ডার এতই দরিদ্র।

যে সমস্ত ভাব এবং তত্ত্ব এখন আমাদিগের নিকট অতি সহজ ও সরল বলিয়া মনে হয়—যাহাদির সহিত এখন আমরা অত্যধিক পরিচিত—যে সকল তথ্যের আবিষ্কার এখন আমরা প্রত্যেকেই করিতে পারি বলিয়া মনে হয়,—কত যুগযুগান্তরের প্রাণপণ চেষ্টায় যে তাহা এখন আমাদিগের নিকট এত সহজ হইয়াছে, সেকথা বলিতে পারি না। যাঁহারা সেই সকল তথ্যের আবিষ্কারক, তাঁহারাই তাহাদিগের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—আবিষ্কারের পথ যে কতখানি দুর্গম, তাহা তাঁহারাই দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অমানুষিক চেষ্টার ফলে আমরাত এখন কেবল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পূর্ণ জিনিসটাই দেখিতে পাই—তাহার গঠন প্রণালীত দেখিতে পাই না! যাঁহারা বিজ্ঞানের মূলসূত্র গুলি নির্দ্ধারণ

---

clusions from them in the applications to life, without the help of language or speech ....This necessity is owing to the abstruse and hidden character of the greatest and most comprehensive uniformities of nature."

আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই, "Archbishop Whately says distinctly that logic is entirely conversant about language.' Sir W. Hamilton, Mr. Mansel and most other logicians treat it as concerned with the acts or states of mind indicated by the words;" W. Stanley Jevons সাহেব বলেন "Logic also treats of language, but only as the necessary index to the action of mind."

করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে তাঁহাদিগের যে কতখানি পরিশ্রম হইয়াছিল এবং মস্তিষ্ক ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব!

মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় কি, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে বঙ্গকবিকুলরাজ বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমি একবার "নব্যভারতে" "মানুষ ও সমাজ শীর্ষক" একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতেই তখন দেখাইয়াছিলাম যে, সমাজের জন্য মানুষ এবং মানুষের জন্য সমাজ। সুতরাং পুনর্ব্বার সে প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়া গিয়াছেন—"মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।"

কিন্তু এই সামাজিক অত্যাচার নিবারণ করিবার উপায় কি? সর্ব্ব প্রথমে বাহুবল দ্বারা এই অত্যাচার নিবারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাহুবল প্রয়োগে অনিষ্ট অনেক, ইষ্টের সম্ভাবনা বড় অল্প। যে অত্যাচারের আর কিছুতেই নিষ্পত্তি নাই, তাহার নিষ্পত্তি কেবল বাহুবলে; কারণ এমন প্রস্তর নাই, যাহা আঘাতে ভাঙ্গে না।

"রাজা মাত্রেই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা বিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না।" অর্থাৎ বাহুবল প্রয়োগের অশুভ ফলগুলি যখন লোকে বুঝিতে পারে, তখন আর বাহুবল প্রয়োগ করিতে হয় না। "কেবল ভাবীফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়।" এই জন্যই ইহার নাম "বাক্যবল"। বাহুবলে রক্তপাত আছে, সংহার আছে, অশান্তি আছে—কিন্তু বাক্যবলে আঘাত নাই, রক্ত নাই, সংহার নাই, অশান্তি নাই—শান্তি আছে, নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি আছে। তাই বাক্যবল অতিশয় আদরের জিনিস। এই "বাক্যবল" সমাজের বা জাতির ভাষা ভিন্ন আর কি? তাই বাক্যবলের উন্নতি করিতে হইলে ভাষা উন্নত হওয়া চাই। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে বাহুবল প্রয়োগ একেবারেই অবৈধ ও বিপজ্জনক। তাই বুঝি সুরেন্দ্র বাবু একবার বক্তৃতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "The Pen is our sword"—অর্থাৎ লেখনীই আমাদিগের তরবারি। কথাটা, অতিশয় সত্য।

বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন—

"বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এপর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল [illegible] সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্য

বলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্য-বলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।... ... ... সাধারণ মনুষ্য-গণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথা-বিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়-ঙ্গতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশ বাক্যবলে আলোচিত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। .... মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবল বীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। .... বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না ....বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয় তাহারই বল বাক্যবল। চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহা জাগতিক তত্ত্ব সকল দুর্বোধ্য হইতে উদ্ধৃত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয় বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাক্যবলই সমাজের ভাষা, সুতরাং সমাজকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইলে সাহিত্যের উন্নতি আবশ্যক। সাহিত্য ও সমাজ একই মাতৃস্তনে লালিত হইয়াছে। উহারা যমজ সন্তান। উভয়ের ভালবাসাও বড় অধিক। যেখানে এক ভাই, সেই খানেই আর একজন; যেখানে সমাজ, সেইখানেই সাহিত্য। যেখানেই সুসাহিত্য, সেইখানেই উন্নত সমাজ।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

আব্‌দার।

১

জগদীশ!
সত্য কিগো তবে চিরদিন মম
এমনি কাঁদিয়া মরিতে হবে,
বিশ্বের করুণা, পবিত্রা বরুণা,
আমারে ছাড়িয়া দূরেই র'বে?

২

কই গো, তোমার আনন্দ-কাননে
ফোটেনি আমার গোলাপ, বেলা,
তোমার তপন, তোমার চন্দ্রমা,
এ অধম-সনে খেলেনি খেলা!

৩

তোমার বিহঙ্গ মধুর কাকলি
করেনি কখনো আমার লাগি,
তোমার ভূধর, বারিধি, প্রান্তর,
মোর তরে কেহ উঠেনি জাগি!

৪

তুমি যে আমারি, আমারি আমারি,
তবে কেন নাথ বিচ্ছেদ হেন,
তুমি কতদূরে, সুখময় পুরে,
আমি এ ভূতলে রয়েছি কেন?

৫

তুমি যে দেবতা রাজরাজেশ্বর,
অনাথ কাঙ্গাল ভিখারী আমি,
তুমি যে আমার, উপহাস সে তো!
মোর নহ—তুমি নিখিল স্বামী!

৬

আমার লাগিয়া আসে কি তোমার
সুমেরু শেখরে তরুণা উষা?
আমারে তুষিতে প'রে কি হাসিয়া
বসুধা রূপসী কুসুম-ভূষা?

৭

আমারে স্মরিয়া গগন-প্রাঙ্গণে,
হাসে কি তোমার তারকা-শশী,
আমারে চাহিয়া উজলা বিজলী
মেঘ থেকে মেঘে পড়ে কি খসি ?

৮

তুমি আছ শুধু ব্রহ্মাণ্ড লইয়া,
আমারে ভুলাতে যাহাই কহ,
তুমি জগতের—তুমি নিখিলের,
কেবল "আমারি" কখনো নহ !

৯

নাথ !
ফেটে যায় বুক অসহ্য বেদনে,
শুকায় জলধি, বিদরে গিরি,
তুমি মোর নহে !—উহু, নাহি সহে
কি জ্বালা দেখ না কলিজা চিরি !

১০

অভাগার ব্যথা তুমি কি বুঝিবে
কি বুঝিবে তুমি মনের কথা,
তবু কেন হায় কেঁদে পড়ি পা'য়,
দেবতা কি বোঝে মানব-ব্যথা ?

১১

জরা, মৃত্যু, রোগ, অদৃষ্টের ভোগ,
শোক, তাপ, পাপ বুঝিলে কবে ?
নরের যাতনা, অসহ্য বেদনা,
তোমার ধারণা কেমনে হবে ?

১২

তবে
মিছা কেঁদে আর কি হবে আমার,
মিছা কেন ভাবি আমারি তুমি,
ছাড়িলে কামনা ঘুচাবে যাতনা,
মরিয়া বাঁচিব অমৃত চুমি !

১৩

গোপনে নি'জনে, আর তব সনে,
"এ দাও ও দাও" কভু না ক'ব,
চাহি না জগৎ, চাহি না তোমায়
আজি হতে' আমি তোমারি হব !

১৪

তোমারি হইব, তোমাতে মজিব,
করিব কেবল তোমারি সেবা,
সঁপিয়া আপনা ভুলিব যাতনা,
দেখিতা' কেমনে নিবারে কেবা !

১৫

দিওনাক তুমি আদর যতন,
যাহা পারি আমি তোমারে দিব,
তোমারে লইয়া যাপিব জীবন,
আর কিছু তব কভু না নিব ?

১৬

এই আবদার রাখিও আমার,
অধমতারণ নিখিল স্বামি,
আর কভু হয়োনা আমার,
আজ থেকে হব তোমারি আমি।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

একখানি পত্র।

সম্পাদক মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বিগত বৈশাখ মাসের নব্যভারতে আপনার লিখিত "দয়া" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আপনাকে একখানি পত্র লিখি। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহা যথাসময়ে প্রেরিত হয় নাই। হঠাৎ অদ্য কাগজপত্রের মধ্যে পত্রখানি দেখিতে পাইয়া আপনাকে পাঠাইতেছি।

বৈশাখের প্রবল রবিকিরণে যখন চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া জীবগণ হাহাকার করিতে

থাকে, সে সময় দয়ার জন্য মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? আপনার "দয়া" পাঠ করিয়া বাস্তবিকই মনে ক্লেশ পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিন্তারও উদয় হইল।

বন্ধুর নিকট যে শুনিয়াছেন, "দয়া আজ কাল বড়ই দুর্লভ," সে কথা মিথ্যা নয়। এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাপটে দয়া করিবার কাহারও অবকাশ থাকা ত দূরের কথা, দয়া করা যে জীবের কর্ত্তব্য, ইহা মনেও আসিতে পারে না। ক্ষীরোদ বাবু গত চৈত্র মাসে "যুগান্তরে" কয়েকটী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বেশ লিখিয়াছেন; কিন্তু বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, সমবেদনার রাজ্যের যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ হয় ত এই যে, ক্ষীরোদ বাবু জীবন-সংগ্রামে একজন জয়ী পুরুষ, দয়ার কোন ধার ধারেন না, সুতরাং ও রাজ্যের বড় খবর রাখেন না। কিম্বা নিজে প্রেমিক দয়াল বলিয়া সংসার দয়াময় দেখেন, দয়ার অভাব তাঁহার চক্ষে ঠেকে না। সংসারে যাঁহারা নিজ বাহুবলে সোজা-সুজি কোন উচ্চ পদ মর্য্যাদার সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা দুনিয়ার দুঃখ দারিদ্র্যের বিশেষ খোজ খবর রাখিতে তত ব্যস্ত নন, কিন্তু যাঁহারা এই রণরঙ্গের মধ্যে বারম্বার উত্থান-পতন, পতন-উত্থান ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতির মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিয়া থাকেন। বন্ধ্যা কখন প্রসববেদনা জানে না, কাজেই প্রসূতির কষ্টের সহিত তাহার সন্তানবতীর ন্যায় সমবেদনা অসম্ভব। যে হতভাগা (সৌভাগ্যবান্ বলিলে অন্যায় হয় না, কারণ দুঃখ বিপদে শিক্ষালাভ করতঃ যে ব্যক্তি দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, ওরূপ অবকাশ তাহার পক্ষে সৌভাগ্য বশতই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। আমাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্যই দুঃখ বিপদ বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট।) বিস্তর দুঃখ অভাবের তীব্র কষাঘাত সহ্য করিয়াছে, সে-ই দুঃখীর দুঃখ ক্লেশে ষোল-আনা প্রাণ খুলিয়া "আহা" করিতে জানে; অন্যে যে "আহা" করে, সে কেবল সংসারের আমল দস্তুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলি[illegible]জন্য; সে "আহা" ভাসিতে ভাসিতে আসে, ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, কাহারও অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে না। যে "আহা"র সঙ্গে নিজের কতক অংশ বাহির হইয়া "আহা"র পাত্রে গিয়া প্রবিষ্ট না হয়, সে "আহা"ও যা "বাহাবা"ও তাই। গৃহিণী বলেন, "পুত্র-শোক পাইবার পূর্ব্বে অপরের ছেলেপিলেকে যে চক্ষে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ নয়,—এখন ছেলে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, নিজের কি অন্যের, এ হিসাব থাকে না।" বাস্তবিক ঠেকিয়া শেখা এতই লাভের। তাই বলিতেছিলাম দুঃখ, বিপদ, শোক, তাপ দ্বারা মা জগদম্বা শুধু আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন না, উহারা আমাদিগকে ধর্ম্মেও বিলক্ষণ উন্নত করিয়া থাকে। এই জন্য সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এখানে যাহারা দুঃখ ক্লেশে কাটাইল, সেখানে তাহারা পরম সুখভোগ করিবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মে স্পষ্ট বলে যে, এখানে যাহারা পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করিতে পাইল না, তাহারা এতদুভয় সেখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষীরোদ বাবুর লেখনীর

উপর চিরকাল দেবতারা পুষ্পার্পণ করিয়া থাকেন। দক্ষিণে বামে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কাহারও মুখের দিকে না তাকাইয়া, তাঁহার কলম যেমন সতেজে চলে, এরূপ আজ কালকার মুখাপেক্ষার দিনে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যদি আমাদের বর্ত্তমান সমাজের নির্দ্দয়তার বিরুদ্ধে দু কথা শুনাইতে পারেন, বড় জোরের হয়। যাহা হউক, আপাততঃ আমার দুর্ব্বল নিস্তেজ কলমে যাহা বাহির হয়, তা[...] বিচার করুন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দয়া-ধর্ম্মও নূতন সংস্করণ প্রাপ্ত এক আজগুবী বিজাতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে. দয়াকে দয়া বলিয়া আর চিনিবার যো নাই। সেকালে জলকষ্ট নিবারণের জন্য কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিতেন, কেহ পরিশ্রান্ত রৌদ্রক্লিষ্ট পান্থকে আরাম দিবার জন্য অশ্বত্থ বট প্রতিষ্ঠা করিতেন, কোন মহাত্মা অতিথিশালা স্থাপন দ্বারা কত আগন্তুককে আশ্রয় আহার যোগাইতেন, কোন ভক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা কত লোককে প্রসাদ বিতরণ করতঃ পরিতুষ্ট করিতেন, কেহ বা বহু লোকের স্নান জন্য গঙ্গায় ঘাট বাধাইয়া দিতেন। দেখিলে চেনা যাইত, এই দয়াধর্ম্মের অনুষ্ঠান অমুক মহাত্মা কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত। আজকাল আর সব জিনিস যেমন কলে প্রস্তুত হইতেছে, ব্যক্তিগত কার্য্যের পরিবর্ত্তে, বহু লোক একত্রে খাটিয়া কলকারখানার দ্বারা কাপড় চোপড় প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমাজকে যোগাইতেছে, তেমনি কোন [...] বিশেষ হইতে দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইয়া কোন পাত্রে বা পাত্র সমূহে পর্য্যবসিত না হইয়া [...] হইতে কোথা পঁহুছিতেছে, কেহ টের পায় না। পূর্ব্বেকার ব্যবস্থায় [...] গৃহীতার মধ্যে যে একটা মধুর সম্বন্ধ ছিল, যদ্দ্বারা উভয়েই কথঞ্চিৎ উন্নত হইতেন, তাহা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ দ্বারা একটু পরিস্ফুট ভাবে বলিতে হইলে দেশের খয়রাতী হাঁসপাতাল গুলির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। বহু দাতার অর্থে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত, রোগীর চিকিৎসা, সেবা, শুশ্রূষা কলের মত চলিতেছে; কিন্তু সেবিত জীবগণের হৃদয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের প্রতি প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবার উপায় না থাকায়, ঐ স্বর্গীয় ভাব একেবারে বন্ধ চাপা পড়িয়াছে। আমার দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কোন মহাত্মা আমাকে সাহায্য করিলেন, তাঁহার আত্মপ্রসাদ-জনিত সুখ ও উন্নতি, সঙ্গে সঙ্গে আমার দুঃখাপনোদন [...] জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা হেতু হৃদয়ের [...] স্নুতা,—কিরূপ স্বর্গীয় ব্যাপার [...] রণের অর্থে পরিচালিত [...] গুলিতে উহা দেখিতে পা[...] কোথায়? আবার এস্থলে এ [...] চনা করিতে হইবে যে, উক্ত [...] অন্তর্ব্যবস্থান সমূহে যাঁহারা [...] থাকেন, তাঁহারা যে সর্ব্বদা দয়ার [...] হইয়া অপার্য্যমানে কিঞ্চিৎ কাঞ্চন [...] পুণ্য সঞ্চয় করিতে যান, এরূপ [...] অন্যায়; নানা অবস্থায় বাধ্য হইয়া নানাবিধ অভিপ্রায়ে অধুনা ঐ সকল ক্ষেত্রে অর্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। একত্রিত [...] অর্থ যে দানের পাত্র সমূহে পঁহুছে না, এ কথা বলা [...]; দুর্ভিক্ষাদির মহাকোলাহলে দশজনে [...] পীড়িতের কার্য্যে লাগিলে,

খুব হইল। তাই ভাবিতেছি, অধুনা আমাদের জীবনটা যেন কোম্পানি বাহাদুরের কলে চলিতেছে। কোম্পানির * মুলুকে বাস, সুতরাং আমাদের সকল কাজ কোম্পানিতে হইতেছে।

এইত গেল একদিক। অন্য দিক দেখা যাউক। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কল-কারখানার জীবন-সংগ্রামে লোকের মতিগতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে সুখ শব্দের যে অর্থ ছিল, এখন আর সে অর্থ নাই। চারিদিকেই ক্রমাগত "চাচা! আপ্‌না বাঁচা" রব প্রবল ভাবে ছুটিতেছে যে, কাড়াকাড়ি মারামারি জীবের একটা বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেরই এই চিন্তা, কি প্রকারে পরের পয়সা ঘরে আনা যাইবে। এবম্প্রকার বিকট স্বার্থ চিন্তা দ্বারা আমাদের অভ্যাসের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, সুখের অর্থ ভয়ঙ্কর বিকৃত। সেকালে দশ টাকা রোজগার করিয়া দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা, পাঁচ জন আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিপালন প্রভৃতি নানা প্রকারে দশজনকে খাওয়াইতে পরাইতে পারিলেই লোকে সুখবোধ করিত। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে, মফঃস্বলের জেলা সমূহে ভাল চাকুরিয়াদের বাসাতে বিস্তর বেকার, উমেদার শ্রেণীর লোক গ্রাসাচ্ছাদন পাইত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একমুঠা খাইব বলিয়া উপস্থিত হইলে কর্ত্তারা তাহাকে ফিরাইতেন না। তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা কত বেশী রোজগার করিলাম, অথচ শৃগাল কুকুরের ন্যায় শাবক প্রতিপালনেই ব্যস্ত থাকিলাম মাত্র; বাহিরের কাহারও প্রতি তাকাইবার অবকাশ আর হইল না। ইহা অপেক্ষা আপশোষের বিষয় আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে কিসে সুখ হয়, দেখা যাউক। এখন হুড়াহুড়ি করিয়া দশ টাকা রোজগার করত খান কতক মোটা কোম্পানির কাগজ লোহার সিন্দুকে ফেলার পর বাঁ তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝুড়ি স্বর্ণালঙ্কার—হীরার সেট্ হইলে ভাল হয়—সংগ্রহ করিতেই হইবে। ঐ সকল অলঙ্কার পরিয়া গৃহিণী ত্রিতল প্রকোষ্ঠের জানালা হইতে মাটীতে উপবিষ্ট পিত্তল-বলয়-পরিহিত গরিব প্রতিবেশীর স্ত্রীকে জাঁতা পিষিতে দেখিবেন, তবে তাঁহার ও আমার সুখ! পরকে দুঃখ অভাব যুক্ত দেখিয়া যখন তুলনা দ্বারা বুঝিব যে, আমি উহা অপেক্ষা কত ভাগ্যবান, তখন আমার সুখ হইবে, নচেৎ কোন প্রকারে সুখ সুখই নয়। মারামারি, কাড়াকাড়ি, কাটাকাটি, মাথা ফাটাফাটি দ্বারা সুখের এই অভিনব উন্নত ভাব আমাদের হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামের উন্মত্ত কোলাহল মধ্যে, যেখানে বিস্তর লোক "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আমি সেখানে বুকের ছাতি ফুলাইয়া যুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া চলিতেছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সংসারে সকলেই আপেক্ষিক, তুলনা ভিন্ন সুখ দুঃখ বুঝিব কি প্রকারে? তবে আর একটু চাই;

* কোম্পানীর আমলে বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে, কোম্পানী নামে কোন ব্যক্তি বিশেষের শাসনাধীনে ভারত সাম্রাজ্য চলিতেছে। পরে যখন জানিতে পারিল যে, "কোম্পানী" মানে একটা সওদাগরের দল, তখন বিস্তর প্রজার মনে অশ্রদ্ধা ও অসন্তোষ জন্মে। অনেকের বিশ্বাস যে, উহা সিপাহি-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

কলিকাতা সহরে অনেকেই আমার মত যুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া থাকে, আমার নাম সবাই জানিবে কি প্রকারে? এজন্য মধ্যে মধ্যে আমার গাড়ীর নীচে দুই একটা হত-ভাগিনী দীন দরিদ্রা বৃদ্ধার চাপা পড়া চাই; তাহার দণ্ড স্বরূপ আমি পুলিস আদালতে বিলক্ষণ দশ টাকা জরিমানা দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ওটা চাই।" "অমুক বাবুর চৌযুড়ির নীচে সেদিন একটা দুঃখিনী অনথা বুড়ী চাপা পড়িয়াছিল," এ প্রকার ঘোষণা দ্বারা সংবাদপত্রে আমার ধনৈশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত না হইলে সোণায় সোহাগা হয় না। এই এখানকার সুখের ভাব।

সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ ক্ষেত্রে দয়া কি প্রকারে আশা করিতে পারেন?

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মহাভারত।

অণুক্রমণিকাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঋষিগণ আদিম ভারত-সংহিতার কথা জানিতেন কি না?

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ঋষিগণ বেদব্যাস-বিরচিত আদিম ভারত-সংহিতার কথা অবগত ছিলেন কি না।

ঋষিগণ কহিলেন—

দ্বৈপায়নেন যৎপ্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্‌॥ ১৭॥
তস্যাখ্যানবরিষ্টস্য বিচিত্র পদ পর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥ ১৮॥
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্‌।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্‌॥১৯॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্‌।
যথাবৎস ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া॥ ২০॥
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্‌॥"২১॥

(হে সূতনন্দন!) "মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া পূজা (অর্থাৎ প্রীতমনে বহুপ্রশংসা) করিয়া থাকেন, যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম রমণীয় উপাখ্যান আছে, যাহা বিচিত্র পদ ও পর্ব্ব যুক্ত, সূক্ষ্মার্থ প্রতিপাদক, যুক্তিযুক্ত, বেদার্থে সমালঙ্কৃত, পরম পবিত্র ইতিহাসাত্মক ভারতের গ্রন্থার্থ সংযুক্ত, নানা শাস্ত্র সম্মত (অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ), সংস্কৃত, সর্পসত্রে বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে বৈশম্পায়ন ঋষি রাজা জনমেজয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, বেদচতুষ্টয়ের সার সমাকর্ষণ পূর্ব্বক অদ্ভুতকর্ম্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক যাহা সঙ্কলিত, আমরা সেই পাপভয়-নিবারিণী পুণ্য-সংহিতা শ্রবণে বাসনা করি।"

বুঝিলাম, উগ্রশ্রবা যখন বলিলেন, তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত "মহাভারতীয়" পরম পবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন, ঋষিগণ তখনই তাহা শ্রবণ করিতে চাহিলেন।

কাহারও কোন বিষয় জানা না থাকিলে, সে তাহা শুনিতে চাহে। পাছে কেহ মনে করে যে, ঋষিগণ দ্বৈপায়ন-বিরচিত ভারত-সংহিতার কোন সংবাদ রাখিতেন না, এইজন্য প্রচলিত-মহাভারতের সঙ্কলয়িতা, ঋষিগণের মুখেই "ভারতের" সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা নিস্তার পাইলেন না। কারণ, সৌতি বলিলেন—সর্পসত্রে "মহাভারতীয়" কথা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন, আর ঋষিগণ শুনিতে

চাহিলেন "ইতিহাসাত্মক ভারত-সংহিতার" কথা। এই "ভারত" "মহাভারত" "পুণ্য-সংহিতা" "ভারত-সংহিতা" সকল নামই এক "মহাভারত'' অর্থে ব্যবহৃত হইত কি না, কে বলিতে পারে? এ সম্বন্ধে নানাবিধ মতান্তর পরিলক্ষিত হয়।

আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে, বেদব্যাস, সম্ভবতঃ একখানি ইতিহাসাত্মক-সংহিতা প্রণয়ন করেন—তাহার নাম 'ভারত-সংহিতা'। সে সংহিতার কথা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ হয়তো জানিতেন। তার পর সর্পসত্রে কথিত নানা ইতিহাস তাহাতে সংযুক্ত হওয়ায়, তাহা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং সর্পসত্র কালে ইহার নাম "মহাভারত" হয়।

কেন আমার এরূপ ধারণা হইল, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

ব্রহ্মর্ষিগণের কথা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দেবগণ পর্য্যন্ত বেদব্যাসের মহাভারত পাঠ করিয়া বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই কথাটায় কিছু গোল বাধাইয়াছে। উগ্রশ্রবাঃর মুখে একথা না দিয়া, বর্ত্তমান-প্রচলিত-মহাভারত-সঙ্কলয়িতা, ঋষিগণের দ্বারা একথা বলাইয়া একটু কৌশল করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য কি না, তাহা আলোচনা করিবার যোগ্য।

ঋষিগণ বলিলেন যে, বেদব্যাস যে 'ভারতাখ্য' ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণও শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু (কাব্য-চিন্তায়) মহাভারত-আলোচনা প্রসঙ্গে, এই স্থলের অনুবাদে সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরিবর্ত্তে "সুধীগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ" লিখিয়াছেন। (কাব্যচিন্তা, ৪৩ পৃষ্ঠা।)

মূল সংস্কৃত শ্লোকে আছে—"সুরৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্॥" (আদি পর্ব্ব, উপক্রমণিকা, ১৭।)

সুরগণের পরিবর্ত্তে "সুধীগণ' করিতে পারিলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মূলে তাহা পাইতেছি না।

যাহা হউক, ঋষিগণ বেদব্যাস-বিরচিত ভারত-সংহিতার কথা যে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইতিহাসাত্মক পবিত্র ভারত-সংহিতা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াও ছিলেন। তবে, ইহা হইতে পারে যে, সর্পসত্রে, বেদব্যাস ও অন্যান্য মুনি ঋষিগণের সম্মুখে সেই ইতিহাস বর্ণনকালে, বৈশম্পায়ন কোন নূতন কথা বলিয়াছেন কি না, তাহা জানিবার জন্য, পুনরায় তাহা শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাহার পর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আদিম ভারত-সংহিতায় কি ছিল, (প্রয়োজন না থাকিলেও) ঋষিগণ আপনা-আপনি তাহা সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিলেন।

এই অংশটী পাঠ করিলে মনে হয় যে, ইহা প্রচলিত-মহাভারত-সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য-সাধন-সঙ্কল্পে কল্পিত; অর্থাৎ স্বৎসঙ্কলিত মহাভারতখানির উপর লোকের বিশ্বাস স্থাপন ও ভক্তির উদ্রেক করিয়া দিবার জন্যই এ কৌশল অবলম্বিত।

এতৎ সম্বন্ধে আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহা এই যে, ঋষি-সমাজ আদিম ভারত-সংহিতার কথা জানিতেন, তাহাই পাঠকগণকে দেখানই সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, ইহার মধ্যে একটী কথা আমাদের প্রয়োজনে আসিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে "মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিয়া

আসিয়াছেন; আর ঋষিগণ বলিলেন—"আমরা সেই ইতিহাসাত্মক ভারত (অর্থাৎ 'ভারতাখ্য' পরম পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস) শ্রবণে বাসনা করি।"

তাহা হইলে, বুঝা যাইতেছে যে, সে সময়ে, এই গ্রন্থের নাম "ভারত" মাত্র ছিল অথবা সেই পাপ-ভয়-নিবারিণী পুণ্য সংহিতাকে 'ভারত-সংহিতা' বলিত; "মহাভারত" নামকরণ তখনও হয় নাই। অন্ততঃ নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ জানিতেন না যে, বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'ভারতাখ্য' ইতিহাসের নাম "মহাভারত" হইয়াছে।

আরও একটী কথা আমরা জানিতে পারিলাম যে, ঋষিগণ সে সময়ে 'ভারত' গ্রন্থকে খাঁটি ইতিহাস বলিয়াই জানিতেন; অর্থাৎ সে সময়ে 'ইতিহাস' বলিয়া এই পুণ্য সংহিতায় একটা গৌরব ছিল এবং ঋষি-সমাজ তাহা স্বীকার করিতেন।

সর্পসত্রে "মহাভারত" কীর্ত্তন।

ক্ষীতিন্দ্র বাবু বলেন—"এই (অর্থাৎ প্রচলিত-মহাভারত) বৈশম্পায়নী ভারত-সংহিতাকে, 'ব্যাসদেব রচিত মহাভারত' বলিয়া আমরা গণ্য করিব; কারণ, ব্যাসদেব জনমেজয়ের সর্পসত্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া বৈশম্পায়নের দ্বারা ইহা বলাইয়াছিলেন।"

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমরা ক্ষীতিন্দ্র বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ (আদিপর্ব্ব, ঊনষষ্ঠ অধ্যায়ে, ভারত সূচনায়) লিখিত আছে যে, সর্পসত্র-নিযুক্ত-ব্রাহ্মণেরা, অবসর কালে, বেদ-মূলক নানা আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব মহাভারতরূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন।"

অতএব, ব্যাসদেবের আদেশে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে, বৈশম্পায়ন যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যাস-বিরচিত ভারত-সংহিতা অথবা ঋষিগণ পূর্ব্বাবধি যাহা জানিতেন, সেই 'ভারতাখ্য পরম পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস' হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত-মহাভারত তাহা নহে; অর্থাৎ মহাভারতের খাঁটি ইতিহাস অংশ (ভারত সংহিতা বা আদি মহাভারত) বৈশম্পায়ন বর্ণন করিয়াছিলেন; আর ব্যাসদেব "মহাভারত রূপ বিচিত্র আখ্যান (অর্থাৎ মহাভারতের গল্পাবলী ও রূপকাংশ) কীর্ত্তন করেন। অন্যান্য মুনিগণও নানা উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ, বেদব্যাস কথিত যে আদিম ভারত-সংহিতা বা 'ভারতাখ্য' বিচিত্র ইতিহাসের কথা জানিতেন, তাহা এই স্থলেই বহুল পরিমাণে অন্য প্রাচীন কাহিনী ও উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হওয়ায় "মহাভারত" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবা কহিলেন—"যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বীয় অনন্ত শক্তি প্রভাবে স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর জঙ্গম নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের প্রীতি উদ্দেশে হুতাশন মুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত সামগ ব্রাহ্মণ যাঁহার গুণগান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়া-প্রপঞ্চরূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব যাঁহার বিরাট মূর্ত্তি, লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, কালত্রয়ে অবিকৃত, সকল মঙ্গল নিদানভূত, মঙ্গল-মূর্ত্তি, ত্রিলোক-পাতা, যজ্ঞফলদাতা, চরাচর-গুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।" *

* এই অনুবাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিলাম, উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ-কাহিনী-বর্ণনা রূপ পরম পবিত্র কার্য্যে দীক্ষিত বা ব্রতী হইবার পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ জন্য ঈশ্বরারাধনা করিলেন এবং সর্ব্বশেষে বলিলেন যে, মহর্ষি বেদব্যাসের "অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।"

এই "অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব" কথাটী লইয়া একটু গোল বাধিতেছে। ইহাতে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ যে সময়ে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন, সে সময় অবধি মহর্ষি বেদব্যাস নিজে বা তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারায় যাহা কিছু প্রচার করিয়াছিলেন, উগ্রশ্রবাঃ সে সমস্তই বর্ণন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মূলে আছে,—

"মহর্ষেঃ পূজিতস্যেহ সর্ব্বলোকৈর্ম্মহাত্মনঃ।
প্রবক্ষ্যামি মতং পুণ্যং ব্যাসস্যাদ্ভুত-কর্ম্মণঃ॥ ২৫॥

বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ (যাহা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা) এইরূপ :—"সর্ব্বলোক পূজিত, মহানুভাব, অদ্ভুত-কর্ম্মকারি মহর্ষি বেদব্যাসের পবিত্র মত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই।"

বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মহাভারতের বঙ্গানুবাদে * এইরূপ আছে।

"সর্ব্বলোকপূজিত মহাত্মা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রণীত পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত "অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব" এরূপ অনুবাদ, আর কোথাও পাই না; মূল দেখিয়াও এ অনুবাদ ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

ভারত কাহিনীর প্রাচীনত্ব।

(আমার বিশ্বাস এই যে, বেদব্যাস সর্ব্বপ্রথমে ইহা ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন।)

উগ্রশ্রবা কহিলেন—"অনেকানেক অতীতদর্শী মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিতেছেন এবং উত্তরকালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। দ্বিজাতিরা দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপে ও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদ-শাস্ত্র, এই পরম পবিত্র ইতিহাস রূপে আভিভূ'ত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১) বহুতর মনোহর শব্দে ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত, এই নিমিত্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।'

এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ভারত-কাহিনী বা ভারতীয় নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত, মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে আরও অনেকে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া নিজে এবং শিষ্যগণের দ্বারায় প্রচারিত করেন। উগ্রশ্রবাঃ, অতীত,

---

কৃত। এই প্রবন্ধ আলোচনায় আমি অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার অনুবাদ ও টীকা গ্রহণ করিয়াছি; স্থানে স্থানে তাঁহার অনুবাদ মূলের সহিত ঐক্য না হওয়াতে' পরিবর্ত্তন বা অপরের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেও বাধ্য হইয়াছি।

* ১২৯২ সালে, ১৩৭নং বলরামদের ষ্ট্রীট হইতে হইতে, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক, মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিনা জানি না। ইহার কয়েক খণ্ড আমার নিকট আছে। অনুবাদ অনেক প্রকার সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল-মহাভারত ব্যতীত অন্য মূল আমার নিকট নাই। অধিকাংশ স্থলেই আমি এই মূল মহাভারত হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছি। অন্যান্য পুস্তকের উদ্ধৃত শ্লোকে যাহা পাঠান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, দুই এক স্থলে তাহাও গ্রহণ করিয়াছি।

(১) "নীলকণ্ঠ মতে সময় শব্দের অর্থ সঙ্কেত, অর্জ্জুন মিশ্র মতে আচার।"

বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ, এই সময়েই যে 'ভারতাখ্য বিচিত্র ইতিহাস' সংক্ষেপে ও বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতেন, তাহাও আমরা উগ্রশ্রবার উক্তিতে জানিতে পারিলাম। প্রাচীন ইতিবৃত্ত যেমন পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া থাকে, ভারত-কাহিনীও সেইরূপ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত রূপে পুরাকাল হইতে ব্যাসদেবের সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল এবং তিনি যত্নের সহিত তাহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ কিরূপ হইয়াছিল তাহারই গুণ বর্ণনাচ্ছলে উগ্রশ্রবাঃ বলিলেন যে, তাহা সর্ব্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদশাস্ত্র ইতিহাস রূপে আবির্ভূত অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা, এবং তাহার সার কথা, তাহাতে (অর্থাৎ উক্ত 'ভারতাখ্য বিচিত্র ইতিহাসে') সন্নিবেশিত হইয়াছে; আবার তাহার উপর সেই পুস্তক, অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার, বহুতর মনোহর শব্দ ও নানা ছন্দে, অলঙ্কৃত বলিয়া, তাহা পণ্ডিতগণের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। এই "মনোহর শব্দ ও ছন্দে অলঙ্কৃত" কথার দ্বারা আমরা এরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, পূর্ব্বে যে সকল পুরাণ-কাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত হইত, মহর্ষি বেদব্যাসই প্রথমে তাহা ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ?

ভারত কাহিনীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহার সন্দিহান তাঁহারা পাণিণি, আশ্বালায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে "ভারতের" প্রসঙ্গ আছে দেখিতে পাইবেন।

বঙ্কিম বাবুও বলিয়াছেন—"মহাভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।" (কৃষ্ণ চরিত্র, ৪২ পৃষ্ঠা)

"মহাভারতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে তাহা থাকিলেও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প—কেন না মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। (কৃষ্ণচরিত্র ৫০ পৃষ্ঠা)।

যাহা হউক, এই সকল কথার পর, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে, উগ্রশ্রবাঃ কি বলিতেছেন, দেখা যাউক।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাহাতে প্রক্ষিপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন—"প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া একান্ত অলক্ষিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টিপ্রারম্ভে সকল ব্রহ্মাণ্ড বীজভূত এক অলৌকিক অণ্ড প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্ব্বিকার, অচিন্ত্যনীয় অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বত্রসম, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই অণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বলোক-পিতামহ (১) দেবগুরু ব্রহ্মা তাহাতে জন্মগ্রহণ করিলেন।"

"তদনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রাচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুত্র ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেবগণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট-বসু, যমজ অশ্বিনীকুমারযুগল, যক্ষগণ সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ ও পিতৃগণ জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র,সূর্য্য, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি ও বিশ্বান্তর্গত যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইল।"

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ

(১) "স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকের পিতৃস্বরূপে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা; এই নিমিত্ত তিনি "সর্ব্বলোক-পিতামহ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রলয়কালে পুনর্ব্বার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। যেমন পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইলে, ঋতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, যুগ-প্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বভূতসংহারকারী সংসারচক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।"

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা কিছু বর্ণনার প্রয়োজন, উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে তাহা বর্ণন করিয়া ভবিষ্যতে কি হইবে এবং প্রতি কল্পাবসানে কি প্রকার হইয়া থাকে, সে সকল কথাই যেন এইখানে বলিয়া শেষ করা হইল; কিন্তু আবার তাহার পরে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়-কথা পাইতেছি। তাহা এই—

"ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন (১)। আর বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি ও মহ্য, দিবের (২) এই একাদশ পুত্র জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহে'র পুত্র দেবভ্রাজ, তৎপুত্র সুভ্রাজ। সুভ্রাজের দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ, সহস্রজ্যোতিঃ নামে তিন পুত্র হইলেন। দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষ পুত্র, ও সহস্রজ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র হইল। ইহাদিগের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষাকুবংশ, ও অন্যান্য রাজর্ষি বংশের উদ্ভব হইল।"

এই উদ্ধৃতাংশটি কোন পরবর্ত্তী লেখকের দ্বারায় প্রক্ষিপ্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা রূপক বলিলেও বলা যায়। ইহা অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাস-যোগ্য কথায় পূর্ণ। সৃষ্টিতত্ত্বের কথা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়া গেলেও আবার তাহার অবতারণা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেনঃ—"হিন্দুর মুখে ত শুনি, দেবতা ত্রেত্রিশ কোটী; কিন্তু দেখি বেদে আছে, দেবতা মোটে ত্রেত্রিশটী; শতপথ-ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণী বিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। যথাঃ—দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। "আদিত্য" "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতি-বাচক মাত্র। তা ছাড়া "দ্যাবা পৃথিবী" এই দুটি লইয়া ত্রেত্রিশটি। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪ টি গণনা করা হইয়াছে। মহাভারতে, অনুশাসন পর্ব্বে, উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথাঃ—আদিত্য।—অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। রুদ্র।—অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী,

(১) এই "সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন" কথাটা আমাদের বোধগম্য হইল না; দেবতা সৃষ্ট হইলেন, তাহা আবার 'সংক্ষেপে' কিরূপ, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

"ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা॥"

"এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ উপরে লিখিত হইয়াছে। শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্টবসু একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত অথবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যা তাঁহাদিগের পরিবারাদি সহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপে সৃষ্টি অভিপ্রায়ে উল্লিখিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্জ্জুন-মিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপন ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি।"

(২) "অর্জ্জুনমিশ্র মতে দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা অদিতি।

রুদ্র, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর। বসু।—ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকে ঋষি অশ্বীদিগকে বলিতেছেন "তিন একাদশ (১১×৩=৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস।" ঐরূপ ১.১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮.১ ও ৮.৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথ-ব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ত্রেত্রিশটি মাত্র দেবতার কথা আছে। এখন ত্রেত্রিশ হইতে, ত্রেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ঋগ্বেদের ৩।৯ ৯ ঋকে আছে, "ত্রীণিশতা ত্রিসহস্রাণি অগ্নিন্ ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। ত্রেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে? তবু ঋষি-ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই। যে গুণের একাদশ গুণে ত্রেত্রিশ, সেই তিনকে শতগুণ, সহস্রগুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটিগুণ করিয়াছে।"

—প্রচার, ১ম বর্ষ।

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত "ভারত।"

"মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে প্রাণিদিগের অবস্থিতি স্থান (১) ত্রিবিধ রহস্য (২) বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও তত্ত্বৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোক যাত্রা-বিধান (৩) এতৎ সমুদয় অবগত ছিলেন। এই ভারতগ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে, কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহবা বাহুল্যে, জানিতে বাসনা করে, এই নিমিত্ত মহর্ষি এই জ্ঞানশাস্ত্রকে সংক্ষেপে ও বাহুল্যে কহিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণেরা প্রথম, মন্ত্র (৪) অবধি, কেহ কেহ আস্তীক-পর্ব্ব অবধি, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, এই "ভারতের" আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ কেহবা গ্রন্থার্থ ধারণা বিষয়ে নিপুণ।"

(১) "গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি।"

(২) "ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। রহস্য শব্দের অর্থ গূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।"

(৩) "সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের বিধি প্রদর্শক নীতি শাস্ত্র বিশেষ।"

আমরা জানিতে পারিলাম, যে সময়ে বর্ত্তমান-প্রচলিত-মহাভারত সঙ্কলিত ও ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই সময়েই কোন্ স্থল হইতে "ভারতের" প্রকৃত আরম্ভ, তাহা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল; অর্থাৎ "অনুক্রমণিকার ১৫০ শ্লোক বাদে প্রথম ৬২ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কাল হইতেই প্রক্ষিপ্তের কথা লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। আমরা আজ নূতন করিয়া একথা তুলিলাম না।

প্রথম মন্ত্র ("নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি) হইতে, বা আস্তীক পর্ব্ব হইতে, অথবা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতেই হউক, একটী কথা এই জানিতে পারা গেল যে, সংক্ষেপে 'ভারত' কীর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইলে, এই গ্রন্থের গোড়ার দিকের (অর্থাৎ আদি পর্ব্ব হইতে) অতি সামান্য অংশই বাদ দেওয়া হইত, ইহাই প্রমাণ হইতেছে।

বেদব্যাস যে সংক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে 'ভারত' রচনা করিয়াছিলেন, দুই একটী

(৪) প্রথম মন্ত্র—
"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ।

অধ্যায়ের কম বেশীতে সে কথা বজায় রাখিতে পারা যায় কি ?

বরং যদি আমরা একথা স্পষ্টরূপে পাইতাম যে, বেদব্যাস,সংক্ষেপে যে "ভারত" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "ভারত-সংহিতা," "আর বিস্তৃত ভাবে যে "ভারত" রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "মহাভারত", তাহা হইলে সুবিধা হইত। কিন্তু একথা পরিষ্কাররূপে কোথাও পাওয়া যায় না, তর্ক ও যুক্তি দ্বারায় প্রমাণ করিতে হয়।

মহাভারতে "আজ্গুবী-গল্প" ও তাহার প্রয়োজনীয়তা।

তার পর উগ্রশ্রবাঃ একটী আজ্গুবী গল্প বলিলেন ;—

"তপসা-ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিদং চক্রে পুণ্যং সত্যবতী সুতঃ ।। ৫৪ ।।
পরশরাত্মজো বিদ্বান্ ব্রহ্মর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ।
তদাখ্যানবরিষ্ঠং স কৃত্বা দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।। ৫৫ ।।
কথমধ্যাপয়ানীহ শিষ্যানিত্যন্বচিন্তয়ৎ।
তস্য তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ঋষের্দ্বৈপায়নস্য চ ।। ৫৬ ।।
তত্রাজগাম ভগবান্ ব্রহ্মা লোকগুরুঃ স্বয়ম্।
প্রীত্যর্থং তস্য চৈবর্ষের্লোকানাং হিতকাম্যয়া ।।৫৭।।"

অর্থাৎ—পরাশরাত্মজ, বিদ্বান্, ব্রত-পরায়ণ, সত্যবতী-নন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে, সনাতন বেদ বিভাগ করিয়া, তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক, এই ইতিহাস রচনার কল্পনা করেন। অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমি কিরূপে এই গ্রন্থ শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইব ?" দ্বৈপায়ন ঋষির চিন্তার বিষয় জ্ঞাত হইয়া, লোকগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার (অর্থাৎ দ্বৈপায়ন ঋষির) সন্তোষ বিধান ও মানবগণের হিতকামনায় স্বয়ং সেই স্থলে আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মার আর কোন কাজ ছিল না, কোথায় কে একখানি পুস্তক রচনা করিবে, তিনি তাহাই অনুসন্ধান করিতেছিলেন ; যেই জানিতে পারিলেন, বেদব্যাস একখানি গ্রন্থরচনা করিবার কল্পনা করিয়াছেন, অম্নি হুস্ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যদি কেহ বলিতেন যে,ব্যাসদেব তাঁহার মনঃসঙ্কল্পিত ভারত-সংহিতা রচনা করিবার বিষয় বহুকাল ধরিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, একদিন রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তাহা হইলে, বিশ্বাস করিতে কোন বিশেষ আপত্য ছিল না। কেন না স্বপ্নের কথা কেহই বলিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালেও কেহ কেহ দু'লাখ পাঁচ লাখের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। সুতরাং বেদব্যাস যে ব্রহ্মার আবির্ভাব স্বপ্ন দেখিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ?

তবে এই গল্পের মধ্যে একটা কথা আছে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়া তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এক ইতিহাস রচনা করিবার কল্পনা করেন। ইহার অর্থ এই যে, এক বেদ চারিভাগে (ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব) বিভক্ত করিয়াও পরাশরাত্মজ বৈদিক উপাখ্যানাদি দ্বারা ইতিহাসাত্মক একখানি মহাকাব্য রচনার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

এই কথা প্রকারান্তরে পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে।

১ম। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বারা বলান হইয়াছে—"ভারত, বেদ-চতুষ্টয়ের সার সমাকর্ষণ পূর্ব্বক সঙ্কলিত এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ।"

২য়। উগ্রশ্রবা বলিয়াছেন—"মহর্ষি

বেদব্যাস যোগবলে প্রাণিদিগের অবস্থিতি স্থান (গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি) ত্রিবিধ রহস্য (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম), বেদ, যোগ, বিজ্ঞান ও বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রাবিধান, (সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের বিধি-দর্শক নীতি-শাস্ত্র বিশেষ) এতৎ সমুদয় অবগত ছিলেন। এই 'ভারত' গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ, যথাক্রমে কথিত হইয়াছে।"

এইরূপে দুইবার (একবার ঋষিগণের দ্বারা এবং একবার সৌতির দ্বারা) এই একই কথা বলাইয়াও, প্রচলিত মহাভারতের সঙ্কলয়িতা সন্তুষ্ট হইলেন না। তাই তৃতীয় বার সৌতির দ্বারা বলাইলেন ;—

"ভগবান সত্যবতী-নন্দন তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে, সনাতন বেদ-শাস্ত্র বিভাগ করিয়া তদীয় সার সঙ্কলন পূর্ব্বক মনে মনে এই পরমাদ্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য, এই কথাটী বার বার বলিলে লোকে মহাভারত পাঠে অনুরাগী হইবে।

অতএব, উপরোক্ত গল্পটী আজগুবী হইলেও, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করিতে হইবে।

তার পর—

(ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে) ব্যাসদেব গাত্রোত্থান করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসন পরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে তদীয় আসন সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন—

"উবাচ স মহাতেজা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
কৃতং ময়েদং ভগবান্ কাব্যং পরমপূজিতম্ ॥৬১॥
ব্রহ্মন্বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়াঃ ॥৬২॥
ইতিহাস পুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্ ॥৬৩॥
জরামৃত্যুভয়ব্যাধিভাবাভাব বিনিশ্চয়ঃ।
বিবিধস্য চ ধর্ম্মস্যাশ্রমাণাঞ্চ লক্ষণম্ ॥৬৪॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধানঞ্চ পুরাণানাঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য পৃথিব্যা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥৬৫॥
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং প্রমাণঞ্চ যুগৈঃ সহ।
ঋচো যজূংষি সামানি বেদাধ্যাত্মং তথৈব চ ॥৬৬॥
ন্যায়শিক্ষা চিকিৎসা চ দানং পাশুপতং তথা ॥৬৭॥
তীর্থানাঞ্চৈব পুণ্যানাং দেশানাঞ্চৈব কীর্ত্তনম্।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ বনানাং সাগরস্য চ ॥৬৮॥
পুরাণাং চৈব দিব্যানাং কল্পানাং যুদ্ধকৌশলম্।
বাক্যজাতিবিশেষাশ্চ লোকযাত্রাক্রমশ্চযঃ ॥৬৯॥
যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্।
পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্য ভুবি বিদ্যতে ॥৭০॥"

"ভগবান্! আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি ; তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ সমুদয়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব নিরূপণ, নানাবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দ্দেশ; চাতুর্ব্বর্ণ্য মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুর্যুগের বিবরণ, নারায়ণ যে কারণে দিব্য ও মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তন এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদী, বন, পর্ব্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, ব্যূহ-রচনা, যুদ্ধ-কৌশল, বক্তৃবিশেষে কথন-বৈচিত্র, লোকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তদুপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।"

প্রচলিত মহাভারতে কি আছে, তাহা আমরা পাইলাম, মহাভারত-সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। বোধ হয়, সঙ্কলয়িতা মনে করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার আবির্ভাবের আজগুবী গল্প প্রসঙ্গে ভুলাইয়া পুরাণ পাঠকের মনে এই দৃঢ়ধারণা জন্মাইয়া দিবেন

যে, এই মহাভারতই সেই আদিম ভারত-সংহিতা; কিন্তু জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন কি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বেদব্যাস কি বর্ণন করিয়াছিলেন, প্রথমে কত শ্লোকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভারত-সংহিতা রচনা করেন ও তাহাতে কি ছিল, কি কারণে সেই আদিম ভারত-সংহিতাকে ঋষিগণও খাঁটি ইতিহাস বলিয়া জানিতেন, এ সকল কথা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মা ও বেদব্যাসের সাক্ষাৎ উপলক্ষ করিয়া এই আজগুবী গল্পের অবতারণা ও সেই সঙ্গে পার্থিবের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় পূর্ণ মহাভারতের পরিচয় দান করিয়াও, সঙ্কলয়িতা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই যে, প্রচলিত মহাভারতই সেই আদিম ভারত-সংহিতা।

"মহাভারত" কাব্য কি ইতিহাস?

ব্রহ্মা কহিলেন—"তোমার মনঃসঙ্কল্পিত গ্রন্থকে তুমি 'কাব্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অতএব তোমার রচিত গ্রন্থ 'কাব্য' বলিয়াই বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।" এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে তাঁহার উপদেশানুসারে ব্যাসদেব ভক্তবৎসল গণনায়ককে স্মরণ করিলেন। স্মৃত মাত্র গজানন তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন ব্যাসদেব কহিলেন—'হে গণেশ্বর, আমি মনে মনে "ভারত" নামে এক গ্রন্থ রচনার কল্পনা করিয়াছি; আপনি যদি লেখকতা কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।'

লম্বোদর গজানন কহিলেন—"লিখিতে আরম্ভ করিলে যদি আমার লেখনীকে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিতে না হয়, তবে আমি লেখক হইতে পারি।"

ব্যাসও কহিলেন—"কিন্তু আপনিও অর্থগ্রহ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না।"

গণনায়ক 'তথাস্তু বলিয়া লেখকতা করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ব্যাসদেব মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

কথিত আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, 'নূতন শ্লোক রচনার্থ অবকাশ লইবার জন্য, স্থানে স্থানে এরূপ কূটার্থপূর্ণ জটিল ও দুর্জ্ঞেয় শ্লোকসমূহ উচ্চারণ করিতেন যে, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও গণেশকে অর্থবোধের নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিতে হইত এবং সেই সময়ে তাঁহার লেখনীর গতি মন্থর হইয়া পড়িত। সেই অবকাশে ব্যাসদেব বহু শ্লোক মনে মনে রচনা করিয়া ফেলিতেন।'

গল্পটী আগাগোড়া আজগুবী ও অনৈসর্গিক! এরূপ আষাড়ে গল্প হইতে সত্য নিরাকরণ করা কিরূপ দুরূহ, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন। সত্য যদি ইহাতে কিছু থাকে, তাহা এই যে, আদিম ভারত-সংহিতাকে ঋষিগণ খাঁটি ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতেন; কিন্তু উপাখ্যানাদি দ্বারা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত ও "মহাভারত" নাম প্রাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থকে "কাব্য' নামে পরিচয় দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। ব্যাসের নাম না করিলে পাছে পুরাণ পাঠকগণ অবিশ্বাস করেন এবং প্রচলিত মহাভারতকেই আদিম ভারত-সংহিতা বলিয়া গ্রহণ করেন, সেইজন্য এই আষাড়ে গল্পের অবতারণা।

তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) দর্শন করিয়া ব্যাস যেন বলিলেন—"ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাঁহাতে এই এই বিষয় সন্নিবিষ্ট করা আমার বাসনা।' ব্রহ্মার যেন ইচ্ছা ছিল যে, ব্যাসদেবের মনঃসঙ্কল্পিত ভারত-সংহিতা খানি 'ইতিহাস' নামে অভিহিত হউক; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা নিজে তাহাকে কাব্য বলিয়া উল্লেখ করাতে তিনি যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন—

"তুমি জন্মাবধি সত্য ব্যবহার করিয়া থাক,

আমরা কখনও মিথ্যা বল নাই; তোমার মুখে সর্ব্বদা ব্রহ্মবাক্য নির্গত হয়; তুমি নিজে যখন তোমার মনঃসঙ্কল্পিত গ্রন্থকে 'কাব্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তখন তাহা'কাব্য'বলিয়াই পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে।"

তার পর ব্রহ্মার আদেশমতে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গণনায়ককে স্মরণ ও তাঁহার উপস্থিতি এবং ভারত-সংহিতা লিখনে প্রবৃত্ত হওয়া প্রভৃতি, সমস্তই স্বপ্নের কাজ বলিয়া পরিচয় দিলে, বর্ত্তমান কালের পুরাণ পাঠকগণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন।

তবে স্বপ্নের প্রকৃতি যেরূপ, ইহার প্রকৃতিও সেইরূপ হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু স্বপ্ন দেখিনা কেন, সে বিষয়ে পূর্ব্বে হয়তো কোন চিন্তা করিয়াছিলাম। সেইরূপ ব্যাসদেব হয়তো, ভারত গ্রন্থ রচনার কল্পনা করিয়া সেই বিষয় অনেক দিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন এবং এক-জন দ্রুত-লেখকের অনুসন্ধানে ছিলেন। সে সময়ে তো আর (Short-hand writing) সঙ্কেত চিহ্ন দ্বারা লিখন-প্রণালীর প্রচলন ছিল না যে, কূটার্থপূর্ণ শ্লোক সমূহ সহজে লিপিবদ্ধ হইবে, কাজেই বেদব্যাস হয়তো একদিন নিরাশ হইয়া ভাবিয়াছিলেন, দৈবীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে এ কার্য্য কাহারও দ্বারা সম্ভবিতে পারে না। তাই নিদ্রিতাবস্থায় একেবারে ব্রহ্মা উপদেষ্টা আর গণেশ লেখক হাজির হইলেন। ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন রূপ আখ্যায়িকা দ্বারা, ভারত-সংহিতা ইতিহাস কি কাব্য, এই কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পাছে লোকে এই 'ভারত' গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে,সেই জন্যই যেন এই অনৈসর্গিক গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। এই উপাখ্যানের দ্বারা যেন পুরাণ-পাঠককে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, ব্যাস যখন ভারত গ্রন্থকে 'কাব্য' রূপেই রচনা করিয়াছিলেন, তখন 'কাব্য'রূপেই পাঠকগণের তাহা গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ণ বাবু বলিয়াছেন—(মহাভারতের) কাব্য সৃষ্টি অভ্যন্তরে, ইতিহাস তাহার বাহ্যাবয়বে। কাব্যসৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ। কাব্য সৃষ্টি উহাদের মূলে ও স্কন্ধে, ইতিহাস উহাদের পল্লবে। কাব্যসৃষ্টি উহাদের মূল আখ্যায়িকা রচনায়, ইতিহাস সেই আখ্যায়িকা বর্ণনায়।—কাব্যচিন্তা, ৪৯।৫০ পৃষ্ঠা।

আমি তাহা বলি না। আমার মত, ঠিক ইহার বিপরীত। মহাভারতের প্রকৃত ইতিহাস, সেই ইতিহাসোক্ত পাত্রগণ, আর সেই পাত্রগণের জীবনী ও সমসাময়িক ঘটনা, সমস্তই অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে রাখিয়া, কল্পনা সাহায্যে উপাখ্যান আকারে সজ্জিত করিয়া তাহাকে এক একটী মনোরঞ্জক গল্পে পরিণত করা হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমার মতে, ঐতিহাসিক মহাভারতের মূল—অভ্যন্তরে, কাব্যসৃষ্টি তাহার বাহ্যাবয়বে। মূলে—ইতিহাস, কাব্য-কল্পনা তাহার ভূষণ। বহু আখ্যায়িকার মূলে সত্য নিহিত, কিন্তু কাব্যাবরণে এবং কল্পনার ভূষণে তাহা আবরিত।

বঙ্কিম বাবু বলেন—"ইউরোপিয়েরা মহাভারতকে Epic poem বলিয়া থাকেন; দেখাদেখি এখনকার নব্য-দেশীয়েরাও সেইরূপ বলিয়া থাকেন। এই কথা বলিলেই মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সব উড়িয়া গেল। মহাভারত তাহা হইলে কেবল কাব্যগ্রন্থ; উহাতে আর ঐতিহাসিকতা থাকিল না।"

"কেন, মহাভারতকে সাহেবেরা 'কাব্য-গ্রন্থ' বলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমন হইতে পারে না; কেন না, সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত। বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয় যে প্রকার সৌন্দর্য্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে, মেকলে, কার্লাইল ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্ত্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানব চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্য চরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য-সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই; মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে যে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূলকথা, এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস মূলতঃ যে ঐতিহাসিক নহে, এমন বিবেচনা করিবার, কোন উপযুক্ত কারণ কেহ নির্দ্দেশ করেন নাই এবং নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে এমনও বিবেচনা হয় না।" কৃষ্ণচরিত্র, ১ম সংস্করণ, ৯।১০ পৃষ্ঠা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

কবীর-প্রকাশ।

১। বিরহিন্ দের্ সন্দেশরা শুন হমারে পিউ। (ব)
জলবিন্ মচ্ছী ক্যাও জীয়ে পানীমেকা জীউ।

বিরহিনী বলিতেছে (কাতর) বচনে।
"প্রিয়তম শুন মম বাণী,
জল বিনে মীন বল বাঁচিবে কেমনে?
আহা! সে যে জলচর প্রাণী!"

২। বিরহ তেজ তনমেঁ তপে অঙ্গ্ সভি অকুলায়।
ঘট শূনা জীউ পিউ মেঁ মৌত ঢূঁঢ় ফির্‌যায়।

তপ্ত হইয়াছে তনু বিরহ অনলে,
সর্ব্ব অঙ্গ আকুল হয়েছে।
শূন্যদেহ, প্রিয় পাশে প্রাণ গেছে চ'লে,
খুঁজে খুঁজে যম ফিরে গেছে।

৩। কবীর সুন্দরী এঁয়ো কহে শুনিহো কন্ত সুজান।
বেগ মিলো তুম্ আয় কর্ নাঁহিতো তজিহো প্রাণ

কবীর কহেন, এই কহিছে সুন্দরী
"ওহে কান্ত শুনহ বচন।
আমার নিকটে তুমি এসো শীঘ্র করি
নতুবা যে যায় হে জীবন।

৪। কে বিরহন কে মীচ্ দে কে আপা দিখ্‌লায়।
আট পহরকা দাঝনা মোপে সহা ন যায়।

হয় দাও মৃত্যু, নয় দাও দরশন,
এক চাহে বিরহিনী নারী।
আট প্রহরের এই দারুণ দহন
আমি আর সহিতে না পারি।

৫। বিরহ কমণ্ডল্ করলিয়ে বৈরাগী দো নৈন।
মাংগে দর্শমধুকরী ছকে রঁহে দিন রৈন।

বিরহ করঙ্গ করে করিয়া ধারণ
বৈরাগী হয়েছে দুটী আঁখি।

ভিক্ষা মাগে মাধুকরী তব দরশন
দিবস যামিনী চেয়ে থাকি।

৬। ইহ তনকা দিবলা করঁ বাতী মেঁলূ জীউ।
লোহ সীঁচু তেল জেঁও বব্ মুখ দেঁখুঁ পীউ॥
আমার এদেহ আমি প্রদীপ করিয়া
এ জীবন বাত্তি তায় দিব।
তেলের বদলে দিব শোণিত সিঞ্চিয়া
প্রিয়মুখ যবে নিরখিব।

৭। বিরহা আয়া দরদ্ সে কড়ুয়া লাগা কাম।
কায়া লাগীকাল হোয়্ মিঠা লাগা নাম॥
দরদ হইতে হলো বিরহ সঞ্চার,
কটু হইয়াছে এবে কাম,
কাল ব'লে জ্ঞান হয় এই দেহভার
মধুময় লাগিতেছে নাম।

৮। কবীর হঁসনা দুর কর রোনেসে কর চিত্।
বিন্ রোয়ে ক্যাঁও পাইয়ে প্রেম পিয়ারা মিত্॥
হাস্য পরিহাস দুর কর (সযতনে),
রোদনে রাখহ চিত্ত সবে,
কহেন কবীর, বিনা রোদনে কেমনে
প্রেম প্রিয় মিত্র লাভ হবে?

৯। হঁস্ হঁস্ কন্ত্ ন পাইয়াঁ বিন্ পায়া তিন্ রোয়্।
হাঁসি খেলে পিউ মিলে তো কোন্ দুহাগন্ হোয়্॥
হেঁসে হেঁসে কান্ত মনে হবেনা মিলন।
কাঁদে যেই সেই জন পায়,
হাঁসিয়া খেলিয়া যদি মিলে প্রিয়জন
তবে কেবা দুঃখী হতে চায়।

১০। সুখীয়া সব্ সংসার হৈ খাওয়ে আওর শোওয়ে।
দুখীয়া দাস কবীর হৈ জাগে আওর রোওয়ে॥
এ সংসারে সকলেই সুখে নিমগন,
খায় আর ঘুমায় অবাধে,
শুধুই কবীর দাস দুঃখী একজন
সে কেবল জাগে আর কাঁদে।

১১। নাম বিয়োগী বিকলতন্ তাহি ন চিন্হে কোয়।
তাম্বোলীকে পান জ্যাঁও দিন দিন পীলা হোয়্।
নামের বিয়োগী (আহা হারাইয়া নাম)
বিকল হয়েছে এবে দেহ,
দিন দিন পীত যথা তাম্বুলীর পান
চিনিতে পারে না তাই কেহ।

১২। নৈন্ হমারে বাবরে ছিন ছিন লোড়ে তুঝ্।
না তুম্ মিলো না মৈঁ সুখী এয়সে বেদন মুঝ।
পাগল আমার এই যুগল নয়ন,
পলকে পলকে তোমা চায়,
তুমিও মিলনা, সুখী নহে মোর মন
এমনি বেদন মম হায়।

১৩। মাংসগয়া পিঞ্জর রহা তাকন্ লাগা কাগ্।
সাহব অজহুঁ ন আইয়া কোইমন্দ্ হমারা ভাগ॥
মাংস খসিয়াছে, দেহে অস্থি মাত্র সার,
এক দৃষ্টে কাক চেয়ে আছে,
হায় হায় কি যে মন্দ কপাল আমার!
আজিও না এলো প্রভু কাছে।

১৪। বিরহ্ প্রবল্ দল্ সাজকে ঘেরলিয়ো মোহি আয়।
নঁহি মারে ছোড়ে নঁহী তড়ক্ তড়ক্ জীউ যায়॥
বিরহ প্রবল দলে সাজিয়া এবার
একেবারে ঘিরেছে আমায়,
মারেও না ছাড়েও না, হায় রে আমার
ধড়্ ফড়্ করি প্রাণ যায়।

১৫। পিয় বিন্ জীয় তরসত্ রহে পলপল বিরহসতায়।
রৈন্ দিবস মোহী কল নঁহী সিকস্ সিকস্ দম্ যায়॥
প্রিয় বিনে এ জীবন ব্যাকুল আমার,
পলে পলে বিরহ জ্বালায়।
কিবা দিবা কি যামিনী শান্তি নাই আর;
শিহরি শিহরি প্রাণ যায়।

১৬। নিশ দিন দাঝে বিরহীনী অন্তর গত কি লায়।
দাস কবীরা ক্যাঁও বুঝে সৎগুরু গয়ে লগায়॥
বিরহিনী অন্তরের অনল দহনে
দিবা নিশি মরিছে জ্বলিয়া,
কহেন কবীর দাস নিভিবে কেমনে?
সৎগুরু দিয়াছে লাগাইয়া।

১৭। পীর পুরাণী বিরহ কি পিঞ্জর পীর ন যায়।
একপীরহৈ প্রীত কি রহী কলেজে ছায়্।
বিরহ বেয়াধি এবে পূর্ণ হইয়াছে,
দেহ পীড়া না ঘুচিল হায়!

প্রীতি হাতে অঙ্গ এক পীড়া জন্মিয়াছে,
কলিজা রয়েছে ছেয়ে তায়।

১৮। চোট সতাওয়ে বিরহকি সবতন্ জাজর হোয়।
মারন্ হারা জানহি কে জিস্ লাগী সোয়॥

বিরহ সন্তাপ সদা করিছে দহন,
সর্ব্বঅঙ্গ জর জর তায়,
সেই সে বেদন জানে দহিছে যে জন,
আর জানে লাগিছে যাহায়।

১৯। বিরহ ভুওঙ্গম বস্‌করি কিয়া কলেজে ঘাও।
বিরহন্ অঙ্গ্ ন মোড়হী জঁ্যাও ভাওয়ে ত্যাঁও খাও॥

বিরহ ভুজঙ্গ দল সদা করি বাস,
কলিজায় করিয়াছে ঘা।
তথাপিত বিরহিনী না ফিরিল পাশ
যেমন করিয়া ইচ্ছা খা।

২০। দেখত্ দেখত্ দিন গয়া নিশভি দেখত্ যায়্।
বিরহিন্ পিয় পাওয়ে নাহী কেবল জীয় ঘবরায়॥

দেখিতে দেখিতে আহা দিন চলে যায়,
সেই ভাবে নিশিগত হয়,
বিরহিনী প্রিয় সঙ্গ না পাইল হায়,
কম্পবান বিকল হৃদয়।

২১। গঁলু তুম্হারে নাম পর জঁ্যাও আটেমেঁ নোন্।
এয়েসা বিরহামেল কর্ নিত দুখ পাওয়ে কোন্॥

তোমার নামেতে আমি যাইব গলিয়া
মিলে যথা আটাতে লবণ।
এমন বিরহ সঙ্গে মিলন করিয়া
নিত্য দুঃখ পাবে কোন্ জন?

২২। বিরহা বিরহা মত্ কহো বিরহা হৈ সুলতান্।
জাঘট বিরহ ন সঞ্চরে সোঘট জান্ মশান্।।

বিরহ বলিয়া তুচ্ছ করো না কখন
বিরহ সাক্ষাৎ সুলতান,
যে দেহে বিরহ নাহি করে বিচরণ,
সে দেহ ত মশান সমান।

২৩ জোজন বিরহী নামকে সদা মগন মন মাঁহি।
জঁ্যাও দরপণ কী সুন্দরী কিনহু পকড়ী নাহি॥

নামের বিরহে যেই বিরহী, সেজন
অন্তরেতে সদা মগ্ন থাকে,
দর্পণের সুন্দরীকে ধরিতে যেমন
কোনো দিকে নাহি পাই তাকে।

২৪। হিরদে ভিতর দৌ জলে ধুঁয়ান পরঘট হোয়।
জাকে লাগী সো লখে কে জিন্ লাই সোয়্।।

হৃদয় নিভৃতে সদা জ্বলে হুতাশন,
ধূঁয়া তার দেখা নাহি যায়,
জ্বলিছে যাহার মাত্র দেখে সেই জন,
আর দেখে যে জন জ্বালায়।

২৫। সোদিন কৈসা হোগা গুরু গহেঙ্গে বাঁহ (বায়)
আপনা কর বৈঠাওয়াহি চরণ কমল ছাঁহ।।

সেদিন কেমন হবে গুরুদেব হায়,
করিবেন এ কর ধারণ,
শ্রীচরণ কমলের ছায়াতে আমায়
বসাবেন করিয়া আপন।

২৬। তন ভিতরে মন্ মানিয়া বাহর কঁহু ন লাগ।
জ্বালতে ফির জল ভয়া বুঝী জলংতি আগ॥

বাহ্য প্রকৃতিতে মন লাগিছে না আর,
অন্তরে হয়েছে নিমগন,
জ্বালা হতে হলো পুনঃ জলের সঞ্চার
নিভিল জ্বলন্ত হুতাশন।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

বুকে আয়।

সহরের কোলাহল, মুখরার কন্দল
শুনিয়া শুনিয়া কাণ হইয়াছে ঝালা পালা,
সভ্যতার অত্যাচারে, ক্ষত বক্ষ শত ধারে
এসেছি তোদের দ্বারে জুড়াতে প্রাণের জ্বালা।

সামান্ত খড়ের ঘর, সম্মুখেতে দামোদর
অদূরে একটী বট অতি শান্ত ছায়া দানে,
ছাড়ি বাদ বিসম্বাদ, বসিতে বড়ই সাধ
গোময়-লেপিত অই আঙ্গিণার মাঝখানে।

৩

দক্ষিণেতে ধান ক্ষেত, খেলিছে সবুজ খেত,
মায়ের উন্মুক্ত বক্ষ ক্ষুধিত-সন্তান তরে;
সহরের সৌধমালা, বাড়ায় প্রাণের জ্বালা
দেখিতে মায়ের মূর্ত্তি এসেছি তোদের ঘরে।

৪

যেথা দুঃখী যেথা চাষা, সেথায় মায়ের বাসা,
জননী থাকে না কভু দুর্ব্বলেরে পরিহরি।
ত্যজিয়া উৎসব বাড়ী, আনন্দ উল্লাস ছাড়ি
হেথায় আছেন মাতা রুগ্ন ছেলে কোলে করি।

৫

আমিও করেছি আশা, হেথায় করিব বাসা,
আর ত লাগেনা ভাল সভ্যতার গণ্ডগোল।
কাঁদিব তোদের দুখে, হাসিব [illegible],
তোদের ধরিলে বুকে পাইব মায়ের [illegible]।

৬

তোদের নয়নজল, ঢালে হৃদে শত-বল,
একটী নিশ্বাস দেয় নির্ব্বাপিত বহ্নি জ্বালি,
কি শক্তি তাহাতে আছে, কত তুচ্ছ তার কাছে
সভ্যতার কোলাহল কোটী হস্তে করতালি।

৭

তোরা মোর ছোট ভাই, কেন রব ঠাঁই ঠাঁই,
তোদের ফেলিয়া গ্রাস কেমনেরে মুখে যায়,
তোদেরে দুহাতে ঠেলে, পারি কি থাকিতে ফেলে
মায়ের কাঙ্গাল ছেলে আয় তোরা বুকে আয়।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

কলিকাতার ইতিবৃত্ত। (৩)

নামকরণ।

সহরের নাম "কলিকাতা" বা "ক্যালকাট্টা," কিরূপে হইল ইহা লইয়া অনেক মত ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা;—১ কিলকিলা নগরী, ২ কোলখাতা, ৩ কোলেকাতা, ৪ যক্ষপুরী, ৫ গলগাটা, ৬ কালকাটা, ৭ খালকাটা, ৮ কালীঘাটা, ৯ কালীকোটা, ১০ আলীনগর।

কোন কোন বিজ্ঞ প্রাচীন অধিবাসীর বিশ্বাস, দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে যে কিলকিলা নগরীর উল্লেখ আছে, তাহারই অপভ্রংশে কলিকাতা নাম প্রচলিত হইয়াছে।

বাবু গৌরদাস বসাক একটী বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এখানে কোল জাতির অধিবাস ছিল, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কুটীর শ্রেণীকে খাতা বলে, তাহা হইতে কোলখাতা নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে কলিকাতা হইয়াছে।

অন্য মতে প্রকাশ, এই স্থান পুরাকালে কৈবর্ত্ত জাতির বাসস্থান ছিল। তাহাদের অনেকেই নৌকা বাহিয়া বা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গঙ্গার ধারে এবং যে খালটী গঙ্গা হইতে বাদা পর্য্যন্ত প্রবাহিত থাকিয়া কলিকাতাকে চৌরঙ্গী জঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, সেই খালের ধারে বাস করিত। কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে "কোলে" একটী সাধারণ উপাধি, সচরাচর লোকে "কোলে কৈবর্ত্ত" বলিয়া থাকে। সেই কোলেদিগের বসতি হেতু স্থানের নাম

---

* কালীঘাট সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তি পাওয়া গিয়াছে। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের কেহ কেহ বলেন,—তাঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাদসাহ কর্ত্তৃক মজুমদার হইবার পূর্ব্বে যশোহর পতিদিগের সরকারে কার্য্য করিতেন। বেহালা প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধীনে ছিল, তিনিই বেহালার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং বর্ত্তমান স্থানে কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা বসন্তরায়ের অনুমতিক্রমে উহার ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ এবং দেবোত্তর প্রদান করেন। চৌরঙ্গীগিরির কথা উহাঁরা স্বীকার করেন না।

"কোলেকাতা" যাহা হইতে এক্ষণে কলিকাতা হইয়াছে।

কিলকিলার ন্যায় "যক্ষপুরী"ও একটী পুরাতন স্থানের নাম, সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, অনেকে কলিকাতাকে সেইস্থান বলিয়া উল্লেখ করেন।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের বিলাতের Gentlemen's Magazine পত্রিকায় কলিকাতার ঝড়ের উল্লেখে ইহাকে Gal Gata বলিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে কোন কোন ইতিহাস লেখক প্রথমে ইংরাজেরাই এই স্থানকে উক্ত নাম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করেন।

আর একটী সাধারণ প্রবাদ এই যে, একজন ঘাসুড়িয়া ঘাস কাটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, জনৈক ইংরাজ জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়া আপনার ছড়িগাছটী ঐ ঘাসের গাদার উপর ঠেসাইয়া এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঘাসুড়িয়া মনে করিল, ঐ ঘাস কবে কাটা হইয়াছে তাহাই বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে উত্তর করিল, কালকাটা, অর্থাৎ কল্য কাটিয়াছি। ইহা শুনিয়া সাহেব স্থানের নাম "কালকাটা" স্থির করিয়া লইলেন। এই "কাল কাটা" শব্দের ভিতরেও দুই মত আছে। অন্যমতে বলে, প্রথমে যখন ইংরাজেরা আপনাদিগের দাঁড়াইবার এবং দ্রব্যাদি জাহাজ হইতে নামাইবার নিমিত্ত কতকগুলি লোককে জঙ্গল কাটিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একজন সাহেব একটী কর্ত্তিত বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া কাঠুরিয়াকে স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ভাবিল, কবে ঐ গাছটা কাটা হইয়াছে তাহাই জানিতে চায়, তদুত্তরে বলিল, কালকাটা।

জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা রিবিউ পত্রিকার ১৮শ ভাগের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তিনি ১৭২৪ খৃঃ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কোন চিঠি পত্রে "ক্যালকাট্টা," নাম খুঁজিয়া পান নাই, সুতরাং মহারাট্টা, খাল কাটার পর "খালকাটা" শব্দ হইতে ক্যালকাট্টা হইয়াছে, অনুমান করেন।

অনেকে বলেন, কালী ঘাট হইতে কালীঘাটা, তাহার অপভ্রংশে কলিকাতা নাম প্রচলিত হইয়াছে।

অনেক বিজ্ঞলোকের বিশ্বাস, বর্ত্তমান কালীঘাট আধুনিক, পূর্ব্বে নিজ কলিকাতাতেই কালীর মন্দির ছিল, তাহাকে লোকে কালীকোটা বলিত, সেই কালীকোটা শব্দ হইতে ক্রমে অপভ্রংশে "কলিকাতা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে জয় করিয়া ইহার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন।

এখন একে একে এই কয়টী প্রবাদ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কিলকিলা পুরী যে কলিকাতা, তাহা কেবল কিরিয়ায়ের দিগ্বিজয় প্রকাশ হইতে অনুমান মাত্র। আগামীবারে আমরা ইহার আলোচনা করিব। কোল জাতি এই বন ও জলাভূমিতে এমন কি উপার্জ্জনের পন্থা পাইবে যে, বংশ পরম্পরায় এখানে বাস করিয়া আপনাদিগের নামানুসারে স্থানের নামকরণ করিবে? তাহাদের সমস্ত জাতি কি একেবারে অদৃশ্য হইল? বরং কোলেকাতা কতকটা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কারণ দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কৈবর্ত্ত জাতিরা বহুকাল হইতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের কোন বংশ সুবিধা বুঝিয়া এখানে আগমন করা অসম্ভব নহে। কোন ইতি-

হ্যাস লেখক বলিয়াছেন, এখানকার একটী উচ্চ ভূমিতে ধীবরেরা জাল শুকাইতে দিয়াছে এবং তাহার নিকট তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর গুলি তিনি জাহাজ হইতে দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি পুরাতন পোস্তার উচ্চস্থানের উপরই জাল শুকাইতে দেখিয়া থাকিবেন। উপরে যে খালের কথা লিখিত হইয়াছে, সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের মান চিত্রে তাহা সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।' ঐ খাল কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সীমা। বর্ত্তমান পুলিস ঘাটকে পূর্ব্বে কুচাগুড়ি ঘাট বলিত, ঐ ঘাট হইতে হেষ্টিংসষ্ট্রীট দিয়া ঠিক গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের উত্তর ফটকের স্থান পর্য্যন্ত খালটী সমরেখায় আসিয়া ঐ স্থান হইতে ধনুকাকৃতিভাবে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর দিয়া ওয়েলিংটনস্কোয়ার পার হইয়া ক্রিকরোর উপর দিয়া, সিয়ালদহের দক্ষিণ বাহিয়া বাদায় মিশিয়াছিল। এখন যে স্থানকে জেলটোলা বলে তাহা ইহার তীরে এবং এই স্থানের মৎস্যজীবীরা অতি প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কোলে উপাধিধারী ছিল কি না এবং তাহার নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে, ইহাও কেবল অনুমান মাত্র। যক্ষপুরী কখনই কলিকাতার নাম ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, ১৫৪০ খ্রীঃ ডিঃ বারোস বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্ন বঙ্গে এই কয়টী স্থানের উল্লেখ আছে, সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং খাঁটরা। বরাহ নগরটী গঙ্গার পশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। আগড়পাড়ার নিম্নে যক্ষ তাহা Xos বলিয়া লিখিত, ইহাকে যদি যক্ষ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উহা আগড় পাড়ার এতদূর নিম্নে যে, তাহাকে কলিকাতার স্থান বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা চক্ষে দেখিয়া যতদূর পারিয়াছেন চিত্রিত করিয়াছেন মাত্র, এমন কি অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপ দেখিলেও যখন হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তখন ডিঃ বারোসের দোষ কি? ১৭৯৪ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে কলিকাতার যে সীমা নির্ণয় হয়, তাহাতে দেখা যায়, বাগবাজারের সম্মুখে গঙ্গার পশ্চিমে এখনকার ঘুসড়ির নাম সে সময় পর্য্যন্ত যক্ষপুর ছিল। ডিঃ বারস ভ্রম ক্রমে বরাহ নগরটী গঙ্গার পশ্চিমে এবং যক্ষপুরটী পূর্ব্বে লিখিয়াছেন। ১৭৩৯ সালের Gentlemen's Magazine মধ্যে Gal Gata দেখিয়া যাঁহারা এই স্থানের ঐ নাম ইংরাজেরা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উহা হইতে ক্রমে ক্যালকাট্টা হইয়াছে অনুমান করেন, তাঁহাদের ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর অত্যন্ত অধিক লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিত, সেই জন্যই ইহাকে ইংরেজেরা শশ্মান মনে করিতেন। যিশু খ্রীষ্টকে যে শশ্মানে হত্যা করা হইয়াছিল তাহার নাম "গলগোথা", তদনুসারে এই স্থানেরও নাম করণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রথম প্রস্তাবের ৩২০ পৃষ্ঠার টিপ্পনিতে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈদেশিক নূতন স্থানের নাম না জানায় এবং পত্র লেখকের সাবধান হইয়া স্থানের নাম না লেখায় পত্রিকা-প্রকাশকেরা ভ্রম ক্রমে C দুইটীকে G করিয়াছেন মাত্র। কর্ণেল ইউল বলেন, পূর্ব্বের সমস্ত চিঠি পত্রাদিতে সুতানুটী ও গোবিন্দপুরেরই নাম প্রদত্ত হইয়াছে, Documentary Memoirs of

Job Charnock পুস্তকে ১৬৮৬ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বরের পত্রে "কলিকাতার" উল্লেখ দেখা যায়।

ঘাস বা গাছ "কাল কাটিয়াছি" এই কাল কাটা হইতে ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি সম্পূর্ণ গল্প কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং উহার আলোচনা অনাবশ্যক। উপরোক্ত কলিকাতা রিভিউর লেখক ১৭২৪ সালের পূর্ব্বে কোথাও ক্যালকাট্টা নামের উল্লেখ না দেখিয়া মহারাট্টা খালকাটা হইতে ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি বিবেচনা করা তাঁহার ভ্রান্তি মাত্র, কারণ কর্ণেল ইউল ১৬৮৬ সালের পত্রে ক্যালকাট্টার নাম নিজে দর্শন করিয়াছেন। অবশ্য জব চার্ণক প্রথমে সুতানুটীতে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত গ্রামের মধ্যেই কুঠী প্রস্তুত করায় অধিকাংশ পত্রাদিতে সুতানুটীর ঠিকানা দেওয়া হইত, গোবিন্দপুরেও একটী বর্দ্ধিষ্ণু বাজার থাকায় তথায় যাহা ক্রয় বিক্রয় হইত, তন্নুপলক্ষে গোবিন্দপুরের নামও প্রচলিত হইয়াছিল। কলিকাতা গ্রামে তখন তেমন হাটবাজার না থাকায় উহার কোন উল্লেখের আবশ্যক হয় নাই। ১৬৮৬ সালের উক্ত পত্রস্থ কলিকাতা গ্রামের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কারণে উহার উল্লেখ হইয়া থাকিবে। যেরূপেই হউক যখন নাম ছিল প্রকাশ হইতেছে, তখন আর ১৭২৪ সালের পর খাল কাটার স্মরণার্থ ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি কখন সম্ভবে না। বরং উক্ত লেখক রীতিমত অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আর একটী কথা এই যে, তিনি ১৭২৪ সালের পূর্ব্বে ক্যালকাট্টা নাম দেখেন নাই ইহাতে বুঝা যায় ঐ সালে দেখিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র খাল ১৭৪০ খ্রীঃ কাটা হইয়াছিল।

কালীঘাট হইতে কালীঘাটা, তাহা হইতে কলিঘাটা, পরে কলিকাতা হওয়া অপেক্ষা কালীকোটা হইতে পরে পরে কলিকোটা, কলকোটা কলকত্তা এবং ক্যালকাট্টা বা কলিকাতা হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। যে রূপেই পরিবর্ত্তিত হউক, কালীর নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আজিও জন্মস্থান ত্যাগ করিলে অনেক লোক "কালী কলকত্তাওয়ালী" বলিয়া থাকেন। ১৭৭০ খ্রীঃ টমাস কিচেন তাঁহার ম্যাপে কলিকাতার নাম কালীকোটা লিখিয়াছেন, আরও কোন কোন ভ্রমণকারী কালীকোটা বলিয়াছেন।

আইন আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য নূতন ভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাকে যে কয় সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাতগাঁ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম একটী প্রধান সরকার, ইহার অধীনে ৫৩টী মহাল ছিল। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ১৭৮৩ খৃঃ উহা অনুবাদ করিয়া গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভাগের ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠায় এই মহাল গুলির তালিকা ও কোন্ মহালে কত খাজনা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎসমস্তই লিখিত আছে। বড় বড় মহাল গুলির নিজস্ব খাজনা তহসিল ছিল। ছোট ছোট মহালগুলি দুইটী এবং কোন কোন গুলি তিনটীও এক সঙ্গে [illegible] ও তহসিল বন্দোবস্ত হয়। সমস্ত সাতগাঁ সরকারের খাজানা ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১১৮ টাকা, তদ্ভিন্ন যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে এই সরকার

হইতে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৬ হাজার পদাতিক সৈন্য দিবার নিয়ম হয়। সাতগাঁ সরকারের মধ্যে, মাকুয়া, কলকত্তা ও বার্ব্বাকপুর এই তিনটী মহাল এক তহসিলে বন্দোবস্ত, ইহার খাজানা, ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ২১৫ দাম। টাকায় ৪০ দাম, তদনুসারে ২৩ হাজার ৪০৫।৶০ হয়। বার্ব্বাকপুরটী আবার হাজিপুর মহালের সহিত এক তহসিল বন্দোবস্ত দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত বার্ব্বাক পুরটী একটী সুবিস্তীর্ণ মহাল থাকায়, তাহার কতক অংশ হাজিপুর মহালের সহিত, আর কতক মাকুমা ও কলকত্তা নামক ক্ষুদ্র দুইটী মহালের সহিত আবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্লাডুইনের মাকুমাকে অন্যান্য অনুবাদকেরা বাঁকুয়া লিখিয়াছেন। আবার হলওয়েল সাহেব বাগুয়া লিখিয়াছিলেন। এখন আমরাও বাগুয়া বলিতেছি।

মুড়াগাছাও একটী স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া লিখিত আছে, পাইকান পরগণার কোন উল্লেখ তাহাতে নাই, কিন্তু ইংরাজদিগের আগমন কালে ইহা কলিকাতার নিজ দক্ষিণে ছিল, তাহা কালীঘাট প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মুড়াগাছা পাইকানের পূর্ব্ব দিকে। হাজিপুর বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবর। ডায়মণ্ডহারবার অতি নূতন নাম, ১৭৮০ সালের রেনেলের ম্যাপে ঐ স্থানে কেবল ডায়মণ্ড পয়েণ্টবলিয়া লিখিত আছে। এখনও অধিবাসীরা উহাকে হাজিপুর বলিয়া থাকে। বার্ব্বাকপুর হাজিপুর ও কলকত্তার সহিত সংযুক্ত থাকায় উহা বজবজ হইতে গোবিন্দ-পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলা যাইতে পারে। মাকুমা বা বাঁকুয়া অথবা বাগুয়া নিশ্চয় কলিকাতার উত্তর। কলিকাতার প্রথম মাজিষ্ট্রেট, যাহাকে সে সময় জমীদার বলিত সেই হলওয়েল সাহেব তাঁহার ১৭৫২ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছেন;—কলিকাতা চারি ভাগে বিভক্ত,১ম ডিহি জাননগর (১) ও কলিকাতা, ২য় গোবিন্দপুর, ৩য় সুতানুটী, ৪র্থ বাগুয়া কলিকাতা। এখন আমরা বুঝিতেছি, কলিকাতা আধুনিক নাম নহে, পূর্ব্বে ইহাকে কালীকোটা বলিত। আজিও যেমন বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত লোক "কলকত্তা" বলে, উত্তর পশ্চিমবাসী রাজা টোডরমলও তেমনি কালীকোটাকে কলকত্তা বলিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান করা যায় "কলকত্তা" নাম রাজা টোডর-মলেরই প্রদত্ত। তৎপরে এখানকার অধিবাসীরা কলিকাতা নামকরণ করিয়াছেন। সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ইহার নাম আলীনগর রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে ইংরাজেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন নামই বাহাল করেন, কেবল আলী-পুর বলিয়া একটী গ্রামের নাম হয়।

সীমা।

কলিকাতার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথমত কুচাগুড়ি বা পুলিস ঘাট হইতে যে খালের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও স্বাভাবিক সীমা ছিলই, তৎপরে দেখা যায়, ১৭০০ খ্রীঃ কোম্পানি নবাব আজিম উসা-হানের নিকট যে ইজারা পান, তদনুসারে

(১) একখানি পুরাতন ম্যাপে আমরা ডিহিজান নগর ও কলিকাতা এক সীমার মধ্যেই দেখিয়াছি, উক্ত জান নগর বর্ত্তমান জানবাজারের স্থানে। কিন্তু আপজনের ১৭৯২ সালের ম্যাপে বর্ত্তমান থিয়েটার রোডের পূর্ব্বে সর্কিউলার রোডের পরপারে আর একটী জান নগর আছে।

পুরাতন দুর্গের কিয়দ্দূর দক্ষিণে একটী সূচ্যগ্র স্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সীমাই স্থির হইতেছে। পূর্ব্ব সীমা ডিহি শিয়ালদহ, ডিহি সুরা, ডিহি বাহিরঃসিমলা (গড়পাড়) ডিহি মাণিকতলা। উত্তর সীমা ডিহি সূতালুটী। সূতালুটীর দক্ষিণ সীমা নবাব মীর বহরের ঘাট, হইতে আরম্ভ করিয়া জোড়াবাগান, মেছুয়াবাজার, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণ দিয়া ঝামাপুকুরের উত্তর হইয়া মাণিকতলা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বসীমা ডিহি মাণিকতলা ও ডিহি উল্টা ডিঙ্গী। উত্তর সীমা বর্ত্তমান শোভাবাজার ষ্ট্রীট যাহা পূর্ব্ব কেটো ষ্ট্রীট, বলিয়া পরিচিত ছিল, তথা হইতে শ্যামবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত। এই শ্যামবাজার ষ্ট্রীট অতি পুরাতন রাস্তা, ১৭৫৬ সালের ম্যাপেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সূতালুটীর উত্তরে বাগুয়া। এই বাগুয়া বাজার হইতে বর্ত্তমান বাগবাজার হইয়াছে।

১৭৮০ সালে কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে যে তিনখানি গ্রাম ইজারা লন, তাহা সূতালুটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নহে, বাগুয়া সূতালুটী ও কলিকাতা। তাহার সীমানা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল যথা; —উত্তর সীমা বরাহনগর (২) দক্ষিণ সীমা গোবিন্দপুরের উত্তর উপরোক্ত নালা, পশ্চিম সীমা গঙ্গা এবং পূর্ব্বসীমা বাদা। (৩) দীর্ঘে নদীর ধারে ছয় মাইল। যেরূপ দক্ষিণ সীমাস্তম্ভের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, উত্তরেও ঐরূপ একটী সীমা স্তম্ভ ছিল, তাহা আমাদের স্মরণ আছে। বাগবাজারের উত্তরে চিৎপুর রোড যেখানে পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই কোণের কয়েক হস্ত পশ্চিমে গঙ্গাতীরে প্রায় চারি ফিট চতুষ্কোণ দশ ফিট উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত সূচ্যগ্র একটী স্তম্ভ ছিল। পোর্ট কমিশনরেরা কয়েক বৎসর হইল উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের কাউন্সিলে কলিকাতার এক প্রকার সীমা নির্দ্দেশ হয় যথা;— উত্তর সীমায় যক্ষপুর (ঘুসড়ি) হইতে বর্ত্তমান টালার পুলের নিম্ন পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সীমা মহারাষ্ট্র খালের পশ্চিম পাড়, দক্ষিণ সীমা পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব প্রান্তে যে পুরাতন সমাধি ক্ষেত্র আছে, তথা হইতে আদি গঙ্গার মুখ দিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত, গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভাটার সময় যে পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই পর্য্যন্ত পশ্চিম সীমা।

গোবিন্দপুর।

রেশম ও তুলার সূতার জন্য বঙ্গদেশ চিরদিন পৃথিবীতে আদরিত। অতি পুরা-

(১) উইলিয়ম বেলির কৃত ১৭৮৪ সালের ম্যাপে কেটোষ্ট্রীটের উত্তর এবং চিৎপুর রোডের পশ্চিমে ডিহিসূতানুটী কেন লেখা হইয়াছে জানি না।

(২) বরাহ নগর চিৎপুরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ছিল।

(৩) বাদাকে অতি পূর্ব্বে "হাদা দহ" বলিত। নদী জলে ভগ্ন স্থানকে হানা, ভূমিকম্পে যে কোন স্থান গভীর রূপে ধসিয়া গেলে তাহাকে হাদা, অথবা দহ বলিয়া থাকে। আমরা প্রথম প্রস্তাবে নিম্ন বঙ্গের সময় সময় ধসিয়া যাওয়ার অনেক প্রমাণ দিয়াছি। কোন সময় বর্ত্তমান বাদাও ঐরূপে ধসিয়া এত গভীর হইয়াছিল যে, তাহার উপর দিয়া সামুদ্রিক পোত সকল যাতায়াত করিত। পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রোসিডিং পুস্তকে পাঁচখানি সমুদ্র যাত্রা বিষয়ক প্রস্তাবের পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, একখানি এমন নষ্ট হইয়াছে যে, তাহার প্রায় কিছুই উদ্ধার করিতে পারেন নাই, অপর চারিখানিতেই হাদাদহের উল্লেখ আছে। লেখকেরা শ্রুত কথা লেখায় উহার স্থান নির্ণয়ে গোলযোগ করিয়াছেন, কেবল একখানিতে আছে, হাদাদহ পার হইয়া একটী বাঁক ফিরিয়া জাহাজ মগরায় পহুছিল।

কালে রোমক প্রভৃতি স্থানের সম্রাটদিগের বিলাস পদার্থের জন্য সহস্র বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া বণিকেরা সপ্তগ্রামে আগমন করিতেন। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার রাজধানী না হইলেও বাণিজ্য স্থান বিধায় ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অর্ণবপোত ইহার নিকট আসিয়া সরস্বতী সলিলে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহারা কেবল বস্ত্র প্রার্থনা করিত না, ভারত-জাত অন্যান্য নানাবিধ বস্তুতে আপনার উদর পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইত। সুতরাং কি গোলকুণ্ডের হীরক, কি তির্ব্বতের স্বর্ণ ও মৃগনাভি, কি লঙ্কাদ্বীপের মুক্তা, কি কাশ্মিরের সুদৃশ্য সাল, কি ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লিন, ভারতের যেখানে যে কোন শিল্প দ্রব্য, আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতি সমস্তের বৃহৎ বৃহৎ ভাণ্ডার লইয়া সকল স্থানের বণিকেরা এখানে বাস করিতেন। তন্তুবায় জাতির শেঠ ও বসাকেরা এখানকার বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। বাঙ্গালার যে যে প্রদেশে সূক্ষ্ম বা সুচিত্রিত ছিট প্রভৃতি বস্ত্রের নির্ম্মাতা তন্তুবায়েরা বাস করিত, সেই সেই স্থানে শেঠ ও বসাকদিগের কুঠী থাকিত। তথাকার অধ্যক্ষ সেখানে পর্য্যাপ্ত বস্ত্র একত্র করিয়া সপ্তগ্রামের প্রধান বাণিজ্যালয়ে পাঠাইত। এইরূপে চারিদিক হইতে রাশি রাশি মূল্যবান বস্ত্র আসিয়া তাঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিত। বিদেশীয় বণিকদিগকে তাহা বিক্রয় করিয়া ইহাঁরা নানাদেশীয় ধনে আপনাদিগকে যথেষ্ট ধনবান করিয়াছিলেন। কেবল যে তাঁহারা ধনবান হইয়াছিলেন, তাহা নহে, দেশ বিদেশে বিশেষ সম্মানও লাভ করিতেন, শেঠ শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

যে সময় পদ্মানদী প্রবাহিত ছিল না, গঙ্গা অষ্টসখী সঙ্গে লইয়া রাজমহল পর্ব্বত সীমার পূর্ব্বতল দিয়া দক্ষিণমুখী হন, কিয়দ্দূরে আসিয়া সরস্বতী ও যমুনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন গঙ্গা দুঃখে ক্ষীণ কলেবরা হইয়া কালীকোটাকে অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া, পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে সঙ্গিনী অন্বেষণে গমন করেন এবং মগরার নিকট আসিয়া অন্য দু একটী সখী পাইয়া পশ্চিম দক্ষিণে অগ্রসর হন কিয়দ্দূরে শাঁখরাইলের নিকট আসিয়া দেখেন, আনন্দে বিস্ফারিতা সরস্বতী দামুদরের সহিত বিবাহিতা হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে রূপনারায়ণ আসিয়া প্রণাম করিল, কিছু পরে কালী নদী আসিয়া মিলিল। কালীনদী আসিয়া যেন গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া বরণ করিতে লাগিলেন, সেইজন্য একটী সুবিস্তীর্ণ ঘূর্ণী জল এখনও দেখা যায়, শ্রীমন্ত সওদাগর উহাকে কালীয়াদহ বলিয়াছেন, তিনি সেই দহে কমলেকামিনাকে গজ গিলিতে দেখিয়াছিলেন। (১) গঙ্গা উহাকেও সঙ্গে লইয়া সগরবংশ উদ্ধারে প্রস্থান করিলেন। আদি গঙ্গাকে বামে রাখিয়া খিদিরপুর মেটে ব্রুজ প্রভৃতির নিম্ন দিয়া যে পথে এখন গঙ্গা চলিতেছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহা একটী সামান্য খাল মাত্র ছিল। ঐ খাল দিয়া হিজিলী হইতে ছোট ছোট ডোঙ্গায় লবণের আমদানী হইত। খালটী দস্যু তস্কর ভয়ে লোকের অগম্য ছিল। চৈতন্য দেব ঐ খাল দিয়া পুরুষোত্তমের দিকে গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে ইহাকে এখন কাটী অর্থাৎ কাটা গঙ্গা বলে। ১৬শ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিবেণীর নিকট চড়া

(১) মিঃ ডবলি, এচ কেরি ভারতবর্ষে এইরূপ ছায়া দৃশ্যের অনেকগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

পড়িয়া সরস্বতীর স্রোতপথ উচ্চ হইয়া পড়ায় ভাগীরথী দিয়া অধিকাংশ জল চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। তদবধি উপরোক্ত হিজলির খাল প্রবল হওয়ায় গঙ্গার সমস্ত জল ঐ পথে বহিয়া যায়, উহাতেই আদি গঙ্গা মজিয়া গেল। সরস্বতীরও ক্রমে ক্রমে মধ্যে মধ্যে এমন চড়া পড়িতে লাগিল যে, বড় বড় অর্ণবপোত যাতায়াত করা বিপদজনক হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমান শেঠ ও বসাকেরা নদীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এ স্থানে আর অধিক দিন ব্যবসায় চলিবে না। নানা কারণে তাঁহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করিলেন। বিদেশী পোত সকল যেখানে গভীর জল পাইবে, সেই পথেই যাইবে। হিজলির খাল দিয়া যখন ভাগিরথীর স্রোত প্রবল হইল, তখন ঐ পথ দিয়াই জাহাজ আসিবে, এই ভাবিয়া উহার শীর্ষ দেশে আপনাদের নূতন বাসস্থান মনোনীত করিলেন। নূতন স্রোতের ধারে বাসস্থান না করার প্রধান কারণ এই যে, যদিও গঙ্গার জল উহা দিয়া যাইতেছে তত্রাচ উহা গঙ্গা নহে, উহার পতিতপাবনী শক্তি নাই। হিন্দু গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে সর্ব্বপ্রকার পারমার্থিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া গঙ্গাতীরে মানব লীলা সম্বরণ করাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই গঙ্গাবাসের জন্য, এখানে বাসস্থান স্থির করেন। আরও কারণ আছে, একেত সাতগাঁয় আর সুবিধা নাই, তারপর নূতন রাজা মুসলমানদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ভয় করিতেন; বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের বিশ্বাস ছিল, মুসলমান গৃহে পদার্পণ করিলে গৃহ দেবতার দেবত্ব থাকে না, গৃহস্থেরাও হিন্দুত্ব বর্জ্জিত হন। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল :—হুগলি জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুরের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বে ঐ গ্রামের অন্য নাম ছিল, অনুমান ১৬৩০খ্রীঃ বাদসাহ পুত্র সাজিহান উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার সময় সপ্তগ্রাম দেখিবার মানসে সরস্বতী নদীতে নৌকা যোগে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উপরোক্ত গ্রাম্যঘাটে তিনি নৌকা লাগাইলে গ্রামবাসীরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বাদসাহ দেখিবার জন্য বিষম জনতা করিল। দেবানন্দ দত্ত নামে জনৈক কায়স্থ যুবা আরব্য ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি স্নান করিবার জন্য নদীতীরে গিয়া নৌকার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হন। নৌকায় সে সময় একখানি পারস্য কাব্য পাঠ হইতেছিল। পাঠক এক স্থানে অশুদ্ধ উচ্চারণ করায় চপল যুবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার হাসিতে সাজিহানের দৃষ্টি পড়ায় তিনি উহাঁকে ধরিতে আদেশ করেন। দেবানন্দ ধৃত হইবা মাত্র অপর দর্শকেরা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, অনেকে দেবানন্দের গৃহে গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে এই সংবাদ নানা শাখা প্রশাখায় সজ্জিত করিয়া প্রদান করিতে লাগিল। সাজিহান নৌকায় দেবানন্দকে আনাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় যুবক নির্ভীকচিত্তে কারণ প্রদর্শন করিলে, উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর অর্থ বোধ এবং ব্যাকরণে সমধিক অধিকারাদি দেখিয়া সাজিহান অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দেবানন্দ দত্তকে আপনার জনৈক মুন্সীপদে নিযুক্ত করিলেন। পরে তিনি বাদসাহ

হইলে দেবানন্দকে যথোচিত পদমর্য্যাদায় উন্নত করিয়াছিলেন। এদিকে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবানন্দের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন বলিয়াই গ্রামস্থ সকলের বিশ্বাস হইল। এখন যেমন অনেক যুবা উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইলে ইংরাজ সাজিতে ভাল বাসেন, তখনও অনেক যুবা তদ্রূপ মুসলমান সাজিতেন। দেবানন্দ দীর্ঘশ্মশ্রু ধারণ করিতেন ও মোগলাই পোষাক পরিতেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি বাদসাহের নিকট অবকাশ লইয়া স্বদেশে আগমন করেন। বাদসাহের উচ্চকর্ম্মচারীর উপযুক্ত রেসেলা প্রভৃতি আড়ম্বরের সমস্তই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া নিজ গ্রামের ঘাটে লাগিল। যখন লোকজন সহ দেবানন্দ মুন্সী গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার মুসলমান পরিচ্ছদ দৃষ্টে কেহই চিনিতে পারে নাই, সকলই গ্রামে মুসলমান আসিয়াছে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবানন্দ মুন্সী ক্রমে আপনার গৃহের পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা প্রমাদ গণিলেন, "সত্য সত্য মুসলমান যদি আমার গৃহে আসে, তাহা হইলে দেবতাও নষ্ট হইবেন, আমারও জাতি যাইবে, সুতরাং অগ্র হইতে দেবতাকে গলায় বাঁধিয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নদীতীরে প্রস্থান করি," এই বলিয়া সস্ত্রীক দেবতা লইয়া সরস্বতী তীরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন শুনিলেন, মুসলমানেরা তাঁহারই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি স্ত্রীর হাত ধরিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতা মাতাকে ডাকিতে লাগিলেন, গৃহে সকলই আছে কেবল মনুষ্য নাই দেখিয়া সহজেই কারণ বুঝিলেন। তখন আপনার উষ্ণীষ ইত্যাদি নামাইয়া গ্রামস্থ লোকদিগের নাম ও সম্বন্ধ ধরিয়া যখন ডাকিতে লাগিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে চিনিল এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার বিজাতীয় পরিচ্ছদের জন্য কি প্রমাদ হইল, তাহা বর্ণন করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিল। উহাঁ হইতেই উক্ত দত্তপরিবার মুন্সী উপাধি লাভ করিয়াছেন। গ্রামটীও দেবানন্দপুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মুন্সীর নিকট আমরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। এই প্রকার জাতি ধর্ম্ম ভয়েও শেট বসাকেরা রাজধানীর বহুদূরে জঙ্গলপার্শ্বে বাস করা মঙ্গল ভাবিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, রাজ কর্ম্মচারীরা, এমন কি নবাব পর্য্যন্ত, ধনবান ব্যবসায়ীদিগের প্রতি সর্ব্বদাই লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেন। টাকার আবশ্যক হইলেই দিতে হইবে। আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রদেশে তৎকালে বিস্তর তন্তুবায়ের বাস ছিল। সিমলা হইতে বরাহনগর পর্য্যন্ত অনেক তাঁতী বাস করিত, তাহারা চমৎকার ছিট বুনিত। কালীকোটা ইতর লোকদিগের বাসস্থান ছিল বটে, কিন্তু বাগুয়ায় অনেক ভদ্রলোক ও তন্তুবায় বাস করিত। সুতালুটী বাগুয়ার মধ্যেই একটী হাট মাত্র, তথায় তন্তুবায়েরা সূতার তাল ও বস্ত্র বিক্রয় করিত। তদ্ভিন্ন এক্ষণে যাহাকে হাবড়ার হাট বলে, তাহা অতি প্রাচীন হাট, পূর্ব্বে ব্যাঁটরার হাট বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐ হাটে আজিও বস্ত্র ভিন্ন আর কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় না। ব্যাঁটরা অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত। উপরে আমরা ডি বরোসের মানচিত্রে ব্যাঁটরার উল্লেখ করিয়াছি, বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Account of Howrah নামক পুস্তকে

১০ম পৃষ্ঠায় ব্যাটরায় নর্সিংদেব চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত একটী দেবালয়ের ভগ্ন স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা যে কত শত বৎসরের প্রাচীন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত কয়েকটী কারণে সপ্তগ্রামের ধনবান শেঠ ও বসাকেরা পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও পুরাতন গঙ্গার সংগম স্থলে নববাস নির্ম্মাণ করেন। বাবু গৌরদাস বসাকের মতে ১৫২০ হইতে ৩০ সালের মধ্যে গোবিন্দপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরে তিনি লিখিয়াছেন, "১৫৩০ খ্রীঃ সর্ব্ব প্রথম পর্টুগীজ জাহাজ গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাঁহারা গোবিন্দপুরে শেঠ ও বসাকদিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছিলেন।" কিন্তু কেরি সাহেবের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিবৃত্তে ৩য় ভাগের ১৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, জন সিলভিরা নামক পর্টুগীজ ১৫১৮ খ্রীঃ এখানে আসিয়াছিলেন। তাহার পর অর্ম্মির মতে ১৫৩৪ সালে, অপর মতে ৩৭ সালে পর্টুগীজ সৈন্য গৌরের নবাবের আহ্বানে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া হুগলিতে স্থান লাভ করে। প্রথম পর্টুগীজ সংশ্রব হিসাবে ১৫১৫ সালের পর গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

কেবল যে শেঠ বসাকেরাই এখানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। নিকটস্থ অপরাপর কায়স্থাদি ভদ্র ও ধনবান লোকেরাও আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। আমরা শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-তীর্থ মহাশয়ের "দত্তবংশ" তালিকায় দেখিতে পাই, গোবিন্দশরণ দত্তও আন্দুল ছাড়িয়া ঐ নব নগরে বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দ শরণের পিতামহ কৃষ্ণানন্দ দত্ত চৈতন্যদেবের সমকালীন, ইনি সপ্ত গ্রামের একজন ধনবান কায়স্থ, আন্দুলের চতুর্ধরী ছিলেন। নিত্যানন্দ ইঁহার সপ্তগ্রামের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দশরণ দত্ত মধ্যম, রামশরণ দত্ত জ্যেষ্ঠ, হরিশরণ দত্ত কনিষ্ঠ, ইহাঁদের পিতার নাম কন্দর্পরাম দত্ত, তিনি আন্দুলে বাস করিতেন। গোবিন্দশরণ, বঙ্গীয় দত্তবংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে ১৭ সপ্তদশ পুরুষ। তিন ভাই বিষয় বিভব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইলেন। রামশরণ আন্দুলেই রহিলেন, গোবিন্দশরণ রাজা টোডড়মলের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন, হরিশরণ মুড়াগাছায় গিয়া বাস করিলেন। রাজা টোডড়মল গোবিন্দশরণের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য মানসিংহকে আদেশ করেন। মানসিংহ বার্বাকপুরের মধ্যে তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করায় তিনি পুরাতন ও নব গঙ্গার সংগমস্থলে বাস করিয়া নিজ নামানুসারে ইহাকে গোবিন্দপুর নাম প্রদান করেন। (১)

তাহা হইলে গোবিন্দশরণের আগমন ১৬শ শতাব্দীর শেষে বা ১৭শ শতাব্দীর

(১) কেদার বাবু লিখিয়াছেনঃ—
"শ্রীরামশরণো জ্যেষ্ঠো গোবিন্দো মধ্যমস্তথা।
কনিষ্ঠ শ্রীহরিশ্চৈবং কুলাচার্য্যে বিচারিতং॥
বিষয়ানাং বিভাগেষু তেষাং বৈরং পরস্পরং।
অভবৎ স্বল্পকালে তৎ সর্ব্ব বিপ্লাবনংপরং॥
গোবিন্দ শরণ স্ত্যক্ত্বা স্বগৃহে বিপন্নাদিকং।
লেভে তোড়ল্মলাৎ কার্য্যং ভূমিদানাদি কর্ম্মষু॥
তোড়ল্মলস্ত কৃপয়া মানসিংহ নৃপায় সঃ।
অর্পয়ামাস গোবিন্দং জ্ঞাত্বা কার্য্যক্ষমংহি তং॥
গোবিন্দস্ত স্বকার্য্যেষু তুষ্টো রাজা মহামতিঃ।
আকবরাজ্ঞয়া ভূমিং দদৌ তং গৌড়মণ্ডলে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে কালিকাপীঠসন্নিধৌ।
গোবিন্দশরণশ্চক্রে গোবিন্দপুরপত্তনং॥"

প্রারম্ভে অবশ্য বলিতে হইবে। গৌরদাস বাবু যে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে, ১৬শ শতাব্দীর শেষে গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়াছে।

কেবল মাত্র কেদার বাবুর "দত্ত বংশ" আমাদের অবলম্বন নহে। তৎসাময়িক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। কবিরাম প্রণীত "দিগ্বিজয় প্রকাশ"মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবিত কালে লিখিত। (১) সম্ভবত সে সময় রাজা শালিখার নবনির্ম্মিত দুর্গে বাস করিতেছিলেন। কবি বলিতেছেন, "গোবিন্দ দত্ত নামক এক রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে ফিরিবার সময় কালী তাঁহাকে স্বপ্নে আহ্বান করিয়া "বাদর রসা" নামক আপনার নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে আদেশ করেন। গোবিন্দ দত্ত তথায় মৃত্তিকা মধ্যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন এবং অপরাপর কায়স্থ ব্রাহ্মণ নবশাখাদি সর্ব্ব জাতিকে আহ্বান করিয়া নিজ নামে গ্রামের নাম করণ করিয়াছিলেন।"(২) এই সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তার কথা আমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিব? সুতরাং আন্দুলের চতুর্ধুরী রাজা টোডরমলের সহকারী গোবিন্দশরণ দত্তই যে গোবিন্দপুরের সংস্থাপক, তাহা মানিয়া লইতে হইতেছে। গোবিন্দপুরের পূর্ব্বনাম "বাদর রসা।"

কালজমীদার অর্থাৎ কলিকাতার বাঙ্গালী সহকারী মাজিষ্ট্রেট গোবিন্দ রাম মিত্রের জীবনী লেখকও বলিয়াছেন, গোবিন্দ রাম মিত্র ১৬৮৭ খ্রীঃ পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া চার্ণক সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া বাস করিলেন এবং নিজ নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখিলেন। (১) অথচ উহার নিম্নচ্ছত্রে লিখিয়াছেন, ১৬৯৫ সালে যখন গোবিন্দপুরে (!) দুর্গ নির্ম্মিত হয়, সেই সময় তিনি কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। উক্ত দুর্গ যে কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, লেখক তাহা জ্ঞাত ছিলেন না।

গৌরদাস বাবু বলেন, মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, শিবদাস বসাক, বারপতি বসাক ও বাসুদেব বসাক এই পাঁচজন বস্ত্র-বিক্রেতা সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া ঐ স্থানে বাস করেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাম শেঠ প্রধান এবং তাঁহার আনিত গোবিন্দজী বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, সম্ভবত ১৭৫৯ খ্রীঃ গোবিন্দপুরবাসীদিগকে স্বগ্রাম ছাড়িয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিতে হয়। শেঠ বসাকেরা অধিকাংশ বড়বাজারে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গোবিন্দজী বিগ্রহের জন্য গঙ্গার ধারে নূতন দেবালয় নির্ম্মিত হয়, এখনও তিনি সেই গৃহে আছেন, কিন্তু গঙ্গা তাঁহাকে ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, তিনি টাকশালের পূর্ব্বে দরমাহাটা ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিতি করিতেছেন।

গতবারে আমরা বরিষার সাবর্ণ চৌধুরী কেশবরাম রায়ের ব্যবহর্ত্তা রুক্মিণীকান্ত মজুমদারের পরিচয় দিয়াছিলাম,তিনি সাধারণত ব্যবহর্ত্তা উপাধি লইয়াছিলেন, তাঁহার

(১) প্রতাপাদিত্য ভূপস্য যশোর ভূমি পস্য চ।
গঙ্গাবাস স্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ।
দিগ্বিজয় প্রকাশ ৬৮৬ ছন্দ

(২) বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা।

(৪) An account of the Late Govindram Mitter. Page 1.

মৃত্যুর পর পৌত্র রামচরণ ব্যবহর্ত্তা উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে রামচরণ ব্যবহর্ত্তার সহিত জমীদারের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনিও গোবিন্দপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী ইহাঁকে প্রথমে হিজলির নিমক মহলের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র উপদ্রব দমনার্থ নবাব যে সৈন্য প্রেরণ করেন, রামচরণ তাহার প্রধান রসদ বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া যান, মেদিনীপুরে এই সৈন্যদল বিনষ্ট হয়, রামচরণও হত হইয়াছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৭৩৭ সালের ঝড় ভূমিকম্প ও জলপ্লাবনে তাঁহার নূতন গৃহখানি গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায়, তিনি পরিবার লইয়া সুবা বাজারে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কালীঘাটের হালদারদিগের আদি পুরুষ ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব পরিণিতা ভার্য্যার গর্ভজাত দুইটী পুত্রও গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন নানাস্থান হইতে অনেক ধনবান সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও নবশাকেরা আসিয়া গোবিন্দপুর পূর্ণ করিয়াছিলেন। জানবাজার শাঁখারীটোলা প্রভৃতি স্থানের সদগোপদিগের আদি পুরুষেরাও গোবিন্দপুরবাসী হইয়াছিলেন। একটী বর্দ্ধিষ্ণু নগরের উপযোগী হাট বাজার প্রভৃতি এবং আবশ্যকীয় শিল্পী ও কুলী মজুর প্রভৃতিতে লোকালয়টী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের মাতামহের পূর্ব্ব পুরুষেরা গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে শাঁখারীটোলার পূর্ব্ব কথিত খালের ধারে অনেক জমী পাইয়া নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে খালধারের ঘোষ বলিত। আর দুই জন সদগোপ ঘোষ শাঁখারীটোলায় এবং জানবাজারে জমী পাইয়া বাস করেন। হাজরা উপাধিধারী জনৈক সদগোপ ভবানীপুরে নকুলেশ্বরের নিকট বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের নামানুসারে হাজরা পুকুর, হাজরা রোড প্রভৃতি আজিও বিদ্যমান আছে।

গোবিন্দ শরণ দত্তের পৌত্র রামচন্দ্র দত্ত ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেই গোবিন্দপুর ছাড়িয়া সুতালুটী হাটে অর্থাৎ হাটখোলায় আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট হইতে নিমতলা ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ইহাদের নূতন বাটীর পরিসর ছিল। সুরসুনার সুবিখ্যাত সীতারাম আইচের বংশীয় একজন আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন, দুর্গ নির্ম্মাণ কালে তাঁহার বংশীয় রামগোপাল আইচ ও জগন্নাথ আইচ পটলডাঙ্গায় সুবিস্তৃত জমী পাইয়া বাস নির্ম্মাণ করেন। ঘোষাল বাবুদের বাটীর সংলগ্ন তাঁহাদের বাটী ছিল, তখন মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হয় নাই, উক্ত রাস্তা তাঁহাদের বাটীর উপর দিয়া গিয়াছে, রাস্তার দক্ষিণের সমস্ত জমী তাঁহাদেরই ছিল। শিমলা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ২৭নং বাটীনিবাসী ইঞ্জিনিয়ার বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র আইচ ও ডাক্তর দেবেন্দ্র চন্দ্র আইচ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ রামগোপাল আইচের পঞ্চম পুরুষ। জগন্নাথ আইচের বংশধর জোড়াসাঁকোয় বাস করিতেছেন। জগন্নাথ আইচ অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার পত্নী সহমৃতা হন, গমন কালে তিনি আপনার নাকের নতটী খুলিয়া যে বধূকে দিয়া যান, সেই মহিলাকে আমরা দর্শন করিয়াছি।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

বাঙ্গালীর যশোগান।

উচ্চ রবে এস ভাই দামামা বাজাই,
প্রাণভরে স্বজাতির যশোগুণ গাই।
আমিত বাঙ্গালী ভাই জাতির প্রধান,
মারামারি নাহি জানি উদার পরাণ।
তা বোলে কি, ভীরু আমি? ভুলেও ভেবনা;
গৃহদ্বন্দ্বে সাহসের না হয় তুলনা।
রাগে হই অগ্নিশর্ম্মা, আপনা পাসরি,
প্রাণপণে যুদ্ধ করি নাশিবারে অরি।
তখন আমার তেজ এমন দুর্জ্জয়,
বিদেশী দেখিলে পরে স্তব্ধ হয়ে রয়।
বলে তারা "ধন্য ধন্য বাঙ্গালী সুজন,
খাঁটি স্বদেশের প্রেমে, এরাই মগন।
কাকেও ছাড়ে না এরা হলে ক্রোধোদয়,
পিতা পুত্র নাশ করে না করি সংশয়।
নাশিতে নিদ্রিত জনে, বড় সুনিপুণ,
বীরত্ব দেখায় বড় করি নারী খুন।
মারামারি খুনোখুনি নিজ ঘরে ঘরে,
অম্লান বদনে এরা অনায়াসে করে।
এই গুণ শিক্ষারম্ভ বাল্যকালে হয়,
শিশুদের থাকে যবে কোমল হৃদয়।
ভাই বোনে মারামারি কথায় কথায়,
তারপর পাঠশালা বিদ্যালয়ে যায়।
বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বিসম্বাদ করি,
বালকেরা ভাবে করি বড় বাহাদুরী।
ইংরাজিতে গালী দেয় বাংলায় না মানে,
মহাদর্প করে সদা গুরুরে না মানে।
মরি মরি ইহাদের শিক্ষার কি গুণ,
মূর্খ লোকে দেখে পথে হেসে হয় খুন।
ভালরে শিক্ষার গুণ বিদেশী ভাষার,
গুরুশিষ্যে সমভাবে করে বেয়াকার।"
আমার গুণের কথা শুন মতিমান,
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ অমৃত সমান।
জ্ঞান লভিবারে আমি ভ্রমি সব দেশে,
নানা সাজ দেখে হেসে ফিরে আসি শেষে।
প্রখর বুদ্ধির বলে পরে করি স্থির,
আমরা হইতে চাহি, সাজের নজির।
স্বভাবে বক্তার জাতি আমরা সবাই,
ঠিক বলেছিল বুথ্ জান তুমি ভাই।
তাই আমি তাড়াতাড়ি সভাস্থলে যাই,
বহু দর্শনের কথা সবারে শুনাই।
বলিলাম ভাই বোন শুন মন দিয়া,
লভিলাম সারজ্ঞান অবনি ঘুরিয়া।
সকলের সাজ যদি করি পরিধান,
তবেত আমরা হব জাতির প্রধান।
সভাস্থলে করতালী চারিদিকে উঠে,
কেহ শত ধন্য দিল নিজ মুখ ফুটে।
তাই মোরা লইয়াছি সকলের সাজ,
আলো করে বসিয়াছি মনুষ্য সমাজ।
কভু হ্যাট্ কোট্ পরি কভু 'চাপকান্'
কভু কালা পেড়ে ধুতি, করি পরিধান।
পার্শি বা ইংলিশ্ কোট্, যাহা রুচি হয়,
পরিতে কাহারো কোট্ না করি সংশয়।
হাঁটুর উপর ঘরে তেল-ধুতি পরি,
বাহিরেতে আলখেল্লা, যোব্বা, ক্যাপ ধরি।
পা খুলিয়া গাড়ী চড়ি, রাজপথে যাই,
বলিলে নিগার ড্যাম্ ক্ষতি কিরে ভাই।
নানাবেশ ধরি আমি সভা করি আলো।
শিরে মোর বিঁড়ে ভাই বড় শোভে ভাল।
যে সভায় যাই আমি কিবা শোভা তার,
বিদেশীরা দ্যাখে আগে আমার বাহার।
নানাবিধ শিরসাজ দেখিয়া আমার,
তাহারা বুঝিতে নারে, এরা কোথাকার।
এ উহার পানে চায়, ফুস্ ফাস্ করে,
চুপি চুপি কথা কয় শির ধরি করে।
তারপর শুনে যবে বক্তৃতা আমার,
সব ধাঁধাঁ ঘুচে যায় বিদেশী ভায়ার।
তবে বলে "এরা সেই সেরা বক্তা জাতি,
শুনিয়াছি বুথ্ মুখে যাহাদের খ্যাতি।
জাতশুদ্ধ বক্তা বলে সংসারেতে ভালো,
নরের মাঝে নাট্যশালা এরা করে আলো।
সভার আহ্বানে হয় সদা অগ্রসর,
নাচ গান থিয়েটারে বদান্য প্রবর।
রঙ্গালয়ে ভিড় দেখ্‌লে এই মনে লয়,
বিদ্যালয় সব বুঝি শীঘ্র খালি হয়।
দেবভক্ত হেন জাতি কোথা আছে আর,
এক ধর্ম্মে সম্প্রদায় হাজার হাজার।
বিষকোটি লোক দেশে দেবতা তেত্রিশ,
তের কোটি দুখে মরে সদা করে রিশ্।

দেবতা থাকিতে এত সাধ নাহি মিটে,
বারয়ারি করে মিলে বড় আট্‌ পিটে।
বাইনাচ, যাত্রা আদি প্রধানাঙ্গ যার,
যত যণ্ডা মিলে দেশ করে ছারখার।
রাজবাটী বাই নাচ পূজার সময়,
সাঁহেবের হুড়োহুড়ি দেখি ঘর ময়।
মদ্য মাংসে পেট পোরে রাঙ্গামুখ দলে,
খাদ্যের বিচার কিছু নাহি সেই স্থলে।
ধন্য ধন্য দলপতি হিন্দুর সদ্দার,
কে বুঝিতে পারে বল মহিমা তোমার?
রাস্তাঘাটে কীর্ত্তনের ধুম দেখ যদি,
চমকিত হবে তুমি, শুন মহামতি।
মনে হবে ধর্ম্ম বুঝি কোন দেশে নাই,
একচেটে হয়ে বঙ্গে বাস করে তাই।"
এইরূপ বিদেশীরা কত কথা বলে,
স্বজাতির গুণ গান শুনি কুতুহলে।
আবার বলিব আমি শুন মতিমান,
আমাদের মহাতত্ব অমৃত সমান।
নৈয়ায়িক জাতি মোরা সন্দেহ কি তায়,
তাড়াতাড়ি কথা কই খই ফুটে যায়।
ছেলেগুলা বুড়াদের দাদা মহাশয়,
ফড় ফড় করে যেন শিলা বৃষ্টি হয়।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা সন্দেহ কি তার,
আমাদের ব্যর্থ ব্যর্থ করে সাধ্য কার?
তর্কে আঁটে আমাদের কে আছে ভূতলে,
সুখে বাস করি তাই পরপদ তলে।
সাতশ বছর করি, পরের গোলামী,
অঞ্জলী ভরিয়া দেই মনুরে সেলামী।
যে যা বল কারো কথা শুনিব না আর,
আমাদের জাতিভেদ্‌ বিধানের সার।
একজাতি মাঝে জাতি হাজার হাজার,
কার সাধ্য করে বল গণনা তাহার।
কোন জাতি আপনারে দেবতা ভাবেন,
অপরের শিরোপরে চরণ তোলেন।
পদধূলি দেন ধরে গম্ভীর আকার,
এঁরা খাঁটি বিনয়ের হন অবতার।
একারণে পুরাতন মনু শাস্ত্রকার,
বলেছেন ইহাঁদের দেব অবতার।
তারপর সব জাতি শূদ্র নামধরে,
তাঁদের জনম দ্বিজ সেবিবার তরে।
এই শূদ্র মাঝে জাতি হাজার হাজার,
কার সাধ্য করে বল গণনা তাহার।

তার মাঝে কোন জাতি হয় এত হীন,
যার ছায়া ছুঁলে স্নান করেন প্রবীন।
এক জাতে এত জাত থাকার কারণ,
আমাদের পরস্পর অদ্ভুত মিলন।
ইংরেজের মুচি মলে বিদেশীর হাতে,
যা গিয়ে লাগে যেন সম্রাটের মাথে।
দেশ শুদ্ধ রেগে উঠে করে মার মার,
মোরা বলি মুচি মলে তাতে কি আমার।
চাসা, ডোম, হাড়ী মুচী সকলি সমান,
ইতরের তরে কার কেঁদে উঠে প্রাণ।
বিদেশীর লাথি খেয়ে মলে ভদ্রলোক,
শুনিতে পাইলে মনে হয় বটে শোক;
কিন্তু তুমি জান সব কাহিনী আমার,
আর্য্য বংশে অবতংশ সদাই উদার;
তাই সেই শোক আমি ত্বরায় পাসরি,
শোধ নিতে শক্তি নাই, তাই ক্ষমা করি।
অতএব জাতিভেদ্‌ সদা অতুলন,—
ত্যজিতে নারিব মোরা থাকিতে জীবন।
বৃদ্ধে বৃহস্পতি মনু ধর্ম্ম অবতার,
সাক্ষাৎ ধরম বল্লে নহে অবিচার।
আইন করেন কত শূদ্রদের তরে,
শুনিলে নরের প্রাণ পুলকে শিহরে।
বিদ্যা শিখিবার সাধ যদি যায় প্রাণে
অমনি গরম তেল ঢাল তার কাণে।
শূদ্র যদি শাস্ত্র কথা মনোমাঝে রাখে,
তখনি অমনি তুমি প্রাণে মার তাকে।
শূদ্র যদি একাসনে বসে দ্বিজসনে,
ভেঙ্গে দাও পদ তার অম্লান বদনে।
ইত্যাকার কত কত সুন্দর নিয়ম,
বড় বড় সুধী যাহে নাহি দেখে ভ্রম,
করেছেন আমাদের মনু মহাশয়,
কোন্‌ দেশে আছে হেন লোক সদাশয়।
জাতিভেদ সর্ব্বসার বিধান বলিয়া,
আমাদের রক্তমাংসে গিয়াছে জড়িয়া।
অতএব আমরা যে জাতির প্রধান,
এতে বল, কে বল আর হবে সন্দিহান।
তাই দাঁও পাইয়াছে রীজ্‌লি এবার
বাহির করেছে ফন্দি হিন্দু নাচাবার।
জাতিভেদ্‌ বই লিখে বাজালেন ডঙ্কা,
বড় জাতে ছোট বলি বাড়ান আশঙ্কা।
একারণে আজকাল কত সভা হয়,
যাহে মিলে রাজা প্রজা পণ্ডিত নিচয়,

নিরূপণ করিবারে শ্রেষ্ঠ কোন্ জাতি,
কোমর বান্ধিয়া সবে করে মাতামাতি।
বড় বুদ্ধিমান মোরা অবনির মাঝে,
ভাবিয়া আকুল তাই, জাতি যায় পাছে।
জানি মোরা জাতি গেলে হব চতুষ্পদ,
তাহোতে নরের আর আছে কি বিপদ্।
ধন্য ধন্য ভাই বোন দুন্দুভি বাজাও,
উচ্চরবে স্বজাতির যশোগুণ গাও।
জাতিভেদ্ গৃহচ্ছেদ্ দলাদলি সহ,
জাতির প্রধান হয়ে চিরদিন রহ।
এইসব দেখে শুনে আনন্দে বিহ্বল,
ইচ্ছা হয় জাতি গুণ গাইব কেবল।
আমার গুণের কথা শুন মতিমান,
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ অমৃত সমান।
সাহেবী আফিস্ আমি করি গুলজার,
শিক্ষা বিভাগেও মম পূর্ণ অধিকার।
সাহেবের মনোরক্ষা করে সদা চলি,
তিনি যা বলান আমি সদা তাই বলি।
যখন তাঁহার সঙ্গে করি বাক্যালাপ
দেহ মনে বাড়ে যেন অতুল প্রতাপ।
বিশেষ ইংরেজী বুলি করিলে উদ্গার
নূতন জীবন আসে দেহেতে আমার।
তাই সে সময় হয় মেজাজ্ গরম,
রাখিনা খাতির করো রাখি না সরম।
দেশী লোক কাছে এলে ফিরেওনা চাই,
মনে করি বেঁচে যাই উঠিলে বাঁলাই।
তাই মম বংশাবলী চিরসুখে রয়,
খেয়ে পরে দশটাকা করিছে সঞ্চয়।
জ্ঞান ধর্ম্মে মনুষ্যত্ব বোকাগুলো কয়,
আমি বলি ধন হতে সর্ব্বগুণোদয়।
ধন হতে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে জগতে,
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয় ধন হতে।
ধনেতে পুলিশ বশ্ জজ্ মেজিষ্ট্রেট্,
সকলেই হয় বশ ভরাইলে পেট।
ধনেতে আসল খুনি মুক্ত হয়ে যায়,
ফাঁসি কাঠ পড়ে গিয়া সাধুর গলায়।
রাজা বশ্ প্রজা বশ্ ধনে বর্ণ্ সব,
গুরু পুরোহিত বশ্ থাকিলে বিভব।
থাকিলে প্রচুর ধন কেটিংচড়ে যাব,
বিদেশীর লাথি গাল মধু বলে খাব।
পেটে খেলে পিঠে সয় কি মধুর বুলি,
একচেটে পোরা আছে আমাদের ঝুলি।

থাকিতে এতেক গুণ কে নিন্দে আমায়ে,
ধিক্ থাক ধিক্ থাক্ শত ধিক্ তারে।
রাজ্য নাই রাজনীতি করি আলোচনা,
কেমন আমার দেখ সূক্ষ্ম বিবেচনা।
বক্তৃতার চোটে আমি ভারত মাতাই,
যদিও আমার ভাই পেটে অন্ন নাই।
বি-এ, এম-এ উপাধিতে করে গুণীকত,
মা, বাপেও মোর কাছে সদা অবনত।
ভয়ে মোর গুরুজন সদাই আড়ষ্ট,
ক্ষতি কি, বলিলে লোক, আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট।
গৃহে শান্তি না থাকিলে তাহে ক্ষতি নাই,
বাহিরে সুনাম মম আছেত সদাই।
বন্ধু বান্ধবের কাছে আমি একজন,
তাঁহারা সদাই মম গুণে মুগ্ধ হন।
উন্নত উদার মন সদাই আমার,
সদাই বাসনা দেশ করিতে উদ্ধার।
তাই বিলাতেও গিয়ে করি আন্দোলন,
স্বদেশের দুঃখরাশি করিতে মোচন।
শুনিয়া বক্তৃতা মম বৃটন্ কুমার,
মনো মাঝে দুখে সদা করে হাহাকার।
ভাবেন ভারতে মশা করে ভন ভন,
এক চড়ে সব দুঃখ হবে নিবারণ।
এ খপর শুনে আমি সদানন্দে মাতি,
মনে করি মারিলাম বড় বড় হাতী।
আমার স্বধর্ম্মে আস্থা যতই দেখিবে,
তব মনে ধর্ম্মনিষ্ঠা ততই বাড়িবে।
হোটেলে বিবিধ মাংস করিয়া ভক্ষণ,
মাঝে মাঝে ভাই আমি জুড়াই জীবন।
মুখ মুছি, ঘরে আসি নামাবলী পরি,
গঙ্গা স্নান করি আমি বলি হরি হরি।
তারপর পট্টবস্ত্র করি পরিধান,
সভা মাঝে সদা আমি করি যোগদান।
এইরূপ শুদ্ধাচারে সভা আলো করি,
বিদায় আদায় করে নিজ মূর্ত্তি ধরি।
বিধবার ধন রত্ন কাড়িয়া লইয়া,
শুদ্ধ হই কালীঘাটে পাঁঠা বলি দিয়া।
বিজয়াতে যার সনে কোলাকুলি করি,
বিজয়া ফুরালে তার সব লই হরি।
এমন ধর্ম্মের ভাব আছে কোথা আর,
আমি বিনা কে করিবে ভারত উদ্ধার।
তাই বলি শান্ত হয়ে শুন বন্ধুগণ,
নিরাশ হবার কিছু নাহিক কারণ।

যারা বলে আমাদের সেনা-বল নাই,
তাহারা বড়ই অজ্ঞ ঠিক জেনো ভাই।
আমাদের মহাবীর সুরেশ বিশ্বাস,
বিদেশ হইতে দেন সদাই আশ্বাস।
দেখান মার্কিন ভূমে প্রতাপ অতুল,
কেন তবে হবে মোরা ভয়েতে আকুল।
ইংরেজের রণতরি হাজার হাজার,
সাগরের মাঝে আছে কাতারে কাতার।
সাগরত তুচ্ছ কথা আমাদের তরি,
ডোবা, নদী, সরোবর সব যায় ভরি।
ইতু পূজার কথা ভাই কভু ভুলিও না,
আমাদের সাহসের না হয় তুলনা।
কে বলে বিজ্ঞান চর্চ্চা আমাদের নাই,
বেঁচে থাক্ আমাদের জগদীশ ভাই।
বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার,
বড় বড় সুধীগণে লাগে চমৎকার;
তাই তাঁরে গুরু বলি করিল স্বীকার,
ইউরোপে জয় জয় হইল তাঁহার।
এসব বড়াই নয় সত্য কথা ভাই,
বিলাত, মার্কিনে যাও তোমার দোহাই।
তারপর দেখ আর এক সুলক্ষণ,
আমাদের যারা করে বিলাতে গমন,
হইয়া নূতন জাতি, তারা সব ফেরে,
আহা, প্রাণে কত আশা তাহাদের হেরে।
মনে হয় নবযুগ হোল বাঙ্গালার,
নববেশে তাই দেশে আসিল কুমার।
ছাড়িল দেশের ভাষা, ছাড়িল পোষাক,
রীতি, নীতি, খানা, পিনা, ছাড়িল বেবাক।
সর্ব্বত্যাগী মহাবীর এদের সমান,
কোন্ দেশে আছে আর বল বুদ্ধিমান ?
সাহেবে নেটিভ বলে করেন যেমন,
সদাকাল আমাদের মিষ্ট সম্ভাষণ,
ইঁহারাও ততোধিক সদয় হইয়া,
কৃতার্থ করেন সবে, নেটিভ বলিয়া।
বাবু বলে ইঁহাদের ডেকোনারে ভাই,
ডাকিলে সাহেব বলে প্রফুল্ল সদাই।
দেশী নাম বল্লে এঁরা কভু তুষ্ট নন,
জন্, বুল্, হগ্ বল্লে বড় খুসি হন।
রাখিলে দেশের নাম করেন সংক্ষেপ,
ইংরেজী হরপ জুড়ে ঘুচান আক্ষেপ।
দিন দিন এই দল হতেছে প্রবল,
আয় ভাই সবে মোরা মিশি গিয়া চল্।

এখন সাহেব হতে আর ক্লেশ নাই,
ঘরে সবে অনায়াসে হওয়া যায় ভাই।
ঐ দেখ বামুন তারা পরি হ্যাট্ কোট্,
আফিসে চলিয়া যান হাসিভরা ঠোঁট্।
ঘরে আসি নিজমূর্ত্তি আবার ধরেন,
ভুঁড়ি খুলি এক ছোটে পাড়ায় ফেরেন।
প্রবেশিকা পাশ করি কত যুবাগণ,
অনায়াসে হ্যাট্ কোট করেন ধারণ।
সাহেব সাজেন কেহ না করিয়া পাশ,
বাঙ্গালার উন্নতির সুন্দর বিকাশ।
এখনো পরেনি যারা সাহেবের সাজ,
পেটে খিদে মুখে মাত্র আছে কিছু লাজ;
হ্যাট্ কোটে তাহাদেরো এত ভালবাসা,
শিশুগণে পরাইয়া মিটায় পিপাসা।
বাপ যান ধুতি পরে রাজপথ মাঝে,
ছেলের সাহেবী সাজ কি সুন্দর সাজে।
কি সুরুচি আহা মরি বলিহারি যাই,
জুতার উপরে মল কন্যারে পরাই।
পালকের কল্কাওলা টুপি দিয়া মাথে,
কন্যা যান খোলা মাথা কর্ত্তাদের সাথে।
এমন সুদৃশ্য শোভা জগমনোলোভা,
সারা ধরা খুঁজিলেও পাবেনাক কোথা।
আরবার ভাইগণ দামামা বাজাও,
প্রাণভরে স্বজাতির যশোগুণ গাও।
অবনিতে এ নিয়ম দেখি সর্ব্ব দেশে,
ভাষার উন্নতি আগে জাতি বাড়ে শেষে;
জাতীয় সম্পদ মাঝে শ্রেষ্ঠ হয় ভাষা,
মোরা ভাবি একথাটা প্রধান তামাসা।
তাই মাতৃভাষা প্রায় দিয়াছি ছাড়িয়া,
ইংরাজিকে সেই স্থানে যতনে রাখিয়া।
ইংরাজিতে কথা কই ইংরাজিতে সই,
ইংরাজিতে পত্র লিখি বন্ধু যার হই।
ইংরাজি বলিতে নারে মূর্খ বলি তারে,
কেমন উন্নতি মোর চেয়ে দেখনারে।
এক মাত্র ত্রুটি ভাই আছে আমাদের,
দেশী মন্ত্রে হয় পূজা সর্ব্বঠাকুরের।
ভট্টাচার্য্য হইলেন হ্যাট্ কোট্ ধারী,
তবে সেটা বাকী কেন বুঝিতে না পারি।
যা হোক্ তা হোক্ ভাই চিন্তা নাই আর,
অবশ্য ইহার শীঘ্র হবে প্রতিকার।
রাজ বাড়ী মহাসভা করিব এবার,
আগামী পূজার কালে হইবে বিচার;

আরবন্ত শাস্ত্রীগণ বসিলে তথায়,
ইংরাজিতে সব মন্ত্র জন্মিবে ত্বরায়।
সাহেবের কাছে সেথা ভুল কেটে লব,
নূতন ইংরাজী মন্ত্রে হবে পূজা সব।
কন্‌সারটের দল ধরিবে সুতান,
সুগভীর নাদে হবে জাতি গুণ গান।

স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হইবে তখন,
ভাবিব আমার আজি সার্থক জীবন।
সে সুখের দিন ভেবে দুন্দুভি বাজাও,
ভাই বোন সবে মিলে জাতি-গুণ গাও।

শ্রীকামাখ্যা চরণ ঘোষ

৺কালীপ্রসন্ন দত্ত।

জন্ম—২০শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১২৬৬ সাল।
জন্মস্থান—ফরিদপুরের অধীন চাওচা গ্রাম।
মৃত্যু—৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩০৮।
মৃত্যুস্থান—কলিকাতা। বয়স—৪২ বৎসর।

কখনও কখনও এই সংসারে এমন দুই-একজন লোক আগমন করে, যাহারা মনটাকে সংসারের কোন অতীত ধামে রাখিয়া আসে। তাহারা হাসে, খেলে, বেড়ায়, কাজ করে, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত হয় না, কিছুতেই বাধা পড়ে না। হাসিয়া হাসিয়া, খেলিয়া খেলিয়া, তাহারা কোথায় যেন চলিয়া যায়। যাওয়ার পর লোকেরা বলে, কি দেখিলাম, কি দেখিলাম! বুয়রযুদ্ধ-লেখক কালীপ্রসন্ন দত্ত এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর কত লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছে—হায়, এমন ছবি বুঝিবা এই সংসারে আর দেখি নাই। বিদ্বেষ, নীচতা, পরশ্রীকাতরতা আমাদের হাড়ে হাড়ে জড়িত, কালীপ্রসন্ন দত্তের হৃদয়ের ত্রিসীমায় এসকল ঠাঁই পাইত না; কেহ কখনও তাঁহাকে পর-নিন্দা করিতে দেখিয়াছে কি না, জানি না। মহত্বে অনুপ্রাণিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, পরনিন্দা যে স্থানে হয়, সে স্থানে কখনও থাকে না। অন্যের উন্নতিতে সদা তাঁহার চিত্তে আনন্দ খেলা করিত, কাহারও প্রশংসার কথা শুনিলে উল্লাসে তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিত। এরূপ চিত্র বুঝি বা আর কোথাও দেখি নাই।

বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি, তিনি আপন পর জানিতেন না। যাহার যে অভাব দেখিতেন, অম্লান চিত্তে তাহা দূর করিতেন। নিজের জিনিস বলিয়া কিছুর প্রতি তাঁহার আসক্তি দেখি নাই, যাহার যে অভাব, তাঁহার জিনিসের দ্বারা সে অভাব সকলে পূরণ করিত, তিনি সব সময়ে নীরব নির্ব্বিকার-চিত্ত থাকিতেন। কেহ তাঁহার নিন্দা বা তাঁহাকে গালাগালি করিলে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না;—অম্লান চিত্তে তাহাদের উপকার করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শত্রু-মিত্র বোধ ছিল না; যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সহিতও মিত্রতা করিয়া গিয়াছেন। লোকে তাহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইত! সময় সময় আমাদের মনে হইত, তিনি কি মানুষ, না দেবতা ছিলেন!

আমরা সদা ভয়ে জড়সড়, কিন্তু ভয় কি জিনিস, তাহা তিনি জানিতেন না। বাল্যকাল হইতে জীবনে কত সংগ্রাম গিয়াছে, একদিনের জন্যও বিচলিত হন নাই। ব্যাঘ্রের মুখে পড়িয়াছেন, টলেন নাই; শত্রুদের হাতে পড়িয়াছেন, দমেন নাই; কর্ত্তব্য পালনের জন্য জেলে গিয়াছেন, ভ্রূক্ষেপ নাই। অস্ত্রধারী বহু লোক হত্যা করিতে উদ্যত, দত্ত নির্ভীক

হৃদয়, স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত। দশ সহস্র টাকা তাঁহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, দুই স্থলে তাঁহাকে হত্যা করার আয়োজন হইয়াছিল, সকলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন,কিন্তু দত্ত কর্ত্তব্য-পালনে উন্মত্ত,সে স্থানে না যাইয়া পারেন নাই। শেষে তাঁহার সাহসের নিকট সকল ষড়যন্ত্র পরাস্ত হইয়াছিল।-তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বীর এই বঙ্গদেশে বড় দুর্লভ।

কাজ পাইলে দত্ত আপন অবস্থা, স্বাস্থ্য ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রি নাই, দিন নাই অবিরত খাটিতেছেন। তিনি যেন পাগল হইয়া যাইতেন। যখন কলেজে পড়িতেন, অনেক সময় পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার হুঁস থাকিত না। এক সঙ্গে সভার কাজ করিয়া দেখিয়াছি, অন্য সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেন, কিন্তু দত্তের চক্ষে একবারও ঘুম বসিত না। বিজনী-ষ্টেটের যে সকল কাজ তিনি করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, সকলেই অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছেন, এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা কি মানুষে সম্ভব? যখন অবসর পাইয়াছেন,তখনই তিনি পরোপকার করিয়াছেন। অবসর পাইয়াও অন্যের উপকার করেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত দত্তের জীবনে ঘটে নাই। আসামের অনেক ষ্টেট তাঁহার নিকট ঋণী।

তিনি জীবনে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু একটী টাকাও রাখিয়া যান নাই। লোকে বলে, ইহা তাঁহার বড় কলঙ্ক! তিনি দান করিতেন, লোকে জানিতেন না; তিনি লোককে খাইতে দিতেন, কিন্তু সংবাদ পত্রে সে কাহিনী উঠিত না। তিনি নিজে খাইতে যেমন ভালবাসিতেন, অন্যকে খাওয়াইতে তেমনি ভালবাসিতেন। যে লোক কখনও মদ্যপান বা ব্যভিচার করে নাই, তিনি সহস্র সহস্র টাকা পরোপকার করিয়া খাইয়া এবং খাওয়াইয়া উড়াইতেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"যে ভাবে আসিয়াছি, সেই ভাবেই চলিয়া যাইব, দিন বসিয়া থাকিবে না।"

বাল্যকাল হইতে দত্ত ধর্ম্মপিপাসু। কলিকাতা আগমনের কিয়দ্দিবস পরই কেশব চন্দ্রের ব্রাহ্মনিকেতনে আশ্রয় লন। সেই সময় হইতে আমাদের সহিত পরিচয়। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি একেশ্বর-বাদী। নিজে কখনও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন নাই, উপাসনা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও হিন্দু সমাজের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। যাহার সহিত দত্তের একবার দেখা হইত, তাহাকেই এমন মুগ্ধ করিতেন যে, সে কখনও দত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। গালাগালি দেও, প্রহার কর, নির্যাতন কর, নিন্দা কর—সে মহাযোগী নির্ব্বিকার-চিত্ত; তিনি বলিতেন, "নিন্দার কোন কথা আমার গায়ে লাগে না।" কেহ কোন রূপ তিক্ত ব্যবহার করিয়া কখনও তাঁহাকে রাগাইতে পারে নাই। ক্রোধ দত্তকে দেখিয়া যেন ভয় পাইত। তিনি সদা নির্ব্বিকার-চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কথা—"চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমাদের।" মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহাকে "চিন্তা করিও না"—বলা হইয়াছিল, তদুত্তরে দত্ত ঐ উত্তর দিয়াছিলেন। ঐ কয়েকটী কথার মধ্যে দত্তের সকল জীবনের বিশেষত্ব ও মূল মন্ত্র নিহিত। তাঁহার মস্তিষ্কের ন্যায় পরিষ্কার মস্তিষ্ক আর

দেখি নাই, যে ব্যক্তি দিবারাত্রি নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তিনি শেষ সময়ে বলিলেন—"চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমাদের।" বাস্তবিকও তিনি মহাযোগী ছিলেন, সংসারের অসার চিন্তা করিতেন না, মনটা তাঁহার অনেক উপরে ছিল, কল্য কি খাইবেন, কি পরিবেন, সে ভাবনায় অধীর হইতেন না, সদানন্দে বিভোর থাকিতেন। সকল চিন্তা যেন কোন্ চিন্তামণিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই যেন মহাযোগী তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবার আষাঢ় মাসে জন্মদিনে প্রার্থনা করিলেন--"গতজীবনে কত ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, আর যেন ভুলভ্রান্তি না করি॥" আর তাঁহাকে ভুলে মজিতে হয় নাই। তাঁহার কন্যাকে অগ্রহায়ণ মাসে সিবসাগর পাঠাইতে কার্ত্তিক মাসে পত্র আসিল, তিনি বলিলেন, 'সে অনেক বিলম্ব, ইহার মধ্যে কে মরে, কে বাঁচে, কে জানে?' ইহার মধ্যেই কোন সময়ে তাহার কোন বন্ধুকে লিখিলেন "যদি আমি হিসাব দিয়া না উঠিতে পারি, আমি ষ্টেটের যে সেবা করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া যেন আমাকে ক্ষমা করা হয়।' এবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেওয়া হইল, তিনি যে অহেতুকী প্রেমের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা পরকাল সম্বন্ধীয় প্রেমের কথা। পীড়ার আক্রমণের পরই বলিলেন "এযাত্রা আর রক্ষা নাই।" আর একটু পরে বলিলেন 'আজ হইতে পান খাওয়া ছাড়িলাম।" তিনি আর বাঁচিলেন না, আর পান খাইলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের শেষ, কিন্তু একটী বারও বলিলেন না, স্ত্রী বা মেয়েদের কি উপায় হইবে! কেবল পীড়া সম্বন্ধে বলিলেন, "চিন্তা আমার কি, চিন্তা তোমাদের।" জীবন্মুক্ত মহাযোগীর মহাযোগের কথা। এককথায় বলিতে গেলে, প্রেমে এবং প্রতিভায়, সেবায় এবং বুদ্ধিতে তিনি রাজা ছিলেন। যাহাকে একবার প্রেমে বাঁধিয়াছেন, এক দিনের জন্যও তাহাকে ছাড়েন নাই। কত লোক কত জনকে ভালবাসেন, আবার স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িলে, ভালবাসা ভুলিয়া যাইয়া শত্রু হন, কিন্তু দত্ত ভালবাসার চির গোলাম, ভালবাসিয়া কাহাকেও একদিনের জন্যও পর ভাবেন নাই। হৃদয়াংশে তিনি দেবতা ছিলেন। আর বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, তিনি অনিন্দিত রাজ সম্মানে ভূষিত ছিলেন। হাইকোর্টের বড় বড় ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ, আসামের হাকিমগণ, চিপকমিসনর পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রাখর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইতেন। বড়রাণী কর্ত্তৃক তাড়িতা এবং লাঞ্ছিতা, পথের ভিখারিণীতুল্যা রাণীকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছে যে ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রতিভা, সে ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রতিভার অলিখিত ইতিহাস আসামের অগণ্য প্রজামণ্ডলী, এবং কর্ম্মচারীর হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত। যাও আসামে, ঘরে ঘরে পরিচয় পাইবে, এমন প্রজাহিতৈষী, দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, বন্ধুবৎসল কৃতজ্ঞ কর্ম্মবীর এবং প্রেমিক দেবতা আর সে দেশে কখনও যায় নাই। বাস্তবিকই, আমার বন্ধু বলিয়া বলিতেছি না, তিনি যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যের দূত ছিলেন। তাঁহার পুস্তক এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে সহস্র সহস্র লোক উৎকণ্ঠিত হইত, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে শত শত লোক ছুটিত, খেলা দেখিতে শত শত লোক ধাইত। তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার

ধারে বসিতে, তাঁহার পরামর্শ লইতে দিবারাত্রি শত শত লোক সম্মিলিত হইত। বাস্তবিকই তিনি যেন কি এক অমৃতময় রাজ্যের দেবশিশু ছিলেন। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরহীন ধার্ম্মিক, আস্ফালনহীন কর্ম্মবীর, আসক্তি ও কামনাহীন সেবক, নিষ্কাম, ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী, দীনতাপূর্ণ উপদেষ্টা, বিনয়পূর্ণ পরামর্শদাতা, এ জীবনে বুঝি বা আর একটীও দেখি নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার পুস্তক এবং প্রবন্ধের স্থান অতি উচ্চ। নব্যভারতের পাঠকগণকে আর সে পরিচয় দিতে হইবে না। বুয়রযুদ্ধ প্রবন্ধেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই বিষয়টী তিনি শেষ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই যেন জীবনের শেষ কার্য্য ছিল। তিনি যেন কি এক স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইতে এই ধরায় আসিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া, ধীরে ধীরে, আড়ম্বরহীন ভাবে, ঘুমাইতে, ঘুমাইতে, শেষে মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন, অলক্ষিত ভাবে কোন্ অদৃশ্যরাজ্যে প্রস্থান করিলেন? চলিয়া যাওয়ার পর ভাবিলাম, আত্মীয়তার বাজারে কি দেখিলাম, কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, তাহা বুঝি বা এ জীবনে আর দেখিব না, যাহা হারাইলাম, তাহা বুঝি বা এ জীবনে আর পাইব না। সে যে কি বস্তু, আমি অধম, আমি কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারি?*

* এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়েকটী ৮ই পৌষ, ১৩০৮, তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে পঠিত হইয়াছিল।

৺ কালীপ্রসন্ন দত্ত।

পাঠকগণ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবেন যে, বুয়রযুদ্ধের লেখক বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত আর এ সংসারে নাই। বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, রাত্রে ওলাউঠা রোগে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন দত্ত ১২৬৬ সানের ২০শে আষাঢ় তারিখে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত চাঁওচা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চাঁওচার দত্ত-পরিবার পূর্ব্ব বঙ্গের একটী সম্ভ্রান্ত পরিবার বলিয়া খ্যাত। বদান্যতার জন্য এ পরিবার অনেক দিন হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। কালী প্রসন্নের জন্ম আখ্যায়িকা গভীর রহস্য পূর্ণ। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় চণ্ডীপ্রসাদ দত্ত অতিশয় ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। চণ্ডীপ্রসাদের চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ ঈশ্বর চন্দ্রের ঔরসে ও সাধ্বী ইন্দুমতীর গর্ভে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দুমতীও অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সদ্‌গুণ-সম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে পরিবারস্থ ও অন্যান্য সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী ছিলেন। ইন্দুমতীর সন্তান হইয়াই নষ্ট হইত দেখিয়া, ধার্ম্মিক চণ্ডীপ্রসাদ বংশরক্ষা পাইবে না ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্তাকুল হইলেন। এজন্য অনেক সময়ে তিনি বিষণ্ণ থাকিতেন। তিনি একদিন বরিশাল জেলার বিঘাস্থ তাঁহার জমিদারী কাছারীর সম্মুখে সায়ংকালে নদীতটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, দেখিলেন, একখানি ছোট নৌকা ঘাটের দিকে আসিতেছে। নৌকাখানি তালপত্রের পুঁথিতে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে জটা-

জুটধারী ও গৈরিক-বসন-পরিহিত এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। ধীরে ধীরে নৌকাখানি আসিয়া ঘাটে লাগিল, সন্ন্যাস-বেশধারী সেই পুরুষ তীরে অবতরণ করিলেন। চণ্ডীপ্রসাদ সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিলে সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম চণ্ডীপ্রসাদ দত্ত? আপনি বড় পুত্রের সন্তান রক্ষা পাইতেছে না দেখিয়া বংশলোপের ভয়ে ভীত হইতেছেন? আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার বংশ রক্ষা পাইতে পারে কিনা, তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। চণ্ডীপ্রসাদ যেন আকাশ হাতে পাইলেন। তখনই সেই মহাপুরুষের অনুজ্ঞা ক্রমে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইল। তিনি ঐ সমুদয় লইয়া কোন এক আবৃত স্থানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং বাহির হইতে তাহার প্রক্রিয়া কেহ দেখিতে না পায়, তজ্জন্য স্বয়ং চণ্ডীপ্রসাদ ও ঈশ্বর চন্দ্রকে পাহারায় রাখিয়া দিলেন। প্রাতে বাহিরে আসিয়া চণ্ডীপ্রসাদকে বলিলেন—ঈশ্বরচন্দ্রের পত্নী এক্ষণে গর্ভবতী কিন্তু ঐ সন্তান রক্ষা পাইবে না। ইহার পরে যে সন্তান জন্মিবে, সে বাঁচিয়া থাকিবে কিন্তু জন্মের অল্পদিন পরেই উহার পিতা ও মাতা কালগ্রাসে পতিত হইবেন। সন্ন্যাসী সন্তানের নাম কালীপ্রসন্ন রাখিতে আদেশ করিয়া যান ও ঐ সন্তান কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইবে, তাহাও বলিয়া যান।

কালীপ্রসন্ন যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থার অনেক অবনতি হইয়াছিল, অতিরিক্ত বদান্যতাই এই পরিবারের হীনাবস্থার কারণ, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কালীপ্রসন্নের বয়স যখন তের বৎসরেরও কম, তখন একই দিনে তাহার পিতৃ ও মাতৃ বিয়োগ ঘটে। তিনি তখন পরিবারের মধ্যে একমাত্র সন্তান, পিতামহ, পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীগণ কর্তৃক সাতিশয় আদর ও যত্নে পালিত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। বাল্যজীবনে কালীপ্রসন্নের বুদ্ধি, সাহস ও উদারতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার পিতামহ ও পিতৃব্যগণ বৎসরের অনেক সময়েই বিষয় কার্য্যোপলক্ষে বরিশালে থাকিতেন। বালক কালীপ্রসন্নকে পাঠাভ্যাসের জন্য বরিশালে আনা হইল এবং ইংরাজি শিক্ষার জন্য বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ছাত্রজীবনে কালীপ্রসন্ন মেধা, সৎসাহস ও চরিত্র গুণে শিক্ষকগণের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মাননীয় বৃদ্ধশিক্ষক, বর্ত্তমান-স্কুল-ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহা মহাশয় এখনও কালীপ্রসন্নের বুদ্ধি, সাহস ও চরিত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন, আমরা শুনিয়াছি। কালীপ্রসন্নের বয়স যখন ১৫ বৎসর, তখন তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টবৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে এফ, এ, পড়িতে থাকেন এবং সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রমে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতায় পাঠাভ্যাস কালে ব্রাহ্মসমাজের সহিত দত্ত কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ট সংশ্রব জন্মে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট হইতে তিনি যে জীবনের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাবীজীবনে যদিও তিনি সমুদয় পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করেন নাই, কিন্তু সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া

গিয়াছেন। যখন কালীপ্রসন্ন বি,এ পড়িতেছিলেন, তখন আমেরিকায় গিয়া পাঠাভ্যাস করিবার জন্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পরিবারের সমুদায় লোক খড়্গহস্ত হইলেন, বি,এ পরীক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে এক মিথ্যা টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে নেওয়া হইল। আত্মীয় স্বজনগণের নানারূপ বাধায় তিনি নিজ সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। বি,এ পরীক্ষা আর দেওয়া হইল না। এই সময়ে তিনি দেবীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভারত সহৃদ্ পত্রিকা বাহির করেন। উনবিংশ বর্ষ বয়ক্রমে তিনি সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গবর্ণমেণ্টের বা অন্ত কোনও চাকরির প্রতি প্রথম হইতেই তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্ত কোন চেষ্টাও করিলেন না। সাহিত্য সেবা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিই তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে ৭।৮ বৎসর ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া বেশ উন্নতিও লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার সময়ে ভারতবণিক নামক সংবাদ পত্র বাহির করেন। ১২৮৮ সনে তিনি দার পরিগ্রহ করেন। ইহার পর দলিত-কুসুম পুস্তক প্রকাশ করেন। ১২৯৩ সালে তিনি বিজনি-ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া আসামে গমন করেন। বিজনির বর্ত্তমান রাণী যখন বড় রাণী কর্ত্তৃক নানা প্রকারে প্রপীড়িতা, লাঞ্ছিতা ও গৃহতাড়িতা হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখকাহিনী শুনিয়া দত্ত কালীপ্রসন্নের দুঃখপ্রবণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, রাণীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। পনর বৎসর বিজনি-ষ্টেটের কার্য্য করিয়া তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বিজনি-ষ্টেটের ইতিহাসে উহা চিরকাল অনন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সৎসাহস, ন্যায়নিষ্ঠ কার্য্যকুশলতা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া তিনি একদিকে স্থানীয় রাজ পুরুষদের শ্রদ্ধা, অপরদিকে প্রজা সাধারণের অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আসাম গোয়ালপাড়ার ছোট ও বড়, সকল ব্যক্তি আজ তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও বিজনি-ষ্টেটের মধ্যে গারোপর্ব্বতের সীমানা নির্দ্ধারণ করিতেগিয়া গত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যে দারুণ পরিশ্রম করিতে হয়, উহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি তিন মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন এবং অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার আদেশে গত ৮ই অগ্রহায়ণ ভীষণ কলেরা রোগে, বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে, তিনি মানব-লীলা-সম্বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কালীপ্রসন্নের চরিত্র এমনই সুন্দর, এমনই মধুর, এমনই উদার ছিল যে, যিনি একদিনের জন্যও তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছিল, তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বাল্যজীবনে তিনি যে পরার্থপরতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, উহা হইতে তিনি একদিনের জন্তও বিচলিত হন নাই, স্বার্থপরতার কালিমা তাঁহার হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তের জন্তও কলুষিত করে নাই। বিপদ ও দুঃখের মধ্যে তিনি এরূপ প্রশান্ত চিত্তে থাকিতেন ও

অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতেন যে, উহা ভাবিলেও মুগ্ধ হইতে হয়। জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অতিশয় বলবতী ছিল, ষ্টেটের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া তিনি যে অবসরটুকু পাইতেন, জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। দত্ত কালীপ্রসন্নের পুস্তকাগার সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ এবং ইহা তাঁহার জ্ঞানোন্নতি স্পৃহার দৃষ্টান্ত। মানব 'মন জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট, এই তিনের উৎকর্ষতা ও সামঞ্জস্য অতি অল্প জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন একদিকে যেমন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁহাব মানসিক ও ইচ্ছাশক্তি যেমন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, তেমনি তিনি অসাধাবণ প্রেমিক ছিলেন, পবেব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দেখিলেই তাঁহাব প্রাণ বিগলিত হইত, প্রাণপণে তাহা নিবা-রণ করিতে সচেষ্ট হইতেন। কর্ত্তব্য পালনে কালীপ্রসন্ন বজ্রেব কত কঠিন, বন্ধুপ্রেমে, সন্তান-বাৎসল্যে, পরদুঃখ নিবারণে তিনি কুসুম হইতেও কোমল ছিলেন। কোন রূপ বাগাড়ম্বব, পবনিন্দা বা আত্ম প্রশংসা তাঁহার মুখে কেহ কখনও শুনে নাই, তাঁহার সুগম্ভীর সদালাপ, অমায়িক ব্যবহাব, আতিথ্য-সৎকার ও উদার প্রেম সকলকেই মুগ্ধ করিত। প্রতিভা ও চরিত্র, উদারতা ও কর্ম্মশীলতার একত্র সমাবেশ কালীপ্রসন্ন-জীবনে যেরূপ দেখা গিয়াছে, উহা সংসারে বিরল। কর্ম্মবীর কালীপ্রসন্ন কার্য্য করি-বার জন্যই যেন কার্য্যকে ভালবাসিতেন, তিনি জানিতেন না, এমন কোন কাজ ছিল না। রন্ধন, সূচিকার্য্য, পশুপক্ষীপালন, বাগান প্রস্তুত, ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দুঃখ ও বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতেই যেন তাঁহার চিত্তে বিমল আনন্দ হইত। প্রতিভার আধার, কর্ম্মবীর প্রেমিক, চবিত্রবান কালীপ্রসন্ন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাব বংশানুগত একটী দোষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই। অমিত ব্যয়িতাই কালীপ্রসন্ন চরিত্র চাঁদিমায় এক-মাত্র কলঙ্ক। তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় এজন্য তাঁহাকে কত তিবস্কার কবিতেন, কিন্তু কিছুতেই চক্ষু ফুটিল না, উহা যেন তাঁহার রক্ত মাংসের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাব পরি-বার ও কন্যাগুলি আজ নিরাশ্রয়, নিরাবলম্বন, একথা ভাবিলেও প্রাণে বেদনা অনুভব না কবিয়া থাকিতে পাবা যায় না। সকলই বিধাতাব ইচ্ছা, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হইয়াছে। তিনি অমর ধামে কালীপ্রসন্নের অমব আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন, ইহাই বিধাতার চরণে প্রার্থনা।

শ্রীবিধুচরণ গুহ।

বঙ্গের ইতিবৃত্ত।

(বুদ্ধদেবের পরি-নির্ব্বাণ কাল হইতে ৯ম খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

ঐতিহাসিক বিষয়, কথোপকথন চ্ছলে লোকের শ্রুতি-মূলে ধরিলে, তাহাতে বিস্তর সুফল ফলে,—অনেকের এইরূপ অভিমতি। তন্নিমিত্তই এখন হইতে আমাদিগকে নিম্নের প্রদর্শিত প্রণালী-অবলম্বনে প্রাচীন ইতিবৃত্ত-বিষয়ক বিষয়

বিনিবেশিত করিতে হইতেছে। দুই জন বন্ধু, একত্র মিলিত হইয়া, বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে যেরূপ কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহারই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমেই প্রথম বন্ধু বলিলেন, "নব্য-ভারতে" ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত, ঐতিহাসিক প্রথম প্রস্তাবে যে সকল ভূপালের বিবরণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন্ অব্দের পর, কোন্ অব্দে কোন্ কোন্ রাজার রাজত্ব বা আধিপত্য ছিল,—তাহার কোন বিশ্বাসজনক নির্দ্ধারণ পাইতেছি না কেন?

২য় বন্ধু, ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—কোন দেশের কোন ইতিহাসেই সুপ্রাচীন কালের ধারাবাহিক, যথাযথ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার যেমন কোন উপায় দৃষ্ট হয় না, বঙ্গের ভাগ্যও, তদ্রূপ ঘোরতর-তিমিরাবৃত।

(খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব-ঘটনা।)

১ম বন্ধু।—খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্বাবস্থা বিদিত হইবার পক্ষে কি, কেবলই অনন্ত অন্তরায়? কোনই সুযোগে কথঞ্চিৎ ঘটনা জানা যাইবে না?

২য় বন্ধু।—হাঁ। কিন্তু কিছু কিছু এমন কৌশল আছে, যাহার অনুকূলতায় উক্ত অন্তরায়, তিরোহিত হইয়া যায়। সেই সকল কৌশল-সঙ্কুল উপায়-সকলের অবলম্বন-স্থল—আমাদের "পুরাণ" প্রভৃতি প্রিয়তম প্রাচীন গ্রন্থ-রাজি। এখন যাহা যাহা বলিয়া যাই, অবহিত চিত্তে শুনিয়া লও। যথা,—

'মগধে' "জরাসন্ধ"-নামক 'পুরাণ'-প্রথিত প্রবলশালী এক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। "গিরিব্রজ" তাঁহার রাজধানী ছিল।—"মহাভারতে" এই ও অন্য ঘটনাবলী, সবিস্তর উল্লিখিত। তৎপুত্র "সহদেব"। 'বৃহদ্রথের' অপত্য—'জরাসন্ধ'। ইত্যাদি। অন্যান্য বিস্তৃত বৃত্তান্ত, ভারতের ইতিবৃত্তে প্রবক্তব্য। মগধের অপরাপর কথা, যথাস্থানে এই প্রবন্ধেই বলিব।

১ম ব।—বড়ই ভাল কথা।—বুঝিলাম—যথাযোগ্য উপকরণের অভাবেই বঙ্গদেশেরও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিবৃত্ত, অত্যন্ত অপরিজ্ঞাত। তবে কোন্ সময় হইতে নিয়মিত ইতিবৃত্ত বিদিত হইতে পারিব?

(বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ কাল।)

২য় ব।—১ম, ২য় ও ৩য় খ্রীষ্টাব্দের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাইতেছি না। তবে এই মাত্র জ্ঞাত আছি, "বুদ্ধদেবের' পরিনির্ব্বাণ-বৎসরে এই বঙ্গদেশ হইতে "বিজয়সিংহ" সিংহলে গিয়া রাজা হয়েন। তৎ-পিতা 'সিংহবাহু'—বঙ্গে রাজত্বাধিপত্য করিতেন। "পাণ্ডুবাস' ঐ বিজয়ের ভ্রাতৃতনয়। নিম্নে তালিকা দেখ,—

(১) সিংহবাহু।

(২) বিজয়সিংহ, (২) অজ্ঞাত নাম,

(৩) পাণ্ডুবাস

১ম ব।—তবে কি চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দী হইতেই আমাদিগকে আরম্ভ করিতে হইবে?

(চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ)।

২য় ব।—হাঁ। খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতে "সমুদ্রগুপ্ত" কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল।

১ম ব।—জানিলাম "সমুদ্রগুপ্ত" চতুর্থ (৪র্থ) শতাব্দীর বঙ্গ-বিজয়ী। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার কি কোন উপায় নাই?

২য় ব।—তাঁহার রাজধানীর অবস্থান, এখনও অনির্ণীত অবস্থায় অবস্থিত। তবে এই পর্য্যন্ত বিদিত হওয়া গিয়াছে, তাঁহাকে "মগধ" দেশে রাজদণ্ড-পরিচালনা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

১ম ব।—কিন্তু "মগধ" দেশের সহিত 'বঙ্গদেশের' কি সম্বন্ধ?

২য়। তুমি কি জান না যে, প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কালাবধি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই দেশ-ত্রয়ের সাধারণ সংজ্ঞা —'বাঙ্গালা-দেশ'।

১ম ব।—মানিলাম—ঐ তিন প্রদেশ, এই বাঙ্গালা দেশের সীমান্তর্গত। কিন্তু তাহাতেও "মগধ"-প্রদেশ, বাঙ্গালা দেশের সীমাভুক্ত হইল কৈ? আর, উহার নাম "বিহার" কেন হইল?

২য় ব।—'বিহার'-প্রদেশ, মধ্য যুগে "মগধ" নামে অভিহিত হইত। 'বিহার' শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠ ও ভ্রমণের স্থান।

১ম ব।—একটী পুরাতন কথা, এখন নূতন ভাবেই তোমার নিকটে শিক্ষা পাইলাম। বিদ্যমান কালের 'বিহার'-প্রদেশের মধ্য যুগে "মগধ" আখ্যা ছিল। আচ্ছা—তবে কি "বিহারের" প্রাচীনতম অন্য কোন্ নাম ছিল না?

২য় ব।—তুমি অতি উত্তম জিজ্ঞাসাই করিলে। প্রাচীনতম সময়ে—বৈদিক কালে —"বিহারের" বা "মগধের" নাম— "কীটক" ছিল।

১ম ব।—তবেই বুঝিতে হইবে, বেদের সময়ে যাহার নাম "কীটক"—পৌরাণিক যুগে, "মগধ"-সংজ্ঞায় এবং বিদ্যমান সময়ে "বিহার"-নামে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

২য় ব।—"কীকট" প্রদেশের কোন্ কোন্ বিষয়, প্রকাশিত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ই বা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, বলিতে পার?

১ম ব।—না; তোমারই মুখে এইমাত্র যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া গেল, তাহার সুবিস্তার-মূলক ব্যাপার, তোমারই জ্ঞান-গোচর থাকা সম্ভাবিত। "ন দোষো মগধে মদ্যে" ইহার কারণ কি?

২য় ব।—"কীকট" অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, "বেদ" গ্রন্থে এইরূপ প্রসঙ্গই প্রকীর্ত্তিত। সেই হেতুই বোধ করি, "মগধ" দেশে সুরা-সেবনে দোষ নাই।

১ম ব।—"কীকট" বা "মগধের" অন্যান্য কথা, আমাকে শিক্ষা দিবে কি?

২য় ব।—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহার কথা, আর অধিক আলোচনা না করাই ভাল। আমরা কতকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অন্য দিন তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর-সমাধানে প্রয়াসী হইব। সে দিন তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

১ম ব।—৪র্থ (চতুর্থ) শতাব্দীর রাজা "সমুদ্রগুপ্ত" এই মাত্রই শিখিয়াছি। ঐ সময়ের অন্য কোন ঘটনা জানা যায় কি না?

পঞ্চম (৫ম) খ্রীষ্টাব্দ।

২য় ব।—খ্রীষ্টীয় ৫ম (পঞ্চম) শতাব্দীর একটা ঐতিহাসিক কথা, তোমায় শোনাইতে হইবে। "তাম্রলিপ্ত" জনপদ, তখনকার বাণিজ্য-কার্য্যের একতম প্রধান স্থান ছিল। উহার বর্ত্তমান নাম কি জান? 'তমোলুক।' এই ঐতিহাসিক প্রমাণ—চীন দেশ হইতে বঙ্গে আগত বৌদ্ধ পর্য্যটক-

দিগের লিপির নিদর্শনে জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিবরণ,আপাততঃ—কতক কতক অজ্ঞাত নয়—কিন্তু নিতান্ত অপরিজ্ঞাত।

সপ্তম (৭ম) খ্রীষ্টাব্দ।

৭ম শতাব্দীতে ১০ (দশ)-টী রাজ্যের নির্দ্দেশ, নিরীক্ষিত হয়। সেই রাজ্যগুলি, বৃহদায়তন নয়—ক্ষুদ্র-রাজ্য-মাত্র। যথা,—

(প্রাচীন নাম)		(বর্ত্তমান নাম)
১। ওড্র	...	১। উড়িষ্যা।
২। কমলাঙ্ক	...	২। কুমিল্লা, ও ত্রিপুরা।
৩। কর্ণসুবর্ণ	...	৩। রাঙামাটী *।
৪। চম্পা	...	৪। ভাগলপুর।
৫। তাম্রলিপ্ত	...	৫। তমোলুক†।
৬। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন	...	৬। পাণ্ডুয়া, ও গৌড়।
৭। ব্রিজি	...	৭। ত্রিহুত।
৮। মগধ	...	৮। দক্ষিণ-বিহার; পাটনা-প্রদেশ।
৯। শ্রীক্ষেত্র	...	৯। সিলেট (শ্রীহট্ট)।
১০। সমতট	...	১০। বাঙ্গালা-দেশ।

১ম বন্ধু।—এ সকল তো গেল, রাজ্যের নাম। [illegible]র নামগুলি জানা যায় না কি?

২য় বন্ধু।—তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই। তবে রাজ-গণের গুণ-ব্যাখ্যান-শ্রবণে একটা-মাত্র সিদ্ধান্ত করা যায়। যেমন—কনোজের রাজার (হর্ষবর্দ্ধন-শিলাদিত্যের) "রাজচক্রবর্ত্তী" বিশেষণ দেখিয়া, তাঁহাকে অন্ততঃও আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর মনে করিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্ত, তাঁহার অধিকৃত স্থান বুঝিতে হইলে, ইহাও ভাবা আবশ্যক যে, বঙ্গদেশও, তাঁহার করায়ত্ত ছিল।*

২য় ব।—৭ম শতাব্দীর যে যে তত্ত্ব জ্ঞাত ছিল, তত্তৎ বৃত্তান্ত উপরে বর্ণিত হইল। উহা, বিস্তর বাস্তব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং সেগুলি,সকলের শ্রোতব্য ব্যাপার।

৮ম ও ৯ম শতাব্দীর ব্যাপারও আমাদের অগোচরীভূত। ১০শ শতাব্দীর যে যে প্রসঙ্গের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, তত্তৎ-প্রসঙ্গ-সূচক প্রবন্ধ-বৃন্দ, শুনিবার অভিলাষ করিবে কি?

১ম ব।—যদি আনুপূর্ব্বিক ঐতিহাসিক কথার অবতারণা না করিতে পার, তাহা হইলে চিত্তের তৃপ্তি বিধান হইবে না। অতএব ভাই! তাই বিনীত নিবেদন—আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বিবৃত কর। অন্যথা মনঃ-ক্ষোভ, বিলক্ষণই থাকিয়া যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(৪২৫ পৃষ্ঠার পর)

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এবারে তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি)। শুন্‌ছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে কি নাকি ঝগড়া হয়েছে। যারা ঝগড়া করেছে,

---

* এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

† ৫ম খ্রীষ্টাব্দের কথা, একবার উল্লিখিত হইয়াছে।

* মালব-ভূপ যশোবর্ম্ম-দেব বিক্রমাদিত্যও, ঐ রূপ উপাধি-মণ্ডিত ছিলেন।

তারা তো সব হয়ে প্যালা পক্ষা (সকলের হাস্য)।

(ভক্তদের প্রতি)। "দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এসব শাঁক বাজে। আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই। (সকলের হাস্য)।

প্রতাপ। মহাশয়, বাজে যদি বল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে।

* * * *

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ, তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজের লেক্‌চার শুন্‌লে লোকটার ভাব বেস বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছ্‌লো। আচার্য্য হয়েছিলেন একজন্ পণ্ডিত, তার নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, আমাদের ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে আমি অবাক্। তখন একটা গল্প মনে পড়্‌লো। একটী ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়ীতে অনেক ঘোঁড়া আছে, এক গোয়াল ঘোঁড়া। এখন গোয়াল যদি হয়, তাহলে কখন ঘোঁড়া থাক্‌তে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বদ্ধ কথা শুন্‌লে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোঁড়া টোঁড়া কিছুই নেই (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। ঘোঁড়া তো নেহই। গরুও নেই (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে কি না বল্‌ছে নীরস। এতে এই বোঝা যায় যে, ও ব্যক্তি ঈশ্বর যে কি জিনিষ, তা কখনও অনুভব করে নাই।

[প্রতাপের প্রতি উপদেশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) দেখ তোমায় বলি। তুমি লেখা পড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা! কেশব আর তুমি ছিলে যেন গৌর নিতাই দু ভাই। এসব তো অনেক হলো, লেক্‌চার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ, বিসম্বাদ, অনেক তো হলো। আর কি এসব তোমায় ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দেও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দেও।

প্রতাপ। আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এসব করা তাঁর নামটা যাতে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)। তুমি বল্‌ছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব কচ্ছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাক্‌বে না। একটা গল্প শুন।

"একজন লোকের একটা পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়ে ঘর। অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছু দিন পরে একদিন ভারি ঝড় এলো। কুঁড়ে ঘর টল্ টল্ কর্ত্তে লাগলো; তখন সে ঘররক্ষার জন্য ভারি চিন্তিত হলো। বল্লে, হে পবনদেব, দেখো যেন ঘরটী ভেঙ্গনা বাবা! পবন দেব কিন্তু শুন্‌ছেন না। ঘর মড়্ মড়্ কর্ত্তে লাগ্‌লো। তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে—তার মনে পড়লো যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া, অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো—বাবা! ঘর ভেঙ্গনা, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। কিন্তু ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে! অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পর দেখ্‌লে যে কিছু হলো না।

তখন বল্‌তে লাগলো, বাবা লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর। তাতেও হলো না। তখন বলে, বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর, দেখো বাবা ভেঙ্গ না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হলো না, ঘর মড়্‌ মড়্‌ করে ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় বল্‌তে লাগলো, যা! শালার ঘর!

(প্রতাপের (প্রতি) কেশবের নাম তোমার রক্ষা কর্ত্তে হবে না। যা কিছু হয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে, তুমি কি কর্‌বে?

[জীবনের উদ্দেশ্য; ডুব দাও।]

"তোমার এখন কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।"

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাইতে লাগিলেন।

গান।

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বল্‌বে সদা অনুক্ষণ। ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্‌ জন।
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

(প্রতাপের প্রতি)। গান শুন্‌লে? লেক্‌চার, ঝগড়া, ওসব তো অনেক হলো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মর্‌বার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর। মনে কোরোনা যে, এতে মানুষ বেহেড্‌ হয়। মনে করোনা যে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'লে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—"

প্রতাপ। মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও আছে একটী ছোক্‌রা। তাই বল্‌ছি, আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ্‌, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি যে, এই সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা, মনে কর, একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হইছিস্‌। তা কোন্‌ খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বল্‌লে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন? কিনারায় বস্‌বি কেন? সে বল্লে, বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বল্লুম, বাবা, সচ্চিদানন্দসাগরে সে ভয় নাই, এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড্‌ হয় না।

(ভক্তদের প্রতি)। 'আমি' আর 'আমার' এইটীর নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ী রাসমণি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক করে গেছেন। একথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটী হয়েছে। আমি কচ্ছি, এইটীর নাম অজ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, এইটীর নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়—এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ী আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এসব তোমার জিনিস—এ স্ত্রী পুত্র পরিবার এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস।

"আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম

মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া; শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া, সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"

* * * *

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী কাঞ্চন।]

প্রতাপ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, যারা আপনার কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছে তো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি যে, সংসার কত্তে দোষ কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাক।

[গৃহস্থের সাধন।]

"দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে, 'আমাদের বাড়ী।' কিন্তু মনে জানে যে, ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে", 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।' কিন্তু আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

"তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই ; তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর ; জেনো যে, বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়, এ সব ঈশ্বরের, আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে ; আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে।"

* * * *

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, মহাশয়, আজকাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন, এ কথা মানেন না।

প্রতাপ। মুখে তাঁরা যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক, তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ কথা অনেকেরই মান্‌তে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই হলো, শক্তিতো মান্‌ছে ? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ। তা ছাড়া ইউরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্য্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয় এ কথা)ও মানেন।

* * * *

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি)। আর কি বলবো তোমায় ? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর এক কথা, কামিনী কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সে দিকে যেতে দেয় না—এই দেখনা, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে (সকলের হাস্য)। তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্।

যদি জিজ্ঞাসা কর,তোমার পরিবারটী কেমন গা, অমনি বলে, আজ্ঞে, খুব ভাল ”—

প্রতাপ। তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল, কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয় আঘাত করিয়া গেল। অবশেষে অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি একথা একেবারেই প্রতিধ্বনিত হয় নাই ?

বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে।

'অর্লিমেরেজ' মন্দ বলি বিয়ে কল্লুম চল্লিশে,
কাটিয়ে ন্যাটা, তিনের কোটা, গোলেমালে হল্লীশে,
আড়াই ডজন ছেলের ভোজন তবু যে ঘর ছাড়ে না।
(আরো) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে,ধনদৌলত বাড়েনা।১

রান্না ছাড়াই,নবেল পড়াই এ'লো বে'লো যাহা পাই,
ভেঙে কড়ি গহনা গড়ি, সাড়ীও কিনি বোম্বাই,
যেনর্ যেনর্ পেনর্ পেনর্ তবুত ছাই ছাড়েনা—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে ধনদৌলত বাড়ে না।২

পাণ্ডু, কুরু, যদু কুলে রইলনাক পুত্র আর,
ধ্বংশ গেছে বংশ সে যে শ্রীশ্রীমতী উর্ব্বরার,
তবু নিত্য কুরুক্ষেত্র আমার গৃহ ছাড়ে না,
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়েনা।

গীতার দীক্ষা নীতিশিক্ষা কত দিলুম গিন্নিকে,
মতি দিলেন পুরুৎঠাকুর তিনটী বেলায় আহ্নিকে,
তবু একি ভেল্কি রে ভাই ঘাড়ে ভিন্ন চড়ে না—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে,ধনদৌলত বাড়ে না।৪

বন্ধুবর্গ ছেড়ে, স্বর্গ রচিয়াছি বিছানায়,
সন্ধ্যা থেকে বন্ধ ঘরে. সত্যকথা—মিছা নয়।
তবু চরণ যখন তখন বুকে ভিন্ন পড়ে না—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়েনা।৫

বাপের বাড়ী মাসে পাড়ি, ঘর সংসার চলে না,
(এই) সোজা কথায় মাথায় ব্যথা,বেজায় মান ভাঙেনা।
ধরাশায়ী বিছানায়, যত ঠেলি নড়ে না—
(কিন্তু) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে ধনদৌলত বাড়ে না।৬

রোদন বেদন জানাই কিছু আপীসে ও বালিসে,
জানেন কিছু ডাক্তার পাঁচু, পৃষ্ঠদেশের মালিসে।
(কেননা) দাম্পত্য প্রেমের পথ্যে সকল রোগত সারে না?
(আহা) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে,ধন দৌলত বাড়েনা।৭

অনুক্ষণ যোগাই মন, সকালে ও বিকালে,
একি খট্‌কা! মুখ ঝাঁট্‌কা তবু নিত্য কপালে?
এসমস্তে পোয়াই কিসে? কিছুই মনে পড়েনা—
(এযে) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে,ধনদৌলত বাড়ে না।৮

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

মিলনের কথা।

ভারতবর্ষে অসংখ্য সম্প্রদায়। অসংখ্য সম্প্রদায়ের অসংখ্য প্রকার মত। মতের ধর্ম্মসাধনে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায়, ধর্ম্মের অন্তরঙ্গের প্রতি লোকের দৃষ্টি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মত-সংঘর্ষণে নানারূপ পঙ্কিল বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাসিতার প্রতি আসক্ত হইলে যেমন সাত্বিকতার দিকে দৃষ্টি কমে, ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, অর্থাৎ মত-সাধনে আসক্ত হইলে প্রেম, পুণ্য, ও ভক্তির দিকে, তেমনই, লোকের দৃষ্টি কমিতে থাকে। যখন এদেশে সাম্প্রদায়িক কলহ বিবাদে ঘোরতর অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে এদেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সে অতি পবিত্র দিন গিয়াছে।

৭২ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সংস্কার

সম্বন্ধে ভারতবর্ষের যে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অবস্থা, প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলন, বহু-বিবাহ-নিবারণ, বয়স্থা মেয়ের বিবাহ, জাতিভেদ-নাশ, অসবর্ণ-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, জাতিনির্ব্বিশেষে শাস্ত্র প্রচার, ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত এ সকল সংস্কার অল্পে অল্পে হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহিলাগণের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ছিল, তাহাও ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগকে এখন হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করা হইতেছে। ঘরে ঘরে এখন বয়স্থা মেয়ে দেখা যায়। পৌত্তলিকতার দুর্গভেদ করা হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে এদেশে পৌত্তলিকতার প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে। এবার জাতীয় মহাসমিতির অঙ্গীভূত সামাজিক সমিতিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা যে ব্রাহ্মসমাজেরই অঙ্গীভূত কাজ, তাহাতে আর সংশয় নাই। এ সকল দেখিলে সকলের মনেই আনন্দ হয়। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, ব্রাহ্মসমাজ সে সম্বন্ধেও নেতা। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। মহাত্মা অক্ষয় কুমার এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষার মূল সোপান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'আধুনিক বাঙ্গালার সৃষ্টিকর্ত্তা, প্যারী চাঁদ মিত্র'; তিনিও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তৎপর বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রূপে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন;—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গৌরগোবিন্দ, শিবনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁহাদের সহচরগণ অম্লান চিত্তে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ইহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় যে, বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রগুলি প্রায় সকলই ব্রাহ্মসমাজের লোক দ্বারা সম্পাদিত। এ সকলই ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহা হওয়া সত্ত্বেও, এদেশে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা বদ্ধমূল হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ বাহিরের কাজ লইয়াই যেন ব্যস্ত ছিলেন;—নিজ সমাজে বা দেশের কোথাও প্রকৃত ধর্ম্ম বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। পারিলে এত ঝগড়া বিবাদ দেখা যাইত না। বাহিরের ব্যাপার কোন সমাজকে চিরকাল ধর্ম্মপথে দৃঢ় এবং অটল রাখিতে পারে না; অন্তরঙ্গ সাধন ভিন্ন কখনও কোন ধর্ম্ম-সমাজ এজগতে দীর্ঘকাল নরনারীর কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই। অন্তরঙ্গ সাধন ভিন্ন মানুষের চরিত্র-ধন লাভ হয় না, চরিত্র ভিন্ন মানুষকে এই পাপ-প্রলোভন-তরঙ্গময় ভবসংসারে কিছুতেই ঠিক রাখিতে পারে না। চরিত্রের মূলে বিশ্বাস এবং ভক্তি। বিশ্বাসে অটল এবং ভক্তিতে সুদৃঢ় না হইলে কে ধর্ম্মজগতে টিকিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, অন্যান্য বহির্বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজ যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সাধারণের চরিত্র-লাভে তেমন কিছু সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই। ইহা যারপর

নাই পরিতাপের বিষয়। কেবল পরিতাপের বিষয় নয়, গভীর হইতেও গভীরতর শোচনীয় অবস্থা।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত সত্য সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি নূতন কথা এজগতে ঘোষণা করিয়াছেন? নূতন কথা এই, আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ-সংস্থাপন;—মধ্যবর্ত্তী নাই, গুরু নাই, অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই,—মানবাত্মা ও ঈশ্বরে মহাযোগ সম্ভব। এই সার কথা এমন সুন্দর ভাবে ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন যে, পাপী তাপী, দুঃখী নগণ্য,—কাহাকেও আর নিরাশ হইতে হইবে না,—"ডাকো, তবেই তাঁহাকে পাইবে।" "ডাকো, তবেই তাঁহাকে পাইবে";—ইহা অতি সুন্দর কথা; কিন্তু মতেই যদি ইহা পালন করি, কথনও যদি তাঁহাকে না ডাকি, বা তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাকে যদি না দেখি, দেখিয়া তাঁহাতে যদি অনুরক্ত না হই, অনুরক্ত হইয়া যদি তাঁহার অনুগত না হই, অনুগত হইয়া যদি তাঁহাকে আত্মস্থ না করিয়া লই, শুধু কেবল মতে, তাঁহাকে ডাকিলই পাওয়া যাইবে, ইহা মানিয়া চলিলে কি হইবে? সন্দেস না খাইলে সন্দেসের মিষ্টত্ব কেহ অন্যের উপদেশে যেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, ধর্ম্মের আদেশ বা মতকেও আত্মস্থ না করিয়া, কেবল তোতাপাখীর ন্যায় কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করিলেই, সেই প্রকার, ধর্ম্মের মিষ্টত্ব হৃদ্‌বোধ হয় না। ধর্ম্ম আত্মস্থ বা জীবনগত না হইলে চরিত্রের উদয় হয় না। ধর্ম্ম যখন জীবনগত হয়, তখনই চরিত্রের উদয় হয়। চরিত্রের উদয় হইলেই "ভক্তি" যে কি বস্তু, মানুষ বুঝিতে পারে। ভক্তির আস্বাদন একবার পাইলে আর মানুষ সংসারের নরকে পচিয়া মরিতে চায় না।

আমি কি করি?—আমি ভক্তি তত্ত্ব বুঝি না, ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া বাহিরে ধার্ম্মিক নাম কিনিয়া কেবল বাহিরেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! কাহারও নিন্দা আমার সহ্য হয় না, প্রহারে প্রহার, চতুরতায় চতুরতা, নিন্দায় নিন্দা,—ব্যবহারিক জীবনে আমার ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ রূপান্তরিত। আমি আশা করিয়াছিলাম, দলাদলি ভাঙ্গিয়া, ভাঙ্গিয়া, ব্রাহ্মসমাজ হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত এক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনে সমর্থ হইবে, কিন্তু হায়, ৭২ বৎসর পরে আজ কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, কেবল দলাদলিই বৃদ্ধি হইতেছে, ক "খ"য়ের নিন্দা করে, খ "ক"য়ের নিন্দা করে। চতুর্দ্দিকে কেবল নিন্দার বাজার বসিয়া গিয়াছে। এক মায়ের সন্তান সকল, এক ধর্ম্ম, এক প্রেম, এক পরিবারের অধীন হইয়াও, ব্যক্তিগত ঝগড়া বিবাদে মাতিয়া বেড়ায়। আমি কি এই কথার অতীত? না—তাহা মোটেই নহি। আমি যদি চরিত্র পাইতাম, তবে তোমার চরিত্রের আদর্শ অন্বেষণ করিতাম, এবং তখন বুঝিতে পারিতাম, তোমার চরিত্র আর কিছুই নয়, উহা তোমাতে বিশেশ্বরের বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা মাত্র। আমি সেই বিশেষত্ব দেখিতাম, এবং তাহাতে মজিতাম। মজিতাম এবং তোমার অনুগত হইতাম। এইরূপে, তোমার চরিত্রে, তাহার চরিত্রে, উহার চরিত্রে—সকলের চরিত্রের মূলে মূলে মজিয়া, সকলের চরণের রেণু হইয়া লাগিয়া থাকিতাম, কেহ পা ঝাড়িলেও ছাড়িতাম না। মৃন্ময়ে চিন্ময়ের অনিন্দিত বিমলরূপে এমন ভাবে মজিয়া থাকিতাম, পর কি, বুঝিতাম না, বিদ্বেষ কি, জানি-

তাম না,—সকলের বিশেষত্বে আমার আমিত্বকে মিশাইয়া দিতাম। সকলে অন্বেষণ করিয়া আমাকে আর খুঁজিয়া পাইত না, আমি এই অগণ্য মানব-পরিবারে সেবা-দাস-রূপে মিলাইয়া যাইতাম। আমার ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাইত;—একটা অ-নামা, অপরিচিত চরিত্র কেবল বিদ্যমান থাকিত। অণু সকল মিলিয়া মিশিয়া সাগরের উৎপত্তি হইত,—মানবে মানবে মিলিয়া মহা-মানব বা অ-মানবের সৃষ্টি করিত। তিনি কে, বন্ধু, বলত? তিনি আর কেহই নহেন, তিনিই বিশ্বপ্রাণ।

বন্ধু,তুমি কি বলিতেছ? সংস্কারের কথা? তাহা ঢের শুনিয়াছি, এখন ও সকল থামাও। জ্ঞান, বিজ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের কথা? ও সকলের ঢের পরিচয় পাইয়াছি, এখন ক্ষণকাল আমাকে বিশ্রাম দেও। আমি আত্মার মূলে প্রবেশ করিয়া, বাহ্যজগতে ঘুমাইয়া পড়িতে চাই, ভাই, আমাকে একটু বিশ্রাম দেও। এ জগতে ধর্ম্মের প্রয়োজন যে জন্য, সেই আত্মশুদ্ধি বা চরিত্র, আত্মায় আত্মায় মিলন, বা বিশ্বপ্রেমাহুতি লইয়া যত দিন তুমি উপস্থিত হইতে না পার, ততদিন, তোমার ঐ জ্ঞান বিজ্ঞানের কচ্‌কচি একটু থামাও, আমি নীরবে ঘুমাইয়া পড়ি। আমি মহামিলন দেখিতে আসিয়াছিলাম, ভূতের কচ্‌কচি শুনিতে নয়। যদি সেই মিলন-ধামে আমাকে লইয়া যাইতে পার, এস,তোমাকে প্রণাম করি,তোমাকে আলিঙ্গন করি। নচেৎ তোমার ঐ হিংসা-বিদ্বেষের মূর্ত্তিকে এখন একটু সম্বরণ ও সংযত কর, পৌনঃপুনিক বক্তৃতার অভিনয় আর দেখাইয়া কাজ নাই; এস, এখন সকলে মহাসাধনারূপ মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ি। তুমিও আমাকে চিনিলে না, আমিও তোমাকে চিনিলাম না যখন,তখন তুমিই বা আমার কথা কি বুঝিবে, আমিই বা তোমার কথা কি বুঝিব? মানব-প্রাণরাজ্যের বর্ণপরিচয়ই এখনও শিক্ষা করি নাই, কি বুঝিব? তোমরাও, আমার ন্যায়, বুঝিবা, আজও সে রাজ্যের তত্ত্ব পাও নাই; পাইলে মিলনের মর্ম্ম বুঝিতে, দশজন একাত্মক হইলে যে মহাশক্তির উদয় হয়, তাহা জানিতে পারিতে, চরিত্রের মর্ম্ম জানিতে;—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় যে জন্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে। বৃথা বকাবকিতে আর কাজ কি? এস,এখন অহং-মূর্ত্তি সম্বরণ করি। অহংটা না গেলে বিশ্বপ্রাণের উদয় হইবে না;—কিছুতেই না; কিছুতেই না। অহং-দস্যুর যখন বিনাশ হইবে, তখন থাকিবে কেবল বিমল চরিত্র। আত্মিক জগতে চরিত্ররূপী আত্মা সকল সংযত, নত, ভক্ত, এবং সর্ব্বশেষে প্রেমে মত্ত। প্রেমানন্দে যখন সকলে মত্ত, তখন সৎ, চিৎ এবং আনন্দের অরূপ রূপে সকলে নিমগ্ন। সেখানে ব্যক্তিত্বের বড়াই নাই, বিচ্ছেদ নাই,ঝগড়া নাই,পরনিন্দা নাই,বিদ্বেষ নাই, পরশ্রী কাতরতা নাই—রিপুর উত্তেজনা মোটেই নাই। সে দেবধামের দেবলীলা। ব্রাহ্ম,তুমি যদি সে লীলা দেখিতে চাও, অহং-অসুরকে বিনাশ করিয়া সংযত, নত, ভক্ত হইতে শিক্ষা কর; মহামিলনের জন্য মহা-সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

বুয়র যুদ্ধ।

প্রথম উপায় এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিসন সম্বন্ধে আলোচনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উইটল্যাণ্ডারগণ বুয়র-রাজ্যে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক, এই তিন প্রকার অসুবিধাই অনুভব করিতেছিলেন। বুয়র-সাধারণ-তন্ত্রের সেক্রেটরী রিজ্ সাহেব বলেন যে, ইংলিস উইট্ল্যাণ্ডার ব্যতীত আর কোন বিদেশীয় লোক কখনও কোন অভিযোগই করেন নাই। না করিবার কতকটা কারণও দেখা যায় বটে; বুয়রগণ ইংলিস উইট্ল্যাণ্ডরকে, বিশেষতঃ জেমসন রেডের পরে, যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, অন্য দেশীয় লোককে তদ্রূপ চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং অন্য দেশীয় ব্যক্তিগণ যে কোন অভিযোগ করেন নাই, তদ্দ্বারা ইংরেজের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রমাণিত হয় না।

ব্যবহারগত বৈষম্য থাকিলেও, শুল্ক, টেক্স প্রভৃতি সম্বন্ধে ত আর বিশেষ জাতি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তন করা সঙ্গত অথবা সম্ভবপর হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিতে ইয়ুরোপীয় অনেক রাজ্যেরই মূলধন ন্যস্ত, মূলধনীগণ প্রথমতঃ উইট্ল্যাণ্ডারদিগের দুঃখে কোন সহানুভূতি দেখান নাই; কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, বুয়রের যে যে বিধিদ্বারা শ্রমজীবীদিগের অনিষ্ট হয়, তাহাতে এই মূলধনেরও অপচয় বা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং উইট্ল্যাণ্ডারগণ ও তাঁহাদিগের পক্ষ-সমর্থনকারী দল যখন পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, বুয়র-রাজ্যের তৎকালীয় বর্ত্তমান বিধানানুসারে দীর্ঘকাল কার্য্য চলিলে, মূলধনীদিগের মূলধন অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে, তখন সকল মূলধনীই উইটল্যাণ্ডারদিগের সহিত যোগ দিলেন; এবং উইটল্যাণ্ডারদিগের দুঃখ কাহিনী তখন সতেজে ও সবলে বর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয়ত, ডাক্তার জেমসনের আক্রমণ সম্বন্ধে কমিসনের সমক্ষে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতেও ইংরেজ সাধারণের দৃঢ়রূপে ধারণা হইয়াছিল যে, বুয়র-গবর্ণমেণ্টের অনেক বিধিই এরূপ তীব্র এবং একদেশদর্শী যে, তদ্দ্বারা খনিকদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

যখন ইয়ুরোপীয় মূলধনীর ও শ্রমজীবীর অসন্তুষ্ট কণ্ঠ একত্রিত হইল, এবং বুয়রদিগের মধ্যে শিক্ষিত এবং পরিমার্জ্জিত দলের লোকেরাও অনেকে সেই সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন বুয়র গবর্ণমেণ্ট আর নীরব থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না। বুয়র-রাজ্যে প্রচলিত কোন কোন বিধি অনুসারে অথবা কোন বিধি কার্য্যে পরিণত করার শৈথিল্যে কিম্বা অপর কোন কারণে ব্যবসায়ীদিগের অনিষ্ট হইতেছে' এবং কি উপায়েই বা তাহা নিবারিত হইতে পারে, তৎসমুদয় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত, ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিলেন। কমিসন কর্ত্তৃক নির্দ্ধারণের যে অংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক, আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিতেছি:—

(১) তৎকাল-বর্ত্তমান এক চেটে চুক্তি

অনুসারে ৫০ পঞ্চাশ পৌণ্ড ডিনামাইটের মূল্য ৮৫ সিলিং দিতে হয়। এই চুক্তি রহিত করিয়া, অথবা এই চুক্তি বিধিসঙ্গত কিনা, তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক পরীক্ষিত করিয়া, ডিনামাইটের মূল্য কম করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

(২) নিদারল্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি কয়লা এবং অন্যান্য জিনিসের যে ভাড়া নেন, তাহা অত্যন্ত বেশী। এই রেলওয়ের সত্বাধিকার গবর্ণমেণ্টের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

(৩) জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যকীয় যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি হয়, তৎপ্রতি নির্দ্ধারিত শুল্ক অত্যন্ত বেশী। এবং জোহান্স্‌বার্গ নগরে শ্রমজীবীদিগের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ও অত্যন্ত অতিরিক্ত।

(৪) স্বর্ণ চুরি নিবারণের নিমিত্ত অতি তীব্র বিধান আবশ্যক, এবং দেশীয় শ্রমজীবী-দিগের নিকট যাহাতে মদ বিক্রীত হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা আবশ্যক। এবং পাশ-ল যাহাতে দেশীয় লোকদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত ছিল) বিশেষ তীব্রতার সহিত কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

(৫) চারি দফায় লিখিত সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং বিধানাদি কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ-দানের নিমিত্ত উইট্‌ওয়াটারস্‌ রাণ্ড স্বর্ণ খনিতে একটী মন্ত্রী-সমিতি (advisary Board) থাকা আবশ্যক।

কমিসন কর্ত্তৃক উল্লিখিত বিষয়গুলি নির্দ্ধারণের পর, বুয়রগবর্ণমেণ্ট একেবারে কিছু না করিয়া আর নীরবে থাকিতে পারেন কিরূপে? কিন্তু পক্ষান্তরে উল্লিখিত সমস্ত অসুবিধা দূর করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি অপরিহার্য্য। সুতরাং বুয়র-গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিলেন। বুয়র-গবর্ণমেণ্ট কমিসনের যে নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যাহা করিলেন, তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

১। ডিনামাইটের ব্যবসায় সম্বন্ধে একচেটে অধিকার বুয়র-গবর্ণমেণ্টের দিবার ক্ষমতা ছিল কি না, এ তর্ক হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করা নানা কারণেই বাঞ্ছনীয় নয়। বুয়রগণ যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তির স্বাধীনতা কতদূর পরিমাণে সীমাবদ্ধ, এই তর্ক কি বুদ্ধিমান বুয়র গবর্ণমেণ্ট আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সম্মত হইতে পারেন? এবং গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগের সহিত চুক্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বা সে চুক্তির ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন কিরূপে? ক্ষতি-পূরণ পাইলে তাহারা সত্বাধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইত বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিবে কে? উইট্‌ল্যাণ্ডার ত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত নন। বুয়র-গবর্ণমেণ্টই বা সম্পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিবেন কেন? বুয়র গবর্ণ-মেণ্ট মোটের উপর ডিনামাইটের মূল্য কতক পরিমাণে কমাইলেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা উইটল্যাণ্ডারগণ বিশেষ উপকৃত হইলেন না। ইয়ুরোপ হইতে আমদানী ডিনামাইট্‌ অন্যত্র যে দরে বিক্রীত হইত, ডিনামাইটের মূল্য প্রায় তত্তুল্য করিলেন, কিন্তু প্রতি ৮৫ পৌণ্ডের কেসে ২০ সিলিং রক্ষণীয় শুল্ক (Protective Tariff) স্থাপিত করিলেন। বুয়র-গবর্ণমেণ্ট কতক পরি-

মাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু খনিকগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না।

চেম্বারলেইন সাহেব বুয়র-গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে, সন্ধিপত্রের সর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বুয়র গবর্ণমেণ্ট কেহ কেহ ডিনামাইটের একচেটে ব্যবসায়ের অধিকার দিতে পারে না। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কার্য্য সন্ধির নিয়ম-বিরুদ্ধ, বুয়র গবর্ণমেণ্ট এ কথা স্বীকার করিলেন না। পক্ষান্তরে বুয়রগণ বলিতে লাগিলেন যে, খনিকদিগের স্বার্থের নিমিত্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ব্যাগ্র হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ইংরেজ একটী ডিনামাইটের কারখানা খুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, বুয়র গবর্ণমেণ্টের একচেটে ব্যবসায়ের চুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, সেই কারখানা খোলা অসম্ভব হইবে, কাজেই এত অন্তর্জ্বালা হইয়াছিল। সেক্রেটরী রিজ, চেম্বারলেইন মহোদয়ের প্রতিও, কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "কাইনকের ডিনামাইট্‌ এবং বারুদ গোলার কারখানায় যে ব্রিটীস কলনিয়াল সচিবের বিশেষ স্বার্থ ছিল, তাহা লোকে জানিত, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা একথা বলিতে চাহি না যে, ঔপনিবেশিক সচিব ট্রান্সভয়াল সম্বন্ধে অবলম্বিত নৈতিক ক্ষেত্রে তিনি আর্থিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন।" উভয় পক্ষে অনেক বাক্‌ বিতণ্ডা হইল বটে, কিন্তু অসন্তোষের ভাব যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না।

২। রেলওয়ের ভাড়া এবং জীবন রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শুল্ক গবর্ণমেণ্ট সমধিক পরিমাণে কমাইলেন, কোন কোন দ্রব্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। এই দুই হিসাবে ১৮৯৮-৯৯ সনে বুয়র গবর্ণমেণ্টের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা ৭০০০,০০০ পৌণ্ড কম হইয়াছে বলিয়া বুয়রগণ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে উইট্‌-ল্যাণ্ডারগণের অভিযোগ নিতান্ত অমূলক ছিলনা। পাঠক বলিতে পারেন, রেলওয়ের ভাড়া বেশী হইলে; কিম্বা আমদানী জিনিসের প্রতি গুরুভার শুল্ক সংস্থাপিত হইলে দেশীয় বিদেশীয় সকলকেই ত তাহা তুল্যরূপে বহন করিতে হইত, তবে বিদেশীয়গণ এত চীৎকার করিতেন কেন? বুয়র রেলওয়ে যোগে অতি অল্প দ্রব্যই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিতেন, তাঁহার পুরাতন প্রণালী অনুসারে গোযানে দ্রব্যাদি প্রেরণ এবং অশ্বারোহণে গমনাগমন, তিনি এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। রেলওয়ের যে কিছু আয়, তাহার অধিকাংশ বিদেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইত, বিশেষতঃ খনিকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় কেপ-ফ্রি-ষ্টেট লাইনের ট্রান্সভয়াল প্রদেশান্তর্গত জোহান্‌সবার্গ পর্য্যন্ত ৪০ মাইল স্থানের ভাড়া, ডিলাগোয়া বেলাইনের মোট ভাড়া হইতে বেশী নির্দ্ধারিত ছিল। আমদানী জিনিসের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অতি কমই ছিল। অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যতীত বিদেশ হইতে আমদানী কোন জিনিসেই তাঁহার প্রায় কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং আমদানী জিনিসের স্থাপিত শুল্কে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু বিদেশীয়দিগের সমস্ত জিনিসই বিদেশের আমদানী, এই শুল্কভার তাঁহারা অত্যন্ত গুরুভার বলিয়া মনে করিতেন। দশজনের সঙ্গে একত্রে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলে,

প্রাণ তাহাতে তত ক্লিষ্ট হয় না। কিন্তু একাকী যদি কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকা তত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে বুয়র-গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্য বোধ হয় উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের অভিমতানুরূপ হইয়াছিল। কারণ উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরবর্ত্তী বিতণ্ডাকালে এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আর কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। চতুর্থ ও পঞ্চম দফার লিখিত নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বুয়র-গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, পরামর্শদাতা সমিতির সৃষ্টি করিয়া বিশেষ ফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহা অতি অনিশ্চিত। সেইরূপ অনিশ্চিত সম্ভবপরতার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করাপেক্ষা যাহাতে চতুর্থ দফায় লিখিত অসুবিধা নিবারণার্থ প্রচলিত বিধান সমুদয় রীতিমত পরিচালিত হয়, তদ্রূপ কার্য্য করাই উচিত। এবং বুয়রগণ বলেন যে, তাঁহারা যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আশার অধিক ফল ফলিয়াছিল। স্বর্ণ চুরির কথা আর শুনিতে পাইত না। পাশ-ল সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্বন্ধেও খনিকগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সুরা সম্বন্ধীয় আইন সম্পর্কীয় কার্য্যকেও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উইটওয়াটারস রাণ্ডের খনিক এবং বণিক প্রভৃতির সভায় এতৎসম্বন্ধে যে রিজলিউসন পাশ হয়, বুয়রগণ তদ্দারাই তাঁহাদিগের কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। উইট্‌ওয়াটারস্ রাণ্ডের বণিক ও খনিকগণের অভিমত যাহাই হউক না কেন, চেম্বারলেইন্ সাহেব ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে বুয়র গবর্ণমেণ্টকে যে চিঠী লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও, সুরাসংক্রান্ত বিধান শিথিল ভাবে পরিচালিত হইতেছিল বলিয়া, বুয়রদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

উইটল্যাণ্ডারদিগের অবলম্বিত প্রথম উপায়, অর্থাৎ উইটল্যাণ্ডারগণ যে অত্যাচারিত, তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সকলের সহানুভূতির অধিকারী হওয়া, তাহাতে উইট্‌লাণ্ডারগণ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের প্রথমাভিযোগ যে, তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন না। এ অভিযোগের সত্যতা বুয়র কখনও অস্বীকার করিতেন না। বুয়রগণ এতদুত্তরে এই মাত্র বলিতেন যে, আদিমবাসীদিগের বিরুদ্ধে কোন কারণে অস্ত্রধারণ করার প্রয়োজন হইলে, প্রত্যেক বুয়র অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য। ইংরেজ এবং আমেরিকান্ উইট্‌ল্যাণ্ডারগণ এই নিয়মের অধীন হইতে চাহেন না; সুতরাং তাঁহারা বুয়রদিগের তুল্যাধিকার পাইতে পারেন না। এই উত্তর যে অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রকৃত সদুত্তর নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। আদিমবাসী সম্বন্ধে বুয়র-রাজ্যের অবলম্বিত নীতি অনেকের চক্ষেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া লক্ষিত হইবে। যিনি সেই সাধারণ-তন্ত্র-রাজ্যের সাধারণের মধ্যে একজন, তাঁহার পক্ষে, সেই নীতি পরিবর্ত্তিত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত, তৎসম্বন্ধে অবলম্বিত বিধি উপেক্ষা অথবা অবহেলা করার অধিকার থাকিতে পারেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রজা-সাধারণের কোন অধিকার ভোগী নহে, তাহার পক্ষে প্রজা-সাধারণের নির্দ্ধারিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ নিয়ম প্রতিপালন করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। উইট্‌ল্যাণ্ডারগণ রাষ্ট্রীয় বিভাগে অধিকার

প্রাপ্ত হওয়ার পরও যদি এই নিয়ম অপরিবর্ত্তিত থাকিত, এবং তাঁহারা তাহা প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রাপ্তাধিকার হইতে বরং বঞ্চিত করার কারণ উদ্ভূত হইতে পারিত। যাহা হউক, এই অভিযোগের কারণ দূর করিবার নিমিত্ত বুয়র-গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সনের পূর্ব্বে কোন প্রকার কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই।

আমরা ক্রুগার-প্রমুখ রক্ষণশীল বুয়রদিগকে উল্লিখিত সঙ্কীর্ণতার নিমিত্ত দোষারোপ করিতেছি বটে, কিন্তু অপর কোন রাজনীতিজ্ঞ অনুরূপ কার্য্য করিতেন কিনা, তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। অনেকগুলি নীচমনা পরশ্রী-কাতর উইট্ল্যাণ্ডারদিগের ব্যবহারে ও বাক্যে বুয়র-গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন; এই শ্রেণীর লোকদিগকে রাষ্ট্রীয় সভায় প্রবেশাধিকার দিলে, বুয়র সদস্যের সংখ্যা অপেক্ষা এই দলের সদস্যের সংখ্যা বেশী হইত। তাহাতে আবার ইহারা যদি আফ্রিকার স্থায়ী বাসেন্দা হইবেন বলিয়া বুয়র বিশ্বাস করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও বরং তিনি মনে করিতেন যে, অপর যাহাই হউক, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বুয়রগণ বিশ্বাস করিতেন যে, এই বিদেশীয় দল কখনও প্রকৃত আফ্রিকার চির বাসেন্দা হইতে স্বীকৃত হইবেন না, যখন তাঁহাদিগের ধনতৃষ্ণা কতক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইবে, তখনই স্বদেশের সুশীতল আবাসে ফিরিয়া যাইবেন। ইঁহারা এরূপ অবস্থায় নিজের স্বার্থ যেরূপ ভাবে দেখিবেন, আফ্রিকার স্থায়ী উন্নতির প্রতি তদ্রূপ ভাবে কখনও দৃষ্টি করিবেন না। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের অনুগ্রহের প্রতি বুয়র-রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর না করাই উচিত।

ক্রুগার রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার নীতি কার্য্যফলানুসারী; যে কার্য্যের দ্বারা অধিক পরিমাণ শুভ ফলের সম্ভাবনা, তদুপযোগী নীতিই অবলম্বনীয়। তিনি এই নীতিই অনুসরণ করিতেন। ইয়ুরোপের কোন দেশে বর্ত্তমান সময়ের পদস্থ রাজনৈতিক দল অনুরূপ নীতি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? গ্ল্যাডোষ্টোন্ মহোদয় মুখে বলিতেন বটে যে, যে নীতি ধর্ম্মানুমোদিত, ন্যায়ানুসারী এবং মানবের ন্যায্য স্বত্বাধিকারের প্রতি সম্মানের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহাই অবলম্বনীয়। এইরূপ নীতির পরিণাম ফল শুভ ব্যতীত অশুভ হইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার স্বমতাবলম্বী আর কতজন লোক তিনি পাইয়াছিলেন? ভারতের অদৃষ্ট লিপি বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতাশালী হস্তে ন্যস্ত ছিল, তখনই কি তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কুত্রাপিও উল্লিখিত উদার নীতি অবলম্বন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? গ্ল্যাডোষ্টোন কি কপটী ছিলেন? পাঠক মহাশয়, আমরা তত নীচ নহি যে, মহামতি গ্ল্যাডোষ্টোন্‌কে কপটী বলিব। তবে প্রকৃত কথা এই যে, গ্ল্যাডোষ্টোনের ন্যায় লোক যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন পৃথিবীতে তাঁহাদিগের মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা বড় বেশী থাকিতে পারে না। অন্ধকারময় জগতে তাঁহারা আসিয়া ক্ষণকাল তাঁহাদিগের প্রতিভার এবং শক্তির আলোকে মানব-নীতির উদার বর্ত্ম মানবকে দেখাইয়া যান, কিন্তু সেই নূতন পথ—যাহার গন্তব্য স্থল এখনও অনিশ্চিত, অপরীক্ষিত, সেই

পথে মানব অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করে; তৎপর, কালক্রমে, সেই পথ দেখিতে দেখিতে, তাহাতে অগ্রসর হইতে সমধর্ম্মী মানুষের প্রাণে সাহস হয়, এবং কোন সাহসী মহাপুরুষ সকলের অগ্রণী হইয়া ফল নিরপেক্ষ ভাবে অগ্রসর হন। তাঁহাকে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত দেখিলে, অপর সকলে গড্ডালিকা-প্রবাহে সেই পথে চলিতে থাকে। গ্ল্যাডোষ্টোন-প্রকৃতি লোক যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনই বোধ হয় যে, তাঁহারা আর কয়েক দিন পরে জন্মিলে জগতের সমধিক উপকার হইত। যাহা হউক, ক্রুগারাবলম্বিত নীতি বর্ত্তমান সময়ের অন্যান্য রাজ সচিবদিগের অবলম্বিত নীতির ছাঁচে ঢালা বলিয়া, ক্রুগারকে অধিকতর নিন্দা করিবার অধিকার আমাদিগের নাই। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত নীতি যদি গ্ল্যাডোষ্টোনের নীতির ছাঁচে ঢালা হইত, তবে তাঁহাকে আজি আমরা দেবতা বলিয়া পূজা করিতে পারিতাম। ক্রুগার ভূয়োদর্শন ও তীক্ষ্ণদর্শন গুণে ডিস্‌রেইলি এবং বিস্‌মার্কের সমকক্ষ না হইলেও, তিনি যে এই সমুদয় গুণে সমধিক পরিমাণে ভূষিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বুয়রের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সঙ্কীর্ণতাই বুয়রের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। তিনি উইটল্যাণ্ডারদিগকে প্রাণান্তেও তাঁহাদিগের সহিত তুল্যাধিকার দিতে প্রস্তুত হইতে পারিলেন না।

ক্রুগারের নিকটে যদি জুবার্টের চরিত্রের উদার জ্যোতি বিভাসিত না থাকিত, তবে হয়ত তাঁহার এ সঙ্কীর্ণতা তত তীব্র ভাবে লোকের দৃষ্টিপথে পতিত না হইতেও পারিত। কিন্তু জুবার্ট অতি উদার নীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি তাহা প্রকাশ করিতে কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না। কাজেই ক্রুগারের অবলম্বিত নীতি লোকের চক্ষে বড়ই দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

উইটল্যাণ্ডারদিগের দ্বিতীয় অভিযোগ যে, বুয়রগণের কৃতকার্য্যে তাহাদিগের বহুবিধ প্রকারে আর্থিক ক্ষতি হইত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের নিযুক্ত কমিসনের নির্দ্ধারণ দ্বারা এই অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণীকৃত হইল। বুয়র গবর্ণমেণ্ট এই অভিযোগের কারণ কতক পরিমাণে বিদূরিত করিলেন সত্য, কিন্তু তথাপিও যথেষ্ট পরিমাণে অবিদূরিত রহিয়া গেল। উইটল্যাণ্ডার যাহা পাইলেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন না, অন্যান্য দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যেও এতৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। একদলের মতে বুয়র গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত ছিল; আর একদলের মতে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণরূপেই করা উচিত ছিল।

উইটল্যাণ্ডারদিগের তৃতীয় অভিযোগ, বুয়র গবর্ণমেণ্টের অধীনে উইট্‌ল্যাণ্ডারদিগের জীবন অথবা সম্পত্তি কিছুই নিরাপদ নহে; এবং বিদেশীয় লোকের পক্ষে "বুয়ররাজ্যে শান্তিতে বসবাস করিবার সম্ভাবনা অতি কম। এই অভিযোগের সত্যতা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করা বড়ই সহজ হইত না। কারণ সকল বে-আইনী কার্য্যকেই কোন না কোন প্রকারের আইনের পরিচ্ছদে সজ্জিত করা যাইতে পারে। কিন্তু বুয়রদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েকটী ঘটনা এরূপ ঘটিল, যাহাতে প্রকৃত অবস্থা

সম্বন্ধে আর কাহারো মনে কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না।

(ক) এপ্লিবি নামক জনৈক পাদ্রির স্ত্রীকে কে হত্যা করিল, তাহা অবধারণ হইল না, এবং উইটল্যাণ্ডারগণ বলিলেন যে, বুয়র গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্য গোপন করিয়াছেন।

(খ) এড্গার নামক এক ব্যক্তির গৃহে রজনী যোগে পুলিশ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর সম্মুখে তাহাকে পিস্তল দ্বারা গুলি করিয়া নিহত করে, তন্নিমিত্ত কোন প্রকার শাস্তি প্রদত্ত হয় না।

(গ) লার্ড নামক জনৈক বুয়র-ফিল্ড-করনেট্ এক রজনীতে, জোহান্স্বার্গ নগরস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃষ্ণকায় প্রজাদিগের প্রতি অবৈধরূপে অত্যাচার করেন, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য, তাঁহার কোন শাস্তি বিধান করেন না।

(ঘ) জোহানস্বার্গ নগরে অসন্তুষ্ট উইল্যাণ্ডারগণ এক সভায় সমবেত হন, যে সমুদয় অসুবিধা তাঁহারা ভোগ করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে আন্দোলন করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই, একদল লোক নানা প্রকার গোলযোগ করিয়া সভার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল, তৎপর হাতাহাতিতে সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল। পুলিশ তাহাতে বাধা দিতে সক্ষম হইল না।

উপরের লিখিত অভিযোগ সম্বন্ধে বুয়র পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। যিনিই যাহা বলুন না কেন, যে অবস্থায় উপরের লিখিত রূপ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে; তদ্রূপ অবস্থার অস্তিত্ব কুত্রাপিও বাঞ্ছনীয় নহে। তবে উল্লিখিত রূপ ব্যাপারাবলম্বনে বুয়রজাতির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ইংরেজ জাতির পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে কিনা, উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ শ্রবণ করিলে, কাহারো মনে একথার উদয় হয় কিনা যে "চালনী বলেন স্থচি তোমার গায়ে একটী ছিদ্র," তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু একথা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে যে, বুয়ররাজ্যের শাসন-যন্ত্রে সকল স্ক্রুপ ভালরূপে কসা ছিল না।

অসন্তুষ্ট উইটল্যাণ্ডারগণ তাঁহাদিগের কষ্ট-কাহিনী দেশময় রাষ্ট্র করিলেন, এক আবেদন পত্রে গ্রথিত করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইলেন। ইংরেজের রাজসভায় উইটল্যাণ্ডারের দুঃখের আন্দোলন, ইংরেজের গৃহে তাঁহার নিমিত্ত সহানুভূতির অশ্রুবর্ষণ, সংবাদ পত্রের স্তম্ভ তাহা কষ্টকাহিনীতে পরিপূর্ণ। অভিমানী বুয়র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চিঠির উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা ইংরেজ-সাধারণের নিকট যথা সময়ে বলিলেন না। ইংলণ্ড তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে একতরফা রায় দিলেন। বুয়রগণ অনেক পরে বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগের বক্তব্য যথা সময়ে সাধারণের কর্ণগোচর না করা, তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু যখন বুঝিলেন, তখন ভ্রম সংশোধনের আর সময় রহিল না। উইটল্যাণ্ডারের প্রথম উপায় সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩০। জমিদারী কার্য্যের নিয়মাবলী। ৺কৈলাসনাথ রায় চৌধুরী ...৩, ৮নং নবকুমার হালদার লেন হইতে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১।০; তৃতীয় সংস্করণ। বহুদিন এ পুস্তক পাওয়া যাইত না, গ্রন্থকারের সৎপুত্র, অনেক অর্থব্যয় করিয়া এই পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। আইনঘটিত বিষয়গুলি উপযুক্ত উকীলের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে, এবং জমীদারী সেরেস্তার অনেক কাগজ পত্রের নমুনা দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণে পুস্তকখানি দ্বিতীয়

সংস্করণের আকার অপেক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। জমীদারী কার্য্যের নিয়মাবলী সম্বন্ধে ইহা শ্রেষ্ঠ পুস্তক;—গৃহপঞ্জিকার ন্যায় ইহা ঘরে ঘরে রাখার যোগ্য। আশা করি, অনেক লোকে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৩১। ব্রহ্ম-গীতা।—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিচরিত, মূল্য ১৲; ভিক্টোরিয়া প্রেস।

কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান যোগ, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভক্তিযোগ পরবর্ত্তী খণ্ডে বিবৃত হইবে।

বয়সের পরিপক্কতার সহিত বিশ্বাসী ভক্তের ধর্ম্মমতের উদারতা ও পরিপক্কতা জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা, সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার ভাষা-জ্ঞান অতি সুন্দর। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও কর্ম্ম-যোগের মত সকল পাঠ করিয়া এবার পাঠক-গণ বিমোহিত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকে গভীর তত্ত্ব সকল এরূপ সহজ ভাষায় প্রশ্ন-উত্তর রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে যে, গল্পের ন্যায় মধুর বলিয়া বোধ হয়; নীরস ও কর্কশ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। চিরঞ্জীব শর্ম্মার লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক, ধন্য তিনি যে, এরূপ গভীর বিষয় অতি সুন্দর ও সরস করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা পড়িয়া মোহিত হইলাম। তাঁহার সকল মতের সহিত যোগ দিতে না পারিলেও, একথা বলিতে পারি যে, এ গ্রন্থ পাঠে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট যে ইহা খুব আদৃত হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

৩২। গীতা-কাব্য।—শ্রীশৈবলিনী দেবী অনুবাদিত, মূল্য ১৲; জয়ন্তী প্রেস।

ধর্ম্মজগতে গীতাতত্ত্বের ন্যায় গভীর তত্ত্ব আর প্রচারিত হয় নাই। যত ইহার বিবিধ টীকা, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করা যায়, ততই ইহার নূতনত্বে অনুপ্রবেশ করা যায়। এ শাস্ত্র যেন নিত্য নূতন। ইহাপেক্ষা গভীর তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রচার করিতে পারেন নাই, পারিবেন কি না, তাহাতেও গভীর সন্দেহ বিদ্যমান।

২০ বৎসর পূর্ব্বে এই গীতা শাস্ত্র এদেশে একপ্রকার দুর্লভ ছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা একখানি জীর্ণ গীতা ক্রয় করিয়াছিলাম। এই ২০ বৎসরের মধ্যে গীতা শাস্ত্র ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, অন্তঃ-পুরেও গীতার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী অন্তঃপুরে থাকিয়াও গীতা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন; কেবল পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। শৈবলিনীর ক্ষমতা অসাধারণ, নচেৎ এই কঠিন কাজে কখনও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার অনুবাদ যতদূর সম্ভব সুন্দর হইয়াছে, মহিলাগণ পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইবেন, আশা করি।

আর একটী কথা, অনেকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফল এই হইয়াছে যে, বাঙ্গালা সাহিত্য উপকথা, গল্প ও উপন্যাসে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে;—মহিলাগণ দিবারাত্রি নানা অসার উপকথা পাঠ করিয়া কল্পনার রথে চড়িয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মাসিক পত্রিকা সকলও যে দিন দিন অসার গল্পে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহা কেবল মহিলা-পাঠকগণের আগ্রহ ও উত্তেজনার ফল। যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই গীতা-কাব্য একবার পাঠ করুন। ইহা স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ফল। গীতাকাব্য, অন্তঃপুরে যদি খুব প্রচারিত না হয়, তবে মনে করিব, গল্প পাঠের জন্যই বুঝিবা মহিলাগণ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

বার-ভুঞা।

মুকুন্দরায়।

বারভুঞা দলের মধ্যে ভূষণার মুকুন্দ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় জমিদারগণের মধ্যে যাঁহারা কিছুমাত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, বাদসাহ বা তৎ প্রতিনিধিগণকে গ্রাহ্য করেন নাই, বরং সময় সময় প্রতিযোগী ভাবে সমরাঙ্গণে অব তরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় বলবীর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নামই তৎসময়ের পারস্যভাষায় লিখিত ইতিহাসে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা অদ্য যে মহাত্মার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম, তাঁহার নামও সেইরূপ ভাবে গৃহীত হইয়া, মহামনা আবুল ফাজেল কৃত "আকবর নামা" গ্রন্থে চির অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে মুকুন্দ রায় "মুকুন্দ জমিদার" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন। সাধারণতঃ লোকে ঐ স্থানকে ভূষণা মামুদপুর বলিয়া থাকে। অধুনা মামুদপুর মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে এবং উহার পূর্ব্বতটে ভূষণার অস্তিত্ব বর্ত্তমান দেখা যায়। বোধ হয়, যেমন পদ্মানদীর বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, তদ্রূপ গোরাই নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। মহা সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভূষণা এখন কেবল মাত্র একটী পুলিশ ষ্টেশন বক্ষে ধারণ করিয়া আপন পূর্ব্ব গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি জনগণের গোচরীভূত করিতেছে।

সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে সাগর-স্রোত প্রবাহিত হইত, ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা বহু শত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সম্যকরূপে উহার জলনিঃসরণ না হওয়ায় কোথাও বা হ্রদরূপে বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। এই সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের সমষ্টিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়ল খাঁ নদীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে মধুমতীর পূর্ব্বতট পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেখানেই মৃত্তিকার কিছু নিম্নেই একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা স্বভাবতঃই ভীটগ্রাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, ঠিক তদনুরূপ ; এইজন্য, বোধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল দাম ছিল, কালক্রমে উহা প'চিয়াই এইরূপ মৃত্তিকারাশির এবং উহা ক্রমে নিম্ন পতন-সহিত স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হয়। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর বিভাগের অন্তর্গত, বোধ হয় ফরিদপুরও পূর্ব্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্ভূত ছিল।

প্রবাদ আছে, এই স্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, কেহই আর আবাদ করিয়া

উঠিতে পারে নাই, পরে ফতেআলী নামীয় এক মুসলমান বহু আয়াসে এই স্থানে মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে উহার নাম হয় "ফতেয়াবাদ"। আইন-ই-আকবরিতে সরকার ফতেয়াবাদের নামোল্লেখ আছে, উহার মহালের সংখ্যা ছিল ৩১, রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৫৭ দাম। হাবেলী ফতেয়াবাদ সাধারণতঃ ভূষণা নামে কথিত হইত। আইন-ই-আকবরি বা আকবর নামাতে ভূষণার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এইরূপ বাকলা ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের নামও আইন-ই-আকবরি বা আকবর নামাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মুকুন্দরায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিক্রমপুর আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের রায় রাজগণ, চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ, সকলেই "দে" উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন, আমাদের বিবেচনায়, এই তিন রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন, কেবল আমাদের যে এই মত, এমন নয়, এতৎ সম্বন্ধে ভারতী ও বালক পত্রিকায় * যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, অন্যান্য লেখকের মতেও এইরূপ অনুমান সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আপতিত হইতেছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মর্দ্দন রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়টী জমীদারী সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর সৃষ্টি-কর্ত্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দনুজ মর্দ্দন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই-সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারীর প্রবর্ত্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত।"

যদিও বক্তিয়ার খিলিজী পূর্ব্ববঙ্গের সীমাতেও পদার্পণ করেন নাই, তথাপি দে বংশীয় রাজগণ যে, একই বংশোদ্ভব ছিলেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের প্রধান চারিটী সমাজ, ১ম বিক্রমপুর, ২য় বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ, ৩য় ভূষণা বা ফতেয়াবাদ, ৪র্থ যশোহর সমাজ। বিক্রমপুর ও বাকলা সমাজের পরই ফতেয়াবাদ সমাজের উৎপত্তি। মুকুন্দরায় এই ফতেয়াবাদ সমাজের সর্ব্ব প্রধান নেতা ছিলেন। এই সময়ে বহু কুলীন কায়স্থ নানাস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া ভূষণা ফতেয়াবাদে বাস করিতে থাকেন। এতন্মধ্যে রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমপুর মালখানা নগর হইতে উঠিয়া আসিয়া বসুবংশের এক শাখা ফতেয়াবাদ সমাজের অন্তর্গত ওলপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভূষণা প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। "যশোহরের পূর্ব্ব অথচ ভূষণার নিকটস্থ দীঘলবালা গ্রামে কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভূষণাধিপতি মুকুন্দরায়ের নাম লিখিত একখানি পুরাতন তুলট কাগজের তায়দাদ আছে।"

এই সময়ে ভূষণাপটী বলিয়াই একটা

* ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী ও বালক দেখ।

সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভূষণাপট্টী বলিয়া এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তিলি, বণিক, কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও ভূষণাই পটী বলিয়া একটা সমাজ আছে।

এই রাজবংশের উৎসাহে ভূষণাতে বিবিধ প্রকার শিল্প কার্য্যের উৎকর্ষ সংসাধিত হয়। ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের বোয়ালমারির কার্পাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদাৎ ইয়োরোপে আমদানী হইত। ফতেয়াবাদের স্থপতিরা এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় হর্ম্ম্যমালাও মঠাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। স্বাধীন প্রদেশে ব্যবসায়ের ও শিল্প কার্য্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, তৎকালীন ভূষণা,ফতেয়াবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"হিজরী ৯৮৮ সনে (১৫৭০ খ্রীঃ অব্দে) সম্রাট আকবর সাহেব বঙ্গাধিকারের সমকাল মোরাদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ হয় (১৫৭৫), তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর, হিজলীর (উড়িষ্যার) খামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীরজানজাদ খাঁ সহজেই মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করিল। মোগল সেনাপতি মোনেম খাঁর মৃত্যু হইলে পর, পাঠান কোতোল খাঁ এই অবসরে পুনরায় বাঙ্গলা আক্রমণ করিল, বিশেষতঃ যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল রাজ্যের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

কোতল খাঁ প্রথমতঃ সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মীরজানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন, মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থে পলাইয়া ছলিমাবাদ (সেলিমাবাদে) * প্রস্থান করিলেন, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া দর্পনারায়ণ (কন্দর্পনারায়ণ) প্রতাপ (প্রতাপাদিত্য) ও ফিরিঙ্গিদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে কোতল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হইল। এই সময় মুকুন্দরায় তথাকার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্য ভাব থাকায় মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কোতল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিল, মুকুন্দরায় মোরাদের সৈন্যগণের সহিত নিজ দলবল মিলাইয়া কোতল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহও ঠিক এই সময়ে বহুসংখ্যক সৈন্য সহিত বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়া কোতল খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করিল।" †

* পূর্ব্বে এই পরগণা সরকার খলিফেতাবাদের অন্তর্গত ছিল, অধুনা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে দৃষ্ট হয়। বাখরগঞ্জে অনেক মীর বংশ বাস করেন, তাঁহারা এই মীরজান জাদের বংশ কি না, বলা যায় না।

† ডাক্তার ওয়াইজ অথবা অন্য কোন ইতিহাস।

মানসিংহ জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদের অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া, মুকুন্দরায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়া ঐ স্থানের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর পরিবার বর্গকে যথোচিত ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপে নামে মাত্র মোগলাধীনে থাকিয়া যখন মুকুন্দ রায় ভূষণার কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে উহার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা গিয়াছে।

চিরন্তন সুখ সৌভাগ্য প্রায় কাহারও ঘটিয়া উঠে না। মুকুন্দ রায়ের পক্ষে তাহাই হইল। ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে মোগল-কুল-গৌরব আকবর সাহ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র সেলিমসাহ জাহাঙ্গির নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর তক্তে আরোহণ করিলেন। বাদসাহ হইয়াই তাহার প্রথম লক্ষ্য হইল, বর্দ্ধমানের সুবেদার সের সাহের পত্নী মেহেরউন্নেসাকে লাভ করা। এইজন্য মানসিংহের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না বিবেচনায়, তাহাকে দীল্লিতে আসিতে অনুজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন। এবং তৎকার্য্যে কুতুবুদ্দিনকে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন।

কুতুব অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। বিশেষ বাদসাহের বিশেষ অনুগৃহীত বিবেচনায় কাহাকেও ভয় করিয়া চলিত না। মানসিংহ যাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া প্রধান প্রধান কার্য্যে রাখিয়াছিলেন, কুতুব সেই সকল রাজকর্ম্মচারিগণকে ক্রমে ক্রমে অবসর করিয়া তৎস্থলে নূতন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ফতেয়াবাদের প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, তখন মুকুন্দরায়কে অপসৃত করিয়া তৎস্থানে এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিলেন। মুকুন্দরায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোন মতেও নবশাসনকর্ত্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষে এই জন্য একটী যুদ্ধ ঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দরায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন *। এই হইতে মোগল সম্রাটের উপর তাহার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইল। এদিকে দেশীয় পাঠান যায়গীরদারেরা চুপে চুপে বাদসাহের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিতেছিল, বঙ্গীয় অন্যান্য ভূস্বামীরাও নানা কারণে তখন বাদসাহ ও তৎপ্রতিনিধিগণকে ক্রূর প্রকৃতি বলিয়াই ভাবিতেছিলেন। ইহার ফলে পরিণামে বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে প্রধান দ্বাদশ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া বাদসাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অবতরণ করিল। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দু মুসলমানে কখনও ঐক্য

লেখক মুকুন্দরায় সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পরস্য ভাষায় লিখিত মূল "আকবর নামা" অনুবাদ করাইয়া এসম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

* এই যুদ্ধ (বঙ্গ) জিতিয়া (ফতে করিয়া) রণস্থানের নাম মুকুন্দরায় ফতেপুর বা ফতেজঙ্গপুর রাখিয়াছিলেন। অধুনা উহা মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত।

ভাবে কোন দিন কার্য্য করিতে পারে নাই, অথবা পারিবে না, তাহারা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, মুসলমানাধিকার সময়েই হিন্দুর সহিত মুসলমান মিলিত হইয়া মুসলমান রাজ্য বিনাশ ব্যপদেশে একত্রিত ও এক-মতাবলম্বী হইয়াছিল।

এদিকে সেরখাঁর হস্ত হইতে মেছের উন্নেসাকে ছিন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হওয়ায় কুতুবুদ্দিন হত হইল। অন্য দিকে বাঙ্গলার বিদ্রোহী জমিদারগণ মোগল-রাজ-কর বন্ধ করিয়া দিল। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদসাহ জাহাঙ্গীর পুনর্ব্বার সুদক্ষ সেনাপতি মানসিংহকে বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ বাঙ্গলায় আসিয়া যেরূপভাবে বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তাহা বার বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যশোহরের পতনের পরই ভূষণাও মোগল সেনাপতির হস্তগত হইল। বিশেষ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মুকুন্দ রায় আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। অগণিত মোগল-বাহিনীর সহিত মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া যতক্ষণ পারিলেন, আপন ভুজবলের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পরিণামে সম্মুখ সমরে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণ যেন এইরূপে স্বদেশ উদ্ধার কল্পে জীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এই উপদেশ প্রদানচ্ছলে সেই শূরভোগ্য ত্রিদিবধামে গমন করিলেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

বঙ্গের "পাল"-রাজগণ।

খ্রীঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দী।

২য় ব।—৯ম বা ১০ম শতাব্দীর রাজগণের তালিকা দেখিলেই, সহজেই—সুরম্যভাবেই—তোমার বোধগম্য হইবে। সেই হেতুই নৃপনিচয়ের বংশতালিকা দ্বারা তোমার মনোরঞ্জন করিতে কামনা করিয়াছি।

১ম ব।—কখন্ হইতে রীতিমত ধারা-বাহিক বৃত্তান্ত বিদিত হওয়া যায়?

২য় ব।—খ্রীষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শাক হইতে নিয়মিত ইতিবৃত্তের উপকরণ, বিলক্ষণই বিদ্যমান।

১ম ব।—কোন্ নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে বঙ্গে বৌদ্ধ-মতের প্রাদুর্ভাব?

২য় ব।—খ্রীষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শাকের প্রারম্ভে বঙ্গে বৌদ্ধাধিকারের প্রবল প্রভাব, প্রাদুর্ভাব ও সূত্র-পাত। তদানীং বঙ্গভূমি, সভ্যতা-প্রদীপালোকে প্রকৃষ্ট প্রদীপ্ত—সুতরাং সম্যক্ সমুজ্জ্বল। অতএব দেখিলাম,—"বৌদ্ধ" "পাল"-নরপাল কুলের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় ইতিবৃত্ত পাঠক-পুঞ্জের সহিত পুরা-বৃত্ত-প্রসঙ্গের প্রথম পরিচয়।

১ম।—তদনন্তর কাহাদের প্রভাব?

২য়।—উহার অব্যবহিত পূরবর্ত্তী কাল হইতেই, হিন্দু-ভূপ-বৃন্দের অভ্যুদয় হয়। সে সকল কথা, পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। এখন উত্থাপিত ব্যাপারের তত্ত্বে অবহিত হওয়া যাউক।

১ম ব।—কোন্ রাজার পর, কোন্ রাজার কর্তৃত্ব, কি প্রকারে অবগত হইব?

২য় ব।—যে যে নামের বাম ভাগে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি অঙ্ক দৃষ্ট হইবে, তাঁহারাই, ক্রমান্বয়ে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে

১ম ব।—কিন্তু ৪র্থ (চতুর্থ) রাজা "বিগ্রহ-পালের" জ্যেষ্ঠ সুত "নারায়ণপাল" অগ্রেই ভূমিপতিত্ব প্রাপ্ত হন নাই কেন?

২য় ব।—ও কথার এক মাত্র উত্তর—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

১ম ব।—তোমার সংস্কৃত-বচনের অর্থ-বোধে আমি একান্ত অশক্ত।

২য় ব।—অর্থাৎ 'জোর: যার—মুলুক তার।' এই সকল কথা, এক্ষণে দূরে রাখ। এখন যথাস্থানে বর্ণনার সহিত তালিকা দেখিয়া লও।

১ম।—এই বার কোন্ ব্যাপারের বিবরণ শ্রবণ করাইবে?

২য়।—পুনরায় তোমায় যে মহীপাল-সকলের রাজ্য-কাল শ্রবণ করাইতে কামনা করিতেছি, তাঁহাদের সংখ্যা, এক-মতে ১০ (দশটী)-মাত্র; অন্য মতে ২১শ (একবিংশ)। কিন্তু, বলাই বাহুল্য—তদ্বিষয়ে মত-দ্বৈধ বিদ্যমান।

১ম।—কোন্ মতটী, অধিকতর প্রামাণিক?

২য়।—যে মতামত, দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত হইল, তাহাই অপেক্ষাকৃত প্রমাণ-সঙ্গত।

১ম।—দক্ষিণ ভাগে যে নাম-মালা, স্থাপিত করিতে চাহিতেছ,—সেগুলি, অধিক প্রামাণিক কেন?

২য়।—শিলা-লিপির সাহায্যে প্রাচীন তত্ত্ববিদেরা, যে যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন,—তাহাকে প্রমাণ-পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে, কাহারই বা অমত হইতে পারে? সেই হেতুই সেই মতটী, দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত হইতেছে।

(রাজগণের নাম)	
(১) রাজা ভোপাল (রাজা ভূপাল)	৫৫
(২) ধূপাল	৯৫
(৩) দেবপাল	৮৩
(৪) ভূপতিপাল	৭০
(৫) ধনপতি পাল	৪৫
(৬) বিগন্পাল (বিজনপাল)	৭৫
(৭) জয়পাল	৯৮
(৮) রাজপাল	ঐ
(৯) ভোগপাল	৫
(১০) জগপাল	৭৪

১০ (দশ) নরপতির রাজত্ব ৬৯৮ (ছয় শত আটানব্বুই বর্ষ)।

(রাজগণের নাম)
(১) গোপাল
(২) ধর্ম্মপাল (১ম)
(৩) দেবপাল
(৪) রাজাপাল (১ম
(৫) শূরপাল
(৬) নারায়ণপাল
(৭) মহীপাল (১ম)
(৮) স্থিরপাল
(৯) বসন্তপাল
(১০) কুমার পাল (১০১৭ খৃঃ)
(১১) লোকপাল
(১২) ধর্ম্মপাল (২য়)
(১৩) জয়পাল
(১৪) নারায়ণপাল
(১৫) * * *
(১৬) * * *
(১৭) রাজাপাল (২য়)
(১৮) মহীপাল (২য়) (কাশীস্থ)
(১৯) নয়পাল
(২০) বিগ্রহপাল

১ম বন্ধু।—ঐ ১০ (দশ) জন নরনাথ, কোন্ জাতীয় রাজা?

২য়।—তাঁহারা, 'কায়স্থ' জাতীয় নরপতিগণ।

১ম।—এখন অন্য কোনও বিবরণ শ্রবণ করিতে পারিব কি?

২য়।—অতঃপর পুনর্ব্বার অপর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ ঘটিবে। সম্প্রতি পার্শ্ব-স্থিত নাম সমস্তের প্রতি প্রীতির সহিত দৃষ্টিপাত কর।

---

১ ম।—"আইন-ই অকবরি" হইতে যে ১০টী (দশটী) নাম প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সহিত, শিলা-লিপির সাহায্যে প্রাপ্ত ২১ (একুশটীর) মধ্যে কোন কোন নামের সাদৃশ্য অবলোকিত হইতেছে, ইহার কি কোন কারণ বিদ্যমান নাই?

২য়।—হাঁ। বিনা কারণে তো কোনই কার্য্য সমুৎপাদ্য নয়। ঐ সাদৃশ্য দ্বারা ইহাই সাব্যস্থ হইতেছে যে,—

(ক) দেবপাল

(খ) রাজপাল বা রাজ্যপাল

এই দুই নাম, প্রকৃত প্রস্তাবেই যথার্থ নাম।

১ম।—শিলা-লিপির অনুকূলতায় দক্ষিণ-দিগ্-বর্ত্তিনী নাম-মালিকার তালিকায় কি অবগত হইব ?

২য়।—তোমার এই অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করিয়া, নীরব থাকিলে, সহৃদয়তা অমুক্ত থাকে। নিম্নের তালিকা পাঠ কর।

(৯ম বা ১০ম শতাব্দী)।

১ গোপাল
- ২ ধর্ম্মপাল,
  - ৩ দেবপাল (নয়পাল),
    - ৪ বিগ্রহপাল (শূরপাল)
      - ৬ নারায়ণপাল
    - রাজ্যপাল
      - ৫ মহীপাল
        - পালগণ (কাশ্মীরের রাজগণ)
        - চন্দ্রদেব (কনোজ-রাজ)
  - জয়পাল
- বাক্‌পাল
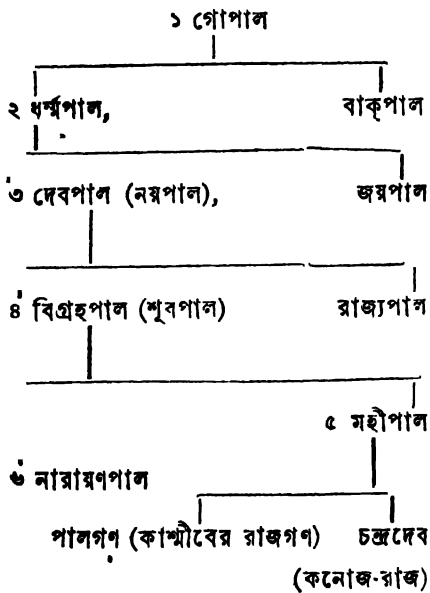
১ম ব।—"দেবপাল" রাজার নামের পার্শ্বে বন্ধনীর ভিতর "নয়পাল" শব্দ কি কারণে বিরাজমান ?

২য় ব।—ঐ নরনাথের দ্বিতীয় সংজ্ঞা—'নয়পাল'। কেবল দেবপালই, নাম-দ্বয়ে অভিহিত হইতেন, এমন নহে। তৎ-পুত্র—তাঁহার অগ্রজাত সুত—"বিগ্রহপালও" দুই নামে প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি "শূরপাল" এই সংজ্ঞাতেও পরিচিত হইতেন।

১ম ব।—এই গোত্রে কত জন রাজার আধিপত্য চলিয়াছিল ? তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কি ঘটনা জানা যায় ?

২য় ব।—"পাল"-উপাধি-ধারী নৃপ-কুল-সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ ভূপতির ক্রিয়া-নিচয়ে সঙ্কুল। তন্মধ্যে ৬ (ছয়টী) প্রধান রাজা। এই রাজবৃন্দের বর্ণনা-সম্বন্ধে এতাবতী উক্তি-ই, যথেষ্ট যে,—উহা যাবতীয় জটিলতায় কুটিল; তথাপি উহার রহস্য, যতদূর উদ্ভিন্ন হওয়া সম্ভাবিত—তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একে একে বিবৃত হইতেছে।

১ম ব।—তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত, কিরূপ ছিল ? অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ ধর্ম্মাশ্রিত নৃপতি ?

২য় ব।—এতদ্বংশীয় নৃপ-নিচয়, শাক্য-গৌতমের অতীব অনুরক্ত ভক্ত। "পাল-" নৃপতি কুল কর্ত্তৃক গৌতমের পরম প্রিয়তম মত, অনুসৃত হইত। সুতরাং ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহারা বৌদ্ধ মতেরই অনুবর্ত্তী।

১ম ব।—কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত মতবাদ-প্রচারে তাঁহাদের স্পৃহা বা অনুরাগের কোন নিদর্শন সন্দর্শন করিতে পাওয়া যায় কি না ?

২য় ব।—না। তন্মতে তাঁহাদের আসক্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহাতে কেহই, তাঁহাদের অত্যাসক্তি, উৎকট অনুরাগ—অথবা গোঁড়ামির কণা-প্রমাণ নিদর্শন নিরীক্ষণ করেন নাই।

বৌদ্ধমত-বিষয়িণী বুদ্ধদেবের বাণী-পরম্পরার প্রতি প্রীতি ও আসক্তি সত্বেও, সাম্প্রদায়িক ভাবের উপর তাঁহাদের অশেষ

ও বিশেষ বিদ্বেষ দৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতার প্রভুতা-বিস্তারের কথা—তথায় উঁহাদের বিরুদ্ধে মতের রাজত্ব ও কর্ত্তৃত্ব, কি বিস্ময়াবহ বিষয় নয়? যখন আমরা প্রমাণ পরম্পরার আনুকূল্যে নিরীক্ষণ করি—"পাল"-রাজ-কুল, ঔদার্য্যের গাম্ভীর্য্য-মূলক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, শুধু দীক্ষিত হইবার কথা নয়—বিরুদ্ধধর্ম্মী লোকাদিগের উপর সাম্য-মন্ত্রানুসারে মায়া মমতা প্রদর্শিত করিয়া আসিয়াছেন, তখনই কি তাঁহাদিগকে মহারাজাধিরাজ অশোক মহাপুরুষেরই উপযুক্ত অনুবর্ত্তক বলিয়া পূজা করিবার কামনা-প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় না?

১ম ব।—এই রাজন্য-কুলে উদারতার লক্ষণ, বিদ্যমান ছিল কি?

২য় ব।—অনৌদার্য্যের পরিবর্ত্তে ঔদার্য্যের শত শত প্রমাণ, অদ্যাবধি বর্ত্তমান।

১ম ব।—তাঁহাদের রাজ্য-কার্য্য-পর্য্যালোচনের জন্য কোন্ জাতীয় লোকের উপর মন্ত্রিত্ব, সমর্পিত হইত—বলিয়া দাও।

২য় ব।—যাঁহারা বৌদ্ধ-দ্বেষ্টা হিন্দু—তাঁহারাই অমাত্য হইতেন। কিন্তু ইঁহারা সেই হিন্দুজাতীয় ব্রাহ্মণগণকে সচিব-পদবীতে কেবল মুখে বা লেখা-পড়ায় উল্লিখিত নীতির রীতির অনুসরণ করাইতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহারা, বাস্তব ব্যাপারে অনুদারতার সঙ্কীর্ণ সীমা-অতিক্রমে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সমর্থ ছিলেন। যাঁহারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া—সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত না থাকিয়া—বরং বিলক্ষণ বিচক্ষণের মত, বিশ্বস্ত চিত্তে—অম্লান বদনে—বিধর্ম্মীদিগকেই (হিন্দুজাতীয় দ্বিজবর্গকেই) অমাত্য-পদবীতে সমারোপিত করিতেন, তাঁহারা সর্ব্বকালিক লোক-সমূহের পূজ্য ও আরাধ্য—বন্দনীয় ও অনুকরণীয়।

১ম ব।—এই প্রশস্ত নীতির অনুবর্ত্তন-ব্যাপারে তাঁহাদের আদর্শ-স্বরূপ কোন রাজা ছিলেন? না—এ বিষয়ের তাঁহারা নিজে নিজেই, পথ-প্রদর্শক?

২য় ব।—ভারতের অন্যতম বৌদ্ধ মহীপতির পদাঙ্ক-অনুসরণে এই মহীপাল-কুল, চালিত হইতেন—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, আমাদিগকে—ভ্রান্ত মতের আশ্রিত বলিবার কাহারও অবসর ঘটিবে না।

১ম ব।—মহারাজ অশোক, তবে তো এক আদর্শ-স্থানীয় রাজেন্দ্র! আচ্ছা,—'পাল'-রাজ-বর্গের অনুবর্ত্তক অন্য কোন ভূপতির বিষয় তুমি জ্ঞাত আছ?

২য় ব।—হাঁ। মহারাজ অকবরকেও, এই নীতির প্রতি অতিমাত্র আসক্তিমান্ হইতে শোনা গিয়াছে।

১ম।—এই বংশীয় রাজন্যগণের সম্বন্ধে যে যে বিবরণ, জ্ঞান-গম্য বা বিশেষ জ্ঞাতব্য—তাহা জানিবার পন্থা নাই কি?

২য়।—বিস্তর বিষয়-ব্যাপারই, আমাদের বোধসুলভ—নেত্রগোচর। নীচে তাঁহাদের একটা বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে,—

রাজার নাম।	রাজ্যারোহণ কাল।	রাজ্যস্থিতি	অনুমিত স্থায়িত্ব	রাজধানী	ধর্ম্মমত	মঠ-স্থাপন	বক্তব্য।
গোপাল	৯০৬ খ্রীঃ	৭ বর্ষ	২০ বর্ষ (৯২৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত	ওদন্তপুরী	বৌদ্ধ	(ক) নালন্দে (খ) বিক্রমশীলায়	সাহেবদের মতে ২০ বর্ষ রাজ্যস্থায়িত্ব
ধর্ম্মপাল *	৯২৬ খ্রীঃ	২৬ „	৩০ „	—			ইনি কামরূপ-জেতা; হিমাচলে গমন করিয়া তথায় নিহত।

* ধর্ম্মপাল।—ইনি 'হিমাচল' অঞ্চলে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নিহত হন। ইঁহার নামে এক দীর্ঘিকা দীর্ঘকাল হইতে বিদ্যমান—উহা "ধর্ম্মপাল-দীঘী" বলিয়া বিখ্যাত।

রাজার নাম।	রাজ্যারোহণ-কাল।	রাজ্যস্থিতি	অনুমিত স্থায়িত্ব	রাজধানী	ধর্ম্ম-মত	মঠ-স্থাপন	বক্তব্য।
দেবপাল	৯৫৬খ্রীঃ	৹৯৯০ খ্রীঃ	৩৪	—	বৌদ্ধ	—	
বিগ্রহপাল	৯৯১ খ্রীঃ	১০০৫খ্রীঃ	১৪	—	ঐ	—	

৫। দেবপাল কবে রাজা হন—তাঁহার রাজ্য-স্থিতি এবং তদীয় রাজত্বের অনুমিত স্থায়িত্ব রাজধানী ও ধর্ম্মমত—উপরে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে বক্তব্য দেখুন।

(১) দেবপাল, ২য় ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র।

(২) তৎপিতা—"বাক্‌পাল"।

(৩) "বাক্‌পাল" উক্ত 'ধর্ম্মপালের' কনিষ্ঠ সহোদর।

(৪) দেবপাল, জনপদ-বহুল নানাবিধ রাজা-সঙ্কুল রাজ্য সকলের জেতা।

(৫) উপাধি—"রাজ-চক্রবর্ত্তী" (মহারাজাধিরাজ)।

(৬) সুতরাং সমগ্র ভারত-ভূ-ভাগের না হউক, অন্ততঃ তিনি সমস্ত 'আর্য্যাবর্ত্তেও' আধিপত্য করিতেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

(৭) ইঁহার রন্ধনাগারে এক তত্ত্বাবধায়কের (বৈদ্যের) অস্তিত্ব ছিল।" "চক্রপাণি-দত্ত"-নামা স্বনামপ্রখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার, ঐ তত্ত্বাবধায়কের ভ্রাতুষ্পুত্র।

(৮) দেবপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—'জয়পাল'।

(৯) জয়পালের নামান্তর—"নয়পাল"।

৬। বিগ্রহপাল—৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজ্য-ভোগ করেন।

(ক) দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি, তাঁহার অধিকৃত।

(খ) ২য় নাম—"শূরপাল"।

(গ) তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম—'রাজ্যপাল'।

"বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকা"-কার, আমাদিগকে অবগত করেন যে, আদি গাঁইওঝা, প্রবলপ্রতাপ "ধর্ম্মপালের" পরম-পূত পৌরোহিত্য-পদে ব্রতী ছিলেন। সেই গৌরব-ময় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি অতুল যশোভাগী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এটী 'আদি গাঁইওঝার' যোগ্যতা, বিদ্যাবত্তা ও পুণ্যশালিতার অকাট্য প্রমাণ। তিনি যে মহাপুরুষের সন্তান, তাহাতে ও-রূপ ঘটনা, অস্বাভাবিক নয়।

আদি গাঁই, ধর্ম্মপালের নিকট যজ্ঞীয় কার্য্য, অত্যাশ্চর্য্য বিধানে সম্পাদনের নিমিত্ত উত্তম পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। "ধামসার" গ্রাম, তাঁহাকে সম্প্রদত্ত হয়। উহাই যজ্ঞীয় দক্ষিণা।

যদি বারেন্দ্রীয়-কুল-গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে, এই "ধর্ম্মপাল" সুনাম-প্রথিত বৌদ্ধ-ধরণীশ্বর নহেন।

বৌদ্ধগণেরও পুরোহিত আছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ নরপতি কর্ত্তৃক হিন্দুজাতীয় পুরোহিত নিযুক্ত করা, কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই।

রাজার নাম।	রাজ্যারোহণ-কাল।	রাজ্যস্থিতি	অনুমিত স্থায়িত্ব	রাজধানী	ধর্ম্মমত	মঠ-স্থাপন	বক্তব্য।
মহীপাল	(১০০৬ খ্রীঃ	১০২৫খ্রীঃ	১৯	—	বৌদ্ধ	—	
নারায়ণপাল	১০২৬ খ্রীঃ	১০৪৬ খ্রীঃ	২০	—	ঐ	—	

মহীপাল—(১০০৬ খ্রীঃ—১০২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত)

১। স্বনামখ্যাত দীর্ঘিকার খনন-কর্ত্তা। সরোবরের নাম- "মহীপাল-দীঘী।"

২। অদ্যাপি উহা বিদ্যমান।

৩। দিনাজপুরে উহার সত্তা আছে।

৪। নারায়ণপাল, তাঁহার অগ্রজাত ভ্রাতা।

নারায়ণপাল—১০২৬ খ্রীঃ—১০৪৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত।

১ম।—"গোপাল" ভূপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "বাক্‌পাল" রাজত্ব প্রাপ্ত হন নাই কি কারণে?

২য়।—এতদ্বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণাভাব। সম্ভবতঃ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ('ধর্ম্মপালের') রাজ্য-কাল, সমাপ্ত না হইতেই, 'বাক্‌পালের' আয়ুষ্কাল, পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং তদীয় ভ্রাতৃ-তনয় ("দেবপাল")—রাজদণ্ড গ্রহণ করেন।

১ম।—"ধর্ম্মপাল" কি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন?

২য়।—তিনি হয় তো সন্তান-হীন ছিলেন; অথবা পিতার রাজত্বাবসানের অগ্রেই তৎ-সুত, স্বর্গগত হইয়া থাকিবেন।

১ম।—'দেবপালের' অনুজাত সহোদর ("জয়পাল") কি হেতু-বশতঃ রাজ্যাধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই? আর, 'রাজ্যপালের' হস্তেই বা কি কারণে রাজ্য গেল না?

২য়।—"বাক্‌পাল"-সম্বন্ধে যে সকল কথা ও যুক্তি, প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হইয়াছে—বর্ত্তমান এই দুই ক্ষেত্রেও তত্তৎ বচন-সমস্তই প্রয়োজ্য।

১ম।—জ্যেষ্ঠ-সত্বেও কিরূপে কনিষ্ঠে দায়াদাধিকার বর্ত্তে, তাহার দৃষ্টান্ত দিবে কে? অগ্রজ সহোদর (নারায়ণপাল) বিদ্যমান থাকিলেও, তদনুজ ভ্রাতা('মহীপাল') প্রথমে রাজ্যারূঢ় হইলেন কেন?

২য়।—ছলেই হউক—বা বল-বিক্রমেই হউক, অথবা কৌশল-ক্রমেই হউক, ক্ষমতা-শালী ও ক্রিয়া-কুশল, অভ্যুদয়-শীল কি পরাক্রান্ত, অথচ প্রবল-প্রতাপ, মহাবল "মহীপাল" রাজ্য-কার্য্য হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত রাজত্ব, তাঁহার পৈতৃক স্বত্ব সংযুক্ত না হইলেও, উল্লিখিত উপায়েই উহা, তাঁহার করতল-গত ও আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল।

১ম।—'মহীপাল' মহারাজের কোথায় বাসস্থান, বিদ্যমান ছিল, তুমি চেষ্টা দ্বারাও বলিয়া দিতে পারিবে না কি? তাঁহার খ্যাতনামা সভাসদের অসদ্ভাব ছিল কি?

২য়।—তিনি বারাণসী-নিবাসী। কবি "আর্য্য-ক্ষেমীশ্বর" তাঁহার সভাসদ্। 'চণ্ড-কৌশিক' নাটক, তাঁহার লেখনী-মুখ-বিনিঃসৃত।

১ম।—তবে কি "নারায়ণপাল" নৃপাল-কেও কাশী-বাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে?

২য়।—ঐ ক্ষিতিপতি, বঙ্গদেশাধিবাসী ও বঙ্গাধিরাজ।

১ম।—মহারাজ মহীপালের পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরার অধিবসতি কোথায়? তাঁহারাও কি বারাণসী-প্রদেশে অধিবাস-প্রয়াসের অভিলাষী হইয়া, তথায় বাস-স্থান-নির্ম্মাণ-কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন?

২য়।—নিঃসংশয়িত প্রমাণ বা তত্ত্ব-কথার অসদ্ভাব বশতঃ উহার উত্তর প্রদানে আমার সামর্থ্য নাই।

১ম।—নারায়ণপালের কোন অমাত্যের না কি অস্তিত্ব, ইতিবৃত্তে বর্ত্তমান আছে, এই কথা আমার শোনা আছে। তাঁহার নাম ও গোত্রের পরিচয়াদি, জ্ঞাত—কি অজ্ঞাত?

২য়।—"গুরব-মিশ্র।" তাঁহার অমাত্য। তিনি বারেন্দ্র-দ্বিজ-বংশে সমুৎপন্ন। "গুরব-মিশ্র" শাণ্ডিল্য-কুলে সঞ্জাত হইয়াছিলেন। কোথায় কোথায় ইঁহাদের কীর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী রহিয়াছে—জানিতে চাও? তবে শোন—

(ক) কাশী,

(খ) দিনাজপুর,

(গ) বুদ্ধগয়া—ইত্যাদি স্থানে।

"পাল"-রাজ-গণ, আপনাদিগকে 'গৌড়-রাজ' বলিয়া পরিচিত করিতে শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন। তথাপি কিন্তু সমগ্র বিহারদেশ ও বঙ্গের উত্তর-ভাগ-মাত্র, তাঁহাদের অধি-কার-ভুক্ত থাকিত। তবে সময়ে সময়ে অপরাপর প্রদেশাধীশ-সমূহকে তাঁহাদের বশ্যতায় স্বীকৃত হইতে হইত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

পরলোকতত্ত্ব

"বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে।"

রামপ্রসাদ।

আগ্‌নষ্টিক পণ্ডিত প্রেমিক বেনেট্ এক সময় বলিয়াছিলেন, "One world at a time is an excellent rule to go by."—অর্থাৎ যে জগতে যখন থাকা গিয়াছে, সেইখানকার কাজ সুচারুরূপে করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। মৃত্যুর পরে কি হইবে, কোথায় যাইব, তাহা ভাবিয়া এখন মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কথাটী শুনিতে বেশ, বলিতে ত আরও বেশ, কিন্তু ওরূপ উপদেশ মত চলিতে পারা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটা সম্ভব। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর অনেক জীবনের অবলম্বন। বিস্তর ভাল লোক, যাহারা ইহলোকে দুঃখে-কষ্টে দিন-যাপন করিতেছে, তাহাদের মনে যদি এরূপ আশা না থাকিত যে পরজন্মে বা পরলোকে সুখ পাইবে, তাহা হইলে উহাদের সাংসারিক কষ্ট সমূহ আরও কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক প্রকৃত নাস্তিক, যাহারা বুক ঠুকিয়া চার্ব্বাকের মত বলিতে পারে, "ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, জীবনের এই কয়টা দিনের পরসব শূন্য, সব অন্ধকার"—সংসারে পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ।* মুখে যে যাহাই

* অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম্ একদা ঠিক এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন;—"David Hume, the most subtle metaphysician

বলুক না কেন, ভিতরে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার ইচ্ছা বলবতী সকলেরই; মৃত্যুর পর আমি বিশ্বসংসার হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যাইব, ইহা ভাবিতে সকলেরই প্রাণ অল্প বিস্তর শিহরিয়া উঠে। এখন কথা এই যে, ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণান্তর কি ভাবে কোন্ অবস্থায় কোথায় থাকিব, পরলোকে থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইব, কি বারম্বার এখানে বা অন্য কোন গ্রহে জন্মগ্রহণ করিব, কি আর কোন প্রকার ব্যবস্থা আছে, ইহা সঠিক জানিতে বা বুঝিতে পারিবার শক্তি সাধারণ জীবের নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বেনেটের উপদেশ মত কয় জন চলিতেছে? যাহারা নিতান্ত মোহপাশবদ্ধ জীব, সংসারের কুহকে একেবারে আত্মহারা হইয়া কলুর বলদের মত দিনের পর দিন এই ভাবে যাপন করিতেছে, তাহাদেরও মনে চকিতের ন্যায় এ প্রশ্ন উত্থিত না হইয়া যায় না—মরিয়া লোকে কোথায় যায়? কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ের জীবন-সংগ্রামের দাপটে পড়িয়া, আজকার দিন কেমন করিয়া কাটিবে, এই দুশ্চিন্তাতে আমরা এমনই ব্যতিব্যস্ত যে, মৃত্যুর পর কোন্ অবস্থায় পড়িব, ইত্যাদি ভবিষ্যৎ ভাবনার অবকাশ নিতান্তই কম। যে দুই এক জন একটু আধটু চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও পরলোক সম্বন্ধে কোন পরিস্ফুট জ্ঞান নাই। খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির বাইবেল কোরাণাদি গ্রন্থানুযায়ী যেমন একটা বিশ্বাস আছে, আমাদের মধ্যে সেইরূপ দেখা যায় না। আমাদের আর আর সকল বিষয়ে যেমন নানা মুনির নানা মত, মৃত্যুর পরপারের অবস্থা সম্বন্ধেও তাই।

এখন দেখা যাউক, পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইহজীবনে আমাদের কোন কাজে লাগে কি না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত এইরূপ আইসে যে, উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে জাতীয় উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সামান্য কয়টা দিনের ভয় ভাবনা কখনই মানুষকে এত দৃঢ় করিতে সক্ষম হয় না, যাহাতে ধর্ম্মবীরের বল তাহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে। এ জন্য পারলৌকিক সম্বাদ সম্বন্ধে একটা পরিস্ফুট ভাব আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

মৃত্যুর পরপারের অবস্থা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কালে এদেশে কি মত প্রচলিত ছিল, জানা কঠিন; কিন্তু যে অবধি জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রচার চলিতেছে, অর্থাৎ দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছে, জন্মজন্মান্তরবাদ সর্ব্বসাধারণে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। আর্য্য ও বৌদ্ধ দর্শন গুলির উহা ভিত্ত, সুতরাং ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত বলিলে দোষ হয় না। মুসলমানদের আগমনে কোরাণী শিক্ষা দ্বারা কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটে নাই; বরং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণ মুসলমানী ধারণার বিরুদ্ধে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, মওলানা-মস্নবীরুম, যাঁহাকে মুসলমানগণ একজন উচ্চ

and one of the greatest historians and political economists of Great Britain, when dining once in a party (D'Alembert, Diderot, Helvetius, Condorcet, Buffon and other eminent persons) at the house of Baron d' Holbach expressed a doubt as to whether any person could anywhere be found to avow himself dogmatically an atheist.'' J. Fiske.

শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ও "কেরামতী বুজ্রুক" বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার কোন গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন —

হাফ্‌ত্‌ সাদ্‌ হাফ্‌তাদ্‌ কালিব্‌ দিদা আম্‌।
হাম্‌ চুঁ সাবজা বারাহা রো ইদা আম্‌॥ *

অর্থাৎ;—আমি ৭৭০ বার মানবদেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। তৎপূর্ব্বে বহুবার উদ্ভিদাদির অবস্থায় ছিলাম। নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত মুসলমানদের ত কথাই নাই, তাহারা ত প্রত্যহ তাহাদের হিন্দু প্রতিবেশীদিগের সহিত শতবার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া থাকে।

ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টানী মত বিশ্বাস দেশে পঁহুছিলেও সাধারণ লোকে তাহাতে বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই; রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত উহা অখণ্ডিত ভাবে প্রচলিত ছিল। যদিও আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উক্ত রাজাকে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারা যায় যে, এখনকার ব্রাহ্মদিগের সকল মতের সহিত তাঁহার মিল ছিল না। অনেকেই জানেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা বৈদান্তিক সভা ছিল। বেদান্ত দর্শনের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার রচিত সংগীত দ্বারা সুপ্রমাণিত,—

"ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়া না পায় স্থল।
অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না পায় যাঁহার।"

তারপর আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও এ কথা বলা সঙ্গত যে, তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন, তাহাও তাঁহার স্বরচিত গীত প্রমাণ করিতেছে;—

"পরনিন্দা, পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারম্বার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যন্ত্রণা।"

এই "যাতায়াত" স্থলে এখন "পাপাচার" শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফিস্‌ক্‌ তাঁহার "প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঈশ্বরে" গ্রন্থে ঠিকই বলিয়াছেন,—কতকটা মানুষের ন্যায় প্রকৃতি-সম্পন্ন পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে অবস্থিতি জন্য একটী অদৃশ্য জগতে বিশ্বাস, এবং ঐরূপ পরজগতের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ মানবজীবনের নৈতিক ব্যবস্থা স্বীকার,—এই তিনটী উপকরণ ব্যতীত কোন ধর্ম্ম গঠিত হয় না, ইহার একটীরও যে স্থলে অভাব, তথায় ধর্ম্মনাম অপ্রযুজ্য।* তিনি ইহাও বলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই বিশ্বের আদ্যন্ত সম্বন্ধীয় কতকগুলি কথা, কিয়ৎপরিমাণ দার্শনিক মতামত, এবং কিছু কিছু ক্রিয়া-কলাপ, অনুষ্ঠান, অনুজ্ঞাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। † আর্য্যধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হইলেও অধুনা যাহা ঐ নামে আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল স্বরূপ এক অভিনব সংস্করণ, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তৎপ্রচারিত পরলোক-

* রোমাণ অক্ষরে অনেকটা ঠিক লেখা যায়;—
Haft sad haftad, qualib dida am,
Ham chun sabza baraha ro ida am.

* (1) Belief in Deity as quasi-human; (2) Belief in an Unseen World in which human beings continue to exist after death; (3) Recognition of the ethical aspects of human life as related in a special and intimate sense to this Unseen World. If any of these three elements be taken away, the remnant cannot properly be called Religion—"Through Nature to God"—John Fiske.

† Every historic Religion has also contained a quantity of cosmological speculations, metaphysical doctrines, priestly rites, ceremonies and injunctions—Ibid.

বার্ত্তা অনেক শাস্ত্রীয় দলীলাদি দ্বারা সাব্যস্ত হইলেও উহাতে বিলক্ষণ খ্রীষ্টানী গন্ধ পাওয়া যায়, ইহা বহু লোকের মত। আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে খাড়া করিতে গেলে, পরলোক সম্বন্ধীয় কিছু জ্ঞান তাহার নিকট পাওয়া চাই। এ কারণ পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা পরলোক ও মুক্তি" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা উহা বিশদরূপে প্রচার করিয়াছেন। উপনিষদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা লোক-লোকান্তর ভ্রমণ করতঃ অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে;—যথা, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে,—

"স্বর্গ লোক হইতে উন্নত স্বর্গলোক লাভ করিয়া দেবাত্মা * তাহার সমধিক তেজস্বী চক্ষুবলে ও প্রখর বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যতররূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। সেই কৌশলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন পাইয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। সে দেবতা-দিগের সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল গীতে স্বর্গরাজ্য পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া তাহার বিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। যখন বিজ্ঞান উজ্জ্বল হইল, প্রেম বিস্তারিত হইল, মঙ্গল ভাবে হৃদয় আর্দ্র হইল, সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা আরম্ভ হইল। লোক-লোকান্তর পর্যটনে যতই তাহার জ্ঞান প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই সে ঈশ্বরের জ্ঞান ক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল। উন্নত-লোকেরও শেষ নাই, ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান ক্রিয়ারও অবধি নাই, বিজ্ঞা-নের বিস্তারেরও অন্ত নাই।"

যাঁহার মুখ হইতে এই সমুদয় কথা বাহির হইয়াছে, তিনি বহুকালের সাধন-ফলে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এ বিষয়ে কেহই ভিন্নমত হইবেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেরও এই মত ছিল। যদি বাস্তবিক মৃত্যুর পরপারের ব্যবস্থা এইরূপই হয়, মানুষকে আর ইহলোকের দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে না আসিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের কথা, সন্দেহ নাই। কাহার ইচ্ছা যে বার-ম্বার জন্ম মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করে? জন্মান্তরবাদী কেহ কেহ উক্ত মত প্রচার সম্বন্ধে এ প্রকার আপত্তি তুলিতে পারেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মাগণের কি ভুল ভ্রান্তি অসম্ভব? তাঁহারা এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ সত্য প্রচার হেতু আগমন করিয়া থাকেন; তাহার বাহিরে তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, তাহা সাধারণ জীবের কথার মত গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতা পণ্ডিতবর সীলি কর্ত্তৃক তাঁহার "প্রাকৃতিক ধর্ম্ম" গ্রন্থে প্রকাশিত।*

পরকাল সম্বন্ধে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও আধুনিক ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মত প্রায় একই প্রকার। এখন দেখা যাউক, জন্মের পূর্ব্বে-কার অবস্থার বিষয়ে ইঁহারা কে কি বলেন? ব্রাহ্মসমাজের নিকট ত এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমা-

* জীবাত্মার উন্নতাবস্থা।

* We recognise that there are seers gifted to trace the course of human destiny, who help us to understand 'what new scene in the drama of time is about to open. But we do not now believe that such seers are merely limited in their views, we think them capable of error and of great error. We even think that their intensity is closely connected with a certain waywardness, and that the very vividness with which they see some things, makes them blind to others, so that we are never surprised to find them as often more right, as at times more wrong than the rest of the world."—
Natural Religion—Sir J. R. Seeley, K. C. M. G. Litt. D.

দের ব্যক্ত অস্তিত্ব আদৌ ছিল না, কারণ জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ; আবার এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে সকলে ভাবরূপে ঈশ্বরে বিদ্যমান ছিলাম, এই পর্য্যন্ত। সংসারের তারতম্যের বিষয়ে বড় কিছু বলিতে চাহেন না। মুসলমান বেশী কচ্‌কচিতে না গিয়া মানবাত্মার এই প্রথম আবির্ভাব স্বীকার করতঃ নিশ্চিন্ত; তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, পৃথিবীতে পাঠাইবার সময় আমাদের প্রত্যেকের গলায় এক একটা 'কিশ্‌মতের' পুঁটুলি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও প্রকারের পুঁটুলি কেন বিতরিত হইল, সে সম্বন্ধে "খোদার মর্‌জী" বলিয়াই ক্ষান্ত।* খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণের কথা এই যে, আমরা এই প্রথম সৃষ্ট সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহ, যাহার সদসদ্ব্যবহারানুযায়ী জীবনের সমস্ত ফলাফল। বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন, পশ্চাতে দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই, সম্মুখে নজর রাখাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, আমাদের চক্ষু দুইটী কেবলমাত্র সম্মুখে দেখিবার উপযোগী করিয়াই স্থাপিত, পশ্চাদ্ভাগে নেত্র প্রদান করা হয় নাই; এই বলিয়া মনকে বুঝানই উচিত। বিবর্ত্তন ও জন্মান্তরবাদ মানিলে জন্মের পূর্ব্ব দিক্‌টা ও সংসারের ইতর বিশেষতার সুন্দর মীমাংসা হয়।

প্রকৃত তথ্য যেরূপই হউক না কেন, প্রাচীন আর্য্যগণ যে মর্ত্ত্যের এই কয়টা দিনকে মানব জীবন বলিতেন না, (ইহার আগেও অনেকবার এবং পরেও অনেকবার সকলকেই আসিতে হইয়াছে ও হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল) তাহার পোষকতার একটা কথা আমাদের মতে বিশেষ বিবেচনা-যোগ্য। তাঁহাদের রচিত কত শ্রেণীর গ্রন্থাদি দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য ধরণের জীবন-চরিত কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কল্পান্তস্থায়ী বহুজন-ব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনকেই তাঁহারা জীবন বলিতেন; একবারকার জন্ম মৃত্যুর ব্যবধান-কালকে জীবন আখ্যা দিতেন না, জীবনের একটা পরিচ্ছদ স্বরূপ দেখিতেন।

যাহা হউক, আজকাল নব্যভারতে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দুই পণ্ডিতে যে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ ধাঁদা লাগিবার কথা,—"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা,—মূর্খে লাগে ধন্দ।" শাস্ত্রাদি হইতে গৌরবাবু দেখাইতেছেন, এখানে আবার আসিতে হইবে না; কোকিলেশ্বর বাবুও শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ সহ বলিতেছেন, কেন ফিরিয়া আসিতে হইবে না? এখন আমাদের মুস্কিল। গৌরবাবু ধর্ম্মরাজ্যের একজন পুরাতন শিক্ষক, ব্রাহ্মসমাজের নববিধান শাখার উপাধ্যায়; ও দিকে কোকিলেশ্বর বাবুও কম নন, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম, এ, উপাধিধারী আর্য্য শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত। আমাদের উভয় সঙ্কট; আমরা

* Re-incarnation solves, as does no other theory of human existence, the problems of inequality of circumstances, of capacity, of opportunity, which otherwise remain as evidence that justice is not a factor in life, but that men are the mere sport of the favouritism of an irresponsible Creator or of the blind forces of a soulless Nature.

Re-incarnation—Annie Besant.

কাহার কথায় সায় দিই? বিষয় যেরূপ গুরুতর, একটা যেমন তেমন সায় দিলেও ত চলে না। ইহা লইয়া জীবের সর্ব্বস্ব বলিলেও দোষ হয় না। দুঃখী, ধনী, মূর্খ, জ্ঞানী, সাধু, অসাধু সকলেরই এ বিষয়ে সমান স্বার্থ।

পাঠকবর্গ দুই পক্ষ শুনিয়াছেন,—ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে গৌরবাবু, হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়। আর এক তৃতীয় পক্ষের কথা আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। যাঁহারা থিয়সফিষ্টদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উঁহারাও জন্মান্তরবাদী। প্রাচীন আর্য্য ও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত অন্যান্য দেশের মত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করিয়া থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় যে সকল গ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত কথাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর সংস্থাপিত। শুধু তাহা নয়, তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অনেক সত্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ কথাও প্রচারিত। তাঁহারা বলেন যে, পরলোকাদি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা তাঁহাদের পক্ষে * জড়জগতের ঘর-দুয়ারের জ্ঞানের ন্যায়। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের কথা নিতান্ত ছুড়িয়া ফেলিবার যোগ্য নহে।

থিয়সফিষ্টদিগের মতে জীবাত্মা বা "ইগো" মৃত্যুর পর লোকলোকান্তর ভ্রমণান্তে পুনরায় ইহলোকে আসিয়া থাকে। এক জন্মের পর আর এক জন্ম হইতে হাজার দেড় হাজার বৎসর লাগে।*

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি সম্বন্ধে থিয়সফিষ্টগণ বলেন যে, ওরূপ স্মৃতিলোপ আমাদের মঙ্গল হেতু। একজনের স্মৃতি লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার উপর ঐ সকল জন্মের বৃত্তান্ত সমূহ স্মৃতিপথে আসিলে পাগল হইবার কথা। বিশেষ স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, সে সকল মস্তিষ্ক যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, তখন সাধারণ জীবের পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা মনে পড়া অসম্ভব। তবে যিনি যোগবলে উন্নত, তিনি "ইগোর" নিকট সংবাদ সংগ্রহ করতঃ তাহাকে বর্ত্তমান মস্তিষ্কের বিষয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।†

* It cannot too often be repeated that in this teaching as to the immortality of the soul and the life after death, Theosophy stands in a position totally different from ordinary religion. It does not put forward these great truths merely on the authority of some sacred books of long ago; in speaking of these subjects it is not dealing with pious opinions, or metaphysical speculations, but with solid definite facts, as real and as close to us as the air we breathe or the houses we live in—facts of which many among us have constant experience—facts among which lies the daily work of some of our students, as will presently be seen.—

Invisible Helpers—C. W, Leadbeater.

* "At length the causes that carried the Ego into Devachan (দেবস্থান বা স্বর্গলোক) are exhausted, the experiences, gathered have been wholly assimilated and the soul begins to feell again th thirst for sentient material life that can be gratified only on the physical plane. * * * The average time Devachan is from ten to fifteen centuries (this cycle is one most plainly marked in history). The Ego is then ready to return, and he brings back with him his now increased experience, any further gains he may have made in Devachan along the lines of abstract thought."

Death and After—Annie Besant.

† There are some living persons, as well as some not at present in earth-life, who remember their own past incarnations, and can recall their incidents as they recall those of their present lives. Memory—which is the link between the varying stages of experience of the conscious being, and which carries with it the sense of individuality and of personality alike—stretches for them through the gateways of past births and deaths,

থিয়সফিষ্টগণ যেরূপ সতেজে অদৃশ্য পরলোকের বৃত্তান্ত সমূহ প্রচার করিতেছেন; এবং মানবদেহের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মৃত্যুর পরপারের অনেক প্রকার সংবাদ উপস্থিত করা হইল; এখন বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকদিগের হস্তে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ভাষাতত্ত্ব। *

বাঙ্গালাসরস্বতীর দশা ফিরিয়াছে। এবার বাঙ্গালায় ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থও প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালাভাষার ব্যুৎপত্তি ইহার পূর্ব্বেও দুই একখানা বাঙ্গালাগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এক আধটুকু আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র। রীতিমত গ্রন্থ এই প্রথম। এ গৌরব শ্রীনাথ বাবুরই বটে।

এক বস্তু ছাড়া আর সবই পরিণামশীল। ভাষাও তাই। ইউরোপে এক লাটিনভাষাই কালে চারি পাঁচটা বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও আদিম আর্য্যভাষা বিকৃত হইয়াই পালি মাহারাষ্ট্রী † শৌরসেনী প্রভৃতি কত প্রাকৃতভাষা জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ রোমান্স্‌ভাষা ও প্রাকৃতের আবির্ভাবে সাদৃশ্য আছে। দুয়েতেই মূলভাষার বর্ণধ্বনি বিকৃত হইয়াছে, অনেক বিভক্তির রূপান্তর বা লোপ ঘটিয়াছে, লিঙ্গ এবং বচনের কড়াক্কড় নিয়ম শিথিল হইয়াছে। দুয়েতেই মূলভাষার বহির্ভূত অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতে যে সকল শব্দ এইরূপ অসংস্কৃতমূলক, তাহাদের নাম দেশী। প্রাকৃতের এই দেশী শব্দগুলি তখনকার প্রচলিত কোন না কোনও অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। অনার্য্য শব্দ ছাড়া কচিৎ অনার্য্য প্রত্যয়ও প্রাকৃতভাষায় ঢুকিয়াছে কি না, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। অন্ততঃ অতিপ্রাচীন প্রাকৃতে ঢুকে নাই বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, সংস্কৃত আর প্রাকৃতে প্রভেদ এইরূপ। কিন্তু এ প্রভেদসত্ত্বেও ভাষার যাহা কঙ্কাল, তাহা দুয়েতেই এক আছে। তবে প্রাকৃতে সে কঙ্কালটা কোথাও কিঞ্চিৎ স্খলিত, কোথাও কিঞ্চিৎ গলিত, সর্ব্বত্র একটু

and the nights of death no more break the chain of memory than the nights break it which separate the days of our ordinary life. Occurrences of their past lives are as real experiences of their living selves as though they had happened a few years agone, and to tell them that they did not have these experiences is a view to them as foolish as if you persisted that the events they passed through ten years ago happened to somebody else, add not to their same selves. They would not debate the question with you, but would just shrug their shoulders and drop the subject, for you cannot argue a man's own experience out of his consciousness. Re-incarnation—Annie Besant.

আর এক স্থানে বেসান্ত বলিয়াছেন, তাঁহার নিজের পূর্ব্ব কথা কতক কতক স্মরণ আছে।

I have met various persons of honour and probity, who remember some of their past lives, and I myself remember fragments of my own past.—Theosophy in Questions and answers.

এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বেসান্তের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সরল তথ্যানুসন্ধায়ী জীব সংসারে অতি বিরল; গভীর পাণ্ডিত্যের কথা থাকুক।

* ভাষাতত্ত্ব। প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা। মূল্য ১৲টাকা।

† সংস্কৃতনাটকের অধমোক্তিগুলি এই মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতে রচিত।

বিবর্ণ হইয়াছে মাত্র। চেহারা ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু জিনিসটা তবু চেনা যায়। এই অর্থে এবং কেবল এই অর্থেই শ্রীনাথ বাবুর উক্তি সত্য যে, "প্রাকৃত ভিন্ন ভাষা নহে"।* নহিলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত যে অত্যন্ত অভিন্ন নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ পরিণামের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই। অথবা এ ইতিহাসের সমাপ্তি নাই। সকল ভাষাই লোকমুখে বিকৃত হইতে থাকে। পালি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃতও যুগে যুগে অধিকতর বিকৃত হইতেছিল। অশোকের শিলাশাসনাবলীর ভাষা এই ভ্রষ্ট প্রাকৃত। উত্তরকালে প্রাচীন প্রাকৃতভাষার বৈয়াকরণেরা এই সকল অর্ব্বাচীন অতিবিকৃত প্রাকৃতকে অপভ্রংশনামেই লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত-ব্যাকরণসঙ্কলনের পর হইতে সাহিত্যগত প্রাকৃতভাষার পরিণাম স্থগিত হইল বটে, কিন্তু অপভ্রংশগুলি ব্যাকরণের শাসন মানিল না—কোথাও মানেনা। সেগুলি কালস্রোতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চলিল। শব্দবিদ্যাবিশারদ মোক্ষমূলরের মত এই, ইহাদেরই অন্তিম বিকারে হিন্দী মরাঠী বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু দুহিতা কেন, বাঙ্গালা তার দৌহিত্রীও না। অসংখ্য অবিকৃত সংস্কৃতশব্দ আছে বলিয়াই বাঙ্গালাকে সরাসর সংস্কৃতের দুহিতা বলা যায় না। কিরূপে এই সকল খাঁটি সংস্কৃতশব্দ বঙ্গদেশের ভাষায় পুনঃপ্রবেশ লাভ করিয়াছিল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তার একটা অনুমান আছে।

বাঙ্গালাপ্রভৃতি আধুনিক ভাষার এই অপভ্রংশমূলকতাবাদ শ্রীনাথ বাবুকেও মানিতে হইবে। শ্রীনাথ বাবু বুঝাইয়াছেন যে, করিতেছে করিয়াছে প্রভৃতি বাঙ্গালা পদ কর্ত্তুমস্তি কৃত্বাহস্তি প্রভৃতি সংস্কৃতবাক্যেরই ধ্বনিবিকার মাত্র।* কিন্তু তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, ঐ ঐ অর্থে সংস্কৃতে কর্ত্তুমস্তি কৃত্বাহস্তি এইরূপ প্রয়োগ হয় না। স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, করিতেছে করিয়াছে—এ সকল "রীতিব্যতিক্রম"। এমন রীতিব্যতিক্রম বাঙ্গালায় আরও অনেক আছে। কিন্তু এ ব্যতিক্রমই বা কোথা হইতে আসিল? এ বাঙ্গালা রীতি সংস্কৃতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সংস্কৃতের যদি কেহ দুহিতা থাকে তো সে পালি, সে মাহারাষ্ট্রী, সে শৌরসেনী, সে মাগধী। এ রীতি সে সকলেরও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? এইরূপে অগত্যা বাঙ্গালাভাষার অপভ্রংশমূলকতা স্বীকার করিতে হয়। সংস্কৃত হইতে সরাসর বাঙ্গালার আবির্ভাব হয় নাই। পালি মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃত—মোক্ষমূলরের grammatical প্রাকৃত—তাহা হইতেও না। প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যুৎপত্তি বুঝান যায় না। বাঙ্গালাভাষার ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে হইলে আর এক সিঁড়ী নীচে হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সে সিঁড়ী ঐ অপভ্রংশ—মোক্ষমূলরের ungrammatical প্রাকৃত। †

* আমি প্রাকৃতশব্দে এ প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই মাহারাষ্ট্রীপ্রভৃতি বুঝিয়াছি। শ্রীনাথ বাবু প্রাকৃত বলিলে বাঙ্গালাও বুঝেন। কিন্তু বাঙ্গালা বয়সে এ সকলেরই কনিষ্ঠা। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার প্রভেদও গুরুতর।

* এ ব্যুৎপত্তি ঠিক কি না, পরে বিচার করিব।

† Max Muller's Science of Language, Ed. 1891, Vol. I, p. 181.

অপভ্রংশেরও পরম্পরা চলিয়াছিল, বুঝা যায়। কিন্তু কোন্ অপভ্রংশ হইতে কখন বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সন্ধিক্ষণ ধরিবার উপায় নাই। অশোকের শিলা শাসন এবং অপর কয়েকটা শিলালিপি ছাড়া অপভ্রংশে আর কোনও রচনা বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু সে অতিপ্রাচীন রচনা। তাহা হইতে বাঙ্গালার প্রভেদ অনেক। এইখানেই ইতিহাসের শৃঙ্খলা ছিন্ন হইয়াছে। অবরোহিপ্রণালীতে বাঙ্গালার সকল খুঁটিনাটির ব্যুৎপত্তি বুঝান অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালাপ্রভৃতি আধুনিক ভাষার অপভ্রংশ-মূলকতাবাদ অশ্রদ্ধেয় নহে। প্রত্যক্ষে যাহা দেখি না, অনুমানে তাহা বুঝিতে পারি। অনুমানেই করিতেছে করিয়াছে প্রভৃতি বাঙ্গালা পদকে অপভ্রংশমূলক বলিয়া বুঝিতেছি। তবে এ অনুমান সম্ভবানুমান * বটে। কিন্তু সম্ভবানুমানও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভাষাতত্ত্বে সে প্রমাণ অপরিহার্য্য।

এ সকল বিচারের আর একটা প্রণালী আছে। সে আরোহিপ্রণালী। ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। ভাষার প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর অবস্থা ধরিতে ধরিতে মূলের অনেকটা কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালায় সে পথও বেশী খোলা নয়। কেন না, বড় জোর হাজার বৎসরের অধিক বয়সের কোনও বাঙ্গালাগ্রন্থ আজপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবু এ আরোহিপথে যতটুকু উঠিতে পারি, ততটুকুতেই লাভ আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাঙ্গালার পঞ্চমীর বিভক্তি 'হইতে' কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃতে পঞ্চমীবহুবচনের বিভক্তি —ভ্যস্। প্রাকৃতে ইহার স্থানে 'হিংতো' এবং 'সুংতো' হয়। আর্ষপ্রাকৃত ও অর্দ্ধ-মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয়। যেমন দেবাহিংতো (দেবাৎ), তুমা-হিংতো (ত্বৎ)। প্রাকৃত ব্যাকরণকার হেম-চন্দ্রের বর্ণিত অপভ্রংশে পঞ্চমীর বিভক্তি— 'হোংতও' এবং 'হোংতউ'। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চাঁদ বর্দ্দাইএর প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে আছে—

> কেতীক দূর অজমের হুংত।

অপভ্রংশের 'হোংতও' এবং প্রাচীন হিন্দীর এই 'হুংত' যে প্রাকৃত 'হিংতো'রই ক্রমিক পরিণামমাত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই। বীম্‌স্ এবং হর্ণলের মতে, বাঙ্গালার 'হইতে' বিভক্তিও এই হিংতো হইতেই আসিয়াছে। 'হিংতো'র বিকারে হিংতে—হংতে—এইরূপ ক্রমে অনুনাসিকলোপে 'হতে' বা 'হইতে' উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। অনুনাসিকলোপের দৃষ্টান্ত হিন্দীতেও আছে। যেমন তুলসীদাসে—

> আদিহিতে সব কথা সুনাই।

এ ব্যুৎপত্তি বেশ মনে লাগে বটে, কিন্তু তবু যেন একটু খট্‌কা থাকিয়া যায়। যেটুকু ছিল, দীনেশ বাবু সেটুকু দূর করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন, এই ব্যাখ্যাই ঠিক্ ব্যাখ্যা। আলোয়ালের পদ্মাবতীতে আছে—

> কারে কব নির্ম্মলী কাহাকে বলি আর।
> হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয়ে পুনি হাড়॥

প্রাচীন বাঙ্গালায় পঞ্চমীবিভক্তির আর একটা রূপ ছিল—'হনে'। যেমন সঞ্জয়ের মহাভারতের—

> তাকে দেখি মোহ পাইল না দেখিল পুনি
> সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি।

এখন দেখিতেছি, প্রাচীন বাঙ্গালায় হন্তে

* Probability.

বা হনে, অপভ্রংশের হোন্তও এবং প্রাকৃতের হিংতো একই শৃঙ্খলার তিন গ্রন্থি। 'হন্তে' হইতে ঁ 'হতে'র উৎপত্তি অনায়াসেই বুঝা যায়। এরূপ অনুনাসিকলোপের দৃষ্টান্ত হিন্দীতেও আছে, দেখিয়াছি। অতএব বাঙ্গালার 'হতে' বা 'হইতে'* বিভক্তি প্রাকৃতের 'হিংতো' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে, এমত বলিলে জোলম্ করা হয় না।

কিন্তু প্রাকৃতের 'হিংতো কোথা হইতে আসিল? হর্ণলে বলেন, সম্ভবতঃ 'হওন্ত' অর্থাৎ'ভবন্ত' হইতে। শ্রীনাথ বাবু 'হিংতো' 'সুংতো'র ধার ধারেন নাই, একেবারে খাঁটি সংস্কৃত 'ভবতঃ' শব্দ হইতেই 'হইতে' বিভক্তির ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বীম্‌সের মতেও 'হইতে' বিভক্তির মূল ভূধাতু।† পঞ্চমীর স্থানে ভূধাতুর রূপ কিরূপে বসিতে পারে, বীম্‌স্ ও হর্ণলে তাহা যেমন বুঝায়াছেন, শ্রীনাথ বাবুও প্রায় তেমনই বুঝাইয়াছেন। শ্রীনাথ বাবু বলেন, " "হইতে" শব্দের অর্থ উৎপন্ন হইয়া (Springing from) অর্থাৎ কার্য্যটা এক স্থানে উৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানে সমাপ্ত হইল। .... গ্রাম হইতে বলিলে গ্রামে উৎপন্ন হইয়া বুঝায়।" কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিই না। মৌখিক ভাষায় পঞ্চমীর একটা বিভক্তি—থেকে। যেমন, পটলডাঙ্গা থেকে কালীঘাট যাচ্ছে। থেকে=থাকিয়া =বোধ হয়, স্থিত্বা *। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোনও স্থানে এই 'থেকে'র বদলে 'থিয়া' বলে। থিয়া=স্থিত্বা। পটলডাঙ্গা থেকে= পটলডাঙ্গায় থাকিয়া। অর্থাৎ পূর্ব্বে পটলডাঙ্গায় ছিল, পরে কালীঘাট যাইতেছে। এই প্রকারে ভূধাতুর রূপেও পঞ্চমীর অর্থ কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইতে পারে, অস্বীকার করি না। কিন্তু তসিল্‌প্রত্যয়ান্ত খাঁটি সংস্কৃত 'ভবতঃ' শব্দ হইতেই বাঙ্গালা 'হইতে' বিভক্তি আসিয়াছে, শ্রীনাথ বাবু এমন হুবহু তত্ত্বটা কোথায় পাইলেন? 'গ্রামাৎ' বুঝাইতে যদি সংস্কৃতে 'গ্রামভবতঃ' এইরূপ পদের প্রয়োগ হইত, তবে বলিতে পারিতাম, পঞ্চমীর অর্থ বুঝাইতে ভূধাতুর প্রয়োগ সংস্কৃতেই হইয়া থাকে। তবে বলিতে পারিতাম বটে যে, বাঙ্গালা 'হইতে' বিভক্তি সংস্কৃত 'ভবতঃ' হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু পঞ্চমীর অর্থ বুঝাইতে সংস্কৃতভাষায় ভূধাতুর প্রয়োগ হয় না। হইতে পারে না, নাই বা বলিলাম; কিন্তু, হয় না। তাহাই যথেষ্ট। এরূপ প্রয়োগ অসংস্কৃত। বাঙ্গালার 'হইতে' বিভক্তি সংস্কৃতভাষামূলক নহে। তবে প্রাকৃতের হিংতো বিভক্তিতে যদি সত্যই ভূধাতু প্রচ্ছন্ন থাকে, তা হইলে তাহা প্রাকৃতেই প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল—সংস্কৃতের পঞ্চমী হইতে আসে

---

* 'হইতে'র ইকারটা ভূধাতুনিষ্পন্ন 'হইতে' পদের দেখাদেখি ঢুকিয়া থাকিবে। কিন্তু সে ইকারটাও আন্দাজিক।

† বীম্‌স্ হিন্দী হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—বনারস্ হোকে আয়া হুঁ। দৃষ্টান্তটা ভাল হয় নাই। সেরূপ আমরাও বলি, কাশী হ'য়ে এসেছি। কাশী হইয়া আসিয়াছি আর কাশী হইতে আসিয়াছি, এ দুয়েতে প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার পঞ্চমীবিভক্তি 'হইয়া' নহে, 'হইতে'। আর 'হ' দেখিলেই স্থানে অস্থানে ভূধাতুটাকে লইয়া টানাটানি করা উচিত হয় না। বীম্‌স্‌ই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। Beames's Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. II (1875), p. 226.

* ঠিক প্রতীঘাতে। স্থাদিঃ। হিন্দীতে থক্‌না ধাতুর অর্থও প্রতীঘাত।

নাই। কিন্তু হিংতো যে 'হওন্ত' হইতেই জন্মিয়াছে, কোনও প্রাকৃতরচনা হইতে হর্ণলে তার বিনিগমক দেখাইতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ 'হিংতো'র ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে বিখ্যাত জর্ম্মান্ পণ্ডিত লাসেনের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সে মত এই। প্রাকৃতে তৃতীয়াবহুবচনের বিভক্তি—হিং। ইহারই উত্তর তসিল্ প্রত্যয়ের প্রাকৃতরূপ 'তো' যুক্ত হইয়া হিংতো বিভক্তি জন্মিয়াছিল। এ মতের অনুকূলে একটা কথা বলিতে পারি। প্রাকৃতভাষাগুলির মধ্যে পালিই সর্ব্বপ্রাচীন। সেই পালিতে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ এক। যথা, পুরিসেহি (পুরুষৈঃ বা পুরুষেভ্যঃ)। তৃতীয়া হইতে পঞ্চমীর ভেদ পরিস্ফুট করিবার জন্য কালে ঐ 'হি'র পরে পঞ্চম্যর্থবোধক একটা অতিরিক্ত 'তো' প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। লাসেনের মতই সমীচীন।

বাঙ্গালায় আর দুইটা কঠিন বিভক্তি আছে। এক প্রথমা, আর এক ষষ্ঠী। প্রথমার একবচনের ব্যুৎপত্তি তেমন দুরূহ নয়। তবে "সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে ... ... কোন প্রভেদ নাই"—শ্রীনাথ বাবুর এ উক্তিটী মিথ্যা। প্রাকৃতে প্রাকৃত বুঝিলেও মিথ্যা, শ্রীনাথ বাবুর মত বাঙ্গালা বুঝিলেও মিথ্যা। অনুস্বারবিসর্গের লোপ নাই ধরিলাম, তবু প্রভেদ আছে। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বুত্তন্ত' না হইয়া 'বুত্তন্তো' হয়, 'রবি' না হইয়া 'রবী' হয়, 'বন্ধু' না হইয়া 'বন্ধূ' হয়। মৃচ্ছকটিকে শকারাদির এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে মৎস্যজীবী ও রক্ষিদ্বয়ের উক্তিতে যে প্রাকৃত দেখিতে পাই, তার নাম মাগধী। মাগধীতে প্রথমার একবচনে পুংনপুংসক উভয়লিঙ্গেই অকারান্ত শব্দ একারান্ত হয়। যেমন—

বুত্তন্তে = বৃত্তান্তঃ
মাণুশে = মানুষঃ
মংশে = মাংসম্
শাকে = শাকম্।

সর্ব্বনামশব্দেও এইরূপ। যথা—

জে = যঃ
শে = সঃ
অবলে = অপরঃ।

অর্দ্ধমাগধীতে প্রথমার এই একারান্ত রূপ বৈকল্পিক। যথা, দেবে বা দেবো। আর্ষপ্রাকৃতে প্রথমার একবচনে অকারান্ত পুংলিঙ্গশব্দের তিন রূপই হয়। যথা দেবে, দেবো, বা দেব। * এই তৃতীয় রূপটা প্রণিধানযোগ্য। বাঙ্গালায় প্রথমার একবচনের কোনও বিভক্তি নাই। এই বিভক্তিশূন্য রূপ প্রাকৃতেই আরম্ভ হইয়াছিল, দেখিতে পাই। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে ঐ একারান্ত প্রথমারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দীনেশ বাবু তার দুইটামাত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহারই উদ্ধৃত কবিতারাশি হইতে আমরা আর কয়েকটা সঙ্কলিত করিতেছি—

মধ্যাহ্নে যবে সমাধে স্নান।
... ...
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও।
... ...
বিধিএ নির্ম্মল তাক কি কহিব অতি।
... ...
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
... ...
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল ধরি।

বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গশব্দেও এই 'এ' বিভক্তি যোজিত হইয়াছিল। যথা—

* চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ, ২।১০।

সুদেক্ষাএ বোলেন্ত শুনহ নর নারী।

সেইখানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর।

প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গশব্দের পরে তৃতীয়ার একবচনের একারাদেশ হয়। যথ মালাএ (মালয়া), বুড্টীএ (বৃদ্ধ্যা), ণঈএ (নদ্যা), ধেণূএ (ধেন্বা), বহূএ (বধ্বা)। উপরিধৃত কবিতাগুলির মধ্যে আকারান্ত, ইবর্ণান্ত, এবং উবর্ণান্ত শব্দের পরে যে 'এ' বিভক্তি দেখিতেছি, তাহা এই তৃতীয়ার 'এ'ও হইতে পারে। অপভ্রংশে লিঙ্গভেদ এবং উক্তানুক্ত কর্ত্তার ভেদ উঠিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। যদি তাই হয়, তবে বাঙ্গালায় ইহাকেও প্রথমাবিভক্তি বলিতে পারি। কালে 'এ'র স্থানে 'তে'ও বসিয়াছে। যেমন বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে—

মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

... ...

বিজয় গুপ্তেতে কয়,

এরূপ উচিত নয়।

হয়ত প্রথমার 'এ'কেও সপ্তমীর 'এ' বলিয়া লোকের ভ্রম হইয়াছিল, তাই সপ্তমীর 'তে'ও প্রথমায় বসিয়াছে। যাহা হউক, প্রথমার একবচনের * এই একারান্ত রূপ এখনও সুপ্রচলিত। এ, তে—দুইই আছে। আমরা এখনও বলি, কুকুরে মাংস খায়, গোরুতে ঘাস খায়। শ্রীনাথ বাবুও লিখিয়াছেন, "সকলেই যখন সংস্কৃত জানিবে," "কবির কথা বুঝিতে পারে"। কিন্তু তাঁর ভাষাতত্ত্বে বিভক্তিটার নামও নাই কেন? শ্রীনাথ বাবুর গ্রন্থ অসম্পূর্ণ।

এ গেল একবচন। প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি—'রা'। যেমন রামেরা, মুনিরা, তোমরা, আমরা। 'রা' কোথা হইতে আসিল? শ্রীনাথ বাবু তাহা এইরূপ বুঝাইয়াছেন। অকারান্ত এবং আকারান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমাবহুবচনের বিভক্তিযুক্ত হইলে, 'আঃ' এই বর্ণে তাহাদের অবসান হয়। যথা রামাঃ, বিশ্বপাঃ, বিদ্যাঃ। কিন্তু রামাঃ = রামার্। ইহা হইতেই স্বরবিপর্য্যয়ে 'রামরা' বা 'রামেরা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু 'মুনিরা', 'সাধুরা', 'সখীরা', 'বধূরা' বলি কেন?—এ সকলে তো গোড়ায় 'আঃ' ছিল না। শ্রীনাথ বাবু বলেন, "অজ্ঞতা হেতু তাহা আমরা কখন কখন করিয়া থাকি"। পূর্ব্বপক্ষ চূর্ণ হইয়া গেল। তার পরেই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তও বলিতে পার, হিতোপদেশও বলিতে পার। "এই "রা" চিহ্ন কেবল রাম, বিশ্বপা এবং বিদ্যা শব্দের ন্যায় শব্দেই ব্যবহার্য্য, অন্য শব্দে নহে। অন্য শব্দে আদি, গণ, প্রভৃতি শব্দ যোগ না করিয়া "রা" চিহ্ন ব্যবহার করিলে ব্যাকরণ দোষ হয়।" কিন্তু 'মুনিরা,' 'সাধুরা,' 'সখীরা,' 'বধূরা' যদি অব্যবহার্য্য হয়, তবে 'তোমরা' 'আমরা'ও সুতরাং অব্যবহার্য্য হওয়া উচিত। কেন না, 'তোমরা' 'আমরা'র মূলে বিসর্গের গন্ধও ছিল না। 'তোম্' শব্দের পরে জস্‌বিভক্তি লাগাইলেও 'অঃ' পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, 'আঃ' জুটে না। অধিকন্তু, সংস্কৃতের আশা ছাড়িতে হয়। তবে শ্রীনাথ বাবু 'তোমরা'

* বীম্‌সের মতে এই একার বহুবচন। প্রমাণস্থলে তিনি দুইটা উড়িয়া কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বে আমরা ইহাকে একবচনই বলিতে বাধ্য, কেন না মূলে ইহা একবচনমাত্র। তবে কখন কখনও ইহাতে জাতি বা বহুত্বও বুঝায় বটে। সেরূপ হইতে বাধা নাই। স্থলবিশেষে একবচনেও বহুবচনের কাজ হয়। 'ব্রাহ্মণ পূজ্য' বলিলে 'ব্রাহ্মণেরা পূজ্য' এইরূপই বুঝায়।

'আমরা' মঞ্জুর করিলেন কেন? ভাষাতত্ত্বে ইহার উত্তর নাই, বোধ হয় বলা বাহুল্য।

আসল কথা, বাঙ্গালাকে "কথিতাকারে লিখিত সংস্কৃতভাষা" করিতে গিয়া শ্রীনাথ বাবু ক্রমাগত বিপদে পাড়তেছিলেন। 'মুনয়ঃ' বা 'সখ্যঃ' হইতে 'মুনিরা' বা সখীরা' বাহির করা শ্রীনাথ বাবুর পক্ষেও কিঞ্চিৎ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে পথ হউক, একটা পথ বাঙ্গালীকে খুলিয়া দিতে হইবে। শ্রীনাথ বাবুও গণ আদি প্রভৃতি শব্দ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। 'তোমরা' 'আমরা' র বেলায় আর তা পারেন নাই। 'তোমরা' 'আমরা' উঠাইয়া দিয়া 'তোমাগণ' 'আমাগণ' বা 'তোমাদি' 'আমাদি'র ব্যবস্থা করিতে শ্রীনাথ বাবুর বুদ্ধিও কুণ্ঠিতা হইয়াছিল। আর এক কথা। শ্রীনাথ বাবুর অমন খাসা সিদ্ধান্তেও একটু গলদ্ আছে। আবার হিসাব করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বিশ্বপ্‌রা বিষ্ণ্‌রা এই সমস্ত লোমহর্ষণ পদের সৃষ্টি হয়। 'রামেরা'র মত করিলেও বিশ্বপেরা বিষ্ণেরা হইয়া পড়ে! অতএব আর এক একটা আকার জমা না দিলে আর 'বিশ্বপারা 'বিষ্ণারা হইয়া উঠে না। ভাষাতত্ত্বে রা-তত্ত্বের দশা এইরূপ।

ঠিক্ বলিতে পারি না, সংস্কৃতপ্রীতি কিছু কমাইতে পারিলে হয়ত শ্রীনাথ বাবু বলিতেন, অকারান্ত শব্দের পরেই সম্ভবতঃ এই 'রা' বিভক্তি প্রথম জন্মিয়াছিল, কালে আকারান্ত ইকারান্ত প্রভৃতির পরেও বসিয়াছে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু রামরা বা রামেরা যে পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই উৎপন্ন হইয়াছিল, আগে তার প্রমাণ চাই। শ্রীনাথ বাবু সে প্রমাণ দিতে পারেন নাই। শ্রীনাথ বাবু বলেন, "রাম শব্দের বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে রামাঃ হয়। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রাকৃতে যে কারণে "র" হয় তাহা ১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে "র" উচ্চারণ করা হয়।" ১১ পৃঃ তিনি বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষায় 'স' স্থানে (ঃ), (ঃ) স্থানে 'র', 'র' স্থানে (ঃ) হয়। অর্থাৎ 'স', 'র,' ঃ একই জাতীয় বর্ণ। যথা, প্রাতর্ = প্রাতঃ, বহির্ = বহিঃ, পুনর্ = পুনঃ, নমস্ = নমঃ।" সংস্কৃতে বিরামে পদান্ত রকারের স্থানে বিসর্গ হয়, একথা সত্য বটে। বিরামে পদান্ত সকারের স্থানেও বিসর্গ হয়, ইহাও সত্য। কিন্তু বিরামে বিসর্গের স্থানে রকার হয়, এ কথাটা সত্য নহে। শ্রীনাথ বাবুও এত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। আর স,র, বিসর্গ একজাতীয় বর্ণ, এ কথাও মিথ্যা। ইহারা যে সবর্ণ নহে, পাঠশালার শিশুরাও তা জানে। স দন্ত্য, র মূর্দ্ধন্য, বিসর্গ কণ্ঠ্য। ইহারা পরস্পরবিনিময়সহও নয়। 'স'র স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে রেফ বা বিসর্গ, রেফের স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে বিসর্গ বা 'স,' কিংবা বিসর্গের স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে, 'স' বা রেফ বসাইতে পারি না। সংস্কৃতে রামস্য না বলিয়া রামর্য বা রামঃয, গীর্ভ্যাম্ না বলিয়া গীঃভ্যাম্ বা গীস্‌ভ্যাম্,' অথবা রামাঃ না বলিয়া রামাস্ বা রামার্ বলিতে পারি না। পারিলে শ্রীনাথ বাবুর কিছু সুবিধা হইত, কিন্তু পারি না। সংস্কৃতে শ্রীনাথ বাবুর মতের নজীর নাই। প্রাকৃতেও না। এরূপ বিনিময় প্রাকৃতেও চলে নাই। সংস্কৃতের বিসর্গ প্রাকৃতে কোথাও 'উ,' কোথাও 'ও' হয়। যেমন বচ্ছো (বৃক্ষঃ),

'মালাউ বা মালাও (মালাঃ)। কোথাও বা একেবারে লুপ্ত হয়। যেমন, বচ্ছা (বৃক্ষাঃ)। কিন্তু কোথাও 'স' বা 'র' হয় না। শ্রীনাথ বাবুর অনুকূল নজীর প্রাকৃতেও নাই। রামরা বা রামেরা 'রামাঃ' হইতে আসিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক।

তবে 'রা'কোথা হইতে আসিল? বীম্‌স্‌ও বুঝিতে না পারিয়া ফাঁকি দিয়াছেন। কিন্তু হর্ণলের গ্রন্থে একটা উত্তর আছে। প্রথমার বহুবচনের এই র-যুক্ত রূপ নেপালী ভাষায়ও পাওয়া যায়। নেপালী 'দেবহেরু' বা'দেবহরু' = বাঙ্গালা'দেবেরা'। নেপালীতে এই হেরু বা হরু কেবল প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি নহে, অন্যান্য বিভক্তির বহুবচনেও আগমের মত যুক্ত হয়। যেমন দেব-হেরু-কো' (দেবদিগের), দেব-হেরু-লাই" (দেবদিগকে)। কিন্তু হর্ণলে দেখাইয়াছেন, মূলে হেরু বা হরু ষষ্ঠীবিভক্তিরই প্রতিরূপ। কথাটা একটু খুলিয়া বুঝাই। মাগধীতে ষষ্ঠীর একবচনের স্থানে বিকল্পে 'হ' হয়। যথা পুলিশাহ বা পুলিশশ্‌শ (পুরুষস্য)। প্রাকৃতে অনেক সময়েই আবার ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে ষষ্ঠীরই অর্থে একটা অতিরিক্ত কেরক-বা' কেরিক, কেলক বা কেলিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃতনাটক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। মৃচ্ছকটিকে "অপ্‌পণো জাদিং"এবং "অপ্‌পণো কেরিকং জাদিং," "অজ্জচালুদত্তস্স পবহণং" এবং "এশে কৃখু পবহণে অজ্জচালুদত্তাহ কেলকে," দুইরূপ প্রয়োগই আছে। এই 'কেরক' অপভ্রংশে 'কেরউ' হইয়াছিল।* প্রাকৃতের 'দেবাহ কেরকং' অপভ্রংশে 'দেবাহ কেরউ' হইয়াছিল। দেবাহ কেরউ হইতেই নেপালীর দেহহেরু আসিয়াছে। দেবাহ কেরউ হইতে দেবাহ এরউ—দেবা হেরউ—এইরূপ ক্রমে দেবাহেরু বা দেবহেরু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। আজ যাহা নেপালীতে প্রথমার বহুবচন, মূলে তাহা ষষ্ঠীর রূপ মাত্র। হর্ণলের মতে,বাঙ্গালার'রা' বিভক্তিও ষষ্ঠীর 'র' হইতে আসিয়াছে।*

এক ঔপমানিকভাষাতত্ত্বের সাহায্যেই হর্ণলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আর কোনও প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু এ মতের অনুকূল প্রমাণ বাঙ্গালাতেই আছে। ষষ্ঠীবিভক্তি বাঙ্গালায় অনেক বিভক্তির স্থানেই বসে বা বসিত। কখনও একাকী, কখনও বা সেই সেই বিভক্তির সহিত। যেমন দ্বিতীয়ার অর্থে—

হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও।
সঞ্জয়ের মহাভারত।
সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল।
ঐ, ঐ।
দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধুলি কেন গায়।
মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

সকল দৃষ্টান্তই দীনেশ বাবুর গ্রন্থ হইতে ধার করা। প্রাচীন বৈষ্ণবকাব্যে দীনেশ বাবু "কাশীরে গমন"ও পাইয়াছেন। সিংহের, সিংহেরে = সিংহকে। দেওয়ানেরে, কাশীরে—এ দুইটাকে দ্বিতীয়ান্তও বলা যায়, চতুর্থ্যন্তও বলা যায়।+ যারে, তারে, তোমারে, আমারে, রামেরে, সীতারে —এখনও অনেক প্রদেশের মৌখিক ভাষায় এবং পদ্যে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। আমরা

* হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী, ৪।৪২২।

* Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, § § 364, 369.

+ গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি। পাণিনির ২।৩।১২। "মথুরাক পাঠাইল রূপসনাতন" এখানেও 'মথুরাকে' দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত। দীনেশ বাবু অনৎ বিভক্তির আশঙ্কা করিলেন কেন?

এখনও বলি, তাদের ডেকে আন, তাদেরে বোলো। চতুর্থীর অর্থে, যথা—

কোপ বাড়িবার শৈল্য বলে আর বার।
সঞ্জয়ের মহাভারত।
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়।
মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে।
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতুহলে।
সঞ্জয়ের মহাভারত।
ভাল দ্রব্য যখন পাব
কালিকারে তুলিয়া না থোব।
ডাকের বচন।
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে।
জনার্দ্দনের কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান।

বাড়িবার, * ডাকিবার, সারিবার, দেখিবারে, ধরিবারে, কালিকারে, বাণিজ্যেরে—এ সকলই চতুর্থীর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম তিনটায় শুধু ষষ্ঠীর বিভক্তি, শেষ চারিটায় ষষ্ঠীর পিছে চতুর্থীর বিভক্তিও আছে। "সারিবার পার"—এখানে তুমর্থে চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী। বাকীগুলিতে চতুর্থীর অর্থ—নিমিত্ত। বিক্রমপুরে এখনও বলে—ধরবার পারস্ না, খাবার গেছে। অর্থাৎ ধরিতে পারিস্ না, খাইতে গিয়াছে। মৌখিক ভাষায় পঞ্চমীর একটা বিভক্তি—'চেয়ে'। প্রায় সর্ব্বদাই ইহা ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে বসে। যেমন, তার চেয়ে সুন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বলে, তার থিয়া সুন্দর। 'থিয়া'ও পঞ্চমীর বিভক্তি, পূর্ব্বে বসিয়াছি। প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনের বিভক্তিও অনেক সময়ে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে বসিত। গত বৈশাখের বঙ্গদর্শনে দীনেশ বাবু যে প্রাচীন গদ্যের নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আছে—'রাজারদিগের,' 'চাকরের দিগকে'। এই সকল কারণে ষষ্ঠ্যন্ত 'রামের' হইতে 'রামেরা' র উৎপত্তিও অসম্ভব বোধ হয় না। 'রা'এর আকারটা প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিবে।* প্রাকৃতে প্রথমার বহুবচনে 'আ' র উপরই ঝোঁক্ কিছু বেশী। অকারান্ত আকারান্ত ছাড়া অন্যান্য শব্দেরও প্রথমার বহুবচনে 'আ' হয়। যথা ভত্তারা (ভর্ত্তারঃ), পিঅরা (পিতরঃ), অপ্পাণা (আত্মানঃ), ণঈআ (নদ্যঃ)। খনার বচনে দীনেশ বাবু 'নরা' 'গরু' 'বলদা' 'ছাগলা' দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালাপদ্যে এখনও 'কত জনা' 'যত জনা' প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। তবে আসল শব্দের পরে না করিয়া তার ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পরে ঐরূপ বিভক্তিযোগ করা হইত কেন, তার কারণ এই বোধ হয় যে, ষষ্ঠ্যন্ত রূপের প্রয়োগে বিবক্ষিত অর্থে যেন একটু জোর পাওয়া যায়—শুধু শব্দে তা হয় না। হিন্দীতেও দেখি, দ্বিতীয়াদি বিভক্তি পরে থাকিলে সর্ব্বনামশব্দের যে যে রূপ হয়, মূলে তাহা ষষ্ঠীর রূপমাত্র। যেমন জিস্=প্রাকৃত জেসিং, জীসে (যস্য বা যস্যাঃ)। জিন্=জাণ, জীণ (যেষাং বা যাসাম্)। তিস্ তিন্ কিস্ কিন্ ইত্যাদিতেও এইরূপ। তুঝ্=তুজ্ঝ (তব)। মুঝ্=মজ্ঝ (মম)। দোনোঁ = দোণ্হং (দ্বয়োঃ)। 'দোনোঁ' প্রথমাতেও হয়। 'তিনোঁ'র মূলও প্রাকৃ-

* বাড়িবার, বাড়্বার, বাড়ার,—একই শব্দের তিন রূপ। সেইরূপ ডাকিবার, ডাক্বার, ডাকার ইত্যাদি। পারি তো ভাষাতত্ত্বের আখ্যাতভাগের সমালোচনায় এ সকলের ব্যুৎপত্তি বুঝাইব।

* হর্ণলের মতে 'রা'ও ষষ্ঠীর 'র' এরই একটা strong form মাত্র।

ন্তের তিণ্‌হং (ত্রয়াণাং বা তিস্‌ণাম্)। হর্ণলের মত অসম্ভব নয়।

কিন্তু হর্ণলের মতের এক দৃঢ়তর প্রমাণ আছে। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গে যদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'জেসিং,' 'জাণং' বা 'জাণ', এবং তদ্‌শব্দের 'তেসিং,' 'তাণং' বা 'তাণ' হয়। এই 'তাণ' প্রাচীন বাঙ্গালায়ও পাওয়া যায়। সেখানে ইহার রূপ 'তান'। যথা—

নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।
তান এক সেনাপতি লস্কর-ছুটিখান।
শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব্ব।
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
জনার্দ্দনের কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান।

মূলে বহুবচন হইলেও, এ সমস্ত স্থলে 'তান' একবচন এবং গৌরববাচী। তান= তাঁর। সংস্কৃতে এক বুঝাইতেও গৌরবার্থে কখন কখনও বহুবচন হয়। শঙ্করাচার্য্য মানুষ একজন, কিন্তু বলি—ভাষ্যকারাঃ। উদ্ধৃত প্রয়োগগুলিরও বুনিয়াদ্ নেই। 'তান' এখনও লুপ্ত হয় নাই। গৌরবার্থে ষষ্ঠীর একবচনে 'তান' এবং 'যান' পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। এই দুই ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই 'আ' যুক্ত করিয়া গৌরবার্থে প্রথমার বহুবচনে ঐ সকল দেশে 'তানা' ও 'যানা' বলে। তানা= তাঁরা, যানা=যাঁরা। বাঙ্গালা প্রথমার 'রা' বিভক্তি ষষ্ঠীর 'র' হইতে আসিয়াছে, 'তানা' 'যানা' এ কথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু ষষ্ঠীর 'র' কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে তিনটা বিভিন্ন মত আছে। (১) আমাদের শ্রীনাথ বাবুর মত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও নাকি এই মত। (২) ডাক্তার হর্ণলের মত। বীম্‌সেরও এই মত। (৩) দীনেশ বাবুর মত। প্রথম মতটা ছাড়া আর কোনও মতই বড় তুচ্ছ নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

জগন্নাথ-দর্শন।

অনেক দিন হইতে আমার জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছিল। ভারতের বহু-দূর হইতে নানাশ্রেণীর নর-নারী যাহা দেখিবার জন্য বৎসর বৎসর, বহু প্রাচীন-কাল হইতে, পথের ভীষণ কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, দলে দলে সমাগত হইয়া থাকে;—শৈশবকাল হইতে যাহার সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবাদ-বাক্য নানামুখে শুনিয়া আসিয়াছি;—একদিন যে বিগ্রহ ও যাহার মন্দির, সেই সুপ্রসিদ্ধ "কালা পাহাড়ের" দেবমূর্ত্তি-ধ্বংসী বিক্রম সহ্য করিয়াছিল;—তাহা দেখিবার ইচ্ছা কাহার মনে জাগরূক না হয়? বিশেষতঃ রামায়ণের ন্যায় প্রাচীন কালে, যে অসীম জলরাশির অজ্ঞাত-কুক্ষি-কবলের অন্তরালে আমাদের আজকালকার এই অসংখ্য প্রাণী সমাকুল হাস্যময় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত ছিল;—আবার বহু-বৎসর পরে যাহার অনুগ্রহে ও যাহার সচ-ঞ্চল ক্রীড়ার প্রভাবে, ইহা নরনারীর আবাস-ক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে;—পুরীতে গেলে সেই মহাশক্তির মহাসৃষ্টিরহস্য স্বরূপ সাগর দেখিতে পাইব,—এ ঔৎসুক্যও আমার ছিল। এবার, পুরীদর্শনের হঠাৎ একটী সুবিধা উপস্থিত হইল। কাকি-নার রাজা বাহাদুর, তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা নিজব্যয়ে দেশদর্শন করিতে সক্ষম নহে, এরূপ প্রায় শতাধিক প্রজার পাথেয় ও আহারাদির ব্যয় স্বয়ং বহন

করিয়া, কতিপয় পার্শ্বচর সহ তিনিও পুরী ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের কৃপায়, এইরূপে আমার বহুদিনের অভিলাষ সফল হইয়াছিল। যে সমস্ত পরিব্রাজক অতি অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র জগন্নাথ ও সাগরের দর্শন লাভ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের সেই মুহূর্ত্তকালব্যাপী দর্শনের (Flying visit) মধ্যে, কিরূপ ধারণা (impression) লইয়া তাহারা চলিয়া যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য, আমি এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। "উৎকল-ভ্রমণ" বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

রাজা বাহাদুর তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের জন্য এবং রাজপরিবারের জন্য পাঁচ খানা গাড়ী পূর্ব্বেই রিজার্ভ (Reserved) করিয়া রাখাইয়াছিলেন। আমরা ১৮ই নবেম্বর ৪৷৷০ ঘটিকার সময়ে সেই গাড়ীতে কাকিনা ষ্টেসনে উঠিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই কলিকাতায় বাসা ও আহারাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তথায় বিশ্রামের পর আমরা রাত্রি ১০ টার সময়ে হাবড়ায় উপস্থিত হইলাম। বেঙ্গল-নাগপুর রেল হাবড়া হইতে মেদিনীপুর ভেদ করিয়া একেবারে পুরী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তাহারই পাঁচ খানা গাড়ী রিজার্ভ করিয়া রাখা হইয়াছিল। নর্দ্দারণ বেঙ্গল রেল অপেক্ষা হাবড়া রেল অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেলে আমরা সে বিষয়ে নিরাশ হইলাম। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী গুলিতে কুচবিহার-রেলের ন্যায় দুই খানি মাত্র বেঞ্চ আছে দেখিলাম। রেল কোম্পানী আমাদের কোন গাড়ীতেই আলোর বন্দোবস্ত করেন নাই। আমরা অনেক বলাতেও তাঁহারা আলো দিতে সক্ষম হন নাই। আমরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যাহা হউক, সাড়ে দশটার সময়ে রেল গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা সেই অন্ধকারে, সঙ্কীর্ণ স্থানেই কোনও রূপে নিদ্রার উদ্যোগ করিয়া লইলাম। রেল চলিতে লাগিল।

প্রত্যূষে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি, রেল গাড়ী গুলি, নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়া হু হু শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। দুই দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর বিকীর্ণ রহিয়াছে। সিন্দুরের ন্যায় লোহিতাভ মৃত্তিকা রেল-পথের উভয়দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ২ নদী ও বিলগুলির উপরে, রেল কোম্পানী যে সকল সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইঁট গুলি বাঙ্গলাদেশের ইঁট অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও কিছু কর্কশ ও মসৃণতা বর্জ্জিত। এখানকার মাটীতে সুড়কী ভাল প্রস্তুত হয় না বলিয়া বোধ হইল। মাটীর কাঠিন্যই তাহার কারণ। গ্রাম্য লোকে এই মাটী দিয়া ঘরের যে দেয়াল প্রস্তুত করিয়াছে, সে গুলি দূর হইতে সিন্দুরের ন্যায় দেখায়। দেখিতে দেখিতে গাড়ী দাঁতন নামক ষ্টেষণে উপস্থিত হইল। দাঁতনে শ্যামলেশ্বর শিবের মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে কালা পাহাড়ের অত্যাচারের সাক্ষ্যস্বরূপ একটী ভগ্নপদ পাষাণ-নির্ম্মিত বৃষ রহিয়াছে। এস্থানে বিদ্যাধর ও শশাঙ্ক নামক দুইটী

অতি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার পরে, গাড়ী জলেশ্বর ষ্টেষণে উপস্থিত হইল। পথের প্রান্তরে এই স্থানে আমরা কতক গুলি বানর ও হনুমান দেখিলাম। এই স্থানের মৃত্তিকা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো রক্তবর্ণ। বালেশ্বর ষ্টেষণ ইহারই পরে! এই ষ্টেষণে আমাদের রিজার্ভ গাড়ী কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং এই স্থানে আমরা আহারাদি করিয়া লইয়াছিলাম। রাজা বাহাদুরের লোক আসিয়া এই স্থানে পূর্ব্বেই শতাধিক লোকের বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ২০ শে নবেম্বর, প্রত্যূষে ৬॥০ ঘটিকার সময়ে আমরা বালেশ্বরে অবতরণ করিলাম। বালেশ্বর একটী জেলা, ইহা কলিকাতা হইতে ১৪৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বালেশ্বর বড়বলং নামক নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত। ষ্টেষণের নিকটেই একটী পোষ্টাফিশ, ডাক্‌বাঙ্গলা ও সার্‌কুট্‌ হাউস্‌ আছে। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরেজের কুঠী প্রথমে স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম কুঠীটীর তাদৃশ উন্নতি হইয়াছিল না। এখানে পূর্ব্বে দিনেমারদিগেরও কুঠী ছিল। এখনও ফরাশীদিগের প্রায় ২০০ একার পরিমিত জমী অধিকার-ভুক্ত আছে। এখানকার স্কুল, কাছারী (Courts) প্রভৃতির অবস্থা মন্দ নহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এত দূর দেশেও ইংরেজদের একটী অতি সুন্দর গির্জ্জা (Church) আছে; বহু টাকা ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহরে অনেক রোমান্‌ ক্যাথলিক মিশনারীও আছেন। ষ্টেষণের ৬ মাইল পশ্চিমে গোপীনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির; আমরা তথায় যাইতে পারি নাই। বালেশ্বরে ষ্টেষণের অতি নিকটেই, ঝড়েশ্বই নামে এক শিবমন্দির আছে। জমীদারের ও গ্রাম্য লোকের সাহায্যে ভোগাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। রেল হইবার পূর্ব্বে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। পাণ্ডারা বলিল, রেল হওয়াতে সে সমাগম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও শিবরাত্রির সময়ে এখানে যে বৎসর বৎসর মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ৩০০০ লোকের সমাগম হয়। শিবমূর্ত্তিটী মৃত্তিকার নীচে অবস্থিত; মৃত্তিকার নীচ হইতে একটী মন্দির উত্থিত হইয়াছে। পাণ্ডারা বলিল, এ শিবলিঙ্গটী পাষাণ ভেদ করিয়া আপ্‌নি উঠিয়াছে। ইহার মাথায় দুগ্ধ দিলে —তাহার পরিমাণ যতই হউক্‌না কেন— সমস্ত দুগ্ধই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; কিন্তু জল দিলে তাহা বাহির হইয়া আইসে। আমরা কিন্তু এ উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র অনুমিত হইল যে, লিঙ্গের চতুর্দ্দিকস্থ পাষাণটীর শোষণ শক্তি (absorbing power) আছে। তরল পদার্থ চুষিয়া লইতেছে, তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। মতিগঞ্জে চিনির দ্বারা প্রস্তুত, ফলের আকার, সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালেশ্বরে কাঠ বিড়ালের (Squirrel) সংখ্যা প্রচুর। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ইহারা অনবরত লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়ায়। আমাদের মধ্যে, কেহ কেহ ধরিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। এখানকার ছাত্রদিগের পোষাক ঠিক্ বাঙ্গালীরই ন্যায়, কিন্তু অধিকাংশের পায়ে জুতা নাই।

বেলা আড়াই ঘটিকার সময়ে আমরা পুনরায় রেলযোগে বালেশ্বর পরিত্যাগ করিলাম। রেল কোম্পানী রাস্তায় মাটী

দিবার জন্য যে গর্ত্ত কাটাইয়াছেন, সেগুলি তখনও জলপূর্ণ ছিল। মাঠেও আমরা জল দেখিলাম। বালেশ্বর হইতে পুরী পর্য্যন্ত বৃষ্টির জলের অভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। বালেশ্বর ছাড়িয়াই সেই সমস্ত জলপূর্ণ খালের ধারে, আমরা এক কি দেড় হস্ত পরিমিত কয়েকটী কুম্ভীর রৌদ্রে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। বোধ হয়, এতৎ প্রদেশের নদী ও পুষ্করিণীতে কুম্ভীরের সংখ্যা অধিক।

সোরো নামক ষ্টেষণে উপস্থিত হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অনতিদূরে কুজ্ঝটিকাময়, কৃষ্ণকায় নীলগিরি নামক পর্ব্বতমালা দেখা যাইতে লাগিল। পর্ব্বতমালাটী পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। রেল যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পর্ব্বতমালাও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ইহার পরেই সেই ভদ্রক ষ্টেষণ। এখানে রেল গাড়ীর ইঞ্জিন বদল হইয়া থাকে। ভদ্রক, বালেশ্বর জেলার একটী মহকুমা। এ স্থানে প্রতি বুধবারে গোমেষাদি পশু বিক্রয়ের প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে।

রেলপথের উভয় পার্শ্বেই বহুদূর পর্য্যন্ত শ্যামবর্ণ ধান্যক্ষেত্র বিরাজিত রহিয়াছে, দেখা গেল। এই ধান্যক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে বালেশ্বর হইতে ব্রাহ্মণী নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আয়তনেও বহুদূর। এই রেলপথেই উৎকলের গ্রাম্য অবস্থা দর্শনের সুবিধা আমাদের ঘটিয়াছিল। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে উৎকল যে একটী দরিদ্র দেশ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। গ্রাম্য নরনারী, যাহারা শস্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিতে আসিয়াছে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় এবং সেকেলে ধরণের। শীত ঋতুর সন্ধ্যাকাল, তবুও তাহাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত শীত-নিবারক কাপড়ের পর্য্যন্ত অভাব দেখিলাম। উহাদের স্ত্রীলোকের পরিহিত রক্তবর্ণ "পাইড়" বিশিষ্ট মোটা এক খানা মাত্র বস্ত্র অঙ্গশোভা করিয়াছে; হাতে, সেই কেলে ধরণের কাঁশা বা তৎসদৃশ কোন স্বল্পমূল্যের ধাতু নির্ম্মিত, কারুকার্য্য বিহীন মোটা মোটা অলঙ্কার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সিঁথিতে মোটা একটা সিন্দুরের ফোঁটা। রংপুরের গ্রাম্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহারা দুই খানা করিয়া পরিধানের বস্ত্র ব্যবহার করে না। ইহারা যে সকল গৃহে বাস করিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই শোচনীয়। গৃহের ছাউনী অতি নিকৃষ্ট খড় দিয়া সম্পন্ন হয়। অতি অল্পদিনেই সেই ছাউনী খসিয়া পড়ে। ঘরের দেয়াল মাটীতে হয়। মাটী অবশ্য শক্ত এবং রক্তাভ, কিন্তু দেয়ালের নির্ম্মাণ-প্রণালী অসন্তোষচিত। [গ্রাম্য গবাদি পশুর অবস্থাও অতি খারাপ।] বসতি অত্যন্ত বিরল; লোক সংখ্যাও কম। রেলপথের উভয় ধারে আমাদের বাঙ্গলাদেশের ন্যায় কদলী ও গুবাক্ বৃক্ষের নিতান্ত অভাব অনুভূত হইল। কেবল আম্র, শাল, তাল ও নারিকেল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইল। উড়িষ্যার রেলের কর্ম্মচারী উড়িয়া ভদ্রলোকেরা বেশ বিনয়ী; ইহাঁরা বাঙ্গলাদেশের দুরন্ত রেল কর্ম্মচারীদিগের মত উদ্ধত নহেন। মুসলমান জাতির সংখ্যা নিতান্তই কম বলিয়া আমাদের বোধ হইল। উড়িষ্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক এখনও কিছুই প্রবেশ করে নাই। দোকানে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য উড়িষ্যায় বিক্রীত হয়, দেখিলাম,

সে গুলির অধিকাংশই সেকেলে এবং সামান্ত ও স্বল্পমূল্যের।

হায়! যে দেশে অত্যন্ত বিলাসী নবাব কতলুখাঁর রাজত্ব ছিল, যে দেশে ধান্ত-ক্ষেত্রের প্রাচুর্য্য এত অধিক আজও দেখিতেছি,—সে দেশ এত দরিদ্র বোধ হইতেছে কেন, এই চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে সম্মুখে একটা অনির্ব্বচনীয়, অননুভূতপূর্ব্ব, মনোমোহকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদিগকে বিস্ময়বিহ্বল করিয়া তুলিল। সহসা সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ধান্তক্ষেত্র অন্তর্হিত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে, বহুবিধ সংখ্যাতীত শাল বৃক্ষ রেলপথের উভয় দিকে দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। আর সে ধান্তের শোভা নাই; শাল বৃক্ষের কৃষ্ণ ছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল। গ্রাম হইতে উত্থিত ধূমরেখা সেই শাল-বনের শিখরদেশে রেখাকারে সজ্জিত হইল। নীচে কৃষ্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রগতিতে কৃষ্ণকায় রেল পথ বনমধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে; অনতিদূরে মসী-শ্যাম নীলগিরি কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আন্দোলিত হইয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে, নীচে মৃত্তিকা সমূহ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির এই গম্ভীর সান্ধ্যদৃশ্য আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণীর সেই বিশাল নদীবক্ষ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বর্ষাকালে এ নদী কম ভয়ঙ্কর হয় না। ইহার বক্ষভেদ করিয়া যে রেল-সাঁকো চলিয়া গিয়াছে, সেটীও দৈর্ঘ্যে নিতান্ত কম নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সাঁকো মহানদীর। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে অতি পবিত্র বলিয়া যে মহানদী কীর্ত্তিত হইয়াছে, একটু পরেই দেখিলাম, সেই মহানদী প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দুইটী ক্ষীণ জলপ্রবাহ দুই-স্থানে রহিয়াছে; তবে বর্ষাকালে যে এ নদী খুব ভীষণ হইয়া উঠে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পথের অনেকগুলি সাঁকো খুব বড় বড়। কোন কোন সাঁকো নীলগিরির পাদদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, রেল-কোম্পানী এই পর্ব্বতেরই পাষাণ খণ্ড লইয়া ছোট ছোট সাঁকো গুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপ বন্য শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা রাত্রি ১২টার সময়ে পুরীতে উপস্থিত হইলাম। সে রাত্রি ষ্টেষণে রেল গাড়ীতেই আমরা বিশ্রাম করিয়াছিলাম। পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের মনে যে গম্ভীরতা আনিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়।

ভদ্রক ষ্টেষণ পার হইলেই, গভর্ণমেণ্ট-রচিত এবং বেঙ্গল—নাগপুর রেল-কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে চালিত বহুবিধ বৃহৎ বৃহৎ সাঁকো পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভদ্রক ষ্টেষণের পরেই সলন্দী নদী, তৎপরেই সেই বিখ্যাত বৈতরণী নদী। ইহাদের উপরের সাঁকো গুলিও কম বড় নহে। বৈতরিণীর পরে,খরস্রয়া নদী, ইহার পরেই ব্রাহ্মণী নদী। ব্রাহ্মণী নদীই আমাদের ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে পার হইতে হইয়াছিল। এই নদীটী পার হইবার পরই রেলপথটী পূর্ব্বোক্ত নীল-গিরিনামক পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানেই দুই ষ্টেষণের মধ্যবর্ত্তী দূরতা খুব বেশী; রেলযাত্রীর ধৈর্য্যচ্যুতি উপস্থিত হয়। এই স্থানটীতেই পর্ব্বতের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অতি স্পষ্ট। এই স্থানটী ছাড়িয়াই, কয়েকটী ষ্টেষণ পরেই, গাড়ী কটক ষ্টেষণে প্রায় কুড়ী মিনিট

অপেক্ষা করে। কটকে আমাদের গাড়ী লাগিবামাত্র রেলের দ্বারে দ্বারে উড়িয়ারা গরম দুগ্ধ, লুচী প্রভৃতি আনিয়া বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইল। "চাই কট্‌কী ঘটী" রব উত্থিত হইল। চাহিয়া দেখি, পাঁচ ছয়টী উড়িয়া যুবক ও বালক ছোট বড় নানা আকারের কট্‌কী ঘটী ও বাটী বিক্রয় করিবার জন্য গোল উপস্থিত করিয়াছে। ইহারা দাম খুব বেশী চাহিতেছে। এই স্থানে মহিষের শৃঙ্গের কাগজকাটা Slice এবং ছড়ি ও একরূপ সুন্দর বিছানার চাদর বিক্রীত হয়। এখানে যে সমস্ত পান আনিয়াছিল, সমস্তই "সুর্ত্তি" দেওয়া। গভর্ণমেণ্ট প্লেগের ভয়ে যাত্রী পরীক্ষার্থ, এ ষ্টেষণে ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন দেখিলাম। পরীক্ষায় কোনই হাঙ্গামা বা ক্লেশ নাই, অতি সহজে অল্প সময়ে সম্পন্ন হইল। কটকের লোক সংখ্যা ৫১০০০ মাত্র। কটকের নীচেই সুপ্রসিদ্ধ, প্রাচীন মহানদী। কটক ও বেরং এই দুই ষ্টেষণের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে নদী গুলির উপর দিয়া যে লৌহ সেতু বিনির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। বহু বিস্তৃত জল ও বালুকাময়, অতি কঠিন ও ক্লেশকর স্থানের উপর দিয়া এরূপ সেতু ভারতে অল্পই আছে। এই সমস্ত বহুশ্রম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ সেতুর প্রসাদেই, এখন উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি গমন এত সহজসাধ্য হইয়াছে। আমরা এস্থলে একটী অনুরোধ না করিয়া পারিতেছি না। এই পথে যেরূপ সুন্দর সুন্দর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট পথিককে বিস্ময়বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছেন এবং সেতুর এখানে প্রাচুর্য্য যেমন অনেক অধিক, তাহাতে এই সকল স্থানে যদি, কোন Sign board দ্বারা যথাস্থানে এই সকল নদীর নাম ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত মালার নাম লিখিত থাকে, তবে পথিকের পক্ষে তাহাদের ঔৎসুক্য তৃপ্তির বড়ই সুবিধা হয়। আমরা এ অংশেও রেল-কোম্পানির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ করিলে দেশ-পর্য্যটনকারী পথিকের সংখ্যাও অধিক হইবার সম্ভাবনা।

এ স্থলে কটক সম্বন্ধে আমরা একটী ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গল্প বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। পাঠক-বর্গ ক্ষমা করিবেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে, মছলীপট্টন হইতে আটটী-মাত্র ইংরেজ বণিক্ বাণিজ্যের উদ্দেশে বঙ্গোপসাগর বাহিয়া, এই মহানদীর মোহানায় নঙ্গর করে। এই স্থানে হরিষপুরে, মোগলদিগের একটী শুল্ক আদায়ের কুঠী ছিল এবং তাহার ভার একজন হিন্দু রাজার হস্তেই স্থাপিত ছিল। এই হিন্দু রাজার সদয় ব্যবহারে ও সাহায্যে, এই বাণিজ্যার্থী ইংরেজগুলি, পর্ত্তুগীজ বণিকের হস্তে নিহত হইতে পারে নাই, নতুবা উহারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইত। ইহার পরে, ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ উভয়েই পরস্পরের ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়া, রাজদ্বারে বিচার-প্রার্থী হয়, রাজা উভয়েরই জাহাজ ও পণ্য-দ্রব্য সরকারে আটক্ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখেন। এইরূপ অদ্ভুত বিচার দেখিয়া, ইংরেজের দলপতি Cartwright ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসভা হইতে চলিয়া আইসেন। হিন্দুরাজা, Cartwright এর এই ক্রোধ দর্শনে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া, উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে শান্ত হইবার জন্য তিন

দিন সময় দিয়া চতুর্থ দিন রাজসভায় আহ্বান করাইয়া লইয়া আসিলেন। তখনও বণিক্ দলপতির ক্রোধ শান্ত হয় নাই দেখিয়া, রাজা হাসিয়া স্বীয় রাজকর্মচারী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "যে জাতি হইতে এরূপ একটী সভ্যতানভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, সে জাতি কিরূপ?" রাজ-কর্মচারিগণ উত্তর করিল যে, "এ জাতির সমকক্ষ, নৌবলে বলীয়ান্ ও অজেয় জাতি কোথাও নাই।" রাজা এই উত্তরে প্রীত হইয়া ইংরেজদিগকে উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। এ ঘটনা ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে সম্পন্ন হইয়া-ছিল। এইরূপে ইংরেজ কটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং এইরূপেই হরিষ-পুরে ইংরেজের সর্ব্বপ্রথম কুঠী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই কটকের পরে সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরে গাড়ী থামিয়াছিল। এই ভুবনেশ্বর হইতেই উদয়গিরি ও খন্দগিরিস্থিত বৌদ্ধদিগের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরে এখনও ৫০০ দেবমন্দির আছে। এই মন্দির গুলির আকার নানারূপ ও উড়িষ্যার স্থপত্য বিদ্যার সাক্ষী। লিঙ্গরাজ নামক শিব-মন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানেও বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই ভুবনে-শ্বরেরই বিখ্যাত কেশরীরাজবংশ, ৯৪০—৫০ খ্রীষ্টাব্দে কটক স্থাপন করেন। ইঁহারাই এই মন্দির গুলিরও স্থাপনকর্ত্তা। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রেই রাজাবাহাদুর সাগর দর্শনের জন্য পুরী রেলষ্টেষন হইতে সাগর-তটে উপস্থিত হইলেন। আমরা ষ্টেশন হইতেই পদব্রজে রওনা হইলাম। কিছু দূরেই ইংরেজদের একটী সমাধিস্থান। সেই সমাধিস্থানের নীচে দিয়াই একটী ক্ষুদ্র ঝিল প্রবাহিত। এই ঝিলটীর নাম চক্রধর নদী। সেই ঝিল পার হইয়াই সাগরতট। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে নয়নসীমা আবদ্ধ করিয়া মহাসাগরের অসীম জলরাশি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—দেখিতে পাইলাম। বিস্তীর্ণ, অনন্ত, বিক্ষুব্ধ জলরাশি গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে, দূর হইতে এক একবার পর্ব্বতবৎ উন্নত হইয়া, আবার পরক্ষণেই ভীমবেগে সহস্র সহস্র মৌক্তিকখণ্ডবৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছে!! আবার উঠিতেছে!!! অনন্ত-কাল হইতে এই অনন্ত নৃত্য চলিয়া আসি-তেছে!! কে বলে সাগর জড় মাত্র? ইহা অনন্ত শক্তির আকর। উঠিতেছে, পড়ি-তেছে, খেলিতেছে, ছুটিতেছে, চলিতেছে, যাইতেছে, ভীম নিনাদ করিতেছে!!! ইহা সদা চঞ্চল, সদা নৃত্যপরায়ণ, সদা ক্রীড়াশীল! ইহা অনন্ত, অসীম, অখণ্ড, অক্ষুব্ধ! চতুর্দ্দিকে কেবল জল, কেবল জল; অপার, নীল, জল রাশি ঊর্দ্ধদেশে নীলগগনে মিশিয়া গিয়াছে;—আর নীচে, হেলিয়া দুলিয়া, ফেনরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে, উন্মত্ত-বিকার-গ্রস্ত-রোগীবৎ ছট্‌ফট্ করিতেছে!!! ইহা অনন্তশক্তিধর বিশ্বস্রষ্টার অসীম কীর্ত্তি! ইহা সৃষ্টির রহস্যময় মহাপ্রহেলিকা!! ক্ষুদ্র নদী ক্ষুদ্রজল লইয়া, যেমন অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া উঠে ও অভিমানে কূল ভাঙ্গে, শস্য ক্ষেত্র ধ্বংস করে এবং লোকের আরামস্থান চূর্ণ করিয়া দেয়;—এ বিশাল জলরাশিময় মহাসাগর ত সেরূপ নহে। ইহার ধ্বনি যেমন গম্ভীর, ইহার দৃশ্য যেমন গম্ভীর, ইহার কার্য্যও তেমনি গম্ভীর! ইহা কূল

ভাঙ্গে না, বরং পুষ্টিসাধন করিয়া দেয়। ইহা কাহাকেও ধ্বংস করে না, বরং সকলকে রক্ষা করে। যে বিশাল তরঙ্গ সকল দূর হইতে উন্নত হইয়া বেগে ছুটিয়া আইসে, মনে করিলে, তাহা সমগ্র দেশ ভাসাইয়া দিতে পারে; কিন্তু আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় এই, যেন কূলে আসিয়া, সেই জলতরঙ্গ লজ্জায় আপনবেগ সম্বরণ করিয়া লইয়া, বেলাভূমিকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লয়, এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনদান করিয়া আবার তাহার নিকট হইতে "আসিব বলিয়া'" বিদায় গ্রহণ করে। কি গম্ভীর ভাব, কি মনোমাদন দৃশ্য! সাধে কি তোমার নামে সাগর! কালিদাস ও বাইরণ মত্ত হইয়া গিয়াছিল! সাধে কি ঐ কবি-যুগল তোমার নামে কলকণ্ঠে গীতি-তরঙ্গ তুলিয়া, তোমারই ন্যায় দেশপ্লাবন করিয়া গিয়াছে?? আমরা সে দিনের মত সেই মহাশক্তির মহাবিকাশে প্রাণ মজাইয়া, বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে বাসায় ফিরিলাম।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমরা কতিপয় যাত্রী জগন্নাথ দর্শন করিতে মন্দির প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। একটী প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্রাকার প্রাচীর দ্বারা মন্দিরটী বেষ্টিত, এই প্রাচীরটী প্রায় ২০ ফিট্ উচ্চ। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী বৃহৎ কপাট রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই প্রাচীরের মধ্যে আরও একটী প্রাচীর আছে; উভয় প্রাচীরের মধ্য ১১ ফিট্ পরিমিত অবকাশ আছে। জগন্নাথের মন্দিরটী মধ্যে এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ। ইহার উচ্চতা ১৯২ ফিট্। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের নিম্ন অংশ অল্পদিনের গঠিত। দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের ন্যায় ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উপরাংশটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পাষাণ দ্বারা নির্ম্মিত। শিখরদেশে একটী লৌহচক্র আছে। ইহার চারিদিকে ও পার্শ্বে আরো অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত ছোট ছোট শতাধিক মন্দির আছে। সমস্ত গুলিই দেবমূর্ত্তি দ্বারা অধিকৃত। প্রত্যেক মন্দিরের দ্বারদেশেই "অর্থগ্রাহী পাণ্ডাঠাকুরদের অধিষ্ঠান আছে"। কেহ কেহবা যাত্রীদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান। একটী পয়সা দিলে, অন্ততঃ দশটী বেত্রধারী পাণ্ডা দৌড়িয়া আইসে। এক বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ এবং রথযাত্রার সময়ে একলক্ষ হইয়া থাকে।

বিমলা ও জগন্নাথের মূর্ত্তিই এখানকার সর্ব্বপ্রধান মূর্ত্তি। মন্দিরটীর দ্বারদেশেই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের কাষ্ঠময় মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। পঞ্জিকা ও চিত্রপটে যেরূপ ছবি দেখা যায়, মূর্ত্তি তিনটী প্রায়ই তদ্রূপ। তবে আকারে মনুষ্যবৎ দীর্ঘ এবং হস্ত পদ শূন্য হইলেও, চক্ষু প্রভৃতি গোলাকৃতি হইলেও, মূর্ত্তি তিনটী দেখিতে ভীষণ নহে। উত্তম মনোরম। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ দিবসেই অন্ধকারাবৃত। দিন অপেক্ষা, রাত্রে আলো দিবার পরই ভাল দেখা যায়। জগন্নাথের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের পথটী অতীব সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময়। শুনিলাম এই পথে নাকি গত দুর্গোৎসব পূজার অষ্টমীর দিন তিনটী যাত্রী চাপা পড়িয়া পরলোকগত হইয়াছে। বিমলার মন্দিরের প্রবেশ-পথটীও এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারাবৃত। প্রথম

বেলা রাণী ও রাত্রিতে রাজা বাহাদুরের অনুগামী হওয়াতে, আমাদের দর্শন-ক্রিয়াটী উত্তম নিরাপদ ও সহজসাধ্যই হইয়াছিল। প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটী বাজার আছে। লোকে ইহাকে আনন্দ-বাজার বলে। এই স্থানে ছোট ছোট মাটীর পাত্রে মহাপ্রসাদ ও কর্পূর এবং চন্দন নির্ম্মিত মালা বিক্রীত হয়। প্রতিদিন এই স্থানের প্রসাদে লক্ষ লোকের উদর পূর্ত্তি হইয়া থাকে, এবং প্রসাদপাকের জন্য ২০০ শত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে। যে হিন্দুজাতি জাতিভেদের জন্য বিখ্যাত, হিন্দুর এই তীর্থক্ষেত্রে সেই জাতিভেদের বন্ধন একেবারেই নাই। এ স্থানে উচ্ছিষ্টের পর্য্যন্ত বিচার নাই। জাতিভেদ না থাকুক্, কিন্তু এখানে মহাপ্রসাদের অন্নব্যঞ্জনাদি যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা ঘৃণিত বলিয়া আমাদের মনে হইল। মহাপ্রসাদ অনাবৃত পাত্রে রক্ষিত হইয়া থাকে,—উহাতে লোকের পদধূলি পড়িলে, আবর্জ্জনাদি পড়িলে, বা রোগের বীজ বা কোন ময়লা দুর্গন্ধি পদার্থ বায়ুবেগে বাহিত হইয়া পড়িলেও, লোকে তজ্জন্য কোন সতর্কতা গ্রহণ করে না। আহার্য্য পদার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার প্রথা, এদেশে একেবারে নাই। মন্দিরের পার্শ্বে ও কোণে, হনুমান, রামচন্দ্র প্রভৃতি আরো বহুবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে।

রাজাবাহাদুর দর্শনের সময়ে প্রণামী স্বরূপে প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্মুখে অনেক রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়িত করিয়াছেন। তৎপরে রাত্রে, জগন্নাথের পূজার জন্য পাণ্ডার হস্তে তথাকার নিয়ম মত প্রচুর অর্থ দিয়া আসিয়াছেন।

আমার পুরী সহর ঘুরিয়া দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাজাবাহাদুরের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়ায়, তাঁহার এক-জন কর্ম্মচারী সহ স্পেসেল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দিনেই রেলষ্টেষণে আসিতে হইয়াছিল এবং তথা হইতে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাসায় ফিরিতে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়া যাওয়াতে, আমার আর সহর দর্শন বা প্রসিদ্ধ পদার্থাদি দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। রাজাবাহাদুর তাঁহার সমভিব্যাহরী শতাধিক লোকের জন্য যেরূপ সচ্ছল ব্যয় করিয়াছেন দেখিলাম, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার সুবন্দোবস্তে কোন লোকেরই কোনও স্থানে আহারাদির কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। যখন যাহার যাহা দেখিবার বা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখনই তাহা পাইয়াছে। এমন কি, যাইবার এবং আসিবার সময়ে, কলিকাতা যাহারা দেখে নাই, তাহাদের দেখিবার জন্য, সমস্ত সহর ভ্রমণের জন্য প্রত্যেককে তিনি গাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। স্পেসেল ও রিজার্ভ ট্রেন হওয়াতে, রেল পথেও তাঁহার লোক কোন কষ্ট পায় নাই। এইরূপ নিজব্যয়ে, নিজের প্রজাবর্গকে যিনি নানা দেশ দেখাইবার সুবিধা করিয়া দেন, তিনি যে একজন দেশহিতৈষী প্রজা-পরায়ণ ব্যক্তি, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হয়? রাজাবাহাদুরের এইরূপ প্রজানিষ্ঠতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

হেন্‌রি ড্রামণ্ড।*

সে আজ দশ বৎসরের কথা—কিন্তু আজিও সে ঘটনাটী ভুলি নাই।

—মাঘের দুরন্ত শীতে এক রাত্রিতে আপন গৃহে বসিয়া আরামে আগুন পোহাইতেছি,—এডিনবরা সহরের পথ ঘাট তুষারে একেবারে আবৃত হইয়াছে,—অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছে,—এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া এক সহাধ্যায়ী স্কচ্‌ বন্ধু হঠাৎ আমার গৃহে ঢুকিয়া বলিলেন "চল Odd Fellows' Hall এ বক্তৃতা শুনিতে যাবে।" সে রাত্রিতে আরাম-চেয়ার ও আগুনের মায়া কাটান বড় সহজ ব্যাপার নহে—তাহার উপর আবার বাহিরের অবস্থা এমনই অপ্রীতিকর! আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বন্ধু বলিলেন "ওঠ, দেরী করিয়ো না—আমাদের আদর্শ প্রচারক ও ছাত্রদলের রাজাকে যদি দেখিতে চাও তবে আমার সঙ্গে চল।" আমি উঠিলাম—দুইজনে গৃহের বাহির হইয়া—পঞ্চভূতের উৎপাত নীরবে সহ্য করিতে করিতে চলিলাম। গম্যস্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা শুধু শুনিলে বিশ্বাস করিতাম কি না সন্দেহ। —সে প্রকাণ্ড গৃহ সহস্রাধিক ছাত্রে পরিপূর্ণ। ভাবিলাম একি আশ্চর্য্য ব্যাপার—যে দুর্দ্দান্ত ছাত্রদের প্রতাপে এডিনবরা সহর থর থর কাঁপে—তাহাদের এতজন কি আকর্ষণে এখানে উপস্থিত ও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শান্ত সমাহিত হইয়া বসিয়া আছে! বন্ধু বলিলেন "অধ্যাপক ড্রামণ্ড ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মাচার্য্য এতগুলি দুরন্ত ছেলেকে বশ করিতে পারেন না!"—একথাটায় আর সন্দেহের অবসর রহিল না।

সেই রাত্রি আমি প্রথম ড্রামণ্ডকে দেখিলাম। দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে—আজিও সেই প্রথম সাক্ষাতের ছবি স্মৃতিতে জাগিয়া আছে। দেখিলাম সে প্রশস্ত ললাট—উজ্জ্বল, সুন্দর, মুখশ্রী—শান্তিপূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুদুটী—প্রীতিপ্রদ, দেহযষ্টি—সরল ও গৌরবান্বিত। দেখিলাম—তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায়—অঙ্গভঙ্গী নাই; স্বাভাবিক স্বরে—মরমের ভাষায়—প্রাণের গভীরতম স্থান হইতে যে কথা গুলি উত্থিত হইল, তাহা শত শত তৃষিত হৃদয়ে শান্তি সলিল ঢালিয়া দিল।

শুধু আমি কেন, ড্রামণ্ডকে যে একবার দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। এমনি এক বিশেষত্ব তাঁহাতে ছিল যে, শুনিয়াছি, বাল্যসহচরদিগের মধ্যে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের দলে—যৌবনের ধর্ম্মবন্ধু মণ্ডলে—সকল অবস্থাতেই তাঁহার সহযোগীদের মনে হইত, ড্রামণ্ড যেন তাঁহাদের একজন নহেন—যেন কোন বরেণ্য জীব—সম্ভ্রান্ত অতিথির ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। জনতার মধ্য হইতে তাঁহাকে বাছিয়া লওয়া কঠিন হইত না—যেন সাধারণ লোক হইতে তিনি স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠতর উপাদানে গঠিত ছিলেন। অথচ, পথের ভিখারী—কি আফ্রিকার অসভ্য Zulu, চপল বালক—কি দুরন্ত ছাত্রদল, ধর্ম্মাচার্য্য—কি বৈজ্ঞা-

---

* দ্বিসপ্ততিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাগৃহে প্রদত্ত বক্তৃতা-মূলক।

‘নিক বৃন্দ, রাজনীতিজ্ঞ—কি রাজপ্রসাদ-ভোগী অভিজাতগণ—এমন কোন শ্রেণীর লোক ছিল না, যাহাদের সহিত তিনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতে না পারিতেন বা যাহাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হইতেন।

স্কটলাণ্ডের একজন বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক * তাঁহার বাল্যাবস্থায় বালক ড্রামণ্ডের সহিত প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন;—“ক্রীড়া স্থলে অন্যান্য বালক পরিবৃত ড্রামণ্ডকে দেখিয়া মনে হইল—এ জনতার মাঝেও সে যেন একা; সুকুমার ড্রামণ্ডের মুখের লাবণ্য—শিষ্টব্যবহার—ও সুন্দর প্রকৃতির সহিত—চারিদিকের অপটু—আনাড়ি—অগঠিত-চরিত্র বালকদের কোন মিলই দেখিলাম না। কি এক আশ্চর্য্যগুণে ড্রামণ্ড আমার দৃষ্টিকে এমনি বন্দী করিল—যে সোৎসুক নয়নে—আমি তাহারি মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রত্যেক গতি-বিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কল্পনা-রাজ্যের এক রাজা যেন হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—আর তুলনায় আমরা যে যথার্থই দীন, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকিল না।” ড্রামণ্ডের পরিচিত শত শত লোক এই মতে সায় দিয়াছেন।

এখনও আপনাদের নিকট ড্রামণ্ডের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আপনাদের ঔৎসুক্য যদি জাগিয়া থাকে, তবে এই খানেই বলি, ড্রামণ্ড কে ছিলেন এবং কি করিতেন। তিনি গ্লাসগো নগরে এক ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কথাটা ঠিক হইলেও ড্রামণ্ডের যথার্থ পরিচয় ইহাতে হইল না। তাঁহার নাম যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অন্ততঃ এটুকু জানেন যে, এই প্রাকৃত বিজ্ঞানের অধ্যাপক একজন আদর্শ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সহস্র সহস্র যুবক ধর্ম্মের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—অসংখ্য নরনারীর জীবন নিরাশার ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়াও—আলোকের ক্ষীণ রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে—পাপপঙ্কে আকণ্ঠ ডুবিয়াও উদ্ধারের পথ পাইয়াছে।

স্কটলাণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে যে কত লোক তাঁহার মুখের বাণী শুনিবার জন্য তৃষিত থাকিত,—কত অনুতপ্ত নরনারী যে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিয়া—সকল লুকান ছবি অপ্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার নিকট ধরিত, তাহা বলা যায় না। অল্প বয়সেই এত লোকের হৃদয়ের উপর এরূপ অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার হওয়া বড় সাধারণ কথা নহে; এরূপ ক্ষমতা লাভ করিলে অনেক প্রবীণ ধর্ম্মপ্রচারকেরও মাথা ঘুরিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ড্রামণ্ড সমসাময়িকদিগের এত উর্দ্ধে উঠিলেও—তাঁহার চিত্ত অবিচলিত ছিল,—তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ভূষণ—বিনয়—এক মুহূর্ত্তের জন্যও খসিয়া পড়ে নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহার যশ দেশ বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—আমেরিকাও একেবারে ড্রামণ্ডের নামে মাতিয়া উঠিল।

কিন্তু চারিদিকে যাঁহার এত প্রতিপত্তি—মনে করিলে যিনি পদমর্য্যাদা ও যশ-গৌরব লুঠিয়া লইতে পারিতেন—তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত যে,

* Ian Maclaren.

লোকের স্তুতি নিন্দায় সে হৃদয় ভুলিবার নহে। অথচ মর্ত্ত্যের সুখ দুঃখ—পরের হাসি কান্না—জীবনের নির্দ্দোষ খুঁটি নাটি—কোন বিষয় হইতেই তাঁহার সহানুভূতি দূরে থাকিত না। হয়ত রাজপথ দিয়া ড্রামণ্ড যাইতেছেন;—নিখুঁত পরিচ্ছদে—সরল কৃশাঙ্গ ঈষৎ হেলাইয়া দুলাইয়া—প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে—জগতের দিকে আশা ও আনন্দের সহিত চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। সে মুখে অশান্তির কোন রেখা নাই—সে সমুন্নত মস্তকে শঙ্কা বা গর্ব্বেরও কোন লক্ষণ নাই। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে মনে হইত যে, এমন বিষয় অল্পই ছিল—যাহাতে তিনি মনোযোগ দিতেন না। ক্রিকেট খেলা, বন্দুক ছোঁড়া—নৌসঞ্চালন প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়াতে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। যেখানেই তাঁহার সহিত দেখা হউক না কেন—হয়ত তাঁহার একটী নূতন গল্প—কি নূতন কোন হেঁয়ালী, অথবা কোন মজার কথা বলিবার থাকিত। বালক বালিকাদিগের দলে মিশিতে ড্রামণ্ডের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

"বালক" জীবটী ড্রামণ্ডের নিকট চির-রহস্যময় এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামগ্রী বলিয়া বোধ হইত। প্রাণীতত্ত্ববিদ যেমন উৎসুক ভাবে কোন জীবের প্রত্যেক গতিবিধি ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া থাকেন—ড্রামণ্ডও সেইরূপ—ক্রীড়াভূমিতে, বিদ্যালয়ে, হাটে মাঠে,—পথে ঘাটে—যেখানেই সুযোগ পাইতেন—এই চিরপরিবর্ত্তনশীল বালক-চরিত্র পাঠ করিয়া অপার আনন্দ পাইতেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জনতা দেখিলেই ড্রামণ্ড তাহাদের মাঝে গিয়া জুটিতেন ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বালক বালিকারা তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া চিনিয়া লইত। এ বিষয়ে ড্রামণ্ড তাঁহার পিতার গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ড্রামণ্ডের পিতা ৫০ বৎসর বয়সের সময় এক রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন—এই বয়সেও তাঁহার বালক বালিকাদের উপর আশ্চর্য্য দখল জন্মিয়া যায়। এমনি স্নেহ মমতায় ছোট ছোট হৃদয়গুলিকে জড়াইয়া ছিলেন—যে তিনি সেই বালক বালিকাদিগের সম্মিলনে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতাগুলিকে ইচ্ছামত হাসাইতে বা কাঁদাইতে পারিতেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলাণ্ডের Stirling নগরে হেনরি ড্রামণ্ড জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মভীরু পিতা মাতার গৃহে জন্মিয়া হেন্‌রি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। হেন্‌রির পিতা একজন স্থানীয় অবৈতনিক বিচারক এবং যুবকদিগের খ্রীষ্টীয় সমিতির সভাপতি ও নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের একজন নেতা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। ড্রামণ্ডের পিতামহও একজন ধার্ম্মিক ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন। এইরূপে বংশ-পরম্পরায় যে সকল সদ্‌গুণ সঞ্চিত হইয়াছে, ড্রামণ্ড উত্তরাধিকারী সূত্রে সেই পরম সম্পদে ধনী হইলেন। একথা কি সত্য নহে যে, ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ইতিহাস ভাল করিয়া খুঁজিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁহাদের বংশেরই কেমন এক আশ্চর্য্য প্রভাব থাকে? মনে হয় যেন অন্ততঃ তিন চারি পুরুষের পুণ্যের ফলে একজন বড় লোক প্রস্তুত হয়। ধরাবক্ষ ভেদ করিয়া ঐ যে স্ফটিক উৎস আকাশের দিকে ছুটিয়া রবির কিরণে নাচিতেছে—

কে জানে, তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়? সুদূরব্যাপ্ত—মানব চক্ষুর অগোচর—না জানি কোন্ অন্তঃসলিলবাহিনী তাহার জীবন!

শৈশবে হেন্‌রি ড্রামণ্ড ও তাঁহার ভ্রাতা কতিপয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তরলমতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য মহিলাদের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত আর কে হইতে পারে? স্নেহ মমতার বিনিময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়গুলিকে একেবারে দখল করিয়া বসিতে—শিশুদের অস্ফুট বাণীর শত আব্দার সহ্য করিতে—বা তাহাদের ব্যাকরণ-বহির্ভূত ভাষার মর্ম্মগ্রহণ করিতে মহিলাদের মত সহজে অভ্যস্থ হইতে আর কে পারে?—ভারতে সে সুদিন কবে হইবে—যখন শিশুদের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের উপর ন্যস্ত হইবে এবং দুর্দ্দান্ত "গুরুমহাশয়ের" বিভীষিকা—বর্গীর হাঙ্গামের ন্যায় অতীত কাহিনী হইয়া দাঁড়াইবে! দ্বাদশ বৎসর বয়সে হেন্‌রি ও তাঁহার ভ্রাতা Crieff নামক স্থানে এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বাড়ী তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। এখানে যে কয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন—তাহা বড়ই সুখের দিন গিয়াছে। এই সময়ে হেন্‌রি বাটীতে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে বুঝা যাইত, তিনি কি আনন্দে ছিলেন। এখানে হেন্‌রি জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিতেছেন—বিজ্ঞানের সহিত প্রথম পরিচয় হইতেছে—সত্য সত্যই একটা বড় ফুটবল লইয়া খেলা করিতে পাইতেছেন—এ সকল কি সহজ গৌরবের কথা!—আজ স্কুলে একটা নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আসিয়াছে;—কাল তাহারা এক বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবে;—ছেলেরা মিলিয়া একটা অভিনয় করিবে—হেন্‌রিকে তাহাতে মেয়ে সাজিতে হইবে—ইত্যাদি কত আমোদের প্রসঙ্গে তাহার পত্র পূর্ণ থাকিত! তাঁহার বাল্য জীবনে অদ্ভুত কিছুই ঘটে নাই—তাহা অতি স্বাভাবিক ছিল। সুস্থদেহে ও সুস্থ মনে—বালস্বভাবপ্রিয় সকল নির্দ্দোষ আমোদেই হেন্‌রি প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন। তাঁহার হৃদয়ের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া স্বচ্ছ সূর্য্যালোকের ন্যায় সকল প্রকার নির্ম্মল আনন্দ অবাধে প্রবেশ পথ পাইত।

তিন বৎসর পরে হেন্‌রি Crieff পরিত্যাগ করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র—এবং তাঁহাকে দেখিতে আরো ছোট মনে হইত! শুনিয়াছি, সেই সময়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে একদিকে যেমন অজাতশ্মশ্রু বালক দেখা যাইত, তেমনি আবার এমন পরিণত বয়স্ক অনেক পাওয়া যাইত, যাঁহারা হয়ত সবে লাঙ্গল ছাড়িয়া—বা কারখানার কাজ হইতে বিরত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়াছেন! সে সময়ের গল্প শুনিয়া এডিনবরার আধুনিক ছাত্রদলের দানবগণ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া থাকেন,—কেন তাঁহারা সেই সুদিনে জন্ম গ্রহণ করেন নাই! তখনকার ছাত্রেরা মোটা মোটা লাঠি হস্তে পাঠগৃহে প্রবেশ করিতেন;—যথেচ্ছভাবে টেবিল চেয়ারের উপর আপনাদের ছুরীর ধার পরীক্ষা করিতেন;—শীতকালে তুষারের গোলা ছুঁড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আসে পাশে সকলকে

আলাতন করিয়া তুলিতেন! ক্ষুদ্রকায় হেন্‌রি ইহঁাদের দলে ঠাঁই পাইতেন না;—অবশ্য তাঁহার সেরূপ উচ্চাভিলাষও ছিল না!

সেই সময়ে ছাত্রদের একটি তর্কসভা ছিল। তাহার সভ্যদিগের শক্তির সীমা থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা ছোট ছিল না! সাধারণতঃ ছাত্রদিগের সভা সমিতিতে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে, তাহার কোনটাইত বাদ যাইত না—তাহা ব্যতীতও তাঁহারা মহা আড়ম্বরে রাজনীতি—সমাজতত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নানা প্রকার কূটতর্ক মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের বক্তৃতার ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিত—এবং ভাব ও ভাষার অভাব হইলে—টেবিলের উপর ঘন চপেটাঘাতে তাহা পূরণ হইয়া যাইত!

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের এক বৎসর পরে একদিন ড্রামণ্ড এই তর্ক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন—এবং তখনই দাঁড়াইয়া একটী ছোট খাট বক্তৃতা দিলেন। সেই প্রথম দিনেই অনেকে এই অল্প বয়স্ক সুন্দর বালকের স্বাভাবিক বক্তৃতা শুনিয়া আকৃষ্ট হইলেন। ইহার দুই মাস পরে তিনি এই সভাতে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার সম্বন্ধে তিনি স্বীয় মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন"আমার প্রবন্ধটী নেহাত মন্দ হয় নাই—ওস্তাদেরাও কেহ কেহ প্রশংসা করিয়াছেন"। এরূপ নিজের প্রশংসার বিষয় ড্রামণ্ড একমাত্র তাঁহার মাতার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা জানেন—জননীর কর্ণ প্রাণপ্রিয় সন্তানের স্তুতি শুনিবার জন্য কেমন তৃষাতুর থাকে—তাঁহারাই ড্রামণ্ডের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। এই তর্ক সভাতেই ড্রামণ্ডের ভবিষ্যত ক্ষমতার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ইহার সভাপতি হইলেন এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতির বক্তৃতায় তাঁহার বাগ্মীতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে ক্ষুদ্রকায় হেন্‌রি দেখিতে দেখিতে এক সুদীর্ঘ কলেবর—সুঠাম গঠন—প্রিয় দর্শন যুবকে পরিণত হইলেন। তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যেন প্রাণের ভিতর কি এক জ্যোতি তিনি পাইয়াছেন,তাহারই আভা মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। তাঁহার চিন্তাশীল মুখে প্রীতির ছবি অঙ্কিত থাকিত—স্থিরনেত্রে প্রেমের কাহিনী কহিত। তাঁহার চক্ষু দুটীর বাস্তবিকই কি এক মোহিনী শক্তি ছিল।- অনেকে আলাপ করিবার সময়ে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন না,—কিন্তু ড্রামণ্ডকে দেখিয়াছি, আলাপ করিবার সময় স্থিরনেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—যেন তাঁহার দৃষ্টি একটু একটু করিয়া তলাইয়া গিয়া হৃদয়কে একেবারে বেড়িয়া ধরিত।

কলেজে অধ্যয়ন কালে ড্রামণ্ড প্রথিতনামা লেখক রস্কিনের একজন ভক্ত শিষ্য হইয়া দাঁড়ান ও সৌন্দর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ড্রামণ্ড আজীবন স্বভাবের শিশু ছিলেন। নিসর্গের কোলে বসিয়া—তিনি জগতের চারিদিকে প্রেমের ছবিই দেখিতেন। প্রকৃতির প্রেম অজস্রধারে বহিতেছে। আকাশে চাঁদ হাসে—আমরা হাসিব বলিয়া, গাছে ফুল ফোটে—আমরা সুখী হব বলিয়া, প্রকৃতি মোহন সাজ ধরে—সবাইকে প্রেম মুগ্ধ করিবে বলিয়া। সে হৃদয় কি দরিদ্র—যাহাতে সৌন্দর্য্যবোধ নাই। প্রকৃতির

প্রেম যিনি বুঝিয়াছেন—তিনি সৌন্দর্য্যের রাজ্য ছাড়াইয়া—প্রকৃতির আড়ালে সেই প্রেমময়ী মায়ের মুখচ্ছবি দেখিতে পান।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ড্রামণ্ড কলেজ ছাড়িয়া এক পরিবারে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তখনও তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ কুয়াসায় ঢাকা ছিল, কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এক অস্পষ্ট অগঠিত বাসনা জাগিয়া উঠিত। এই সময়ে তিনি প্রাণের আবেগে—তাঁহার ঊনবিংশ জন্মদিন উপলক্ষে আপনার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন—

"In looking back on my past years I see nothing but an unbroken change of mercies. Few lives have been as happy as mine. The rod of affliction may conquer many, but if I am subdued at all I have been "killed with kindness"—unmerited, unrequited, unsolicited, unexampled kindness."

"গত জীবনের দিকে ফিরিয়া চাহিলে কেবলই ভগবানের অজস্র করুণা দেখিতে পাই। আমার মত সুখের জীবন অতি বিরল। হয়ত দুঃখের কশাঘাতে অনেকে পরাজিত হয়েন—কিন্তু আমি যদি বশীভূত হইয়া থাকি—তাহা কেবল করুণায়—দয়াতে আমি মরিয়াছি,—অনুপযুক্ত পাত্রে এত অযাচিত দান;—এ দয়ার প্রতিদান নাই—ইহার তুলনা মিলে না।"

আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত বিধাতার অযাচিত প্রেমের দান লাভ করিতেছি—তবু আমাদের কয়জনের প্রাণে তাহাতে সাড় হয়? কিন্তু ড্রামণ্ডের হৃদয়ে—সারা জীবনে ভগবানের করুণার স্মৃতি একটু একটু করিয়া জমিয়া—হঠাৎ চির নীহার-স্তূপের ন্যায় গড়াইয়া পড়িয়া সে হৃদয়ে শত মন্দাকিনী ছুটাইয়া দিল।

ড্রামণ্ড এডিনবরায় ফিরিয়া আসিয়া এক ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। এখানে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। এই ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে চার বৎসর শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে পর, ধর্ম্মাচার্য্য হইবার অধিকার জন্মে। দুই বৎসর কাল এই কলেজে পড়িয়া ড্রামণ্ড জার্ম্মাণীতে গমন করেন ও তথায় কতিপয় অধ্যাপকের অধীনে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। জার্ম্মানী হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত কিছুকাল প্রাকৃত-বিজ্ঞান-চর্চ্চা করেন। এই সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট এক তত্ত্ববিদ্যা সভার সভাপতিরূপে "Spiritual Diagnosis" "আধ্যাত্মিক ব্যাধিনির্ণয়" নামক এক গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশদরূপে দেখাইয়া দেন যে, উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্যের—অন্যান্য উপাসকদিগের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণের যোগ থাকা আবশ্যক। আচার্য্য তাঁহার সাধারণ উপদেশ বা বক্তৃতার অপেক্ষা নির্জ্জনে কাহারও কাণে দু একটী আশার কথা বলিয়া—কাহাকেও বা ধর্ম্মজীবনের দু একটী সঙ্কেত দেখাইয়া দিয়া অনেক আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের সহায়তা করিতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে উপদেশের পর উপদেশ শুনিয়াও কোন ফল না হইতে পারে—কিন্তু জীবনে এমন অবস্থা ঘটে—যখন প্রাণ কেন জানি আকুল হইয়া উঠে;—হয়ত শোকের কশাঘাতে হৃদয় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কি সংশয়ের আঁধারে পড়িয়া প্রাণ আতঙ্কে অধীর হইয়াছে—তখন—সেই মাহেন্দ্রক্ষণে নির্জ্জনে দুটী বিশ্বাসের

কথা প্রাণকে স্পর্শ করিয়া জীবনের স্রোত একেবারে ফিরাইয়া দিতে পারে।

এই সময়ে, ছাত্রাবস্থাতেই ড্রামণ্ড বাক্য, কার্য্য ও জীবনের সকল শক্তিই ঈশ্বরের সেবাতে খাটাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়া—দরিদ্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই স্কট্‌লাণ্ডে ধর্ম্মের এক প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইল—এবং সেই স্রোতে ড্রামণ্ড একেবারে প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন।

১৮৭৩ খ্রীঃ গ্রীষ্ম ঋতুর শেষভাগে দুই জন আমেরিকাবাসী ধর্ম্মপ্রচারক ইংলণ্ডে আসিয়া জুটিলেন। ইঁহাদের একজন প্রচারক—অপর জন গায়ক—কিন্তু উভয়ে অভিন্ন হৃদয়। প্রচারকের নাম Moody এবং গায়কের নাম Sankey। বস্তুত তাঁহারা উভয়েই প্রচারক;—দুই জনে মিলিয়া পরস্পরের বল বাড়াইতেন;—এক জন বক্তৃতায় অপর জন সঙ্গীতে মানুষের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতেন। Moody ও Sankeyর সমবেত চেষ্টায় ব্রিটিশ্‌ ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

স্কট্‌লাণ্ড ধর্ম্ম বিষয়ে চিরদিনই বড় রক্ষণশীল। তখন অধিকাংশ স্কচ্‌ উপাসনালয়েই কোন প্রকার বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার একেবারে নিষেধ ছিল। অর্গান যন্ত্র বহুকষ্টে—ক্রমে ক্রমে স্কট্‌লাণ্ডের গির্জ্জা সমূহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে—কিন্তু হার্ম্মোনিয়াম ব্যবহারে এখনও বাধা আছে। উপযুক্ত রাগিণীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে ধর্ম্মসঙ্গীতও যে লঘু বা লালিত্যহীন হয় না—তাহা স্কটলাণ্ড ক্রমে স্বীকার করিতেছে। একদিকে যেমন উপাসনালয় হইতে বাদ্যযন্ত্রের একেবারে নির্ব্বাসন দণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে—তেমনি আর একদিকে আবার বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহারও একেবারে নিরাপদ না হইতে পারে। মৃদঙ্গ ও করতালীর সাহায্যে নিস্তেজ হৃদয়কেও মাতাইয়া দেওয়া যায়, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত; শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ক্ষেত্র—ভক্তিরস-প্লাবিত বঙ্গে ইহাদের আধিপত্য সহজে খর্ব্ব হইবে না। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার কথা নহে যে, দর্শন বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পুনঃ পুনঃ মৃদু উত্তেজনায় এক প্রকার স্নায়বিক পরিবর্ত্তন ঘটে—যাহা মাদকের মত লোককে মাতাইয়া দেয়—কখনও বা চেতনা-শূন্য করে। জানি না হৃদয়ের এরূপ ক্ষণিক উত্তেজনায় ধর্ম্ম জীবনের কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটে কি না। সঙ্কীর্ত্তনে মৃদঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে যে স্নায়বিক অবসাদ ঘটে, তাহাই প্রাণে ব্রহ্মকৃপালাভের পরিচায়ক কিনা, তাহা স্থিরচিত্তে বিচার্য্য।

Moody ও Sankey র কথা বলিতেছিলাম। তাঁহারা যখন এডিনবরাতে আসিলেন, তখন প্রথমতঃ অনেক আচার্য্যেরা তাঁহাদের "হুজুকে" ভাবিয়া সংশয়ের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এবং তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর সহিত কোন সহানুভূতি দেখাইলেন না। প্রথম প্রথম Moody ও Sankey র প্রচারে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। Moody অসুস্থ হইলেন,—Sankeyর অর্গান ভাঙ্গিয়া গেল, হারমোনিয়াম যন্ত্র গির্জ্জার ভিতর লওয়ার তুমুল আপত্তি হইল—ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল বাধা টিকিল না। লোকে Moody ও Sankeyর সরল প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। তাঁহাদের চারিদিকে

শ্রোতাদের জনতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল;—যাঁহারা দূরে দূরে ছিলেন, তাঁহারা আরো নিকটে আসিতে লাগিলেন। যাঁহারা উপাসনালয়ে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রাণ খুলিয়া Sankey ও তাঁহার অর্গানের সহিত গান করিলেন! Moody ও Sankey র প্রাণের ভিতর যে আলোক জ্বলিতেছিল—ক্রমে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; ভক্ত আত্মা যে যেখানে ছিল, একেবারে বিশ্বাসের আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। এই আগুনে এক যুবক আপনার জীবন আহুতি দিল;—স্পষ্টই সে প্রাণে উপলব্ধি করিল যে, ঈশ্বর অঙ্গুলী নির্দ্দেশে তাহাকে জীবনের পথ দেখাইয়া দিতেছেন—সে পথে অগ্রসর হইলে প্রভুর সেবার সুযোগ হইবে;—তাহা হইতে বিমুখ হইলে আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিবে। এই যুবক হেন্‌রি ড্রামণ্ড। তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন এবং অনতিবিলম্বে Moodyর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা শুধু প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে—নগরে নগরে নানা প্রকার সদনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। স্কট্‌লাণ্ডের চারিদিক হইতেই প্রচারক প্রেরণের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা আসিতে লাগিল। তাঁহারা একেবারে সমগ্র দেশব্যাপী ধর্ম্মের তুফান উঠাইয়া দিলেন। ড্রামণ্ড যেখানে প্রচার করিতে যান, সর্ব্বত্রেই বিপুল জনতা হয়—সহস্র সহস্র লোক তাঁহার মুখে পরিত্রাণের বাণী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয়;—স্থানীয় আচার্য্যগণও ড্রামণ্ডকে তাঁহাদের নেতার ন্যায় দেখেন। সাধারণ উপাসনা ও বক্তৃতা ব্যতীতও নির্জ্জনে ধর্ম্মপিপাসুদিগের সহিত আলাপ করা ড্রামণ্ডের প্রচারের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। এই নিভৃত মিলনে অসংখ্য লোক তাঁহাকে হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানের বেদনা জানাইত। তখন ড্রামণ্ডের বয়স ২১ বৎসর মাত্র। পর বৎসর ড্রামণ্ড আয়ার্লণ্ডে গমন করেন। এইরূপে বৃটিস রাজ্যের নগরে নগরে প্রায় এক বৎসরকাল ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই সময়ে ২২ বৎসরের যুবক ড্রামণ্ড যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে—এবং এখনও ধর্ম্মপিপাসুদিগের আত্মার তৃষা মিটাইতেছে। ভাবিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়, এরূপ অপরিণতবয়স্ক যুবক কিরূপে অবলীলাক্রমে সহস্র সহস্র শ্রোতাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতার মূল প্রস্রবণ স্বীয় ধর্ম্মজীবন—তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যে প্রেমের উৎস বিরাজ করিত—তাহা হইতেই উন্মাদিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় বক্তৃতাস্রোত প্রবাহিত হইত ও তাহাতে নিত্য নূতন নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিত।

এরূপ ক্ষমতা বিরল হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অজ্ঞাত নহে। পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি—স্বর্গগত পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রথম উষাতেই যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়। সে সৌম্যমূর্ত্তি যুবকের বাগ্মীতায়—তাঁহার প্রাণের জ্বলন্ত উৎসাহে ও সে সাধু জীবনের সৌরভে—অসংখ্য নরনারী ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়াছেন—এবং তাঁহার সহযোগীদের অনেকেরই ধর্ম্মজীবন

আজিও সেই পবিত্র স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আছে।

ড্রামণ্ডের নিজ জীবন অতি পবিত্র হইলেও তিনি কোন দিন পাপীকে ঘৃণা করেন নাই। দুঃখী তাপীর সহিত তাঁহার প্রাণের এরূপ সহানুভূতি ছিল যে, তাহারা ভগ্ন-হৃদয় লইয়া—পাপের বোঝা তাঁহার নিকট নামাইত। নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির দাসত্বে যে হৃদয়কে কলুষিত করিয়াছে,—লজ্জায় যে জগতের দিকে চাহিতে পারিতেছে না,—পাপের সেবায় যাহার আত্মা একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছে—নিরাশায় যাহার হৃদয় একেবারে অবসন্ন, এমন কত দীন ড্রামণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বাস করিত, তিনি তাহাদের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন। সংশয়ে যাহার হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়াছে, সে একবার ড্রামণ্ডের সহিত আলাপ করিয়া বিশ্বাসের দুর্গে সুরক্ষিত হইত,—দুর্গতির পথে যে অনেকদূর গড়াইয়াছে, সেও ড্রামণ্ডের সহিত সাক্ষাতের পর আশায় বুক বাঁধিত।

ড্রামণ্ড প্রচার কার্য্যে এমন ভাবে ব্যাপৃত থাকিয়াও জীবনের ছোট ছোট কর্ত্তব্য গুলি ভুলিতেন না। নিয়মিত রূপে বাড়ীতে মাতার নিকট পত্র লিখিতেন—ছোট ভাইটীর ক্রীড়ার সামগ্রীগুলিরও তন্ন তন্ন করিয়া খবর লইতেন। প্রচার কার্য্য হইতে একটু অবসর পাইলেই বাড়ী যাইবেন—সেইজন্য ঠিক স্কুলের বালকের মত উৎসুক হইয়া আছেন। লণ্ডন হইতে মাতার নিকট পত্র লিখিতেছেন—

"Your flowers made me just a little homesick, they had such a country air about them. I declare I had almost forgotten there were such things as daisies. However, at latest next week I shall renew my acquaintance with fresh air."

"তোমার প্রেরিত ফুলগুলিতে কেমন একটা গ্রামের সুবাস ছিল;—সে গুলো পেয়ে বাড়ীর জন্য মনটা একটু ব্যাকুল হল। সত্যি বল্‌ছি, ডেসি ফুল বলে যে একটা জিনিষ আছে—তা যেন একেবারে ভুলেই গিয়াছিলাম। বড় জোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেশে গিয়ে আবার মুক্ত বাতাসের সঙ্গে পরিচয় করিব।"

এইরূপে ছাত্রাবস্থাতেই প্রায় দুইবৎসর কাল ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া ড্রামণ্ড আবার ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন। কলেজে ফিরিয়া যাইতে ড্রামণ্ড প্রথমতঃ অনেক ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে স্থির করিলেন, কলেজের পাঠ শেষ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপ্রচারে যাঁহার এরূপ অসাধারণ স্বাভাবিক ক্ষমতা, তিনিও দেখিলেন, তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। জ্ঞান কখনও ধর্ম্মের উন্নতির পথে অন্তরায় হয় না—বরং ধর্ম্মের বল বৃদ্ধি করে। ড্রামণ্ড দুই বৎসর কাল এই কলেজে পড়িয়া ধর্ম্মতত্ত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইলেন। তাহার পর, অনেক উপাসকমণ্ডলী হইতে—আচার্য্য পদপ্রার্থী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন—কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সময়ে তিনি স্বাধীন ভাবে অল্প অল্প প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই রূপে জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক প্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় কিছু কাল গত হইল। তাহার পর শুনিতে পাইলেন, গ্লাস্‌গো নগরে এক ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে—প্রাকৃত-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছে।

ড্রামণ্ড ছাত্রাবস্থা হইতেই ভূতত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতি প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত এই পদপ্রার্থী হইলেন; এবং কিছুকালের মধ্যেই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ড্রামণ্ড অধ্যাপক হইয়া একদিকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন—অপর দিকে মুক্ত ভাবে শ্রমজীবীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। কলেজের ছাত্রদের নিকট প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে তাঁহার যেমন উৎসাহ, তেমনি শ্রমজীবীদিগকে মঙ্গলবারতা শুনাইতে—ধর্ম্মজীবনের পথ দেখাইয়া দিতে—তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল।

এ দিকে, "ড্রামণ্ড বিজ্ঞান পড়াইতেছেন"—একথা অনেকের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাদ্রী ড্রামণ্ড—ডারুইন-প্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশবাদের সমর্থন করিতেছেন—ইহা শুনিলেও কি বিশ্বাস করা যায়? ধর্ম্মাচার্য্যদিগের অনেকেইত সুযোগ পাইলে বিজ্ঞানের বুকে ছুরি চালাইতে ছাড়েন না। আর, এই আততায়ীর অস্ত্র যে কেবল এক পক্ষ হইতেই চালিত হইয়াছে, তাহাও নহে। বৈজ্ঞানিকগণও সময়ে অসময়ে ধর্ম্মের গলা টিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মবিজ্ঞানের 'মুরুব্বিয়ানা' সহ্য করিতে পারেন না—আবার বিজ্ঞানও ধর্ম্মের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য উৎসুক নহেন। কর্ম্মবীর ড্রামণ্ড কিন্তু দুই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিবাদ কেবল কাল্পনিক। যাহাদের বিগ্রহের কোন কারণ নাই—তাহাদের মাঝে আড়স্বর করিয়া শুধু এক সন্ধির পতাকা উড়াইয়া লাভ কি? ড্রামণ্ড এই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জড়-জগতে ও আধ্যাত্মিক জগতে—এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে,—এক রাজার এ দুই রাজ্যে একই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত।

১৮৮৩ খ্রীঃ এই বক্তৃতা গুলি একত্রে "Natural Law in the Spiritual World" "অধ্যাত্ম জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বর্ত্তমান সময়ের আর কোন পুস্তক বিলাতে এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই পুস্তকের এক সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইলেই ড্রামণ্ড আপনার পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেন—কিন্তু ইহা প্রকাশের পর এক লক্ষ পুস্তক কেবল ইংলণ্ড ও স্কটলাণ্ডেই বিক্রীত হইয়াছে।

ড্রামণ্ড অধ্যাত্মজগতে জড়জগতের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তাঁহার পুস্তকের রাশি রাশি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে,—কতকগুলি তাঁহার মতের তীব্র প্রতিবাদে—আবার কতকগুলি সমর্থনে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পুস্তক ঈশ্বরভক্ত লেখকের প্রাণের সজীব জলন্ত ভাষায় লিখিত একখানি অভিনব গ্রন্থ। ইহা পাঠে ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কুসংস্কার থাকিলে তাহা দূরীকৃত হইবে।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরেই ড্রামণ্ড কিছু কালের জন্য মধ্য

আফ্রিকায় গমন করেন। তথায় কয়েক মাস তিনি দেশের কোন সংবাদ পান নাই। সুতরাং তাঁহার পুস্তক প্রকাশে দেশে যে এত আন্দোলন হইয়াছে—তাঁহার যশ এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ড্রামণ্ডের কাণে তাহার কোন সংবাদ এতদিন পেঁছায় নাই। প্রায় ছয়মাস পরে তিনি একদিন দেশের কতকগুলি পত্র ও পত্রিকাদি পাইয়া—তাহাতে পড়িয়া অবাক্ হইলেন যে, তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েক মাস পরে দেশে গিয়া দেখিলেন যে, "অধ্যাত্ম জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম' পুস্তকের প্রশংসা করিয়া লোকে তখনও ক্লান্ত হয় নাই।

ড্রামণ্ডের সকল বক্তৃতা ও পুস্তকাদিতেই তাঁহার ভাষার মাধুরী, ভাবের নূতনত্ব, ও কল্পনার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতা ছোট ছোট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। The Greatest Thing in the World—"জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রদার্থ" নামক পুস্তক তাহাদেরই অন্যতম। এই পুস্তকের তিন লক্ষেরও অধিক খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই ইহা অনুবাদিত হইয়াছে!

মধ্য আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ড্রামণ্ড কয়েক বৎসর নানা প্রকার কার্য্যে একেবারে ডুবিয়া ছিলেন। এই সময়ে অনেক সম্রান্তলোক তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তন্মধ্যে লর্ড ও লেডী এবার্ডিনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহঁাদের বিশেষ অনুরোধে ড্রামণ্ড লণ্ডন সহরে ডিউক অব ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের বাটীর drawing room এ ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। ইহাতে লণ্ডনের অনেক সম্রান্ত লোক বিশেষ আগ্রহের সহিত নিয়মিতরূপে যোগ দিতেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, পরিমার্জ্জিত রুচি, ও জীবন্ত ধর্ম্মভাব দেখিয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন।

ড্রামণ্ডের জীবনের একটী প্রধান কাজের কথা এখনও বিশেষ ভাবে বলা বাকী রহিয়াছে।—তাহা ছাত্রজীবন-সংস্কার। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এডিনবরা ছাত্রজীবনের অবস্থা (বিশেষতঃ চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রদের) বড়ই শোচনীয় ছিল। তাহাদের অধিকাংশ জীবনই একেবারে ধর্ম্মশূন্য ছিল। তাহারা কোন উপাসনালয়ে যাইত না; ধর্ম্মের নামে বিদ্রূপ করিত;—প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মের রুধির লইয়া আবির খেলাইত। এডিনবরার কোন ধর্ম্মাচার্য্যই সে দুর্দ্দান্ত ছাত্রগণকে আয়ত্বাধীন করিতে পারিতেন না। এই সময়ে ড্রামণ্ড কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এমনি করিয়া ছাত্রদের হৃদয়কে অধিকার করিলেন যে, তাহার ফলে কি হইল—তাহা এই প্রবন্ধের আরম্ভে বর্ণিত হইয়াছে।

বিলাতে এক ধরণের প্রচারক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের Popular Evangelist বলে। তাঁহারা সাধারণ লোকদের মাতাইয়া তুলিতে বিশেষ পটু। সেরূপ প্রচারক হইতে হইলে উচ্চস্বর, স্থূলদেহ, যথেষ্ট রহস্যজনক গল্পের সংস্থান—তাহার প্রতি উদাসীনতা এবং ললিত

কেলার প্রতি একটু ঘৃণার ভাবও থাকা আবশ্যক!! প্রচারকের এই আদর্শ হইতে ড্রামণ্ড অনেক দূরে ছিলেন। তাঁহার স্বর্গের বারতা শুনাইবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে কেবল আশার বাণীই কহিতেন। কথিত আছে, কোন ইতালীয় চিত্রকর কেবল সুন্দর সুন্দর দেবদূতের ছবিই চিত্র করিতে পারিতেন—কিন্তু সয়তানের চিত্র তাঁহার তুলিকায় মোটেই আসিত না, কারণ তিনি কখনও তাহাকে দেখেন নাই।

ড্রামণ্ড স্বর্গের কথা এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারিতেন যে, যাহারা শুনিত, তাহাদের প্রাণে ভাল হইবার বাসনাই জাগিয়া উঠিত;—কিন্তু পাপের বিভীষিকা সম্যক রূপে বর্ণনা করিতে পারিতে পারিতেন না—কারণ পাপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় অল্পই ছিল।

প্রায় দশ বৎসর কাল ড্রামণ্ড এডিনবরা ছাত্র-মহলে প্রতি রবিবার প্রচার করিয়াছেন। ড্রামণ্ডের নেতৃত্বে এডিনবরা ছাত্রমহলে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই ছাত্র-জীবন-সংস্কার বস্তুতঃই ড্রামণ্ডের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

ড্রামণ্ডকে একবার এমেরিকাতে পাইবার জন্য মার্কিনদিগের বড়ই আগ্রহ। তাহারা বারম্বার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীঃ বসন্তকালে ড্রামণ্ড তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বোষ্টন যাত্রা করিলেন। বোষ্টন ও অন্যান্য স্থানে তিনি যে কয়টী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে আমেরিকার বিপুল জনতা একেবারে মাতিয়া উঠিল—তাহাদের মুখে আর কোন কথা নাই কেবল "ড্রামণ্ড" "ড্রামণ্ড"!

এই বক্তৃতা গুলি পরবৎসর "মানবের ঊর্দ্ধারোহণ" (Ascent of Man) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ড্রামণ্ডের এই গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ছত্রে ছত্রে কবিত্ব—ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখকের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত। ইহাতে তিনি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মের সারতত্ত্ব স্বার্থবলিদান—এবং এই পরার্থে আত্মোৎসর্গই—জীবজগতে ক্রমবিকাশেরও মূলমন্ত্র। সে বিজ্ঞান কি অন্ধ, যাহা জীবের ক্রমোন্নতির মূলে শুধু সংগ্রাম দেখিতে পায়? স্বার্থের দাস হইয়া জগতে কি কেবল একে অন্যের সংহারে উদ্যত? জীবরাজ্যে কি প্রেমের জয় নাই? প্রাণীজগতে কি সন্তানের জন্য মাতাকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রাণ উৎসর্গ করিতে দেখা যায় না? ড্রামণ্ড দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন—প্রকৃতির চারিদিকেই স্বার্থ বলিদানের ছবি। নিঃস্বার্থপরতার মন্ত্র চারিদিকে সজাগ না থাকিলে—সন্তানের জন্য মাতার স্নেহ বর্ত্তমান না থাকিলে জীবপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইত। এই আত্মোৎসর্গের প্রভাবেই জীব ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মানবরাজ্যে পৌঁছিয়াছে—এবং সেখানে প্রেমের পুত্তলী—স্নেহরূপিণী মাতার মাতৃত্বে এই পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

বাস্তবিক ড্রামণ্ডের শেষ পুস্তকে ঈশ্বরভক্তি, কবিত্ব ও বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন।

এইবার আমরা ড্রামণ্ডের জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হইলাম। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক মাস তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পরবৎসর তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় এডিনবরা ছাত্রসমাজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রোগ কাহাকে বলে যিনি জানিতেন না—তাঁহার সবল দেহকে এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিল। সে সরল দেহযষ্টি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই অবস্থায়ও তিনি কয়েকমাস প্রাণপণে যতটুকু সাধ্য কাজ করিয়াছেন। শেষে আর পারিলেন না—শক্তি একেবারে হার মানিল। ক্রমশঃ শয্যাগত হইলেন।

একি হইল? মধ্যাহ্নভাস্কর হঠাৎ রাহু গ্রাসে পড়িল কেন?

কেন ভগবান এরূপ মূল্যবান জীবনকে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দিলে?—যাঁহার জীবনে জগৎকে দেখাইলে—কিরূপে সংসারেই বৈরাগী হইতে হয়,—মর্ত্ত্যের সুখ ও আরাম পায়ে না ঠেলিয়াও—কিরূপে সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য হইতে হয়, অনন্যসাধারণ গুণ, যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া কিরূপে বিনয়ের সহিত তাহা বহন করিতে হয়,—সেই সুন্দর জীবন দিয়াই আবার দেখাইলে—দুরন্ত রোগশয্যায় পড়িয়াও কিরূপে বিশ্বাসের অক্ষয় কবচ বুকে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আজীবন যিনি "প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কাজে তাঁর"—এই মহাব্রত ধরিয়াছিলেন—তিনি আজ রোগযাতনা নীরবে সহ্য করিয়া—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় স্থির ভাবে—সেই ধ্রুবতারার দিকেই চাহিয়া জীবনের অন্তিম কাল কাটাইলেন। এক বৎসরেরও অধিক সময় দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সে অমর আত্মা প্রেমময়ের আহ্বান শুনিয়া মৃত্যুর পরপারে—অমরধামে চলিয়া গেল;—এখানে আমাদের তরে—তাঁহার সুন্দর নির্ম্মল জীবনের স্মৃতির সুবাস রহিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

পূর্ণাঙ্গধর্ম্ম।*

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মানবমন তিন ভাগে বিভক্ত; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা। মানবমনে যাহা-কিছু আছে, তাহা এই তিনটীর মধ্যে কোন না কোনটীর অন্তর্গত। মানবমনে যাহা কিছু আছে, তাহা হয় জ্ঞান নতুবা ভাব, নতুবা বাসনা বা ইচ্ছাশক্তি। এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তুমি একটী ছবি দেখিলে। ইহার মধ্যে মানবমনের তিন অবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। প্রথম, ছবির জ্ঞান। এই একটী ছবি। তাহার পর ছবি সম্বন্ধীয় ভাব। আহা! কেমন সুন্দর ছবিটী! অথবা কি কুৎসিৎ ছবিটা! তাহার পর ছবি সম্বন্ধীয় কোন ক্রিয়া। যদি ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাক, অথবা তাহা হইলে উহা পুনঃ পুনঃ দেখিবার ইচ্ছা। অথবা ঐরূপ এক খানি ছবি পাইবার জন্য বাসনা ও চেষ্টা।

মানবমনের এই তিনটী বিভাগ; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাশক্তি বা কর্তৃত্ব। মানবমনের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা এই তিনের কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত।

সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ। ধর্ম্মেরও তিন অঙ্গ; জ্ঞান, ভাব বা ভক্তি, এবং ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ। সুতরাং জ্ঞান, ভাব বা ভক্তি, এবং কর্ম্ম। ধর্ম্মের এই তিন অঙ্গের

* ১৩ই মাঘ, ছাত্রসমাজের উৎসবে পঠিত।

তত্ত্ব, আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয়। একটী একটী করিয়া এই তিনটী অঙ্গের আলোচনা করিতে হইবে। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে সহস্র সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের পক্ষপাতী নহে। তাঁহাদের মতে জ্ঞানদ্বারা ধর্ম্মজীবনের কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বহুল পরিমাণে অনিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানচর্চা দ্বারা সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা উৎপন্ন হয়। বিচার ও তর্ক করিলে মানুষ সংশয়বাদী ও নাস্তিক হইয়া যায়। কত শত স্থলে জ্ঞানচর্চার ফলস্বরূপ সংশয়বাদরূপ কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়াছে।

আমাদের দেশে বহু কাল হইতে জ্ঞান মার্গ ও ভক্তিমার্গ, এই দুই সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ জ্ঞানপথাবলম্বীরা ভক্তিমার্গকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আবার ভক্তিপথাবলম্বীদিগেরও জ্ঞানমার্গের প্রতি সাধারণতঃ তদনুরূপ ভাব। অনেক জ্ঞান-পথাবলম্বীরা মনে করেন যে, ভক্তিতে মুক্তি নাই, জ্ঞানেই মুক্তি। আবার এমন অনেক ভক্তিপথাবলম্বী আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, জ্ঞান পরিত্রাণের পথ নহে; ভক্তিতেই মুক্তি। তাঁহারা বিচার ও তর্ককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

"বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

ইহাই তাঁহাদের প্রিয় বচন।

খ্রীষ্টীয় জগতেও এই প্রকার মতাবলম্বী সহস্র সহস্র লোক চিরদিন রহিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, Reason is carnal; তাঁহাদের মতে জ্ঞান, বিচার ও তর্ক সংশয়বাদ ও অবিশ্বাসের মূল।

বাস্তবিক কি জ্ঞান, ধর্ম্মের বিরোধী? বাস্তবিক কি জ্ঞানালোচনার ফল নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ? কখনই না। যে জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর নিজ হস্তে তাঁহার সন্তান-গণকে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করেন, ভক্তি তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মের মধু। তিনি জ্ঞান না দিলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। তিনি ভক্তি না দিলে, ভক্তি-সুধাপানে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সেই একই উৎস, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে মানুষ জ্ঞান এবং প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়। তবে এ উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য কেন থাকিবে?

আমাদের দেশে জ্ঞানপথাবলম্বীদের মধ্যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি কি বলেন? শঙ্করের মতে জ্ঞানেতেই মুক্তি, কিন্তু ভক্তি ও কর্ম্ম তাহার উপায়। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, শঙ্করের অনুসরণ করিয়া সেই কথাই বলিয়াছেন।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে, লৌকিক জ্ঞানের কিছু আবশ্যকতা আছে কি? সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষায় যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ধর্ম্মজীবনের বিকাশের পক্ষে সাহায্য করে কি? অনেকে মনে করেন যে, এ সকল লৌকিক জ্ঞান, ঐহিক জ্ঞান। ইহাতে পারমার্থিক, পারত্রিক কোন প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

ইহার তুল্য ভ্রান্তিও আর নাই। সচরাচর যাহাকে লৌকিক জ্ঞান, পার্থিব জ্ঞান, (Secular knowledge) মনে করা হয়, প্রকৃত ভাবে দেখিলে প্রকৃত ভাবে আলোচনা করিলে, উহাই আধ্যাত্মিক

যা পারমার্থিক জ্ঞানের আকার ধারণ করে।

বাস্তবিক বিজ্ঞান কি? এই পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যাখ্যা। এই জগতে যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে মঙ্গলভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই জগৎ যে আশ্চর্য্য সুপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, বিজ্ঞান তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই জগতের বিবিধ বিভাগের দুরবগাহ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিবার জন্য বিজ্ঞান প্রয়াস পাইতেছেন।

কিন্তু জগতে যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে মঙ্গলভাব, যে প্রণালী রহিয়াছে, উহা কাহার শক্তি? কাহার জ্ঞান? কাহার মঙ্গলভাব? কাহার প্রণালী? জগতে যে শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, উহা কি জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের নহে? জগতের তত্ত্ব শিক্ষা করিলে কি তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই মঙ্গলভাব, তাঁহারই মহিমার বিষয় শিক্ষা করা হয় না? কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে উহাতে কি গ্রন্থকারের জ্ঞানশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? বিজ্ঞান ও দর্শন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎরূপ মহাশাস্ত্রের ভাষ্য। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ ভাষ্যকার মাত্র। অজ্ঞান মানব ভাষ্যকারদিগেরই মহিমা দেখিতেছে। মূলশাস্ত্রকারের মহা মাহাত্ম্য দেখে না!

বিজ্ঞান ও দর্শন ব্রাহ্মাণ্ডবেদের ভাষ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই মহা ব্রহ্মাণ্ডবেদের কত টুকুর ভাষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন? একান্তই ক্ষুদ্র অংশ। কিছুই নহে। সেই জন্য এক মহাবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন ;—"আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ড সকল সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অকূল রহিয়াছে!"

অনন্ত ঊর্দ্ধ গগনে কোটি কোটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সেই অনন্ত পুরুষেরই জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশ করিতেছে! সেই জন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত নিশীথকালে দূরবীক্ষণ সহকারে গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, নিজের গণনার সহিত জ্যোতিষ্কের সংস্থানের একত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন ;—

"Oh! God! I think thy thoughts with Thee."

গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, শারীরস্থান শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রভৃতি সকল প্রকার বিজ্ঞান, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশল ও মহিমা প্রচার করিতেছে! সুতরাং উপযুক্তভাবে দেখিলে, উপযুক্তভাবে আলোচনা করিলে সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদবেদান্তের ন্যায় গণিতশাস্ত্রও তাঁহাকে প্রদর্শন করিতেছে! সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাস্কেল বলিয়াছেন ;—

"Geometry declares the perfection of the Divine Mind."

জ্যামিতি পরমেশ্বরের জ্ঞানের পূর্ণতা প্রকাশ করে।

সমস্ত বিজ্ঞান পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে সত্য, কিন্তু সে ভাবে, সে চক্ষে বিজ্ঞানকে দেখে কে? অনেকে জগতের তত্ত্ব আলোচনা করেন, কিন্তু তাহার মধ্যে জগদীশ্বরকে কি দেখিতে পান? এই সকল লোক অন্ধ নয় তো অন্ধ কে? তাঁহারা বিশ্বরূপ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, অথচ গ্রন্থকর্ত্তাকে ভুলিয়া যান। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত, তাঁহারা নিম্নে, ঊর্দ্ধে, প্রকৃতির সকল বিভাগে, সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞা-

নের সাহায্যে, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

এখন দেখা যাউক, মানব জাতির ইতিহাস, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে কি বলে? অতীতসাক্ষী ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, সকল দেশে ও কালে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যে পরিমাণে যোগ, সেই পরিমাণে ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা, এবং যে পরিমাণে জ্ঞানচর্চ্চার অভাব, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম, অজ্ঞান ও কুসংস্কারের সহিত জড়িত।

খ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উহা বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ হইলেও, পরবর্ত্তী সময়ে উহা কুসংস্কারজড়িত হইয়া পড়িল কেন? অজ্ঞান জ্ঞানচর্চ্চার অভাবই উহার কারণ। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বিরহিত হইল বলিয়াই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাথমিক বিশুদ্ধতা বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গেল। একজন মনুষ্য, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি, অভ্রান্ত গুরু বলিয়া খ্রীষ্টীয় জগতে গণ্য হইলেন। লোকে তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থদানে, লঘু গুরু সর্ব্ব প্রকার পাপের জন্য ক্ষমামাত্র লাভ করিতে লাগিল। পোপের হস্তেই স্বর্গের চাবি ন্যস্ত হইল। অশেষ প্রকার ভ্রান্ত সংস্কারে রোমীয় ধর্ম্মসমাজ নিমজ্জিত হইয়া পড়িল।

আবার, খ্রীষ্টীয় জগতে ক্রমে যত জ্ঞানচর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তত ধর্ম্মসমাজের কুসংস্কার নিচয়ের প্রতি লোকের আস্থা হ্রাস হইতে লাগিল। উইক্লিফ প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকদিগের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। শেষে মার্টিন লুথরের প্রবল প্রতিবাদে রোমীয় সমাজ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টিয়ানগণ পোপের অভ্রান্ততা প্রভৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাস সকল বর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু যে উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল, তাহা থামিবার নহে। জ্ঞানোন্নতি চলিতে লাগিল। ক্রমে প্রচলিত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের কোন কোন যুক্তিবিরুদ্ধ মতের প্রতি অনেক লোকের আর আস্থা থাকিল না। অনেক বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রিত্ববাদ বর্জ্জন করিয়া ইউনিটেরিয়ান মত অবলম্বন করিলেন। জ্ঞানোন্নতি সহকারে ইউনিটেরিয়ান, ইউনিভার্স্যালিষ্ট প্রভৃতি উদার সম্প্রদায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে এই সকল সম্প্রদায়ের এতদূর উন্নতি হইল যে, ইহারা নামে খ্রীষ্টিয়ান হইলেও ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টীয় জগতে ইউনিটেরিয়ানদিগের ধর্ম্মমত ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অনুরূপ।

এক্ষণে স্বদেশে আসা যাউক। বাবা নানক পঞ্জাবে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, উহা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। কিন্তু ক্রমে, বংশপরম্পরায়, উহা বিবিধ কুসংস্কারের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আবার জ্ঞানোন্নতি সহকারে শিখ্‌দিগের মধ্যে নিরঙ্কারী শিখ্ নামক এক নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। নিরঙ্কারী অর্থাৎ নিরাকারবাদী। ইঁহারা গুরু নানক প্রচারিত বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়াছেন ও প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিলেও তাহাই দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের এখন কি দশা হইয়াছে? জ্ঞানচর্চ্চা-বিহীন অজ্ঞান লোকের হস্তে পড়িয়া উহার যে

প্রকার দুর্গতি হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

জগতের ইতিবৃত্তের সাক্ষ্যদ্বারা যেমন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানচর্চ্চার সহিত যোগ না থাকিলে ধর্ম্মের সহিত কুসংস্কার জড়িত হয়, এবং জ্ঞানচর্চ্চার সহিত যোগ থাকিলে ধর্ম্মমত বিশুদ্ধতর আকার ধারণ করে, সেইরূপ, আবার, ইহাও সত্য যে, ধর্ম্ম বিশুদ্ধতর আকার ধারণ করিলে, সমাজের সকল বিভাগে উন্নতিস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। লুথরের ধর্ম্ম-সংস্কার ইহার একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ। খ্রীষ্টীয় জগতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হওয়ার পর, সকল বিভাগে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, সকল বিভাগে, উন্নতি-স্রোত প্রবাহিত হইল। উহা আজও পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্জাবে গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে যে, বিশুদ্ধতর ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে শিখজাতি জগতের মধ্যে এক বীর জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শিখদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের মূলে তাহাদের ধর্ম্মোৎসাহ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরস্পর সহযোগিতা আছে।

সাধারণতঃ ধর্ম্মজগতে এই নিয়ম। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উন্নতি, এবং জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে উপধর্ম্মের প্রবলতা, ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত জীবনে কি ইহার ব্যতিক্রম স্থল সকল দেখা যায় না? কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এমন লোক সকল কি দেখা যায় না, যাঁহারা মহাপণ্ডিত অথচ ধর্ম্মবিষয়ে কুসংস্কারী? আবার এরূপ লোক সকলও কি দেখা যায় না, যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য অথচ যাঁহাদের ধর্ম্মমত বিশুদ্ধ? ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতার কোন সম্বন্ধ নাই?

নিশ্চয়ই হয় না। মহাপণ্ডিত অথচ ধর্ম্ম বিষয়ে কুসংস্কারী, এমন লোক জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্য; কিন্তু তাহার কি কোন বিশেষ কারণ নাই? বিশেষ কারণ এই যে, এই প্রকার লোক অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ বুদ্ধি পরিচালনা করেন, ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সেরূপ করেন না। সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ে বুদ্ধি চালনা করেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করেন। একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "নাচে ভাল, পাক্ দেয় এল।" এই সকল পণ্ডিতগণের তাহাই হয়। তাঁহারা সকল বিষয়ে বুদ্ধিচালনা করিয়া আসল বিষয়েই আপ্তবাক্যের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হন। আর সকল পথেই তাঁহারা দেখিয়া চলেন, কেবল ধর্ম্ম-পথেই চক্ষু মুদিয়া চলা ভাল মনে করেন। কি মহা অসামঞ্জস্য! কি ভ্রান্তি!

কিন্তু এমন লোক আছেন যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মমত বিশুদ্ধ। এরূপ কেন হয়? ইহার কারণ তিনটী। প্রথম, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য হইলেও, তাঁহাদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি প্রবল এবং সেই বিচারশক্তিকে তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হন না। দ্বিতীয়, এমন এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের স্বীয় স্বীয় বিচারশক্তি প্রখর না হইলেও তাহারা বিশুদ্ধমতাবলম্বী গুরু, আচার্য্য বা নেতার নিকটে যে বিশুদ্ধমত শিক্ষা

করিয়াছেন, গুরুভক্তি বশতঃ সে মতের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা হয় না। তাঁহাদের ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতার হেতু তাঁহাদের জ্ঞান বা বিচারশক্তি নহে। আচার্য্য বাক্যে নিষ্ঠাই উহার কারণ। তৃতীয়, আর এক প্রকার লোক আছেন, সংসর্গই তাঁহাদের মতবিশ্বাসের বিশুদ্ধতার হেতু। তাঁহারা বিশুদ্ধমতাবলম্বী লোকের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বিশুদ্ধ। কিন্তু এ প্রকার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা যায় না। এরূপ লোক নিরাকারবাদীর সংসর্গে নিরাকারবাদী থাকেন, সাকারবাদীর সংসর্গে সাকারবাদী হন, সংশয়বাদীর সংসর্গে সংশয়বাদী হন। বাল্যকালে বুড়াঠাকুরমার নিকটে আপনারা গল্পে শুনিয়াছেন ;—"সোনার কাটি, রূপার কাটি, তোমরা কার ? আমরা যখন যার তখন তার।" এই শ্রেণীর লোক সেই প্রকার। আমি এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু সাকারবাদীদিগের সঙ্গে মিশিয়া সাকারবাদী হইয়া গিয়াছেন। এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু সংশয়বাদীর সঙ্গে মিশিয়া সংশয়বাদী হইয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের যোগ একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সুসভ্য ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানগণ এবং আবিসিনিয়াবাসী খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা বিষয়ে এত পার্থক্য কেন ? জ্ঞানের পার্থক্যই তাহার কারণ। ডাক্তার মার্টিনোর ধর্ম্ম এবং বোর্ণিওর মুসলম্যানের ধর্ম্মের মধ্যে 'আস্মান জমিন্' তফাৎ কেন ? জ্ঞানের পার্থক্যই তাহার কারণ।

এখন ব্রহ্মবিদ্যা (Theology) সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা একান্ত অবিশ্যক। উহার আলোচনার অভাবে, দুই বিপরীত প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক কুসংস্কার ও উপধর্ম্মে নিমজ্জিত হয়। আর এক শ্রেণীর লোক সংশয়বাদী হইয়া যায়।

জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে কতক্ লোক কুসংস্কারী হইয়া যায় কেন, ইহা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু আবার কতক্ লোকে সেই জন্য সংশয়ী হইয়া যায় কেন ? তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাসের জ্ঞানমূলক ভিত্তি পান না বলিয়া সংশয়বাদে উপনীত হন। ব্রাহ্মসমাজে আমি এই দুই প্রকার লোকই দেখিয়াছি। প্রকৃতি অনুসারে দুই প্রকার লোকের, এই দুই বিপরীত গতি হয়। এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে বৈষ্ণব অথবা অন্য প্রকার সাকারবাদী হইয়া গেলেন। আবার এমন লোকও দেখিয়াছি, যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে সংসর্গগুণে সংশয়বাদী হইলেন।

বহু দিন হইল, একবার দার্জিলিং পর্ব্বতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুই সপ্তাহ একত্রে বাস করিয়াছিলাম। এক দিবস, তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, আমাদের যুবকদিগকে সংশয়বাদী ও নাস্তিকদিগের যুক্তি সকল শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল যুক্তির খণ্ডনও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যুবকদিগকে নাস্তিকদিগের যুক্তি শিখাইলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তিনি একটী সুন্দর উপমা দিয়া বলিলেন, যেমন বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য বসন্তের টীকা দেওয়া আবশ্যক।

মহর্ষি বলিলেন, "আমি সংশয়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। বলিলেন, হিউমের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার এইরূপ বোধ হইল যে, হিউমের তর্কের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমাকে চারিদিকে ঘেরিয়াছে। আমি বাহির হইবার পথ পাইতেছি না। পরে একটী স্থানে ফাক পাইয়া সেই স্থান দিয়া বাহির হইলাম।

সুস্পষ্ট দেখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর। 'আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব' নামক বক্তৃতায় আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি জ্ঞানমূলক। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানচর্চ্চা একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য, লোককে ধর্ম্মবিশ্বাসের জ্ঞানমূলক ভিত্তি প্রদর্শন করেন। লোককে এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারা বিশ্বাসের যুক্তিমূলক 'বুনিয়াদ' দেখিতে পান। লোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, অবিশ্বাস ও সংশয়বাদ একান্ত অযুক্ত ও অসার। লোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বালুকারাশির উপরে আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি নহে। সুদৃঢ় পর্ব্বতের উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত।

জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তির চর্চ্চা একান্ত আবশ্যক। কেবল শুষ্কজ্ঞানে অভিলষিত ফললাভ হইবে না। যে সকল লোক ভাবপ্রধান, যাঁহাদের হৃদয় ভাবপ্রবণ, তাঁহারা যেখানে অধিক ভাব পাইবেন, সেই খানেই যাইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি শুষ্ক হইয়া যায়, ব্রাহ্মসমাজ যদি উপযুক্তরূপে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে এখানে তৃপ্তি না পাইয়া অনেক লোক অন্যত্র চলিয়া যাইবে। যেখানে অধিক ভাব পাইবে, সেখানে যাইবে।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জল চায়। সে যদি নির্ম্মল জল না পায়, তৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেক সময় মলিন জল পান করে। কিন্তু মলিন জল অস্বাস্থ্যকর। এস্থলে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কি? আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তিকে জ্ঞান ও ভক্তির নির্ম্মল জল প্রদান করা। যে তৃষ্ণার্ত্ত, তপ্ত বালুকায় কি তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইবে? সে যদি তৃষ্ণার জ্বালায় মলিন জল পান করিতে থাকে, সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে। সেই জন্য, সুনির্ম্মল জল যোগাইয়া দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য। ভক্তিযুক্ত সুনির্ম্মল জ্ঞানসলিলে, আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাপীড়িত ব্যক্তিগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কি তাহা করিয়া আসিতেছেন না? আসিতেছেন। কিন্তু আরও উপযুক্তরূপে, আরও উৎকৃষ্টরূপে, এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা প্রার্থনীয় ফললাভের আশা কোথায়?

অনেক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি যে, দার্শনিক আলোচনা চান না, তাহার কারণ কি? প্রথম কারণ এই যে, উহা তাঁহাদের বড়ই শুষ্ক বোধ হয়। তাঁহারা উহাতে কোন রস পান না। কিন্তু বাস্তবিক কি জ্ঞানালোচনা নীরস? প্রকৃত ভাবে যিনি জ্ঞানালোচনা করেন, যাঁহার চিত্ত ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতভাবে প্রবিষ্ট হয়, তিনি উহাতে পরমানন্দ লাভ করেন। জ্ঞানালোচনায় এত আনন্দ আছে যে, জ্ঞানীজন জগৎকে ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া উহাতে ডুবিয়া যান। জ্ঞানালোচনায়, দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক, উভয় প্রকার আলোচনাতেই সুগভীর আনন্দ। আর্কিমিডিস্ যে, নূতন সত্যের

আবিষ্কার করিয়া স্নানাগার হইতে বিবস্ত্র অবস্থায়, উন্মত্ত প্রায় হইয়া, প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি," তাহা কি সামান্য আনন্দের ফল!!

অনেকে যে ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার বিরোধী, তাহার আর একটী কারণ আছে। তাঁহারা দেখেন যে, কোন কোন স্থলে জ্ঞানালোচনা বিশ্বাসকে বিচলিত করিয়া দেয়। সুতরাং তাঁহাদের মনের এইরূপ ভাব হয় যে, জ্ঞানালোচনা অনিষ্টকর। ধর্ম্মবিষয়ে বিচার ভাল নহে। উহাতে সংশয় ও নাস্তিকতা উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস, জ্ঞানালোচনার বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ্যে, দার্শনিক আলোচনার কোন অধিকার নাই। ধর্ম্মরাজ্যে দর্শনের Jurisdiction নাই।

এ সকল কি প্রকৃত কথা? বাস্তবিক কি দর্শন, ধর্ম্মের বিরোধী? বাস্তবিক কি দর্শন, ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিনাশ করে? আংশিক ও অপ্রকৃত দার্শনিক আলোচনায় কোন কোন্ স্থলে ঐরূপ কুফল ফলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতভাবে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে, উহাতে নিশ্চয়ই সুফল ফলে। ধর্ম্মের দর্শন (Philosophy of religion) যেমন একদিকে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বিদূরিত করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসকে উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে, জ্ঞানচর্চ্চার পক্ষে, আমি অদ্য অনেক কথা বলিলাম। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাস সহজজ্ঞানসিদ্ধ। সুতরাং তদ্বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সহজ জ্ঞানেই যখন ঈশ্বরকে পাইতেছি, তখন আর দার্শনিক আলোচনায় কাজ কি?

এ কথার উত্তর এই যে, আমি সহজ জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তথাচ বলি যে, দার্শনিক আলোচনা প্রয়োজনীয়। কোন্ কোন্ গুলি সহজ জ্ঞান এবং কোন্ গুলি নয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিবে কে? এই স্থলেই দার্শনিক আলোচনার একান্ত আবশ্যক। আমি বলিব, এই গুলি সহজ জ্ঞান, এই গুলি মূল বিশ্বাস; তুমি আর কতকগুলিকে মূল বিশ্বাস বলিবে। কিরূপে মীমাংসা হইবে, কোন্ গুলি মূল বিশ্বাস? বলপূর্ব্বক বলিলেই হইবে না। জ্ঞানালোচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে, কোন্গুলি সহজ জ্ঞান, কোন্গুলি মূল বিশ্বাস। আর কোন্গুলি নয়।

ধর্ম্মের দর্শন (Theology) যে সম্ভব নহে, এ বিষয়ে জ্ঞানবিরোধীদিগের একটী যুক্তি আছে। যুক্তিটী এই;—মানুষ সসীম, সুতরাং যুক্তি, বিচার, দার্শনিক আলোচনা সকলই সসীম জীবের। সসীম জীবের যুক্তি ও বিচার অবশ্য সসীম। তবে যাহা সসীম, তদ্দ্বারা অসীম পরমেশ্বরকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? সসীমের দ্বারা অসীমের নির্ণয় কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান-বিচার, দার্শনিক আলোচনা বৃথা। সহজ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে।

এ কথা কি যুক্তিসিদ্ধ? কখনই না। দার্শনিক আলোচনা সসীম জীবের বলিয়া অসীম ঈশ্বরের নির্ণয় যদি অসম্ভব হয়, তবে সহজ জ্ঞানের দ্বারাও ঈশ্বরকে পাওয়া অসম্ভব। সহজ জ্ঞান কাহার? মানুষের। মানুষ সসীম। সুতরাং সসীম মানুষের সহজ জ্ঞান, অবশ্য সসীম। তবে সসীম সহজ জ্ঞান-

দ্বারা অসীম পরমেশ্বরকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? সসীমের দ্বারা অসীমের নির্ণয় কি অসম্ভব নহে?

এখন দাঁড়াইল কি? দার্শনিক আলোচনা সসীম জীবের; সুতরাং উহা সসীম। উহা সসীম, সুতরাং উহা দ্বারা ঈশ্বর নিরূপণ সম্ভব নহে। আবার প্রতিপন্ন হইল যে, সহজ জ্ঞানও (intuition) সসীম; সুতরাং উহা দ্বারাও ঈশ্বরকে পাওয়া অসম্ভব। তবে কি হইল? পরিশেষে নিরীশ্বরবাদে কি উপনীত হইতে হইল?

এখন আমরা মহা সঙ্কটে পড়িলাম। অগ্রসর হইবার পথ কোথায়? পথ নিশ্চয়ই আছে। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, সসীম কখন অসীমকে জানিতে পারে না। জানা অসম্ভব। কূপমণ্ডূক কি পৃথিবীর বিষয় জানিতে পারে? একটি ঘটীর মধ্যে কি সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরের স্থান হয়? যাহাতে যাহা একেবারে নাই, সে তাহার জ্ঞান কখন লাভ করিতে পারে না। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এই যে একটী কথা আছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা আমাতে আদবে নাই, তাহা বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব। যে ব্যক্তি জন্ম হইতে সম্পূর্ণ অন্ধ, তাহার পক্ষে, বর্ণের জ্ঞান কি কখন সম্ভব হইতে পারে? যে জন্ম হইতে সম্পূর্ণ বধির, তাহার পক্ষে সঙ্গীতের জ্ঞান, রাগ রাগিণী ও সুরের জ্ঞান কি কখন সম্ভব হয়? যাহাতে যাহা মূলেই নাই, সে তাহার ভাব কখনই গ্রহণ করিতে পারে না।

সেই জন্য, যে সসীম, সে কখন অসীমকে জানিতে পারে না। 'অসীম' এই শব্দটাই তাঁহার নিকট অর্থশূন্য। কেবল তাহাই নহে। সে কেবল অসীমকে জানিতে পারে না, এরূপ নহে, সে সসীমকেও জানিতে পারে না।

সসীমকেও জানিতে পারে না কেন? নিজে যে বাস্তবিক সসীম, সম্পূর্ণ সসীম, সে সসীমকেও জানিতে পারে না। জানিতে পারে না কেন? এই জন্য যে, সসীম ও অসীম এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞান, বাস্তবিক এক জ্ঞান। অথবা ইহা বলিলেও হয় যে, উহা একই জ্ঞানের দুই দিক্‌ কিন্তু ঐ দুই দিক্‌ পরস্পর অচ্ছেদ্য, অভিন্ন। দুইয়ে এক, একে দুই।

ভাবুন দেখি, একটা যষ্টির এক দিকের শেষ আছে, কিন্তু আর এক দিকের শেষ অংশ নাই। ভাবুন দেখি, একটী বৃত্তের কেন্দ্র আছে, কিন্তু পরিধি নাই; অথবা পরিধি আছে, কিন্তু কেন্দ্র নাই। ভাবুন দেখি, উত্তর দিক্‌ আছে, কিন্তু দক্ষিণ দিক্‌ নাই; অথবা দক্ষিণ দিক্‌ আছে, কিন্তু উত্তর দিক্‌ নাই।

একটী যষ্টির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের প্রভেদ বুঝিতে পারি। একটী বৃত্তের পরিধি ও কেন্দ্রের প্রভেদ বুঝিতে পারি। উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণ দিক্‌ যে ভিন্ন, এবং দক্ষিণ দিক্‌ হইতে উত্তর দিক্‌ যে ভিন্ন, ইহা বুঝি। কিন্তু উহার মধ্যে একটী, আর একটী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে, ইহা মনে ভাবাও অসম্ভব। একটা যষ্টির এক প্রান্ত, অপর প্রান্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে, বৃত্তের কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, উত্তর দিক্‌, দক্ষিণ দিক হইতে, এবং দক্ষিণ দিক্‌, উত্তর দিক্‌ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে রহিয়াছে, কোন পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে,

ইহা আমরা কখনই ভাবিতে পারি না। আমাদের মনের প্রত্যাহার শক্তি আছে, সত্য, কিন্তু প্রত্যাহার শক্তিদ্বারা আপেক্ষিক জ্ঞানের পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা কখনও ভাবিতে পারি না।

সেইরূপ, সসীম ও অসীমের জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানের স্বতন্ত্র ও পৃথক্ সত্তা কখন সম্ভব নহে। সসীম বলিলেই অসীম বুঝায়, অসীম বলিলেই সসীম বুঝায়। সসীম কাহাকে বলে, যে জানে না, সে অসীম কাহাকে বলে, তাহাও, অবশ্য জানে না। আবার, অসীম কাহাকে বলে যে জানে না, সে সসীম কাহাকে বলে তাহাও অবশ্য জানে না। কেন না, এই দুই জ্ঞান, বাস্তবিক এক। অথবা, ইহা বলিলেও হয় যে, একই জ্ঞানের দুই দিক্। এই উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

সেই জন্যই বলিতেছি যে, বাস্তবিক যে সসীম, সে অসীমকে জানিতে পারে না। অর্থাৎ যাহার জ্ঞান, সম্পূর্ণ সসীম, সে অসীমকে কেমন করিয়া জানিবে? যেমন সে অসীমকে জানিতে পারে না, সেইরূপ, সে সসীমকেও জানিতে পারে না। সে নিজে যে সসীম, তাহাও জানিতে পারে না। কেন না, অসীমকে জানিলেই সসীমকে জানা হয়, এবং সসীমকে জানিলেই অসীমকে জানা হয়।

আমরা জানিতেছি যে, আমরা সসীম। সেই সঙ্গে সঙ্গেই অসীমকে জানিতেছি। আপনাকে সসীম বলিয়া যখনই জানিলাম, তখনই সসীমের সীমা অতিক্রম করিলাম। সসীম বলিয়া জানিবামাত্র, অসীমের রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। তবেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের যে জ্ঞান, উহা প্রকৃত ভাবে সসীম নহে। উহা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

তবে কি আমাদের জ্ঞান, বাস্তবিক, সসীম নয়? উহা অসীম, অনন্ত? একথা কে বলিবে? ঐ প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কি রহিয়াছে, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তোমার আমার জেবের মধ্যে, তোমার হস্তের মুষ্টির মধ্যে কি রহিয়াছে, আমি বলিতে অক্ষম। প্রকৃতিরাজ্যের মধ্যে আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি কতটুকু প্রবেশ করিতে পারে? আমি তো মূর্খ, সামান্য ব্যক্তি। জগতের মধ্যে যাঁহারা মহাজ্ঞানী বলিয়া গণ্য, তাঁহারাও বলেন যে, তাঁহারও কিছুই জানেন না। মানুষ যতটুকু জানিয়াছে, অনন্ত জ্ঞানের নিকট তাহা কিছুই নহে! মানুষের মধ্যে যিনি মহাজ্ঞানী, তিনিও অকূল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া অবাক্ ও স্তব্ধ হইয়া আছেন!

তবে যে বলিতেছি যে, আমাদের মধ্যে অসীম জ্ঞান বর্ত্তমান্, সে কথার তাৎপর্য্য কি? আমাদের জ্ঞানের দুইটী দিক্ আছে। আমাদের জ্ঞান এক দিকে সীমাবদ্ধ, আর এক দিকে সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জ্ঞান, দেশের সীমা, কালের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্যই আমাদের পক্ষে অসীম দেশ ও অসীম কালের জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। আমাদের জ্ঞান সসীমের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীম, অনন্ত রাজ্যে যাইতে পারে বলিয়াই আমরা আপনাদিগকে সসীম বলিয়া জানিতেছি।

এখন আমরা আমাদের অন্তরেই অনন্ত জ্ঞানকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সেই পূর্ব্বের প্রশ্ন আবার আসিতেছে।

আমরা সৃষ্ট জীব, সুতরাং পরিমিত। পরিমিতের পক্ষে অসীমের জ্ঞান, সীমাতীত জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতেছি যে, এমন জ্ঞান আমাদের রহিয়াছে, যাহা সীমাতীত। সেই জন্যই আমাদের পক্ষে অসীম ও সসীমের জ্ঞান সম্ভব হইতেছে। কিন্তু উহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, যিনি অনন্ত পুরুষ, তাঁহারই জ্ঞান আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ। অথবা ইহা বলিলেই প্রকৃত কথা বলা হয় যে, সেই "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম" আমাদের অন্তরে। পরিমিত মনুষ্য কেমন করিয়া অনন্ত পরমেশ্বরকে জানিবে? একথার সদুত্তর এই যে, আমরা তাঁহারই জ্ঞানে তাঁহাকে জানিতে পারি।

শঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, পথ দেখিতে পাইলাম। পথ দেখাইয়া দিল কে? জ্ঞান। জ্ঞানই এস্থলে পথপ্রদর্শক। তবে জ্ঞানকে কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিব? যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মকে বুঝিতে চেষ্টা করা, (Theology) ধর্ম্মদর্শনের আলোচনা অনাবশ্যক, সহজজ্ঞানই যথেষ্ট, তাঁহাদের কথার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল।

জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এখন ভক্তি বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব। ভক্তি বিষয়ে প্রশ্ন এই যে, প্রকৃত ভক্তি কি, আর কি নয়?

প্রথমতঃ ইহা নিশ্চয় যে, অন্ধ ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নয়। জ্ঞানের সহিত যে ভক্তির যোগ নাই, উহা প্রকৃত ভক্তি নহে। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়াই কি তাহাকে সম্মান করিতে হইবে? সে যদি অসচ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মশীল হয়, তথাচ কি সে সম্মানের পাত্র? কখনই নয়। জ্ঞানের ও প্রকৃত সভ্যতার যত উন্নতি হইতেছে, এ ভাব শিক্ষিত সমাজ হইতে ততই চলিয়া যাইতেছে। কোন গুণ থাকুক, আর নাই থাকুক, বড় বংশে জন্মিলেই মানুষ সম্মানাস্পদ, এ ভাব সভ্য জগৎ হইতে অল্পে অল্পে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যদি অপদার্থ হন, তথাচ তিনি ভক্তিভাজন, আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্য হইতে এ ভাব চলিয়া যাইতেছে। সাধু শূদ্র অপেক্ষা অসাধু ব্রাহ্মণ অধিক মাননীয়, ইহার অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কিছুই নাই।

রাজা অত্যাচারী হইলেও তিনি ভক্তিভাজন, ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মহীন হইলেও তিনি পূজ্য, ইহার তুল্য ন্যায়বিরুদ্ধ কথা আর কি আছে? ধার্ম্মিক দরিদ্র অপেক্ষা, অধার্ম্মিক ধনবান্‌কে অধিক সম্মান করিতে হইবে, জগতে এরূপ একটা ভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার বিপরীত ভাবের যে ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় নাই।

মহৎকে ভক্তি করিতে শিখিলে মন ক্রমশঃ মহৎ হয়। হীনকে ভক্তি করিলে মন ক্রমশঃ হীন ও সংকীর্ণ হইয়া যায়। যেমন তোমার আদর্শ হইবে, তোমার জীবন সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ মানুষের এইরূপ দুর্ব্বলতা দেখা যায় যে, ভক্তিভাজন ব্যক্তির ভাল মন্দ দুই গ্রহণ করে। সেই জন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ভক্তির আদর্শ যত নির্ম্মল হওয়া সম্ভব, তদ্বিষয়ে যত্ন করা একান্ত প্রার্থনীয়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়াই মানবাত্মা মুক্তিপথে অগ্রসর হয়।

অযথা ভক্তি নিন্দনীয়, কেন না, অযথা ভক্তি মুক্তিবিরোধী। উহা মুক্তিবিরোধী কেন? যাহাকে তাহাকে ভক্তি করিলেই মানবাত্মা উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, ইহা নিতান্তই ভুল কথা। অনুপযুক্ত পাত্রে ভক্তি বদ্ধ হইলে, মানুষ, অনেক স্থলে, অজ্ঞাতসারে ভক্তিভাজনের দোষ গ্রহণ করে। অনেক স্থলে বলিলাম এই জন্য যে, এ নিয়মের ব্যভিচার স্থলও দেখিতে পাই।

"The chaste Lucretia worshiped the unchaste Venus."

সতী লুক্রিসিয়া অসতী ভিনস্ দেবতার পূজা করিতেন। কিন্তু অনেক স্থলেই ইহা দেখা যায় যে, ভক্তিভাজনের দোষ মানুষ অজ্ঞাতসারে আপনার চরিত্রগত করিয়া লয়।

অযথা ভক্তি অজ্ঞানের ফল। জ্ঞানের সহিত যোগ ভিন্ন প্রকৃত ভক্তিলাভ হয় না। ইহা অতি সত্য কথা যে, ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস না হইলে প্রকৃত ভক্তির বিকাশ হয় না।

আমাদের দেশের অনেক লোকের এই মত যে, ঢেঁকি পূজা কর, আর অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনাই কর, ফল সমান। এই উভয় প্রকার উপাসনাই উপাসককে একই গম্য স্থানে লইয়া যাইবে। প্রণালীতে কিছু আসে যায় না। উভয়ই তো উপাসনা। ভগবান তো জানিতেছেন যে, আমি যাহাই করি না কেন, তিনিই আমার লক্ষ্য। তিনি জানিলেই হইল।

এ সকল অতি অসার কথা। প্রণালীতে কিছু আসে যায় না, ইহার তুল্য অযুক্ত কথা আর নাই। পূজার প্রণালীতে অনেক আসে যায়। মা কালীর কাছে বলিদান, আর নির্ম্মলা ভক্তির সহিত ভগবানের গুণ কীর্ত্তনের ফল কি এক? ইহা কখনই সম্ভব নয়।

উপাসনার উদ্দেশ্য সফল হয় কখন? যখন উপাস্য দেবতার আদর্শের সহিত উপাসক আপনার প্রকৃতিকে মিশাইয়া ফেলেন। সেই জন্যই উপাস্য দেবতার আদর্শ, যতদূর উচ্চ ও পবিত্র হইবে, সেই পরিমাণে উপাসকের চরিত্রও উন্নত ও পবিত্র হইবার সম্ভাবনা।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মকে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন। সুতরাং তিনি ভক্তিদৃষ্টিতে সকল পদার্থ ও জীবকে দর্শন করেন। যাঁহার সে জ্ঞান লাভ হয় নাই, তিনি যদি হিন্দু হন, তিনি কাশী বা বৃন্দাবন, বা অন্য কোন স্থানকে দেবতার স্থান জানিয়া উহা ভক্তির চক্ষে দেখিবেন। মক্কা, বা বেথেলহেম্ বা পৃথিবীর অন্য সকল স্থানকে সে চক্ষে দেখিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার ভক্তি, স্থান বা তীর্থ সম্বন্ধে সংকীর্ণ। তিনি ব্রাহ্মণ জাতীয় লোককে ভক্তি করিবেন, কিন্তু চণ্ডালের ছায়াস্পর্শ করিলে পাপ জ্ঞান করিবেন। পরমেশ্বর কি ব্রাহ্মণ দেহেই আছেন, শূদ্র দেহে নাই? শূদ্র দেহ সৃষ্টি করিল কে? শূদ্র দেহের প্রাণরূপে বর্ত্তমান আছেন কে? সেই একই পরমপুরুষ ব্রাহ্মণ দেহে ও চণ্ডাল দেহে সমভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাঁহার উহা দেখিবার চক্ষু নাই।

ভগবদ্গীতা বলিতেছেন যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ব্রাহ্মণদেহ ও কুক্কুর দেহ সমান দেখেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাংসাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্মতস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।
গীতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ শ্লোক।"

পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। এইরূপ যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন। এবং নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী ব্যক্তিরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ যত দিন না মানুষ বুঝিতে পারে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, ততদিন তাহার ভক্তি বদ্ধ। বিশেষ স্থানে, কালে, জাতি বা ব্যক্তিতে বদ্ধ। উহা বদ্ধ বা সংকীর্ণ ভক্তি। প্রকৃত ভক্তি নহে। যিনি বুঝিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান্, তাহার ভক্তি বিশেষ দেশ, বিশেষ কাল, বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তারিত হয়। শিবমন্দির, বা গির্জ্জাঘর; কাশী, বা মক্‌কা, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানই তাঁহার নিকট ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার ভক্তি সাম্প্রদায়িক সংস্কারের সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নহে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের সত্তা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষ মন্দিরে, বিশেষ মূর্ত্তিতে, বিশেষ তীর্থে উহা অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। ইহার তুল্য অসার কথা আর কিছুই নাই। অনন্তের অল্প বা অধিক কি? যাহা অনন্ত, তাহা অনন্তই। তাহা কোথাও অল্প, কোথাও অধিক, একথার কি কোন অর্থ আছে? বিশেষ মন্দিরে, বিশেষ মূর্ত্তিতে, বিশেষ তীর্থে, বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিতে সেই অনন্ত অধিক পরিমাণে অধিষ্ঠিত, অন্যত্র তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে, ইহার তুল্য অযুক্ত ও অসার কথা কি আছে? অনন্তের কি অল্পাধিক আছে? তবে আমরা যেখানে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার প্রকাশ অধিক দেখি, সেখানে আমাদের ভাবোচ্ছ্বাস অধিক হয়, এই মাত্র। তাঁহার সত্তা ও অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র সমান।

প্রকৃত ভক্তি কি ও কি নয়, ইহা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিলাম যে, যে ভক্তির সহিত জ্ঞানের যোগ নাই, উহা প্রকৃত ভক্তি নহে। জ্ঞান কাহাকে বলে? সত্যকে অধিকার করা, অথবা সত্যের ধারণার নাম জ্ঞান। ভক্তি কাহাকে বলে? মহত্ত্বের অনুভূতিতে লোকের হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সচরাচর তাহাকেই ভক্তি বলা হয়। জ্ঞান, কিনা জানা। কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে অগ্রে জানিব, পরে তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার ভাবোদয় হইতে পারে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি যেরূপ প্রকার ভাব হউক না কেন, তাহার উদ্রেক হইতে পারে। তবে দেখুন, অগ্রে জানা, তাহার পর ভাব। অগ্রে জ্ঞান, তাহার পর ভক্তি। আবার ইহাও সত্য যে, ভক্তি অধিকতর জ্ঞান আনিয়া দেয়, অধিকতর জ্ঞানলাভের সাহায্য করে। জ্ঞান নিশ্চয়ই অগ্রে। কেন না যাহাকে জানি না, তাহাকে কেমন করিয়া ভক্তি করিব? গোলাপ ফুলকে না জানিলে

তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেমন করিয়া মোহিত হইব? চন্দ্রকে না জানিয়া চন্দ্রের শোভা কেমন করিয়া অনুভব করিব? কোন একজন সাধু ব্যক্তিকে আমি জানি না, চিনি না; অথচ তাঁহাকে ভক্তি করিতেছি, ইহা কি সম্ভব?

প্রকৃত ভক্তি কি এবং কি নয়, এবিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিলাম, জ্ঞানের সহিত যাহার যোগ নাই, তাহা প্রকৃত ভক্তি নয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না।

দ্বিতীয়তঃ ভাবুকতা প্রকৃত ভক্তি নয়। ভাবুকতা ভাল। উহার নিন্দা করিতেছি না। উহাতে হৃদয়কে সরস রাখে। নীরসতা, আধ্যাত্মিক উন্নতির অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা। ভাব বা ভাবুকতা ভাল। কিন্তু ভাবুকতাকেই ভক্তি মনে করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে। ভাব ও ভক্তির প্রভেদ বুঝা আবশ্যক।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমি মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে একটী সুন্দর কবিতা পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। এই যে ভাব, ইহাকে কি ভক্তি বলিব? কখনই না। ইহা ভাব, ভক্তি নয়। যদি ঐ কবিতাটি পাঠ করিয়া আমার গর্ভধারিণী জননীকে স্মরণ হয়, তাঁহার জন্য আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে, ঐ ভাব তাঁহার চরণের দিকে ধাবিত হয়, তবে উহা ভক্তির আকার ধারণ করে। তখন উহা ব্যক্তিগত হয়। ভাব ব্যক্তিগত না হইতেও পারে। ভক্তি ব্যক্তিগত। ভাবুকতা ও ভক্তির মধ্যে এই বিশেষ প্রভেদ।

তৃতীয়তঃ যে ভক্তির সহিত বিনয় নাই, উহা কখন প্রকৃত ভক্তি নহে। ভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই বিনীত। ভক্তরাজ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন;—

তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥

এই শ্লোকে তিনি বলিতেছেন যে, তৃণ হইতেও আপনাকে হীন জানিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। বাস্তবিক যে হৃদয়ে বিনয় নাই, সেখানে ভক্তি থাকিতে পারে না। নিম্ন ভূমিতেই যেমন জল দাঁড়ায়, সেইরূপ বিনীত হৃদয়েই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। যে অহঙ্কারী, সে আপনার ঈশ্বর আপনি। সে আর কোন্ দেবতাকে ভক্তি করিবে? সে আপনার গুণকীর্ত্তন আপনি করে। আমি কেমন সুন্দর, আমি কেমন সদ্‌বংশোদ্ভব, আমি কেমন সম্ভ্রান্ত, আমি কেমন বুদ্ধিমান্, আমি কেমন বিদ্বান্, আমি কেমন ধার্ম্মিক ও সাধু, এইরূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি আপনার আরাধনা আপনি করে। সে আর কোন্ দেবতার আরাধনা করিবে? অহঙ্কৃত হৃদয়ে ভক্তি দাঁড়ায় না।

চতুর্থতঃ পবিত্রতা ভিন্ন কখন প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না। যে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি চলিতে থাকে, তাহা কখন প্রকৃত ভক্তি নহে। তাহা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে। সংকীর্ত্তনে নৃত্য করি, দশাপ্রাপ্ত হই, অথচ গোপনে বদ্‌মায়েসি করিতেও ছাড়ি না, এরূপ হইলে আমি কি ভক্ত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইতে পারি? যে পরিমাণে যথার্থ ভক্তি লাভ হইবে, সেই পরিমাণে মানুষ নিশ্চয়ই পবিত্র হইবে। ভক্তি দেবদুর্ল্লভ পবিত্র পদার্থ।

পঞ্চমতঃ সকাম ভক্তি, প্রকৃত ভক্তি

নহে। যে ভক্তির সহিত স্বার্থের যোগ আছে, তাহা কখন প্রকৃত ভক্তি নহে। কত লোক আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কালীঘাটের মা কালীর নিকট মানত করে, "হে মা কালি! জোড়া পাঁটা দিব, মা! আমাকে মোকদ্দমাটা জিতাইয়া দেও। মা কালী যেন ঘুষখোর! দস্যুরা কি মা কালীকে বিশ্বাস ও ভক্তি করে না? তাহারা ডাকাইতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে মা কালীকে পূজা দিয়া যায় যেন, ভাল করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতে পারে!

সচরাচর দেখা যায় যে, মানুষ নিজে যেমন, তাহার দেবতাও সেইরূপ হয়। মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, মহিষের যদি ঈশ্বরজ্ঞান থাকিত, সে মনে করিত যে, ঈশ্বর অত্যন্ত বলবান, সুন্দর শরীর, প্রকাণ্ড শৃঙ্গবিশিষ্ট এক মহিষ। তিনি স্বর্গের মাঠে বিচরণ করিয়া সুকোমল দুর্ব্বাদল ভক্ষণ করিতেছেন। আবার মহিষের যদি সয়তানের জ্ঞান থাকিত,তবে সে মনে করিত যে, সয়তান এক দুষ্ট, কদাকার, বিশীর্ণ মহিষ, ঈশ্বর মহিষের সহিত সয়তান মহিষের সর্ব্বদা গুঁতাগুঁতি হইয়া থাকে!

দুর্গোৎসবের মন্ত্রের মধ্যেই রহিয়াছে;—

ধনং দেহি, যশোদেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে,
পুত্রং দেহি সর্ব্বং কামশ্চ দেহিমে।

দুর্গোৎসব যে কিরূপ সকাম পূজা, তাহা এই প্রার্থনাতেই বুঝা যাইতেছে।

পরজন্মে সুখী হইবার আশায়, মানুষ ইহজন্মে সদনুষ্ঠান করে।

নিষ্কাম ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। নিষ্কাম ভক্ত বলেন, হে প্রভো! আমি তোমার নিকট ধন, মান, সম্পদ কিছুই চাহি না। তোমার চরণসেবা করিতে পারিলেই এ অধমের জীবন সার্থক। ভক্তরাজ শ্রীচৈতন্য কি বলিয়াছেন;—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্‌ জগদীশ কাময়ে,
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

হে জগদীশ! তোমার নিকটে আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব শক্তি, এ সকলের কিছুই চাহি না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

আহা! কি সুন্দর কথা! ভক্তিরস পানে চৈতন্যদেব এমনি মুগ্ধ যে, তাহার তুল্য জগতে আর কিছুই দেখিলেন না! ধন, জন, সুন্দরী নারী, কবিত্বশক্তি সকলই তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইল! তিনি জগদীশ্বরের নিকট অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনা করিলেন।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি জ্ঞানের মাধুর্য্যে এতই মুগ্ধ যে, তাহার উপর বা তাহার তুল্য আর কিছু দেখিতে পান না। আবার যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি ভক্তিসুধা পানে এতই পরিতৃপ্ত যে, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাহার তুল্য, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে আর কিছুই দেখিতে পান না। উপনিষদে মহর্ষি বলিতেছেন;—

"ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধুঃ"

সকল ভুতের মধ্যে, ধর্ম্ম মধুস্বরূপ। জ্ঞানী বলেন, "জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।" ভক্ত বলেন, "সকলের সার ভক্তি, "মুক্তি তার দাসী।" নিষ্কাম জ্ঞানী ও নিষ্কাম ভক্ত ঐ রূপই বলিবেন, কেন না জ্ঞান ও ভক্তির তুল্য তাঁহারা আর কিছু দেখিতে পান না।

আমাদের দেশে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ,

এই দুই ভিন্ন মার্গ রহিয়াছে। সাধকগণ এই দুই পথেই চলিতেছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই দুই বিভিন্ন পথের সাধকগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। পরস্পরের বিরোধী হন।

কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির যোগে যে, অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হয়, তাহাতেই জীব সত্যরাজ্যে গমন করিতে পারে। তাহাতেই পরিত্রাণ। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, "জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি তাহার স্ত্রী। সুতরাং ভক্তি ভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, জ্ঞান বাহির বাটীতে বসিয়া থাকে।" কথাটী অতি সুন্দর! কিন্তু যে জ্ঞান ভগবানের বাহির বাটীতে বসিয়া থাকে, তাহা উচ্চতম জ্ঞান নহে। প্রকৃত পরমার্থিক জ্ঞান নহে। এরূপ বলিলে, বোধ হয়, দোষ হয় না যে, জ্ঞানপুরুষ, ভক্তি স্ত্রীলোক। এই উভয়ের বিবাহে যে সন্তান প্রসূত হয়, তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান। অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানেই পরিত্রাণ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বিচারগ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানেই পরিত্রাণ। কিন্তু সে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভক্তি ও কর্ম্মের প্রয়োজন।

তত্ত্ব জ্ঞানেই যে মুক্তি, ভগবদ্গীতা ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

যাঁহারা নিরন্তর উদ্যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক, অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার, তাহাকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা নষ্ট করি।

যে আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা গীতার এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, সেই অবস্থা লাভ হইলে, অধ্যাত্মরাজ্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যায়। ঈশ্বর, পরকাল সকলই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং, অতএব, করিয়া বুঝিতে হয় না। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় যে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, উপনিষদ্ তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। এখানেই তাঁহাকেই জানা যায়। তাহাকে দেখা যায়, এরূপ ভাবের কথায় উপনিষদ্ পূর্ণ।

"তমাত্মস্থং যেনুপরিপশ্যন্তিধীরাস্তেষাং সুখং
শাশ্বতীনেতরেষাং।

যে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখেন, তাঁহারই নিত্য সুখ হয়, অপরের হয় না।

"ন চক্ষুষাগৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণাবা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তং
পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানের প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি হইলে ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই নিরুপাধি ব্রহ্মকে দেখা যায়।

ব্রহ্মকে যে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এরূপ ভাবের শ্লোক কত উদ্ধৃত করিব? ঐরূপ শ্লোকে উপনিষদ্ পূর্ণ।

এখন ধর্ম্মের যে তৃতীয় অঙ্গ কর্ম্ম, তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব।

কর্ম্ম দুই প্রকার। প্রথম ব্যক্তিগত বা স্বার্থসম্ভূত কর্ম্ম। আমার নিজের জন্য যাহা করি, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহা করি, তাহাই স্বার্থসম্ভূত কর্ম্ম। অন্যের কল্যাণের জন্য যাহা করি, তাহা পরার্থ-সম্ভূত কর্ম্ম। পরার্থসম্ভূত কর্ম্মের বিশ্ব-জনীন গতি।

এই যে দুই প্রকার কর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, মানবজীবনের পক্ষে উভয়ই একান্ত আবশ্যক। একটীকে ছাড়িয়া আর একটী হয় না। স্বার্থপরতাকে অবশ্য ঘৃণা করি। উহা নীচ প্রকৃতির লক্ষণ। কিন্তু স্বার্থপরতা ও স্বার্থসম্ভূত কর্ম্ম, এ উভয় এক শ্রেণীভুক্ত নহে। আমাদের পক্ষে স্বার্থ ও পরার্থ, উভয়ই আবশ্যক। আমাদের জীবন রক্ষার পক্ষে স্বার্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। আর আমাদের উন্নতির পক্ষে উভয়ই একান্ত আবশ্যক।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর দুই প্রকার গতি। কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবর্জ্জনী। একটী দ্বারা সূর্য্য ইহাকে আপনার দিকে টানি-তেছে। আর একটী দ্বারা ইহা আপনার সম্মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুই প্রকার গতিই পৃথিবীর পক্ষে একান্ত আব-শ্যক। পৃথিবী আপনার শক্তিতে সম্মুখের দিকে দৌড়িতেছে। কেহ যদি তাহাকে টানিয়া না রাখিত, তাহা হইলে সে, সৌর-জগৎ হইতে পলাইয়া গিয়া, অসীম শূন্যে কোথায় চলিয়া গিয়া নষ্ট হইত, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইত না। সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সূর্য্য সর্ব্বদা পৃথিবীকে টানিয়া রাখিতেছে। সেই জন্য সূর্য্যের আকর্ষণ পৃথিবীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কেন্দ্রাভিমুখী গতি আবশ্যক। আবার কেন্দ্রবর্জ্জনী গতি, অর্থাৎ যে শক্তিতে সূর্য্যকে ছাড়িয়া পৃথিবী সম্মুখের দিকে দৌড়িয়া যাইতে চায়, তাহাও অত্যাবশ্যক। ঐ কেন্দ্রবর্জ্জনী গতি না থাকিলে পৃথিবী সূর্য্যের মধ্যে গিয়া পড়িত ও বিনষ্ট হইয়া যাইত। এই দুই প্রকার গতির মিলিত ক্রিয়া, পৃথি-বীকে দুই দিকে, বিনাশ হইতে রক্ষা করি-তেছে; এবং ইহাকে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে উহার আপনার পথে পরিচালিত করিতেছে।

পৃথিবীর পক্ষে যেমন এই দুই প্রকার শক্তি, মানব জীবনের পক্ষে, সেইরূপ স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থ না থাকিলে মানুষ আত্ম-রক্ষা করিতে পারিত না। স্বার্থ, মানুষের পক্ষে কেন্দ্রাভিমুখী গতি; এবং পরার্থ না থাকিলে, সে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারিত না। পরার্থ, মানুষের পক্ষে, কেন্দ্র-বর্জ্জনী গতি। স্বার্থ ও পরার্থ, এই উভয়ের মিলিত ক্রিয়া মনুষ্যকে রক্ষা করে, ও তাঁহাকে তাহার প্রকৃত পথে পরিচালিত করে।

আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্মশাস্ত্র সকলে, কর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চতম উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় কর্ম্মসাধন সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ রহিয়াছে, তাহা কি উচ্চ! কি চমৎকার!

কিন্তু এ স্থলে একটী প্রশ্ন এই যে, গীতার উপদিষ্ট কর্ম্ম স্বার্থসম্ভূত, কি পরার্থ-সম্ভূত। স্বার্থসম্ভূত কর্ম্ম বলিলেই যে, শারীরিক ও সংসারিক নিকৃষ্ট কর্ম্ম বুঝায়, এমন নহে। মানুষের আধ্যাত্মিক স্বার্থও আছে। আমি নিজে কেমন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিব, এই চিন্তাপ্রসূত যে কিছু চেষ্টা ও কর্ম্ম সকলই আধ্যাত্মিক স্বার্থপ্রসূত।

গীতার উপদিষ্ট কর্ম্ম, কি সেইরূপ আধ্যাত্মিক স্বার্থসম্ভূত? ব্যক্তিগত মুক্তিই কি গীতার কর্ম্মসাধনের লক্ষ্য? গীতার কোন কোন শ্লোক পাঠ করিলে পাঠকের মনে এরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতে পারে যে, গীতাকারের অভিপ্রায় এই যে, সাধক জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া নির্জ্জনে সুগভীর ধ্যান মগ্ন হইয়া কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের কয়েকটা শ্লোকে এই প্রকার নির্জ্জন ধ্যানের উপদেশ আছে।

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তোধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষযাংস্ত্যক্ত্বা রাগ দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ বিরহিত হইবে। বাক্য, কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ (যোগের প্রতিবন্ধক পদার্থ সংগ্রহ চেষ্টা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে; এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না।

এই সকল শ্লোকে গীতাকার নির্জ্জন ধ্যানের উপদেশ দিলেও, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, সাধক জনসমাজের হিতাহিত কার্য্যে ঔদাসিন্য অবলম্বন করিবেন। কেন না, দেখা যাইতেছে যে, পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিতেছেন। অন্যের জন্য জীবন দিতে হইবে বটে, কিন্তু আপনার আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিসর্জ্জন দিয়া নহে। পরার্থের মধ্যেই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক স্বার্থ বর্ত্তমান।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, গীতার মতানুসারে সাধন অবস্থায় কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। উহা প্রকৃত কথা বলিয়া মনে হয় না। কেননা, গীতার যিনি আদর্শপুরুষ, যিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া উপদেশ দিতেছেন, তিনিও জনসমাজের কার্য্যে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা বলিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কোন অভাব নাই। তথাচ আমি কর্ম্ম করিতেছি। কেননা, আমি কর্ম্ম না করিলে, অন্য লোকে কর্ম্ম করিবে না। তাহাদের তাহাতে অকল্যাণ হইবে। সেই জন্য আমি কর্ম্ম করিতেছি। ইহা দেখা যাইতেছে যে, গীতার আদর্শপুরুষের নিজের কোন অভাব না থাকিলেও, তিনি জীবের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গীতার অভিপ্রায়ানুসারে মুক্তাত্মাকেও কর্ম্ম করিতে হয়। তিনি জীবের কল্যাণের জন্য অনুকম্পা পরবশ হইয়া কর্ম্ম করেন।

ভক্তি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম, কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন উঠি-

তেছে। প্রকৃত কর্ম্ম কি, ও কি নয়? স্বার্থবুদ্ধি, সুখের ইচ্ছা, যশঃ মান, গৌরবের ইচ্ছায় যাহা হয়, তাহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। কোন ধনবান্ ব্যক্তি দুর্ভিক্ষে দশ হাজার টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য যদি হাঁ করিয়া বসিয়া থাকেন, অথবা সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা প্রকাশিত হইলে উহা বন্ধুগণের নিকট সাতবার পাঠ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার কর্ম্ম, প্রকৃত কর্ম্ম নহে।

স্বর্গসুখের ইচ্ছাতে যে কার্য্য হয়, তাহাও প্রকৃত কর্ম্ম নহে। এখানে মদ ছাড়িলে স্বর্গে গিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় শ্যামপেন পাইব, এখানে চরিত্র ভাল রাখিলে স্বর্গে গিয়া পরমা সুন্দরী অপ্সরা পাইব, এভাবে যদি কেহ জীবন কাটাইতে চান, তবে তাহা কখন প্রকৃত ধর্ম্মভাব নহে। অনেকের স্বর্গ, যেন এক ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবাবের বাগান। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে যেমন মানুষ, তাহার উপাস্য দেবতাও তেমন। সেইরূপ আবার ইহাও সত্য যে, যে যেমন মানুষ তাহার স্বর্গও তদনুরূপ। পৃথিবীর ময়লা স্বর্গে লইয়া গেলেই কি তাহার দুর্গন্ধ যায়?

নিষ্কাম কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত কর্ম্মণি।
গীতা। ২।৪৭।

কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয়, এবং কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হয়।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং।

এই সকল কর্ম্ম আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! এ নিশ্চিত উত্তম মত জানিবে।

ভগবদ্গীতার মতানুসারে ফল প্রত্যাশাবিহীন হইয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

নিষ্কাম কর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উহা তিন প্রকার। প্রথম, কিছু না ভাবিয়া, করিতে হয় করা বলিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা এক প্রকার নিষ্কাম কর্ম্ম। দ্বিতীয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম। তৃতীয়, ভগবদ্ভক্তি হইতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি, প্রভুর কার্য্য বলিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহা নিষ্কাম। প্রথম প্রকার কর্ম্ম হইতে দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। আর তৃতীয় প্রকার কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম।

ভগবদ্ভক্ত, ফলপ্রত্যাশা না করিয়া পরমেশ্বরে আপনার কর্ম্ম সমর্পণ করেন। পরব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎতত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্ যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সমাজিক, কি রাজনৈতিক পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য।

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভিন্ন প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। প্রেমের উচ্চ অবস্থায় পুণ্যবোধ লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে আছে যে, সাধক

ক্রমে ক্রমে পাপপুণ্যের অতীত হইয়া যান। পাপের অতীত হন, এ কথার তাৎপর্য্য সহজে বুঝা যায়। কিন্তু পুণ্যের অতীত হন, এ কথার অর্থ কি?

মা, সন্তানের সেবা করিয়া কি মনে করেন, পুণ্য করিলাম? কেন করেন না? এই জন্য যে, তিনি গাঢ় স্নেহে, উচ্চতম প্রেমে, সন্তানের সেবা করেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে একার্য্যে পুণ্যবোধ অসম্ভব। কালান্তক যমোপম বিষধর, শিশুকে দংশন করিতে আসিতেছে। দৌড়িয়া আসিয়া মা সর্পের পথরোধ করিলেন। সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে মা বলিলেন,—"আমি মরি, তাহাতে দুঃখ নাই; আমার বাছা তো বাঁচিল!" এই যে নিষ্কাম ভালবাসায় মা আপনার জীবন দিলেন, ইহাতে কি পুণ্য-বোধ সম্ভব হইতে পারে? আমি শিশুর জন্য প্রাণ দিলাম, অতএব আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবে, এরূপ সকাম চিন্তা কি কখন তাঁহার মনে আসিতে পারে? পতিপ্রাণা স্বাধ্বী-সতী স্বামীর কল্যাণের জন্য শত প্রকার স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট বহন করিতে পারেন ও করেন। কিন্তু তিনি কি পরকালে সুখ-সম্ভোগ করিবার আশায় উহা করিয়া থাকেন? প্রগাঢ় প্রেমে সুখলালসা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি উভয়ই ডুবিয়া যায়। পুণ্যবোধ লুপ্ত হয়। প্রেমের জন্যই প্রেমিক প্রেমাস্পদের সেবা করেন।

কেবল তর্কে এ সকল কথা বুঝান যায় না। স্বার্থ-পরতায় যাহার হৃদয় পূর্ণ, সে নিষ্কাম কর্ম্মের বিষয় কি বুঝিবে? "এক পয়সা যার মা বাপ" সে পাপ-পুণ্যের অতীত অবস্থার বিষয় কি বুঝিবে?

উচ্চ অবস্থায় পুণ্যবোধ লোপ হয়। ধর্ম্ম তখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বিজ্ঞা-নের ভাষায় বলিতে গেলে, ধর্ম্ম তখন organised হইয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। শিশু কেমন সুন্দর! কেমন সরল! কেমন পবিত্র! সেই জন্য লোকে শিশু দেখিলেই কত ভালবাসে! কিন্তু শিশু কি নিজে জানে যে, সে কত সুন্দর, কেমন সরল ও পবিত্র? কিছুই জানেনা। জানেনা বলিয়াই শিশু জীবনের এত মাধুর্য্য!

শিশু যেমন, সাধুও সেইরূপ। সাধু আপনাকে কখন সাধু বলিয়া মনে করেন না। যে আপনাকে সাধু বলিয়া মনে করে, সে কখন প্রকৃত সাধু নহে। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি বড় ভাল, সে কখন যথার্থ ভাল নয়। যিনি যথার্থ ভাল, তিনি কখন আপনাকে ভাল বলিয়া মনে করেন না। বলা যাইতে পারে যে, ঐ শিশুর ন্যায় তাঁহার এক প্রকার Self consciousness থাকে না। সাধু আপনার সাধুতা দেখিতে পান না। অন্যের সদ্‌গুণ দেখিবার পক্ষে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিজের সদ্‌গুণ সম্বন্ধে তিনি অন্ধ। মানুষ যত উন্নতি পথে অগ্রসর হয়, ধর্ম্ম ততই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও প্রকৃতিগত হইয়া যায়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে পুণ্যবোধ লুপ্ত হয়। অন্য লোকে তাঁহার যে কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করে, তিনি তাহাতে প্রশংসাযোগ্য কিছুই দেখিতে পান না। কেন না, উহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া গিয়াছে। আর পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম যত বৃদ্ধি হয়, প্রেমে

পুণ্যবোধ ডুবিয়া যায়। এই অবস্থার যে কর্ম্ম, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিন ভিন্ন অথচ এক। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে, এই তিনের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ। যে জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ নাই, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। ঐ সুন্দর গোলাব কুসুমটীকে দেখিয়া যে মুগ্ধ হইল না, যে উহার সৌন্দর্য্য দেখিল না, কেবল উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বর্ণ দেখিল, বাস্তবিক, কি তাহার গোলাব দেখা হইল? গোলাবকে সেই প্রকৃত ভাবে দেখে, যে কেবল চক্ষু দিয়া গোলাব দেখে না। চক্ষু ও হৃদয় উভয়ের যোগে উহাকে প্রকৃত ভাবে দেখা হয়।

সেইরূপ ধর্ম্মকে, ঈশ্বরকে কেবল বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, এমন নহে। জ্ঞান ও হৃদয়, জ্ঞান ও ভক্তির যোগ ভিন্ন প্রকৃত ভাবে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে জানা যায় না। কেবল কর্ণের দ্বারা সঙ্গীতের জ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ শক্তি ও হৃদয় উভয়ই আবশ্যক। সঙ্গীতের শব্দ শুনিলেই সঙ্গীত শুনা হয় না। উহার মাধুর্য্য অনুভব করা চাই। সেইরূপ, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের যোগ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তিতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। ভক্তিকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম হয় না। আবার নিজে ভক্ত হওয়া ভিন্ন, হৃদয়-রসনায় ভক্তিরস পান করা ভিন্ন ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির যোগ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় না।

জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ ভিন্ন যেমন প্রকৃত জ্ঞান হয় না, সেইরূপ আবার ভক্তির সহিত জ্ঞানের যোগ ব্যতীত প্রকৃত ভক্তিলাভ হয় না। কিন্তু এই শেষোক্ত বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তাহার পর কর্ম্ম। জ্ঞানের সহিত ভক্তির যোগ না থাকিলে উহা যেমন প্রকৃত ভক্তি নহে, সেইরূপ, আবার কর্ম্মের সহিত ভক্তির যোগ না থাকিলে উহা প্রকৃত ভক্তি নহে। যাহাকে জানি না, তাহাকে কেমন করিয়া ভক্তি করিব? সুতরাং জ্ঞান মূলে। আবার যাহাকে ভক্তি করি, তাহার সেবা না করিয়া কি থাকিতে পারি? যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে, সে স্বভাবতঃ তাহার সেবা করিতে ভালবাসে। না করিয়া থাকিতে পারে না।

এখন দেখুন, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম বা সেবা, এই তিনের মধ্যে কেমন নিগূঢ় সম্বন্ধ। একটীকে ছাড়িয়া আর একটী নহে। কর্ম্ম আর সেবা একই কথা। জীবের কল্যাণের জন্য যাহা কিছু করি, তাহাকে কর্ম্ম না বলিয়া ভক্তজন, সেবা বলেন।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এই তিনের মধ্যে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই তিন, ভিন্ন অথচ এক। ঐ বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। উহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, সকলই ভিন্ন অথচ এক। এক কেন? একটীকে ছাড়িয়া আর একটী নয়। মূল হইতে সমগ্র বৃক্ষে, পত্র, পুষ্প, ফল পর্য্যন্ত সমুদয় অংশেই এক জীবনী শক্তি সঞ্চারিত। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সমগ্র বৃক্ষটী one organic whole.

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ। উহা, জ্ঞান, ভক্তি, সেবা এই তিনে মিলিয়া one organic whole. জ্ঞানভক্তিরূপ স্বর্গীয়

মহা বৃক্ষে, সেবারূপ অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। এই সেবারূপ ধর্ম্মকেই আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে সনাতন ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

"যোনোপায়েন দেবেশি লোকঃশ্রেয়ঃ সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যংব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মঃ সনাতনং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন ;—

হে দেবেশি! যে উপায়ে লোকের হিত হয়, তাহাই ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

এই যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, ইহাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

হে পরমেশ্বর! হে করুণাময়! হে জ্ঞানদাতা, ভক্তিদাতা প্রভো! তুমি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর কর। হে জ্ঞান-সূর্য্য! তুমি আমাদের চিদাকাশে প্রকাশ হও। তোমার প্রকাশে আমাদের মোহ, কুসংস্কার, ভ্রান্তি সকলই বিদূরিত হউক। হে জ্ঞানময়! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা অন্ধ। তুমিই অন্ধকে চক্ষু দিতে পার। তোমার কৃপায় চক্ষুলাভ করিয়া জীব তোমাকে দর্শন করে। তোমাকে দেখে, আর তোমার অধ্যাত্মরাজ্য দেখে। যে কেবল দৈঘ্য, প্রস্থ, বেধ বর্ণ দেখিল, সে অন্ধ নয় তো অন্ধ কে? যে কেবল পার্থিব শব্দ শুনিল, সে বধির নয় তো বধির কে? তুমি আমাদিগকে সেই চক্ষু দেও, যাহাতে তোমাকে দেখা যায়, তোমার সত্যরাজ্য দেখা যায়। তুমি আমাদিগকে সেই কর্ণ দেও, যাহাতে তোমার মধুর বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়। জ্ঞানচক্ষুতে তোমাকে দেখিব, জ্ঞানের কর্ণে তোমার কথা শুনিব। ভক্তিদাতা! ভক্তি দেও। তোমাকে দেখিব, আর তোমার শ্রীচরণে প্রেম ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জন্ম জীবন সফল করিব। আর হে প্রভো! আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার দাস দাসী করিয়া লও। তোমার পদসেবায় আমাদের জীবন কাটিয়া যাউক। তোমার পুত্র কন্যাদের সেবাই তোমার সেবা। তাহাদের সঙ্গে তুমি এক। হে প্রভো! সকল নরনারীকে, তোমার সন্তান, আমার প্রভুর সন্তান জানিয়া, তাঁহাদের মধ্যে তোমাকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, দাসানুদাস হইয়া যেন আমরণ তাঁহাদের চরণসেবা করিতে পারি। আমাদিগকে তোমার প্রকৃত সেবক করিয়া লও। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সেবক হইবার মহা সৌভাগ্য প্রদান কর।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আহ্বান।

(১)

আমি মায়াময়ী মহামায়া জগত-জননী।
সংসারের খেলা ফেলে
কোলে আয় শিশু ছেলে ;
আমি মাতা, আমি শিশু তোর, এস যাদুমণি।
আয়রে অঞ্চলে ঢাকি ;
আমি তোর বুকে থাকি ;
আমি ক্ষুধা, আমি সুধা তোর, সুপ্তি জাগরণ।
আমি তোর সুখ হাসি,
আমি তোর অশ্রু রাশি,
আমি খেলা, আমিই খেলনা, আমি ভাই বোন।
সখা, সখী, বন্ধু আমি,
আমি পত্নী, আমি স্বামী,
চুম্বনে কম্পন-সুখ আমি, প্রেমে আলিঙ্গন

আমি দীপ্তি, আমি আশা,
আমি তোর ভালবাসা,
বিরহের দীর্ঘশ্বাস আমি, যাতনা, বেদন ।২
আমিরে নয়নে ভ্রান্তি,
আমি শোক, আমি ক্লান্তি,
আমিরে স্বরগ আশা, নরক ভীষণ।
আমি শূন্য, আমি কায়া,
আমি তাপ, আমি ছায়া;
আমি শৈশব, যৌবন, জরা, জীবন, মরণ।৩

(২)

চেয়ে দেখ, কি মোহন-রূপে আমি সেজেছি!
অরুণ রঞ্জিত জলে,
বিকশিত ফুল দলে,
নব জল-ধর-ধারে আজি আমি এসেছি।
হের স্বচ্ছ নীলাকাশে
আমার মূরতি ভাসে।
উছলি, সরিত-জলে নাচিতেছি ছুটিয়া।
দেখ মোর কত শোভা
গিরিশিরে মনলোভা;
তুষার ধবল কান্তি লয়ে আছি ফুটিয়া।
এসগো মানবগণ
কর মোরে আলিঙ্গন;
এত রূপ কোথা পাবে? ভালবাস আমারে।
ভালবাস, দেও প্রাণ;
দেও যা করেছি দান;
ফিরে দাও যে জীবন দিয়াছিনু তোমারে।
দাও ফুল—প্রফুল্লতা,
শ্যামল জীবন-লতা;
সঁপ আসি কর্ম্মফল আজি মোর চরণে;
পাপ, তাপ, পুণ্য, শান্তি,
দেও গো উৎসাহ, ক্লান্তি;
জীবন ফিরায়ে দাও আলিঙ্গিয়া মরণে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মাভৈঃ মাভৈঃ।

(১)

গ্যাস্ থেকে জল হয়, বলে যখন কেমিষ্ট্রি,
পরিষ্কার বোঝা গেল সৃষ্টির যত মিষ্ট্রি।
বোঝা গেল পরমেশ্বর নিতান্তই ফক্কা;
ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে পাবেই পাবে অক্কা।
তীর্থগুলো ব্যর্থ হল, কেউ না রাখে তক্কা;
বারাণসী বুদ্ধগয়া, পেলেষ্টিন্ ও মক্কা।
যায়রে ধর্ম্ম! কিন্তু চর্ম্মচক্ষে সবাই চেয়ে দ্যাখ,
বিষ্ণুর অংশ পরমহংস কচ্চে কত প্যাঁকপ্যাঁক।
মাভৈঃমাভৈঃ অনাডোবায় বাড়ছে ওঁদের গুষ্টি;
ইংরাজীতে তর্জমায় ভেরিটেবল গুস্টি'।

(২)

দেশের নীতি মন্দ অতি, ছেলেগুলি দুষ্ট;
বুক্‌ঠুকে বেড়ায় সুখে, চুরুট মুখে পষ্ট।
গৌরাঙ্গ হেরে অঙ্গ বাঁকায় নাক মোটে;
দলে দলে টাউনহলে হল্লাকোরে জোটে।
ইন্সিপয়র বাংলা বই করে ঘরে জমা;
থাক্‌তে দেশে চমৎকার বাইবেলের তর্জমা।
ছেলে দুষ্ট, যুবা নষ্ট, একি মহাপাপ!
ঠিক্ বলেছে গণকঠাকুর, কলিরই প্রতাপ।
মাভৈঃ মাভৈঃ ওয়েলডন্ চিন্তা কচ্চেন গতি;
নিদেন কথা, হিদেন্ ছেলের সুধরে যাবে নীতি।

(৩)

উড়ে গেল বর্ষা বাদল, পুড়ে গেল ধান;
নাহি অন্ন অবসন্ন হচ্চে জীবের প্রাণ।
ছিল পৈতৃক ম্যালেরিয়া, প্লেগটা স্বোপার্জিত,
দুটোয় মিলে চুলোয় দিলে সুখশান্তি যত।
এত টীকে, তবু টি'কে রইল রোগের মূল;
কেমনে ভাই বাঁচি প্রাণে পাইনে ভেবে কূল।
কিন্তু দেশে খ্রীষ্টমাসে দেখছনা কি মজা ভাই;
বছর বছর, কেঁচর মেচর কচ্চে দেশের কত চাঁই।
মাভৈঃ মাভৈঃ কংগেরেসে হাঁসিল কোরে দাবি,
পোক্তা যত বক্তা বাবু, কর্ম্মে কাবু সবি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অগ্রগামী।

পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়কে লোকে ম্লেচ্ছ বলিত, পরে তাঁহাকে সমাজ, দেশ ও ধর্ম্ম-সংস্কারক মহাপুরুষ বলিল। এমন দিন আসিবে, যে দিন হিন্দুসমাজ তাঁহাকে অগ্রগামী হিন্দুভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিবে। সে দিন সমাজ-সংস্কার-সমিতিতে (Social Conference) যাহা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্য সমাজ আর বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না, অগ্রগামী হিন্দুসমাজ বলিয়াই গৃহীত হইবে। আর ধর্ম্মলোপকারী ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করা হইবে না। সেনাপতি অগ্রে গিয়া শত্রু শিবিরে বিজয় পতাকা উত্থিত করিলেন, পরে সৈন্যগণ মধ্যে সর্ব্বনিম্ন লোকও তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। মহাত্মা সক্রেটিস যে সমস্ত সত্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সমস্ত সত্য আজি জগৎবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। ইউক্লিডের গবেষণা আজি স্কুলের বালক পর্য্যন্ত পোঁছিয়াছে, নিউটনের আবিষ্ক্রিয়া আজি কুলি, মজুর পর্য্যন্ত অবগত। সুতরাং প্রথম পথপ্রদর্শকগণ ভিন্ন জাতীয় নহে, অগ্রগামী মাত্র।

প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না, তাই লোকে নূতন-তত্ত্ব-আবিষ্কারককে ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, ভণ্ড, বিজাতীয়, বিধর্ম্মী বলিয়া তিরস্কার করে, পরে তাঁহাকে ভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সাধু বলে, অবশেষে কালে তাঁহারা অগ্রগামী পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচিত হয়েন। যুগে যুগে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সাধারণ লোকে নূতন আবিষ্কার দেখিয়া প্রথমে মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত, পরে প্রশংসাকারী—অবশেষে পশ্চাদ্গামী শিষ্য হয়। তখন জনসাধারণ বা গড্ডালিকা-প্রবাহই পশ্চাদ্গামী ও উক্ত মহাত্মাগণ অগ্রগামী হয়েন। পূর্ব্বে শাক্যসিংহকে যাহারা বেদ ও যজ্ঞলোপকারী, পাষণ্ডদলের নেতা বলিত, তাহাদের পরপুরুষেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে জাতিনাশক, ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন বিজাতীয় ধর্ম্ম বলিত, ক্রমে হৃদয়ে হৃদয়ে তাহারা বুঝিল, ধর্ম্মভাব বিকাশ হইলে এ ভাব আসিবেই, সুতরাং তাহাকে অগ্রগামী ভিন্ন আর কিছু বলিল না। আজি সমাজ বিলাত-ফেরতদিগকে গ্রহণে প্রস্তুত, পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই তাহারা আজি জাতিনাশা নহে, অগ্রগামী হিন্দু মাত্র। বিধবা বিবাহের জন্য মহাত্মা বিদ্যাসাগর কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বক্রভাবে কতই না দুঃখিত হইয়াছিলেন! গালাগালি তাহার অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল, আজি সমগ্র হিন্দুসমাজ তাহা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিল। আজি আর মহাত্মা বিদ্যাসাগর পাষণ্ডবিপ্লবকারী নহেন, আজি তিনি অগ্রগামী মহাপুরুষ।

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার ন্যায় লোকের প্রিয়বস্তু আর নাই। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লোক বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু যখন স্ত্রীশিক্ষা প্রথমে এদেশে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন গুপ্ত কবি গাইয়াছিলেন,—

"এরা সব এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল
কবেই কবে।"

যে মহাত্মা বিডন স্ত্রীশিক্ষার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাঁহাকেও এক পত্রিকা উপহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"বেথুন তোমার অধিকার, জন্মের মত হল বঙ্গের,
অঙ্গের অলঙ্কার।"

এই উপহাস প্রকৃত আশীর্ব্বাদে পরিণত হইয়াছে, কারণ বেথুন কলেজ ও বেথুন সোসাইটী বঙ্গের অঙ্গের অলঙ্কার সন্দেহ নাই। সুতরাং বেথুন ও তাঁহার সহযোগী বাঙ্গালিগণ দেশের শত্রু নহেন, অগ্রগামী।

মানব সমাজ এইরূপেই চলিয়া থাকে। অতি ধীরে ধীরে, অতি সতর্কভাবে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মানব অগ্রসর হয়, তন্মধ্যে উন্নতচেতা, মনীষা-সম্পন্ন সাহসী তেজস্বীগণ অজ্ঞাত সাগরে দীর্ঘ ঝম্প (Big jump in the unknown) প্রদান করেন, পরে সে অজ্ঞাত সাগর আর অজ্ঞেয় থাকে না, আয়ত্ব হইয়া আইসে। এবং সেই মহাত্মাগণের উল্লম্ফন ক্রিয়াও আর পবন-নন্দনের অনুকরণ বলিয়া বোধ হয় না, তাহা সেতুবন্ধ পথে অগ্রসর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কটকের গন্তব্য হইয়া উঠে। এস্থলে উক্ত উল্লম্ফনকারী মহাত্মাগণ কেবল অগ্রগামী মাত্র। সাধারণ লোকে নাসিকার বাহিরে দেখে না, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দূরে অগ্রসর হইতে চায় না। একটু অগ্রসর হইবে বলিলেই মনে করে, ঐ বুঝি প্রচ্ছন্ন কূপে পতিত হইলাম। এইরূপে অদূরদর্শী অনগ্রগামীগণ শত শত পাপাচারে জর্জ্জরিত হইতে থাকে; কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে। তখন এক তেজস্বী পুরুষের হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠে। তখনই তাহার শরীরে অসাধারণ বল, ঈশ্বরের প্রেরণা আগমন করে, আর তাহারা বিপদকে বিপদ, বাধা বিঘ্নকে বাধা বলিয়া মনে করে না, হুহুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হয়। ২।১ জন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। ২।৪ জন কতক দূর অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া পড়ে, নিজের দুর্ব্বলতায়, সমগ্র সমাজ "সর্ব্বনাশ হইল সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। চাহিয়া দেখ, সেই মহাত্মা গন্তব্য পথে কতদূর গিয়া পড়িয়াছেন, আবার দেখ, তিনি একা নহেন, ভূত কালের মহাত্মাগণ তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে, দেশ-বিদেশের সাধু সাধ্বীগণ তাঁহাদের সহিত হস্তশৃঙ্খলে চলিতেছেন। গণ্ডীর বাহির হইলেই সার্ব্বভৌমিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায়। ঈশা, মুশা, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, কনফুসস্ তাঁহাদের সহগামী হইলেন। অমনি ভীরু কুসংস্কারাপন্ন সমাজ একটু একটু, অর্থাৎ যে টুকু ঐ দৃঢ় শৃঙ্খলার আকর্ষণে নড়িল, ততটুকু অগ্রসর হইল, সমগ্র সমাজ-দেহকে টানিল, সকল বলের সংহতি আবার কার্য্য করিল, সমাজ-দেহ চলিতে লাগিল, অবশেষে চাহিয়া দেখ, সে মহাত্মা আর দূরে নহেন, অগ্রগামী।

মানব সমাজ শক্তিহীন, নানা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, অগ্রগামীগণ এঞ্জিন, যখন জুড়িয়া দিবে, প্রথমে এঞ্জিনের ভিতরে ঈশ্বর প্রেরণার অতুল বল আবির্ভূত হইবে; হঠাৎ এঞ্জিনখানা নড়িয়া উঠিল, ঝনাৎ করিয়া শেষের গাড়ীখানি পর্য্যন্ত যেন একটু বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চারিত হইল। কেহ বলিতেছিল, যায় না, কেহ বলে কি প্রকারে যাইবে, কেহ বলেন, শৃঙ্খলিত, চরণ চলে না, এঞ্জিন চলিল, ঝন ঝন ঝনাৎ, যেতে হবে চল। সকলের মোহ-নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, যে বলিল পারি না, তাহারও কাণে বিষম টান লাগিল।

শেষে বলিল, আঃ যাইবে, তবে চল। এই-রূপে শৃঙ্খলিত সমাজে গতি আরম্ভ হইল, ধীরে ধীরে চলিল, কেহ বলিল, কি অন্যায়, কেহ বলে ধীরে চল, কেহ বলিল, ছি ছেড়ে দেও, এঞ্জিন বলিল, কড়াকড় ঝনাৎ, "ছাড়িতে পারি না, ভাই সকল সঙ্গে চল," ক্রমে মহাগতির সঞ্চার হইল। এ মহাত্মা বৃহৎ সমাজটীকে লইয়া কতদূরে অগ্রসর হইলেন। তখন পশ্চাতের গাঁড়ীগুলি দেখিল, এঞ্জিন অগ্রগামী।

কিন্তু জগতের ইতিহাসে এক মহাপুরুষের আগ্নেয় তেজে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, শীঘ্রই সেই অগ্নি মন্দীভূত হইল, সকলের ভার একজনে আর কতক্ষণ কুলাইবে, সুতরাং বহু কার্য্য সাধন করিয়া মহাত্মা অকালে কালবক্ষে নিপতিত হইলেন। সমাজ-যন্ত্রের সে এঞ্জিনখানা অকালে নির্ব্বাপিত হইল। গতি হঠাৎ থামিয়া গেল। যাহারা চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে যাহাদের অধিক টান লাগিয়াছিল, Elastic recoil বা প্রতিক্রিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ঝনাৎ করিয়া কতকটা পিছাইয়া দিল। তাহারা পূর্ব্বেই ভাবিতেছিল, আমরা আর যাইব কেন? আঃ অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, চল প্রিয় বাসভূমে অর্থাৎ সেই অজ্ঞানের রাজ্যে যাই। ইনি কে যে ইহার সঙ্গে যাইব? Reaction is the resentment of people against reform. প্রতিক্রিয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রোধ, সেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। এই রূপে আবার সমাজের পশ্চাতের লোকেরা পশ্চাদগামী হইয়া পড়িল। আবার উক্ত পশ্চাদগামী দল আসিয়া সুর ধরিল, তাহাদেরও নেতা জুটিল, দুই চারি দিন আবার ছত্রভঙ্গ দিল। সমাজ দেহ অসাড় নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল।

কিন্তু সত্যের শক্তি অবিনশ্বর, মহাপুরুষের ভিতরকার ঈশ্বরের প্রেরণা তাহার নিজস্ব নহে, সুতরাং মৃত্যু বা তিরোভাবের সহিত তাহার ঈশ্বর-প্রেরণা তিরোহিত হইল না। দেখ এঞ্জিনখানা পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু ঘরে ঘরে তাহার অগ্নি জ্বলিল। হৃদয়ে হৃদয়ে কেশব রামমোহন বিরাজ করিতে লাগিল। হৃদয়ে হৃদয়ে ক্ষুদ্র এঞ্জিন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। বাকী রহিল, একটী টান মাত্র, সম্মিলিত সমাজ সেই কাজ করিল, পরে অপ্রতিহত তেজে সমাজ-দেহ নিয়তির দিকে চলিতে লাগিল। চাহিয়া দেখ, সে দিন আসিয়াছে। আজি অগ্রগামী রামমোহন ও কেশবচন্দ্র ম্লেচ্ছ বা ধর্ম্মত্যাগী নহেন, অগ্রগামী ভ্রাতা। এক্ষণে মনে হয়, এ সকল ত আমরা সকলেই জানিতাম, কেবল মুখে বলি নাই, এই মাত্র।

ভাই বাঙ্গালী, চাহিয়া দেখ, সুদিন আসিয়াছে, সুপবন বহিতেছে, সমগ্রজাতি আজি অগ্রগামী কেশব ও রামমোহনকে চিনিয়াছে। এক্ষণে আর বিলম্ব নাই, গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। বাঙ্গালী চরিত্রের এ কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই, আমরা এ পর্য্যন্ত অগ্রগামী ভ্রাতাদের সহিত বড় কুব্যবহার করিয়াছি। আমাদের রামমোহন দেশত্যাগী হইয়া যখন বিদেশে সেই অমূল্য জীবনরত্ন বিসর্জ্জন দিলেন, সেদিন তোমরা এক বিন্দু অশ্রুও ফেল নাই, এ লজ্জা অসহনীয়। বিদ্যাসাগর, কেশবকে তোমরা যত গালি দিয়াছ, বোধ হয় অন্য কোন জীবিত লোক এত গালি সহ্য করেন নাই। আজি ভগবানের বিধানে তোমাদের গালির পাত্র

অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা অগ্নি ঘরে ঘরে জ্বলিতেছে। আর স্বভাবের গতিরোধ করিও না। অগ্রসর হও, সুপবনে জাতীয় তরণী ছাড়িয়া দেও. অধঃপতন অনেক হইয়াছে, আর নয়, চল আমরা অধিকাংশের পরমোন্নতির দিকে অগ্রসর হই। The greatest good to the greatest member. আর আমাদিগের নেতাদিগকে বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ না বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্থানে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাই, মুক্তকণ্ঠে বলি, আমাদের অগ্রগামী হিন্দু ভ্রাতা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বুয়র যুদ্ধ।

দ্বিতীয় উপায়।

মানুষ যতই উদার এবং সাধুপ্রকৃতির হউক না কেন, স্থাপিত অধিকার এবং পরিচালিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা বোধ করিলে,তাঁহার আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ইচ্ছা স্বভাবকে সঙ্কুচিত এবং উত্তেজিত করে। ইংরেজ ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধে পরাজিত এবং অপমানিত হইয়াও উদার ভাবে বুয়র জাতিকে স্বতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রদান করেন, তারপর ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে তাহাদিগকে স্বতন্ত্রতা আরো পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত অতীব দুর্ল্লভ, অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং উদারনীতির প্রসব। ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য, ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের সন্ধির পর, অতি সামান্য একটী বিষয়ে মাত্র ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল,—ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত বিদেশীয় কোন রাজ্যের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মাত্র ছিল না। বুয়রগণ, এই সামান্য বিষয়ে তাঁহাদিগের শক্তি সঙ্কুচিত দেখিয়া, পূর্ব্বে ক্ষুণ্ণ ছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু শ্বেতকায় রাজন্যবর্গ, জগতে শান্তি বিধানের নিমিত্ত, বুয়র যুদ্ধের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রুস্ সম্রাটের আহ্বানে যে একত্র সমবেত হন, এবং যে শান্তি-সমিতির অধিবেশনের অতি অল্পকাল পরেই চীন-যুদ্ধে এবং বুয়র-যুদ্ধে শান্তি স্থাপন-বাসনার জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া গেল, সেই সমিতিতে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের প্রতিনিধি গৃহীত হইল না। ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ইয়ুরোপের রাজন্যবর্গ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। এই ঘটনায় বুয়রের প্রাণ অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

অসন্তুষ্ট ইংরেজ উইটল্যাণ্ডারগণও জানিতেন যে, বুয়র আর যাহা কিছু করুক না কেন, তাহাতে ইংলণ্ড উত্তেজিত হইবেন না; কিন্তু বুয়র যদি ইংলণ্ডের রাজকীয় শক্তির অধীনতা অস্বীকার করে, তাহা হইলে, ইংলণ্ডকে উত্তেজিত করা অতি সহজসাধ্য। ইংরেজের প্রাণে যদি একমাত্র বিশ্বাস হয় যে, বুয়র ইংরেজের প্রাধান্যে ক্ষুণ্ণ, তবে বুয়রের সমস্ত কার্য্যই যে ইংরেজবিরোধী, এ কথা ইংরেজের প্রাণে সহজেই প্রতীয়মান হইবে, উইট্‌ল্যাণ্ডার এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের সেক্রেটরী রিজ সাহেব ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ১৭ মে তারিখের চিঠীতে উইট্‌ল্যাণ্ডারের বাঞ্ছনীয় এই শুভ মুহূর্ত্ত উদ্ভাবিত করিলেন। ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিতর্কিত কয়েকটী বিষয় সালিসের বিচারে অর্পণের নিমিত্ত ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্য প্রস্তাব করেন। চেম্বারলেন্ সাহেব তদুত্তরে বলেন যে, সাম্রাজ্ঞীয় শক্তির সহিত তদধীন সামন্ত শক্তির কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে, তাহা সালিসিতে মাসাংসার্থ অর্পিত হইতে পারে না। এই তর্কের উত্তরে রিজ সাহেব বলেন যে, ট্রান্সভয়াল রাজ্য, সামন্ত রাজ্য নহে, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র রাজ্য।

উইট্‌ল্যাণ্ডার যে শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই শুভক্ষণ উল্লিখিত রূপে ঘটিল। ইংরেজের প্রাণ এই কথায় উত্তেজিত হইল। উইট্‌ল্যাণ্ডার এই সুযোগে ইংলণ্ডবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং অধিকাংশকে বুঝাইতে কৃতকার্য্যও

হইলেন যে, ১৮৮১ খ্রীঃ অঃ হইতে বুয়রের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত নীতি ইংরেজ-বিরোধী,—ইংলণ্ডকে আফ্রিকা হইতে তাড়িত এবং বিদূরিত করাই, বুয়রের একমাত্র লক্ষ্য।

ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজ পতাকা জগতের সমস্ত স্থানে উড্ডীন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বুয়রের বিরুদ্ধে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, বাগ্মী, ভাস্কর, কবি, নাট্যকর, যে কোন ব্যবসায়ে যে কেহ ব্রতী, সকলেই বুয়রের কার্য্য নিজ নিজ অভিপ্রেত ভাবে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত, চিত্রিত এবং বর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বুয়র যে কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র গ্রন্থনসূত্র অবধারিত হইল। স্থির-বুদ্ধি পাঠক মহাশয়ের সমক্ষে আমরা তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলে, দুই একটী দেখিয়া তিনি হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; একদেশদর্শী ইংরেজ-দল সেই সমস্ত কার্য্যের যেরূপ অর্থ করেন, তাঁহার নিকট হয়ত তাহার অনেক কার্য্য ভিন্নার্থবোধক বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু বুয়রের সময়ের ফেরে এবং কৌশলের অভাবে, তাহার কার্য্য অনেক বুদ্ধিমান ইংরেজও কেবল মাত্র বিদ্বেষ পরবশতার ফল বলিয়া অবধারণ করিলেন। আমরা তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত মাত্র নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করা অসম্ভব, সুতরাং আশা করি, পাঠক মহাশয় তজ্জনিত ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

(১) ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ট্রান্সভয়াল রাজ্য ব্রিটিস সাম্রাজ্যভুক্ত করার পর, ইংলণ্ড এবং আফ্রিকানিবাসী অনেক সদাশয় ইংরেজ ইংলণ্ডের এই কার্য্যকে অতি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন; এবং ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে আফ্রিকা-নিবাসী অনেক ইংরেজের প্রাণে এইরূপ ভাব সমুদিত হয় যে, যে সমস্ত শ্বেতকায় ব্যক্তি আফ্রিকাকে তাহাদিগের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আফ্রিকার নিয়তি তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত। এই মত প্রচার এবং এই উদ্দেশ্যে একটী সমিতির সৃষ্টি হইল, এই সমিতি আফ্রিকাণ্ডার বণ্ড্ নামক আখ্যা ধারণ করিলেন; তাঁহাদিগের মূল মন্ত্র "আফ্রিকা কেবল আফ্রিকাণ্ডারদিগের নিমিত্ত।" সিসিল রোডস্, হফমেয়ার এবং ম্রিণারও এই দলভুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড নিবাসী অনেক ইংরেজও এই মত সঙ্গত এবং ন্যায়ানুগত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আজি এই সমিতির অভ্যুত্থান, এবং ইহার কার্য্য সমস্তই ইংরেজ চক্ষে অতি নিন্দনীয় এবং ইংরেজ-বিরোধী।

(২) ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, ক্রুগার প্রভৃতি বুয়র-গণ ইয়ুরোপের কতিপয় রাজ্য সন্দর্শনার্থ গমন করেন; বুয়র জাতীয় অস্তিত্বের বিপুল ক্ষেত্রে যে সামান্য বালক মাত্র, তাহা তাঁহারা লণ্ডনে আসিয়াই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং জগতের অন্যান্য সুসভ্য জাতির রীতি নীতি ও শাসন-প্রণালী যে তাঁহাদিগের বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা আবশ্যক, এ কথাও তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই আবশ্যকতার অনুরোধে অথবা কৌতুহল নিবারণার্থ বুয়র-অধিনেতা ইয়ুরোপের অন্যান্য রাজ্যে গমন করিলেন। জর্ম্মান্ সম্রাট প্রথম উইলিয়ম তাঁহাদিগকে অতি সদয় ভাবে গ্রহণ করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহারা ডাক্তার লিডস্‌কে তাঁহাদিগের সহযোগীতার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন, এবং রেলওয়ে সম্বন্ধেও এই সময়ে তাঁহারা কতকগুলি বন্দোবস্ত করেন। রেলওয়ে সম্বন্ধে পর্টুগালের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ধি নামে আখ্যাত হইতে পারে না। কিন্তু আজি তাহার নাম ব্যবসায়ীক সন্ধি শব্দে প্রখ্যাত হইয়াছে। বুয়রদিগের এই কার্য্যকেও ইংরেজদিগের মধ্যে অনেকে ইংরেজবিরোধী বলিয়া এইক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন।

(৩) ট্রান্সভয়াল রাজ্যের পশ্চিমে এবং কেপকলনী ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থলে বেচুনাল্যাণ্ড আদিম অধিবাসীগণের শাসনাধীনে ১৮৮৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ছিল। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কস্মিনকালে এই

স্থান ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের অংশ অথবা রক্ষিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ১৮৮১ খ্রীঃ অঃ সন্ধিপত্রে ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের সীমা অবধারিত ছিল বটে, কিন্তু ট্রান্স্ভয়াল বাসী বুয়র যে অন্য রাজ্যে যাইয়া আবাস স্থাপন করিতে পারিবেন না, এরূপ কোন নির্দ্ধারণ ছিল না। ১৮৮১ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে অনেক বুয়র বেচুনাল্যাণ্ডে যাইয়া বসতি করিলেন। তখন ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট বুয়র-গবর্ণমেণ্টকে বলিলেন, এ কার্য্য বড়ই অন্যায় হইতেছে। ক্রুগার বলিলেন, তিনি প্রতিবিধানের কোন আইনত উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। ইংরেজ তখন রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বেচুনাল্যাণ্ড প্রবেশ করিলেন; বুয়র তথা হইতে তাড়িত হইল। এই সময়ে জর্ম্মাণী ডামারাল্যাণ্ডে এবং নামাকাল্যাণ্ডে স্বীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। ইংরেজ তখন নিজের বিষয় বুদ্ধিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বেচুনাল্যাণ্ড যদি এই ভাবে রক্ষিত না হইত, তবে উত্তর আফ্রিকার সহিত ইংলণ্ডের সমস্ত সংস্রব চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইত। বুয়রদিগের এই কার্য্যের নিমিত্ত তৎকালে বুয়র গবর্ণমেণ্টকে ইংরেজ দোষী সাব্যস্থ করেন নাই, কিন্তু এইক্ষণে এই কার্য্য বুয়রগবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইংরেজ বিদ্বেষের অন্যতম দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এইরূপ অনেক কার্য্য, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল আত্মোন্নতি এবং আত্মপক্ষ সবল করার অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা যাহা কতিপয় ব্যক্তির অবিমৃষ্যকারিতার ফল মাত্র, তাহা হয়ত চিরদিনই ইংরেজের চক্ষে তদ্রূপ ভাবে লক্ষিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, রিস্ক সাহেব উল্লিখিত রূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেওয়ার পর, উইট্ল্যাণ্ডারগণের এবং তাহাদিগের পক্ষসমর্থনকারী দলের কৌশলে ঠিক বিপরীত রঙ্গে তাহা প্রতিফলিত হইল। ইংরেজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেল্কিবলে অন্ধ হইল। যাদুকর যে বস্তুকে যাহা বলিয়া দেখাইল, তিনিও তাহাই দেখিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। ক্রুগারের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিল। ইংরেজ স্থির করিলেন, আফ্রিকায় বুয়রই তাঁহার প্রধান শত্রু।

১৮৮১ খ্রীঃ অঃ হইতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুয়রগবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য ইংরেজগণ মধ্যে অনেকেই কেবল মাত্র নিম্নলিখিত কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন।

(১) "ক্রুগারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ রাষ্ট্রীয় সভায় অধিকারপ্রাপ্ত হইলে, দেশের স্বাধীনতা কিছুতেই রক্ষিত হইবে না। সুতরাং তদধিকার প্রাপ্তির উপযোগী বিধান সমূহকে ক্রমে ক্রমে এরূপ তীব্র এবং সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে যে, কেহ আর তাহা পাইবার নিমিত্ত প্রয়াসী না হয়। এক সময়ে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে, অতএব এই অভীষ্ট ক্রমশঃ কৌশলের সহিত কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।"

১৮৮১ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ফ্রাঞ্চইচ সংক্রান্ত বিধান আলোচনা করিলে, এই মীমাংসা অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। প্রথমতঃ দুই বৎসরের বাসেন্দা বারার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেইকাল যে পরিমাণে, এবং যেরূপ তীব্র নিয়মাধীনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

ক্রুগারের দ্বিতীয় নীতি—"ইংরেজের অর্থে, ইংরেজের সাহায্যে দরিদ্র দেশের অর্থাগমের প্রশস্ত পথ—স্বর্ণ-খনিগুলি কার্য্যোপযোগী হইলে, তাহাদিগকে নানা প্রকারে এরূপ অসুবিধাগ্রস্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ট্রান্স্ভয়াল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং সে দেশে আর ফিরিয়া যাইতে না চাহে।"

জেমসন্ রেডের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোন কার্য্য হইতে এই মীমাংসা করা অতীব দূরকল্পনা-সাধ্য। কিন্তু উত্তেজিত কল্পনার চক্ষে কোন দৃশ্যই অসম্ভব নয় এবং উত্তেজিত প্রাণের নিকট কোন কথাই অমূলক অথবা ভিত্তিশূন্য হইতে পারে না।

(৩) "ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশীয় লোকদিগকে সমধিক পরিমাণে ট্রান্স্ভয়াল রাজ্যের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, তাহা-

দিগকে সমধিক পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটে অধিকার প্রদান করিয়া, বিদেশীয় অপর রাজ্যের সহানুভূতি আকর্ষণ করা; এবং এই প্রকারে অপর রাজ্যের স্বার্থ সমধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট হইলে, তাঁহারা অবশ্যই ট্রান্স্‌ভয়ালকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইবেন। এই ভাবে ইংরেজের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে অপর রাজ্যের সহিত স্বার্থ স্থাপন করা।" ফ্রি-ষ্টেটের সহিত ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের নির্দ্ধারণ ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখান হইয়া থাকে।

সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে এই মীমাংসা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই প্রকার আত্মরক্ষার উপযোগী নীতি অবলম্বন করায় যে বুয়র আফ্রিকা হইতে ইংরেজকে কিরূপে তাড়িত করিতে পারিতেন, তাহা বুঝা দুরূহ।

(৪) "আফ্রিকা নিবাসী ইংরেজকে আফ্রিকার স্বতন্ত্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদিগকে মাতৃভূমির সহানুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা এবং আফ্রিকাওয়ার দলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করা ক্রুগারের চতুর্থ নীতি।"

(৫) "মূলধনী এবং তাঁহাদিগের অধীনস্থ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইতে না পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা ক্রুগারের পঞ্চম নীতি।"

উপরের লিখিত কয়েকটী বিভাগে ক্রুগারের সমস্ত কার্য্য ইংরেজ সাধারণের সমক্ষে চিত্রিত হইল। যে ক্রুগার একদিন খোদার খুড়তত ভাই ছিলেন, সেই ক্রুগার নীচ, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, কপটী, নররূপধারী পশুর আকার ধারণ করিলেন।

আফ্রিকার বিপুল ক্ষেত্রে ভগবান তাঁহার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির দুইটী পদার্থ পাঠাইয়াছিলেন, একটী ক্রুগার একটী রোডস্‌। দুই জনই উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতাপ্রিয়, দেশীয়দিগের স্বত্ব, স্বার্থ এবং দুঃখের প্রতি দৃষ্টিবিহীন, উভয়ই কার্য্যফলানুসারে অবলম্বিত নীতির ন্যায়ানুগতা বিচার করিয়া থাকেন, কেহই লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কোন প্রকার সাধনাকেই অন্যায় বলিয়া মনে করেন না। আফ্রিকার কার্য্যক্ষেত্রে এই দুই মহাপুরুষে অনেক দিন হইতে কোলাকুলি চলিতেছিল। উভয়ই অবসর খুজিতেছিলেন, কোন্‌ সময়ে একজনে আর এক জনকে গাঢ় আলিঙ্গনের পূর্ণবলে বিচূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। মুখে ক্রুগার বলিতেছিলেন, আফ্রিকা কেবল "আফ্রিকাওয়ারদিগের নিমিত্ত। রোডস্‌ও সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছিলেন, "তাইত। রোডস্‌ জেমসন্‌ রেডের সময়ে মনে করিয়াছিলেন, অবসর উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু পরে দেখিলেন, তিনি ভুল করিয়াছেন, অসময়ে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ হইল। জগতের লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। তিনি যে উচ্চ আসনে বসিয়া দেবতার ন্যায় পুজিত হইতেছিলেন, সে স্থান হইতে পাতিত ও পদদলিত হইলেন। ক্রুগার সেবার জয়ী হইলেন। কিন্তু রোডস্‌ বিচূর্ণ হইলেন না। কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া আবার আফ্রিকার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। প্রাণপণে ক্রুগারের পশ্চাতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কার্য্যফলে, প্রতিভাবলে, ক্রুগার আজি পরাজিত, বুয়রের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত।

পাঠক বোধ হয় শুনিয়াছিলেন যে, "আল্লার দুনিয়ায় আজব মেলা, সাপে চাটেন বাঘের গলা," দৃশ্য কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। আফ্রিকা অনেক কাল পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়াছে, এবং এইক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছে যে, সর্ব্বদা ভগবানের নামোচ্চারী বুয়র নেতা, এবং আত্মসুখ-নিরপেক্ষ-পরাধিকার-বিস্তৃতির বক্তৃতাকারী বিস্তৃতাশয় রোডস্‌, এতদুভয়ের কেহই প্রকৃত মানবাধিকারের স্বতন্ত্রতার অথবা স্বাধীনতার বিস্তৃতির নিমিত্ত জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন না। উভয় যোদ্ধাই কৌশল-নির্ম্মিত দুইটী বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, রোড্‌সের পোষাক সময়োপযোগী, ক্রুগারের পরিচ্ছদ ফেসনের বাহিরে। কাজেই ক্রুগার ধরা পড়িলেন, রোডস্‌ ধরা পড়িয়াও আবার সরিয়া গেলেন। তাঁহারই জয় হইল।

তৃতীয় উপায়।

অতি দীর্ঘকাল হইতে আফ্রিকাবাসী শ্বেতকায়গণ মনে করিতেছিলেন যে, আফ্রিকার প্রকৃত বাসেন্দা আদিম অধিবাসী ব্যতীত, যে কোন বিদেশীয় শ্বেত-দেহ-ধারী আফ্রিকার প্রতপ্ত ভূমিতে গিয়া বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহারই আফ্রিকার নিয়তি নির্দ্ধারণের অধিকার আছে। যাহারা আফ্রিকার প্রকৃত অধিবাসী, তাহাদিগের অবশ্যই আফ্রিকার ভূমিতে কোন স্বত্বাধিকার নাই; সুতরাং তাহাদিগকে কোন প্রকারের কোন অধিকার প্রদান করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত অদূরদর্শিতা এবং মূর্খতা।

এই উদার নীতি দ্বারা সম্যকরূপে পরিচালিত হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। যাঁহাদিগের প্রাণে সততা অথবা ধর্ম্মভয় আছে, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা মনুষ্য সমাজে নিদেন সুসভ্য এবং শিক্ষিত জাতীয় লোক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষেও মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আত্ম-পদবীর উচ্চতা রক্ষার অনুরোধেও এরূপ কথা মুখের বাহির করিতে পারেন না। বিশেষতঃ ইংরেজ একথা বুঝিতে পারেন যে, আফ্রিকার উন্নতি কেবল ইংরেজের দ্বারা হইতে পারে না; ইংরেজের ধন, মস্তিষ্ক, বল, বিক্রম, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার দ্বারা দেশীয় শক্তি রক্ষিত, পরিচালিত এবং ভবিষ্যতের নিমিত্ত শিক্ষিত না হইলে, আফ্রিকায় ইংরেজ স্থায়ী হইতে পারেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে যেরূপ কুলীন, আফ্রিকায় তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন; উদরে অন্ন থাকুক অথবা নাই থাকুক, সাহজাদার জাতীয় ইংরেজ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংস্থান করা অসম্মান-জনক মনে করিয়া থাকেন; শ্বেতাঙ্গধারী ইংরেজ মুটে, মজুর বা হল-পরিচালকের কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিলে, অপর দশজন ইংরেজও তাহাতে নিজের জাতিকে অপমানিত মনে করিয়া থাকেন, এবং প্রাণান্তেও তদ্রূপ দৃশ্য দেখিতে সম্মত হইতে পারেন না। সুতরাং আফ্রিকাবাসীকে রক্ষা না করিয়া ইংরেজের পক্ষে আফ্রিকায় বসবাস করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ড ব্যবসায়ী রাজ্য; ইংলণ্ডে স্বভাবজাত পদার্থের অঙ্গে মানব মস্তিষ্কের মুদ্রাঙ্কণ চিহ্ন লাগাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন আকারে, মানবের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ দ্রব্য প্রত্যহ প্রস্তুত হইতেছে। এই কার্য্যে ইংলণ্ডের অসংখ্য ধনের আবর্ত্তন প্রত্যাবর্ত্তন, অসংখ্য ক্ষমতাশালী মস্তিষ্কের পরিচালন, লক্ষ লক্ষ লোকের নৈপুণ্যের এবং শ্রমশীলতার নিয়োগ এবং বিকাশ। সম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের করের দ্বারা ইংলণ্ড জীবিত এবং রক্ষিত হইতে পারেন না; বাণিজ্যই ইংলণ্ডের বল, বাণিজ্যই ইংলণ্ডের জীবন, বাণিজ্য বিস্তৃতির অপরিহার্য্য আবশ্যকতাই, তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতির মূল কারণ এবং চালক শক্তি। আফ্রিকাবাসীর যদি অস্তিত্ব লোপ হয়, তবে আফ্রিকায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিস্তৃতির সম্ভাবনা অতি সুদূর ভবিষ্যতে অপসারিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আফ্রিকাবাসীকে রক্ষা করায় ইংলণ্ডের ধর্ম্মও হয়, কর্ম্মও হয়।

অনেক দিন হইতেই বুদ্ধিমান ইংরেজ রাজপুরুষগণ উপরের লিখিত কথার সত্যতা অনুভব করিয়াছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তদনুযায়ী নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে কেপ্‌কলনীকে ইংলণ্ড স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রদান করেন। এই কলনীর পার্লেমেণ্টে সদস্য নিযুক্ত করার অধিকার আদিম অধিবাসীদিগকেও প্রদান করা হইয়াছে। এই উদার নীতি আবার কতিপয় বৎসর পরে কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে; ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে নাটালকে যে স্বায়ত্ত সাশনাধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে আদিম অধিবাসীকে উল্লিখিত প্রকারের অধিকার প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতা সাময়িক ব্যতীত স্থায়ী হইতে পারে না। ইংরেজ রাজপুরুষেরা সকলেই জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আফ্রিকানিবাসীকে কোন না কোন দিন আফ্রিকা সম্বন্ধে আফ্রিকাবাসী ইংরেজের তুল্যাধিকার প্রদান করিতেই হইবে।

আফ্রিকার ক্ষেত্রে আদিমবাসীর পরই পুরাতন উপনিবেশীর স্বত্বাধিকার, ইংরেজ, বুয়র এবং তাঁহাদিগের মিশ্র বংশধরগণ এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। যে কোন কারণেই হউক, শত বৎসর অতীত হইয়া গেল, ইংরেজ এবং বুয়রের মধ্যে এত মেশামিশি, এত দেখা দেখি, অথচ ইংরেজ বুয়রকে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ-ভাবাপন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না, এবং আরো কয়েক শতাব্দী অন্তেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা, সন্দেহ স্থল। যদি আফ্রিকায় ব্রিটিস শিক্ষা, সভ্যতা এবং অধ্যবসায়ের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বর্ত্তমান না থাকিত, তবে ব্রিটিস জাতির পক্ষে এই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করা যত সহজসাধ্য হইত, এখন আর তত সহজসাধ্য হইতে পারেনা। আফ্রিকায় আজি ইয়ুরোপীয় সুসভ্য ক্ষমতাশালী অন্যান্য জাতিও তাঁহাদিগের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত বিচরণ করিতেছেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের সম্মুখে অনেক সময়ে ইংলণ্ডের অনেক কার্য্য মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সম্ভবপর। অথচ সমস্ত শক্তিকে আফ্রিকা হইতে তাড়িত কিম্বা বিদূরিত করাও অসম্ভব। সুতরাং ইংলণ্ডের দূরদর্শী রাজপুরুষেরা অনেক দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, আফ্রিকায় ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থির রাখিতে হইলে, সমস্ত আফ্রিকানিবাসী শক্তিগুলিকে ইংলণ্ডের প্রাধান্যের নিম্নে একত্র গ্রথিত করিতে হইবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে তুল্যাধিকার রক্ষা করাও বিশেষ আবশ্যক।

গ্ল্যাডোষ্টোন্, লর্ড ডার্বি প্রভৃতি মনে করিতেন, স্বভাব কোন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহ একত্রিত করিলে, তাহা স্বভাবের নিয়মাধীনেই ক্রমে ক্রমে একভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ একটীর উপর আর একটী প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে, একটীকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হয়; যদি এই সংগ্রামে একের দ্বারা অন্যের একেবারে বিনাশ নিবারণ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল শক্তিসমূহ প্রবল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একত্রিত এবং একীভূত হইয়া থাকে। তাঁহারা এই ভাব হইতেই বুয়রকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, বুয়রকেও কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু বুয়র অথবা অপর কেহ সমগ্র আফ্রিকা পুরাতনাধিবাসী শূন্য না করিতে পারেন, অমানুষিক কোন কার্য্য দ্বারা উক্ত মহদুদ্দেশ্যের সিদ্ধি দূরে অপসারিত করিতে না পারেন, তদুপযোগী নীতি অবলম্বন করিয়া, আফ্রিকার ভবিষ্যৎ উন্নতির রক্ষকের স্বরূপ আফ্রিকায় অবস্থান করাই ইংরেজের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের মত সময় সময় এতৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ড তাহার অবলম্বিত নীতি কোন সময় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে একথাও বিশ্বাস করিতেন যে, আফ্রিকায় ইংরেজ যে গুরুভার কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়াছেন, বুয়র গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিতেও সহযোগী এবং অংশী হইবেন।

ইংলণ্ডের পূর্ব্বের ব্যবহার যাহাই হউক, ১৮৮১ হইতে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের প্রতি ইংলণ্ডের অটল আস্থা ছিল। বন্ধুভাবে পরামর্শ দান করা ব্যতীত কখনও ভয় প্রদর্শন অথবা বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে ইংলণ্ড এই কাল মধ্যে কখনও কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের নিজের কথাতেই আমরা এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারি। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি একজন ইংরেজকে বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ড এত দিন নায়কের ন্যায় ট্রান্স্‌ভয়াল রাজ্যের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন, এখন ট্রান্স্‌ভয়াল ইংলণ্ডকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে চাহেনা বলিয়া তিনি এই রাজ্যের গলা কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন।" প্রকৃত প্রস্তাবেই ইংলণ্ড ট্রান্স্‌ভয়ালের মন যোগাইয়া চলিয়াছিলেন।

উপরের লিখিত অবিচলিত আস্থার প্রতিদানে, বুয়র ইংরেজের প্রতি প্রাণের সহিত বিদ্বেষ এবং ইংলণ্ডের শক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার এবং ইংলণ্ডের উদ্দে-

ণ্ডের প্রতিকূলাচরণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই দোষী হইয়াছেন। ইংরেজকে যদি তিনি কেবল অবজ্ঞা করিতেন কিম্বা অবিশ্বাস করিতেন, তবে তাহা তত গুরুতর অপরাধ বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিতনা, এবং তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূলাচরণ—আফ্রিকাবাসীর সর্ব্বনাশের চেষ্টা—কেহই ক্ষমা করিতে পারেন না। বুয়র গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এই সঙ্কীর্ণ নীতির ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত মাত্র। আমরা তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।

(১) ইংলণ্ড আদিমবাসীকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প এবং তাহার স্বত্ব এবং স্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্ত নিজকে দায়ী মনে করিতেন। ট্রান্সভয়াল আদিম অধিবাসীর অস্তিত্বে পর্য্যন্ত কাতর, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে আদিম অধিবাসীর কোন স্বত্বাধিকার ছিল না। প্রকারান্তরে দাসত্ব-প্রথাও বর্ত্তমান ছিল। তাহা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে।

আদিমবাসীদিগের বিরুদ্ধে বুয়র যত যুদ্ধ করিয়াছেন, যুদ্ধের কালে এবং পরে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এবং তৎসম্বন্ধে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার এবং কার্য্য আলোচনা করিলেই উপরের লিখিত কথার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইবে।

(২) আফ্রিকাস্থ সমস্ত রাজ্যে কর এবং শুল্ক প্রভৃতি একই অনুপাতে অবধারিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন শাসন-শক্তির মধ্যে মনান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম হয়; এ সম্বন্ধে অন্যান্য শক্তি ইংলণ্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ট্রান্সভয়াল তাহাতে সম্মত হইলেন না।

(৩) পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের নিমিত্ত ইংলণ্ড প্রাণপণ করিতেন, বুয়র-সাধারণ-তন্ত্র, তাহার কার্য্যের দ্বারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং অনাস্থা বৃদ্ধি করিতেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাবি করিলে, বুয়র-রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সভা তৎসম্বন্ধে বিশেষ রিজলিউসন পাশ করিয়া হাইকোর্টের বিচারাধিকার রহিত করিতে কুণ্ঠিত অথবা লজ্জিত হন নাই। তৎপর যখন হাইকোর্টের চিফজাষ্টিস্ এইরূপ অন্যায় রিজলিউসনকে রাজ্যের গঠনবিরোধী বিধান বলিয়া মান্য করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন তিনি বিচারাসন হইতে অপসারিত হইলেন। যে যে ঘটনা অবলম্বনে এই কথা বলা হইল, তাহাও পরিশিষ্টে সমালোচিত হইবে।

পাঠক বলিতে পারেন যে, এরূপ ঘটনা কি জগতে আর কোন রাজ্যে ঘটে নাই। অন্য রাজ্যে ঘটিয়াছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাহা কলঙ্ক ব্যতীত গরিমা বলিয়া কখনও ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হই নাই। একস্থানে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান অন্যত্র অন্যায়ানুষ্ঠানের প্রতিপোষক হইতে পারে না।

উপরে যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং দোষের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা ইংলণ্ড বরাবর জানিতেন, তথাপি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, কালে এই ভাব বিদূরিত হইবে, ট্রান্সভয়াল নূতন রাজ্য, ক্রমে নিজের দায়িত্ব ন্যায়ানুগত ভাবে বহন করিতে শিক্ষা করিবেন। হয়ত ইংলণ্ডের এই ভাব অপরিবর্ত্তিত থাকিত, কিন্তু দুইটী গ্রহবৈগুণ্যে এই ভাবের ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

সিসিল্‌রোডস্ অপদস্থ হওয়ার পর, ইংলণ্ডকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত নিজের শক্তিশালী মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। পক্ষান্তরে ক্রুগার উইটল্যাণ্ডারকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত, ইংরেজের আধিপত্য স্থাপনে বাধা দিবার নিমিত্ত, নিজের সঙ্কীর্ণ নীতিকে সতেজে কার্য্যক্ষেত্রে অবতারণা করিলেন। বুয়ররাষ্ট্রীয় সভার সভ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে বুয়রদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; বুয়র রাষ্ট্রীয় সভায় উইটল্যাণ্ডারের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান কঠোর বিধান আরো কঠোরতর করা হইল। এবং ক্রমে ক্রমে দুই জাতির মধ্যে এরূপ ভাব হইয়া দাঁড়াইল যে, একের অস্তিত্ব অন্যের অসহনীয়।

এই অবস্থায় ইংলণ্ডবাসীও দুই দলে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন; একদল অতি অল্পসংখ্যক—এখনও বলিতে লাগিলেন, ক্রুগারকে আরো সময় দেওয়া উচিত। বুয়রজাতির শিক্ষা, দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যেরূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে বুয়র-গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য একেবারে

নির্দ্দোষ হইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে বুয়র নিজের গন্তব্য পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, তৎপূর্ব্ব তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠান সঙ্গত নয়। আর একদল—অধিকাংশ ইংরেজ—সে কথার সত্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছে, অফ্রিকায় বুয়রের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অফ্রিকার ভাবী উন্নতির প্রতিরোধক; বুয়র তাহাতে বাধা দিবেন ব্যতীত কখনও সহায়তা করিবেন না। ব্রিটিস পতাকার ক্ষমতাশালী ছায়ার নীচে সমস্ত শক্তির একত্র, সমাবেশ ব্যতীত আফ্রিকার আর আশা নাই। এই দলের কথাই প্রবল হইয়া উঠিল। ব্রিটিস জাতি এই কথাই প্রকৃত কথা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। উইটল্যাণ্ডারের তৃতীয় উপায়ও সফল হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৩। পদ্মা।—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৷৷০।

প্রথম সংস্করণ উপলক্ষে বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নব্যভারতে এ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। এখন প্রমথ বাবু বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কয়েকটী কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর, অতি পরিপাটী। পদ্মা পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব। কবি বলেন,—

"অয়ি নদি, একবার হেরি রূপ তব;
আরবার এ মানস-স্রোতে অভিনব
হেরি উর্ম্মিলীলা! ছুটী ধাবা মুগ্ধপ্রায়,
কি দুর্লভ লক্ষ্যপানে ছুটিছে তৃষায়!"

শেষ কবিতা—নদীর মিনতি।

"কেন আহা, বসে আছ রৌদ্র-দগ্ধ তীরে,
হর তৃষ্ণা, অবগাহ আমার এ নীরে
নিঃসঙ্গ পথিক! নিঃসঙ্কোচে এস চলি
চঞ্চল চরণ-ক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষ দলি;
আরো এস নামি;—যেথা, গভীর হৃদয়ে
ফুটে নৃত্য গীত; ল'ব যে গুপ্ত নিলয়ে
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বাঁধি। সর্ব্বতাপ গ্লানি
দূর করি দিব ভ্রাত! স্নেহসিক্ত পাণি
বুলাইব তপ্ত গাত্রে। বড় শ্রান্ত তুমি;
কত বা বিঁধেছে পদে ও বন্ধুর ভূমি!
সান্ত্বনা শুশ্রূষা সনে দিব ধৌত করি
সকল কলঙ্ক-লেখা; শুভ্রবাস পরি
যেও তুমি স্নাত, শুদ্ধ, যথা ইচ্ছা সুখে;
গ্লানি শুধু ফেলে যেও, পাতি ল'ব বুকে।"

কি সুন্দর, কি মধুর আহ্বান। এরূপ মধুর কবিতা এ পুস্তকে অনেক আছে। পূর্ব্ব বঙ্গ, নদীতে তুমি শ্রেষ্ঠ ছিলে, এখন গীতি-কবিতায় কি শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে? পশ্চিম বঙ্গ ঘৃণা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিলেই আমরা সুখী হই।

৩৪। গীতিকা।—শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১৷৷০।

ইহা প্রমথ বাবুর দ্বিতীয় পুস্তক; ইহারও ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটী।

ধনীর ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, সরস্বতীর তিরোভাব, এ দেশের চিরপ্রবাদ। সেই প্রবাদ এ যুগে বঙ্গ প্রদেশে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। গীতি-কবিতার নেতা এ দেশে ৺ মাইকেল এবং ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী;—তৎপর রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, গিরীন্দ্রমোহিনী, গোবিন্দদাস, মানকুমারী সকলেই এদেশে এক প্রকার অমরত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। মধ্য হইতে লক্ষ্মীর বরপুত্র প্রমথ বাবু বঙ্গে আবির্ভূত হইয়া সকলকে মোহিত করিতেছেন। অসঙ্কোচে বলিতে হইবে, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় শিষ্য। পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের অপূর্ব্ব সম্মিলন। পুস্তক খানি কত সুন্দর, দেখাইবার জন্য একটী কবিতা মাত্র এস্থলে তুলিলাম।

উপহার।

"জানি, তাহা জানি আমি, অয়ি মাতৃভূমি,
সব ভাল, ভালবেসে যা দিয়েছ তুমি।
তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ,
তোমার আলোক ভাল, তোমার বাতাস;
তরু তব ছায়া দেয়, সাজি ফল-ফুলে,
তটিনী মিটায় তৃষ্ণা ফিরি কূলে কূলে;
তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞান-সুধা পান;
শিরে তুলে ঘরে আনি আশীর্ব্বাদী ধান।
তুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন;
বক্ষে ধরি আছ মোর গৃহ পরিজন;
তোমারে ঘিরিয়া নিত্য হয় মহোৎসব;
অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব।
যাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার,
তোরি ভাষা দিয়ে তোর কণ্ঠে দিব হার।"

প্রমথ বাবুর লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

দুঃখী শ্যামদাস।

ধারেন্দা বাহাদুরপুর পুরী জেলায় একটী উড়িয়া গ্রামে। এই গ্রামে এক ঘর বাঙ্গালী সদ্‌গোপ বাস করিত। কৃষ্ণমণ্ডলের পূর্ব্ব বাসস্থান গৌড়দেশে দণ্ডেশ্বর গ্রামে। দণ্ডেশ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়া কৃষ্ণমণ্ডল ধারেন্দায় বাস করেন। চৈতন্য নীলাচলে বাস করিলে তাঁহার নিকটে থাকিবার লোভে অনেকগুলি বাঙ্গালী উৎকলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব কৃষ্ণমণ্ডলও বোধ হয়, সেই কারণে দণ্ডেশ্বর ছাড়িয়া ধারেন্দায় আসেন, নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না।

কৃষ্ণমণ্ডলের কয়েকটী পুত্র ও কন্যা হইয়া অল্প বয়সে মারা যায়। তাহার পর আবার একটী পুত্র হইলে কৃষ্ণমণ্ডল ও তাঁহার পত্নী দুরিকা শিশুটীকে "দুঃখিয়া" বলিয়া ডাকিতেন। অতি অল্প বয়স হইতে দুঃখিয়ার বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ প্রবল হয়। দুঃখিয়া পিতামাতার অনুমতি লইয়া গৃহত্যাগ করেন। এই দুঃখিয়া বৈষ্ণব মহাজন মধ্যে দুঃখী কৃষ্ণদাস, দুঃখী শ্যামদাস, শ্যামানন্দ দাস ও শ্যামানন্দ পুরী নামে বিখ্যাত। উৎকলে গায়কগণ দুঃখী শ্যামের পদাবলী গাহিয়া থাকে। সে গুলি বড় মিষ্ট। কিন্তু গান শুনিয়া দুঃখী শ্যামকে উড়িয়া মহাজন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। সাঁওতালদিগের মুখে গান শুনিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, তাহারা বাঙ্গালা গান গাহিয়াছিল। পুরীতে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে দুঃখী শ্যামের একটী মঠ আছে। সেই মঠ হইতে একখানি পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথি খানি উড়িয়া অক্ষরে লেখনী দিয়া তাল পত্রে লেখা। কিন্তু গানগুলি বাঙ্গালা। দীন কৃষ্ণদাস একজন বিখ্যাত উড়িয়া কবি। অনেকবার মনে হইয়াছিল, দীন কৃষ্ণদাস ও দুঃখী কৃষ্ণদাস একই ব্যক্তি। প্রাচীন আসামীয় সাহিত্যে বাঙ্গালা কাব্য পাওয়া যায়। সে কারণেও মনে হইয়াছিল, উড়িয়া দুঃখী শ্যাম বাঙ্গালায় পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। ভক্তিরত্নাকর এসকল কল্পনার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

কণ্টক নগর বা কাটোয়া বঙ্গের ইতিহাসে বিশেষতঃ বৈষ্ণব ইতিহাসে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তাহার পরে অম্বিকা। অম্বিকার এখানকার বৈষ্ণব মঠের অধিকারী হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর দুঃখিয়ার দীক্ষাগুরু, দুঃখিয়া পিতামাতার নিকট বিদায় হইয়া অম্বিকায় উপস্থিত হন। হৃদয়চৈতন্য তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম দেন। কিছু দিন নিকটে রাখিয়া হৃদয়চৈতন্য শিষ্যকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তখন শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনে ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন;—গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখনও প্রকট ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য তখনও বৃন্দাবনে শিক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীনিবাসের পরে দুঃখী কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। হৃদয়চৈতন্য শ্রীজীবকে একখানি পত্র লিখিয়া দুঃখী কৃষ্ণকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। জীব গোস্বামী ১৫০৪ শকে লঘুতোষণী সমাপ্ত করেন। বোধ হয়, পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বা ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দুঃখী কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন।

চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য অপ্রকট হইবার পরে নরোত্তম সরকার ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরী গোস্বামীর কৃপায় উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস সরকার ঠাকুর ও কৃষ্ণদাসের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে জীব গোস্বামী তিন জনকে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিতে দেশে পাঠাইয়া দেন। শ্রীজীব কৃষ্ণদাসকে শ্যামানন্দ নাম দিয়াছিলেন।

বোধ হয়, তখন বাঙ্গালা হইতে উৎকল হইয়া বৃন্দাবনের পথ প্রশস্ত ছিল। ভক্তিগ্রন্থ লইয়া আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে উৎকল হইয়া দেশে ফিরিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বিরের লোকেরা ধনরাশি ভ্রমে গ্রন্থ অপহরণ করে। গ্রন্থের অনুসন্ধানে আচার্য্য বিষ্ণুপুরে কয়েকদিন থাকিতে অভিলাষ করিয়া নরোত্তমকে খেতুরী পাঠাইয়া দেন। শ্যামানন্দকে নরোত্তমের সঙ্গে দিয়া বলিয়া দেন, যেন খেতুরীতে পৌঁছিয়া শ্যামানন্দকে সাবধানে উৎকলে পাঠাইয়া দেন। কয়েকদিন খেতুরীতে বাস করিয়া শ্যামানন্দ বিদায় লন। রাজা সন্তোষ দত্ত শ্যামানন্দকে সঙ্গে করিয়া পদ্মা পার করিয়া দেন। পদ্মা হইতে কণ্টকনগরে গিয়া শ্যামানন্দ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তথা হইতে নবদ্বীপ হইয়া শান্তিপুর এবং শান্তিপুর হইতে অম্বিকায় যাইয়া হৃদয়চৈতন্যকে দর্শন করেন। গুরুর নিকট বিদায় লইয়া শ্যামানন্দ পূর্ব্ব বাসস্থান দণ্ডেশ্বর দেখিতে যান। দণ্ডেশ্বর হইয়া তিনি ধারেন্দায় উপস্থিত হন।

ধারেন্দা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উৎকলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাইয়া শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার মধ্যে মল্লভূমে সুবর্ণরেখা পার্শ্ববর্ত্তী বয়নী ও পুরী জেলায় বলরামপুর, গোপীবল্লভপুর, নৃসিংহপুর প্রধান। শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে রসিক, মুরারি, কিশোর, দামোদর, রাধানন্দ, পুরুষোত্তম, মনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, উদ্ধব, অক্রূর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, গদাধর, রাধামোহন, জগতেশ্বর ও আনন্দানন্দ বিখ্যাত। উৎকল দেশে শ্যামানন্দের আটচল্লিশ খানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। পুরীতে দুইটী মঠ আছে। একটীর নাম দুঃখী শ্যামের মঠ, আর একটীর নাম শ্যামানন্দের মঠ।

পদকল্পতরু হইতে দুঃখী শ্যামের একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীরাগ।

রাই কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতেক ভাঁতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশর, বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে।
রসের আবেশে গমন মন্থর
হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ঈষৎ হাসিয়া
বঙ্কিম নয়ানে চায়।
সিঁথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে অরুণ কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে নিকুঞ্জ ভবনে
কল্পতরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোলে।

এই পদটীতে "শ্যামানন্দের" ভণিতা

দেখা যায়। আমার পুঁথি খানিতে সকল ভণিতা "দুঃখী শ্যামের," সুতরাং এই দুই জন একই ব্যক্তি কিনা নিশ্চয় বলিতে পারি না। শ্যামানন্দের ভণিতা যুক্ত আর দুটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। 'দীন কৃষ্ণদাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভণিতা যুক্ত আর কয়েকটী পদ দেখা যায়। সে গুলি দুঃখী শ্যামের পদ কিনা, নিশ্চয় করিতে না পারায় তাহাদিগকে এখানে উদ্ধৃত করা হইল না।

বর্ত্তমান পুঁথিখানির কবিতাগুলির কোন কোনটী বাঙ্গালা, কোন কোনটী উড়িয়া মিশ্রিত। এই মিশ্রিত কবিতাগুলি লিপিকরের প্রসাদে মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। বিদ্যাপতির পদাবলী এইরূপে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। দুঃখী শ্যাম বাঙ্গালী হইলেও উৎকলবাসী, উৎকল ভাষা তিনি ভাল জানিতেন। এবং উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা পদের মাঝে মাঝে দু একটী এমন উৎকল শব্দ দেওয়া আছে যে, সে দুঃখী শ্যামের নিজের ভিন্ন অপরের বলিয়া কোন সন্দেহ হয় না। আবার কোন কোনটী যে লিপিকরের অনুগ্রহে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। দেখিলেই আধসিদ্ধ উড়িয়া বলিয়া বুঝা যায়।

দুঃখী শ্যামের কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিলাম। ভাল কি মন্দ, বিচার না করিয়া পদ কয়েকটী সংগ্রহ করিলাম।

"চিকণ কালা, গলাতে মালা
বাজনি নুপুর পায়;
চাঁদ ঝলমল ময়ূরের পাখা
চূড়ায় মন্দ বায়।
চিত উপরে ভ্রমর চলে
তিরছা নয়নে চায়।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
মরণ বলিয়া যায়।
কদম্বের তলে কিরূপ হেরিনু
রসিক শেখর কালাই
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল
নাসে সিন্ধু ফল শোহই।
কটীরে দুকূল পায়েরে নুপুর
দুঃখী শ্যাম দাস কহে।"

"বৃদ্ধকালে তু মোহর একই নন্দন
দুঃখ তাপ বিনাশনে তু হরি চন্দন,
কাহাকু কি সুতকেই নহিব দইব?
তো পরি অবুঝা পুত্র কে কাঁহি কি হব,
আসরে গোবিন্দ কত জঞ্জাল তোহর
কে সহি পারিব বাপ এমনি বেভর।
এতে বলি বেণি নেত্র নীর ঘন ঘন
গোবিন্দ মঙ্গল রসে দুঃখী শ্যাম গান।"

"ময়ূর চন্দ্রিকা চূড় দুহিক সুন্দর
সুবর্ণ কিরীট শোহে ললাট পটর।
ভালে গোরোচনা চিত্রা নয়ানে অঞ্জন
মকর কুণ্ডল কর্ণে দিশে শোভাবন।
নাশা পুটে রত্নদণ্ডি কণ্ঠে চাপসরি
হৃদে ব্যাঘ্রনখ শোহে ঘনেকি বিজরি।
তিনসরি মুকুতা ছেঁচা কণ্ঠে রত্নহার
বাহে বাজুবন্ধ দেখ কঙ্কন শ্রীকর।"

"শিরে সপ্ত ফেণী শোহে জগজন মন মোহে
কর্ণরে কুণ্ডল শোভা পায়
নানা মণি রত্নহার, হৃদয়ে পদক সার
চাঁদমুখ ঝলকত তায়।
শিঙ্গা বেণু করে ধরি, কৃষ্ণ সঙ্গে নৃত্য করি,
দেব চলে নন্দের ভবনে।
আগে চলে বলরাম, পিছে চলে ঘনশ্যাম,
পাছে রহে সর্ব্ব শিশুগণে।
গোবিন্দ মঙ্গল বাণী, দুঃখী শ্যামদাস ভণি,
শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।"

"ওগো মাগো
"আমি না রহিব তোমার গৃহে কভু না গো।
কতবার মাগিনু ননি
আমারে না দিলে তুমি ;
ও গো আমার যদি মায়ে হোত
ধূলী ঝাড়ি ননি দিত,
সুবল সুদাম খাইল ননি
আমাকে না দিলে তুমি
ক্ষুধায় আকুল আমি
মাগিতে না দিলে তুমি
গোবিন্দ মঙ্গল বাণী
দুঃখী শ্যামদাস ভণি।"

"প্রাণ কানাই রে।
নবনি খাইতে কে কলা মনারে।
কোলে আয় নয়ানতারা
দুটী নয়ানু বহাছে ধারা
কোলে আয়রে
আয়রে সোণা গোপাল ননি খায়রে।
তু যবে নন্দের কানায়
নবনি খাইতে কে কলা মানা।
তু যবে নন্দের সুত
পকাউ তু বাপ শপথ।
কোলে যদি ন আসিব
তবে মার মাথা খাইব,
দুঃখী শ্যামদাস ভণি
আয়রে বাপ নীলমলি"

খাওরে, কোলে থাক, কেন কান্দরে বাছা নীলমণি।
ন কান্দ ন কান্দ দেবিরে ক্ষীর সর ননি।
ওরে নকান্দ শ্রীনন্দ নন্দন
যশোদা পরাণ ধন।
তুমি যদিরে কান্দিব
আমি প্রাণ হারাইব।
তোমার কান্দনা দুখ
অন্তরে বিদারে বুক
তোমার কান্দনা ছাঁদে
অন্তরে পরাণ কাঁদে
ন কান্দ মো গদাধর
চন্দ্রমা বদন তোর
তোমার কান্দনা শুনি
পাষাণ হয়েছে পানি
তোমার যত কাঁদনা
আমার হৃদ দহনা।
তোমার কান্দনা শুনি
মরি যাবে নন্দরাণী।
দুঃখী শ্যামদাস ভণি
ন কান্দ মোর নীলমণি"

"যে যে মা মা মা মা বোলে বাণী
সে যে উৎচ্চ ডাকে নীলমণি।
মায়ে ননিদে ননিদে গো মায়ে
আমি ধরছু তোমার দুটী পায়ে
মায়ে ননি যদি নাহি দিব
আমি দুঃখে প্রাণ হারাইব
এতে বলিবে নীলমণি
কান্দিয়া লোটে ধরণী
তা দেখিয়া নন্দরাণী
দুঃখী শ্যামদাস ভণি।"

"মরি মরি খাইবে নীলমণি
অমনি দেরি সর নবনী।
আহা মো দুঃখী সঙ্খালী
তুকেতে করি যাউঅলি।
মরি যাঁউ মো নয়নতারা
দুটী নয়ন বহুছি ধারা।
মরি যাইবে মোর দুঃখীর ধন
মো দুঃখীর ধন গোপজীবন
মলিন দেখি তো চন্দ্রবদন
বলি রাণী নেত্র বরষে বন
মলিন দেখি তো নীল বদন
বলি রাণী মুখে দিয়ে চুম্বন
মো দুঃখীর ধন মো জীবজীবন
হীন দুঃখী শ্যাম কলে গায়ন!

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

কামিখ্যা শৈলে।

"দিনকা মোহিনী, রাত কা বাঘিনী, পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকর্, ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে।"

(তুলসী দাস)।

ভারতবর্ষের কোন অংশেই হিন্দুজাতির তীর্থের অভাব নাই; যেখানে দুই বা ততোধিক নদ বা নদী একত্রে সম্মিলিত হইয়াছে, সেই খানেই হিন্দুর তীর্থস্থান। যেখানে কোনও অত্যাশ্চর্য্য বা অলৌকিক ঘটনায় লোকে চমৎকৃত, বিমোহিত বা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে, যেখানে পবিত্রতা ও সুন্দরতা একাধারে মিলিয়া পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অনধিগম্য কৌশল, অপার মহিমা এবং অমিত করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা যেখানে কোনও তপঃপ্রভাবশালী ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষের জন্ম ও লীলায় মানবসমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, সেই খানেই হিন্দুর তীর্থস্থান। সংক্ষেপতঃ অসাধারণ সামর্থ্য-সম্পন্ন ঈশ্বরানুগৃহীত মানবকুলধুরন্ধরদিগের পদার্পণে যে স্থান পবিত্র, ফলমূলভোজী যোগীন্দ্র ও তপস্বীদিগের পদস্পর্শে যে স্থান প্রপূত, যমুনা, জাহ্নবী অথবা কৃষ্ণা কাবেরী কিম্বা ব্রহ্মপুত্র বা গোদাবরীর শ্যাম সলিলের উল্লসিত উর্দ্মিমালায় যে স্থান প্রধৌত, হিন্দুর সেই খানেই তীর্থ। এই জন্য প্রাচীন হিন্দুর তীর্থ স্থান সমূহ একদিকে যেমন অনুপম নৈসর্গিক শোভার লীলা ক্ষেত্র, অপর দিকে তেমনি কৃতজ্ঞতা ও পবিত্রতার পরিচায়ক, এই জন্য হিন্দুর তীর্থ হিন্দু হৃদয়ের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল এবং অসাধারণ দৃষ্টান্ত। প্রকৃত ভক্ত, সাধক ও মুমুক্ষের নিকটে এই সকল তীর্থ শিক্ষা, দীক্ষা, সাধন, ভজন, ভক্তি ও মুক্তির পবিত্র স্থল বলিয়া গণ্য। এই জন্য মায়াময় সংসারের বিষম কোলাহলে এবং দুর্নিবার্য্য কঠোরতায় মানবকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিবার জন্য অথবা সংসারতাপদগ্ধ জীবনের শেষাংশ শান্তিতে অতিবাহিত করিবার জন্য তীর্থস্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এই জন্য নরমাংসলোলুপ হিংস্র সর্প ও শ্বাপদকুলসমাবৃত শস্পবিহীন গহন অরণ্য মধ্যেও বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কলরব শুনিলে কিম্বা অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শৈলশরীর হইতে নিঃসৃত নির্ম্মলা নির্ঝরণীর কুলুকুলুবাহী সলিলসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে অথবা নয়নমনানন্দদায়ী প্রসূনপুঞ্জের সুগন্ধি আঘ্রাণ করিলে ভক্ত হিন্দুহৃদয়ে ভগবানের করুণা, কৌশল, মহিমা ও মহত্বের কথা উদয় হয় এবং সেই জন্য অনেক নিবিড় কাননও হিন্দুর তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত হিন্দুরতীর্থে পরিপূর্ণ, এমন কি নাগা, কুকি, গারো, খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি অসভ্যতর জাতি-সমাবৃত এবং দুর্গম পর্ব্বত ও গহন অরণ্য-সমাকুল আসাম প্রদেশেও হিন্দুর তীর্থ বর্ত্তমান। অদ্যকার প্রবন্ধে আসামের সুপ্রসিদ্ধ কামিখ্যা তীর্থের কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। অযোধ্যা, পঞ্জাব বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কামিখ্যায়

আসিতে হইলে মোকামা ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া সামেরিয়া ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়ি-গ্রামে সুপ্রশস্তা ধর্লা নদী পার হইয়া যাত্রা-পুরে আগমন পূর্ব্বক ষ্টিমারের যাত্রী হইতে হয়। এই পথ নানা কারণে অসুবিধা-জনক। ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ দেশীয় স্থান সমূহ হইতে ষ্টিমার যোগে গোয়ালন্দ বা নারায়ণগঞ্জ হইতে একেবারে যাত্রাপুরে আসা যায়; কলিকাতা হইতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহায়তায় যাত্রাপুর পর্য্যন্ত আসা আজিকালিকার দিনে কঠিন কথা নহে। যাত্রীরা যে পথ দিয়াই আসুন না কেন, যাত্রাপুরে আসিয়া সকলকে মিলিতেই হইবে, যাত্রাপুর হইতেই আসামের সীমা আরম্ভ। যাত্রাপুরের নীচে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। দিবা ১১ টার সময়ে রিভার-ষ্টিম-নেভিগেশন কোম্পানীর "লুসাই" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ধুবড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। একেবারে বহুদূর পর্য্যন্ত যাইলে স্নান আহার ও শয়নের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া আমরা ধুবড়ীতে অব-তরণ করিয়াছিলাম। ধুবড়ী অতি ক্ষুদ্র সহর, এখানে দেখিবার কিছুই নাই বলিলেই হয়। সাধারণের সুবিধার জন্য কটন লাই-ব্রেরী নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তকালয় আছে এবং কুকি, গারো ও নাগা খ্রীষ্টান বালক বালিকা-দের পাঠের জন্য একটী ছোট মিশনরী স্কুল আছে। ধুবড়ীতে দুই দিবস অবস্থান করিয়া "হক্" (Hawk) নামক ষ্টিমারে বুধবার সায়াহ্নে আরোহণ পূর্ব্বক বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যার পরে গৌহাটী পৌঁছিলাম। রিভার-ষ্টিম-নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ গুলিতে সমুদয় আসাম প্রদেশের পোষ্টাফিস "মেল" প্রতি দিবস আনীত ও প্রেরিত হয়, এই জন্য ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগের নিকট হইতে এই কোম্পানি প্রতি বৎসর ৮৫ সহস্র টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুবৃহৎ ব্রহ্মপুত্র বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ষ্টিমারগুলি সুদূর ডিব্রুগড় প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত গমনাগমন করে বটে, কিন্তু কামিখ্যা দর্শন করিতে হইলে গৌহাটী পর্য্যন্তই আসা অবশ্যক। ধুবড়ী হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩৸৹, যাত্রাপুর হইতে ধুবড়ীর ভাড়া এক টাকা অপেক্ষা কম। পঞ্চ মুদ্রার কম ব্যয়ে যাত্রাপুর হইতে ষ্টিমার যোগে প্রায় একশতাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী গৌহা-টীতে আসা যায়। গৌহাটী নগরী আকারে বৃহতী না হইলেও এবং এখানে ধুমধামের কোনও নিদর্শন বা লক্ষণ না থাকিলেও, ব্রহ্মপুত্রতটস্থিতা এই প্রাচীনা নগরী দেখিতে মন্দ নহে, ইহার চারি দিকেই পাহাড় এবং জঙ্গল। কোনও অপরিচিত বা নবাগন্তুক ব্যক্তি আসাম প্রদেশে আগ-মন করিলে সর্ব্বপ্রথমেই চারিটী বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। প্রথম—ধুবড়ী হইতে গৌহাটী আসিতে আসিতে ব্রহ্মপুত্র নদের দুই ধারে বিচিত্র প্রকারের গহন কানন সমূহ এবং শৈলমালা দর্শন করিয়া পথিকেরা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৌতূহলা-ক্রান্ত হয়েন। স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ফলবৃক্ষ সমূহ আছে এবং অনেক স্থানে নানা প্রকার ফলমূল পুষ্প অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমরা কার্ত্তিক মাসে প্রচুর পরিমাণে আতা, কাঁঠাল, আনা-রস, পেঁপে প্রভৃতি সর্ব্বত্রই সংগ্রহ করিতে

সমর্থ হইয়াছিলাম। বড় বড় কদলী প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং মৎস্য ও কলা এই দুই দ্রব্য সর্ব্বত্রই সুলভে পাওয়া যায়। ধুবড়ী হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তশৈল (Hidden rocks) আছে, এই জন্য জাহাজকে অনেক সময়ে সাবধানে গমনাগমন করিতে হয় এবং রাত্রিকালে "শান্তি-আলোকের" (Light House) সহায়তা অবলম্বন করিতে হয়। ভারতবর্ষের কোন নদ নদীর দুই ধারে এরূপ অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় না, স্থানে স্থানে সিংহলের দৃশ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। দ্বিতীয়তঃ—আসামের প্রধান প্রধান নগর ও প্রধান প্রধান স্থান সমূহে বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার এত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমরা বঙ্গদেশ হইতে দেশান্তরে আসিয়াছি, বলিয়া সহসা বা সহজে মনে কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। বাঙ্গালীর এরূপ আধিক্যে শিক্ষিত আসামীবৃন্দ বিরক্ত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তথাকার চিফ্ কমিশনর কটন সাহেবের মতে "অন্ততঃ আরও পঞ্চবিংশ বৎসর কাল আসামপ্রদেশে বাঙ্গালীবৃন্দ আসামীদিগের শিক্ষক, পরিচালক, নেতা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপে বর্ত্তমান না থাকিলে আসামের আশু উন্নতি অসম্ভব।" আসামের পল্লীগ্রামসমূহে অথবা অরণ্যময় প্রদেশে প্রবেশ না করিলে প্রকৃত আসামে আসিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ—আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই বংশনির্ম্মিত গৃহ দেখিয়া নবাগত ব্যক্তির চিত্ত মধ্যে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। চিন বা জাপানে যেরূপ বংশনির্ম্মিত প্রাসাদ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেরূপের বা সে আকৃতির গৃহ দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অতি অপরিচিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মধ্যে যেরূপ অতি দীনহীন ও নীচজাতীয় লোকদিগের বংশশাখা (কন্‌চি) নির্ম্মিত দারিদ্র্যভাবসম্পন্ন পর্ণকুটীর দেখিতে পাওয়া যায়, আসামের সর্ব্বত্রই তাহাই দেখিতে পাইবেন। বড় বড় রাজপুরুষদিগের কাছারী কিম্বা জমিদারদিগের আবাস হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র কৃষক কিম্বা ভিক্ষোপজীবী কাঙ্গালের অবস্থিতির স্থান পর্য্যন্ত সমুদয়ই বংশনির্ম্মিত কুটীর। ধুবড়ী সহরে পোষ্টাফিস ও ডেপুটী কমিশনরের খাজানা খানা (Treasury) ভিন্ন ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী নাই, এই দুইটী বাটীও অতি সামান্য আকারের এবং খোলার টাইলের ছাদের পরিবর্ত্তে টিনের ছাদ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আসামের মধ্যে গোহাটী একটা বড় সহর ও বড় স্থান বলিয়া গণ্য, এই সহরের মধ্যেও অতি কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের সহিত দুই একটা সামান্য ইমারৎ বা দালান দেখিতে পাওয়া যায়। আসামের সর্ব্বত্রই বংশনির্ম্মিত সামান্য সামান্য কুটীর। কারণ এই যে, এ দেশে পাথর বা ইটের, অধিক কি, মাটীর বাটীও ভূমিকম্পের প্রকোপে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রতিমাসে গড়ে প্রায় একবার ভূমিকম্প হইয়া থাকে, এইজন্য এ দেশে ইমারৎ স্থির থাকিতে পারে না, তদ্ভিন্ন প্রজা সাধারণের অবস্থাও অতি দরিদ্র এবং বিলাস, সভ্যতা ও শিক্ষাও অতি অল্প। আসামে "দশশালা" বন্দোবস্তের প্রচলন, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে জমিদার এবং প্রজার এতদুভয়ের কাহারই জমিতে অধিকার বা স্বত্ব নাই। জমির করও খুব

উচ্চ, প্রজা সাধারণ বড়ই দরিদ্র। ইংরেজ ভদ্রলোক এবং মেমেরা বাঁশের আবরণে কর্দ্দম লাগাইয়া তদুপরে চূর্ণকের লেপ (White wash) দিয়া থাকেন। চিক্, পর্দ্দা, সামিয়ানা প্রভৃতির ব্যবহারে তাহাদের কুটীরগুলি দেখিতে কিঞ্চিৎ সভ্য ও সৌখীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী বা আসামীদিগের আবাসস্থানগুলি এত ক্ষুদ্র ও জঘন্য যে, কোনও বিশিষ্ট ভদ্র লোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান সহরে কদাচিৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরও দেখা যায়। সে ঘরগুলি দেখিলে পঞ্জাবের প্রান্তঃসীমাস্থ (Frontier) পেশোয়ার নগরের কাষ্ঠগৃহগুলিকে মনে পড়ে। পেশোয়ারে প্রায়ই ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এই জন্য তথায় অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত। আসামে ভূমিকম্পে যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ভূমিকম্প প্রতি বৎসর গড়ে দশবার কথনও বা দ্বাদশবারের অধিক হইয়া থাকে। ৪র্থ—ভারতের অন্যান্য অংশে বিশেষতঃ অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থলে অপরিচিত বা নবাগত ব্যক্তির অবস্থানের জন্য ধর্ম্মশালা, অন্নছত্র, চৌলট্, পান্থশালা, সরাই, আশ্রম প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়; যে সকল পথিক কোনও ভদ্রলোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতিথিরূপে পরিগণিত হইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা এই সকল স্থানে অনায়াসে বিনা ব্যয়ে অথবা সামান্য ব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন, আসামে—বিশেষতঃ আসামের এই অংশে—এবম্প্রকারের কোনও পান্থাশ্রমই নাই, সুতরাং বিদেশীয় লোকদিগের অবস্থান পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়। আসামের লোকদিগের আতিথ্য সৎকার বিষয়ে আমি প্রশংসা করিতে পারি না; বঙ্গদেশ অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের লোকদিগের দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার, অতিথিসৎকার প্রভৃতি গুণের তুলনায় আসামবাসীরা নিকৃষ্টতম; আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীরাও এ বিষয়ে আসামবাসীদিগের পক্ষে সদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারেন নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আসামে যেমন আসামী তেমনি বাঙ্গালী!! পাহাড়, জঙ্গল এবং শ্বাপদ সমতুল্য খাসিয়া, গারো, কুকি, নাগা প্রভৃতি সমাবৃত আসাম প্রদেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মজ্ঞান এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

যাহা হউক, দুই চারি দিবস গৌহাটী নগরীতে অতিবাহিত করিয়া আমি কামিখ্যা শৈলাভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলাম। গৌহাটী হইতে তিন মাইল অর্থাৎ দেড় ক্রোশ দূরে গেলে নীলেশ্বর অথবা কামরূপ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই সার্দ্ধেক ক্রোশ পথ অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার ও অতি প্রশস্ত। গৌহাটী হইতে এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার কিঞ্চিৎ পরেই অরণ্যের আরম্ভ। ক্রমে ক্রমে এই অরণ্য অত্যন্ত নিবিড় হইয়া রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, পাহাড় ও জঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অতি কষ্টে, কৌশলে ও ব্যয়ে এই মহা গহন অরণ্য কাটিয়া কাটিয়া করুণাময় বৃটীশরাজ এই পথটী প্রস্তুত করাইয়া যাত্রিদিগের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। এই বনের দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে সাধুদিগের আশ্রম আছে। কোনও কোনও আশ্রমে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ ও লতায় পরিপূর্ণ এবং পরি-

শোভিত। এই তিন মাইল পথ পর্য্যন্ত হস্তি, অশ্ব, পাল্কী বা অশ্বযানে আসা যায়, কিন্তু তীর্থ স্থানে যাইতে হইলে অন্ততঃ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করা কর্ত্তব্য বলিয়া অনেক হিন্দুর বিশ্বাস থাকায়, অনেকে এই তিন মাইল প্রায়ই পদব্রজে আসিয়া থাকেন। পাহাড়ের নীচে রাস্তার বাম পার্শ্বে পথিকদিগের সুবিধার জন্য একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক একখানি ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া রাখিয়াছেন। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে, পাহাড়ের ঠিক নীচে, অরণ্যের মধ্যে একটী শুভ্র বর্ণের ক্ষুদ্র ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ে উঠিবার ইহাই একমাত্র দ্বার। একজন হিন্দুস্থানী জমিদার এই গেটের উপরে "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর দর্‌ওয়াজা" এই কথাগুলি খোদিত করিয়া দিয়াছেন। খোদিত অক্ষর পাঠ করিয়া স্মরণ হইল, প্রাচীন সংস্কৃত ভূগোলাদিতে, বিশেষতঃ ফাহিয়ান ও হুয়েন্ সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ একই স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গেট্ বা ফটক দিয়া উর্দ্ধে এক মাইল যাইতে হয়। ইহাই পাহাড়ের প্রথম "চড়াই"। এক মাইল উঠিয়া গেলে সুপ্রসিদ্ধ কামিখ্যা মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই এক মাইল বা অর্দ্ধ ক্রোশ উঠিবার জন্য সুগম সিঁড়ি ও পথ থাকিলেও উঠিতে বিশেষ পরিশ্রম হয়। এই পথের দুই পার্শ্বেই অনন্ত গহন বন, সেই বনের ভিতর হইতে নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গের কাকলী লহরী শ্রুত হওয়া যায়। এই বনে বানর, অজগর সর্প, হরিণ, বন্য মহিষ, শার্দ্দূল এবং বনমানুষ (ourangoutang) বাস করে। বনের কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না; চারিদিকে কেবল পাহাড় ও বন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মধ্যে মধ্যে শার্দ্দূল আসিয়া গৃহপালিত পশু এবং মানুষকে হত্যা করিয়াছে, এরূপ দেখা যায় ও শুনা যায়। পাহাড়ে উঠিবার সময়ে পর্ব্বতের গাত্রে স্থানে স্থানে গণেশ, লক্ষ্মী, হনুমান প্রভৃতির খোদিত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বনের ভিতরে ঝিল্লি জাতীয় এক প্রকার কীট যখন শব্দ করে, তখন বোধ হয় যেন একটা বড় চর্‌কী বা চর্‌কার বিকট আওয়াজ হইতেছে। আর এক প্রকার কীটের স্বর ঠিক একটা ছোট রেলওয়ে ইঞ্জিনের মত। আমি আসিয়াখণ্ডের আর কোনও পর্ব্বত বা বনে কখনও এরূপ কীটের অত্যাশ্চর্য্য বিকট শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের নিভৃত স্থল হইতে প্রতিধ্বনি শুনা যায়, কিন্তু কি কারণ বশতঃ এই প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা ঠিক সোজা নহে, অক্র বক্র ভাবে (Zigzag) ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। এক মাইল অতিক্রম করিবার পরে আর একটী ক্ষুদ্র ফটক দেখিতে পাইবেন, তাহাই পর্ব্বতের এক দিকের শেষ দ্বার। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথমে দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ব্যয়ে বিনির্ম্মিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে, তদনন্তর দশমহাবিদ্যার মন্দির এবং তাহার পরে মহাকালীর প্রাচীন দেবালয়। এই স্থান হইতে আরও আট দশ মিনিট কাল উর্দ্ধে উঠিলে আর একটী গেট্ দেখা যায়, এই গেটের প্রায়

একশত হস্ত দূরে এবং ঠিক সম্মুখদিকে আর একটী গেট্, দুই গেটের মধ্যবর্ত্তী শস্পাবৃত ভূমিখণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ কামিখ্যা মন্দির, ইহাই ৫২ পীঠের একটী পীঠ। এই ভূমিখণ্ডে প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত মৎস্য, ফল, মূল, ফুল, দুগ্ধ, দধি, আলু, কদলী, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে। মন্দিরের বর্ণনা ক্রমশঃ করিব, এক্ষণে যাত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

অযোধ্যা, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে নিত্য নিত্য দলে দলে যেরূপ প্রচুর সংখ্যায় যাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় কামিখ্যায় মোটেই যাত্রী নাই। একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিহার, বঙ্গদেশ এবং আসাম ভিন্ন এদেশে আর কোন যাত্রী প্রায় দেখা যায় না। রাজপুতানা, পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি লোক ব্যবসা বা চাকরী উপলক্ষে আসাম প্রদেশে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কথনও কথনও এস্থলে আগমন করেন; বস্তুতঃ যাত্রীর সংখ্যা এস্থানে খুব কম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রায় দেড় শত ব্রাহ্মণ পাণ্ডার বড় বড় গৃহস্থের খরচ অতি সুখে ও স্বচ্ছন্দতায় যাত্রিগণের কৃপায় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অনেক শূদ্রও এই যাত্রীদিগের কৃপায় সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করে। ইহার কারণ পরে বলিব, এক্ষণে যাত্রীর কথা শুনুন। এখানে যাত্রীর সংখ্যা কম হইবার অনেক গুলি কারণ আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কারণ অতীব কৌতুকাবহ।

প্রথম কারণ এই যে, অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত আছে যে, কামরূপের লোকেরা ভৌজ-বিদ্যা ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী এবং ঐ বিদ্যা বলে সেখানকার অধিবাসীরা অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ সম্পাদন করিতে পারে। ঐ বিদ্যাবলে এই ইন্দ্রজালিকেরা ধনবানের ধন, রূপবানের রূপ, যশস্বীর যশঃ, বীরের বীরত্ব, সতীর সতীত্ব, বিদ্বানের বিদ্যা ইচ্ছা করিলেই হরণ করিয়া লইতে পারে। এই বিশ্বাস বহুদূর দেশব্যাপী লোকদিগের মধ্যেও বদ্ধমূল হইয়া আছে, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে জনসমাজে ভীতির উৎপাদন করিয়া আসিতেছে এবং এখনও এই ধারণায় বহুসংখ্যক লোক কামরূপ কামিখ্যায় আসিতে আশঙ্কিত। ২য় কারণ—শাস্ত্রোক্তি এই যে, কামরূপের রাজা রাক্ষস বংশ সম্ভূত এবং তথাকার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা গন্ধর্ব্ব, নাগ, কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতি কুল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী বর হইবার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কোনও ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন করাইয়া দিতে পারে। ৩য় কারণ—অতি পুরাকাল হইতে জনপ্রবাদ এই যে, কামরূপ কামিখ্যার স্ত্রীলোকেরা মোহিনী বিদ্যায় অভিজ্ঞা, তাহারা বিদেশীয় পুরুষদিগকে বশীকরণ মন্ত্র দ্বারা করায়ত্ব করিয়া লয়, সুতরাং কামিখ্যায় যে যায়, সে আর দেশে ফিরিয়া আইসে না। (বাস্তবিক বহুসংখ্যক বিদেশী লোক কামিখ্যায় আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই, কারণ কি তাহা পরে লিখিব)। চতুর্থ কারণ—মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, যাহা কিছু দূরস্থিত, তাহাই যেন আশ্চর্য্যজনক বলিয়া

বোধ করে, এই জন্য ইংরাজি কবি ক্যাম্বেল লিখিয়াছেন:—It is the Distance that lends charms to the view. কালি-কার দিনে রেলওয়ে ও ষ্টিমারে, বিশেষতঃ গৌহাটী হইতে পার্ব্বত্য পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ প্রস্তুত হওয়ায় পথিক-দিগের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু যখন এ সকল ছিল না, তখন গারো, কুকি, খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি শ্বাপদ সমতুল্য অসভ্য জাতি-সমাকুল, বিপদে পরিপূর্ণ, পর্ব্বত-সমাবৃত, গহন কানন-সমাচ্ছন্ন সুদূর ও দুর্গম এবং অরাজক আসাম প্রদেশে আসিয়া কামিখ্যা তীর্থ দর্শন করা একটা অলৌকিক কার্য্য মধ্যে গণ্য হইত।

আমি ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গ, বেহার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মালা-বার উপকূল, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, রাজ-পুতনা, পঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই লোকের মুখে কামিখ্যার যাদু, মন্ত্র, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, ভোজবিদ্যা, স্ত্রীলোকের বশীকরণ বিদ্যা প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি। কামি-খ্যায় লোক আসিয়াছে অথবা কামিখ্যা হইতে পুনরাগত হইয়াছে শুনিলে ভারত-বর্ষের অনেক স্থানের অনেক লোকে এখনও গ্রাম ছাড়িয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। হিন্দু স্থান, মালব ও রাজপুতানার অনেক লোকের বাটীতে বা দোকানে কামরূপ দর্শনকারী কোনও লোক, এমন কি, কোনও ভক্তের বাটীতে কোন গৈরিক বসনধারী কোনও সাধুপুরুষ উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী বা দোকানাধ্যক্ষ টাকা কড়ি সত্বরেই সাবধানে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে; ভয় এই যে, পাছে, কামরূপের মন্ত্র দ্বারা টাকা উড়াইয়া লইয়া যায়। কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে ঐ লোকের নিকটে আসিতে দেয় না; ভয় এই যে, পাছে বশীকরণ মন্ত্রদ্বারা ইহাদিগকে বশীভূত করে। কলিকাতায় যে সময়ে হোসেন খাঁ জিন্নীসাহেবের আবির্ভাব হয়, তখন লোকে ইহাকে কামরূপসিদ্ধ ভাবিয়া ভয় ও ভক্তি করিত। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা" নামক পুস্তকে হোসেন খাঁর অনেক কথা লিখিয়াছেন। কামরূপ কামিখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা, এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ জনপ্রবাদ প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই দেখা যায় ও শুনা যায়। সুদূর কোচিনে, কন্যাকুমারীকায়, লঙ্কায়, ব্রহ্মদেশে, সিঙ্গাপুরে, অধিক কি, কাবুল ও গজনিতেও আমি এরূপ জনপ্রবাদ শুনি-য়াছি। অনেক মুসলমান পুস্তকে কামরূপ "পরীর রাজ্য" বলিয়া লিখিত আছে। কোরাণের ব্যাখ্যাকারী বড় বড় মোল্লা ও মৌলবী অথবা হাফেজ ও হাজী বলিয়া থাকেন "যাদুবিদ্যা এখন কেবল কামরূপ কামিখ্যাতেই আছে, আর সকল দেশে প্রায়ই লোপ পাইল।" আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রবীণ প্রচারক একজন কলিকাতাস্থ মুসল-মান ভদ্রলোক আমাকে অল্পদিন হইল বলিয়াছিলেন, "যাদুবিদ্যা আজ্‌কাল আর দেখা যায় না; যৎকিঞ্চিৎ এখনও কামরূপ কামিখ্যায় আছে।" মুসলমানদিগের কোরাণে যাদুর কথা আছে। মুসলমানেরা যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকে এবং বাইবেলেও মন্ত্রবিদ্যা ও যাদুবিদ্যার আশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ পাঠ করা যায়। লোকের মুখে অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, কামরূপ দেশে

ডাকিনীপাড়া নামে এক গ্রাম আছে, তথায় নিরবচ্ছিন্ন ডাকিনী (Witches) ডাইনগণ বাস করে। ইঁহাদের নিশ্বাসে মানুষ ভেড় হইয়া যায় এবং ইহারা মানুষকে গোলামের মত বশীভূত করিয়া রাখে। বিদেশী লোকেরা ইহাদের হস্তগত হইলে আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। অনুসন্ধান করায় লোকে বলিল, কামরূপ পাহাড়ের উপরে কামিখ্যা মন্দিরের চারিক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের অপর তটে হিংস্র শ্বাপদ সমাবৃত গহনকানন মধ্যে এই ডাকিনীপাড়া গ্রাম অবস্থিত। আমি যাত্রাপুরে আসামের সীমায় প্রথম পদার্পণ করিয়া অবধি গৌহাটী পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিন দুই বেলা ডাকিনীপাড়ার প্রসঙ্গ তুলিয়া ঐ স্থানের নিরাকরণ জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, সকলেই আমাকে বলিয়াছেন "আমরা স্বচক্ষে ঐ গ্রাম দেখি নাই, কারণ ঐ স্থানে যাইতে হইলে গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। তথায় যাইলে মানুষ মরিয়া যায় অথবা তথাকার অধিবাসিদিগের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকে। সেখানে সকলেই স্ত্রীলোক এবং সকলেই ডাকিনী। কামিখ্যা তীর্থের পাণ্ডাদের মুখে ঐ গ্রামের কথা শুনিয়াছি।" পাঠক মহাশয়! আমি কামরূপ পাহাড়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই ঐ গ্রামের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, পাণ্ডারা বলিয়াছিল "শনিবার অথবা অমাবস্যা তিথি ভিন্ন সে গ্রামে কোনও মনুষ্য যাইতে পারে না।" কিন্তু অনেক যাত্রীর অবস্থান কালে অনেক শনিবার গত হইয়াছে, অথচ ডাকিনীপাড়া কেহ কখন দেখে নাই; অনেক যাত্রীর অবস্থান কালে কত অমাবস্যা গত হইয়াছে, কিন্তু সেই গল্পগত ডাকিনীপাড়া কাহারও চর্ম্মচক্ষের সম্মুখে পতিত হইল না!! পুরাকাল হইতে শনিবারের পর শনিবার, অমাবস্যার পর অমাবস্যা গত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কল্পনারাজ্যে অবস্থিত ডাকিনীপাড়া কেহই দেখিল না। পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, "আমাদের পিতা পিতামহ দেখিয়া থাকিবে, আমরা দেখি নাই, সেখানে সকলেই ডাকিনী, সকলেই মন্ত্রসিদ্ধা।" ডাকিনীপাড়ায় লইয়া যাইবার জন্য পাণ্ডাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করায়, পাণ্ডারা সর্ব্বপ্রথমে ভয় দেখাইয়া বলিল, "সেখানে যাওয়া আর সমুদ্রের জলে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করা একই কথা। সেখানে গেলে কি মানুষ জীবন্ত ফিরিয়া আইসে? ঢাকার বড় কর্ত্তা হরেকৃষ্ণ গুহ, কাগ্‌মারির চিনিবাস চাটুর্য্যে, তেওতার গোরাচাঁদ ঘোষাল, হুগলীর রসিক বোস প্রভৃতি ডাকিনীপাড়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই মরিয়া গিয়াছিল। ইহা আমাদের প্রপিতা মহাশয় অনেকের নিকটে গল্প করিয়া গিয়াছেন।" আমি ভীত হইলাম না দেখিয়া অথচ যাত্রীকে অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া পাণ্ডা বলিল, "সেখানে যাইতে গেলে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, সে প্রকারের কষ্ট আপনাদিগের দ্বারা সহ্য হইতে পারে না।" তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত নহি এবং আমার অনুরোধ অনিবার্য্য দেখিয়া পাণ্ডারা টাকা চাহিল, আমি টাকা দিতে স্বীকৃত হইলাম। শেষে এরূপ চুক্তি হইল যে, যদি তাহারা টাকা লইয়া আমাকে ডাকিনীপাড়ায় লইয়া না যায় এবং ডাকিনীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া না দেয়, অথবা ডাকিনীপাড়া নামে বাস্তবিক যদি

কোনও গ্রাম না থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে তাহারা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইবে। এই কথা শুনিয়া পাণ্ডাদের কেহ অসুস্থতার, কেহ বা অবকাশহীনতার, কেহ বা অন্য কিছুর ভাণ করিতে লাগিল, সুতরাং তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না। রাত্রিকালে একটী হিন্দুস্থানী "সাধু" আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময়ে আমরা এক জন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সরল হৃদয়ের পাণ্ডাকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। পাণ্ডা আসিলে ঐ তেজস্বী হিন্দুস্থানী সাধু তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "দেখ পাণ্ডাজি! আমরা তোমাকে অদ্য রাত্রে যে প্রশ্ন করিব, তাহার যদি মিথ্যা উত্তর দাও, তাহা হইলে যে জগন্মাতা কামিখ্যা দেবীর নামে ও কৃপায় তুমি এবং তোমার পরিবারস্থ নরনারীগণ পুরুষানুক্রমে পোষিত হইয়া আসিতেছ, সেই দেবীর অভিশাপে তুমি দুই দিবসের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং তৎসঙ্গে আমারও অভিশাপ এই যে, ঐ ভয়ানক ব্যাধি কর্তৃক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতে করিতে তুমি মুখ হইতে শোণিত নিঃসরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই দেখ, বিল্বপত্র হাতে করিয়া অভিশাপ দিলাম।" সাধুর এই কথা শুনিয়া পাণ্ডাজী কাঁপিতে লাগিল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে ভয়ে ভয়ে বলিল "আপনার প্রশ্নের আমি যথার্থ উত্তর দিব, আপনি প্রশ্ন করুন।" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য করিয়া বল দেখি, ডাকিনীপাড়া নামে কোনও গ্রাম আছে কি না?" পাণ্ডা বলিল, "মহাশয়! এ কথার গোপনে উত্তর দেওয়াই আবশ্যক। বাস্তবিক ডাকিনী পাড়া নামে কোনও গ্রাম নাই, এই জনপ্রবাদ অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ডাকিনীপাড়া নামে বাস্তবিক কোনও গ্রাম বা স্থান নাই।" আমি বলিলাম, "তবে তোমরা এরূপ মিথ্যা জনরবের প্রশ্রয় দাও কেন?" পাণ্ডা বলিল, "এরূপ দুই একটা জনরব না থাকিলে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য্য প্রকৃতি রক্ষা পায় না।" আমি বলিলাম, "তোমরা বাতুল ও নির্ব্বোধ; বুঝিতেছ না, এইরূপ জনরবে তোমাদেরই সমূহ ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে? পূর্ব্বে এখানে পথের দুর্গমতায়, বিশেষতঃ যাদু, মন্ত্র, ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, বশীকরণ বিদ্যা প্রভৃতির ভয়ে লোকে আসিত না; এখন এদেশে রেল, ষ্টিমার, প্রশস্ত পথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, লোকে সহজেই আসিতে পারে, কিন্তু তোমরা ভূত, প্রেত, ডাইন, মোহিনী বিদ্যা প্রভৃতির মিথ্যা ভয়ে জনসাধারণকে এমনই আশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ যে, তাহারা আসিতে পারিতেছে না। এই ভয়ের অপনোদন হইলে গৃহস্থের কুলবধূরা পর্য্যন্ত এই তীর্থে আসিতে পারে এবং যাত্রীর সংখ্যা অধিক হইলে তোমাদেরই সর্ব্ব প্রকারে লাভ। অতএব এই সকল মিথ্যা জনরবে তোমাদেরই ক্ষতি দেখিতেছি।" রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া পাণ্ডাজী উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আমরাও বহুকালের ডাকিনীপাড়া রহস্যের উন্মেষণ হইল দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পাঠক মহাশয়! দেবীর মন্দির কিম্বা কামিখ্যা পাহাড়ের উপরিস্থিত অংশের কথা আমি এখনও তুলি নাই; অনেক মহা কৌতুকাবহ রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে এখ-

নও অনেক বাকী আছে। কিন্তু এই রহস্য মালার উন্মেষণের পূর্ব্বে আপনাকে আরও দুই একটা হাসির কথা শুনিতে হইবে।

আমি বহুকাল হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে শুনিয়া আসিতেছি, গৌড়-বাঙ্গালা দেশে অতি পূর্ব্বে গোপীচাঁদ নামে এক রাজা বাস করিতেন। ঐ রাজা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় সমস্ত জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েন। তিনিই যাদু বিদ্যা, মন্ত্র বিদ্যা, বশীকরণ বিদ্যা প্রভৃতির স্রষ্টা এবং বাঙ্গালা দেশই ঐ সকল বিদ্যার আদি স্থান—বাঙ্গালী জাতিই ঐ সকল বিদ্যার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষতঃ বেহার, মালব, উত্তরপশ্চিম এবং রাজপুতানায় এই প্রবাদ এখনও লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে শুনিতে পাইবেন। ঐ সকল দেশে সহস্র সহস্র লোক গোপীচাঁদের অদ্ভুত কীর্ত্তি সমূহের গীত ও গজল্ গাহিয়া ভিক্ষা করে, নানা স্থানে গোপীচাঁদের জীবন চরিত্র লইয়া কথকতা ও পাঁচালী হয় এবং স্ত্রীলোকেরা অনেক স্থলে গোপীচাঁদের নামে পরস্পরের নিকটে শপথ করে। গোপীচাঁদের জন্ম, প্রেত হস্তে মৃত্যু, প্রেতলোকে গমন, ভূতগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধ, মন্ত্রবলে দিগ্বিজয়, তাঁহার রাণীর সহিত বিচ্ছেদ, গোপীচাঁদের পুত্রশোক ও বনগমন প্রভৃতি করুণ-রসাত্মক বিবরণ লইয়া ঐ সকল দেশে ভূরি ভূরি গ্রন্থ বিরচিত হইয়া গিয়াছে; হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় এরূপ অন্ততঃ বিশ খানি গ্রন্থ দেখিয়াছি। আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার হিন্দী পাঠ্য পুস্তকেও গোপীচাঁদের জীবনচরিত একবার অধীতব্য বিষয় ছিল। বাঙ্গালী জাতি যাদুকরের জাতি এবং বাঙ্গালা দেশ মন্ত্রবিদ্যার আকর,—এই বিশ্বাস ঐ সকল স্থানের লোকদিগের হৃদয়ে খুব দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশাবতংস (অধুনাতন বোম্বাই-এর) সুবিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত প্রিন্স্ রবি বর্ম্মা মহাশয় গোপীচাঁদের সুন্দর চিত্র পর্য্যন্ত আঁকিয়াছেন এবং পুনা চিত্রশালার অধ্যক্ষগণ দুই আনা মূল্যে গোপীচাঁদের আর একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। অথচ বঙ্গদেশের কেহই গোপীচাঁদের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। বাঙ্গালা দেশে গোপীচাঁদ নামে কেহ রাজা ছিল না, একথা এক সময়ে এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন বলিয়া, রাজপুতানার কোনও মিত্র রাজ্যের হিন্দুনরপতি ঐ "বাতুল বাঙ্গালী ভদ্রলোককে" রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা গোপীচাঁদের কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারাও গোপীচাঁদের জন্মস্থান বা রাজধানীর নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ কল্পিত গোপীচাঁদ এবং গোপীচাঁদের জাতি, মাড়োয়াড়িদিগের হৃদয়ে যেরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেকের মনে কল্পিত ডাকিনীপাড়া এবং কামরূপের কল্পিত মন্ত্রবিদ্যা সেইরূপ আতঙ্কের উৎপাদন করিয়াছে।

পাঠক মহাশয়! আমি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসামে আসিয়াছিলাম, সুতরাং মোকামা ঘাটে গঙ্গাপার হইয়া সামেরিয়া ঘাট ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ পূর্ব্বক বেহার অঞ্চল পরিব্রজন করিতে করিতে আমাকে কামরূপের দিকে আসিতে হইয়াছিল। বেহারের বারুণী জংশন ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক একজন সম্রান্ত বিহারী

ভদ্রলোকের বাটীতে আমি কয়েক দিবসের জন্য অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি কামরূপ যাইতেছি শুনিয়া, বেহারী জমিদারের পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় জনৈক অমাত্য বলিয়া উঠিলেন, "কন্ কি মশায়! কামরূপে কি মানুষে যাতি পারবা? ইশ্, ইশ্! কন্ কি কর্তা! আপুনি কি ডাইনের খোজ খবর রাখেন না? কামিখ্যায় মানুষে যাতি পারে না।" আমি বলিলাম, "যদি মানুষে যাইতে না পারে, তবে কি পশুতে যায়?" পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "পশুতেই যায়; যাহারা যায়, তাহারা পশু এবং পশু হইবার জন্যই তথায় যায়।" বেহারী জমিদার বলিলেন, "আপনি গৈরিক বসনধারী সাধু, আপনার পক্ষে কামরূপে যাওয়া বোধ হয় ততটা অসম্ভব না হইলেও হইতে পারে, কারণ আপনারাও মন্ত্রাদি জানেন; কামিখ্যার লোকেরা যাদু করিলে আপনারা তাহার খণ্ডন মণ্ডন করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন, কিন্তু তথাপি ঐরূপ স্থানে না যাওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়।" এই সকল কথা বারুণী জংশন রেলওয়ে ষ্টেশনে হইতেছিল; রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ইউরোপীয়ান তথায় উপস্থিত ছিলেন, ইনি মোটা বেতনে রেলওয়ের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে ইনি বলিয়া উঠিলেন—

"I passed many years of my life in the junglee Assam, and can authoritatively say that there is any amount of *Jadu* among the Assamee women. That these pilly Kamroopees are a striking people admits of on doubt. I have heard and read enough of them and I do believe that they can cast any amount of Jadu in and out of season."

কামরূপের যাদুর কথা লইয়া সকলেই কিছু কিছু বলিতেছেন দেখিয়া জনৈক হিন্দুস্থানী জমাদার সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর যো কুচ্ ফোর্মায়া হ্যায় বিল্‌কুল্ সহী ও সালিম্‌হ্যায় কেঁওকে মেরে চাচায়া ভাই সাহেব কা দামাদকা নানিকি ভাউ করিবন্ বিশ্ বরষ্ সে উনি পাহাড় বক্‌রা বন্‌কে গেপ্তার হ্যায় আওর অন্‌করিব্ বার বরষ গুজরা হুয়া হামারে গাঁওসে তিন আদমী কামরূপ পাহাড় পর্ দেবীজিকো দর্শন্‌কো লিয়ে আয়েথে, মগর্ আব্ তক্ ওয়াপীশ্ আয়া নেহি, শুনাহুঁযো কোই আতা হ্যায় সো লোট্‌তা নেহি।" আমি দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া কামরূপাভিমুখে আসিবার সময়েও তথাকার অনেক লোকের মুখে ঐরূপ কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছিলাম। কুড়িগ্রামের নিকটে ধর্লানদী পার হইয়া নদীর বিস্তৃত সৈকতভূমে ট্রাম গাড়ীর ন্যায় তথাকার রেলওয়ে শকটে আরোহণ পূর্ব্বক একটী অর্দ্ধবয়স্ক এবং সভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আমি আলাপ পরিচয় ও কথোপকথন করিতে লাগিলাম। ইনি শিক্ষাবিভাগের বেতনভোগী লোক, ধুবড়ী জেলার অন্তর্গত রূপসী নামক স্থানে যাইতেছিলেন। লোকটীকে শিক্ষিত এবং বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগের ভদ্র কর্ম্মচারী জানিয়া আমি তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপথনে নিযুক্ত ছিলাম। ঐ ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, "আপনি অনেক দূর হইতে অনেক অর্থব্যয় ও কষ্ট এবং পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সহিত কামরূপে ভগবতীর দর্শনলাভ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন,

এই হেতু কামিখ্যায় যাওয়া নিষেধ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া এখন বিবেচনা করি না, বিশেষতঃ কামিখ্যার অতি নিকটে আপনি আসিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বর করুন, আপনি নিরাপদে কামিখ্যা শৈলে উপস্থিত হউন এবং নিরাপদে তাহা হইতে প্রত্যাগত হউন, কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি উপদেশ দিতেছি, আমার কথাগুলি যেন আপনার স্মরণ থাকে।" পাঠক মহাশয়! কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে একখানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে আমি "My first Impressions of Assam" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধের এক অংশে এই বন্ধুর কৌতুকাবহ উপদেশগুলি বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ইংরাজি হইতে উহারই কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"কামরূপ কামিখ্যার নাম ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের লোকের নিকট পরিজ্ঞাত। এই কামরূপ নামে অনেকের মনে আতঙ্ক ও আশ্চর্য্যের উদয় হয়। এই কামরূপের নামে অনেকে মিথ্যামন্ত্র ব্যবহার করিয়া উদরপূরণ করে এবং জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করে। বাজারে যে সকল ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভোজবাজি বা ইন্দ্রজালের ভাণ করিয়া তামাসা দেখায়, তাহারা কোন আশ্চর্য্য খেলা খেলিবার সময় প্রায়ই বলে,

কার আজ্ঞা?

জয় মা! কামরূপ কামিখ্যার আজ্ঞা!! অনেক ইউরেশিয়ান, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, আমেরিকান, ইউরোপীয়ান এবং মুসলমানও একথায় বিশ্বাস করেন। অনেক দিন হইল, দক্ষিণ-ভারতের (মান্দ্রাজের) কোইম্বাটুর জেলার অন্তর্গত ইরোদ্ (Erode) নামক মহকুমার একজন ইউরেশীয়ান ভোজ বাজির তামাসা (Magic) দেখাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে সে ব্যক্তি বলিতেছিল—

Bravo! Bravo! Who orders it to be done?
Hik! Mik! Nik!
Kick! Prick! Lick!
I say, the Satan shall cease to breathe.
Hik! Mik! Nika!
By order of the Kamiksa!!

এই ভয়াবহ কামিখ্যায়, এই প্রেত প্রেতেনী, নাগ নাগিনী, ডাকিনী, মোহিনী পরিবৃত কামাখ্যায়—আমি সম্প্রতি গমন করিয়াছিলাম। যাত্রাপুরে আসামের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাকে কামরূপ সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনাইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। বন্ধু বলিলেন, সাবধান! সাবধান! যে কোনও মতেই আপনি তাহাদের করায়ত্ত না হয়েন। কামরূপের পুরুষদিগের হস্তে ভয় নাই; যত ভয়, যত বিপদ তাহা কেবল তথাকার মন্ত্রবিদ্যা পারদর্শিনী সর্ব্বনাশিনী স্ত্রীলোকের দ্বারাই উদ্ভূত হয়। পাহাড়ের সেই সকল স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত রূপবতী এবং অত্যন্ত কামাতুরা, এই জন্য এই দেশের নাম কামরূপ; শিবের কোপানলে যে মদন (কাম) ভস্ম হইয়াছিল, এই কামরূপ তাহারই সৃজিত এবং তাহারই রাজ্য। ভস্মীভূত হইয়াও কাম আবার জীবিত হইয়াছিল এবং এখনও নিরাকার রূপে এদেশ শাসন করিতেছেন। দেবীর প্রকৃত নাম কামিখ্যা নহে— "কামাখ্যা", অর্থাৎ কাম যাহার আখ্যা কিম্বা "কামাক্ষী" অর্থাৎ যাহার দৃষ্টিতে কাম। এই দেবী সেই হরকোপানলদগ্ধ মদনের মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়া এক্ষণে

কামরূপে বর্ত্তমান। এক্ষণে কাম ভিন্ন অন্য কথা নাই। স্মৃতিতে মনু বলিয়াছেন, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অষ্টগুণ অধিকতর কামাতুরা; মহাশয়! আমি বিবেচনা করি ঐ পাহাড়ের এবং ঐ দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষাপেক্ষা অষ্টশত গুণ অধিক কামপরায়ণা। উহারা স্বদেশীয় পুরুষে অধিক অনুরক্তা নহে। বিদেশীয় পুরুষেই অধিক অনুরক্তা। বিদেশীয় পুরুষ আসিলে তাহাকে আর দেশে ফিরিয়া যাইতে দেয় না, মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ঐ দেশে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কাহাকে কাহাকে ভেড়া, ছাগ, গো, হরিণ করিয়া রাখিয়া দেয়। বিদেশীয় পুরুষেরা ইহাদের স্বামী হয় এবং স্বামী হইয়াও গোলামের মত বশীভূত থাকিতে বাধ্য হয়। এই সকল গোলাম বা ক্রীতদাসেরা এই সকল স্ত্রীলোকদিগের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই নিযুক্ত থাকে। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য কেহ অনিবার্য্য রূপে ক্রন্দন করিতে থাকিলে, স্ত্রীলোকেরা তামাসা করিয়া বলে, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও; কিন্তু ঐ হতভাগ্য পুরুষ, ঐ মন্ত্র বশীভূত পুরুষ, সমস্ত দিন ঐ পাহাড়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার স্বল্প সময় মধ্যেই ঐ স্ত্রীলোকের কুটীরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। মহাশয়! সাবধান! সাবধান! দেখিবেন, যেন উহাদের হস্তে পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত না হয়েন। স্ত্রীলোকেরা আপনাকে তাম্বূল (পান) খাইতে দিলে, খাইবেন না; তাহারা কোনও পুষ্প বা ফল দিলে সহসা তাহা গ্রহণ করিবেন না; কোন স্ত্রীলোকের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবেন না, অথবা কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কলহ করিবেন না; আপনার দ্বারায় কোনও স্ত্রীলোক যেন বিরক্ত বা কুপিত না হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!! স্ত্রীলোকে কোনও কাষ্ঠাসনে (বিশেষতঃ পিড়ি নামক পদার্থে) বসিতে বলিলে সহসা তাহাতে বসিবেন না, কারণ এরূপ আসনে বসিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ কাষ্ঠাসনে বসিলেই কয়েক মিনিটের পরে আসনোপরিস্থিত আপনার শরীর শূন্যে অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে এবং পক্ষীর ন্যায় উড়িতে উড়িতে ঝটিতি ডাকিনীপাড়ায় আপনি উপস্থিত হইবেন, তথা হইতে ডাকিনীরা আপনাকে আর আসিতে দিবে না। কেবল যে ডাকিনীপাড়াতেই এইরূপ স্ত্রীলোক আছে, তাহা নহে, কামিখ্যা শৈলোপরিস্থিতা সকল স্ত্রীলোকই মন্ত্র বিদ্যায় সিদ্ধহস্তা এবং কামরূপ দেশের প্রায় সকল স্ত্রীলোকেই কিছু কিছু যাদু নিশ্চয়ই জানে। দেখিবেন যেন, সুগন্ধি দ্রব্যব্যবহারে, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যবহারে, উত্তম পরিচ্ছদ ধারণে বা ভাল করিয়া কেশাদি বিন্যাসে আপনি স্ত্রীলোকের মনোনীত না হন। এইরূপ অনেক কৌতুকাবহ কথা শুনাইয়া বন্ধু আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।” (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মনের ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় কি ?

সমাজ ও সাহিত্যে যে সম্বন্ধ, তাহা আমারা ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখন দেখা যাউক, ভাষা কাহাকে বলে। মনের ভাব বা মনোবৃত্তিগুলির বাহ্য অভিব্যক্তির

অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন রকমে সংযুক্ত ও সজ্জিত, আমাদের কণ্ঠস্বরের নানাবিধ পরিবর্ত্তনের সাধারণ নাম ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, ভাষার উপযুক্ত হইতে হইলে তাহাদিগের প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র অর্থ থাকা আবশ্যক। বিশিষ্ট অর্থপ্রকাশক শব্দের যোজনায় মনোভাব ব্যক্ত করাই ভাষা। ভাষাই মনোভাবের অভিব্যক্তি—ভাষাই তাহার বাহ্য আকৃতি।

কিন্তু শব্দ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রকার উপায়েই মনোভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে। স্বতঃই সকলের মনে হইতে পারে যে, 'কথা নাই বা কহিলাম, কাগজে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিব।' যদিও লেখা অপ্রত্যক্ষ ভাবে মনোভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কর্ত্তব্য চিহ্নের দ্বারা শব্দ বিশেষের অভিব্যক্তি। অক্ষর বা বর্ণ মনুষ্য সম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন মাত্র। কথিত ভাষা না থাকিলে লিখিত ভাষা থাকিতে পারে না। ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয়, তার পর হস্তের সাহায্য।

চিত্রাক্ষর (Hieroglyphics) দ্বারা মনোভাব যৎকিঞ্চিত প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু যদি চিত্রাক্ষরই মনোভাব ব্যক্ত করিবার একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইত না। চিত্রাক্ষর লিখিতে যে নৈপুণ্য, পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময় আবশ্যক হয়, তাহা বিচার না করিলেও দেখা যায় যে, ইহার দ্বারা কেবল প্রাকৃতিক বস্তু বিশেষই সম্যকরূপে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা বিশেষণ বা ক্রিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা চিত্রাক্ষরের নাই।

অনেক সময় আমরা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি। যদিও আমাদিগের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের প্রায় সকল গুলিই অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার দ্বারা সভ্যজীবনের সকল কথা বুঝাইতে পারা যায় না। যখন আমরা ক্ষুধায় কাতর হই, তখন মুখের কাছে পুনঃপুনঃ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াই সে ভাব প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের কোন তথ্য প্রকাশ করিতে হইলে অঙ্গভঙ্গী অপারগ হইবেই হইবে।

মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলের মাংসপেশী কুঞ্চিত বা বিস্ফারিত হয়। তাই মুখভঙ্গী দ্বারা ক্রোধ বা হর্ষ বা বিষাদ প্রভৃতি সূচিত হইয়া থাকে। ক্রোধ হইলে আমরা ভ্রূকুঞ্চিত করি, চক্ষু বিস্তারিত ও আরক্ত হয়—হর্ষ হইলে আমরা হাসি, বিষাদে চক্ষু আনত হয়। বদনমণ্ডল কেমন স্ফূর্ত্তিহীন ও মলিন হইয়া পড়ে। মনের ভিতর কোন বিকার হইবামাত্রই স্নায়বিক প্রক্রিয়ানুসারে অঙ্গের মাংসপেশীগুলী সঞ্চালিত হইয়া সেই মনোবিকারের লক্ষণগুলি বাহ্যতঃ প্রকাশিত হয়।

কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনেও আমরা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। বড় বিরক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত রুক্ষস্বরে আমরা বলিয়া থাকি—"আঃ"; কিন্তু আরামের সময় সেই রুক্ষ "আঃ"কে একটু দীর্ঘ করিয়া কমলস্বরে বলি—"আ-আ-আঃ।" এইরূপ

"আঃ" "ইঃ" "উঃ" "ওঃ" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে আমরা বড় বেশী কিছু প্রকাশ করিতে পারি না। কিন্তু সামান্য যে কয়েকটী মনোভাবই প্রকাশিত হয়, তাহাই মনুষ্য সম্প্রদায়ের পক্ষে সাধারণ। সকল দেশেই, সকল মনুষ্যই একই অবস্থায় পতিত হইলে সেইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী তদ্রূপ নহে। মানুষ আপন আপন অবস্থাভেদে সময়োপযোগী এক এক রকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কথিত ভাষা, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত ভাষা হইতেও অধিক মাত্রায় নব কপোলকল্পিত। কোন একটী বিশেষ ভাব এবং সেই ভাবটী প্রকাশ করিবার উপযুক্ত একটী বিশেষ শব্দের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই। "পুস্তক বলিলেই যে কেন কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন-সমন্বিত এক যোগাগ্রথিত কাগজ মনে করিতে হইবে, তাহা বলিতে পারি না। "কপুস্ত" বা "স্তপুক" বা স্তকপু বা "কস্তপু" বলিলে আমরা "পুস্তক" বুঝিব না কেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহার কোন নিয়ম নাই—কোন যুক্তি নাই। কোন্ শব্দটী ব্যবহার করিলে আমি যে কি বুঝিব, তাহা আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই অসভ্য জাতির ভিতর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করার প্রচলনই অধিক। মানুষ যতই সভ্য হয়, ততই নিয়ম-নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবার ইচ্ছা তাহার প্রবলা হয়। সেই ইচ্ছার ফলেই আমাদিগের সমাজও লিখিবার বর্ণমালা।

যাহার অভাব নাই—অভিযোগ নাই, চিন্তা নাই, মনোভাব প্রকাশের আবশ্যকতা নাই, তাহার কোন ভাষাও দরকার হয় না। অভাব-অভিযোগ-শূন্য, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী প্রাণী হয় দেবতা, না হয় পশু। তাই পশু জাতির অস্ফুট ধ্বনি আছে, ভাষা নাই। দেবতার ভাষা আছে কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু যাহার চিন্তা আছে, চিন্তার অভিব্যক্তি আবশ্যক, যাহার দুঃখ আছে, দুঃখ সহানুভূতি প্রার্থনা করে, যাহার সুখ আছে, সুখ সঙ্গীর জন্য লালায়িত, তাহারই ভাষা আবশ্যক, শব্দের আবশ্যক। মনুষ্যের কল্পনা-প্রসূত কথিত ভাষাই তাহাকে পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। কারণ ভাষাই সমাজের আদিম বন্ধন; যেখানে ভাষা নাই, সেখানে সমাজ নাই; আবার যেখানে সামাজিকতার অভাব, সেই খানেই ভাষারও অভাব। ভাষা ও সমাজ পরস্পর সম্বন্ধ-বদ্ধ একের অভাবে অন্যটীর অস্তিত্ব অসম্ভব। ইতর প্রাণীর ভিতর সমাজ-বন্ধন নাই, তাই তাহাদিগের ভাষাও নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে তাহার কল্পনা-প্রসূত নহে, ভাষা ধীরে ধীরে কোন্ এক অজানিত পথে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইয়াছে।

যদিও ভাষা এক জনের জন্য নহে, সমাজের জন্য—কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ ভাষার নির্ম্মাতা নহে। অমুক জিনিসকে "পুস্তক" বলিব, আমরা কাহারও সহিত এরূপ কোন বন্দোবস্ত করি নাই। আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহা আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদিগের সামাজিক রীতি-নীতি যেরূপ পাইয়াছি, সেই প্রকার। কিন্তু তাঁহারা ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? উত্তরে আমরা

বলিব, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে। মূলতঃ ইহার অধিক আর আমরা কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যখনই একটী নূতন ভাব বা নূতন দ্রব্য আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা তখনই তাহার অভিব্যক্তির জন্য একটী নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকি। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভক্ত নামদেব।

সাধু বামদেব অতি কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেন বটে, কিন্তু মন শ্রীহরি-পাদপদ্ম-সুধাপানে নিরত থাকিত। অনাসক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সাধু মহাত্মাদিগের উপদেশ। সেই উপদেশ তিনি বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে তাহা প্রতিফলিত হইত। গৃহে একটী শ্রী বিগ্রহ ছিল। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে স্বহস্তে তাঁহার পূজা করিতেন। যে সকল মহাপুরুষ ভগবানে মনপ্রাণ অর্পণ করেন, তাঁহারা প্রায়ই সাংসারিক সুখে বঞ্চিত হন। বাম দেবের ভাগ্যে এই মহাসত্যের অপলাপ হয় নাই। সন্তানের মধ্যে একটী কন্যা, সেটীও ভাগ্যদোষে বিধবা। বামদেব ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষাদানে কন্যাকে বিগ্রহের সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তি ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বামদেব-তনয়াকে কৃপা করিলেন।

এক দিবস রজনীতে বামদেব-দুহিতা নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখে আছেন। এক দিব্যকান্তি পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, বৎসে! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তাহাই পূর্ণ হইবে। যৌবন উত্তীর্ণা রমণী অপত্যধনে বঞ্চিতা হইলে প্রায়ই অপত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, বামদেব-দুহিতাও একটী অপত্যের প্রার্থনা করিলেন। ভগবান প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। যে বরে ধর্ম্মপ্রাণ যীশু, কুমারী মেরীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বরে নামদেবও সুলক্ষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত-লেখক ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, পাঠক একবার তাহা স্মরণ করুন। দত্ত মহাশয়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বিশেষরূপ তথ্যানুসন্ধান না করিয়া যে এইরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। বিশেষ তিনি পরমহংসদেবের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন।

পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রামকৃষ্ণের জন্ম এবং বাল্যকালের অবস্থা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিম্বদন্তি আছে। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গমন করিয়া একদিন রজনীযোগে স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটী চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "দেখ আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব"। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল এবং মনে মনে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী একদিন নিজ গ্রামে বাটীর সন্নিকটে অপর দুইটী প্রতিবাসিনীর সহিত দণ্ডা-

রমান ছিলেন। ঐ বাটীর সন্নিধানে একটী শিবমন্দির আছে। সেই শিবালয়ের দিক্ হইতে ঘনীভূত বায়ু তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ কথা সঙ্গিনীদিগকে কহিলেন। ইহাদের মধ্যে এক জনের নাম ধনী ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না, অথবা তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্তও কাহাকে খুলিয়া বলিলেন না।

চৈতন্যদেব, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম সম্বন্ধেও অনৈসর্গিক ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। চৈতন্যদেব মাতৃগর্ভে দ্বাদশ মাস থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হন্। শুকদেবও নিয়মিত সময় অতিবাহিত করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যাঁহারা এই মরধামে ধর্ম্মজগতে পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভগবান্ প্রেরিত। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মস্থাপনার্থ ভগবান্ কোন ভক্ত মহাত্মাকে প্রেরণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, বরং ইহা সুযুক্তি-পূর্ণ। প্রেমাবতার চৈতন্যদেব, দয়ার সাগর বুদ্ধ, বিরক্ত বৈরাগী যীশু, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জন্মসময় এবং তৎকালীন ধর্ম্মজগতের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত করিলে ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, ব্যক্তিদিগের নিকট এখন আর অপরিজ্ঞাত নাই। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ, বীভৎস তান্ত্রিক মতের প্রাধান্তে নরবলি প্রভৃতি ঘটনা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পঞ্চ "ম"কার না হইলে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান হইত না। যে দুই চারি জন ধার্ম্মিক সে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেন এবং ভগবানের নিকট যাহাতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া উন্নত হয়, তাঁহার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। এই প্রার্থনার ফল স্বয়ং চৈতন্যদেব।

যে সময়ে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ধ্বজা সুদৃঢ়রূপে প্রোথিত হইতেছিল, যখন হিন্দু-সমাজের গণ্যমান্য বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সন্তান সকল দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন, এবং যাঁহারা, স্বধর্ম্মে ছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছিল, সেই দুর্দ্দিনে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তাঁহার আবির্ভাবে স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা ভারত-গগনে উড্ডীন হইয়া, সনাতন ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল।

সময় হইলে ভক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। তাঁহারা কোন বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ নহেন। প্রকৃতি তাঁহাদের চরণে শত শত নমস্কার করিয়া স্থান ছাড়িয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িবেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ভক্ত, ভাগবত, ভগবান এক; তিনে এক, একে তিনি। ধর্ম্ম এক। খ্রীষ্টের উপদেশে, চৈতন্যের উপদেশে কি কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়? ভগবান ভক্তহৃদয়ে, ভক্ত ভগবানহৃদয়ে যুগলরূপ ধারণ করিয়া লীলা করেন। একথা যে বুঝে, সে দেবতা। হিন্দু এ কথা যে সময়ে বুঝিত, তখন ঋষি-যুগ, সে

দিন গিয়াছে, তাই ভারতে ধর্ম্মের আজ এত অধোগতি!

ভগবান্ মানুষের মত হইয়া, মানুষের মত সুখ, দুঃখ, তাড়না ভোগ করিয়া মর্ত্তো লীলা করেন, আবার সময় হইলে প্রস্থান করেন, একথা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীও স্বীকার করেন। করেন কিনা দেখুন :—

I make myself known to some under the more familiar appearance of human forms and by a sudden immediate communication of Divine light open the deepest mysteries to others.

Of the Immitation of Christ—Thomas A Kempis.

দুহিতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ হইলে বামদেব কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনাহারে শ্রীবিগ্রহ-সমীপে রজনীতে পড়িয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ কি বলিলেন, পাঠক শ্রবণ করুন।

বহু খেদান্বিত হৈয়া ঠাকুরের স্থানে।
করযোড়ে কহে কর লজ্জা নিবারণে॥
নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে।
মোর বরে তোমার কন্যার হেন গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব বশ না হইবে খর্ব্ব।

ভক্তমাল।

যথা সময়ে দুহিতার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বামদেব দৌহিত্রের নাম রাখিলেন নামদেব। নামদেব আশৈশব হরিভক্ত। লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া ধর্ম্মবীর নামদেব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে পুলকিত হইয়া বিগ্রহ সমীপে নৃত্যগীত এবং গড়াগড়ি দিতেন। সময় সময় বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া শীতল হইতেন। এইরূপে ভক্তপ্রবর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামান্তরে বৃদ্ধ বামদেবকে কার্য্যবশতঃ গমন করিতে হইবে। বিগ্রহের পূজার ভার গ্রহণ করিবে কে? দৌহিত্র অল্পবয়স্ক; রীতিমত পূজা-পদ্ধতি অবগত নহে। বামদেব চিন্তিত হইলেন। নামদেব মাতামহের চিন্তার কারণ জানিতে ব্যগ্র হইলেন। মাতামহ বলিলেন, ভাই, তুই এক দিবসের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে, বিগ্রহের সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না। নামদেব পূজার ভার গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মাতামহও উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্মত হইলেন এবং সাবধানে পূজা করিবার জন্য বার বার উপদেশ প্রদান করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন।

নামদেব পূজার সময় পূজাকার্য্য সমাধা করিলেন। অপরাহ্নে দুগ্ধ-ভোগ দিতে হইবে। দুগ্ধ আনিয়া স্বহস্তে আওটাইয়া তাহাতে মিছরির গুঁড়া দিলেন এবং পবিত্র পাত্রে সেই দুগ্ধ লইয়া শ্রীবিগ্রহ সমীপে উপস্থিত হইলেন। দুগ্ধপাত্র বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "হরি কৃপা করিয়া আপন হস্তে তুলিয়া দুগ্ধ পান কর, নতুবা আমি শ্রীবদনে দুগ্ধ ধরি। কেন ঠাকুর আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছ? এবং দুধ খাইতেছ না, আমি এ স্থানে থাকিলে বুঝি খাইবে না, তবে আমি বাহিরে যাই, তুমি দুগ্ধ পান কর"—এই বলিয়া সরলপ্রাণ বালক ঠাকুর-গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং কিছু সময় অন্তে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল, হরি দুগ্ধ খাইতেছেন কিনা। কিন্তু কই দুগ্ধ যেমন তেমনই রহিয়াছে, ঠাকুর ত পান করেন নাই। নামদেব বড় কাতর হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, আমার সহিত ঠাকুরের পরিচয় নাই, তাই বুঝি দুগ্ধ পান করিলেন না, অথবা দুগ্ধ মধ্যে অপবিত্র কিছু ছিল, তাই হরির অগ্রাহ্য হইয়াছে। পুনরায়

দুগ্ধ আনিলেন, পুনরায় পবিত্র চিত্তে পূত পাত্রে সেইরূপ শ্রীবিগ্রহ সমীপে দুগ্ধ পাত্র রক্ষা করিলেন। কিন্তু কই ঠাকুরত গ্রহণ করিতেছেন না। বালক অতি কাতরে বলিতে লাগিলেন, "হরি, দাদা দুগ্ধ দেন, তুমি আনন্দে পান কর, আজ আমার কোন্ অপরাধে গ্রহণ করিতেছ না? আমি জানিলাম, আমি মহাপাপী, তুমি যদি আমার প্রদত্ত দুগ্ধ না গ্রহণ কর, আমি গলায় ফাঁসী দিব, বিষপান করিয়া তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব, কিম্বা কাটারি দ্বারা এই পাপ জীবনের অবসান করিব। এই বলিয়া কাটারি লইয়া যেমন হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি ভক্তবৎসল ভগবান্ বামহস্তে ভক্তের হস্ত ধারণ করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধপান করিতে লাগিলেন। ভক্ত! একবার প্রাণ ভরিয়া এই দৃশ্যটী হৃদয়ে অঙ্কিত কর। ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে যে বাঁধিয়াছে, তাঁহার নিকট সকলই সম্ভবে! এ সংসারে ভক্তের নিকট কিছুই অসম্ভব হয় না।

দাদার নিকট খাও মুক্তি হৈমু দোষী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসী।
নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরী দিব।
প্রাণী হত্যা পাপ আজি তোমারে লাগাব।
এত কহি ছুরী এক লইয়া হৃদয়।
মারিতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়।
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধ খায় উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মৃদু মধুর হাসিয়া।

ভক্তমাল।

"এখনি পাবি দরশন, ডাকের মত ডাকা হ'লে" ইহা কাল্পনিক কথা নহে। ডাকিতে জানিলে এখনও ভগবান্ ভক্তের নিকটে প্রকাশ হন্ এবং তোমার আমার ন্যায় কথা কহেন।

আমরা বিংশ শতাব্দীর আলোক প্রাপ্ত যুবক, এ কথা বিশ্বাস করিব কেন? ডাকিতে আরম্ভ কর, মধুপান করিতে একবার অভ্যাস করিলে আর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। একবার হরির নামে মত্ত হও, মজ, নেশা জন্মাও, তাহা হইলে আর ছাড়িতে পারিবে না। যে কোন মাদক বস্তু সেবন করে, সে কি তাহা সহজে ছাড়িতে পারে? কামনা করিয়া ডাক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যদিও পন্থা নিকৃষ্ট, কিন্তু শনৈঃশনৈঃ নিষ্কামে যাইয়া পৌঁছিবে। ভক্তরাজ ধ্রুব প্রথমে কামনা করিয়াই ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ভগবৎ দর্শন হইল, তখন কি বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন্।

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং।
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বাপ দিব্যরত্নং
স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

ভক্তি সুধোদয়।

আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলাম, পাইলাম মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র যাঁহাকে না পান, সেই তোমাকে।

অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি। আমি কৃতার্থ হইয়াছি। স্বামিন্! আর কোন বাসনা আমার নাই। বাস্তবিক যখন ভগবৎ দর্শন হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে। রাবণের কথা মনে করুন্। রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে সম্ভোগ করিতে বলায়, বলিয়াছিলেন যে, রামরূপ হৃদয়ে উদয় হইলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ জ্ঞান হয়, সীতা কোন্ ছার!

এদিকে মাতামহ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। নামদেবকে সেবা পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নামদেব দুগ্ধ-প্রসাদ যাহা রাখিয়াছিলেন, মাতামহ নিকট উপ-

স্থিত করিলেন! মাতামহ অন্ন.দুগ্ধ দেখিয়া বলিলেন, প্রসাদী দুগ্ধ তুমি পান করিয়াছ এবং অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ আমার জন্য রাখিয়াছ। না দাদা, আমি পান করি নাই। ঠাকুর প্রথমে আমার প্রদত্ত দুগ্ধ পান করেন নাই, পরে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলে দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া নিজ হস্তে দুগ্ধ পান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বামদেব দৌহিত্রের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ঠাকুর কি প্রকারে পান করিয়াছেন, তাহা দেখিতে চাহিলেন। বামদেবের বিশ্বাস যেরূপ, তাহাতে এইরূপ কথা বলাই সম্ভব। কিন্তু নামদেবের বিশ্বাস, ভক্তি তাঁহার মাতামহ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তাধীন। ভক্তের মান রক্ষা তিনি না করিলে কে করিবে? নামদেব পর দিবস দুগ্ধ লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃতাঞ্জলীপুটে নিবেদিত দুগ্ধ ঠাকুরকে পান করিতে আহ্বান করিলেন। ঠাকুর দুগ্ধ পান কর, যদি অদ্যকার দুগ্ধ প্রত্যাখ্যান কর, আমি গলায় কাটারি দিয়া এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ঠাকুর অমনি ভক্তের আহ্বানে উপস্থিত হইলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। বামদেবের যে টুক্ বাকী ছিল নামদেব রাজেন্দ্র সঙ্গমে তাহা পূর্ণ হইল।

"না খাইবে যদি পুনঃ মরিবারে চাহে।
কাতরে বালক দু নয়নে ধারা বহে॥
আস্তে ব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুনঃ হাসিয়া হাসিয়া॥
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
স্তুতি ভক্তি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি।"

ভক্তমাল।

কৃপাময় পাঠক! আসুন, আমরাও ভক্তরাজের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই। এমন সুযোগ আর ঘটিবে না, এমন ভক্ত ধরাধাম পবিত্র করিতে জন্মগ্রহণ কখন করিবেন, কে বলিতে পারে?

গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে অলিকুল আকুল হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মধুলোভে ভ্রমণ করে॥

দুর্গম গিরি শিখরে কিম্বা প্রখর তপন তপ্ত মরু প্রান্তরে থাকিলেও তাহার নিস্তার নাই; অলি জুটিবেই জুটিবে। ভক্ত গোলাপ পুষ্প সদৃশ; যেখানে প্রস্ফুটিত হউক না কেন, ধর্ম্মপিপাসু নর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবেই হইবে। কারাগারের লৌহশৃঙ্খলেও তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না। কে না রূপ সনাতন ও গোস্বামী রঘুনাথের কথা জানেন? এমন মুসলমান কারাগারেও সনাতনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। রঘুনাথের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিলনা। সুন্দরী ভার্য্যা, ৮ লক্ষ মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং মাতা পিতার স্নেহময় বচনেও তাঁহাকে চৈতন্য-সান্নিধ্য হইতে অন্তরে রাখিতে পারে নাই।

নামদেবের সৌরভ দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইল। দেশের সম্রাটের কর্ণে তাহা জয়ঢকা রবে নিনাদিত হইতে লাগিল। যবন সম্রাট নামদেবের কেরামত দেখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নামদেব কিরূপ সাধু, একবার পরীক্ষা করিবার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। কে কবে যবন সম্রাটের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে? ইচ্ছা একবার হৃদয়ে উদয় হইলে, তাহা যে প্রকারেই হউক পূর্ণ করিতে হইবে। নামদের

সকাশে লোক প্রেরিত হইল। নামদেবও সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন্ না। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট কেরামত দেখিতে চাহিলেন। ভক্ত কখনই আপনার ক্ষমতা জানেন্ না। তিনি কি করিতে পারেন, তাহা তিনি নিজেও অবগত নহেন। সুতরাং সম্রাটের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল। নামদেব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সাধুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। চারি পাঁচ দিন অন্তে পুনরায় সম্রাট নামদেবকে বন্দীশালা হইতে দরবারে আনিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কিছু আশ্চর্য্য দেখাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্ত সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দৈবগতিকে সেখানে একটী মৃতবৎস দেখা গেল। সম্রাট বলিলেন, তুমি হিন্দু সাধু, গাভীকে হিন্দু দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে। এই বৎসের মাতা ইহার বিরহে কান্দিয়া বেড়াইতেছে, ইহাকে প্রাণদান কর। নামদেব শুনিবা মাত্র হাতে তুড়ি দিয়া বলিলেন, বৎস উঠ, মাতার নিকট গিয়া দুগ্ধ পান কর।

> ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে।
> উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে॥
> কথা মাত্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়।
> রাজা চমকিত চিত্তে অনিমিখে চায়॥
>
> ভক্তমাল।

ভগবান্ স্বয়ং ভক্তকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করিয়া সময় সময় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পরীক্ষায় খাটি সোণা আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। ভক্তও পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দ্বিগুণ মাধুর্য্য লাভ করেন। বৃন্দাবনে সনাতন সমীপে সম্রাট আকবর উপস্থিত হইয়া অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। ভক্তচূড়ামণি বিষ্ঠার ন্যায় তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিবার সময় একটী স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণি হস্তে ধারণ না করিয়া কোন প্রকারে তাহা একটা গর্ত্তে ফেলিয়া আবর্জ্জনা দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, পরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করেন।

নামদেবকে সম্রাট বহু অর্থ সম্পত্তি দিতে বার বার যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভক্ত তাহা কোন মতে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই।

এই সময়ে সম্রাট বহুমূল্য এক পালঙ্ক ও শয্যা উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া তাহা নামদেবকে গ্রহণ করার জন্য বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নামদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু নিজেই সমস্ত মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, নবাবের পাইকগণ কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে না— অগত্যা সম্রাট সম্মত হইলেন, কিন্তু গুপ্তচর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইতে বিরত হইলেন না। নামদেব সম্রাটের চক্ষুর অন্তরালে গমন করিয়া, মাণিক্য-খচিত বহুমূল্য শয্যা ও পালঙ্ক নদীতে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। এদিকে গুপ্তচর সম্রাট সকাশে আসিয়া সকল অবস্থা নিবেদন করিল। সম্রাটের আদেশে পুনরায় নামদেব দরবারে আনীত হইলেন এবং এইরূপ মূল্যবান্ শয্যা নদীতে কেন নিক্ষেপ করিয়াছেন, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন।

> পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা।
> কৌতুকে বিনতি করি কহিতে লাগিলা॥
> হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে।
> তেঁহ কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহা বলে॥

প্রয়োজন থাকে চল দেই উঠাইয়া।
রাজা সঙ্গে লোক দিলা কৌতুক করিয়া॥
সেই খাট শুক্ল শয্যা সেই আবরণ।
জল হইতে তুলি দিলা করিয়া গমন।
ভক্তমাল।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। কোন এক ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহার হস্তে একটী বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজি সম্মুখে মণিকর্ণিকায় উহা নিক্ষেপ করেন। ধনবান্ ব্যক্তি ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। স্বামীজি তন্মুহূর্ত্তে গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং ডুব দিয়া ধনী-প্রদত্ত হীরক অঙ্গুরীয়ের ন্যায় কতকগুলি অঙ্গুরীয় ধনী সম্মুখে ধরিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টী বাছিয়া লইতে বলিলেন। ধনী দেখিয়া অবাক্। এই ঘটনা অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং ইহার উপর সমালোচনা করা অনাবশ্যক।

নামদেবের যশঃসৌরভ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। স্বগ্রামবাসী একটী বণিক একদা এক যজ্ঞ করিলেন। নামদেব যাহাতে কিছু সোণাদান গ্রহণ করেন, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের শূদ্রের নিকট হইতে সোণা দান গ্রহণ মহা পাপ, পক্ষান্তরে শূদ্রের, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান মহাপুণ্য। কিন্তু এখন সোণাদান গ্রহণ বোধ হয় পাপ মধ্যে গণ্য হয় না। এমন ব্রাহ্মণ এখন বিরল, যিনি সোণাদান গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন! যাহা হউক, বণিকের চেষ্টা ফলবতী হইল, নামদেব একটী তুলসী পত্রের ওজনের সোণা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তুলসী পত্রের ওজনের সোণা আর কতটুকু! যখন নামদেব দান গ্রহণ করিবেন, তখন অল্প শ্রেণীতে আসে যায় কি? নামদেব একটী তুলসী পত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপন করিলেন এবং বণিককে অপর দিকে সোণা দিতে বলিলেন। বণিক দুই কিম্বা তিন রতি সোণা লাগিবে বলিয়া তাহাই দিলেন। কিন্তু তিন রতি সোণাতে তুলাদণ্ডের তুলসী পত্রের দিক্ কম্পিতও হইল না। ক্রমে ৫। ৭। ১০ তোলা স্বর্ণ প্রদত্ত হইল, তাহাতেও তুলা টলিল না, কি সর্ব্বনাশের কথা! বাড়ীতে বণিকের যে কিছু সোণা ছিল, সকলই তুলাতে দিলেন, কই কিছুতেই তুলসী পত্রের দিক্ উত্তোলিত হয় না। বণিক্ অবাক্, নামদেবের গৌরবের সীমা রহিল না।

নামদেব নিষ্ঠা সহকারে একাদশী ব্রত করিতেন। এ বিষয় শাস্ত্রের আদেশ তিনি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন, কোন কারণে তাহা হইতে কখনই বিচলিত হইতেন না।

এক সময়ে একাদশী দিবসে বাটীতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত। নামদেবের গৃহে অতিথি বিমুখ হইয়া যাইবে, ইহা নামদেবের অসহ্য; অথচ একাদশী দিবসে তিনি কি করিয়া অন্নজল ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের সহিত বচসা হইতে লাগিল, হঠাৎ ব্রাহ্মণ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই সামান্য একটু আঘাতেই বৃদ্ধের পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রতিবেশী মণ্ডলী উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন; নামদেবকে তিরস্কার করিতেও বিরত হইলেন না। নামদেব একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। এই আকস্মিক ঘটনা দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশীগণকে বলিলেন, তোমরা চিতা প্রস্তুত কর, আমিও ব্রাহ্মণের সহিত দেহত্যাগ

করিব। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেহত্যাগ। চিতা সজ্জিত হইল, বৃদ্ধের মৃতদেহ চিতার উপর স্থাপিত হইল। নামদেব শবের সহিত চিতায় প্রবিষ্ট হইলেন। শ্মশান-বন্ধুগণ অগ্নি জ্বালিয়া চিতায় সংযোগ করিতে প্রস্তুত; শব এই সময়ে মৃদু মধুর হাসিয়া নামদেবকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। চারিদিকে গগন-ভেদ করিয়া হরিধ্বনি উত্থিত হইল। নামদেব ও বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে চিতা হইতে উঠিলেন। তৎপর দিবস বৃদ্ধকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ আর কেহ নহেন, ভবার্ণবের কাণ্ডারী পতিতপাবন ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ম এই এক লীলা করিলেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে প্রত্যহ আরতি দেখিবার জন্ম সায়ংকালে নামদেব গমন করিতেন। এবং আরতি সমাপন হইলে কীর্ত্তনান্তে বাটীতে আসিতেন। এক দিবস আরতি দেখিতে গিয়াছেন; দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা; পাদুকা কটিদেশে বন্ধন করিলেন এবং মন্দিরের দ্বারদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বাররক্ষক বিনামা সহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া নামদেবকে এক ধাক্কা দিয়া মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। নামদেব কখনও গান না শুনিয়া প্রত্যাগত হইতেন না, সে দিবসও হইলেন না। মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে যাইয়া নিবিষ্ট চিত্তে গান করিতে লাগিলেন। বিগ্রহ মন্দির সহ ঘুরিয়া নামদেবের সম্মুখে উপস্থিত—মন্দির সেই ভাবেই ছিল, পূর্ব্বস্থানে আর যায় নাই।

সাধুর গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, খুব ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল. সাধুর ভ্রূক্ষেপও নাই। প্রতিবেশীরা আসিয়া গৃহস্থিত তৈজস পত্র বাহির করিতে লাগিলেন। নামদেব বলিলেন, কি কর, যাঁহার ইচ্ছায় অগ্নি আমার গৃহ গ্রাস করিতেছে, তাঁহার সুখ হইবে বলিয়াই এরূপ হইতেছে। সকল বস্তুই গৃহেতে থাকিবে, কিছুই বাহির হইবে না; ইহা বলিয়া বহিস্থ সকল জিনিস পুনরায় অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইল।

ঠাকুর তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল, অগ্নি লাগিয়াছিল, ইচ্ছা হইল, আবার নির্ব্বাপিত হইল। বেশ! কিন্তু আমি এখন মাথা রাখিব কোথায়, তাহার কিছু ব্যবস্থা করিবে না? ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল, ভগবান্ ভক্তের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

শুকদেবের পিতা জনকের নিকট শুকদেবকে শিক্ষার জন্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন। শুকদেব জনকভবনে আসিয়া দেখিলেন, জনক রাজার বিভবের ইয়ত্তা নাই, নগরের শোভাই বা কত! রাজভবনের সৌন্দর্য্যে অমরাবতীও ম্লান হইয়া যায়। শুকদেব ভাবিলেন, বিলক্ষণ, পিতা ভাল লোকের নিকট আমাকে শিক্ষার জন্ম প্রেরণ করিয়াছেন, এ দেখি বিষয়ীর এক শেষ! কিন্তু পিতার আদেশ, কি করেন, জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনক শুকদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন দান করিলেন। এবং কিয়ৎকাল কথোপকথনান্তর তাঁহাকে বিশ্রাম করিবার জন্ম স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। জনকের ভবনে অগ্নি লাগিল। ক্রমে ক্রমে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল ভস্মীভূত হইতে লাগিল। যে কক্ষে শুকদেব উপবিষ্ট ছিলেন, অগ্নি সেই কক্ষে

লাগিল। শুকদেবের একখানা কৌপিন ও বহির্ব্বাস মাত্র সম্বল। কৌপিন ত পরিধানে আছেই, বহির্ব্বাস খানিতে অগ্নিসংযোগ হইবার উপক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ তারস্বরে অগ্নিকে বলিলেন "তিষ্ট"। সেই তিষ্ঠ বলা অমনি জনক তথায় উপস্থিত। অগ্নির সাধ্য কি আর অগ্রসর হয়? শুকদেবের বহির্ব্বাস সে যাত্রায় রক্ষা পাইল। তিনি যে কারণে তথায় আসিয়াছিলেন, তাহাও সিদ্ধ হইল। জনক বলিলেন, কি করিলে, অগ্নিকে থামিতে কেন আদেশ করিলে? তোমার আদেশ লঙ্ঘন করে, অগ্নির সাধ্য নাই, কিন্তু ইহাতে বহির্ব্বাসের প্রতি তোমার যে একটু মমতা আছে, ইহা প্রকাশ পাইল। ভোগ্য বস্তু আসক্তি-শূন্য হইয়া ভোগ করিতে হইবে। মিথিলা নগরী আজ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও আমার কিছুই যাইবে না; কেন না, উহা আমার কিছুই নহে।

ভক্ত-চরিত্র চর্চ্চায় হৃদয় পবিত্র, মন উন্নত এবং নিজের অসারত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। সংসার পরীক্ষার স্থল, হিসাব দিবার জন্য একদিবস ডাক পড়িবে। সেই দিবস সেই মহান্ সিংহাসন সম্মুখে কি বলিয়া দাঁড়াইব? অপরিমিতব্যয়ী সন্তানের ন্যায় কি বলিব, জগজ্জননী যে মূলধন দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, আমার অন্ধতা প্রযুক্ত সে সমুদায় হারাইয়াছি? এখন শূন্য হস্তে পাপ-ভারাবনত সন্তপ্ত হৃদয়ে জলধারায় বক্ষস্থল ভাসাইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত, মা রক্ষা কর! রক্ষা কর!

এ সংসারে কয়দিন থাকিবে। আজ-কাল কিম্বা পরশ্ব ডাক পড়িবেই পড়িবে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইলে কৈ? ধন জন, বন্ধু বান্ধব, সকলই পড়িয়া রহিবে। অর্থ, যাহা উপার্জ্জন করিতে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে—কত না মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া—লোক ঠকাইয়া—অগণ্য পাপাচার করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা কোথায় থাকিবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!

সময় থাকিতে থাকিতে পথ দেখিয়া লও। ঐ যে তোমার সম্মুখে স্বর্গীয় আলোক-পূর্ণ রাজপথ দেখা যাইতেছে, পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ কর, মহাপুরুষগণ তোমার পথপ্রদর্শক, তাঁহারা তোমার হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইবেন।

তুমি যে দিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, লোকে কত না আনন্দ করিয়াছিল, কত না হাসিয়াছিল, তুমি কিন্তু চক্ষের জলের সহিত সংসারে আসিয়াছিলে। যে সময় তুমি যাইবে, তখন যেন তোমার জন্য সকলে ক্রন্দন করে, তুমি যেন হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতে পার। দয়াময় ভগবান কি এমন করিবেন?

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

ব্রহ্ম ও জগৎ। (২৩)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় যে প্রাণীদেহের উৎপত্তির কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী সমূহের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও, শ্রেণীগত বা জাতিগত একটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কেবল জড়ে এ প্রকারের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। একই অশ্ব জাতির মধ্যে বহুবিধ শ্রেণী বিভাগ থাকিলেও, এই বিভিন্ন-শ্রেণীর সকলগুলিই যে এক অশ্বজাতীয়, তাহা তাহাদের ক্রিয়া ও গঠন-গত সৌসা-

দৃশ্য হইতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। প্রতি জাতীয় প্রাণী পরস্পর হইতে নিতান্ত বিভিন্ন-প্রকারের; কিন্তু প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবান্তর শ্রেণী আছে, উহারা আবার সেই সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। অশ্ব বহু প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল প্রকারের অশ্বই যে সেই এক অশ্ব জাতিরই অন্তর্গত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সম্বন্ধেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। এই শ্রেণীবিভেদের কারণ কি? এত প্রকার-ভেদ কিরূপে হইল? এই বিভেদের মূলে কি ঈশ্বরেচ্ছা বর্ত্তমান অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক নিয়মে একটী মাত্র প্রাণী জাতি হইতে এই বিশাল ও বহু জাতীয় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে?

বিবর্ত্তন-বাদ (Evolution theory) এই-রূপে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিবর্ত্তনবাদের উত্তর সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি একটী অশ্ব এবং একটী গর্দ্দভজাতীয় প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত সম্বন্ধ ঘটে, তবে উভয়ের সংযোগ-ফলে উহাদের যে সন্তান জন্মিয়া থাকে, তাহা উহাদের উভয়ের মধ্য-বর্ত্তী এক ভিন্ন প্রকারের প্রাণী হইয়া দাঁড়ায়; যেমন "খচ্চর" বা mule নামক জন্তু। কিন্তু এই খচ্চরগুলির মধ্যে, পরস্পর সংযোগ ঘটাইলে, উহাদের আর কোন প্রকার সন্তান উৎপাদিত হইতে দেখা যায় না। আবার, দুই প্রকার অবান্তর শ্রেণীর দুইটী স্ত্রী ও পুং অশ্বের সংযোগে যে সন্তান জন্মিয়া থাকে, উহারা উহাদের পিতা ও মাতা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার-প্রকার ধারণ করে এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ সংযোগ ঘটাইয়া দিলে, এই প্রকারের প্রাণীর উদ্ভব হইতে দেখা যায়। এইরূপ, পরস্পর সংযোগ-ঘটনা ঘটাইয়া দিয়া, ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে,—(ক) অত্যন্ত বিসদৃশ দুই জাতীয় প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ ক্রিয়া আদৌ ঘটিতে দেখা যায় না; (খ) তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক সাদৃশ্য সম্পন্ন দুই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ঐরূপ সংযোগ ঘটাইয়া দিলে, তাহা হইতে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তা-নের আর তদ্রূপ সন্তান একেবারেই প্রসূত হইতে দেখা যায় না; (গ) উত্তম সাদৃশ্য-বিশিষ্ট এবং অল্পাধিক মাত্র-বৈলক্ষণ্য-ধারী জাতিদ্বয়ের সংযোগ-ফলে, নূতন প্রকারের সন্তান প্রসূত হইয়া, ঐ সন্তানদিগের মধ্যেও আবার ঐরূপ সন্তান ক্রমাগত প্রসূত হইতে দেখা যায়। প্রাণী জাতির মধ্যে বিভিন্নতার ইহাই এক প্রকার হেতু। এতদ্ব্যতীত অন্য একরূপে বিভিন্নতা হইয়া থাকে। একটী প্রাণীর স্বজাতির অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যে দুইটী বা তিনটী সন্তানের অঙ্গবিশেষ একটু বৈলক্ষণ্যভাব ধারণ করিল এবং সেই বৈলক্ষণ্যের ফলে তাহার দৈহিক ক্রিয়া ও প্রকৃতিরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইল। মনে কর, কতগুলি সন্তানের ছয়টী হস্তা-ঙ্গুলি হইয়াছে, দেখা গেল। প্রথমেই কেন এরূপ হয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু একবার এইরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা দিলে, সেই বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট প্রাণীকে একটী স্থায়ীজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করান যাইতে পারে। ঐ ছয় অঙ্গুলি বিশিষ্ট প্রাণী গুলির মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ ঘটিতে দিলে, কিছুদিন পরে ঐরূপ ছয় অঙ্গুলি

বিশিষ্ট নূতন এক জাতির অভ্যুদয় হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়া বশতঃ ক্রমে নূতন নূতন জাতির অভ্যুদয় করান যাইতে পারে। আবার, এইরূপ নূতন-তর জাতির অভ্যুদয়, মনুষ্য-যত্ন দ্বারা নির্ব্বাহিত না করাইয়াও, কেবল প্রকৃতির নিয়ম বশতঃও হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ছয় অঙ্গুলি বিশিষ্ট প্রাণীগুলির বাহ্য প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি যদি নিতান্ত অনুকূল হয়, তবে জীবন-সংগ্রামে ঐ জাতীয় প্রাণীই থাকিয়া যাইবে। এইরূপ, অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে পড়িলে, কোন অজ্ঞেয় কারণে প্রাণীশরীরে যে অল্পমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রথমে দেখা দেয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হইতে হইতে, প্রকৃতির অনুকূলতাবশতঃ ঐ বৈলক্ষণ্য বিশিষ্ট প্রাণী গুলিই স্থায়ীরূপে পরিণত হইয়া পড়ে, অন্য প্রাচীন জাতি ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন বিশেষ অজ্ঞাত কারণে, একবার মাত্র কোন এক বৈলক্ষণ্য প্রাণীতে উপস্থিত হইলেই, উহাকে মনুষ্য-যত্নদ্বারা (Artificial selection) অথবা প্রকৃতির অনুকূলতায় (Natural selection), স্থায়ী এক নূতন জাতীয় জীবরূপে পরিণত করান যাইতে পারে। বিবর্ত্তবাদ এইরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, আদিতে একটীমাত্র জাতি হইতে, এইরূপ ক্রমানুসারে, নানাবিধ অবান্তরজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। মানব শরীরে, কদাচিৎ ব্যবহারে লাগে বা একেবারেই কোন প্রয়োজনে আইসে না, এরূপ কোন হাড় বা পেশী প্রভৃতি দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, মনুষ্যজাতি উদ্ভূত হইতে, উহাকে যে যে ইতর-প্রাণীর মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে, ঐ পেশী বা হাড়, তাহাই বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়।

বিবর্ত্তবাদের যুক্তি ও উত্তর আমরা প্রধানতঃ দেখিলাম। কিন্তু বিবর্ত্তবাদের প্রবর্ত্তিত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী প্রধান আপত্তির উল্লেখ করিতেছি। মনুষ্যযত্নদ্বারা যে পরাবর্ত্তিত নূতন প্রাণী অভ্যুদিত করান যায়, তাহা, এবং প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন প্রাণী অভ্যুদিত হয়, তাহা, এতদুভয়ের ফলে বিশেষ পার্থক্য আছে। অপেক্ষাকৃত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলে, সেই সংযোগ ফলে যে সন্তান জন্মে, ঐ সন্তানদিগের আর সন্তান উৎপাদন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুকূলতায় যে নূতন জাতীয় জীব অভ্যুদিত হয়, তাহাদের মধ্যে পরস্পর-সংযোগে, ঐ প্রকারের সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, দেখা যায়। কেন এরূপ হয়, বিবর্ত্তবাদ ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। কোন কোন কোন অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে এরূপ কোন হাড় বা পেশী আদি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা উহাদের কোন প্রকার ব্যবহারে বা প্রয়োজনে আইসে না। সুতরাং উহারা যে প্রাকৃতিক-অনুকূলতায় স্থায়ী জীবে পরিণত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। তারপর, একই দম্পতীর পাঁচটী সন্তানের মধ্যে, সর্ব্বপ্রথমে দুইটীমাত্র সন্তানের কেন এরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, বিবর্ত্তবাদ এ কথার উত্তর দিতে কিছুতেই সক্ষম নহে। আর যদি বিবর্ত্তবাদমতে, আদিতে একটীমাত্র জাতিরই সৃষ্টি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, সেই জাতিই

বা কি কারণে জন্মিয়াছিল, তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে, দৃঢ়তা সহকারে ইহাই বলা সঙ্গত হইয়া পড়ে যে, প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি ব্যাপারে, পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সংকল্পের আবশ্যকতা হইয়াছিল। নিতান্ত বিভিন্ন একজাতিকে, অন্য এক নিতান্ত ভিন্ন জাতিতে কদাপি পরিবর্ত্তন করা যায় না বলিয়াও, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, বিভিন্নতার একমাত্র কারণ,—পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা সংকল্প। জড়রাজ্যেও একথা বিলক্ষণ খাটে। ভিন্ন ভিন্ন তাপ, গতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট অণু সমূহের সংযোগ বিয়োগবলে সূর্য্যচন্দ্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা যেন মানিলাম, কিন্তু ঐ অণুপুঞ্জ মিলিয়া কেন ঠিক্ সেই চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী, জল রূপেই পরিণত হইয়া পড়িল এবং অন্য কোন আকারে মিলিত হইল না, ইহারই বা বিজ্ঞান ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন কি সদুত্তর দিতে পারে? আবার, প্রত্যেক পদার্থটীর সহিত প্রত্যেক পদার্থটীর অতি বিস্ময়কর সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলেও, ঈশ্বরেচ্ছা স্বীকার না করিয়া আর গত্যন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদান্ত এইজন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, প্রকৃতি বা মায়ার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া, পরমেশ্বরের সংকল্পবশতঃই হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাম ও রূপ (Species and individuals) পরমেশ্বরের সংকল্পবলে অভ্যুদিত হইয়াছে, ইহাই বৈদান্তিক-সিদ্ধান্ত।

অতএব আমরা এখন ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এই যে স্থূল পদার্থরাশি আমরা দেখিতেছি, উহারা সূক্ষ্মাবস্থারই পরিণতি মাত্র। এবং ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থাই শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে। সেই শক্তি ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। আমাদের এই সকল সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান সম্মত ইহাও আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম। এই শক্তিই শঙ্করের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি। এই মায়া যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা দেখাইব যে, এই মায়া কোন অলীক পদার্থ নহে, এবং শঙ্কর কোথাও তাঁহার মায়াকে অলীক বলেন নাই। কিন্তু সে কথা বারান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মাতৃমূর্ত্তি।

একদা সায়ংকালে দিবসের ক্লান্তি ও শ্রান্তির পর বিশ্রাম ও চিন্তার করে আত্মসমর্পণ করিয়া নীরবে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ধীর পাদনিক্ষেপে ঘরে একটী মহিলা প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি রূপসী রঙ্গিণী বা উচ্ছ্বাসময়ী বিলাসিনী নহেন, তিনি সংযতা, নির্লিপ্তা, অনাসক্তা প্রেমরূপিণী মাতৃমূর্ত্তি।

রমণীর রূপ বা ভালবাসা ব্যাখ্যা করে নাই, এমন কবি এই পৃথিবীতে আছেন কি না, আমি জানি না। রমণীর ভালবাসায় আকৃষ্ট হয় নাই, এমন যুবক এই পৃথিবীতে আছে কি না, তাহাও জানি না।

রমণীর ভালবাসা সর্ব্বত্র পবিত্র না হইতে পারে, কিন্তু সে ভালবাসার আকৃষ্ট বা নমিত অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই। কেন, কেন মানুষ এত আত্মহারা?

মানব-জীবন ক দিনের? আজ আছে ত কাল নাই;—যেন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সদা চঞ্চল। দশ দিন পূর্ব্বে যাহার অহঙ্কার-দৃপ্ত ব্যবহারে মর্ম্মাঘাত পাইয়াছি, হায়, আজ সে কোন্ অন্ধকারে লুক্কায়িত? বিধাতার বিধান, মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, জাগিতেছে, মরিতেছে। মরিবার জন্যই যাঁহার জন্ম, তাহার মনেও লালসা, বাসনা, কামনা, কত কি! মরিবার জন্যই যাহার জন্ম, যৌবন তাহাকেও কত রূপে মাতায় ও উত্তেজিত করে! যাইবার জন্যই ত পৃথিবীতে আসিয়াছি, তবে কেন এত খাটুনী, এত বকুনী, এত মাতামাতি, এত হুটাহুটী, ছুটাছুটী? কেন, কে জানে?

আমি প্রত্যহই এই সকল কথা ভাবিতে বসি। ভাবিয়া ভাবিয়া কূল কিনারা পাই না, অবসন্ন হই, ক্লান্ত হই, তবুও চিন্তা ছাড়ে না। কেন, কেন এই ভূতের বোঝা বহিতেছি? সে দিন ভাবিতেছিলাম, কেন এই পৃথিবীতে আছি? ভাবিতেছিলাম, থাকিয়া কি করিতেছি?—মৃত্যু কবে আসিবে?—মৃত্যুর পর কোন্ নিরাকারপুরে যাইব? মৃত্যুর পর আত্মীয়দিগের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে কি না?—মৃত্যুর পরও আত্মীয়তা, ভালবাসা থাকিবে কি না? ভাবিয়া ভাবিয়া, অন্যদিনের ন্যায় আজও কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারিতেছিলাম না। ভাবিতেছিলাম, হায়, এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য কত মহৎ, আর আমি কত ক্ষুদ্র! মহত্বে ক্ষুদ্রত্ব ডুবাইতেছিলাম;—অসীমে সীমা হারাইতেছিলাম, এমন সময়ে কাছে বসিলেন,—চরিত্রে অনিন্দ্যা, দয়ায় অপরাজিতা, একটী ক্ষমার মূর্ত্তি। আমি আবার কায়ার, আবার সীমায় ফিরিয়া আসিলাম।

তিনি বাল্যে আমাকে ভালবাসিতেন। আমাতে কি গুণ দেখিয়া ভালবাসিতেন, জানি না; জানি শুধু এই, তিনি ভালবাসিতেন। তখন ঘোর দারিদ্র্য সংগ্রামে তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত হাবুডুবু খাইতেছিলেন; এখন সংসারের ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখিয়াছেন। এখন তিনি এই সংসারের হিসাবে গণ্যা, মান্যা, পূজ্যা, সকলই। আর আমি? আমি দিন দিন মলিনতার অন্ধকারে আবৃত হইতেছি। একবার যে লোকের নিকট কোন প্রকার অপরাধ করিয়াছি, সে লোক ত ভ্রমেও আমার দিকে তাকায় না, আর আমি তাঁহার নিকট কত শত শত প্রকার অপরাধ করিয়াছি। দূর হইতে দূরে, দিন দিন কত সুদূরে যাইতেছি; কিন্তু তবুও তাঁর দৃষ্টি স্নিগ্ধ, মিষ্ট, কি-জানি-কেমন ক্ষমার এক স্বর্গীয় ভাবে জড়িত। তিনি আসেন, ধারে বসেন, সান্ত্বনা দেন, প্রয়োজন হইলে শুশ্রূষা করেন, প্রয়োজন হইলে নিজে না খাইয়া খাওয়ান, কি জানি কত দয়া, কত মায়া লইয়া আমার নিকট আসা যাওয়া করেন। আমার নিকট, তোমার নিকট, তাঁহার নিকট, সকলের নিকট এইরূপ কত রমণী আসা যাওয়া করেন। অপরাধীর অপরাধ গণনা করিয়া যে ব্যক্তি ভালবাসা ছাড়ে, তাহাকে বলে পুরুষ; আর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যিনি কোল দেন, তাহাকে বলে রমণী। এই রমণী শক্তিই তিব্বতে রামমোহন

রায়কে রক্ষা করিয়াছিল।* রমণী বলেন, “ভালবাসায় আবার ব্যবসাদারী ?” কিছু পাইয়া যে দেয়,সে বণিক ; কিছু না পাইয়াও যে দেয়, সে প্রেমিক। লোকেরা বলে, প্রেমিক এই সংসারে দিনদিনই যেন দুর্ল্লভ হইতেছে ; কেনা বেচা রূপ দোকানদারীই যেন সর্ব্বত্র। কিন্তু কিছু না পাইয়াও তোমাকে কেহ কিছু দেন নাই কি ? কোন কিছুর প্রত্যাশা না রাখিয়াও তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ কেহ করেন নাই কি ? ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে, কেহ করিয়াছেন বই কি ? নচেৎ তুমি এই পৃথিবীতে আসিলে কেমন করিয়া ? কেহ করিয়াছেন বই কি, নচেৎ এই রোগ-তাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে আছ কেমন করিয়া ? নিশ্চয়ই এক মধুর সুস্নিগ্ধ স্পর্শ তোমার সকল উত্তাপ দূর করিতেছেন। করিতেছেন, এক অপরাজিতা শক্তি। ষ্টের নিকট তিনি মেরী, চৈতন্যের নিকট তিনি শচী, সেণ্ট আগাষ্টাইনের নিকট তিনি মণিকা, বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি ভগবতী দেবী, আর তোমার আমার নিকট সাধারণের অপরিচিতা মাতৃমূর্ত্তি।

আমি বাল্যে মাতৃ হারা। আমার জীবনে ঐ সুস্নিগ্ধ স্পর্শ-সুখ কোথায় ? যৌবন-উষায় কত খুঁজিয়াছিলাম, সেই সুধাবিনিন্দিত স্পর্শানুভূতি পাই নাই। কিন্তু আজ ? আজ দেখিতেছি, যিনি আমাকে দয়া করেন, স্নেহ করেন, ভালবাসেন, আমার অশেষ অপরাধ ভুলেন, তিনিই মাতৃমূর্ত্তি। আমার মা আমার বাল্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন এই বার্দ্ধক্যে, তিনি যেন অনন্ত ক্ষমার অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার চতুর্দ্দিক আবেষ্টন করিতেছেন। আমি কোথায় যাইব, কোথায় লুকাইব ! দিবসের প্রখর দীপ্তিতে ঐ মাতৃমূর্ত্তি, রজনীর গাঢ়ান্ধকারেও ঐ মাতৃমূর্ত্তি। মা আসেন, বসেন, সান্ত্বনা দেন, খাওয়ান, শুশ্রূষা করেন, শেষে কি জানি কেন, অন্তর্হিত হন।

তুমি বল, সুন্দর রমণী মূর্ত্তি দেখিলে তোমার রিপু উত্তেজিত হয়। আমার নিকট সে কথা যেন কল্পনা-মিশ্রিত, ভাব ও সাধনা-দুষ্ট প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। প্রলোভন-বীজ এ সংসারের বাহিরে নয়, মানব-অন্তরে। তুমি আপনার রিপুর উপর আপনি জয়লাভ কর, দেখিবে, নির্ব্বাণ-নিরঞ্জনা তটে মার-পিশুন পরাজিত, সেখানে বি-মলার মূর্ত্তি পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত। আপনি মরিয়া এজগতে কে কবে অন্যকে সজীব দেখিতে পারিয়াছে ? যে অসৎ, সে মনে করে, সৎ লোক এ সংসারে নাই ; সে মনে করে, প্রকৃতি তাহাকে বিপথে লইয়া যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া প্রলোভনের রূপ ধরিয়াছে। কামল রোগী এ জগতের সকলই হরিদ্রা-বর্ণ দেখে। তুমি সাধনার রাজ্যে অনুপ্রবেশ কর, ইন্দ্রিয় ও রিপুর উপর বিজয় নিশান তোল, দেখিবে, কোথাও প্রলোভন নাই। রমণী-মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরমধুর, চিরপবিত্র।

যে সাক্ষাতের কথা বলিতেছিলাম, মা আমার দুই চারিটী কথা বলিয়া, যখন অন্য লোক ঘরে ঢুকিল, তখনই পলায়ন করিলেন। যখন আমি তন্ময়, তখনই তিনি কাছে ; যখন অন্যমনস্ক, তখন দূরে, অতি দূরে। হঠাৎ আগমন, হঠাৎ তিরোধান। তিনি কি মানবী, না চিন্ময়ী ? আমি বুঝিয়াছি, পাগলকে ভুলাইবার জন্য চিন্ময়ীই সময়ান্তরে মানবী, আবার মানবীই সময়া-

* নগেন্দ্র বাবুর রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত ৩য় সংস্করণ, ১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

রূপে মাতৃভাবে চিন্ময়ী। নিরাকারা বা সাকারা, এ দুয়ের পার্থক্য আমি এখন আর বুঝিতেছি না। এখন কেবল কামনা করিতেছি, দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট মাতৃরূপের জয় জয়কারে জগৎ প্লাবিত হউক। মা-নাম-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া মানুষ শোক তাপ, জন্ম মরণের অতীত নিত্যানন্দ ধামে চিরবিশ্রাম লাভ করুক।

আমন্ত্রণ।

দেখিয়াছ অবনী ভ্রমিয়া
কোথা যদি মিটেনি পিপাসা—
যদি হইয়াছ শ্রান্ত, আইস আইস পান্থ!
আমি দিব বাড়ীঘর,
দিব ভালবাসা।

২

দীন আমি তবু মোর বাড়ী,
হাসে রবি উষার অঞ্চলে,
তরুণ সোণালী রাগে, তরু পত্রে সোণা জাগে
রঙ্গে নাচে শুভ্র বায়ু
মধুর হিল্লোলে।

৩

আমারে "আমার" বলে সেথা
যূথি, বেলা, গোলাপ, কামিনী,
তাদেরি বরাঙ্গ-বাসে, বসন্ত উল্লাসে আসে,
স্বরগ তেয়াগি আসে
অমর নন্দিনী!

৪

আমারেও শুনায় সঙ্গীত
কত পিক, দোয়েল, পাপিয়া,
সে যেন প্রেমের গীতি, মাখা স্নেহ মাখা প্রীতি,
সুখের স্বপনে উঠে
বুকে উছলিয়া!

৫

আমার সে শ্যামা তরঙ্গিণী
বহি যায় কুলু কুলু তানে,
কি যেন সাধের ব্যথা, নীরব সোহাগ কথা,
লুকায়ে মাখিয়া দেয়
অনাদৃত প্রাণে।

৬

সায়াহ্নে সে কুটীর দুয়ারে,
আসে কত বিড়াল-দম্পতী,
আমারি করুণা তরে, কতই মিনতি করে,
রাজা যথা দরিদ্রের
সাহস, শকতি!

৭

জগতের উপেক্ষিত আমি
তবু মোর এত "আপনার"
'তুমি যদি পরিশ্রান্ত, মোর ঘরে চল পান্থ!
তোমারে সকলি দিব—
যা' কিছু আমার।

৮

আজি মোরে পা'রনি চিনিতে—
স্মরি দেখ কৈশোর স্বপন,
যে কালে অসীম আশা, প্রাণে শুধু ভালবাসা,
সরলতা মাখা ছিল
প্রতি প্রাণ মন।

৯

সেই কালে—এক শুভক্ষণে
স্নিগ্ধ পূত সন্ধ্যার সময়
তোমারি চরণ-মূলে, আমি দিয়েছিনু খুলে,
সুখ, সাধ, আশা সহ
সমস্ত হৃদয়।

১০

হায় সখে, গেলে অবহেলি
সে সহজ প্রীতি-উপহার—
কেন না তা' ক্ষুদ্রতুচ্ছ, তব আশা বহু উচ্চ,
ধরিবে বিশাল বুকে
সমগ্র সংসার!

১১

একটী প্রাণের মাঝে কেন
লুকাইয়ে রাখিবে আপনা—
ও বক্ষের স্তরে স্তরে, যে বাসনা বাস করে,
নিখিলে ভরিলে তবে
পোরে সে কামনা।

১২

গেলে চলি মহাবলী তুমি,
দেখিলাম দূরে দাঁড়াইয়া,
প্রাণ মম মূর্চ্ছাপন্ন, হিয়া খানি অবসন্ন,
তবু তব বিঘ্ন বাধা
দিনু সরাইয়া।

১৩

জড়, মৃত দেখিয়া আমারে
জগত চাহিল দয়া দিতে,
যে কেহ মানব-বংশ, বিভুর প্রেমের অংশ
তাই ভাবি উঠিলাম
জগতে পূজিতে।

১৪

কিন্তু কই?—ছ'লনা সাধনা
প্রাণ ভরা প্রবলা পিপাসা,
বিশ্বের মমতা স্নেহ, লউক অপর কেহ,
আমার প্রার্থিত ধন
তব ভালবাসা।

১৫

সে আকাঙ্ক্ষা, তৃষিত রসনা
বিস্তারিল সমস্ত হৃদয়,
যাহা ভাবি, যাহা স্মরি, যাহা কিছু কাজ করি,
অনন্ত অতৃপ্তি ভরা
সারা বিশ্বময়!

১৬

দেখি শুনি ছাড়িনু সংসার—
ছাড়িনু সে প্রিয় পরিজন,
একাকী বিজন বনে, বসিলাম যোগাসনে,
বাহিরে রহিল পড়ি
সমগ্র ভুবন।

১৭

আজি যদি এসেছ আবার—
কি কহিব হরি! হরি! হরি!
লহ জীবনের জ্বালা, সংশয় নৈরাশ্য ঢালা,
দাও প্রীতি সুধা—দোঁহে
পুনঃ ঘর করি!

১৮

যত ব্যথা সয়েছ ও বুকে
দাও মোরে অঞ্জলি অঞ্জলি,
যত কিছু পাপ তাপ, অপযশঃ অভিশাপ,
আমারি আমারি শিরে
দাও সে সকলি।

১৯

তুমি হও গঙ্গাস্নাত সম
সুস্থ, সুখী, নিষ্পাপ, নির্ম্মল,
পবিত্র বাতাসে তব, লভিয়া জীবন নব,
সেবিব বিশাল বিশ্বে
লভি' নব বল।
পবিত্র বাতাসে তব, পাইয়া জীবন নব,
মুছিব মলিন অশ্রু, হইব সরল,
আবার ভাবিব তুমি আমারি কেবল!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

কলিতার ইতিবৃত্ত (৪)*

সপ্তদশ শতাব্দী ও তৎপূর্ব্বে কলিকাতার নিকট যে সমস্ত জনপদ ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক। যদিও ইহা পাঠ মধুর হইবে না, তত্রাচ ঐতিহাসিক নিয়মা-নুসারে তাহাদের নাম প্রভৃতির যতদূর সম্ভব স্থায়ীত্ব রক্ষা করা উচিত। গতবারে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় ডি'বারোসের মানচিত্র সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, 'চক্ষে দেখিয়া যতদূর পারিয়াছেন চিত্রিত করিয়াছেন,' প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, ডি বারোস কখন ভারতবর্ষ চক্ষে দেখেন নাই। তিনি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৫৩১ সালে কতকগুলি আব-শ্যকীয় অফিসিয়াল কাগজপত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে ১৫৫২, ১৫৫৩, এবং ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারত-বর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের তাৎ-কালিক বিবরণ যতদূর পারিয়াছেন, বর্ণন করিয়াছিলেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই মানচিত্রে সাওগাঁ, আগড়-পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ, এবং বাঁটর (ব্যাটরার) স্থান ও নাম দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে কালীঘাট প্রস্তাবে মুকুন্দরামের চণ্ডীর মধ্যে বেতড়ের উল্লেখকে আমরা ভ্রম বলিয়া মনে করিয়াছি, এখন বুঝা যাইতেছে, ডি বারোসের বাটোরই মুকুন্দ-রামের বেতড় হওয়া সম্ভব, এবং উহা পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বহুদূর বিস্তৃত থাকায় কতক অংশ ব্যাটরা এবং কোন স্থান পূর্ব্বনামে বেতড়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উক্ত গ্রন্থে স্থানগুলির নাম ভৌগোলিক নিকট-বর্ত্তী উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না, ইহা যে কেবল মুকুন্দরামের দোষ, তাহা নহে, পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে চারি খানি সমুদ্র যাত্রা বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ আবি-ষ্কার করিয়াছেন, সমস্ত গুলিতেই এই দোষ দৃষ্ট হয়। আমরা মুকুন্দরামের বর্ণনায় যে সকল প্রাচীন স্থানের উল্লেখ পাইতেছি, তাহা এই :—উজাবন, কোলগ্রাম, চাকদা, কুমারখালা, হাড়িয়া, মৌনা, হসনপুর, গড়-পাড়া, দৌলতপুর, বাক্সা, কাঁকনা, গঙ্গাড়া,

* ২য় প্রস্তাবে অর্থাৎ নব্যভারতের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় আমরা যে শ্রাদ্ধের গোলযোগের উল্লেখ করিয়াছি-লাম যে, শ্রাদ্ধের কর্ত্তা কালীপ্রসাদ দত্ত, তাঁহাকে চূড়া-মণি দত্তের পুত্র বলা হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা একটী শতাধিকবর্ষা বৃদ্ধার নিকট শুনিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিতেছি। এই মহিলা হাটখোলার মাণিক বসুর বৃদ্ধ প্রপৌত্রী। তিনি ঐ নিমন্ত্রণে গিয়াছি-লেন এবং উহার অনেক ব্যাপার তিনি স্মরণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন। এমন কি, সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সময় যে সংগীত রচিত হইয়াছিল, তাহারও কতক অংশ তাঁহার স্মরণ থাকায় আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বৃদ্ধার নিকট সেকালের অনেক কথা পাইয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। তিনি বলেন, কালীপ্রসাদ দত্ত চূড়ামণি দত্তের পুত্র নহেন। হাটখোলার গোরাচাঁদ দত্তের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোকুলচাঁদ কনিষ্ঠ রামহরি দত্ত, কালীপ্রসাদ এই রামহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ নহে, জননীর। কালীপ্রসাদ যথার্থই একজন মুসলমান নর্ত্তকীর গৃহে যাতায়াত করিতেন, উক্ত নর্ত্তকীর নাম, আনার বিবি। শ্রাদ্ধে গোলমাল আর কেহ তত করেন নাই, জ্ঞাতিরা অর্থাৎ দত্তগোষ্ঠীই শেষ পর্য্যন্ত বিরোধী ছিলেন, এবং যোগ দেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে গানটী রচিত হইয়াছিল, তাহার অংশ এই :—"দত্তবাড়ীর তত্ত্ব শুন ভাইঃ—

কুলীনপাড়া, কুণ্ডরপুর, বাঁকুল্যা, বেলেড়া, কাথড়াপুর, গোন্দিতা, মনপাড়া, চন্দ্রখালি, নারায়ণদহী, মানপাড়া, নপাড়া, বাগনস্থর, চরধী, আঙ্গারপুর, নবগাঁ, সোণালিয়া, ঝোলা, উধনপুর, নৈহাটী, শাঁখারীঘাট, মঙ্গলঘাট, বারেন্দা, রাহুতপাড়া, কাকড়াহাটী বাইগুণকোপ, ললিতপুর, ভাগ্নোসিংহেরঘাট, মাটিয়ারি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মৃজাপুর, নিশ্চিন্তপুর, গোঠপাড়া, শিকড়দহ, মেড়তলা, সমুদ্রগড়ি, পাহাড়পুর, আম্বুয়া মুলুক, শান্তিপুর, গুপ্তীপাড়া, কোদালিয়া, উলা, কাছিমা, মহেশপুর, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, ইছাপুর, মাহেশ, খড়দহ, কোন্নগর, কোতরং, কুচিনান, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেতড়, ধনস্ত, বালিঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, নাচনগাছা, বারাশত, খলিনা, ছত্রভোগ, রশান, হিমাই, কালীপাড়া, হাতিগড়, মগরা, ফুলিয়া, যশিপুর। ইহার মধ্যে অনেক স্থানের এখন ঠিকানা নাই।

কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশে, নদিয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোর ও হুগলি জেলাকে কিলকিল্লা প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, "ইহার পূর্ব্ব সীমা কালিন্দিকা (অর্থাৎ যমুনী) নদী, পশ্চিম সীমা সরস্বতী। দানগলি (১) নদীতীরে গঙ্গার পার্শ্বে সাড়েশ্বরী দেবী (২) আছেন। মাহেশ ও খড়দাহ গ্রামের মধ্যে দীর্ঘ গঙ্গার (৩) তীরে মাহেশে রাজা কুলপাল বাস করিতেন। ইহারা দুই ভাই, কুলপাল ও দেশপাল। কুলপাল হইতে হরিপাল ও অহিপাল জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, তন্তুবায় ও শাঁখারী প্রজা লইয়া হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে "হরিপাল" নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণী সন্নিকটে চক্রদ্বীপ অর্থাৎ চাকদহে ও ডমুর দ্বীপ অর্থাৎ ডুমুরদহে বাস করেন। অহিপালের তিন পুত্র, কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও কেশীধ্বজ। কেশীধ্বজ সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করেন। কৃতধ্বজের পুত্র বিরলি, সুগন্ধি (৪) গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডের বংশধরেরা জগদ্দলে বাস করেন। কেশীধ্বজ চান্দোল নামক কায়স্থ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মী (বীরভূমের অন্তর্গত ভদ্রপুরের নিম্ন দিয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণী নামে নদী ছিল) নদীতীরে কেশীধ্বজের বংশীয় কায়স্থেরা বাস করেন। শিবপুর, বালুকা অর্থাৎ বালি, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রাম ব্রাহ্মণ-

* * *

কেউ সেজেছেন মোল্লারে ভাই,
কেউ সেজেছেন কাজী,
চাকা টুপী মাথায় দিয়ে কেউ সেজেছেন ঘাট মাঝি
* * *
বিবি আনারেব চরিত্র গাই।"

এই ব্যাপারে কালীপ্রসাদ শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে দিবারাত্র বাস করিতেন, এবং যোগ ধ্যানে জীবনের শেষাংশ যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর নাই। রামহরির দ্বিতীয় পুত্র শিব প্রসাদের মহেশ ও গিরীশ নামক দুই পুত্র ছিল, কেবল মহেশচন্দ্রের বংশ আছে। তাঁহার দুই পুত্র, বীরেশ্বর ও কেদারেশ্বর, বীরেশ্বরের কৃষ্ণকিশোর ও নকুরচন্দ্র নামে পুত্রগণ আছেন। তাঁহারা যদি নিজ পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাত থাকেন, আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

(১) বর্ত্তমান ভানকুনীর জলা।

(২) চুঁচড়ার সাড়েশ্বর তলা দেখা যায়।

(৩) বোধ হয় পূর্ব্বে এই স্থানে গঙ্গা বহুদূর পর্য্যন্ত সমরেখায় প্রবাহিত ছিল।

(৪) সুগন্ধি গ্রাম হুগলি হইতে পশ্চিম দিকে ধনেখালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে অমরপুরের পশ্চিমে। বহুরায় বংশই, এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী, পূর্ব্বে ইহাঁরা নবাব সরকারে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন, আজিও অনেকে ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আছেন। রায় মহাশয়দের পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ বাঙ্গালার মধ্যে একটী দর্শনীয় বস্তু। অত বড় তোরণ ও পূজার দালান এবং তাহার অদ্ভুত কারুকার্য্য এখন অতি অল্পই দেখা যায়।

দিগের বাসভূমি। হুগলির সন্নিকট বংশবাটী গ্রামের নিম্নে দামোদর হইতে খলাপি নদী আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। খলশালী নামক একখানি বৃহৎ গ্রামে ধীবর জাতীয় রাজা বাস করেন। গঙ্গার পূর্ব্বভাগে পাটলী গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস। গোবিন্দপুর, ভট্টপল্লী, শৃগালদহ, সারপল্লী অর্থাৎ সুরো প্রভৃতি [illegible] ধনজন সম্পন্ন গ্রাম এই [illegible]লা প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত।"

চৈতন্যদেবের জীবন-চরিতে কাঞ্চনা, শান্তিপুর, পানিহাটী, আড়িয়াদহ, বরাহনগর প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন আন্দুল, সুরসুনা, সীতারামপুর, মুরদপুর, বেহালা, রসাপাগলা, বরিষা, হরিনাভি, জাগুলি প্রভৃতি প্রাচীন ভদ্রগ্রামের নাম প্রচলিত রহিয়াছে। নদীয়া হইতে কৃষ্ণনগর, নারায়ণপুর, জাগুলি ও বারাশত হইয়া কলিকাতার এবং কলিকাতা হইতে বেহালার ভিতর দিয়া কুল্পি পর্য্যন্ত একটী পুরাতন রাস্তা রেণেলের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থমধ্যে আইন-আকবরিতে "কলকত্তা" এবং বটতলায় মুদ্রিত মুকুন্দ রামের চণ্ডীতে "কলিকাতা" ভিন্ন এই স্থানের ঐ নাম আমরা আর দেখিতে পাইতেছি না।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদসাহ আওরংজেবের পৌত্র বাঙ্গালার নবাব আজিম উসানকে অনেক ধনরত্ন দান করিয়া যে তিনখানি গ্রাম জমিদারদিগের নিকট উচিত মূল্যে ক্রয় করিবার অনুমতি লাভ করেন, অর্ম্মির মতে তাহা সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। কিন্তু কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হামিল্‌টন্, যিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, "কোম্পানির অধীনস্থ স্থানের সীমা একদিকে গর্ভর্ণপুর (গোবিন্দপুর) অপরদিকে বর্ণাগুল (বরানগর) [illegible] ওলন্দাজদিগের কুঠী ও বাগান আছে। এই [illegible] তীরে ছয়মাইল, স্থলভাগে লবণ হ্রদ পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে দশ বার হাজার লোক বাস করে। ইহারা কোম্পানির খাজানা রীতিমত প্রদান করিতে কোন আপত্তি করে না।" এই লেখায় বুঝা যাইতেছে, বরাহনগরের দক্ষিণ চিৎপুর পর্য্যন্ত কলিকাতা ছিল। তাহা হইলে সুতানুটী নহে, বাগুয়া বটে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সুতানুটী বাগুয়ার মধ্যস্থ একটী ডিহি মাত্র।

এইচ, বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ সালে Supplement to Statistical Reporter মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এদেশের বায়ুর গুণে কোন কাগজ পত্র অধিক দিন থাকে না। গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত দলিল পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সিরাজ উদ্দৌলার হস্তে প্রথমতঃ সে সমস্তই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার পর যত সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্যাঁতানিতে ও উঁই পোকায় নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং পুরাতন দলিল পত্র দৃষ্টে কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা কিছুই নিরূপণ করিবার উপায় নাই। ভ্রমণকারী ও কোন কোন লেখকের পত্রাংশ লাভ করিতে পারিলে পরম লাভ বলিয়া সেই গুলিকেই অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট।" ১৭৫২ খ্রীঃ হলওয়েল সাহেব তাঁহার ডেপুটী গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার চাকুরীর প্রথম হইতে হিসাব দাখিল করিতে বলায় গোবিন্দরাম উত্তরে বলেন, "পূর্ব্বের কাগজপত্র সমস্ত ১১৩৭ সালের

জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরেও কাগজপত্র উই পোকায় খাইয়াছে। "তিনি আরও বলেন, ইংরাজদিগের আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে যাহারা বাস করিত, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারা যায় নাই। যদি কোন দেশীয় চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলে হইতে পারে। তাঁহার উপরোক্ত আক্ষেপোক্তিগুলি প্রতি অক্ষরে সত্য। ইংরাজ আগমন অধিক দিনের নহে, দুই শত বৎসরের কথা মাত্র অথচ তাহার পূর্ব্বের অধিবাসিদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা কলিকাতার অতি পুরাতন অধিবাসী হইয়াও অনেক দিন হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া অতি সামান্য মাত্র সন্ধান পাইয়াছি। এখনও চেষ্টায় বিরত হই নাই, সন্ধান পাইলেই পাঠকগণকে অবগত করিব।

চিৎপুরে একটী অতি প্রাচীন কায়স্থবংশ বাস করিতেন, বহুকাল তাঁহারা চিৎপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবুও বাগুয়ার প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া তাঁহাদের কথা অগ্রে লিখিতেছি। মহানাদের দে বংশীয় কোন ব্যক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাগুয়া পরগণায় চিত্রপুর বা চিৎপুরে আসিয়া বাস করেন, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত কায়স্থ দে মহাশয়ের পৌত্র চক্রপাণি গৌড়ের নবাবের সেনাপতি ছিলেন। সে সময় লোকে বিদেশে চাকুরী স্থানে প্রায়ই পরিবার লইয়া বাস করিতেন না, চক্রপাণি সাহসী বীর ছিলেন, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না, বোধ হয় সেই জন্যই সপরিবারে গৌড়ে বাস করিতেন। তাঁহার একটী পরমা সুন্দরী বিধবা কন্যা ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার রূপলাবণ্যের সংবাদ নবাবের কর্ণে উঠিল। তিনি চক্রপাণি সেনাপতিকে ডাকিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। চক্রপাণি ~~যেমন বীর, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন~~ নবাবের অভিলাষ শ্রবণ মাত্র ~~আপনাকে~~ পরম পুলকিত দেখাইয়া ভাবী জামাতাকে সম্মানের সহিত বার বার অভিবাদন করিয়া বলেন, বাদসাহ আপনি প্যাগম্বরের ন্যায় সত্যবাদী, ইহা আমি অবশ্যই আশা করিব যে, আপনার এই অভিলাষ পূরণ করিতে আপনি কোন কুলোকের ছলনা বা বাধা প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবেন না। আমার একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের কৌলিক প্রথা অনুসারে আমাদের গ্রাম্য দেবতা চিত্রেশ্বরী দেবীর পূজা করিতে হয়, সুতরাং কন্যাকে লইয়া গিয়া চিত্রেশ্বরীর পূজা করিয়া আসিতে দুই সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব হইতে পারে। যদি সেই সময় মধ্যে কোন কুলোক আপনার মন ফিরাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমার এবং কন্যার, বড়ই মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইবে। নবাব চক্রপাণির ছলনা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিভূ স্বরূপ তাঁহাকে শিরোপা প্রদান করিয়া সম্মানের সহিত বিদায় করেন। কিন্তু সঙ্গে প্রহরী দিয়াছিলেন। চক্রপাণি গৌড়নগর হইতে সপরিবারে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে জাতিকুল, মান বাঁচাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। বিধাতা রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ববাস মহানাদের নিকট আসিয়া নৌকা রাখিলেন। এবং "সুবিখ্যাত জটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া আসি, তোমরা আমার কলত্রব্যাদি রক্ষা কর" বলিয়া সপরিবারে অবতরণ

করেন এবং অন্তপথে গঙ্গাতীরে আসিয়া নৌকারোহণ করিয়া স্রোতমুখে নৌকা ভাসাইয়া দেন। চিৎপুরে নামিতে আর সাহস হইল না, পাছে নবাবের লোকে ধরিয়া ফেলে। গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে মুড়াগাছার গভীর জঙ্গলতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে প্রদেশে জনমানবের কোন চিহ্নই নাই। নির্ভয়ে অবতরণ করিয়া বন মধ্যে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিৎপুরে নবাবের লোকজন আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার ভ্রাতার উপর এমন বিষম উপদ্রব করিয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। চক্রপাণি নিশাকালে বনমধ্যে দেবারতির শঙ্খঘণ্টার শব্দ পাইয়া এ কি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন বনমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন, এই নির্জ্জন বনে একটী পরম সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয় রহিয়াছে। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে ভক্তিভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেছেন। বিগ্রহের নাম হরিমাধব। নির্ব্বাসিত চক্রপাণি বিজন বনে সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গলাভে সানন্দে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া আপনার বিপদবার্ত্তা নিবেদন করিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিয়া বনমধ্যে যাহাতে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, তদুপযোগী সমস্ত সুবিধা করিয়া দেন। ক্রমে ইহাঁদের আদর্শে অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি জাতি আসিয়া হরিমাধবের মন্দির বেষ্টন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে হরিমাধবের মন্দির থাকায় গ্রামের নাম হরিনাভি রাখা হয়।

চক্রপাণির পুত্র শূলপাণিও পিতার সহিত আসিয়াছিলেন। তৎপুত্র বিষ্ণুদাসের সময় ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ভীষণ জলপ্লাবন ঝটিকা ও ভূমিকম্পে যখন নিম্নবঙ্গ ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই দৈব উপদ্রবে হরিমাধবের মন্দির মৃত্তিকা তলে বসিয়া যায়। আজিও লোকে সেই ভূমিখণ্ডকে হরিমাধবের পোতা বলিয়া উল্লেখ করে। বিষ্ণুদাস দের দুই পুত্র, পার্ব্বতী চরণ ও দেবীদাস। পার্ব্বতী চরণ বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন, এবং বিস্তার কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়া কতক স্থানের পার্ব্বতীপুর নাম প্রদান করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জয়কৃষ্ণের ঔরসে রামজীবন ও রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। রামজীবনের চারি পুত্র, শ্রীরাম, রামরাম, রামদেব ও লক্ষ্মীকান্ত, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের পৌত্র পর্য্যন্ত হইয়া বংশলোপ হইয়াছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ নিঃসন্তান, কেবল রামদেবের বংশ বর্ত্তমান; তাঁহার পুত্র আনন্দিরাম, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও মদন মোহন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ভৈরব চন্দ্র ও তারিণী চরণ, ভৈরবের পুত্র রামকুমার ও শ্যামকুমার, রামকুমারের পুত্র কেদার নাথ ও মহেন্দ্র নাথ। এই কেদার নাথ দে ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রয় করেন এবং নববিধানের প্রচারকত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান।

উপরোক্ত পার্ব্বতী চরণের কনিষ্ঠ দেবীদাসের পুত্র রাম কান্ত, তৎপুত্র রামেশ্বর, তৎপুত্র রামকিশোর, তৎপুত্র রাম কানাই, তৎপুত্র রাধামোহন। ইনি বংশ মধ্যে প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গুরুদাস, তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দে কায়স্থ-

জাতির ক্ষত্রিয়ত্বে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উপবিত আদি গ্রহণ করিয়াছেন। এই চক্রপাণী দের বংশ অতি বিস্তৃত। যদিও আমরা সমস্ত পাইয়াছি, কিন্তু এ প্রস্তাবে তৎ সমস্ত প্রকাশ করিলে অনেক স্থান যায় এবং পাঠকদিগেরও বিরক্তিজনক হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

বুয়র যুদ্ধ।

মিঃ চেম্বারলেন।

ইংলণ্ডের প্রাণ যতই উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হউক, ঔপনিবেশিক সচিব যদি ধীর এবং স্থির ভাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত নিজের পদোচিত কার্য্য করিতে পারিতেন, তবে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অভিনীত না হইলেও পারিত। উইট্‌ল্যাণ্ডারগণ অত্যাচারিত, বুয়র গবর্ণমেণ্ট দূষিত, এবং সেই গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে নানাপ্রকার সংস্কার প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বুয়র জাতির নিতান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি প্রণালীতে এই সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ। কাহারো মতে ইংলণ্ডের উচিত ছিল যে, ট্রান্সভয়াল রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর সুতীক্ষ্ণ অসির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া কঠিন ও অকম্পিত স্বরে বলা, "এই সময়ের মধ্যে তুমি এইরূপ পরিবর্ত্তন কর, নচেৎ তোমার অস্তিত্বের শেষ।" অপর পক্ষের মতে ট্রান্সভয়াল রাজ্যকে বুঝাইয়া, বন্ধু ভাবে প্রবোধ দিয়া, আবশ্যকীয় সংস্কারে প্রবর্ত্তিত করাই উচিত ছিল। চেম্বারলেন সাহেবের পূর্ব্বমত পাঠ করিলে পাঠকবর্গের নিকট বোধ হইবে যে, তিনিও এই শেষোক্তদলের লোক, অবস্থার বাধ্য হইয়া মতান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। চেম্বারলেন সাহেবের বিপক্ষগণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি নিজে কোন মতামতের ধার ধারেন না, বাতাস যখন যেদিকে বহিতে থাকে, তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতকে পরিচালিত হইতে দেন। একথা কত দূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতেও আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, ঔপনিবেশিক সচিব যে প্রণালীতে ট্রান্সভয়াল রাজ্যের সহিত বিবাদ আপোসে মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যেরূপ ভাবে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোচিত হয় নাই। তিনি যদি বুদ্ধিমত্তা এবং সরলতার সহিত সমস্ত তর্কিত বিষয় মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইতেন, তবে ক্রুগারের সঙ্কীর্ণতা, রোডসের দুরভিসন্ধি, এবং উইট্‌ল্যাণ্ডারের স্বার্থপরতা সত্ত্বেও এই যুদ্ধ না ঘটাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পূর্ব্বের মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইল, তিনি ছলান্বেষীর ন্যায় "আর পাইত আর চাই" নীতি অবলম্বন করিলেন। এই যুদ্ধে বুয়রের দায়িত্ব বৃহৎ, ইংলণ্ডের দায়িত্বও কোন অংশে কম নহে। আমাদিগের কথার সারবত্তা বুঝাইবার নিমিত্ত, আমরা এই অধ্যায়ে চেম্বারলেন সাহেবের পূর্ব্বমতের আলোচনা করিব এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তিনি কিরূপভাবে আপো-

সের প্রস্তাব চালাইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বুয়র এবং ইংরেজের মধ্যে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয় কি ছিল, তাহার সমালোচনা করিব।

মজুঁবা যুদ্ধে ব্রিটিস সৈন্য পরাভূত হওয়ার পর ইংলণ্ড যখন প্রতিহিংসার নিমিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তখন মহামতি গ্লাডোষ্টোন সেই জাতির সুবৃহৎ গৌরব ভেলার কর্ণধার; তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের পথে ধীর এবং স্থিরভাবে অগ্রসর হইলেন, বুয়র জাতিকে প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে দয়া এবং সহানুভূতি প্রদান করিলেন, বুয়র রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎকালে চেম্বারলেন সাহেব সেই মহাপুরুষের সহযোগী ছিলেন, সে সময়ে বুয়রদিগের প্রতি তাঁহার কি ভাব ছিল, তাহা তাঁহার তৎকালীয় উক্তির নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন।

"বুয়রগণ স্বাভাবিক যুদ্ধপ্রিয় নহে, তাহারা আড়ম্বরশূন্য, পরিশ্রমী, কিন্তু অমার্জ্জিত এবং অসভ্য কৃষকজাতি; ভূমিজাত দ্রব্যই তাহাদিগের জীবিকা। গভীর ও কঠোর ধর্ম্মভাবের দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় অনুপ্রাণিত। এবং তাহাদিগের যে পূর্ব্বপুরুষগণ স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের অত্যাচারময় শাসন হইতে হলাণ্ডকে স্বাধীন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহারা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতার প্রতি অদম্য ভালবাসা উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ কি ইংরেজ জাতির নিকট প্রশংসনীয় নহে, এবং ইংরেজ চরিত্রের উৎকৃষ্ট অংশ এই সমস্ত গুণের দ্বারা গঠিত বলিয়া কি আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি না? এইরূপ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র সাহায্যে বিবাদ মীমাংসা করা কি আমাদিগের পক্ষে প্রয়োজন হইবে?"*

উপরের লিখিত কয়েকটী পংক্তি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তৎকালে ইংরেজরাজ-সচিব কি উদার ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন।

চেম্বারলেন্ সাহেবের অতিপূর্ব্বমত, অর্থাৎ যখন তিনি "লিবারেল্" দলভুক্ত ছিলেন, তৎকালীয় মত, পূর্ব্ব লিখিত কয়েকটী পংক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তৎপর তিনি "ইউনিয়নিষ্ট" দলভুক্ত হইবার পরও, ১৮৯১ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মতের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৯৬ খ্রীঃঅব্দে, জেমসন্ রেডের পরে, ক্রুগার যখন তীব্র হইতে তীব্রতম উপায়ে উইট্ল্যাণ্ডারের অদৃষ্টাকাশ কালিমাময় করিয়া তুলিতেছিলেন, তখনও কনষ্টিটিউসনাল্ ক্লাবে বক্তৃতা কালে তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

"দক্ষিণ আফ্রিকায়, দুইটী জাতিকে, ইংরেজ এবং ওলন্দাজকে, একত্রে বাস করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে, সম্ভবতঃ আরো কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে, ওলন্দাজের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং

* "The Boers are not naturally a warlike race; they are a homely, industrious, but somewhat rude and uncivilised nation of farmers living on the produce of the soil; they are animated by a deep and even stern religious sentiment, and they inherit from their ancestors, the men who won the independence of Holland from the oppressive rule of Phillip II of Spain, their unconquerable love of freedom and liberty. Are not these qualities which commend themselves to men of the English race, are they not virtues which we are proud to believe form the best characteristics of the English people? Is it against such a nation that we are to be called upon to exercise the dread arbiterment of arms?"

প্রত্যেক রাজপুরুষের, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তির, কর্ত্তব্য যে, এই দুই জাতির মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্দ রক্ষিত হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আমাদিগের নিজের কেপকলনীতেও ওলন্দাজের সংখ্যা বেশী। কেনাডাবাসী ফরাসী-কেনেডিয়ান সহযোগী প্রজাবর্গ যেরূপ রাজভক্ত এবং ব্রিটিস সংস্রবে আস্থাবান, কেপকলনীতে সহস্র সহস্র তদ্রূপ প্রকৃতির ওলন্দাজ বসবাস করেন। পক্ষান্তরে উল্লিখিত সহযোগী ওলন্দাজ প্রজাবর্গ স্বভাবতঃই মনে করিয়া থাকেন যে পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী সাধারণতন্ত্র রাজ্যবাসী ওলন্দাজগণ তাঁহাদিগের একই শোণিত-সম্ভূত, এবং যখন তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার বল প্রয়োগ কিম্বা অবিচার করা হইবে, কিম্বা বল প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, তখন তাঁহাদিগের (কেপবাসী ওলন্দাজদিগের) সহানুভূতি তাঁহাদিগের একদেশবাসী প্রজাদিগের প্রতি জন্মে। সুতরাং একথা সর্ব্ববাদীসম্মত হওয়া উচিত যে, ইংরাজ এবং ওলন্দাজের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব রক্ষিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা অবলম্বিত এবং সর্ব্বপ্রকারেরই উপায় নিঃশেষিত হওয়া উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা যখন শ্রেষ্ঠতম শক্তি, তখন' এ কথা সত্য যে, আমরা উইটল্যাণ্ডারদিগের দুঃখে উদাসীন থাকিতে পারি না।"

"কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তদ্রূপ ডাচ্ গবর্ণমেণ্টও বটে, সুতরাং উপরের লিখিত কষ্টের প্রতিকার-চেষ্টা-কালে, আমাদিগের সহযোগী ওলন্দাজ প্রজাদিগকেও, আমাদিগের সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে, অল্প কয়েকদিনের কয়েকটী ঘটনার পূর্ব্বে, অন্তরীপ-নিবাসী ওলন্দাজ, ফ্রিষ্টেট-নিবাসী ওলন্দাজ, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র-নিবাসী উদার-নীতি-ধারী ওলন্দাজগণ পর্য্যন্ত, উইটল্যাণ্ডার দিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। আপনাদিগের সকলেরই পরিজ্ঞাত কারণ হইতে এইক্ষণে সেই মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু আমি নিরাশ হই নাই, আমি বিশ্বাসের সহিত আশা করি যে, ট্রান্স্‌ভায়াল আক্রমণের পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে পুনরায় সেই অবস্থা আনয়ন করা যাইবে; এবং পুনরায় আফ্রিকা নিবাসী অধিকাংশ ওলন্দাজের সহানুভূতি এবং সমর্থনা দ্বারা আমাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষিত হইবে; এবং যদি আমরা তাহা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সমবেত মতের সৃষ্টি হইবে, সেই মতকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন শক্তি আর বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। এইক্ষণে, মহোদয়গণ, মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ইহাই অবলম্বিত নীতি। *

* "In South Africa two races, the English and Dutch, have to live together. At the present time and probably for many years to come the Dutch are in the majority, and it is therefore the duty of every statesman, of every well-wisher of South Africa to do all in his power to maintain amicable relations between the two races. In our Cape-colony the Dutch also are in a majority. There are tens of thousands of Dutchmen in the Cape-colony who are just as loyal to the throne and to the British connection as, let me say, our French Candanian fellow subjects in the Dominion of Canada. At the same time these Dutch fellow subjects of ours very naturally feel that they are of the same blood as the Dutchmen in the two neighbouring Republics, and they

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মে তারিখে সার উলিয়ম্ হারকোর্ট সাহেবের কথার উত্তরে হাউস্ অব্ কমন্স্ সভায় বলিয়াছেন :—

কোন স্থলে এরূপ ভাব প্রকাশিত হইতেছে যে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে এই গবর্ণমেণ্টের শেষ-লিপি (ultimatum) প্রেরণ করা উচিত। যে লিপি নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য হইবে, এবং তদন্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাশয়, আমি তদ্রূপ সম্ভবপরতার বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করি না। যে কোন যুদ্ধে ব্রতী হওয়া সম্ভবপর, তন্মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব-ভার-যুক্ত। যুদ্ধ অন্তঃবিগ্রহের স্বভাবযুক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, কষ্টপূর্ণ এবং বহুব্যয়-সাধ্য। আমি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে, এই যুদ্ধাগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পরও যে অনলময় ভস্মরাশি রাখিয়া যাইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সুশীতল করিতে বহুপুরুষ-ব্যাপী কালও যথেষ্ট হইবে না। এই গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী অব্-ষ্টেট পরম্পরা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ট্রান্স্ভাল রাজ্যের অন্তঃশাসন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নিমিত্ত এই গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই। এইক্ষণে উক্ত বিষয়ে সংস্কার প্রবর্ত্তিত করার নিমিত্ত যদি প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া হয়, তবে সেই কার্য্য একদিকে যে, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অপরদিকে তদ্রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে।"*

চেম্বারলেন্ সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ করা আমাদিগের পক্ষে

---

sympathise with their compatriots whenever they think that they are to be subject, or are likely to be subject to any injustice or to the arbitrary exercise of force. It was, therefore, a proposition to be universally accepted that we must use every exertion and exhaust every means of securing good feeling between the Dutch and the English. It is true that as the paramount power in South Africa we could not be indifferent to the grievances of the Witlanders.'

"But as a Dutch Government, well as an English Government, it ought to be our object, endeavouring to secure the redress of their grievances, to carry with us our own Dutch fellow subjects. (Cheers.) Up to a recent date—until recent events the sympathy of the Dutch population at the Cape, in the Orange Free State, and even of the Progressive Dutchmen in the South African Republic itself—the sympathy of all was with the Imperial Govefnment and with the Witlanders in endeavouring to secure the redress of their grievances. There has been a revultion of feeling since from causes which are wellknown to you, but I do not despair, in fact I have a confident hope, that we shall be able in the course of no lengthened time, once more to restore the situation as it was before the invasion of the Transvaal, and to have at our back the sympathy and support of the majority of the Dutch population in Africa; and if we have that opinion—the united opinion which that will constitute will be an opinion which no power in Africa can resist. Now, gentlemmen, that is the South African policy, of Her majesty's Government." ("Hear, hear.")

On the 22nd april 1896 M. Chamberlain, addressing a select audience at the constitutional *club*.

* "In some quarters idea is put forward that the Government ought to have issued an ultimatum to President Kruger – an ultimatum which would have certainly been rejected and which must have led to war. Sir, I do not propose to discuss such a contingency as that. A war in South Africa would be one of the most serious wars that could possibly be waged. It would be in the nature of a civil war. It would be a long war, a bitter war, and a costly war. As I have pointed out, it would have behind it the embers of a strife which I beleive generation would hardly be long enough to extinguish. To go to war with President Kruger in order to force upon him reforms in the internal affairs of his state, with which successive Secretaries of state standing in this platform have repudiated all right of interference, that would have been a course of action as immoral as it would have been unwise," (Cheers)

সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমরা নিম্নে কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তাঁহার তৎকালীয় মতের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। আমরা এতৎপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ১৮৯৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট কোন্ স্বভাবের নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অবলম্বনীয় নীতি বলিয়া মনে করিতেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিগ্রহ-সংঘটনকে কিরূপে অধর্ম্মজনক এবং বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ট্রান্সভয়াল রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন-কার্য্যে সংস্কার-বিধান করা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের শক্তি কিরূপ সীমাবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখেও তিনি হাউস অব কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, বন্ধুভাবে উপদেশ দেওয়া ব্যতীত কোন প্রকার আভ্যন্তরিক বিষয়ে কোন সংস্কার বিধানের নিমিত্ত প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে বাধ্য করিবার কোন অধিকার ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নাই। চেম্বারলেন্ সাহেব এই সময়ে এ কথাও বলিতেন যে, ক্রুগার যদি বিশ্বাস করেন যে, উইট্ল্যাণ্ডারদিগকে রাষ্ট্রীয় সদস্য-সভায় পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহার নিজের ক্ষমতা হ্রাস হইবে, তাহা হইলে, সে বিষয়ে অসম্মত হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে এবং কেহ তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ নিন্দা করিতেও পারে না।

যে "সুজারেণ্টি" নিয়া শেষে এত গোল, প্রকৃত প্রস্তাবে যে কথাটী যুদ্ধের কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার মত ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। তিনি ৯ই মে তারিখে বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন যে, আমরা আমাদিগকে সুজারেন বলি অথবা অন্য আখ্যা দেই, সে শব্দ লইয়া কলহ করার প্রয়োজন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ-শক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেই হইল। এই প্রধান্য কেহ অস্বীকার করে নাই, কারণ অস্বীকার করা অসম্ভব। অথচ সেই শব্দের জন্যই এত নররক্তপাত হইল!

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে চেম্বারলেন্ সাহেব সার্ আমেদ্ বার্টলেট্ সাহেবের কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি যুদ্ধের কল্পনাকে অতি তীব্রভাষায় সমালোচনা করেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বমত সমর্থন করেন। তাঁহার এই কথা গুলি এরূপ সতেজে এবং পরিষ্কাররূপে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার তাহা অবিকল উদ্ধৃত করার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। *

* "What is the alternative? What is the policy which the honourable gentleman would put forward if he were standing here in my place? What would be the policy of the hon. member for Sheffield as colonial Secretary? (Laughter) We know what it would be. He would send, in the first place, an ultimatum to President Kruger that unless the reforms which he was specifying were granted by a particular date the British Government would interfere by force. Then I suppose he would come here, and ask this House for a vote of L 10,000,000 or L 20,000,000 —it does not matter particularly which (laughter)—and would send an army of 10,000—men, at the very least, to force President Kruger to grant reform in a state in regard to which not only this Government but successive Secretaries of State have pleged themselves repeatedly that they would have nothing to do with its interral affairs, that is the policy of the hon. gentleman, that is not my policy. My policy has been to restore the good feeling which was beginning to be created between the Dutch and the British population.........Common prudence demands

যাহারা চেম্বারলেন্ সাহেবের উল্লখিত উক্তিগুলি অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিবেন,তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য বড়ই অসম্বদ্ধ এবং নীতিশূন্য বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি যে, অবস্থার নিকট তিনি পরাজিত হইয়া—শান্তিপথাবলম্বী সাম-নীতি দ্বারা অভীষ্ট স্বরূপ একান্ত প্রয়োজনীয় ফললাভে অসমর্থ হইয়া—তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবলম্বিত নীতির বিরোধী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

চেম্বারলেন্ সাহেবের মত পরিবর্ত্তনের বিষয়, পাঠক মহাশয় উপরের লিখিত কয়েকটী মত তাহার পরবর্ত্তী সময়ের অবলম্বিত মতের সহিত তুলনা করিলেই, বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর আমাদিগের অধিক ব্যক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায় ?

(১)

মল্লিকা মালতী জাতি
ধরিয়া ত্রিদিবভাতি
হরষে ঢলিয়া পড়ে
ভ্রমরের গায় ;
অবোধ অতৃপ্ত অলি
এর প্রেম পায়ে ঠেলি,
কণ্টকিত কেতকীর
পানে ছুটে যায়।
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায় ?

(২)

রূপসী তারকা দল
লয়ে আঁখি ছল ছল
ঘিরে থাকে শশধরে
ব্যাকুল হিয়ায় ;
শশী নিমেষের তরে
তা'দিকে দেখে না ফিরে,
মুগ্ধ সে গো কুমুদিনী
প্রণয় আশায়।
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায় ?

(৩)

হৃদিভরা প্রেম লয়ে
শত উপহাস সয়ে
অর্ঘ্যসম আপনারে
দিয়াছ যাহায় ;
সে তোমার প্রেমরাশি
হাসি' শুধু শুষ্কহাসি
অথবা ঘৃণার ভরে
ফেলে চলে যায়.
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায় ?

(৪)

যারে ভাবি' আপনার
দিবানিশি অনিবার
প্রেম শতদলে পূজ
দেবতার প্রায় ;

---

that at all events we should give time for the feeling of irritation produced by the raid to subside, and that we should not base upon our own wrong a demand for reform that would be absolutely unjustifiable under such circumstances. (Cheers) That is my policy, and I believe that policy is succeeding.

শত নিশি যার লাগি
কাটায়েছ একা জাগি,
বারেক সে তব কথা
ভাবে নাক হায়!
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায়?

(৫)

ভালবাসা মরীচিকা
দূরেতে রজত রেখা
যত মনে কর কাছে
তত সরে যায়;
ভাব যারে আপনার
জেনো সে নহে তোমার
তারো মন তব সম
অন্যপানে ধায়।
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায়?

(৬)

যাহারে পাবার নয়
তারে কেন মনে হয়
আপন করিতে সদা
বাঁধিতে হিয়ায়?
একি গো স্বপন সম,
শুধু মোহ, শুধু ভ্রম,
ভালবাসা-প্রতিদান
নাহি কি ধরায়?
পায় না যাহারে হৃদি কেন তারে চায়?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

১লা পৌষ, স্বর্গীয়া ** দেবীর চিত্র দর্শনে উচ্ছ্বাস।

ছবিখানি নেহারি তাহার
বুক যেন ভরে এলো আঁধারে,
পুরাতনে নূতন করিয়ে
এতদিন পরে পুন কাঁদাবে!

ভালবাসা-মাখান বয়ানে
প্রাণ যেন, আছে এবে নিহিত,
হাঁসির চিকণ শশী লেখা
এখনো প্রেমেরে স্মরে মোহিত।

ছল ছল করিয়া নয়ন,
আসিতেছে ভিজে আজি যেন রে,
রুণুর অঙ্কিত ছবি নেহারি,
তার তরে একা কাঁদি কেন রে?

বিশ্বাসতো নাহি মনে জাগে,
তারে আমি ফেলিয়াছি হাঁরায়ে,
লতিকা বিতানে বুঝি সেগো,
আমা তরে আছে এবে দাঁড়ায়ে!

হয়তো তুলিছে কত ফুল,
দোঁহে ব'সে মালা গাছি গাঁথিবে,
আঁচল ভরিয়ে "রাজু" মোর
আমা কাছে এখনিতো আসিবে।

জাগরণে অলস স্বপন
স্মৃতিরে পিয়ায় দারু যতনে,
এমর জীবনে কভু আর
পাইব কি সেই প্রিয়া রতনে?

বসন্ত যা দূরে গেছে চলি
কাছে জাগে শরতের জোছনা,
কেঁদে কেঁদে শুধু মাঙা হাসি
হাসি দিয়া জীবনের রচনা।

হাসে "তরু" হাসে "ইন্দু" বসি
হাসে "শেকা" মাতৃহারা তনয়া,
'শরতের' অঙ্ক মাঝে শোভে
নবজাত শিশুবর্ণ কণয়া!!

আসে অশ্রু টুটি হাসি বুক,
হাসি আসে অশ্রু বুক চিরিয়ে,

চলে যে গিয়াছে তারে ছেড়ে
নূতনেরে আনি স্নেহে ঘিরিয়ে।

নিরদয় হ'য়ে সেই দিন,
পুঁছেছি নয়ন জল বসনে,
পুরাতনে চাপাইয়া ভুল,
বসায়েছি চিত্তবনে নূতনে।

নিরাশাও দূরে যায় চলি,
সুবর্ণ মঞ্জীর দিয়া চরণে
শত উর্ব্বশীর রূপ লয়ে
আসে আশা ভগ্ন কুঞ্জ কাননে।

পিক পুন আলাপে পঞ্চম,
বাসনা উছলি উঠে মরমে,
অনুরাগে সাজাতে হৃদয়
আপনি চমকি উঠি সরমে।

স্পর্শ করে স্বজন বিরাগ
পিতা মাতা ঘৃণা দেন ঢালিয়া,
আসক্তি বৈরাগ্য রূপ ধরি
একাকিনী উঠে প্রাণে কাঁদিয়া।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আত্মার মঙ্গল।*

হে দেব! জীবনলীলা করি পরিহার
চলিল স্বরগ ধামে বিনয় আমার।
হে পিতঃ! হে পরমেশ! ভকত-বৎসল!
জীবের আশ্রয়স্থল আত্মার মঙ্গল!
ত্যজি ধন, ত্যজি জন, শিশু মম যায়,
ডেকে লও ডেকে লও স্নেহ মমতায়।
হে প্রভো! হে বিভো! ভব-সিন্ধুর কাণ্ডারি!
ভবেশ ভৈরব-ভীম-ভব-ভয় হারি!
নিতান্ত চলিল শিশু তোমার আশ্রয়ে,
সুবাস করিয়ে রেখো চরণ-কুসুমে।
নিবেদন করে তার দুঃখিনী জননী
তাপিত সে শিশুটিরে কোলে লও তুমি।
আহা, কত কষ্ট পেয়ে মোর সে গিয়েছে চলে
তুলে লও কোলে প্রভু তুলে লও কোলে।
জীবের ভরসা তুমি জীবনে মরণে,
চরণে যেতেছে শিশু রাখিও চরণে।
জগন্নাথ, জগবন্ধু জগতজীবন!
দীনবন্ধু প্রিয় তব দীন হীন জন।
চলিল গো দীন নাথ শিশু দীন হীন
রোগাগুনে দগ্ধীভূত বদন মলিন,
তোমার চরণতলে, চৈতন্যস্বরূপ!
একমাত্র শান্তিদাতা এক মাত্র ভূপ!
আশীর্ব্বাদ করি আমি নয়নের জলে
তব কাছে পাঠালেম তুমি লও কোলে।
জগদীশ, সে আমার হৃদয়ের ধন
করিলাম তোমার চরণে সমর্পণ।
জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়তি নিয়ম,
লঙ্ঘন হউক ইচ্ছা নাহি প্রিয়তম!
গেল শিশু তব কাছে শোক নাহি তায়,
তুমি তারে স্থান দিও চরণ-ছায়ায়।
রোগে দুঃখে শান্তিহারা শিশু অসহায়,
চলিল তোমার পদে শান্তির আশায়
আত্মার উপরে তার নিত্যনিরঞ্জন!
শান্তির সন্তোষ-উৎস কর বরিষণ।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ত্যজিয়া সকলে,
শরণ লইল তব চরণ কমলে
ত্যজি রবি ত্যজি শশী ত্যজি বন্ধুদলে,
শরণ লইল তব চরণ-কমলে।
হে শুভ! হে শিব! সনাতন সুধাকর!
হে অনন্ত! হে অব্যয়! হে সত্য শঙ্কর!
চরণ-সরোজে তারে এক বিন্দু স্থান
সৃষ্টি স্থিতিকারী হরি করহ প্রদান।

---

* স্বর্গগত বিনয়ভূষণ দাসগুপ্তের মৃত্যুতে এই শোক-কবিতা লিখিত হইল।

তোমার নিকটে যাবে আর কারে ভয়
অভয় আনন্দ দান করহ অব্যয়।
বড় আদরের সে যে বড় সোহাগের,
বড় আবদারে সে যে অগাধ স্নেহের।
তোমার নিকটে যাবে এই ভরসায়
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া দিলাম বিদায়।
রোগ জ্বালা দুর্ব্বলতা সব হবে দূর,
আনন্দ আলয়ে পাবে আনন্দ প্রচুর।
কি বলিব দুঃখকথা প্রভু ভগবান!
সেই জ্যেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ সেই সে প্রধান
সন্তানের মধ্যে মম সব জান তুমি,
অন্তরযামীর কাছে কি জানাব আমি।
তথাপি তাহাতে দুঃখ করি না ঈশ্বর
তুমি তারে সুখ শান্তি দাও নিরন্তর।
আমি পাপী মহাপাপী মহা দুঃখানলে
অবশ্য হৃদয় মম যাইবেক জ্বলে।
হৃদয় হউক মম পুড়ে ছারখার
তাহারে রাখিও সুখে মিনতি আমার।
আত্মাতে আনন্দ তার উঠুক বিকাশি
বসন্ত কুসুমে যথা সুবাসের রাশি।
অতৃপ্তি অভাব পূর্ণ অনিত্য এভব
বিষতুল্য যাবতীয় বিষয় বিভব।
অল্পকালে ত্যজি সব পবিত্র বালক
চলিল তোমার কাছে পৃথিবীপালক।
সুশীল সুবোধ সে যে ধার্ম্মিক সরল
জগদীশ কর তার আত্মার মঙ্গল।
শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

সঙ্গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—একতালা।

সচ্চিদানন্দময় স্নেহসিন্ধু
বিশ্বজীবন মূলে, অমৃতরূপ বিরাজে।
জরা মরণ দুঃখ ভাগী,
প্রবল ভীতি আকুল জীবানুরাজি;
চির বসন্ত পরশে—হর্ষিত মৃতজন,
নবজীবন লভে।
নব নবীন সুরঞ্জিত,
সদা নবতর, এমর ভুবন বিকাশে।
অমৃত আনন্দ প্রকাশে,
কিবা আশ্চর্য্য প্রভাবে।
বিকল বিরূপ বিশ্বজন,
সদা সুন্দর সুন্দরতর;
পরম প্রিয় দরশন,
মোহনরূপ লভে।
অন্ধ নয়ন পায়,
আদ্য তমিস্র আলোকরূপ,
অজ্ঞান জ্ঞানি, জর অজর
মর অমররূপ বিকাশে।
বুদ্ধি মন চিত অভিভূত
আনন্দ পরশে স্নেহসিন্ধু
অমৃতময় নাম সাধু মুখে শুনি
দীনজন মরম পরশে।
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৫। কবিতা-কুঞ্জ। শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য।৵০। বালকদিগের জন্য এই পুস্তক লিখিত। তাহাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। সক্রেটিস সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন;—

"অবনত নহ দুখে
স্ফীত নহ কভু সুখে,
তোমাতে জোয়ার ভাটা নাহি মনেতে,
আদর্শ চরিত্র তুমি সভ্য য়ুরোপের।
স্বাধীন উন্নত প্রাণ,
শুনিত যশের গান
পরমুখ চেয়ে কিছু করনি কখন।
রাখি নিজ লক্ষ্য ঠিক
চলিয়াছ নিরভীক,
ধীর মনে বাধা শত করি আনমন
দমে নাই মন তব হতাশে কখন।"

৩৬। অশ্রুবিন্দু।—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শোক-গাথারূপ পুণ্যকাহিনী নীরবে শুনিতে হয়। আমরা তাহাই করিলাম।

৩৭। কায়স্থতত্ত্ব-বিচার।—শ্রীহেমন্তকুমার বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য ৵০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা তাহার খণ্ডন। নগেন্দ্র বাবুর প্রত্যুত্তর পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

৩৮। ফুলের মালা।—শ্রীঅনাথ

বর্দ্ধ সেন প্রণীত। মূল্য।০; বরিশাল, আদর্শ যন্ত্র। ২।৩টী কবিতা ভাল লাগিয়াছে।

৩৯। বঙ্গমঙ্গল।—মূল্য ৵০। এই পুস্তক খানি রচনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; পড়িয়া গ্রন্থকারের মাতৃভক্তির পরিচয়ে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম।

মায়ের আহ্বান কি সুন্দর—

"ডাকিছেন—"আয় মোর নিরন্ন সন্তান,
তোদের কিসের দুঃখ? কেন হাহাকার?
চিরদিন অফুরান ভাণ্ডার আমার।
"লও বৎস, আমার এ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—
কাণে কি বাজিবে তোর এ আর্ত্ত আহ্বান?
আছে দেশে খোলা মাঠ, বুক জোড়া হাওয়া;
সেথাকার ধূলামাটি করে তোরে দাওয়া।
দু'হাতে ছড়াগে সেথা মুঠা মুঠা ধান,
কুড়াগে সোণার বেণু, ওরে ম্রিয়মাণ।
"আছে শান্তি, আছে শান্তি সে শান্ত কুলায়ে,
স্নেহশ্যাম পল্লীপথে, অশ্বথের ছায়ে,
স্বচ্ছ-তোয়া স্রোতস্বীর উচ্চ বালুচরে
পলায় মেঘের ছায়া, রৌদ্র এসে পড়ে।
ভাসায় তালের ভেলা জলের উপর,
উদাস-আকুল গায়ে স্বাধীন ধীবর।"

৪০। কবিতা।—শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত; সমস্ত পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম, আমার দেবতা, আত্ম সমর্পণ, বঙ্গভাষা, পথিক প্রভৃতি কবিতা আমাদের বেশ লাগিয়াছে। সাধনা করিলে কালে গ্রন্থকার সিদ্ধ মনোরথ হইবেন!

৪১। সুন্দরী।—উপন্যাস; শ্রীযতীন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৲।

সাহিত্যের এক একটা যুগ থাকে, সেই যুগে যেমন জিনিস হয়, অন্য যুগে তেমন হয় না। এই সূত্র ধরিয়া কোন কোন অকৃতী, অবিজ্ঞ লেখক-সমালোচক সিদ্ধান্ত করেন, "অমুক লোকের ন্যায় আর কেহ লিখিতে পারিবে না।" প্রকৃতির প্রতি বস্তুই যখন পৃথক রূপ, তখন একজনের ন্যায় আর একজন পারিবে কিরূপে? আমরা বলি, এ যুগের লেখকগণ যেরূপ পারেন, সে যুগের লোকেরা যত বড় প্রতিভাশালী লোকই হউন না কেন, এরূপ পারিতেন না। সে কালের বঙ্গদর্শন খুব ভাল ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু এ যুগের প্রথম শ্রেণীর কাগজ সকলে গত ৮।১০ বৎসর যে সকল সরস প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা বঙ্গদর্শনের সাধারণ শ্রেণীর প্রবন্ধ হইতে অনেক ভাল। অন্ধ না হইলে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ, দিন দিনই পৃথিবী উন্নতির পথে চলিয়াছে, কে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিবে? রাণী এলিজাবেথের সময়ে বিলাতে অনেক কৃতী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ের কৃতী লেখকগণ কি তুচ্ছ, নগণ্য? মাসিক পত্রিকার সমালোচকগণের ন্যায় যাঁহারা না পড়িয়া, না চিন্তা করিয়া বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহারা কোন দেশেই আদৃত হইতে পারেন না। বঙ্কিম বাবু খুব প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালাভাষা কি লোপ পাইবে? আর কেহ কি কলম ধরিবে না? যিনি এরূপ বলেন, তাঁহার মন্তব্য পাঠের ও প্রণিধানের অযোগ্য।

বাবু যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বোধ হয়, একজন নবীন লেখক। বোধ হয়, তিনি বেশী দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন নাই। তবুও তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতকে যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় লোকেরা বলেন, যতীন্দ্রনাথের সাহস বড় বেশী।

আমাদের দেশের লোকেরা ২০ খানি পদ্য পুস্তক বা ৫০ খানি উপন্যাস দেখিলেই শিহরিয়া উঠেন। হায়, একটা ভাষাকে গণ্য মান্য করিতে হইলে কত রাশি রাশি গ্রন্থ চাই, তাঁহারা একবারও ভাবেন না!

এই সবে দুই কি তিন যুগ ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার একটু বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছে; লেখকেরা কিছু কিছু লিখিতেছে, পাঠকেরা কিছু কিছু পড়িতেছে। একটা ভাষাকে দাঁড় করাইতে হইলে কত লেখক ও কত পাঠকের প্রয়োজন, তাহার হিসাব কে দিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষার লেখক সহস্র গুণ এবং পাঠক কোটীগুণ বেশী হইলেও আমরা কিছু হইল মনে করি না। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য।

এই যৎসামান্য চেষ্টা আয়োজনের মধ্যেই সাহিত্য-সংসারে হিংসা-বিদ্বেষ-কীট প্রবেশ করিয়াছে। কত সুকুমার-সাহিত্য-চা

কাটিয়া বিনষ্ট করিতেছে। এ দেশের মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা আর কিছুই নহে, উহা হিংসা-বিদ্বেষ-পোকার উদ্গীরিত বিষ রাশি মাত্র। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদিগকে জ্যেষ্ঠভ্রাতদিগের দলে বকামী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, আজ তাঁহারা বড় বড় সমালোচক! শস্যক্ষেত্রকে পঙ্গপালের হস্ত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা ও যত্ন আছে, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রকে রক্ষা করার কোনই চেষ্টা নাই। আগাছা খাইয়া পঙ্গপালগণ যদি পলায়ন করিত, কেহ শঙ্কিত হইত না; কিন্তু হায়, আগাছার সহিত কত সুগাছকে যে পঙ্গপালগণ বিনষ্ট করে, কে না জানেন?

চিতোরের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। চিতোরের বীরত্বকাহিনী ভারতের গৌরব, যতবার শুনি, ততবারই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যতীন্দ্র বাবুর এই পুস্তক পড়িয়াও বারম্বার আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, বারম্বার আমাদের অশ্রু-পতন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই নবজাত সুন্দর চারাটী পঙ্গপালের হস্ত হইতে সুরক্ষিত হইবে কি?

যতীন্দ্র বাবু, সুন্দরী শোভন সিংহ, আবদুল্লা-আয়মানী, লাবণ্যময়ী-তেজসিংহ, এই ৩ প্রেমিক শ্রেণীর প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, একাধারে মিলন, বিচ্ছেদ, শোক চিত্র দেখান নই, বোধ হয়, তাঁহার উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হয়, এইরূপ করায় অযথা পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুস্তকখানি কিছু জটিল হইয়াছে। ভবিষ্যতে গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে সতর্ক হইলে আমরা সুখী হইব। এক সময়ে এক স্থানে একটা ভাবকে স্থায়ী করার জন্যই লেখকগণের চেষ্টা করা উচিত। •

পুস্তকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা শেষাংশ যেন-তেন-প্রকারে লেখা হইয়াছে। শোভন সিংহের আত্মত্যাগের পর হইতে কাহিনী নীরস, উচ্ছ্বাস-শূন্য হইয়া গিয়াছে।

এই সকল দোষ ভিন্ন অন্যরূপ গল্পগত দোষ আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। সুন্দরী-শোভনের প্রেম-পরিচয়ের সময় ৮ ও ১৪ বৎসর ধার্য্য করা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এই পুস্তক খানি আদ্যন্ত অতি সুরুচির সহিত লিখিত। তেজসিংহের একটী চুম্বনের বর্ণনা না থাকিলে আরো ভাল হইত। লেখক এই পুস্তকে গল্প রচনায় যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, কালে তাহা হইতে অনেক সুফল প্রসূত হইবে, আশা করি। এই পুস্তক পড়িয়া আমরা গ্রন্থকারের প্রতি বড়ই আস্থাবান হইয়াছি। বিধাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৪২।—দেবলা। ঐতিহাসিক কাব্য। মৌলবী ওসমান আলী বি-এল কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ॥০। গুজরাটের রাণী কমলা দেবী ও তাঁহার দুহিতা দেবলা দেবীর আখ্যান অবলম্বনে লিখিত। বাঙ্গালার জনসংখ্যার প্রধানত দুই অংশ, হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই অঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। বড়ই সুখের বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতেছেন। লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইলাম।

৪৩।—হরিমতি। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য ॥০। পুস্তক খানির ছাপা ও কাগজ ভাল নয়, কিন্তু অনেক চকচকে টুকটুকে পুস্তক ইহার ধারেও ঘেসিতে পারে না। জিনিস ভাল হইলে বাহ্য চটক না থাকিলে কি আসিয়া যায়? বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের শ্যামরূপ বর্ণনার ধারে এইরূপ বর্ণনা স্থান পাইবার যোগ্য নয় কি?

"কাল জলে ঘন ছায়া নীলিমগগন,
মিশাইয়া দেখিনু যে হ'ল না তেমন লো
হ'ল না তেমন।
দলিত অঞ্জন ঘন তায় নীল আভা,
কভু না তুলিতে পারি শ্যামচাঁদ শোভা লো
শ্যামচাঁদ শোভা।

জলিত দীপের মূল সুনীল বরণ,
তাদের তাদয় দেখি শ্যামের মতন লো
শ্যামের মতন।
ইন্দ্রবর নীলকান্ত দেখিতে মোহন
হবে না হবে না সখি। তাহার মতন গো
তাহার মতন।
আঁধার যামিনী গায়ে জোছনা মাখায়ে,
চাঁদ তারা অঙ্গুরিয়া দিনু তার গায়ে গো
দিন তার গায়ে।
যমুনা সলিলে আনি কাদম্বিনী মালা।
বাঁকা শশী বাঁকাইয়ে করি রূপ ডালা গো
করি রূপ ডালা।

ময়ূর পুচ্ছের রঙ্গে তাহাতে রঞ্জিনু
সঠিক আঁকিতে রূপ তথাপি নারিনু গো
তথাপি নারিনু।"

৪৩। বুদ্বুদ।—শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সুরুচি এবং সুভাব জমাট হইলে যে তরঙ্গের উদয় হয়, বুদ্বুদ তাহাই। গ্রন্থকারের বিনয়-বিজড়িত এই "উপহারে" সকল সমালোচনা পরিসমাপ্ত।

"কে প'ড়িবে কেবা জানে
এ মোর কাহিনী,
কল্পনা মাধুরী নাই,
কবিতা দুখিনী,
উপমা বসন নাই,
অলঙ্কার হীনা,
চুল গুলো আলু থালু,
মুখটী মলিনা।
ভাবের তরঙ্গ নাই,
দুর্ব্বলা লেখনী,
ভাষার লালিত্য নাই অসার জীবনী।
তাই বলি প্রাণ সখা
থাক যে সেখানে,
ফিরে চাও একবার
বুদ্বুদের পানে।
দুবার চাহিবে ব'লে মনে নাহি আশ,
ইহার যে ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষণেই বিনাশ।"

৪৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।—শ্রীম-কথিত, প্রথম ভাগ। এতদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। লেখক উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, পর পর খণ্ডে সমস্ত কথা প্রকাশিত হইবে। রামকৃষ্ণ কথামৃত বঙ্গভাষার এক অমূল্য জিনিস। নব্যভারতের পাঠকগণকে এই অমৃতের পরিচয় না দিলেও চলে; কেন না, সকলেই তাহার আস্বাদন পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত "ম" ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও ভাণ্ডারে নাই। তিনি কৃপা করিয়া নব্যভারতে উত্তর খণ্ডও ক্রমে ২ প্রকাশ করিবেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। সাধু রামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মজগতের ভক্তি বিশ্বাসের এক অপূর্ব্ব বিকাশ। আমরা জীবদ্দশায় তাঁহার দর্শন লাভে ও উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া শ্রীযুক্ত "ম" ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইবে। আমরা এই সকল উপদেশ পাঠ করিয়া যে কত উপকার পাইয়াছি, বলিয়া শেষ করার সাধ্য নাই।

৪৫। INDIAN FAMINES, their causes and remedies, by Prithvis Chandra Ray.

বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সমস্যা অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। নীরবে, বিনা আড়ম্বরে তিনি মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় স্বদেশের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় এই পুস্তক খানি এমন সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন যে, পড়িলে তাঁহার গবেষণার ও হিতৈষণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ৫০ সহস্র স্কোয়ার মাইল ব্যাপিয়া, ১৭৬৯ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দুর্ভিক্ষে ভারতের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অতি দক্ষতার সহিত তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে দুঃখে হৃদয় অভিভূত হয়। ইহা যেন গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক-কাহিনী। কবে ভারতবর্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের এই দুর্নিবার কলঙ্ক অপনীত হইবে! পৃথ্বীশ বাবুর এই পুস্তক খানি প্রতি শিক্ষিত লোকের নিকট আদৃত হইবে, আশা করি।

৪৬। রাজর্ষি কুমার।—শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার প্রণীত, মূল্য রাজর্ষি কুমার—ধ্রুবের জীবন ভক্তের কথা ভক্তির ভাষায় অনুরাগী লিখিয়াছেন। প্রথম ও শেষ কবিতায় গ্রন্থকারের প্রাণের কথা পাঠ করিয়াছি পুস্তকের সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৭। একটী ফুল।—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীরেবতী কান্ত বন্দ্যো... প্রণীত, মূল্য ।০। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের সুন্দর চিত্র। যতদিন কৌলীন্য প্রথা... কন্যাপণ এদেশে প্রচলিত থাকিবে, ... এইরূপ বিষাদ-মাখা কাহিনী অনেক ... করিতে হইবে। হায়! কবে বঙ্গস... রূপান্তর হইবে এবং কন্যাপণ উঠিয়া যা...

এ বৎসরের প্রাপ্ত কয়েক খানি পু... বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছে। ৪৩... সংক্ষিপ্ত সমালোচনা হইল। স্থানাভাবে... পুস্তক শেষ হইল না, আগামী বৎসর।